



উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৬৬-তম বর্ষ

(১৩৭০ মাঘ হইতে ১৩৭১-পৌষ)



'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত'

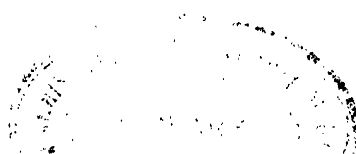
সম্পাদক

স্বামী নিরাময়ানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩

মূল্য ৫·৫০



প্রতি সংখ্যা ৫০ প.

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ—১৩৭০ হইতে পৌষ—১৩৭১)

লেখক-লেখিকাগণ ও তাঁহাদের রচনা

লেখক-লেখিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত	অমৃত পিপাসা (কবিতা)	২৬৩
	ত্রয়ী (ঐ)	৩২০
	হে ধরণি! (ঐ)	৪০৮
	অনন্ত জিজ্ঞাসা (ঐ)	৫৬০
শ্রীগৌরপদ দাশ	প্রশ্নোত্তর (কবিতা) ...	৬৩৪
স্বামী চণ্ডিকানন্দ	সারদা-রামকৃষ্ণ (সঙ্গীত—স্বরলিপি-সহ)	৫৯
	মা (ঐ)	২৬৪
	করুণা-পাথার কেন মা তোমার (ঐ)	৫৩৮
	আদ্যাশকতি মাতৃমূরতি (সঙ্গীত)	৬৫৬
শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	যুগনায়ক বিবেকানন্দ ...	৩৫০
শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তী	মানবতাধর্মী স্বামীজী ...	১৫৫
	শ্রীশ্রীমায়ের সংসারে একদিন ...	৫৯৯
স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বামীজীর সন্নিধানে	৩১, ৮৪, ১৩১, ২০৪, ২৫৭, ৩১৩, ৩৬৯, ৪২৯, ৪৬৫, ৫৫৬, ৬২৬, ৬৮১
ডক্টর শ্রীজীবেন্দ্র সিংহরায়	ঊনবিংশ শতাব্দী: বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা ...	১৪৫
শ্রীদিলীপকুমার রায়	বরদ (কবিতা)	১৯১
	আরব-যোগীর কথা (ঐ)	৪৬৪
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা	২১০, ২৪৯
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাড়ুই	স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি (কবিতা)	৩০
স্বামী ধীরেশানন্দ	বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা ...	১১৫, ১৮২, ২৩৩, ৩৫৩, ৪০১
	জীব কি স্বতন্ত্র? ...	৪৮১
	'গীতা সুগীতা কর্তব্যা' ...	৬৩৫
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নটরাজ (কবিতা) ...	১৩৮
	প্রার্থনা (ঐ) ...	৬৬৬
শ্রীনারায়ণ পাত্র	অপরাজেয় আত্মা (কবিতা) ...	১২০
স্বামী নির্বেদানন্দ	সমাজসেবা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ (অনুবাদ: স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ)	১৪
স্বামী নির্মলানন্দ গিরি	শ্রীশঙ্করাচার্য ও স্বামী বিবেকানন্দ ...	১২৭
শ্রীনটবিহারী চট্টোপাধ্যায়	শতবর্ষ পরে (কবিতা) ...	২৪
শ্রীপুষ্পকুমার পাল	মাতৃদর্শন ...	৬৭৮



বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে

অভিভাষণ

স্বামী মাধবানন্দ

বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা পার্ক সার্কাস ময়দানে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের অভিভাষণ

বন্ধুগণ,

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁহার জন্মস্থান এই মহানগরীতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইতে এবং এই ধর্মমহাসভার উদ্বোধন করিতে আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই মহানগরীতেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী শুনাইয়াছিলেন। বিভিন্ন-ধর্মাবলম্বী মানুষ নিকট এবং দূর হইতে সকল ধর্মের মূল ঐক্য নির্ধারণের জন্য এখানে সমবেত হইয়াছেন। ধর্মকে যদি টিকিয়া থাকিতে হয়, এবং মানব-মঙ্গলের জন্য অবশ্যই ইহা টিকিয়া থাকিবে, তবে আমাদের সকলকে একে অন্যের সহিত ভাবের আদানপ্রদান করিতে হইবে এবং খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে কোথায় আমরা একমত, কোন্ ভিত্তিতে বা মঞ্চে আমরা সকলে মিলিত হইতে পারি এবং ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধা দিতে পারি, কারণ ধর্মহীনতা সর্বত্র প্রসার লাভ করিতেছে। বর্তমানে যখন সকল জাতিই আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতেছে, তখন বিভিন্ন-ধর্মাবলম্বিগণ হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর নিকট প্রেম, শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাণী ঘোষণা করিবে, ইহাই বিধেয়। নানা বাহ্য ধর্মাচারের প্রকাশ এবং অন্তরের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ—এ দুইটি বুঝাইতে 'ধর্ম' শব্দটি অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিকপক্ষে ধর্মাচার যেখানে শেষ হয়, সেখান হইতেই আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের গূঢ় মর্ম এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মে প্রভেদ করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রথমটির সংজ্ঞা দিয়াছিলেন—মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ।

তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কংফুচে, মুসা, পিথাগোরাস, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, লুথার, ক্যালভিন এবং শিখ, দেবতত্ত্ববাদী ও প্রেততত্ত্ববাদী সকলেই মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব প্রচার করেন।

ধর্মের মূলসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, অতীতে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রধান ধর্মকে পরিবর্তনশীল স্থান কাল ও কৃষ্টির সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হইয়াছে, সুতরাং সম্প্রদায়গুলি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সকলেই নিজ নিজ মতকে একমাত্র প্রামাণ্য বলিয়া দাবি করিয়াছে। একই স্রষ্টা বা গ্রন্থ মানিলেও তাহারা যে পৃথক্ মত পোষণ করে, ইহাই ঐক্যের মূল ভিত্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে। একই ধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু নয়, পৃথিবীর সকল ধর্মের মধ্যে এই ঐক্য খুঁজিয়া বাহির করাই বর্তমান সমস্যা। আমরা দীর্ঘকাল বিভিন্নতার উপর জোর দিয়াছি, এখন ঐক্যের উপর জোর দিবার সময় আসিয়াছে।

যখন আমরা সকল ধর্মের ঐক্যের কথা বলি, তখন বিভিন্ন ধর্মের স্থাপয়িতাদের নিকট হইতে প্রথম যে আকারে ঐগুলি নির্গত হইয়াছিল বা মৌলিক গ্রন্থে যেরূপ পরিবেশিত হইয়াছিল, তাহাই প্রধানতঃ আমাদের মনে পড়ে। এখানেও আবার আমরা জানি যে, পৃথিবীর ঐ-সকল মূল ধর্মও সমষ্টিগতভাবে কখনও সদৃশ নয়, কারণ সেই প্রাচীনকালেও ভাষা এবং উপাসনা-পদ্ধতিতে সেগুলি বিভিন্ন ছিল। এই সমস্যা-সমাধানে ভারতীয় পদ্ধতি ছিল বৈচিত্র্যকে স্বীকার করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচার করেন—যেমন একটি ধানের খোসা ও শস্য এই দুইটি অংশ থাকে, তেমনি সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য প্রত্যেক ধর্মে সার ও অসার দুই অংশ অবশ্য থাকিবে। একটি চারাগাছকে রক্ষা করিতে যেমন একটি বেড়ার প্রয়োজন, তেমনি উক্ত রক্ষাকারী আবরণেরও প্রয়োজন। অধিকন্তু বিকাশোন্মুখ মনকে ধাপে ধাপে ঊর্ধ্বগামী হইতে হয় এবং ধর্মের বিভিন্ন রূপ ইহার প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির উপযোগী বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। অসার বলিয়াই রূপকে বাদ দেওয়া যায় না; আবার ধর্মের বহু সারাংশ আপাতবিরুদ্ধ হইলেও বস্তুতঃ তাহা নয়, ঐগুলি পরিপূরকও হইতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'আমি বিভিন্ন ধর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষা, অনুষ্ঠান, গ্রন্থ ইত্যাদির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করি না, কিন্তু আমি প্রত্যেক ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যের উপর গুরুত্ব দিই। আমার বিশ্বাস ঐগুলি পরস্পরবিরোধী নয়, বরং পরিপূরক।'

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মৌলিক ঐক্য প্রকাশ করিয়া সম্প্রদায়গুলিই সত্যের একমাত্র অধিকারী—এই দাবির অসারতা প্রতিপন্নপূর্বক পার্থক্যগুলিকে বড় করিয়া দেখিবার এবং অসার বিষয় লইয়া কলহ করিবার মূঢ়তা প্রদর্শন দ্বারা আমরা দুই দিক হইতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে পারি। 'আমাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত সীমা বিস্তার করা এবং সকল ধর্মই ঈশ্বরে পৌঁছাইয়া দেয়, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা।'

সকল ধর্মের একই লক্ষ্য উপলব্ধি এবং ঐগুলির মধ্যে সমন্বয়-সাধনের এই প্রচেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিজ জীবন দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় শিক্ষা দিয়াছেন যে, সকল ধর্মই সত্য। ভারতের ইতিহাসও স্বামীজীর মনে এই শিক্ষা মুদ্রিত করিয়াছে। ১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রদত্ত তাঁহার সর্বপ্রথম বক্তৃতায় এই বাণীই ব্যক্ত হয়: 'এই বক্তৃতা-মঞ্চে উপস্থিত কতিপয় বক্তাকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি—যাঁহারা প্রাচ্য প্রতিনিধিদের নামোল্লেখ করিয়া আপনাদিগকে বলিয়াছেন যে, বহু দূর দেশ হইতে আগত এই-সকল প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশে পরমতসহিষ্ণুতার

ভাব বহন করিয়া লইয়া যাইবার সম্মান নিশ্চয়ই দাবি করিতে পারেন। আমি এমন এক ধর্মাবলম্বী বলিয়া গর্ব অনুভব করি, যে ধর্ম জগৎকে পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্বগ্রাহিতা দুই-ই শিক্ষা দিয়াছে। আমরা যে শুধু পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী তাহা নয়, পরন্তু সকল ধর্মকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।'

এই গ্রহণের ভাব ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিই নির্দেশ করে এবং তাহার উপর জোর দেয়। আমরা শুধু পরমতসহিষ্ণু নই, পরন্তু সকল ধর্মকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করি এবং সেগুলিকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করি। সকল ধর্মই এদেশে মর্যাদা পায়, কারণ সেগুলি সবই কোন না কোন প্রয়োজন সাধন করে। ভারতীয় সভ্যতার মূল নীতি—'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'; ইহাই বিশ্বের স্বাভাবিক নিয়ম। সমন্বয়, ভ্রাতৃত্ব, পরমতসহিষ্ণুতা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই মানবজাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য নিশ্চিত ও নিরাপদ হইতে পারে। পরমতসহিষ্ণুতায় আরম্ভ করিয়া সহানুভূতি ও সাহায্যের মাধ্যমে ভারত সাম্প্রদায়িকতার প্রকৃত সমাধান পাইয়াছিল একমাত্র গ্রহণ ও স্বীকৃতির পথেই। এই মত স্বামীজী সাহসের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছেন, 'সুতরাং পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা যে মহৎ শিক্ষাটি প্রয়োজন, যাহা এখনও পৃথিবীকে ভারতের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা শুধু পরমতসহিষ্ণুতার ভাব নয়, অধিকন্তু সহানুভূতির ভাব। আমাদের উদার হইতে হইবে—ইহাই শেষ কথা নয়, আমাদের ধর্মমত এবং বিশ্বাস যতই বিভিন্ন হউক, আমাদের একের অন্যকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে হইবে।'

ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতীতি হয় যে, ইহা শুধু নিষ্ফল ভাবপ্রবণতা নয়, ইহা অনুষ্ঠান দ্বারা প্রমাণিত সত্য। হিন্দুরা খৃষ্টানদের জন্য গীর্জা এবং মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল—এইরূপ দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করিতে পারি। ভারতে পার্শী উদ্বাস্তুদিগকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল এবং সেণ্ট টমাস কর্তৃক প্রচারিত খৃষ্টধর্মকে প্রসার লাভ করিতে দেওয়া হইয়াছিল। ভারতীয় কৃষ্টির অন্তর্নিহিত ভাব সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য নীতি নির্ধারিত হইয়াছে ঋগ্বেদের এই মন্ত্রে: 'একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'—সত্য এক, কিন্তু ঋষিরা উহা বহুভাবে অভিহিত করিয়াছেন। এই বাণী কৃষ্টি ও সভ্যতার সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রচেষ্টাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে।

সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত মূল সত্যের ব্যাবহারিক ও তত্ত্বগত স্বীকৃতির সহিত রামানুজ, রামদাস, কবীর, নানক এবং শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মধ্যযুগের সাধকগণ প্রত্যেক ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ মৌলিক উপাদানগুলির একীকরণ-প্রক্রিয়া জ্ঞানতঃ অনুসরণ করিয়াছিলেন। কতিপয় আধুনিক ধর্ম-সংস্কারকও একই পন্থা অনুসরণ করেন। ইহা কিন্তু মোটের উপর সাধারণের নিকট সমাদৃত হয় নাই, কারণ এই পথে প্রত্যেক প্রচেষ্টা মৌলিক বিভেদ দূর না করিয়া শুধু নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ সমীকরণের ভাব পছন্দ করিতেন না, এই সমীকরণ এক ধর্মের কতকগুলি অংশ বাদ দিয়া এবং অন্যস্থান হইতে যাহা সর্বজনের স্বীকৃতি লাভ করিবে এমন কতকগুলি ধার করিয়া কতকগুলি ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। তিনি বরং প্রত্যেক ধর্মকেই সমগ্রভাবে স্বীকার করিতেন, এবং যদি বাহ্য কোন আচারের সংস্কার বা বর্জনের কথা বলিতেন, তবে তাহা তিনি আধ্যাত্মিকতার মূলোচ্ছেদকারী নিরর্থক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়াইবার উদ্দেশ্যেই বলিতেন। তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণতর এবং উদার ও যুক্তিপূর্ণ

করিবার পক্ষপাতী ছিলেন ; উহা ব্যতীত বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের যুগে বর্তমান পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক ধর্মমতেরই টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা আছে। স্বামী বিবেকানন্দ সকলকেই তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম যুক্তিপূর্ণ বেদান্তদর্শন এবং যোগের মনস্তাত্ত্বিক প্রকাশের আলোকে আরও ভালভাবে বুঝিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য সচেতন উপলব্ধির বিরোধী ছিলেন না, বরং অনুকরণের তীব্র নিন্দা করিতেন। স্বামীজীর মতে সম্প্রীতি-স্থাপনের পদ্ধতি—ভগবান্‌কে জানিবার স্বকীয় অকৃত্রিম উপায়ের প্রতি অবিচলিত অনুরাগের সহিত ভ্রাতৃত্বের সক্রিয় অনুশীলন।

সম্প্রদায় থাকিবেই, কারণ বিভিন্ন মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিভিন্ন, কিন্তু মতভেদের কারণ সম্প্রদায়গুলি নয়, যদিও প্রায়শঃ ঐগুলি সংঘবদ্ধ পাশবিকতার অগ্নিতে ইন্ধন যোগায়। বাস্তবিকপক্ষে মানুষের মধ্যে পশুভাব বশীভূত করিতে না পারিলে প্রকৃত সম্প্রীতি কখনও স্থাপিত হইবে না। আমাদের বেশীর ভাগ ব্যবহার ও জীবনদর্শন স্বার্থপরতা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়। আমাদের ব্যক্তিগত ঘৃণা, সামাজিক বিদ্বেষ এবং সমাজ-চ্যুতির দ্বারা প্রতিবেশীরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনধারণ-প্রণালী গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। দলগত স্বার্থও রাজনৈতিক অত্যাচার, জাতি-বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক-উন্মত্ততার রূপ গ্রহণ করে এবং এই সবই করা হয় আধ্যাত্মিক উন্নতির নামে ; কিন্তু এই জঘন্য অবস্থার জন্য রাজনীতিই দোষী, ধর্ম নয়।

এই অবস্থার প্রতিকার ধর্মের স্বল্পতা দ্বারা হইবে না, বরং আরও বেশী ধর্মাচরণ দ্বারা হইবে। ইতিহাস একাধিকবার প্রমাণ করিয়াছে যে, কপট সন্ধি ও চুক্তি—যাহা 'কূটনীতি' নামে অভিহিত, তাহা কখনও শান্তি আনিতে পারে না। অথবা কোন যুদ্ধ—তাহা ঠাণ্ডাই হোক বা গরমই হউক—শান্তি দিতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের জন্য ধার্মিক লোকদিগকে সংঘবদ্ধ-ভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে, এবং বিষয়টি শুধু রাজনীতিজ্ঞদের হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, কারণ অধর্ম হইতে ধর্মকে রক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপরেই স্থায়ী শান্তি-স্থাপনের গুরু-দায়িত্ব নির্ভর করে। সাম্প্রদায়িক কলহের দিন পশ্চাতে ফেলিয়া দিতে হইবে শুধু এই কারণে যে, তাহাতে ধর্মকেই দুর্বল করা হয়। বর্তমান যুগে সকল ধর্মকেই মিলিত হইতে হইবে, নতুবা সকলকেই জড়বাদ দ্বারা একসঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে। দীর্ঘকাল আমরা চক্রান্তকারীদিগকে সত্য ধর্মের অপব্যবহার দ্বারা তাহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে দিয়াছি। মহাত্মারা সর্বপ্রথম ভালবাসা, শান্তি, দয়া, সাম্য এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে এগুলি চক্রান্তকারীদের হাতে শুধু বাঁধা বুলিতে পরিণত হইয়াছে ; তাহারা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও সত্যদ্রষ্টাদের সর্বজনীন ভাবকে 'আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্ম', 'আমাদের জাতীয় ধর্ম', 'আমাদের দেশের ধর্ম' ইত্যাদিতে পরিণত করিয়াছে এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের হাতে ধর্ম—ধর্মোন্মত্ততা, শুধু ধর্মের দোহাই এবং অন্যের প্রতি ঘৃণায় পর্যবসিত হইয়াছে ; নৈতিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের কোন আন্তরিক চেষ্টা হয় নাই। প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ও অবতারগণের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রেম ও মহিমার প্রকাশ এইরূপে ঈশ্বরের সন্তানদের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই ধর্মোন্মত্ততা দূর করিবার জন্য পৃথিবীর মানুষকে আরও ভাল শিক্ষা এবং সকল ধর্মমত সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক গবেষণা এবং তুলনামূলক অধ্যয়নও সারবস্তু হইতে

অসার বস্তুকে পৃথক্ করিতে পারে এবং আমাদিগকে আরও ভাল মানসিক অবস্থায় আনিতে পারে। সাম্প্রদায়িক পাণ্ডিত্যাভিমানী নীতিবিদ্‌গণের দার্শনিক অনুমানগুলি স্পষ্টতঃ ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে, কারণ যথার্থ ধর্ম বেশ ভালভাবেই এরূপ পরীক্ষা ও নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে যখন আলোচ্য বিষয় এই জীবনের বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলির পরিপন্থী হয় এবং নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন শুধু কাহারও উক্তি বা কোন প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করিলেই চলিবে না। পুরাণ এবং আনুষ্ঠানিক আচারগুলিও এই একই প্রকারে পরীক্ষা করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার বৈজ্ঞানিক উন্মত্ততা প্রকাশ না করিয়া এবং সকল প্রকার প্রকৃত বা আনুমানিক বিশৃঙ্খলা, বিধির ব্যতিক্রম ও অযুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষিপ্তের মতো না ছুটিয়া। কারণ আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব স্বাভাবিক অনুবন্ধসমূহ আছে, যেগুলি ব্যতীত কোন ধর্মই টিকিয়া থাকিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যতক্ষণ না ঐ-প্রকার আনুমানিক অযৌক্তিকতা অপরের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধভাবে ব্যবহৃত না হয়, ততক্ষণ আমাদিগকে এ-সকল অনুমোদন করিতে হইবে। যদি তোমাদের অবৈজ্ঞানিক পুরাণ, আচার-অনুষ্ঠান এবং অতীন্দ্রিয়বাদ বাস্তবিকই তোমাদিগকে ঈশ্বরাভিমুখী হইতে সাহায্য করে বলিয়া অনুভব কর, তবে এগুলি রাখো। কিন্তু অন্য সকলকেও তাহাদের স্বকীয় পথে চলিতে দাও, এবং তোমাদের মনের অন্ধকারময় নিভৃত প্রদেশে যুক্তির আলো প্রবেশ করার পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ করিও না।

বিজ্ঞান এবং যুক্তির সম্ভাবনার শেষ সীমা পর্যন্ত এইরূপে একমত থাকিয়াও আমাদের কিন্তু এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, ধর্ম হইতেছে মানুষের ঈশ্বরে পঁহুছিবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি—এই সত্য কোন বিজ্ঞান বা যুক্তি অস্বীকার করিতে পারে না, এবং যে-কোন অবস্থায়ই তাহার আপস করা চলে না। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে আমরা সকলেই একমত, যদিও আমাদের ধর্মের বিভিন্ন নাম থাকিতে পারে, এবং আমরা ঈশ্বরকেও ভিন্ন নামে ডাকিতে পারি। যদি ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা কোথাও সত্য হয়, তবে ইহা সর্বত্রই সত্য, যেন সকল ধর্মেরই উত্থান বা পতন একসঙ্গে ঘটে। এই আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তির মূল্যায়ন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হইতে পারে, এবং কতকগুলিকে উচ্চ ও কতকগুলিকে নিম্নপর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে; তথাপি এগুলি সবই ধর্ম, এবং সংশ্লিষ্ট মানবমনের বিকাশের তারতম্যে যে-সভ্যতায় সেগুলি পরিপুষ্ট হয়, তদনুসারে ঐগুলির যথোচিত কার্যক্ষেত্র আছে। কম উন্নত উপজাতিগুলির ধর্মও যেমন ধর্ম, সভ্য জনসমাজের ধর্মও তেমনি ধর্ম; শিশুর আধ-আধ কথাও মানবীয় ভাষারই একটি রূপ।

মানুষের ব্যবহারের বিস্তৃততর সকল ক্ষেত্রে অথবা ব্যক্তিগত জীবনে, অথবা উভয় ক্ষেত্রে আমরা মৈত্রীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু নিম্ন হইতে ঊর্ধ্ব দিকে অগ্রসর হওয়াই ভাল। একজন সাধু সমাজে নূতন মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারেন, এবং গৃহের ছাদ হইতে চীৎকার করা অপেক্ষা একজন আদর্শ-চরিত্র মানুষের জীবন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের জন্য অনেক বেশী কাজ করিতে পারে। আইন অন্যায়ের বাধা দিতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ সৃষ্টি করা মানব-হৃদয়ের উপরই নির্ভর করে। পরিকল্পিত অগ্রগতি অকপট ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে অবশ্যই অনুসরণ করিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'ধ্বংসকারী সংস্কারক পৃথিবীর কোন উপকার করে না। যদি পারো সাহায্য কর; যদি না পারো, হাত গুটাইয়া নাও এবং দাঁড়াইয়া দেখ।

দ্বিতীয়তঃ মানুষ যে অবস্থায় আছে, সেখান হইতে তাহাকে উন্নতির পথে লইয়া যাও। মানুষকে ধার্মিক করিতে পার—এরূপ ধারণা ত্যাগ কর। তোমার নিজ আত্মা ছাড়া অন্য কোন শিক্ষাদাতা তোমার নাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ জীবনে এই-সকল মত আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। যদি পৃথিবীকে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা এবং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব লাভ করিতে হয়, তবে শ্রীরামকৃষ্ণ যে-আদর্শের প্রতীক, সেই আদর্শ ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে অনুসরণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। এবং এই একটি ক্ষেত্রে ধার্মিক ব্যক্তিমাত্রই সফল হইতে পারে। অকপট ধার্মিক ব্যক্তিদের মতো তাহারা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হউক এবং স্বার্থান্বেষী সংসারী লোকদের দ্বারা তাহারা যেন পরিচালিত না হয়।

উপসংহারে প্রার্থনা করি, স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ যে পরমত-সহিষ্ণুতা ও সর্বগ্রাহিতার জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন, তাহা বিশ্ববাসীদের জীবনে রূপায়িত করিতে এই বিশ্বধর্ম-সম্মেলনের বক্তৃতা ও আলোচনাসমূহ যেন সহায়তা করে। আমি আপনাদের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

সপ্তর্ষিমণ্ডল হ'তে নেমে এসো

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

তোমার অমৃতবাণী এ ভারত ভুলেছে যেদিন,
এসেছে দুর্দিন তার। আলোকের কেন্দ্রহারা হ'য়ে
ঘুরেছে হৃদয়হীন প্রেতায়িত দিবসেরে লয়ে
বৃত্তের বাহিরে। অধ্যাত্ম-পথের বার্তা করি লীন,
বস্তুতন্ত্র-সভ্যতার অগ্নিগর্ভে তার আত্মাহুতি—
শোকাবহ পরিণতি এনেছে সহসা; স্তবস্তুতি
জড়ধর্মী মানবের উপাসনা-তরে—কেঁদে মরে
সংখ্যাতীত প্রাণী। ভারতের এ মৃত্তিকা দাবদগ্ধ,
সত্যনিষ্ঠ যুগযাত্রী অসহায়, সব যেন স্তব্ধ
হয়ে গেছে। উৎকণ্ঠা-কাতর চিত্ত আর্তনাদ করে,
দূরাগত প্রতিঘাতে মহাদুর্যোগের শঙ্কা জাগে;
প্রাত্যহিক অস্থিরতা, প্রতিক্রিয়া আনে কালোছায়া;
ম্রিয়মাণ উপত্যকা তীর্থতটে তোমারে যে ডাকে,
সপ্তর্ষিমণ্ডল হ'তে নেমে এসো লয়ে মর্ত্যকায়া।

কথাপ্রসঙ্গে

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী—অনুচিন্তন

নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আর একটি বৎসর কাটিয়া গেল। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এই সংখ্যা হইতে উদ্বোধনের ৬৬তম বৎসর আরম্ভ। যে বৎসরটি কাটিয়া গেল, সেটি একটি সাধারণ বৎসর নয়। এই বৎসর বিশ্বব্যাপী বিবেকানন্দ শত-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, দেশে বিদেশে মানুষ নূতন আলোক, নূতন শক্তির আশায় স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়াছে—অনুধ্যান করিয়াছে। স্বামীজীর জীবন ও বাণীর নব নব দিগন্ত উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

এই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সহিত যে মহাশতাব্দী অতীতে মিশিয়া গেল, ভবিষ্যতের জন্য তাহার অনুধ্যান একান্ত প্রয়োজন। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর পরিপূর্ণ তাৎপর্য আজও মানবমনে সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়ে নাই। স্বামীজীর নিজের কথা দ্বারাই তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি তো জীবন-মধ্যাহ্নে সূর্যাস্তকালে বলিয়া গিয়াছেন: 'আর একজন বিবেকানন্দ থাকলে, বুঝত—এ বিবেকানন্দ কি ক'রে গেল!' শোনা যায়—তিনি আরও বলিয়াছেন: 'দু-শো বছর পর থেকে মানুষ বিবেকানন্দকে বুঝতে শুরু করবে! যা ভাব দিয়ে গেলাম—পনর-শ বৎসর হেসে খেলে চলবে।' এই-সব ভাবময় উক্তি ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রাখিয়া আমরা সদ্য-অতীতের আলোচনায় অগ্রসর হই। কারণ ইহাতে আমাদের আত্ম-সমীক্ষণে ধরা পড়িবে—আমরা অর্থাৎ বর্তমান মানবজাতি বিবেকানন্দের কোন্ কোন্ ভাবের কতটুকু ধরিতে পারিয়াছি।

বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে কোন আলোচনার প্রথমেই অবশ্য স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ-বিষয়ক ধ্যান ও দর্শন এবং তাঁহার অলৌকিক উক্তি-গুলি। সেগুলির সবটুকু আমাদের বোধগম্য না হইতে পারে, কিন্তু ঐগুলিই দিগ্দর্শনের প্রধান সহায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, অখণ্ডের ঘর হইতে তিনিই এই ধ্যানসিদ্ধ মহা ঋষিকে এ পৃথিবীতে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন মানব-কল্যাণের জন্য। তিনি আরও বলিয়াছেন, 'এত বড় আধার আসেনি কখনও।' শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ যেমন মহান্ ও ব্যাপক—তাঁহার আদর্শের ও বাণীর বাহককেও অবশ্যই তদনুরূপ হইতে হইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের তাৎপর্য যতটুকু এ পর্যন্ত ধরা পড়িয়াছে, তাহা এই যে—ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহাকে দেখা যায় বা অনুভব করা যায়, তাঁহাকে লাভ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য লাভের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে বহু উপায় উদ্ভাবিত বা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সেগুলি সবই সত্য। সেই উপায়গুলি লইয়া কলহ না করিয়া উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইলেই মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণ সুনিশ্চিত।

এই মহাবাণীই স্বামীজী উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধর্ম লইয়া কলহমুখর আধুনিক সভ্য জগতের কাছে ঘোষণা করিয়াছেন। এইটি প্রধান ঘোষণা হইলেও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর আরও অনেকগুলি দিক্ আছে—সেগুলি কেহ বা অবাস্তব মনে করেন, কেহ বা উল্লিখিত প্রধান দিক্টি উপেক্ষা করিয়া আনুষঙ্গিকের উপরই অত্যধিক জোর দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, স্বামীজী প্রধানতঃ দেশপ্রেমিক সমাজকর্মী, ভারতের উন্নতির জন্যই তাঁহার বিদেশে ধর্মপ্রচার।

ইতিহাসের দিক্ দিয়া এ-কথা অবশ্যই সত্য

যে, স্বামীজীর আমেরিকায় ইওরোপে ধর্মপ্রচারের সহিত ভারতের নব জাগরণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে, ভারতবাসীর লুপ্ত আত্মবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামীজীর এমন সব উক্তিও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভারতের দুঃখদৈন্য দূর করিবার জন্যই তিনি পাশ্চাত্যে যাইতেছেন, এবং পাশ্চাত্য হইতে দেশে ফিরিয়া ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিরাট কর্মযোগের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। তথাপি ভুলিলে চলিবে না—স্বামীজীর সকল কর্মের উৎস আধ্যাত্মিকতা। স্বামীজী দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ এই জাতীয় জাগরণকে শুধু রাজনীতিক ও সামাজিক খাতে প্রবাহিত করিলে দেশের ও জাতির স্থায়ী উন্নতি হইবে না, বারংবার তাহাকে আঘাত পাইতে হইবে। কি দেশে, কি বিদেশে স্বামীজীর সকল কর্মের মূল প্রেরণা মানুষের আত্মিক জাগরণ। আত্মার দৃষ্টিতে দেশ বা বিদেশ, ধর্ম বা বিধর্ম নাই। বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক জাগরণই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনাদর্শের বিশেষ তাৎপর্য—এইটুকু আজ বুঝিতেই হইবে।

এই আধ্যাত্মিক জাগরণ শুধু বিশেষ কোন জাতির, ধর্মের বা সম্প্রদায়ের নহে। অনেকে ভুল করিয়া মনে করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্মের সহিতই জড়িত। এ-কথা ঠিক যে, তাঁহাদের আবির্ভাবে হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম নবজন্ম লাভ করিয়াছে, নবজীবনের স্পন্দনে জাগিয়া উঠিয়াছে, বিশ্ব-জীবনের রঙ্গমঞ্চে তাহার জন্য নির্ণীত কর্মভার আধ্যাত্মিকতার উদারবাণী প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইতেছে পৃথিবীর সকল ধর্মের ভিতর একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ধর্মের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নূতন পরিপ্রেক্ষিতে উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁহাদের ধর্ম বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে শুরু করিয়াছেন। মনীষিগণ বলিতেছেন, বৈজ্ঞানিক জড়বাদের সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে সকল ধর্মকে এক উদার ভিত্তিতে মিলিত হইতে হইবে। শুধু সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান ও পৌরাণিক কাহিনীর উপর নির্ভর করিলে ধর্ম আর আজ শিক্ষিত সভ্য সমাজে কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

ধর্মের এই উদার সাধারণ ভিত্তি 'বেদান্ত'। স্বামীজী দেশ-বিদেশে ভারতের যে 'সনাতন ধর্ম' প্রচার করিয়াছেন, তাহা তথাকথিত আনুষ্ঠানিক 'হিন্দুধর্ম' নয়—তাহা এই বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক ধর্ম (Universal Science-Religion)। রাজ-নীতিক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর ক্ষমতালাভ ও ধর্মান্তরিতকরণের ভাব হইতেই সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার উৎপত্তি। বেদান্ত-ভাব গ্রহণ করার অর্থ নিজের ধর্ম ভাল করিয়া উপলব্ধি করা এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর সকল ধর্মকে শ্রদ্ধা করা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে ধর্মসমন্বয়ের মহান্ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, বিবেকানন্দ-মুখে তাহাই বজ্রকণ্ঠে প্রচারিত: বেদান্ত হিন্দুকে ভাল হিন্দু করিবে, খ্রীষ্টানকে ভাল খ্রীষ্টান করিবে, মুসলমানকে ভাল মুসলমান করিবে। মূলতঃ সকল ধর্মই সৎ ও সত্য।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী শেষে এই প্রার্থনা করি—মানুষের মধ্যে সুপ্ত উন্নততর চেতনা জাগ্রত হউক। তবেই ধর্মের নামে দাঙ্গাহাঙ্গামা উৎপীড়ন ও দুর্বৃত্ততা বন্ধ হইবে। কোন ধর্মই এগুলি সমর্থন করে না। ধর্মের সহিত রাজ-নীতির মিশ্রণের ফলেই এগুলির উৎপত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামে, সকল ধর্মের মহান্ প্রতিষ্ঠাতাদের নামে ঠিক ঠিক উদ্‌বুদ্ধ হইলেই মানুষের মন হইতে এই-সকল দুষ্প্রবৃত্তি দূরীভূত হইবে।

বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকীতে

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের সৃষ্টি। রামকৃষ্ণই নরেন্দ্রনাথকে বিবেকানন্দে রূপান্তরিত করেছিলেন, তাঁর কাজ করবার জন্য। ধর্ম-জগতে সব ধর্মেরই স্থান আছে, সকল ধর্মই সত্য—এই ছিল রামকৃষ্ণের মর্মবাণী। 'যত মত তত পথ'—এই সার্বভৌম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করবার জন্যেই মর্ত্যধামে রামকৃষ্ণের অবতরণ। তিনি হচ্ছেন বর্তমান যুগের এক ঋষির ভাষায়ঃ The pilot and the guide for the needs of the new age. রামকৃষ্ণ যুগ-সারথি। নব-যুগের আহ্বানে তাঁর আবির্ভাব। আর নরেন্দ্র-নাথকে তাঁর একান্ত প্রয়োজন ছিল 'যত মত তত পথ'—এই যুগবাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্যে। তাই তো রোমাঁ রলাঁর ভাষায়, 'this great moulder of souls cast with his fingers of fire the bronze of Vivekananda' ...মহাশিল্পী আগুনের আঙুল দিয়ে সযত্নে তৈরী করলেন বিবেকানন্দকে। বিবেকানন্দের সমগ্র ব্যক্তিত্বের উপরে রামকৃষ্ণের পাঁচ আঙুলের ছাপ অতি সুস্পষ্ট। নরেন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অসাধারণ যুবক সহজে রামকৃষ্ণের কাছে মাথা নীচু করেনি। যুবক ইংরেজী এবং সংস্কৃত—উভয় সাহিত্যেই বিদ্যার জাহাজ। যা যুক্তিসহ নয়, তা কিছুতেই মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত নন। অদ্ভুত—অপূর্ব ঠাকুরের দিব্য জীবনের মহিমা! প্রভাতের শিশিরস্নাত অনাঘ্রাত পুষ্পের মতোই পবিত্র সেই জীবন। সংসারে আছেন, কিন্তু পদ্মের পাতার মতোই তিনি নির্লিপ্ত। মহা-মায়ার কৃপায় মায়ার সমুদ্রকে অতিক্রম ক'রে ঠাকুর এমন এক রাজ্যে বাস করেন, যেখানে দিবারাত্র ঈশ্বরীয় আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরের ব্রাহ্মণটির হৃদয়ে ভেদবুদ্ধির লেশ-মাত্র নেই। পোকাটিরও তিনি নিন্দা করেন না। দীপ্ত, মুক্ত, নিরাসক্ত সেই মহাজীবনের দুর্নিবার আকর্ষণকে ঠেকাবার সাধ্য নেই নরেন্দ্র-নাথের। অথচ বুদ্ধিতে যার নাগাল পাওয়া যায় না, তাকে নতশিরে মেনে নিতেও নরেন্দ্র-নাথের ঘোর আপত্তি। সংশয়ের অবসান কোথায়?

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরটিও গঙ্গায় ছিপ ফেলে চুপটি ক'রে বসে আছেন, আর মজা দেখছেন। রোমাঁ রলাঁ তাঁর অনন্যকরণীয় ভাষায় ঠাকুরকে বলেছেনঃ the tolerant and mischievous fisher of the Ganges—কৌতুকপ্রিয় দুষ্টু শিকারী ছিপ ফেলে বসেই আছেন! চারের লোভে মাছ বঁড়শির চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, বঁড়শিতে দু-একটা ঠোকরও মারে মাঝে মাঝে, কিন্তু টোপ গেলে না কিছুতেই। মৎস্য-শিকারীর সহিষ্ণুতা কিন্তু অপরিমেয়। তিনি জানতেন, মাছ একদিন না একদিন বঁড়শি গিলবেই। পৃথিবীতে নরেন্দ্র-নাথের আবির্ভাব তো রামকৃষ্ণের যুগবাণী বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্যে। রামকৃষ্ণের চরণ-মূলে জীবনকে উজাড় ক'রে সঁপে না দিয়ে নরেন্দ্র যাবে কোথায়? অবশেষে 'রাঙাচক্ষু বড় রুই' টোপ গিললো। নরেন্দ্রনাথ তিলতুলসী দিয়ে জন্মের মতো নিজেকে বিকিয়ে দিলেন রাম-কৃষ্ণের চরণারবিন্দে। কিন্তু বৃহৎ রুইমাছটিকে ডাঙায় তুলতে ঠাকুরের ছটি বছর লেগেছিল স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'I fought my Master for six long years, with the

result that I know every inch of the way!'

বিবেকানন্দের বাণীর মধ্যে আমরা রামকৃষ্ণের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। রামকৃষ্ণের পতাকা-বাহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিবেকানন্দ যা কিছু লিখে গেছেন, ব'লে গেছেন, ক'রে গেছেন—সবই ঠাকুরকে প্রচার করবার জন্যে। দিগ্বিজয়ী পুরুষসিংহের গগনস্পর্শী প্রতিভার ছাপ ছিল বিবেকানন্দের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বে। চমৎকার দুটি বড়ো বড়ো চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কী যাদু! প্রশস্ত ললাট; মজবুত শরীর; একটা রাজকীয় মহিমা বিচ্ছুরিত হচ্ছে সন্ন্যাসীর দুর্বার ব্যক্তিত্ব থেকে। রোমাঁ রলাঁ ঠিকই মন্তব্য করেছেন, 'He was a born king and nobody ever came near him either in India or America, without paying homage to his majesty'—জন্ম থেকেই বিবেকানন্দ যেন মহিমময় সম্রাট্। 'পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল।' কি ভারতবর্ষে, কি আমেরিকায় যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, তাদেরই মাথা আপনা থেকে নুয়ে পড়েছে তাঁর গরিমার কাছে। তাঁকে দেখামাত্রই লোকের মনে হ'ত দেবতার দীপহস্তে এই মানুষটি এসেছেন অন্ধকারকে আলোকিত করবার জন্যে। তাঁর প্রশস্ত ললাটে দেবতার নিজের নামের উজ্জ্বল স্বাক্ষর! প্রথম দৃষ্টিপাতেই লোকে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় নির্বাক্ হয়ে যেত। এ মানুষ তো সে মানুষ নয়। এ যেন মহাকাশচারী এক মুক্তপক্ষ ঈগল! কী প্রকাণ্ড এবং কী জোরালো তার প্রসারিত দুটি ডানা! মুক্তির মধ্যেই তার জন্ম! মুক্তিতেই তার আনন্দ! পৃথিবীর কোন বন্ধনই তার জন্য নয়! এ মানুষের আসন সকলের পুরোভাগে! নেতৃত্ব করবার জন্যেই এঁর আবির্ভাব! রলাঁ (Romain Rolland) ঠিকই লিখেছেন: It was impossible to imagine him in the second place. Wherever he went, he was the first. পৃথিবীর বিবেকানন্দেরা যেখানেই যাবেন, সেখানেই তাঁরা প্রথম, সেখানেই তাঁরা অদ্বিতীয়। ঠাকুর বলতেন, 'ডোবা-পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘি, যেমন হালদারপুকুর।'

রাজকীয় মহিমায় দেদীপ্যমান বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্যও কি অদ্ভুত! অপরিচিত দেশে বিবেকানন্দ তখনও একজন অজ্ঞাত এবং আগন্তুক ভারতীয় সন্ন্যাসী মাত্র। মহাসভা-সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির নামে পরিচয়পত্র নেই! এই অবস্থায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হ'ল। অধ্যাপক বিস্ময়ে চমকিত হলেন হিন্দুসন্ন্যাসীর জ্ঞানের গভীরতা দেখে। যাতে স্বামীজী চিকাগো ধর্মসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে বক্তৃতা দেবার সুযোগ পান, তার জন্যে অধ্যাপক পত্র দিলেন তাঁর এক বন্ধুর নামে। ঐ পরিচয়-পত্রের মধ্যে লেখা ছিল: দেখিলাম, অজ্ঞাতনামা হিন্দু আমাদের সকল পণ্ডিতকে একত্র করিলে যাহা হয়, তদপেক্ষাও বেশী পণ্ডিত।

আর বিবেকানন্দের হৃদয়? বুদ্ধের হৃদয়ের মতো সেই বিশাল হৃদয় করুণার যেন সমুদ্র! ঐশ্বর্যের দেশ আমেরিকায় ধনী শিষ্যেরা গুরু-দেবের সুখের জন্যে কত আরামের ব্যবস্থা করেছেন! নতুন মহাদেশে বিবেকানন্দ যখন অপরিচিত ছিলেন, তখন চরম দারিদ্র্যের অন্ধকারে তাঁর দিন কেটেছে! দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছেন; একমুষ্টি অন্ন মেলেনি। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, নিরাশ্রয় বিবেকানন্দ চিকাগোর রাজপথে অবসন্ন দেহে ব'সে পড়েছেন। এমনি এক মুহূর্তে দৈব সহসা অনুকূল হয়ে স্বামীজীর নিমজ্জমান তরীকে তীরে ভিড়িয়ে দিলেন।

আশ্রয় মিললো, বিশ্রাম মিললো, ধর্মসভায় বক্তৃতারও সুযোগ মিলে গেল! ঠাকুরই কি আড়াল থেকে সব 'জোটপাট' ক'রে দিলেন? কিন্তু দারিদ্র্যের গ্রাস থেকে যদি বা তিনি রক্ষা পেলেন, এবার মুখব্যাদান ক'রে তাঁকে খেতে এল ঐশ্বর্যের বাঘ। দিগ্বিজয়ী বাগ্মী এবং পণ্ডিত, রামকৃষ্ণের প্রিয়তম সন্তান ঐশ্বর্যের কবলে প'ড়ে কি জীবনের ব্রত বিস্মৃত হবেন? কিন্তু দারিদ্র্য যাঁকে পরাজিত করতে পারেনি, ঐশ্বর্যের মায়াও তাঁকে মুগ্ধ করতে পারল না! ঠাকুরের ভুজচ্ছায়ায় যাঁর বসতি, ঐশ্বর্যই বা তাঁর কি করবে এবং দারিদ্র্যই বা কি করবে? রলঁ্যা বিবেকানন্দের জীবনচরিতে লিখেছেন: Vivekananda grew almost physically sick from this excess of money. At night in his bedroom he gave vent to cries of despair and rolled on the ground, when he thought of the people who were dying of hunger. সুরম্য প্রাসাদের সুসজ্জিত কামরায় মেঝের উপরে বিনিদ্র বিবেকানন্দ এপাশ-ওপাশ করছেন। চোখে ঘুম নেই! সুদূর সমুদ্রপারে তাঁর দরিদ্র জন্মভূমিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনশনে অর্ধাশনে জীবন অতি-বাহিত করছে। তাদের অস্তিত্ব একটা অন্তহীন বেদনার দুঃস্বপ্ন। সেই দুর্ভাগা স্বদেশবাসীদের ম্লানমুখচ্ছবি বিবেকানন্দ একমুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছেন না! ভুলবেন কেমন ক'রে? সন্ন্যাসীর প্রাণ যে তাদের প্রেমে পূর্ণ হয়ে আছে! ভালবাসার চরম যেখানে, সেখানে দুই নেই, সবই একাকার! প্রেমে আমরা যাকে ভালবাসি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাই, এক হয়ে যাই। ভালবাসা মানে ইংরেজীতে যাকে বলে identification, প্রেমের রাজ্যে 'আমি' মানে 'তুমি' আর 'তুমি' মানে 'আমি'! মার্কিন কবি হুইট্‌ম্যানের 'Song of Myself' কবিতায় দুইটি অপূর্ব লাইন আছে, যার মধ্যে প্রেমের এই তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লাইন-দুটি:

I donot ask the wounded person
how he feels,
I myself become the wounded person,
My hurts turn livid upon me
as I lean on a cane and observe.

—আহতকে আমি জিজ্ঞাসা করিনে, কিরকম বোধ ক'রছ তুমি। আমি নিজেই যে হয়ে যাই সেই আহতব্যক্তি! বেতের ছড়ির উপর ভর দিয়ে আমি দেখি আর বেদনায় আমার সর্বাঙ্গ নীল হয়ে যায়।

এর নাম প্রেম, এর নাম ভালবাসা! ভালবাসলে—যাকে ভালবাসি, তার যাতনাকে রক্তের প্রতিটি কণা দিয়ে অনুভব করি আমরা। স্বামীজী ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট দুর্ভাগা নরনারীকে এমন গভীর করেই ভালবেসেছিলেন তাঁর সত্তার প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে যে তাদের ক্ষুধার যাতনাকে তিনি রীতিমত অনুভব করতেন—যেন দুঃসহ ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছেন তিনি নিজেই! স্বদেশের মানুষগুলির সঙ্গে যাঁর ঐক্যের অনুভূতি ছিল এমন এবং গভীর, তিনি কেমন ক'রে সুখে নিদ্রা যাবেন পালঙ্কের দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায়? ঠাকুর ঠিকই বলতেন, 'নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়।'

একটি সুগঠিত সুন্দর মানবদেহ, কথা-বার্তায় চালচলনে একটি রাজকীয় গরিমার বিচ্ছুরণ, জ্ঞানে যেন দ্বিতীয় শঙ্কর আর হৃদয়টি যেন কারুণ্যের অবতার বুদ্ধের বিশাল হৃদয়! এই সবগুলি মিলিয়ে যে একটি পরিপূর্ণ মানবের ছবি আমাদের কল্পলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সেই পরিপূর্ণ মানব ছিলেন বিবেকানন্দ! গর্বোদ্ধত পাশ্চাত্যের সম্মুখে অবহেলিত এশিয়াকে মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে এইরকমের একটি অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভার প্রয়োজন

ছিল! ভারতবর্ষের আকাশে তখন ঘনীভূত অন্ধকার! সিপাহীবিদ্রোহের মধ্যে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের যে-প্রয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতোই প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল, তা ফলবান্ হয়নি। জড়বাদী পশ্চিমের দিগ্বিজয়ের গরিমার সম্মুখে আমরা তখন বিস্ময়ে হতবাক্! তার টেক্‌নলজির চমকপ্রদ উন্নতির চাকচিক্যে আমরা মুগ্ধ। ঐ চোখ-ঝলসানো সভ্যতার উদ্ধত দৃষ্টির সম্মুখে আমরা তখন ভাবতে আরম্ভ করেছি—কত ক্ষুদ্র, কত অপদার্থ আমরা; কত দরিদ্র আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি। আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে তখন ইংরেজ-শাসনের জয়ধ্বনি। ভারতীয় ইতিহাসের সেই এক অতি তমসাচ্ছন্ন মুহূর্তে একটা ধূল্যবলুণ্ঠিত জাতিকে জাগাবার জন্যে আবির্ভূত হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। জীমূতমন্দ্রস্বরে তিনি আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, গরিমময় আমাদের অতীত, সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আমরা বংশধর, আধ্যাত্মিক শক্তির আধার আমাদের পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ। গর্বিত পাশ্চাত্যের উদ্ধত সভ্যতার পদপ্রান্তে আমরা ছিলাম কুণ্ঠায় নতশির। স্বামীজী চিকাগোর ধর্মসভায় বেদান্তের যে-বাণী প্রচার করলেন, তার মধ্যে বেজে উঠল হিন্দুধর্মের জয়ডঙ্কা। সমগ্র জগৎ স্তব্ধ হয়ে শুনল উপনিষদের এবং ভগবদ্গীতার সেই অমর বাণী। পরানুকরণের দাসসুলভমোহে মুগ্ধ হয়ে ভারতবর্ষ তার নিজস্ব ধর্মের এবং সংস্কৃতির এককণাও ছাড়তে প্রস্তুত নয়। সে জেনেছে আপনাকে, চিনেছে আপনার জ্যোতির্ময় অতীতকে, নিঃসংশয়ে বুঝেছে ইতিহাসের অমোঘ অঙ্গুলি-সঙ্কেত কোন দিকে। পাশ্চাত্য সভ্যতা অপূর্ণ এবং আংশিক; প্রাচ্যের সভ্যতাও তাই। দুয়ে মিলে যে-সভ্যতা তাই হবে পরিপূর্ণ। এশিয়া ইওরোপকে দেবে ধর্ম; ইওরোপের পদপ্রান্তে বসে এশিয়া শিখবে বিজ্ঞান। রলাঁ্যা নিজে পাশ্চাত্যের মানুষ হয়েও তাই উন্নাসিক ইওরোপীয় সভ্যতাকে কটাক্ষ ক'রে বলেছেন বিবেকানন্দের জীবনীতে: The time is past for the pre eminence of one incomplete and partial civilisation. Asia and Europe, the two giants, are standing face to face, equals for the first time. If they are wise, they will work together, and the first of their labours will be for all.

পাশ্চাত্যের আকাশস্পর্শী স্পর্ধার সামনে উন্নতশিরে দাঁড়াবার শক্তি ও সাহস প্রাচ্যের মনে এনে দিল চিকাগোর সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতার বিদ্যুৎপ্রবাহ। সেই বক্তৃতা আমাদের চিত্তে সঞ্চারিত ক'রল আত্মবিশ্বাস, ভারতবর্ষের অপরাজেয় আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পর্কে আমাদিগকে ক'রল দৃঢ়নিশ্চয়। যে বেদান্ত ছিল তপোবনের ঋষিদের সম্পদ, মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের গর্বের ও গবেষণার বস্তু, তার বাণীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে তিনি পরিব্যাপ্ত ক'রে দিলেন ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত। স্বামীজী নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেছিলেন একটা ধূল্যবলুণ্ঠিত জীবন্মৃত জাতিকে নবজীবনের পথে জাগ্রত করবার জন্যে সর্বপ্রথম দরকার সেই জাতির অন্তরে আত্ম-বিশ্বাস সঞ্চারিত করা। তাই নানা ভঙ্গীতে বারংবার তিনি বলতেন: 'আমাদের প্রধান কর্তব্য নিজেকে ঘৃণা না করা। উন্নত হইতে হইলে প্রথমে নিজের প্রতি, তার পর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাকা দরকার।'

কিন্তু যে-কথাটি বলবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা, তার থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছি। দিগ্বিজয়ের সমস্ত অভিযানের মধ্যে বিবেকানন্দ নিমেষের জন্যও ভোলেননি, জন্মে জন্মে তিনি রামকৃষ্ণের দাসানুদাস। রামকৃষ্ণকে প্রচার

করাই তাঁর জীবনের ব্রত। আর রামকৃষ্ণের কাছে তনু-মন-ধন নিবেদন ক'রে দিয়েছে যারা, রণে বনে পর্বতে তারা অজেয়! ১৮৯৪ খৃঃ স্বামীজী লিখেছিলেন তাঁর জনৈক ভক্তকে: আমরা আকাশের তারকাসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ করতে পারি, উৎপাটিত করতে পারি ত্রিভুবন। জান না আমরা কে? আমরা রামকৃষ্ণের দাস। রামকৃষ্ণের উপরে বিবেকানন্দের বিশ্বাস ছিল অপরিমেয়। দিগ্বিজয়ীর প্রতিভায় যিনি ছিলেন দেদীপ্যমান, সারা পৃথিবীর প্রথিতযশা পণ্ডিতেরা সসম্ভ্রমে স্বীকৃতি দিয়েছে যাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমাকে, নেতৃত্ব করবার সহজাত ক্ষমতা নিয়ে যিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কিন্তু আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে সর্বাগ্রে এবং সগৌরবে বলেছেন, 'তস্য দাসদাসদাসোঽহম্—Oh, I am the servant of the servants of his servants. আমি তাঁর দাসাণুদাস। কেন? 'Ramakrishna Paramahansa is the latest and the most perfect – the concentrated embodiment of knowledge, love, renunciation, catholicity and the desire to serve mankind.'—কারণ রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার-

। জ্ঞানের, প্রেমের, ত্যাগের, ঔদার্যের এবং লোকহিতৈষণার ঘনীভূত প্রতিমূর্তি! তাঁর সঙ্গে কারও তুলনাই হয় না। 'He must have been born in vain, who cannot appreciate him!' যারা রামকৃষ্ণকে ঠিকমত বুঝলে না, তাদের মানবজন্ম বৃথা। 'My supreme good fortune is that I am his servant through life after life.' আমার পরম সৌভাগ্য যে জন্মে জন্মে আমি তাঁর দাস। 'A single word of his is to me far weightier than the Vedas and Vedanta.' আমার কাছে তাঁর একটি কথার গুরুত্ব বেদ-বেদান্তের চেয়ে অনেক বেশী।

বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকীতে তাই বারংবার স্মরণ করা দরকার, স্বামীজীকে ঠাকুরই গড়েছিলেন যেমন ক'রে শিল্পী নিপুণহাতে মূর্তি গড়ে। বিবেকানন্দকে রামকৃষ্ণ মনের মতো ক'রে গড়েছিলেন তাঁর চিন্তার বীজকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত ক'রে দেবার জন্যে। তপস্যার দ্বারা উপলব্ধিতে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সেই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রচার ছিল বিবেকানন্দের ব্রত। বিবেকানন্দ শিক্ষাব্রতী ছিলেন, বেদান্তের প্রচারক ছিলেন, দেশপ্রেমিক ছিলেন, সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রদূত ছিলেন, পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের স্বর্ণসেতু ছিলেন। এ সবই তিনি ছিলেন, আরও কত কি ছিলেন! কিন্তু সর্বাগ্রে তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণের পতাকাবাহী মহাসৈনিক। তাই তো রলাঁ্যা স্বামীজীর জীবনীর প্রারম্ভেই লিখেছেন: The great disciple whose task it was to take up the spiritual heritage of Ramakrishna and disseminate the grain of his thought throughout the world....সেই মহান্ শিষ্য যাঁর ব্রত ছিল রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক মহাসম্পদের উত্তরাধিকারী হয়ে তাঁর চিন্তার বীজ বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া।

সমাজসেবা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ*

স্বামী নির্বেদানন্দ

বেদান্তকে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ শক্তির চিরন্তন উৎস ব'লে ঘোষণা ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: 'তোমাদের চোখের সামনে উপনিষদের সত্য পড়ে রয়েছে। সেগুলি আহরণ ক'রে তদনুসারে জীবন-গঠন কর, তাহলেই ভারতের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।' সমাজের নিরাপত্তা নির্ভর করে ব্যক্তির উন্নত জীবনের ওপর; বেদান্তের আদর্শের মাধ্যমে সে উন্নতি হওয়া সম্ভব। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন যে, বেদান্তের আদর্শ মানুষের প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত করে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী উদার ক'রে দেয়। যথাশক্তি দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বলেছেন যে, জাতিকে একতাবদ্ধ করার জন্য সর্বপ্রথম কাজই হচ্ছে গোটা দেশকে বেদান্তের আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শের প্লাবনে ভাসিয়ে দেওয়া। তাঁর যে-সব শিক্ষিত দেশবাসী পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির মোহে মুগ্ধ হয়ে নিজ ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতি অন্ধ ছিলেন, বিশেষ ক'রে তাঁদের তিনি বলেছেন যে, জাতীয় সংস্কারের কার্যতালিকায় বৈদান্তিক ভাবের মাধ্যমে পুনর্জাগরণের স্থান প্রথমেই দেওয়া প্রয়োজন। কেন যে প্রয়োজন, তা-ও তিনি বলেছেন, 'আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক জ্ঞান ও অন্যান্য যে-সব জ্ঞান আমাদের প্রয়োজন, তা সবই এসে যাবে। কিন্তু ধর্মকে বাদ দিয়ে যদি জাগতিক জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা কর, আমি সোজা কথায় বলছি, ভারতে সে-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে; লোকের ওপর কখনও তা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।'···

ভারতের জাতীয় সংগঠনের কাজে ধর্ম যে অতিপ্রয়োজনীয়, সে-কথা তিনি বারবার বলেছেন, 'রক্ত যখন শুদ্ধ ও সতেজ থাকে, কোন রোগের বীজাণুই তখন শরীরে ঢুকে টিকে থাকতে পারে না। আমাদের ধমনীতে আধ্যাত্মিকতার রক্ত বইছে। সে রক্ত-প্রবাহ যদি অব্যাহত থাকে, যদি নির্মল থাকে, সতেজ থাকে, তাহলে সবই ঠিকমত চলবে। সে-রক্ত শুদ্ধ থাকলে দেশের সামাজিক, রাজনীতিক এবং অন্যান্য সব জাগতিক অভাবই, এমন-কি দারিদ্র্যও দূরীভূত হবে, সব রোগই সেরে যাবে।'···

একজন ভবিষ্যদ্বক্তার মতোই বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক আদর্শকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করলে আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ পর্যন্ত লক্ষ্যলাভের সাফল্য অর্জনে সমর্থ হবে না কখনও। তিনি বলেছেন, সব দিক দিয়েই দেখা যাচ্ছে, জনগণ-চালিত শাসনতন্ত্র,—তাকে সমাজতন্ত্রবাদ বা অন্য যে-কোন নামেই অভিহিত করা যাক না কেন—এসে যাচ্ছে। জাগতিক অভাবের অবসান, কম কাজ, নির্যাতনহীনতা, যুদ্ধ-বিরতি, খাদ্যের প্রাচুর্য—এ সব তো লোকে চাইবেই। কিন্তু ধর্মের ওপর, লোকের সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত না হ'লে এ সভ্যতা বা অন্য কোন সভ্যতা যে টিকে থাকবে, তার নিশ্চয়তা কি? ধর্মের ওপর নির্ভর কর; ধর্ম সব জিনিসের মূল পর্যন্ত স্পর্শ করে; এ যদি ঠিক থাকে, সবই ঠিক চলবে।' ধর্ম লোককে আফিংখোরের মতো নির্জীব ক'রে রাখে—স্বামীজীর মতে এরূপ ভাবার চেয়ে ভুল ধারণা

* মূল গ্রন্থ 'Sri Ramakrishna & Spiritual Renaissance" হইতে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

আর কিছু থাকতে পারে না; যদিও এ-কথা অতি সত্য যে, মানুষকে দুর্বল, ক্রীতদাসতুল্য, এমন-কি মনুষ্যত্বহীন পর্যন্ত ক'রে তোলার জন্য আধ্যাত্মিক দারিদ্র্যের এক যুগে উদ্ভূত সঙ্কীর্ণ ধর্মধ্বজীদের গড়া বিকৃত ধর্মকে যথেষ্ট দায়ী করা চলে। কাজেই তিনি প্রাণপণে ঘোষণা করেছেন, 'আমার মতে হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য ধর্মকে নষ্ট করার কোন প্রয়োজন নেই; সমাজে ধর্ম যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়নি বলেই এমন হয়েছে। এ-কথা আমি প্রতিটি শব্দ ধরে প্রমাণ ক'রে দিতে পারি আমাদের প্রাচীন গ্রন্থ থেকে। এইটাই আমি শেখাতে চাই; আর একে কার্যকরী করার জন্য আজীবন আমাদের চেষ্টা করতেই হবে।'…

বেদান্তের মূল শিক্ষা থেকে গৃহীত সমাজ-সেবার কার্যকর প্রণালীগুলি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন তিনি। বলেছেন:

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য ক'রে তিনি অনুজ্ঞা দিয়েছেন লক্ষ লক্ষ ব্যথিতের দুর্দশা অনুভব করতে, তাদের ঈশ্বর জ্ঞান করতে; ঈশ্বরপূজার জন্য যতখানি প্রয়োজন, ততখানি ভক্তিভাব, ত্যাগ ও শ্রদ্ধা নিয়ে তাদের সেবা করতে। স্বামীজীর জলদ-গম্ভীর বাণী এখনও কানে ভাসে, 'ঈশ্বরকে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ? দীন, দরিদ্র, দুর্বল—এরাই তো ঈশ্বর! আগে এদের পূজো কর না কেন? এরাই তোমার ঈশ্বর হোক—এদের কথা ভাবো, এদের জন্য কাজে লেগে পড়, এদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা কর প্রাণ ভরে; দেখবে প্রভু তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।' …'দরিদ্রের জন্য যার হৃদয় কাঁদে, তাকেই আমি মহাত্মা বলি, নইলে সে দুরাত্মা।'…'জনগণকে অবহেলা করা একটা বিরাট পাপ ব'লে মনে করি আমি; আর এটাই আমাদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। ভারতের জনসাধারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না ভালভাবে শিক্ষা পাচ্ছে, ভালভাবে খেতে-পরতে পাচ্ছে, ততক্ষণ যত রাজনীতিই করা যাক, বিশেষ কিছু ফল হবে না তাতে। আমাদের শিক্ষার জন্য তাদের ত্যাগস্বীকার করতে হয়, আমাদের মন্দির তারা গড়ে দেয়; আর প্রতিদানে পায় পদাঘাত। কার্যতঃ তারা আমাদের ক্রীতদাস। ভারতকে আবার নতুন ক'রে জাগাতে হ'লে তাদের জন্য আমাদের খাটতেই হবে।'… 'যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী ব'লে মনে করি।'

স্বামীজী এভাবে সমাজের উচ্চবর্ণকে জন-সাধারণের প্রতি তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দিয়েছিলেন। যাঁরা জাতীয় উন্নতি চান, তাঁদের বলেছেন, জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে, তাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা বজায় রেখে তাদের 'হারানো ব্যক্তিত্ব প্রত্যর্পণ' করতে হবে। কারণ, এতে দুই কাজই সিদ্ধ হবে, নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে, আবার দেশকে গৌরবের আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাও হবে। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, 'ত্যাগ ও সেবাই আমাদের জাতীয় আদর্শ। এ দুটি খাতে তার জীবনপ্রবাহ বেগবান্ ক'রে তোল, তাহলেই বাকী সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে।'

ফলে স্বামীজীর মতো তাঁর স্বদেশবাসীরাও হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলেন যে, ভারতীয় জাতি কার্যতঃ কুটিরেই বাস করে! আর দেশের অধিকাংশ লোকই, 'বিশ কোটি নরনারী

দারিদ্র্যে ও অজ্ঞানান্ধকারে চিরনিমগ্ন' হয়ে রয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'আমাদের জাতি যদি আবার তার পায়ের ওপর দাঁড়াতে চায়, তাহলে ধনী শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের লোকদের—সেবা-অর্ঘ্য হাতে নিয়ে, উচ্চাসন থেকে নেমে এসে জনসাধারণের পাশে দাঁড়াতে হবে, তাদের কুটিরের দ্বারে দ্বারে গিয়ে খাদ্য ও শিক্ষা পৌঁছে দিতে হবে। এভাবে ওপরে তুলে আনতে হবে জনসাধারণকে। কিছুদিনের জন্য নিজেদের বিলাসের, নিজেদের সমৃদ্ধিলাভের 'সব চিন্তা ছেড়ে দিয়ে, নিজেদের সব শক্তি-সম্বল সাধ্যমত উৎসর্গ করতে হবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে জনগণের সেবায়।' স্বামীজী বলেছেন, 'সর্বাগ্রে ক্ষুধা ও অনাহাররূপ দুর্ভাগ্যের, কোনরূপে বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর উদ্বেগের অবসান তোমাদের ঘটাতেই হবে।' তারপর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এবং অপরাপর জাতিগুলি কিভাবে চিন্তা করেছে, তা তাদের জানাতে হবে। অপরাপর জাতিগুলি বর্তমানে কি করছে, বিশেষভাবে সে-কথা তাদের জানতে দাও। তারপর কিভাবে তারা চলবে, সে-কথা তাদের নিজেদেরই নির্ধারণ ক'রে নিতে দাও। আমাদের কাজ হচ্ছে রাসায়নিক পদার্থগুলি একত্র ক'রে দেওয়া; প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কেলাসন আপনি ঘটবে

স্বামীজী বলেছেন, 'খাঁটি বৈদান্তিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর জাগতিক শিক্ষার সম্মিলিত প্রসারই সর্ববিধ সামাজিক ব্যাধির মহৌষধ। অস্পৃশ্য, স্ত্রীলোক বা নিম্নশ্রেণী ব'লে যারা সামাজিক বৈষম্যের চাপে এতকাল নিপীড়িত হয়ে এসেছে, তাদের সকলেরই ভেতর নবপ্রাণের সঞ্চার করবে এই শিক্ষার বিস্তার; এই শিক্ষা তাদের উন্নত হ'তে সাহায্য করবে; এই শিক্ষাগুণে তারা নিজেদের কথা ভাবতে, নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারবে। প্রাণের পুষ্টিকারক দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—সর্ববিধ খাদ্য সরবরাহ ক'রে এইসব সমাজ-নিষ্পেষিত লোকগুলির অসহায় স্তিমিত-প্রায় প্রাণশক্তিকে আবার সতেজ ক'রে তুলতে হবে। রাসায়নিক পদার্থগুলির একত্র সমাবেশ বলতে স্বামীজী এই কথাই বুঝেছিলেন। একবার এটা ঘটাতে পারলে—সমাজের পদ-দলিত অংশের জনগণ একবার তাদের হারানো শারীরিক ও মানসিক সবলতা ফিরে পেলে আধুনিক যুগের প্রয়োজনোপযোগী অতি-বাঞ্ছিত নতুন নতুন সামাজিক নিয়ম ও প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবন করার সামর্থ্য তাদের আসবে। এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন তাঁর এই বিবৃতিতে—প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কেলাসন আপনি ঘটবে। এই নিজে থেকে বেড়ে ওঠার কাজে, জাতীয় জীবনের এই স্বাভাবিক সম্প্রসারণে সহায়তা করার কাজে অবিলম্বে লেগে পড়ার জন্য স্বামীজী সমাজসেবীদের বারে বারে তাগাদা দিয়েছেন। গোঁড়াদের মতো তিনি সমাজকে আধুনিক কালের অনুপযোগী প্রাচীন প্রথা ও চিরাচরিত আচরণের গুল্মজালে চির-আবদ্ধ ক'রে রাখতে চাননি। একটা নতুন স্মৃতির (সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতির গ্রন্থ) প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন—এমন একখানি স্মৃতি, যা বেদান্তের মূলতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে, আবার পরিবর্তিত আধুনিক জীবনের সঙ্গেও খাপ খেয়ে যাবে। কিন্তু আধুনিক সংস্কারকদের মতো পুরাতন নিয়ম-কানুনগুলিকে নির্মমভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমাজের ওপর কতকগুলি নতুন নিয়ম জোর ক'রে তিনি চাপাতে চাননি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যাবহারিক ও ভাব-জগতে কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয় যা কিছু আছে, সেগুলির

সমবায়ে গড়া খাঁটি সংস্কৃতির প্রচারের মাধ্যমে সমাজের অবনমিত শাখার উন্নতির গতিবেগ দ্রুততর করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এরূপ হ'লে শিক্ষার নবালোক পেয়ে নিপীড়িতের দল নববলে বলীয়ান্ হয়ে উঠবে, এবং যুগোপযোগী নতুন স্মৃতির উদ্ভাবন করতে উদ্বুদ্ধ হবে ; ফলে সমগ্র সমাজের স্বাস্থ্য ও সাম্য বজায় রাখার জন্য যে-সব সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন, তার পুনরধিকার তারা লাভ করবে। এই জন্যই স্বামীজী বলেছিলেন, 'যতক্ষণ না উচ্চতর প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টা ভয়াবহ পরিণতিই নিয়ে আসবে।' এভাবে সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি বিপ্লবের চেয়ে অভিব্যক্তির ওপর বেশী আস্থাবান্ ছিলেন। ওপর থেকে চাবুক মেরে সংস্কার করা, বা নীচে থেকে তার জন্য সংগ্রাম করা—এর কোনটারই পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এ দুটি পথই ধ্বংসাত্মক। প্রথমটি সাংস্কৃতিক আদর্শগুলিকে বিপর্যস্ত ক'রে তুলবে ; আর দ্বিতীয়টি সমাজদেহ থেকে সবলে প্রাণ নিষ্কাশিত ক'রে দেবে। তিনি বলেছেন, 'বলতে দুঃখ হয়, আমাদের বর্তমান সংস্কার-আন্দোলনগুলির অধিকাংশই হচ্ছে পাশ্চাত্য উপায় ও কর্ম-পদ্ধতির বিচারহীন অনুকরণ ; ভারতে এ জিনিস যে চলবে না, তা নিশ্চিত।'

প্রচলিত বিধিগুলির ভেতর 'অতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অতি অযৌক্তিক' অংশগুলির জন্যও অভিসম্পাত বা গালাগাল দিতে সমাজ-সেবীদের নিষেধ করেছেন স্বামীজী ; এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে বলেছেন তাঁদের, 'যে প্রথা-গুলিকে আজ নিঃসন্দেহে অনর্থমূলক ব'লে মনে হচ্ছে, সেগুলিও অতীতে একদিন নিঃসংশয়ে প্রাণপ্রদ ছিল।' 'এগুলি যদি সরিয়ে ফেলতে হয়, তাহলে সে কাজ করার সময় যেন অভি-সম্পাত-মুখর না হই আমরা ; বরং জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রথাগুলি একদিন যে মহৎ কাজ করেছিল, তার জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে এগুলিকে যেন আশীর্বাদ করি তখন।' তাছাড়া তাঁর মনে হয়েছিল, যা একদিন অতীতে শুভকারী ছিল, সেই ধর্ম-বিধির অপব্যবহারগুলির ত্রুটি সংশোধন করতে হলেও হঠকারীর মতো হুকুম চালিয়ে তা করা উচিত নয়। আধুনিক কালের শিশু-শিক্ষকেরা ব্যক্তি-বিশেষের ক্ষেত্রে যা ক'রে থাকেন, তাই করতে হবে—সমাজের মনস্তত্ত্ব অবলম্বনে সে সংশোধন করতে হবে। সমাজকে তার ভুল ধরিয়ে দিতে হবে ধীরে ধীরে। তারপর উন্নতির পথে যে-সব কুসংস্কারকে সে বাধা ব'লে মনে করবে, সেগুলিকে যাতে সে সুস্থ, স্বাভাবিক ও স্বত-অভিব্যক্ত প্রচেষ্টায় সরিয়ে ফেলতে পারে, তার জন্য যথেষ্ট শক্তি-মান্ ক'রে তুলতে হবে সমাজকে। 'জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ কর, কিন্তু সে বেড়ে উঠবে নিজে নিজেই ; হুকুম চালিয়ে তাকে বাড়াতে পারবে না কেউ।' 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে গিয়ে তাকে সাহায্য কর, যাতে সে উপরে উঠে আসতে পারে···। তুমি আমি কি করতে পারি? একটি শিশুকেও শিক্ষা দিতে পারো ব'লে ভাবছ নাকি? না, তা পার না। শিশু নিজের শিক্ষা নিজেই আহরণ ক'রে নেয়। তোমার কর্তব্য, তাকে তার উপযুক্ত সুযোগ দেওয়া।' আগ্রহ-শীল ধীর সমাজ-সেবকের কাজ হচ্ছে জনগণের দেহ ও বুদ্ধিকে তেজীয়ান্ ক'রে তোলা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আধ্যাত্মিক ক'রে তোলা। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন, বেদান্তের প্রাণপ্রদ সলিলে সমাজ যদি একবার অবগাহন-স্নান করতে পারে, তাহলে তার বিশ্বাস ও আচরণের ওপর গজিয়ে

ওঠা সব বিষাক্ত ক্ষতই আপনা-আপনি সেরে যাবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এতে 'বাহ্য-উপশম মাত্র হয়ে দেহের মধ্যে তার বীজ লুকিয়ে থাকতে পারবে না, রোগের মূল পর্যন্ত উপড়ে বেরিয়ে যাবে।' তিনি বলেছেন, 'মনের অভ্যন্তরে যে আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ ক'রে চলে, সমাজের কল্যাণকর পরিবর্তনগুলি তারই বাহ্য প্রকাশ; কাজেই সে শক্তি যদি সবল ও সুপরিচালিত হয়, তাহলে সমাজও সেরূপ সুষ্ঠুভাবে নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারবে।' আর জনগণকে তিনি বলেছেন, 'তথাকথিত সমাজ-সংস্কারের কথা ভেবে মাথা গুলিয়ে ফেলো না, কারণ আধ্যাত্মিক সংস্কার হবার আগে সমাজ-সংস্কার হ'তে পারে না।'

সর্বশেষে স্বদেশবাসীর হাতে তিনি তাদের অব্যবহিত পবিত্র গুরু কর্তব্যভার তুলে দিয়েছেন, 'কথা বলা থামাও, হৃদয়ের দ্বার খুলে যাক স্বদেশের ও সারা জগতের মুক্তির কাজে লেগে পড় তোমাদের প্রত্যেকেই ভাববে যে, এ-কাজের সব দায়িত্ব তোমার নিজেরই।' কোনরূপ সঙ্কীর্ণ স্বদেশ-প্রেমের পূর্ব-সংস্কার বাস্তবিকই স্বামীজীর ছিল না। মানবজীবনের কতকগুলি সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ভাব ও আদর্শের রক্ষক ভারতের জন্য—তাঁর স্বদেশের জন্য তাঁর যে ভালবাসা, সে ভালবাসার সম্পর্ক বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে; জগতের সব মানুষের জন্য তাঁর যে ভালবাসা, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যে সংবদ্ধ রয়েছে তাঁর স্বদেশ-প্রেম। শুধু একত্বরূপ বৈদান্তিক ভাবের বিশ্বব্যাপী প্রসার ও প্রচলনের মাধ্যমেই যে সর্বজাতির দুর্বল, দুঃখ-জর্জরিত ও পদ-দলিতদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট দূর করা সম্ভব, সে-কথা তিনি বিশ্বাস করতেন। একমাত্র এই ভাবগুলির প্রচলনের মাধ্যমে ভীতি-বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বেদনাক্লিষ্ট জগৎ তার স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্বপ্ন সফল ক'রে তুলতে পারে। বিশ্বের জাতি-সঙ্ঘের যে বহু আকাঙ্ক্ষিত সৌধ নির্মাণের স্বপ্ন জগৎ দেখছে, একমাত্র বেদান্তই সে সৌধের সর্বজনীন ও যুক্তিসহ ভিত্তি গড়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু ভারতীয় জীবনে তার যোগ্যতার নিঃসংশয় প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার পূর্বে জগৎ বোধ হয় নিজের পুনর্গঠনের কাজে বেদান্তের সত্যগুলি গ্রহণ করতে পারবে না। কাজেই বৈদান্তিক সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি অবলম্বনে ভারতের উদ্ধার-সাধনের পথ বেয়েই জগতের মুক্তিসাধনের পথে পৌছতে হবে—এই ছিল তাঁর দৃঢ়-বিশ্বাস। হিন্দুসমাজ এই শক্তির অন্তর্নিহিত প্রভাব বাস্তব-জীবনে প্রমাণ করতে পারলেই জগৎ আপনা হতেই বেদান্তের আদর্শানুসারে আধুনিক সভ্যতাকে ঢেলে সাজতে উদ্যোগ করবে। এই জন্যই নিজস্ব প্রাচীন আদর্শ সম্বন্ধে স্বদেশবাসীদের সচেতন ক'রে তুলতে, এবং সেই মহান্ আদর্শ-গুলিকে পুনরুদ্বোধিত ও বাস্তবে রূপায়িত ক'রে নিজের ও সমাজের জীবনকে প্রাণচঞ্চল ক'রে তোলার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে স্বামীজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন শাখা-সমন্বিত হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণকে ও সেইসঙ্গে সর্ববিষয়ে ভারতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনকে সমগ্র মানব-জাতির দুঃখকষ্ট নিবারণের প্রথম প্রয়োজনীয় সোপান ব'লে বিশ্বাস করতেন তিনি। স্বদেশ-বাসীকে তিনি বলেছেন, এই বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যই ভারত বহু শতাব্দীর অত্যাচার ও বর্বরোচিত ব্যবহার সহ্য করেও বেঁচে আছে।... ভারত যে আবার নিশ্চয়ই আত্ম-সচেতন হয়ে, সুস্থ সবল হয়ে তার গৌরবের উচ্চতম শিখরে উঠে দাঁড়াবে, এবং বৌদ্ধ প্রচারের অভ্যুদয়-কালের মতো আবার সে সারা বিশ্বে কল্যাণপ্রদ মহান্ আধ্যাত্মিক সত্যগুলি ছড়াবে, সে-বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন স্বামীজী। মানুষকে ঈশ্বর

জ্ঞান ক'রে প্রেমের বাণীর মাধ্যমে বিশ্বমানবকে উন্নত জীবন গঠনে সে সহায়তা করবে। মাতৃভূমি ভারতের ব্রত ও উদ্দেশ্য এত উন্নত বলেই স্বামীজী তাঁর স্বদেশবাসীদের এ-কথা স্মরণ রাখতে অনুরোধ করেছিলেন যে, নিজেদের জাতি-সংগঠনের কাজে নিরত হওয়ার সময়ও গোটা বিশ্বের শান্তি ও সামঞ্জস্যের দিকে যেন দৃষ্টি রাখে তারা; ভারতের শুদ্ধ প্রেম ও সেবা প্রসারিত হয়ে চিরদিন যেন স্পর্শ ক'রে চলে সারা বিশ্বের সব ঠাঁই।

নরেন্দ্র বিবেকানন্দ

শ্রীউমাপদ নাথ

যুগোত্তর ঋতূত্তীর্ণ আকাশের অপূর্ব ভাস্কর !
দু-হাতে ছড়ালে তুমি শৌর্যাগ্নির চূর্ণিত উত্তাপ,
দীক্ষা দিলে সূর্যমন্ত্রে। প্রেমের প্রাবৃটে শান্তিক্ষর
করিলে আকাশ তার, ব্যর্থ হ'ল যুগের প্রস্বাপ।

এখানে আছাড় খেলো পশ্চিমের মদার্ণব-জাত
ইন্দ্রধনুবর্ণ ফেনা ; রোমাঞ্চিত মধুগন্ধে তার
চঞ্চলিল যুগমন। যৌবনের উষ্ণ স্বেদস্নাত
সেই মোহযাত্রা-পথে খুলে দিলে অমৃতের দ্বার।

কালের কল্মষবিষ নিজকণ্ঠে নিলে তুমি হর,
বিক্ষোভের বাষ্প হ'তে নিঙাড়িয়া শক্তিময়ী সুধা
ভারত-নির্মাণকালে তুলে নিলে , তুমি বজ্রধর :
ভারত জাগ্রত হ'ল, তৃপ্ত হ'ল আবিশ্বের ক্ষুধা।

সংস্কারবিমুক্ত বীর, বিজ্ঞানের শুচিদৃষ্টি নিয়ে
এ পৃথ্বীর সর্বশুভ গেঁথে এক সুচারু মালায়
পরালে মায়ের গলে। প্রাচ্য ও প্রতীচী দুই দিয়ে
নতুন কর্মের বিশ্ব বিরচিলে মিলন-শালায়।

অথচ তোমার মতো আর্যকৃষ্টিবেত্তা বেদবিৎ
একান্ত বিরল আজো। ভারত-বিগ্রহ ছিলে তুমি।
তোমার মানসতীর্থে মুক্তি পেল ঋষি-প্রজ্ঞা, চিৎ :
জীবন-আনন্দ-যজ্ঞে, তুমি ছিলে দৃশ্য ব্রহ্মভূমি।

ভারত-নির্মাতা শিল্পি ! হে বিপ্লবী সূর্যভর্গ যতি
নরেন্দ্র বিবেকানন্দ ! তোমার চরণে রাখি নতি।

ভারতাত্মা বিবেকানন্দ

ডক্টর শ্রীরমেশ দাশ

স্বামী বিবেকানন্দ বার বার একটি মহৎ সত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সত্যটি এই: প্রত্যেক জাতির এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা তার মেরুদণ্ড-স্বরূপ। মেরুদণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলে ব্যক্তির যেমন অস্তিত্ব লোপ পায়, সেই রকম জাতির মেরুদণ্ডটি যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তারও অনিবার্য বিনাশ ঘটে। আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় জাতির মেরুদণ্ড হ'ল ধর্ম। পরম দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ধর্মচেতনা যদি কখন বিলুপ্ত হয়, তাহলে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিতভাবে আমাদের অস্তিত্বও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কিন্তু গভীর আনন্দ ও পরম আশ্বাসের কথা আমাদের ধর্মের অর্থাৎ ধর্মবোধের কখন বিলুপ্তি ঘটতে পারে না, কারণ আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, চিরন্তন মানুষের শাশ্বত ধর্ম—সত্য-দ্রষ্টা, মন্ত্র-দ্রষ্টা, বলিষ্ঠ ও পূত-চিত্ত প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণের হৃদয়ে যার মহিমময় অভ্যুদ্ভাস ঘটেছিল, তাঁদের মধুকণ্ঠে বাণীরূপ লাভ ক'রে যা বেদ-বেদান্ত উপনিষদ্ আকারে অপূর্ব সঙ্গীতে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। সনাতন ধর্ম স্বপ্রকাশ, ঋষিকণ্ঠে ঝঙ্কৃত স্বয়ং শ্রীভগবানের বাণীই তাঁর ভাষা। তাই স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ই এই ধর্মকে রক্ষা করার ভার গ্রহণ করেছেন। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জুনকে বলেছেন:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।

তাই যখনই আমাদের ধর্ম-চেতনায় গ্লানির সঞ্চার ঘটেছে, তখনই শ্রীভগবান্ অবতাররূপে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে আমাদের অপূর্ব অধ্যাত্ম-চেতনাকে উদ্বোধিত করেছেন।

সুদীর্ঘ পরাধীনতার নিষ্পেষণে এবং পাশ্চাত্য জড়বাদের কুপ্রভাবে যখন ভারতবাসীর মেরুদণ্ড প্রায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছিল, বিরাট আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও ভারতবাসী যখন নিজেকে রিক্ত দীনতম ভিক্ষুকেরও অধম জ্ঞান করতে আরম্ভ করেছিল, যখন সে আত্মসম্মান হারিয়ে নিজেকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিল, তখন শ্রীভগবান্ পুনরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এই পুণ্যভূমিতে, বেদান্ত-ধর্মের পুনরুদ্ধার ক'রে ভারতের ধর্ম-চেতনাকে পুনঃপ্রোজ্জ্বল করতে। এবার তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন দুটি দৈবী দেহ ধারণ ক'রে—রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-রূপে। রামকৃষ্ণ ছিলেন বেদান্তের ভাব ও বাণীরূপ, বিবেকানন্দ তারই কর্ম-বিগ্রহ। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ দুই নিয়েই সেই পূর্ণ দৈবী সত্তা। একজনকে বাদ দিয়ে আর একজনের কল্পনা একেবারেই অসম্ভব। রামকৃষ্ণ যদি হন ধারণা, তাহলে বিবেকানন্দ তার ব্যঞ্জনা। রামকৃষ্ণ উদাহরণ হ'লে বিবেকানন্দ তারই অনুশীলন। রামকৃষ্ণকে যদি ঘনীভূত অমৃত বলি, তাহলে বিবেকানন্দ হলেন সেই অমৃতের অকৃপণ অজস্র বিমুক্ত বর্ষণ। রামকৃষ্ণ ঘনাগ্নি হ'লে বিবেকানন্দ সেই অগ্নিমাণিক্যের জগৎপ্লাবী জ্যোতিঃ-প্রবাহ।

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুগঠিত বলিষ্ঠ ও শ্রীমণ্ডিত দেহে প্রচণ্ড সাহস, অমিত তেজ ও প্রগাঢ় আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন একটি মন—দেহের ঋজুতার সঙ্গে মনের সরলতা—একটি প্রাণবন্ত অনির্বাণ অগ্নিসত্তা।

পৌরুষ ও প্রেমের অপূর্ব সমন্বয়, শঙ্করের

প্রখর মনীষা আর বুদ্ধের সুগভীর হৃদয়বত্তার অপরূপ সমাবেশ ঘটেছিল বিবেকানন্দ-চরিত্রে।

বিবেকানন্দের ধর্মবোধ অন্ধবিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না; প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং সংস্কারমুক্ত বলিষ্ঠ যুক্তিই ছিল তাঁর ধর্মানুভূতির ভিত্তি। যিনি তাঁকে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করাতে সমর্থ হয়েছিলেন, একমাত্র তাঁরই শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন তিনি। সত্যনিষ্ঠা তাঁর এতই প্রবল ছিল যে, ভগবান্ রামকৃষ্ণের শিষ্য হয়েও নবতর সাধনার সন্ধানে এক সময় তিনি গাজিপুরের পওহারী বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

যে সত্যকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই সত্যকে তিনি যুক্তির দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর ব্রহ্মদর্শন তাই শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-দর্শনেরই বিষয় ছিল না, সর্বজনগ্রাহ্য বিজ্ঞানেরও বিষয় ছিল। এই কারণেই প্রচণ্ড যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তা-সম্পন্ন পাশ্চাত্যের বিদগ্ধসমাজও সহজেই পেরেছিল তাঁর ধর্মবিজ্ঞানকে স্বীকার ক'রে নিতে; এই কারণেই জড়বাদের প্রচণ্ড তরঙ্গকে অবলীলাক্রমে প্রতিহত ক'রে তিনি অধ্যাত্মবাদকে দৃঢ়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন বিশ্ববাসীর মানসলোকে।

বিবেকানন্দ সাধারণ মানুষের কাছে অফুরন্ত আশা ও উৎসাহের চিরউজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্র। শুধু হিন্দুর নয়, সকল যুগের সকল মানুষের কাছে উচ্চতম আদর্শ ও অনন্ত প্রেরণার উৎস তিনি। পুরুষসিংহ মানবশ্রেষ্ঠ দেবমানব নরশার্দূল বিবেকানন্দ অনন্ত প্রাণের, অপার আনন্দের, অমিত তেজের, প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। তিনি পরশমণি। তাঁর অগ্নিস্পর্শে, তাঁর ধ্যানে ও আলোচনায় জড়ও চৈতন্য লাভ করে, মৃতও সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। তিনি অতি সহজ ক'রে সাধারণ মানুষের কাছে শাশ্বত ধর্মের মর্ম-কথাটি তাদের মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, দুরূহ বেদান্তশাস্ত্রের নির্যাসটি মধুরভাবে পরিবেষণ করেছেন।

বেদান্তকেশরী বিবেকানন্দ দৃপ্তকণ্ঠে সকলকে আহ্বান ক'রে বলেছেনঃ 'তত্ত্বমসি'—তুমিই তিনি, তুমিই ব্রহ্ম। তোমার আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি কর। তাহলে বুঝতে পারবে—তুমিই সচ্চিদানন্দ চিরমুক্ত চিরশুদ্ধ পরমাত্মা, তুমিই সেই একমাত্র দৈবীসত্তা, যিনি বিশ্বচরাচর পরিব্যাপ্ত ক'রে রয়েছেন। তুমিই সূর্য, তুমিই চন্দ্র, তুমিই নক্ষত্র, তুমিই অগ্নি, তুমিই ঝঞ্ঝা, তুমিই মহাকাল, তুমিই মহাতরঙ্গ; যা-কিছু সবই তুমি। মোহাচ্ছন্ন হয়ে, মায়াচ্ছন্ন হয়ে তুমি সুখ-দুঃখ ভালোমন্দ লাভক্ষতির মিথ্যা জালে আবদ্ধ হয়ে ক্লিষ্ট হচ্ছ। জেগে ওঠ, আত্মোপলব্ধি কর। তাহলে প্রত্যক্ষ করবে—তুমি সুখদুঃখ ভালোমন্দ লাভক্ষতির সমূহ জাগতিক দ্বৈতবোধের অতীত অখণ্ড আনন্দ, পরা শান্তি, চরম জ্ঞান ও শক্তিস্বরূপ ব্রহ্ম।

এই পরম সত্যকে লাভ করতে হ'লে প্রচণ্ড সাহসের প্রয়োজন। আত্মজ্ঞান বলহীনের দ্বারা লভ্য নয়। তাই বিবেকানন্দ সবাইকে বলেছেন নির্ভীক হ'তে। সমস্ত শাস্ত্র মন্থন ক'রে তিনি যে মন্ত্ররত্নটি উদ্ধার ক'রেছিলেন সেটি হ'ল—'অভীঃ'। তিনি বার বার বলেছেন—দুর্বলতা বা ভয়ই একমাত্র পাপ। গীতাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়েও তিনি যে একটি মাত্র শ্লোকাংশের উল্লেখ করেছেন সেটি হ'ল—'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ!'

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন—ক্লীবত্ব, জড়ত্ব, দুর্বলতা, ভয় ত্যাগ ক'রে অসীম সাহসে উদ্বুদ্ধ হও, তবেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে, ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করতে পারবে। অর্জুন তদনুরূপ আচরণ করেছিলেন, তাই বিশ্বরূপ দর্শনের

মহান্ সৌভাগ্য ঘটেছিল তাঁর। বিবেকানন্দ বার বার বলেছেন—কোন কিছুতেই ভয় ক'রো না। ভয় কিসের? তুমি ব্রহ্ম, তোমার আবার ভয় কাকে? তুমি ছাড়া আর কেই বা আছে? কাকে তুমি ভয় ক'রছ?

প্রত্যেককেই আপন চেষ্টায় আপন সাধনায় আপন বীর্যবলে পরম সত্যকে লাভ করতে হবে। একজন অন্ন গ্রহণ করলে অন্য জনের যেমন ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সেইরূপ একজনের সাধনায় অপরজনের সিদ্ধিলাভ কখন সম্ভব নয়। গুরু শুধু পথ-প্রদর্শক; শিষ্যকে সেই পথের যাত্রী হ'তে হবে, তবেই সিদ্ধি হবে তার করায়ত্ত। তাই বিবেকানন্দ পুনঃ পুনঃ সবাইকে বলেছেন আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হ'তে, আত্মপ্রত্যয়-সম্পন্ন হ'তে। তিনি বলেছেন, 'আমরা নিজের চোখ ঢাকিয়া চিৎকার করি—কেহ আসিয়া আমাদিগকে আলো দেখান—নির্বোধ! চোখ হইতে হাত সরাইয়া লও! তাহা হইলে সব ঠিক হইয়া যাইবে।' নিজের চেষ্টাতেই চোখের মোহ-কালিমা মুছে ফেলতে হবে, তাহলে সেই মুহূর্তে বিশ্বনিখিল এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। বিবেকানন্দের মতে গীতার শ্রেষ্ঠ উপদেশ:

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ

ফাঁকি দিয়ে কোন মহৎ কর্ম সম্পাদন করা যায় না। বিনা পরিশ্রমে, অন্যের ওপর নির্ভর ক'রে কখনই ব্রহ্মানুভূতি লাভ করা সম্ভব নয়। পরম লাভের জন্য চরম সাধনার প্রয়োজন।

ব্রহ্মানুভূতি লাভ করবার জন্য নিজের প্রচণ্ড চেষ্টার দ্বারাই নিজের মধ্যে অনুকূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বিবর্তনবাদিগণের দ্বারা প্রদত্ত জীব-বিজ্ঞানের একটি উদাহরণের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: যেরূপ প্রচণ্ড চেষ্টায় জলের মাছ উন্নততর জীবনের আশায় নিজের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে করতে পরিশেষে আকাশের পাখিতে পরিণত হয়েছে, সেইরূপ প্রচণ্ড প্রয়াসের দ্বারাই নিজেদের মধ্যে ব্রহ্মানুভূতির অনুকূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে আমাদের। পরিবেশের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি, তবু কতকগুলি মাছ আপন চেষ্টাতেই পাখি হয়ে গেল। তেমনি বর্তমান পরিবেশে থেকেও আপন চেষ্টায় আপন সাধনায় প্রত্যেকেই নিজেকে ব্রহ্মানুভূতি লাভের যোগ্য ক'রে তুলতে পারেন। বস্তুতঃ বিবেকানন্দ ক্রমবিবর্তনবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্রমসঙ্কোচবাদের অবতারণা করেছেন। বৃক্ষরূপে যে শক্তিকে আমরা প্রকটিত দেখি, বীজরূপে সেই শক্তিই সঙ্কুচিত সংহত হয়ে ছিল। *প্রাণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানুষ।* যে প্রাণ-কণাটি বিবর্তিত হ'তে হ'তে মনুষ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে বিবর্তনের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা ক'রে, সেই প্রাণ-কণার মধ্যেই মনুষ্যের সমূহ সম্ভাবনা সংহত হয়ে ছিল। ঋষিগণ যে ব্রহ্মানুভূতি লাভ ক'রে নিজেদের ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বোধ করেন, সেই অনুভূতি সকলের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। বীজ থেকে বৃক্ষের উদ্গম সম্ভব করতে হ'লে যেমন প্রয়াসের দরকার, প্রযত্নের প্রয়োজন, তেমনি নিজের মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্মত্ব উদ্বোধিত করবার জন্য যত্ন ও সাধনার দরকার। 'যত্ন কর, রত্ন লাভ হবে'।

হতাশ হবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। শিশু-যুবা, প্রৌঢ়-বৃদ্ধ, পুণ্যবান্-পাপী, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, রোগী-ভোগী—সকলেই, জীবনের যে-কোন স্তরে এবং যে-কোন অবস্থাতেই যে-কেউ নিজপ্রচেষ্টার দ্বারা ব্রহ্মত্ব লাভ করতে পারে এবং সংকল্প যদি বজ্রদৃঢ় হয়, প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তাহলে এক মুহূর্তেই অসম্ভব সম্ভব

হ'তে পারে, মুহূর্তের মধ্যেই মানুষ ব্রহ্মানুভূতি লাভ ক'রে জীবন্মুক্ত হয়ে যেতে পারে। পাপ-তাপ, অধর্ম, অন্যায়—কোন-কিছুই এই পরম লাভের পরিপন্থী হ'তে পারে না, কারণ আত্মা চিরশুদ্ধ চিরমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপ। এক পলকেই মানুষ তার তমসাচ্ছন্ন অতীত অতিক্রম ক'রে অনন্ত জ্যোতির্ময় লোকে উত্তীর্ণ হ'তে পারে। সুতরাং মাভৈঃ, ক্লৈব্য ত্যাগ কর, হতাশা বর্জন কর, সচেষ্ট হয়ে অমৃতত্ব অর্জন কর, জীবন্মুক্ত হও।

ব্রহ্মত্ব লাভ করলে তোমার জীবন মহানন্দে অনুক্ষণ পরিপ্লাবিত হবে, কারণ ব্রহ্ম আনন্দ-স্বরূপ। তখন তুমি বিশ্বচরাচরে একমাত্র ব্রহ্মকেই দর্শন করবে। প্রত্যেকটি জীব তখন তোমার চোখে শিবরূপে প্রতিভাত হবে, ভূত-মাত্রই ভূতনাথ হয়ে উঠবে তোমার কাছে! ভালমন্দ, শত্রুমিত্র—সবই ব্রহ্মময় হয়ে উঠবে তোমার দৃষ্টিতে। প্রেমামৃত পান ক'রে তুমি অনন্ত আনন্দময় হবে।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে তুমি সর্বপ্রেমী হবে, আবার যদি সর্বপ্রেমী হ'তে চেষ্টা কর, তাহলে ব্রহ্মজ্ঞান অনায়াসে লাভ করবে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে তুমি সর্বপ্রকার ভালো-মন্দ, সখ্য-বৈরী, আশা-আশঙ্কার ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে অবিরাম পরা শান্তিতে অবস্থান করবে—প্রচণ্ড আনন্দ, অনন্ত শক্তি, চরম জ্ঞানের অধিকারী হয়ে অমৃতত্ব লাভ করবে। তাই বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠে বার বার এই অগ্নিমন্ত্রটি ধ্বনিত হয়েছে :

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ওঠো, জাগো, যতক্ষণ না সেই পরমবস্তু লাভ হয়, ততক্ষণ দৃঢ় পদক্ষেপে অতন্দ্র চেষ্টায় অবিরাম অগ্রসর হও।

যে ধর্ম মানুষের মধ্যেই ব্রহ্মত্বের সন্ধান পেয়েছে, তদপেক্ষা উন্নততর ধর্ম আর কী হ'তে পারে? যিনি সর্বসাধারণের মর্মলোকে সেই ধর্মের উদ্বোধন করেছিলেন, তাঁর অপেক্ষা অধিক শক্তিমান্ আর কে?

শাশ্বত সনাতন বেদান্ত-ধর্মই ভারতবর্ষের আত্মাস্বরূপ, তারই সার্থক প্রকাশ দেখতে পাই ভারতাত্মা বিবেকানন্দের মহৎ জীবনে।

পার হ'ল শতাব্দীর সীমা

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

অসীমে অনন্ত পথে ব্যাপ্ত যাঁর অমর মহিমা,
সে-বিবেক শুদ্ধরূপী পার হ'ল শতাব্দীর সীমা।
এবার আবার যাত্রা শত লক্ষ শতাব্দীর পথে :
দেশে দেশে এ-মহাভারতে,—
শুনাবে সে জীবনের সমুজ্জ্বল বাণী।
শেষ নাই, ক্ষয় নাই এ-বাণীর কোনো দিন জানি।

কোথা কাঁদে মানবতা, সেইখানে নিত্য গতি তাঁর,
সঙ্গে রামকৃষ্ণ, যুগে যুগে চির কর্ণধার।
তাঁরই সেই বাণীরূপ বিবেকে আনন্দ হ'য়ে জাগে;
যুগ হ'তে যুগান্তর উৎসবে মননে অনুরাগে।

শতবর্ষ পরে

শ্রীনুটবিহারী চট্টোপাধ্যায়

হয়ে গেছে শতবর্ষ পার,
সপ্তর্ষিমণ্ডল ছাড়ি' উল্কাসম এলে এ ধরায়,
কেঁদেছিল মহাপ্রাণ, ভারতের সুপ্ত লুপ্তপ্রায়
মানবতা করিতে উদ্ধার।

ভারতেরে বেসেছিলে ভালো,
তার দৈন্য মলিনতা, তার গ্লানি অশিক্ষা অজ্ঞান,
তারই মাঝে দেখেছিলে এ জাতির মৃত্যুহীন প্রাণ,
দিলে নব জীবনের আলো।

ভারত ললাটে তবে ম্লান
অতীত গৌরব-টীকা, যুগান্তের দাসত্বের ভারে,
বিজয়-তিলক আঁকি জগতের সভার মাঝারে
দিলে তারে গৌরব সম্মান।

দীক্ষা লভি' শক্তিমন্ত্রে তব,
নির্জীব শিথিল দেহে এসেছিল নব জাগরণ,
পেয়েছিল পথের নির্দেশ, নিয়েছিল করিয়া বরণ
প্রতিষ্ঠার পন্থা অভিনব।

ত্যাগ প্রেম নিষ্ঠার সাধনা,
বেদান্ত-গীতার সত্য, ভারতের ইষ্ট চিরকাল,
জীবে শিবজ্ঞানে পূজা, হোক না সে পতিত কাঙাল,
নব যুগধর্ম, আরাধনা।

পূরব-গগনে উঠে রবি,
কিরণ ছড়ায় বিশ্বে, দেশের সীমানা নাহি মানে,
যুগসূর্যচ্ছটা হেরি' চায় সবে ভারতের পানে,
নেহারিতে বেদান্তের ছবি।

ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নবজাগরণের ইতিহাসে তিনটি কালানুক্রমিক স্তর বা পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন আচার্য যদুনাথ 'India through the Ages' নামক গ্রন্থে। প্রথম পর্যায়ে ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার ফলে ভারত-বাসীর মধ্যযুগীয় তন্দ্রার ভাব ধীরে ধীরে অপসৃত হ'তে থাকে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ গদ্য-সাহিত্যের জন্ম হয় এই যুগে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে দেখা দেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে। এর ফলে মধ্যযুগীয় সামাজিক মূল্যবোধ এবং জীবনাদর্শ এক প্রচণ্ড আঘাত পায়, যদিও সে আঘাত সমাজের সকল স্তরে অনুভূত হয়নি। তৃতীয় বা শেষ পর্যায়ে আসে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং তার অনিবার্য পরিণতিরূপে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনা। নবজাগরণ-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হন দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের সন্ধিক্ষণে। প্রথম দুই যুগের পূর্ণ পরিণতি ও তৃতীয় যুগের সম্ভাবনা তাঁর জীবনের মধ্যে আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করি।

১৮৬৩ খৃঃ জানুআরি মাসে নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম হলেও স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে তিনি ভারতের আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত হন আরও ত্রিশ বৎসর পরে, শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় অসামান্য সাফল্যলাভের ফলে। ভারতবর্ষে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা হয় ১৮৯৭ খৃঃ পাশ্চাত্য দেশ হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর, এবং ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই এই মহাপুরুষ তাঁর নশ্বর দেহ পরিত্যাগ ক'রে যান। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দের কীর্তি বা অবদান সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার সময় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বামীজীর ভারতীয় কর্মজীবনের ব্যাপ্তি মাত্র পাঁচ বৎসর। এত অল্প সময়ের মধ্যে স্বামীজী তাঁর দেশবাসীর চিত্তে যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন রামমোহন ব্যতীত উনবিংশ শতাব্দীর আর কোন চিন্তা-নায়ক বা কর্মবীর তা করতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। শঙ্করাচার্যের পর আর কোন সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ভারতীয় গণমানসকে এতদূর প্রভাবিত করতে পারেননি, এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। অতি স্বল্পকালস্থায়ী জীবনে স্বামীজী তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দান করতে পারেননি—এ-কথা অনস্বীকার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন তাঁর জাতিগঠন-পরিকল্পনার আংশিক (যদিও সার্থক) রূপায়ণ মাত্র। কিন্তু স্বামীজীর দেহত্যাগের পর তাঁর চিন্তা ও আদর্শ বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে যে-ভাবে তাঁর দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছে, তা সত্যই বিস্ময়কর।

বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হলেও স্বামীজী সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। তিনি নিজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিত হয়েছিলেন, এবং সে-যুগের বহু উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়ের মতো পাশ্চাত্য দার্শনিক বেন্থামের Utilitarian মত-বাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারেননি। তাছাড়া 'শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা'র আদর্শও তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পেয়েছিলেন। এই সব কারণে বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায়। স্বামীজীর ধর্মবিশ্বাস ও

তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে ভারতীয়েরা জগতের যে-কোন জাতির চেয়ে বড় এবং মানব-জাতির আধ্যাত্মিক গুরু-হিসাবে আধুনিক জগতে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু জগৎকে অধ্যাত্মবিষয়ে শিক্ষা দেবার আগে ভারতকে নিজ অবস্থার উন্নতি সাধন ক'রে জগতের শ্রদ্ধাভাজন হ'তে হবে। স্বামীজী এ-কথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবাসীর জীবনে ধর্ম স্বাভাবিক ভাবে এলেও তার মধ্যে বহু মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে এবং সমাজের অধিকাংশ লোকই সাত্ত্বিকতার আবরণে ঘোর তামসিকতায় লিপ্ত। একমাত্র রজোগুণের বিকাশের দ্বারাই এই ঘোর তামসিকতা দূর করা সম্ভব এবং সেই উদ্দেশ্যেই স্বামীজী ভারতীয় যুবকদের দেশব্যাপী কর্মযজ্ঞের উদ্বোধনে আহ্বান করেন।

স্বামীজীকে কোন কোন ঐতিহাসিক 'হিন্দু'-নবজাগরণ-আন্দোলনের নেতা ব'লে অভিহিত করেছেন, কিন্তু তাঁর জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাবের লেশ মাত্র ছিল না। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' বইটির এক স্থলে বলেছেন, শ্রীনগরে স্বামীজী তাঁর মুসলমান মাঝির শিশুকন্যাকে উমা-রূপে পূজা করেছিলেন। রাজা রামমোহনকে যে-তিনটি কারণের জন্য তিনি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন, তার একটি হচ্ছে তাঁর হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমদর্শিতা। চরিত্র-হিসাবে বুদ্ধকে তিনি জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ব'লে বর্ণনা করেছেন এবং তার পরেই খ্রীষ্টকে স্থান দিয়েছেন, যদিও খ্রীষ্ট সত্যই কোন ঐতিহাসিক চরিত্র কিনা সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল। অপরদিকে হিন্দুধর্মের সমস্ত মূল শিক্ষাকে গ্রহণ করলেও স্বামীজী দেশ হ'তে অন্ধভক্তির মূলোচ্ছেদ ও পুরোহিত-সম্প্রদায়ের অত্যাচারের অবসান কামনা করতেন। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী একবার বলেছিলেন, এদেশে এখন যারা ধর্ম ধর্ম করে, তাদের অনেকেই full of morbidity—cracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত দুর্বলতা-সম্পন্ন, বিকৃতমস্তিষ্ক অথবা বিচারশূন্য ধর্মোন্মাদ)। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত একটি পত্রে তিনি আক্ষেপ করেছেন: 'ধর্ম কি আর ভারতে আছে দাদা! জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ—সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া অপবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান!' বাংলা দেশের দরিদ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমান ধর্মাবলম্বী-দের সংখ্যাধিক্য, তাঁর মতে জমিদার ও পুরোহিত-বর্গের অত্যাচারের ফল। বেদকে স্বামীজী অবশ্যই হিন্দুধর্মের সব চেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ ব'লে মনে করতেন, কিন্তু শিকাগো ধর্ম-মহাসভার এক অধিবেশনে তিনি ঘোষণা করেন, 'বেদ' শব্দ দ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্য-সমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, 'বেদ' সেই-সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডার-স্বরূপ। একমাত্র বেদান্তের উদার মতবাদ-ই ছিল, স্বামীজীর বিশ্বাসে সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তিভূমি, কিন্তু সেই মতবাদ গ্রহণ করতে হ'লে জগতের প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলির কোনটি পরিত্যাগ করতে হবে—এ-কথা তিনি কখন বলেননি।[১] বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে বিবেকানন্দের এই ধর্মবিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন ধর্মবিশ্বাসই গ্রহণযোগ্য নয়।

১ এই দিক দিয়ে বিচার করলে রাজা রামমোহনের সঙ্গে স্বামীজীর ধর্মবিশ্বাসের অসাধারণ সাদৃশ্য ছিল; কিন্তু রাম-মোহনের মতো স্বামীজী মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন না।

রাজনৈতিক-আন্দোলনে বিবেকানন্দ যদিও কোন দিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি, তবু তাঁর অন্তরে চিরকালই একটি তীব্র দেশপ্রেমের ভাব বর্তমান ছিল, এবং এক স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। ঈশ্বর, স্বদেশ ও স্বধর্ম তাঁর কাছে প্রায় সমান আদরণীয় ছিল, এবং দেশবাসীর মধ্যেও আবার তিনি দরিদ্র নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি বেশী অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আমার ভগবানকে, আমার ধর্মকে, আমার দেশকে—সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষুককে আমি ভালবাসি।' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'বর্তমান ভারতে' তিনি তাঁর দেশবাসীকে যে 'স্বদেশমন্ত্র' উপহার দিয়েছেন, তা সত্যই অনবদ্য: তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা, আমার কাপুরুষতা দূর কর।' ভারতবাসীর মধ্যে এই মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করাই বিবেকানন্দের জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। বারংবার তিনি বলতেন, 'দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু।' স্বদেশী আন্দোলনের সময় হ'তে অসহযোগ আন্দোলনের কাল পর্যন্ত বাংলা দেশের বিপ্লবী তরুণেরা বিবেকানন্দের এই বাণীকেই তাঁদের মূলমন্ত্র-হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ যথার্থই বলেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে 'ডিনামাইট' তৈরী হয়। বিবেকানন্দের আমলে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইংরেজ-শাসনের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ ছিলেন। মধ্যে মধ্যে সেই শাসন-ব্যবস্থার সমালোচনা যে তাঁরা করতেন না, এমন নয়, কিন্তু মোটের উপর ভারতে ইংরেজ-আধিপত্য-স্থাপনকে তাঁরা দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলেই গ্রহণ করেছিলেন। স্বামীজী কিন্তু ইংরেজ-শাসনের ধ্বংসমূলক দিকটিই বড় ক'রে দেখেছিলেন। ১৮৯৫ খৃঃ আমেরিকায় প্রদত্ত একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন: ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হইল তিনটি 'ব'—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্র্যাণ্ডি। ইহারই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ 'সেন্টে' গিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন: ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা?—স্তূপীকৃত ব্র্যাণ্ডির ভাঙা বোতল—আর কিছু নয়।...ইতিহাস ইংরেজের কৃত কার্যের প্রতিশোধ নেবেই। জাতীয় কংগ্রেসের কর্মপন্থায় এইজন্য বিবেকানন্দের আস্থা ছিল না এবং কংগ্রেস-পরিচালিত আবেদন-নিবেদন-সর্বস্ব রাজনৈতিক আন্দোলনকেও তিনি ভারতবাসীর পক্ষে হেয় মনে করতেন। বরিশালের স্বনামধন্য কংগ্রেসী অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি স্পষ্টভাবে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব না করলেও বিবেকানন্দ তার একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন সন্দেহ নেই।[২]

যে স্বাধীনতাকে স্বামীজী 'উন্নতির প্রথম শর্ত' ব'লে বর্ণনা করতেন, তাকে সমাজের সকল স্তরে তিনি প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষে উচ্চবর্ণের লোকেরা তথাকথিত নিম্নজাতির

২ বিবেকানন্দের মানস-কন্যা নিবেদিতা প্রচ্ছন্নভাবে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান　।

লোকেদের উপর যুগ-যুগান্তর ধরে যে অত্যাচার ক'রে এসেছে, তার সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত না করলে এ দেশের উন্নতি অসম্ভব ব'লে তিনি মনে করতেন। প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গাকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন (১৮৯৪): 'যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখেছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী ব'লে মনে করি।' আর একটি চিঠিতে তাঁর গুরুভ্রাতাদের তিনি বলেছেন, 'যদি ভাল চাও তো ঘণ্টাফণ্টাগুলো গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ নর-নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজো করগে,—বিরাট্ আর স্বরাট্। বিরাট্ রূপ এই জগৎ, তার পূজা মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম।'

ভারতবর্ষে শূদ্রজাতির অভ্যুত্থানের সূচনা তিনি নিজের জীবদ্দশাতেই দেখে গিয়েছিলেন এবং তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁকে বলেন, 'এখন হাজার চেষ্টা করলেও ভদ্রজাতেরা আর ছোটজাতদের দাবাতে পারবে না। এখন ইতর জাতদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্রজাতদের কল্যাণ।' কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক স্বামীজীকে সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী ব'লে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু স্বামীজীর এই সমাজতন্ত্রবাদের মূল উৎস মার্ক্সের দ্বান্দ্বিক জড়বাদ নয়, এর মূল উৎস ভারতবর্ষের চিরন্তন মানবিকতাবোধ এবং গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা। ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কাছে ধর্মের কোন আবেদন নেই, এ-কথা স্বামীজী ভালভাবেই জানতেন, এবং তাই তিনি বারংবার বলেছেন যে, বর্তমান যুগে ভারতীয় জনসাধারণের সব চেয়ে বড় অভাব খাদ্যের, আধ্যাত্মিকতার নয়। 'অন্ন! অন্ন! যে ভগবান্ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। আরও খাদ্য, আরও সুযোগ প্রয়োজন।' তাঁর সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ভ্রাতৃবৃন্দকেও বিবেকানন্দ তাই জনসেবার ব্রতে দীক্ষিত করেছিলেন। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—এই ছিল তাঁদের জীবনের আদর্শ।

নবজাগরণ-আন্দোলনের আর একটি প্রধান দিক ছিল সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টা। প্রচলিত অর্থে স্বামীজী অবশ্যই সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। বিদেশে বক্তৃতা দেবার সময় স্বামীজী সর্বত্র ভারতবর্ষের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের প্রবল সমর্থন করতেন, তাঁর মতো দেশপ্রেমিকের পক্ষে সেইটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এ-কথা মনে করলে আমাদের ভুল হবে যে, স্বামীজী তাঁর দেশীয় সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। আমাদের দেশে দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচার যে শাস্ত্রের বিধানকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে, এ-কথা তিনি বারংবার বলতেন। আবার সমাজ-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধানগুলিও যে পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্ন যুগের প্রয়োজনে বারংবার তাদের পরিবর্তন যে কাম্য, এ-কথা ঘোষণা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। ঐতিহাসিক প্রগতিবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাবীকালের ভারতবর্ষ প্রাচীন ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বড় হবে, এ-কথা তিনি তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে একটি পত্রে স্পষ্টই লিখেছেন।

প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার যে ত্রুটিগুলির দিকে স্বামীজী বারংবার তাঁর দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ

করেছিলেন, সেগুলি হচ্ছে—বংশানুক্রমিক জাতিভেদ-প্রথা, অস্পৃশ্যতা, অতিরিক্ত মাত্রায় খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধি-বিচার এবং স্ত্রী-জাতির প্রতি অবহেলা। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে তিনি একবার বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তার মানে নেই ; হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে।' আমেরিকায় যাঁদের তিনি মন্ত্রশিষ্য করেছিলেন, তাঁদের সকলকেই তিনি ব্রাহ্মণ জ্ঞান করতেন। ব্রাহ্মণরা বহুকাল ধরে দেশের তথাকথিত নীচ জাতিদের ঘৃণা করার ফলেই যে বর্তমান কালে জগতের ঘৃণা-ভাজন হয়ে পড়েছে, এ-কথাও তিনি বলেছেন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে (১৮৯৪) তিনি লেখেন, 'ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া।... ইহার ভিত্তি অপরের প্রতি ঘৃণা। প্রাচীন বা আধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না।' আর একজন ভক্তকে তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষে inter-marriage (অন্তর্বিবাহ)-টা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।'

অস্পৃশ্যতার নিন্দায় বিবেকানন্দ চিরদিন মুখর ছিলেন। 'ছুঁৎমার্গ' হিন্দু ধর্ম নয়, শাস্ত্র-বহির্ভূত প্রাচীন আচার মাত্র, এ-কথা তিনি নানা স্থানে বলেছেন। মাদ্রাজে এক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যদি আমি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত ; কারণ আমি যাঁহার শিষ্য, তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক অস্পৃশ্য মেথরের গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।' অতিরিক্ত মাত্রায় খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধি-বিচারকেও বিবেকানন্দ অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। মনমাদুরা অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন, 'আমরা এখন বৈদান্তিকও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই ; আমরা এখন 'ছুঁৎমার্গী', আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর...। যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা গারদে যাইতে হইবে।'

ভারতবর্ষের নারীজাতির দুর্দশায় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিচলিত হয়েছিলেন। বিদেশীরা, বিশেষতঃ খ্রীষ্টান পাদরীরা ভারতীয় নারীদের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে কিছুটা অতিরঞ্জন করলেও তাঁদের অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়, এ-কথা স্বামীজী জানতেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'ভারতে দুই মহাপাপ—মেয়েদের পায়ে দলা আর 'জাতি' 'জাতি' ক'রে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা।' নারীজাতির অবস্থার উন্নতির জন্য বাল্যবিবাহ-নিরোধ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনকে তিনি একান্ত প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করতেন। শিক্ষার প্রসার হ'লে ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা নিজেরাই তাদের হিতাহিত বুঝতে পারবে এবং তার ফলে সামাজিক পরিবর্তন আপনা হ'তে আসবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। তবে পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদের তিনি কখনই ভারতীয় নারীজাতির আদর্শস্থানীয়া ব'লে মনে করতেন না। রানাডে-প্রমুখ সমসাময়িক ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে বিবেকানন্দের দুইটি বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য ছিল। প্রথমতঃ তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ভারতবর্ষের সমাজকে গড়তে চাইতেন না, পাশ্চাত্য সমাজ যে নানা বিষয়ে অসুখী, এ-কথা তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানা ছিল। দ্বিতীয়তঃ

সমসাময়িক সমাজ-সংস্কারকেরা যে শুধুমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন, সমগ্র জাতির জন্য নয়, এ-কথাও তিনি বুঝেছিলেন। জনৈক ভক্তকে কথাপ্রসঙ্গে তিনি একবার বলেন, 'তোমাদের মুখে যা সংস্কারের কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরীব সাধারণদের স্পর্শই করবে না। তোমরা যা চাও, তাদের তা আছে। এজন্যে তারা ওগুলোকে সংস্কার বলেই মনে করবে না।'

জাতীয় জাগরণের মূল কথা যে শিক্ষা, স্বামীজী তা জানতেন, এবং শিক্ষাবিস্তারই সেইজন্য তাঁর জনসেবাব্রতের প্রধান অঙ্গ ছিল। পাশ্চাত্য জাতিগুলির কাছে আমাদের ব্যাবহারিক শিক্ষালাভের যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—এ-কথা তিনি বারবার বলেছেন। তবে শিক্ষার উপকরণ যা-ই হোক না কেন, ধর্মভাব-বিরহিত হ'লে সে শিক্ষা যে কল্যাণপ্রসূ হবে না, সে বিষয়ে স্বামীজী তাঁর দেশবাসীকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। বস্তুতঃ ভারতের নবজাগরণের এমন কোন দিকই নেই, যে বিষয়ে স্বামীজী চিন্তা করেননি অথবা যে বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত উপদেশ জাতিকে ভবিষ্যতে পথ চলবার প্রেরণা দেবে না। স্বামীজীর উপদেশের মূল কথাই 'এগিয়ে চলো'। এগিয়ে চলার পথে ভুল-ভ্রান্তি ঘটা বিচিত্র নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক; কিন্তু গতিরোধ হওয়ার অর্থ পতন ও মৃত্যু।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাড়ুই

অনন্তর উষা এলো; এসো তুমি আমার আকাশে
নতুন মাধুর্য নিয়ে, মিহির-সঙ্কাশ! আজ আমি
আমার উৎসের কাছে যেতে চাই আলোর সন্ধানে;
তুমি দাও সে সন্ধান; তোমার বাণীর ব্যাপ্ত দর্পণের তলে
আমার মূর্তিকে দেখি: আমিও আর এক সিংহ-শিশু;
অমৃতের পুত্র ব'লে নিয়ে চলো সিংহের নিলয়ে।
আমাকে জাগাও দেব, তোমার উত্তাপ-স্পর্শ দিয়ে।

আমার বিমুগ্ধ রাজ্যে কেন্দ্রান্বিত চৈতন্যের 'পরে
হে মহামানব এসো; ভাঙো সঙ্কীর্ণের হাহাকার;
আমাকে বিস্তৃত করো, যুক্ত করো পৃথিবীর সাথে।
হাজার বছর ধরে পুঞ্জীভূত গাঢ় অন্ধকার
অধুনা তরল হোক—বাষ্প হয়ে শূন্যে যাক্ মিশে।
একান্ত এ আশা নিয়ে বসে আছি যুগ যুগ ধরে
আমাদের মাঝে তুমি আরবার এস কৃপা ক'রে।

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী পরমানন্দ

পূর্বাশ্রমে স্বামী পরমানন্দের নাম ছিল সুরেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা। তাঁহার পিতা আনন্দ গুহঠাকুরতা বরিশাল জিলার বানরিপাড়ায় বাস করিতেন। সুরেশচন্দ্র ছিলেন ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ! নয়বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। শিশুকাল হইতেই তিনি সুদর্শন, শান্ত ও সাহসী ছিলেন। খেলাধূলায়ও তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি স্বামীজীর জনৈক শিষ্যের সংস্পর্শে আসিয়া সংসার ত্যাগ করার সংকল্প স্থির করেন।

১৯০০ খৃঃ মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্র গৃহ হইতে পলাইয়া বেলুড় মঠে যোগদান করেন। বসন্তকালে বেলুড় মঠে আসেন বলিয়া পূজ্যপাদ রাজা মহারাজ তাঁহাকে 'বসন্ত' নামে ডাকিতেন। তখন তিনি নাবালক ছিলেন; আত্মীয়েরা দাবি করায় তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু কিছু দিন পরেই তিনি পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া বেলুড় মঠে উপস্থিত হন। তখন তাঁহাকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সাহায্যার্থে মাদ্রাজ মঠে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৯০১ খৃঃ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সহিত তিনি বেলুড় মঠে আসেন এবং স্বামীজীর পূত সঙ্গ লাভ করেন।

মাত্র ১৬ বৎসর বয়সের একটি ছেলে মঠে যোগ দেওয়ায় কেহ কেহ আপত্তি তুলিলে স্বামীজী বসন্তকে সাদরে স্বীয় পদপ্রান্তে আশ্রয় দিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। পরের বার মঠে যোগ দিলে স্বামীজী এই কিশোর বালককে শুধু যে মঠে স্থান দেন তাহাই নহে, সন্ন্যাসদানেও কৃতার্থ করেন। পরবর্তী কালে এই বাল-সন্ন্যাসীর কার্যকলাপ স্বামীজীর দূরদৃষ্টিরই প্রমাণ। ১৯০২ খৃঃ জানুআরি মাসে পূর্ণিমার দিন তিনি স্বামীজী কর্তৃক সন্ন্যাসে দীক্ষিত হইয়া 'পরমানন্দ' নামে অভিহিত হন। স্বামীজীর শেষ সন্ন্যাসী শিষ্যদের অন্যতম স্বামী পরমানন্দ। সন্ন্যাস লাভ করার পর তাঁহাকে মাদ্রাজে প্রেরণ করা হয়।

মাদ্রাজে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় ১৯০৪ খৃঃ পরমানন্দ বেলুড়ে প্রত্যাগমন করেন; প্রায় বৎসরাধিক কাল বেলুড় মঠে বাস করিয়া পুনরায় মাদ্রাজে যান। পরমানন্দের জীবন-গঠনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বিশেষ প্রভাব ছিল।

স্বামী অভেদানন্দ ভারতবর্ষে আসিয়া ১৯০৬ খৃঃ ১০ই নভেম্বর পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন যাত্রা করেন। ১৯০৮ খৃঃ বড়দিনের পূর্বে উভয়ে নিউইয়র্কে পৌছান। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পরমানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারে জীবন অতিবাহিত করেন। বস্তুতঃ ১৯০৮ খৃঃ হইতেই তিনি প্রচারকের কাজে ব্রতী হন। প্রথমে তিনি নিউইয়র্ক বেদান্ত-সমিতিতেই কাজ আরম্ভ করেন, ঐ বৎসরই একবার বস্টনে যাইয়া মিসেস ওলিবুলের আতিথ্য গ্রহণ করেন। বস্টনের বেদান্ত আশ্রম বস্তুতঃ মিসেস ওলিবুল ও পরমানন্দের চেষ্টাতেই স্থাপিত হয়। এই আশ্রম-পরিচালনায় পরমানন্দকে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। স্বামী পরমানন্দের পরবর্তী জীবনের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বস্টন বেদান্ত-সমিতি। তিনি বহু পুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে 'Path of Devotion' (ভক্তির পথ)

উল্লেখযোগ্য, উহা হিন্দী ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি কবিও ছিলেন।

১৯১১ খৃঃ ২রা জুলাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি ভারতে আসেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার পৌছিবার পূর্বেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ইহলীলা সংবরণ করেন। বেলুড় মঠে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া নভেম্বর মাসে ইওরোপ হইয়া পরমানন্দ আমেরিকায় ফিরিয়া যান। ১৯১২ খৃঃ 'Message of the East' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ও বস্টন বেদান্ত-সমিতির নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়। উক্ত বেদান্ত আশ্রমে কবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রমুখ ভারতীয় মনীষিগণ সানন্দে অভ্যর্থিত হন।

১৯১২ খৃঃ জুন মাসে পরমানন্দ তৃতীয় বার ইওরোপে গমন করেন। তাঁহার লিখিত অনেক পুস্তক ইতালী, ফরাসী ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ১৯১৩ খৃঃ চতুর্থ বার তিনি ইওরোপে যাইয়া কিছুদিন প্রচার-কার্য করেন।

১৯২৬ খৃঃ দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে আনন্দ আশ্রম স্থাপিত হয়। এই আশ্রমটি সিয়েরা-মাদ্রে পর্বতের সানুদেশে গ্লেনডেইল শহর হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত। এখান হইতে লস এঞ্জেলেস ও পাসেডিনা যথাক্রমে ১০ ও ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৯২৯ খৃঃ বস্টন হইতে ২৬ মাইল দূরে তিনি কোহাসেট নামক স্থানে আরও একটি আশ্রম স্থাপন করেন।

৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের তিরোভাব-দিবস এবং যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা-দিবস। তিনি ঐ দিবস কোহাসেট আশ্রমে মৌনাবলম্বন করিয়া কাটাইতেন

তিনি পাচ বার ভারতবর্ষে আসেন—যথাক্রমে ১৯১১, ১৯২৬, ১৯৩৩, ১৯৩৫ এবং ১৯৩৭ খৃঃ। কোহাসেট আশ্রমে ৫৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৯৪০ খৃঃ ধ্যানপরায়ণ ও বাগ্মী সন্ন্যাসী স্বামী পরমানন্দ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিত ধামে প্রয়াণ করেন—ঐ দিন কোহাসেট আশ্রমের ১১শ বার্ষিক উৎসবের দিন।

সেভিয়ার-দম্পতি

স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যদিগের মধ্যে সেভিয়ার-দম্পতির স্থান অতি উচ্চে। বস্তুতঃ এই দম্পতি স্বামীজীর কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া তাঁহাদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন।

মিস্টার জে. এচ্. সেভিয়ার 'কাপ্তেন সেভিয়ার' নামেই পরিচিত। তিনি ইংরেজ সেনা-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। কার্যব্যপদেশে তিনি ভারতেও বহুদিন ছিলেন। স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎকারের সময় তাঁহার বয়স প্রায় ৪৯ বৎসর। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অন্তরে ধর্ম-লাভের আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও নানা মতবাদে সত্যের অনুসন্ধান করিয়া কোথাও মনের তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৯৬ খৃঃ স্বামীজী যখন ইংলণ্ডে দ্বিতীয় বার পদার্পণ করেন, তখন তাঁহারা উভয়ে স্বামীজীর এক বক্তৃতা শুনিতে যান। প্রথমাবধিই তাঁহাদের মনে হয়, যে তত্ত্ব-অন্বেষণে এতদিন তাঁহারা চারিদিকে খুঁজিয়াছেন, তাহা এইখানেই আছে। ভারতের অদ্বৈত দর্শন ও স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে তাঁহারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হন।

স্বামীজীর এক বক্তৃতা শুনিয়া বাহিরে আসিয়া কাপ্তেন সেভিয়ার মিস ম্যাকলাউডকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি এই যুবকের সহিত পরিচিত কি? আপাততঃ যাহা মনে হইতেছে, তিনি কি সত্যই তাই।' শ্রীমতী ম্যাকলাউড উত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাহাতে কাপ্তেন বলেন, 'তাহা হইলে ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য ইঁহাকেই অনুসরণ করা উচিত।'

ইহার পরে কাপ্তেন তাঁহার পত্নীর নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তিনি স্বামীজীর শিষ্য হইলে তাঁহার আপত্তি আছে কি না। শ্রীমতী সেভিয়ার আনন্দচিত্তে স্বামীকে অনুমতি দেন এবং নিজেও স্বামীজীর শিষ্যা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

যখন প্রথম স্বামীজীর সহিত শ্রীমতী সেভিয়ার অবসর-সময়ে দেখা করেন, স্বামীজী তাঁহাকে 'মাতা' বলিয়া সম্বোধন করেন। আরও বলেন যে, স্বামীজী তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি তাঁহাকে দিবেন। তিনি ভারতে আসিবেন কিনা, প্রশ্ন করেন। এই দম্পতি এবং স্বামীজীর মধ্যে ক্রমে এক অতি মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে এবং বস্তুতঃ এই দম্পতি স্বামীজীকে একাধারে গুরু এবং প্রিয় সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। তাঁহারা স্বামীজীর অন্তরঙ্গ সহচর হন এবং তাঁহাদের সমুদয় সঞ্চিত অর্থ স্বামীজীকে দান করিতে মনঃস্থ করেন। কিন্তু স্বামীজী তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য বেশীর ভাগ অর্থই রাখিয়া দিতে তাঁহাদিগকে সম্মত করান।

ইংলণ্ডে প্রচার-কার্যে অতিরিক্ত পরিশ্রমে স্বামীজীর দেহ ও মন ক্লান্ত হওয়ায় এবং বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন-বোধে সেভিয়ার-দম্পতি মিস মূলার সমভিব্যাহারে স্বামীজীকে লইয়া ইওরোপ-ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময় আলপ্‌স্ পর্বতের পাদদেশে মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক ও সেণ্ট বার্নাডের মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বিশ্রামের সময় রমণীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া স্বামীজীর মনে হিমালয়ের অনুকূল পরিবেশে একটি আশ্রম স্থাপনের সংকল্প প্রথম উদিত হয়। ইহা জানা মাত্রই সেভিয়ার-দম্পতি এই কল্পনা কার্যে পরিণত করিতে উৎসুক হন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমই ভবিষ্যতে এই কল্পনার বাস্তব-পরিণত রূপ এবং এই আশ্রম সেভিয়ার-দম্পতিরই অক্লান্ত চেষ্টায় ও অর্থে স্থাপিত হয়। ইওরোপ-সফরের শেষ দিকে এই দম্পতিই শুধু স্বামীজীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্বপ্রকার সুখসুবিধার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া জার্মানি হইয়া পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহাদের হ্যাম্পষ্টিডস্থ ভবনে স্বামীজীকে লইয়া যান। এই ভবনে স্বামীজী কয়েকদিন বাস করেন।

স্বামীজী ভারতে প্রত্যাগমন করিবেন জানিয়া এই দম্পতিও স্বামীজীর সহিত ভারতে তাঁহার কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন স্থির করেন। ১৮৯৬ খৃঃ ১৬ই ডিসেম্বর স্বামীজী ভারতে রওনা হন, সঙ্গে সেভিয়ার-দম্পতি ও বিশ্বস্ত গুডউইন। তাঁহারা নেপল্‌স্ পর্যন্ত ইওরোপের মধ্য দিয়া আসিয়া ৩০শে ডিসেম্বর কলম্বো রওনা হন। ১৮৯৭ খৃঃ ১৫ই জানুআরি তাঁহারা সিংহলে কলম্বোয় পৌছান।

এই সময় হইতে ১৮৯৮ খৃঃ পর্যন্ত তাঁহারা প্রায়ই স্বামীজীর সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়াও স্বামীজী তাঁহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে সঙ্গেই রাখেন। ১৮৯৭ খৃঃ মে মাস হইতে উত্তর ভারত সফরেও এই দম্পতি অধিকাংশ সময় স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন। কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে গোপাল-লাল শীলের বাগান-বাড়িতে পাশ্চাত্য শিষ্যগণের থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং স্বামীজী ঐ স্থানেই মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতেন এবং সন্ধ্যায় প্রায় আড়াই মাইল রাস্তা পদব্রজে গল্প করিতে করিতে আলমবাজার মঠে আসিতেন। কোন দিন ক্লান্তি বোধ করিলে তিনি বাগান-বাড়িতেই রাত্রি বাস করিতেন। আবার সেভিয়ার-দম্পতি কখনও মঠে আসিয়া স্বামীজীর গুরুভাইদের সহিত মেলামেশা করিতেন। শ্রীমতী সেভিয়ার নিরঞ্জন মহারাজের বীরত্ব-ব্যঞ্জক

চাল-চলনের জন্য তাঁহাকে খুব পছন্দ করিতেন ও বলিতেন, 'ওঁকে রাজপুত্রের মতো দেখায়।'

১৮৯৮ খৃঃ সেভিয়ার-দম্পতি আলমোড়ায় 'টমসন হাউসে' বাস করিতেছিলেন। স্বামীজী সেই বৎসর ৮ই মে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া সেভিয়ার-দম্পতির অতিথি হন এবং কয়েক দিন বাস করেন। সঙ্গে আসিয়াছিলেন ধীরামাতা, মিস্ ম্যাকলাউড এবং ভগ্নী নিবেদিতা; কলিকাতায় আমেরিকার কন্সাল জেনারেলের পত্নী মিসেস প্যাটারসনও ছিলেন।

এই মহানুভব দম্পতির অবিস্মরণীয় কীর্তি—মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা। এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠায় এবং এখান হইতে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা-মুদ্রণে কাপ্তেন সেভিয়ারের অশেষ দান স্মরণীয়। শ্রীমতী সেভিয়ার আশ্রমের সকলের সুখ-সুবিধার প্রতি মাতার ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। ১৮৯৯ খৃঃ ১৯শে মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মতিথিতে অদ্বৈত-আশ্রমের ভিত্তি-স্থাপন হয়।

কাপ্তেন সেভিয়ার পূর্ব হইতেই মূত্রকৃচ্ছ্রতা-রোগে ভুগিতেছিলেন এবং এই পীড়া কঠিন আকার ধারণ করায় ১৯০০ খৃঃ ২৮শে অক্টোবর এই কর্মবীরের দেহাবসান ঘটে। মায়াবতীতে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব থাকায় তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করার কথায় তিনি সম্মত হন নাই। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রোগ-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া এই মহাপ্রাণ ইংরেজ ভক্ত বাঞ্ছিত ধামে প্রয়াণ করেন। একটি আদর্শের জন্য এরূপ নীরব আত্মত্যাগের উদাহরণ অতি বিরল।

মিঃ সেভিয়ারের নশ্বর দেহ তাঁহারই অন্তিম বাসনা অনুযায়ী হিন্দুমতে অগ্নিতে দাহ করা হয় এবং ঊর্ধ্বদৈহিক ক্রিয়াও হিন্দুমতেই অনুষ্ঠিত হয়।

স্বামীজী এই সময় দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য সফরে গিয়াছিলেন। হঠাৎ এই দুর্ঘটনার আভাস পাইয়া তিনি সত্বর ভারতে রওনা হন, কিন্তু পরে দুঃখ করিয়া বলেন, তাড়াতাড়ি করিয়া আসিয়াও সেভিয়ারের মৃত্যুর পূর্বে পৌঁছাইতে পারিলাম না। ৯ই ডিসেম্বর স্বামীজী বেলুড় মঠে পৌঁছিয়া এই মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শোকসন্তপ্তা 'মাদার' সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দেওয়া প্রয়োজন-বোধে মায়াবতীতে তারযোগে সংবাদ দিয়া সেখানে রওনা হন।

শ্রীমতী সেভিয়ার স্বামীর মৃত্যুর পরেও প্রায় পঞ্চদশ বর্ষকাল মায়াবতী আশ্রমে বাস করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে একবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৯১১ খৃঃ মার্চ মাসে ভারতে ফিরিয়া আসেন। অদ্বৈত-আশ্রমবাসীদিগের নিকট তিনি স্নেহময়ী জননীস্থানীয়া ছিলেন।

তাঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ স্বামীজীর বাণী ও রচনা—ইংরেজী গ্রন্থাবলী-প্রকাশে অশেষ পরিশ্রম, সাহায্য এবং প্রবল উৎসাহ-দান। মিস্ ম্যাকলাউড একবার তাঁহাকে এই নির্জন শৈলাবাসে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে বিরক্তি আসে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তরটি দেন, তাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন যে, স্বামীজীর কথা চিন্তা করিয়া তিনি সময় কাটান। চারিদিকের পাহাড়ীরা তাঁহাকে মঙ্গলময়ী মাতার ন্যায় জ্ঞান করিত এবং তিনি পাহাড়ী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে পয়সা বিলাইতেন। তিনি অদ্বৈত আশ্রমের একজন ট্রাষ্টী নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯১৬ খৃঃ ৪ঠা এপ্রিল এই মহীয়সী নারী মায়াবতী তথা ভারত ত্যাগ করিয়া বোম্বাই হইতে জাহাজে ইংলণ্ড রওনা হন। যাইবার পূর্বে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত অ্যাণ্ড্রুজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। একদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সস্ত্রীক শ্রীমতী সেভিয়ারের

সঙ্গে মঠে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া যান। ইতিপূর্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন মায়াবতীতে কিছুকাল কাটাইয়া আসিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি অবশিষ্ট জীবন ইংলণ্ডেই কাটাইয়া দেন। ১৯৩০ খৃঃ ২০শে অক্টোবর, ৮৩ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর দশ মিনিট পূর্ব পর্যন্তও তাঁহার সংজ্ঞা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং খুব শান্তভাবে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের উন্নতিকল্পে ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহার চেষ্টা ও যত্নের অভাব ছিল না। স্বামীজীর শিষ্যদের তিনি আপন সন্তানের ন্যায় ভালবাসিতেন। তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ছিল তাঁহার প্রখর দৃষ্টি। স্বামী বিরজানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শ্যামলাতাল আশ্রমটিও এই মহীয়সী মহিলার অনুমোদিত ও অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত।

অধ্যাপক ডক্টর পল ডয়সন

১৮৯৬ খৃঃ স্বামীজী বিশ্রাম উপলক্ষে সুইজারল্যাণ্ডে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিতেছেন, সেই সময় ইংলণ্ড হইতে ঠিকানা পরিবর্তিত হইয়া কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক বিখ্যাত প্রাচ্যভাষাবিদ্ পল ডয়সনের এক পত্র আসে। অধ্যাপক স্বামীজীকে কীলে যাইয়া তাঁহার ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। এই পত্র পাইয়া স্বামীজীকে ইওরোপীয় ভ্রমণসূচী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিতে হয়।

অধ্যাপক স্বামীজীর বক্তৃতা ও বাণীসকল পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, স্বামীজী একজন মৌলিক-চিন্তাশীল ও আধ্যাত্মিক প্রতিভাবান্ ব্যক্তি। অধ্যাপক স্বয়ং বেদান্তদর্শনে অনুরক্ত ছিলেন এবং অল্প কয়েকদিন পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক তাই স্বাভাবিকভাবেই স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হইতে ইচ্ছুক হন। স্বামীজী ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কীলে যাইবার ব্যবস্থা করেন। কীল বাল্টিক সাগরে অবস্থিত জার্মানির একটি বিখ্যাত বন্দর ও নগর। স্বামীজীর সঙ্গে সেভিয়ার-দম্পতিও কীলে যান। এবং তাঁহারা উপস্থিত হওয়া মাত্রই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁহাদিগকে অধ্যাপক নিজ ভবনে আমন্ত্রণ করেন।

সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়। অধ্যাপক মনে করেন, সত্যান্বেষণে মনুষ্য-প্রতিভা যে অমূল্য রত্নরাজি আবিষ্কার করিয়াছে, উপনিষদ্ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অধ্যাপক কিছু অনুবাদ করিতেছিলেন, স্বামীজী তাহা লইয়া আলোচনা করিতে থাকেন এবং কয়েকটি দুর্বোধ্য ও জটিল বিষয়ের সঠিক তাৎপর্য এবং নির্ভুল ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজীর মতে শব্দবিন্যাসকৌশল অপেক্ষা বিষয়ের প্রাঞ্জলতা বাঞ্ছনীয়। তাঁহার ব্যাখ্যা ভাবগম্ভীর ও প্রাঞ্জল, দৃঢ়বিশ্বাস-ও প্রত্যক্ষানুভূতি-সমন্বিত থাকায় অধ্যাপক সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মত গ্রহণ করেন।

দিনের বেলা একসময় স্বামীজীকে অধ্যাপক একখানা কবিতা-পুস্তকের পৃষ্ঠা উলটাইতে দেখেন। কিন্তু তিনি কথা বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে কোন উত্তর পান না। স্বামীজী পরে ইহা জানিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন, তিনি ঐ পুস্তকপাঠে মগ্ন থাকায় শুনিতে না পাওয়ায় এরূপ ঘটিয়াছে। অধ্যাপক কিন্তু এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। কিন্তু পরে নানা অলোচনার মধ্যে স্বামীজী ঐ পুস্তকের বহু অংশ উদ্ধৃত করেন এবং ব্যাখ্যা করেন।

ইহাতে অধ্যাপক বিস্ময় বোধ করেন এবং প্রশ্ন করেন কিরূপে এরূপ স্মরণশক্তি অর্জন করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় যোগীদের মনঃ-সংযোগের কথা আরম্ভ হয়। স্বামীজী নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলেন—যোগ এত গভীর হওয়া সম্ভব যে, জলন্ত অঙ্গার শরীরে চাপিয়া ধরিলেও কোন অনুভূতি হইবে না।

এই সময় কীলে এক প্রদর্শনী চলিতেছিল। ডক্টর ডয়সন তাঁহাদিগকে উহা দেখাইতে লইয়া যান। পরদিবস কীলের চতুষ্পার্শ্বস্থ দ্রষ্টব্য বস্তুসকল দর্শন করেন।

অধ্যাপকের বাসনা ছিল স্বামীজী কয়েকদিন কীলে অবস্থান করেন, কিন্তু স্বামীজী ইংলণ্ডে ফিরিয়া সেখানে প্রচারকার্য আরম্ভ করিতে ব্যগ্র থাকায় আর বিলম্ব করিতে ইচ্ছা করেন নাই। অবিলম্বে ইংলণ্ডে যাইবার ব্যবস্থা করেন। অধ্যাপক স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও শাস্ত্রজ্ঞানে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত শাস্ত্রের জটিল সমস্যা আলোচনার সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। ফলতঃ তিনি হ্যামবুর্গে আসিয়া স্বামীজীর সহিত মিলিত হন এবং হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া আসেন।

ইংলণ্ডে ডক্টর ডয়সন প্রায় প্রত্যহ স্বামীজীর সহিত মিলিত হইয়া বেদান্ত-দর্শনের মূলতত্ত্ব আলোচনা করিতেন। এই-সকল আলোচনায় ডক্টর ডয়সন বেদান্তের অন্তর্নিহিত ভাব সম্বন্ধে স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্ত হইতেন। অধ্যাপক দুই সপ্তাহ কাল লণ্ডনে থাকেন। তিনি হয় দিনে, না হয় রাত্রিতে স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হইতেন। স্বামীজী বলিতেন, পাশ্চাত্য মনদ্বারা বেদান্ত-শাস্ত্র সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা দুরূহ, কারণ পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাঁহাদের পূর্বার্জিত ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহার বিচার করিতে চাহেন। আরও ঘনিষ্ঠতা জন্মিলে ডক্টর ডয়সন বুঝিলেন যে, হিন্দু দর্শনের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাশ্চাত্য ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ ইহা তর্কশাস্ত্রের অন্তর্গত বিষয় নহে, প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়। এই মনীষী বহু সময় এইরূপে বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় আনন্দ লাভ করিয়া জার্মানিতে ফিরিয়া যান।

তদানীন্তন ইওরোপে ইংলণ্ড জার্মানি ও ফ্রান্স উন্নত দেশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডক্টর ডয়সনের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য স্বামীজীর জার্মানিতে পদার্পণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই। তদুপরি দুইজন বিশিষ্ট কৃতী জার্মান সন্তান—ম্যাক্সমূলার ও ডয়সন—স্বামীজী দ্বারা প্রভাবান্বিত হন, ইহা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নাই।

মিস ম্যাকলাউড

মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড নিউইয়র্ক সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি-সম্পন্না মহিলা ছিলেন। ১৮৯৫ খৃঃ নিউইয়র্কে স্বামীজীর সহিত এই মহিলার প্রথম পরিচয় ঘটে। ক্রমে ইহা স্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই মহিলাকে স্বামীজী 'জো' বা 'জয়া' নামে ডাকিতেন। তিনি গুরুগতপ্রাণা ছিলেন। অপরপক্ষে তিনি ও স্বামীজী একে অন্যের সহিত বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এই মহিলা স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণধী ছিলেন এবং স্বামীজীর মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিতেন। তিনি সর্বদা স্বামীজীর প্রচার-কার্যের মানসিক শ্রম লাঘব করিতে তৎপর থাকিতেন এবং অতি উচ্চভূমিতে আরূঢ় মন স্বাভাবিক অবস্থায় নামাইয়া আনিতে সাহায্য করিতেন। জয়া তাঁহার ভগিনীর বিবাহে পারী যান এবং মিঃ লেগেটের আমন্ত্রণে স্বামীজীও সেখানে যান। তথায় কয়েকদিন যাপন করিয়া স্বামীজী ইংলণ্ডে পদার্পণ করিলে জয়াও সেখানে গিয়াছিলেন। এই স্থানেই

ভগিনী নিবেদিতার সহিত জয়ার প্রথম পরিচয় ঘটে। নিবেদিতা তাঁহাকে 'য়াম' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে তিনি 'Tantine' নামে পরিচিতা ছিলেন। তিনি আজীবন স্বামীজীর কাজে উৎসাহের সহিত আত্মনিয়োগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন।

যে ৩৪ খানি পত্র স্বামীজী এই মহিলাকে লিখিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জয়ার সাংসারিক জ্ঞানের উপর স্বামীজীর বিশেষ আস্থা ছিল। অপরদিকে নিজের আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান মনের সকল কথাও 'জো'কে জানাইতেন—যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। জয়া স্বামীজীকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন এবং অযথা প্রশ্নাদি দ্বারা বিব্রত না করিয়া বরং নানা রূপে ধ্যানপ্রবণ মনকে সাধারণ ভূমিতে আবদ্ধ রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন।

স্বামীজী দেশে ফিরিয়া আসিলে ১৮৯৮ খৃঃ ৮ই ফেব্রুআরি তিনি ভারতবর্ষে আসেন। বেলুড় মঠের জন্য ক্রীত জমির এক অংশে একটি পুরাতন বাড়ি সাময়িকভাবে সংস্কার করিয়া তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হয়। মিসেস ওলিবুল বা ধীরা মাতাও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া ঐ স্থানে বাস করেন। কিছুকাল পরে ভগিনী নিবেদিতাও ঐ গৃহেই কয়েকদিন তাঁহাদের সহিত বাস করেন। ২২শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে এবং পরবর্তী রবিবার ২৭শে ফেব্রুআরি সাধারণ উৎসবে তাঁহারা যোগদান করেন। সাধারণ উৎসব ঐবৎসর বেলুড়ে পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়িতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'গোপালের মা' নামে পরিচিতা অঘোরমণি দেবীর সহিত ইঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। এই আচার-পরায়ণা বৃদ্ধা তাঁহাদিগকে নাতনীর ন্যায় গ্রহণ করেন।

১৮৯৮ খৃঃ ১১ই মে ইঁহাদিগকে লইয়া স্বামীজী আলমোড়ায় কাপ্তেন সেভিয়ারের অতিথি হন—সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, সদানন্দ ও স্বরূপানন্দ। প্রায় একমাস আলমোড়ায় মহানন্দে কাটাইয়া স্বামীজী কাশ্মীর-ভ্রমণে বাহির হন। সঙ্গে যান জয়া, ধীরামাতা এবং নিবেদিতা। কাশ্মীর-ভ্রমণ সমাপ্ত হইলে নানা স্থানীয় দৃশ্য উপভোগ করিয়া জয়া ধীরামাতার সহিত স্বদেশে চলিয়া যান।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাইয়া স্বামীজী মিঃ লেগেটের ভবনে (রিজলী ম্যানর) থাকাকালীন জয়া পুনরায় তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। জয়া ঐস্থান হইতে ভ্রাতার দুরারোগ্য রোগের সংবাদ পাইয়া ক্যালি-ফোর্নিয়ায় যান। জয়ারই চেষ্টায় স্বামীজী আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে লস্ এঞ্জেলেসে মিসেস্ ব্লজেটের গৃহে যাইয়া অতিথি হন। ১৮৯৯ খৃঃ ২০শে নভেম্বর হইতে ১৯০০ খৃঃ প্রথম ভাগ পর্যন্ত পশ্চিমোপকূলে স্বামীজীর বেদান্ত-প্রচার জয়ার সাহায্যে এবং চেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছিল। তিনি জীবনান্ত পর্যন্ত হলিউড বেদান্ত-সমিতির কাজে ব্রতী ছিলেন।

প্রথম ভারত-সফরের প্রায় ১৪ বৎসর পরে তিনি পুনরায় ভারতে আসেন। এই সময় শ্যামলাতাল আশ্রমটিও দেখিয়া আসেন। পরে শ্রীমতী সেভিয়ারের সহিত ভারত ত্যাগ করেন।

তিনি পুনরায় ভারতে আসেন ১৯৩০ খৃঃ এবং এই সময় ৮ই এপ্রিল নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ভগিনী ক্রীষ্টিনের দেহত্যাগের খবর পাইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন। ১৯৩৮ খৃঃ মঠের অতিথিশালায় অবস্থান-কালে তিনি স্বামী বিরজানন্দকে মঠের প্রধান অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন।

জয়া স্বামীজীর কথা আলোচনা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। স্বামীজীর মধ্যে কি তেজস্বিতা ছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস জয়ার সাধারণ কথাতেও প্রকাশ পাইত, স্বামীজীর সহিত পরিচয়ের পর তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'এখন আমি কি করিব ?' তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন, 'ভারতবর্ষকে ভালবাস'। জয়া জীবনে এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। প্রথমবার ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বে স্বামীজীর অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি লিখিয়া পাঠান, 'যদি ভারতবর্ষের প্রতি তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকে তবেই এসো, নচেৎ নয়। আমরা ভারতের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যবাসীদের কটূক্তিপূর্ণ সমালোচনা আর সহ্য করিতে পারি না।' জয়া ভারতে আসিলেন।

স্বামীজী বলেন, 'ইনি রত্নস্বরূপা, ইঁহার অন্তর সদাই দয়ায় বিগলিত।' অন্য সময় লিখেন, 'ইনি রাষ্ট্রনায়ক-তুল্য—ইনি রাজ্যশাসন করিতে পারেন। আমি মানুষের মধ্যে এরূপ সুদৃঢ় অথচ সাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি খুব কমই দেখিয়াছি!'

জয়া ১৮৯৫ খৃঃ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর হইতেই কিন্তু নিজের বয়স গণনা করিতেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি ৯১ বৎসর বয়সে ১৯৪৯ খৃঃ ১৪ই অক্টোবর লস্ এঞ্জেলসে দেহত্যাগ করেন।

কাশ্মীরের মহারাজা

১৮৯৭ খৃঃ ৮ই সেপ্টেম্বর বারমুল্লা পহুঁছিয়া নৌকাযোগে স্বামীজী শ্রীনগরে গমন করেন। ১০ই সেপ্টেম্বর তিনি শ্রীনগরে বিচারক ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হন। তিনদিন পরে তিনি মহারাজার প্রাসাদ দর্শন করিতে যান। তাঁহাকে দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী অভ্যর্থনা করেন। তন্মধ্যে একজন ডাক্তার মিত্র জানান যে, মহারাজা জম্মুতে আছেন। কিন্তু মহারাজার ভ্রাতা রাজা রামসিং পরদিবস স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক পরদিবস রাজা স্বামীজীকে বিশেষ অভ্যর্থনা করেন। স্বয়ং রাজা রামসিং রাজকর্মচারীদিগের সঙ্গে মেঝেতে বসিয়া স্বামীজীকে আসনে বসাইয়া সম্মানিত করেন। প্রায় দুইঘণ্টা আলাপ হয়। বহু বিষয়ের আলোচনা হয়, ধর্ম ও প্রজাদের কল্যাণ সম্বন্ধেও আলাপ হয়। রাজা বিশেষ প্রভাবিত হইয়া স্বামীজীর কর্মে সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নানা দর্শনীয় বস্তু ও তীর্থাদি দর্শন করিয়া স্বামীজী বারমুল্লায় প্রত্যাবর্তন করেন।

২০শে অক্টোবর পুনরায় মহারাজার আমন্ত্রণে স্বামীজী জম্মু যান। স্টেশনে আসিয়া রাজকর্মচারিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং তিনি রাজ-অতিথি-রূপে গণ্য হন। প্রথম মহেশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য নামক একজন রাজকর্মচারীর সহিত কাশ্মীরে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার কথা হয়। ২৩শে তারিখে মহারাজা স্বয়ং দীর্ঘ-কাল স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ করেন। রাজ্যের প্রধান কর্মচারিগণ ও মহারাজার দুই ভ্রাতার সাক্ষাতে প্রায় চার ঘণ্টাকাল আলাপ হয়। মহারাজা স্বামীজীকে আরও ১০।১২ দিন থাকিয়া কয়েকটি বক্তৃতা দিতে অনুরোধ করেন। এই সময় স্বামীজী প্রায়ই হিন্দীতে বক্তৃতা দিতেন। তাহা এত সুন্দর হইত যে, মহারাজা স্বামীজীকে হিন্দীতে কয়েকটি রচনা লিখিতে অনুরোধ করেন। স্বামীজী হিন্দী রচনা লিখেন এবং উহা খুবই প্রশংসা অর্জন করে। ২৯শে অক্টোবর কাশ্মীর ত্যাগ করিতে মনঃস্থ করিয়া স্বামীজী মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে মহারাজা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় দেন এবং বলিয়া দেন যে, যখনই জম্মু বা কাশ্মীরে আসিবেন, রাজ-অতিথি হইলে খুবই আনন্দিত হইবেন।

দ্বিতীয়বার ১৮৯৮ খৃঃ ২২শে জুন পাশ্চাত্য শিষ্য সমভিব্যাহারে স্বামীজী শ্রীনগরে উপস্থিত হন। মহারাজা স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে আনান। মহারাজা সংস্কৃত কলেজ এবং মঠ স্থাপন করিবার বাসনায় স্বামীজীকে স্থান পছন্দ করিতে বলেন। নানা তীর্থাদি দর্শন করিয়া ৮ই অগস্ট হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর শ্রীনগরেই স্বামীজী বাস করেন। স্বামীজী ও মহারাজা উভয়েই মিলিত-ভাবে একটি জমি পছন্দ করেন। পাশ্চাত্য শিষ্যগণ ঐ জমিতে তাঁবু খাটাইয়া বাস করিতে থাকেন। স্বামীজী নৌকায় বাস করিতেন। বহু রাজপুরুষ ও অন্যান্য লোক আসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইত।

মঠ করা কিন্তু সম্ভব হইল না। কারণ বহু চেষ্টায়ও মহারাজা রেসিডেণ্টের অনুমতি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। স্বামীজী স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কাশ্মীরে মঠ করা তখন বিশেষ সুবিধা হইত না, তাই তিনি সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন।

জামসেদজী নাসরভনজী টাটা

বোম্বাই প্রদেশের নাভাসারীর জামসেদজী টাটা আজ ভারতীয় শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। তিনি ভারতীয় পার্শী শিল্পপতি। বহু জনহিতকর কার্যেও তাঁহার দান অবিস্মরণীয়। স্বামীজী যখন ১৮৯৩ খৃঃ ধর্ম-মহাসভায় যোগদান-মানসে জাপান হইতে শিকাগো রওনা হন, সে-সময় সহযাত্রিরূপে উভয়ে পরিচিত হন। স্বামীজী দেশের একজন যুবক-ব্যবসায়ীর সহিত পরিচিত হইয়া ব্যবসা-সংক্রান্ত নানা কথা আলোচনা করেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ আলোচনা শুনিয়া জামসেদজী বিশেষ প্রীত হন এবং দেশের দুঃখ-দুর্গতির জন্য এই সন্ন্যাসীর কত গভীর বেদনা ও সহানুভূতি, তাহা বুঝিতে পারেন। স্বামীজীর কলিকাতা থাকা-কালে জামসেদজী স্বামীজীকে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন। দুঃখের বিষয় প্রত্যুত্তরে স্বামীজী কি লিখিয়াছিলেন, তাহা অজ্ঞাত। জামসেদজী লিখেন :

প্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ,

আমার বিশ্বাস আপনার জাপান হইতে চিকাগো যাত্রার পথে সহযাত্রিরূপে আমাকে আপনার স্মরণ আছে। এই মুহূর্তে বিশেষ করিয়া মনে হইতেছে—ভারতে কঠোর আত্ম-সংযম-প্রবণতার পুষ্টিসাধন সম্বন্ধে আপনার অভিমত। ইহাকে ধ্বংস না করিয়া কার্যকরী প্রণালীতে প্রবর্তিত করাই কর্তব্য।

ভারতে আমার বিজ্ঞান-গবেষণাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐ অভিমত স্মরণ করিতেছি। আমি নিঃসন্দেহ যে, ঐ গবেষণাগার সম্বন্ধে আপনি শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন। আমার মনে হয়, তপস্যার ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ সম্ভব হয় না, যদি তপস্বীদের জন্য একটি মঠ বা আশ্রম স্থাপন করি, যেখানে তাহারা সাধারণ ভদ্রভাবে বাস করিয়া স্বাভাবিক ও মানবীয় বিজ্ঞান-চর্চায় জীবন অতিবাহিত করিবে। আমার মতে যদি একজন উপযুক্ত নেতা এই প্রকার যোগীদের পক্ষ হইয়া জেহাদ ঘোষণা করে, তবে যোগ বিজ্ঞান ও আমাদের দেশের সুনামকে বহু সহায়তা করিবে। এবং আমি জানি না বিবেকানন্দ অপেক্ষা কে বেশী দক্ষ সেনাপতি হইতে পারে! আপনি কি মনে করেন, আপনি এই বিষয়ে আমাদের প্রাচীন প্রথা পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে নিজেকে নিয়োজিত করিতে যত্নবান্ হইতে পারিবেন? মনে হয়, এক অগ্নিবর্ষী প্রচার-পুস্তিকা দ্বারা আমাদের জনগণকে জাগরিত করিয়া কাজ

আরম্ভ করিলে আপনার পথ সুগম হইবে। আমি হৃষ্টচিত্তে মুদ্রণের সকল খরচ বহন করিব।

আপনার বিশ্বস্ত

২৩শে নভেম্বর, ১৮৯৮ জামসেদজী এন. টাটা

এস্প্লানেড হাউস,

বোম্বে

এই লিপি হইতেই বুঝা যায়, জামসেদজী স্বামীজীর প্রতি কতটা শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। শুনা যায়—দিয়াশলাই জাপান হইতে আমদানি করা হয় জানিয়া স্বামীজী দেশে কারখানা করিয়া দেশেই দিয়াশলাই প্রস্তুতের উপদেশ দেন, কারণ তাহা হইলে দেশের টাকা সম্পূর্ণ দেশেই থাকিবে এবং বহু লোকের কর্মসংস্থানও হইবে। যে সময়ে ভারতবর্ষে স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান একপ্রকার ছিল না এবং সকল শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যই ভারত পরমুখাপেক্ষী, তখন এই যুগাচার্য নবীন সন্ন্যাসী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শিল্পপতির মিলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, সন্দেহ নাই।

রবার্ট ইঙ্গারসোল

রবার্ট ইঙ্গারসোল আমেরিকায় তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা উপলক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী লোক-সমাগম হইত এবং তিনি বক্তৃতা দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন। তিনি অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন।

স্বামীজী ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দ্বারা আমেরিকার বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে সুবিদিত হইলে বহুবার স্বামীজীর সহিত রবার্ট সাহেবের ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয় তিনি স্বামীজীর সহিত আলাপে এত মুগ্ধ হন যে, এই নবীন সন্ন্যাসীকে নানাপ্রকার গুরুজনোচিত সাবধান-বাক্য বলিয়া অতিশয় উৎসাহে আমেরিকার জনগণের মনে আক্রোশ উৎপাদন করিতে নিষেধ করেন। তিনি মনে করিতেন, আমেরিকাবাসী অপরের ধর্মমতে অসহিষ্ণু এবং স্বামীজীও স্পষ্টবক্তা উৎসাহী প্রচারক। তিনি ইহাও বলেন, ঐ সময়ের মাত্র ৪০ বৎসর পূর্বে আমেরিকায় প্রচার করিতে আসিলে স্বামীজীকে আমেরিকাবাসীরা বিধর্মী বলিয়া হয় ফাঁসি দিত, না হয় জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারিত। এমনকি মাত্র অল্প কয়েক বৎসর পূর্বেও গ্রামাঞ্চলে প্রচার করিতে বাহির হইলে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিত। আমেরিকাবাসীর এইরূপ চিত্রাঙ্কনে স্বামীজী কিছু আশ্চর্য বোধ করেন। রবার্ট সাহেবের বুঝিবার কিছু ভ্রম হইয়াছিল। ভারতীয় সন্ন্যাসী কি বাণী প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। সকল ধর্ম ও সকল অবতারকে সমান চক্ষে দেখা ও সমান ভাবে শ্রদ্ধা করা এবং খৃষ্টানদিগকে খৃষ্টের শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া ও তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশস্ত করিয়া বিশ্বমানবতার ধর্ম প্রচার করাই ছিল এই নবীন যুগাচার্যের বাণী। এই জন্যই কাহারও মনে বিপরীতভাবের উদ্রেক না করিয়া সকল মানুষই স্বামীজীর বাণী গ্রহণ করিতেছে—ইহা ইঙ্গারসোল বুঝিতে অপারগ ছিলেন।

একদিন ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে কথাচ্ছলে বলেন, 'আমি এই জীবনে যথাসম্ভব ভোগেই বিশ্বাস করি। লেবু নিংড়াইয়া রস গ্রহণ করিয়া শুকনো করাই উদ্দেশ্য। কারণ এই রূপ-রস-গন্ধময় জগৎ ও বর্তমান জীবনই একমাত্র নিশ্চিত বস্তু, অন্য সব অনিশ্চিত।' ঈশ্বর, আত্মা বা পরলোক সম্বন্ধে তিনি কিছুই বিশ্বাস করিতেন না, কারণ তাঁহার মতে এই সকলই বাক্যাড়ম্বর মাত্র। স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'আমি এই

পৃথিবীরূপ লেবু আপনার অপেক্ষাও ভালরূপে নিংড়াইতে জানি এবং আমি আপনার চেয়ে বেশী রসও বাহির করিতে পারি। আমি জানি—আমি অক্ষয়, অমর, তাই আমার কোন তাড়াতাড়ি নাই, কোনও ভয় নাই। ধীরে সুস্থে লেবু নিংড়াইয়া আমি নিংড়ানোও উপভোগ করি। আমার কোনও কর্তব্য নাই, স্ত্রী-পুত্র-সম্পত্তির বন্ধন নাই, তাই আমি সকল নরনারীকে ভালবাসিতে পারি। আমার নিকট সকলেই ঈশ্বর। মানুষকে ঈশ্বরের ন্যায় ভালবাসার আনন্দ চিন্তা করুন। আপনি আমার মতো লেবু নিংড়াইতে চেষ্টা করুন, রসের শেষ ফোঁটাটি পর্যন্ত বাদ পড়িবে না।'

ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে বলেন, তিনি যেন খৃষ্টানদের মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন না করেন। তিনি আরও বলেন, পুরুষ-পরম্পরাগত ধর্মের সহিত কঠিন সংগ্রাম ধর্মীয় মতবাদের উপর লোকের বিশ্বাস শিথিল করিয়াছে এবং ইহাই স্বামীজীর আমেরিকায় সাফল্যের পথ পরিষ্কার করিতে সাহায্য করিয়াছে।

স্বামী জ্ঞানানন্দ

টিহিরীতে স্বামী অখণ্ডানন্দ অসুস্থ হওয়ায় স্বামীজী তাঁহাকে দেরাদুনে আনিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া হৃষীকেশ চলিয়া যান। স্বামী তুরীয়ানন্দ সঙ্গে ছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ কিছুটা সুস্থ হইয়া মীরাটে চলিয়া যান এবং ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের চিকিৎসাধীনে প্রায় দেড় মাস থাকেন। হৃষীকেশে স্বামী সারদানন্দ ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল আসিয়া মিলিত হন। স্বামী ব্রহ্মানন্দও কনখলে ছিলেন এবং আসিয়া স্বামীজীর সহিত মিলিত হন। স্বামীজীর এসময় কঠিন পীড়া হয়। গুরুভাইরা জীবনের আশা প্রায় ত্যাগ করেন। যাহা হউক স্বামীজী বিধির বিধানে দৈব ঔষধে আরোগ্যলাভ করিয়া ওঠেন। তখন তাঁহারা সকলে স্বামীজীকে লইয়া সাহারানপুরের উকিল বন্ধুবিহারীবাবুর গৃহ হইয়া মীরাটে উপস্থিত হন। প্রায় পক্ষাধিককাল স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ মীরাটে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথের গৃহে এবং অপর সকলে যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের গৃহে অবস্থান করেন।

পরে যজ্ঞেশ্বরবাবুর এক বন্ধুর 'শেঠজীর বাগান' নামক স্থানে স্বামীজী সকলকে লইয়া একত্র বাস করিতে থাকেন। কয়েকদিন পরে স্বামী অদ্বৈতানন্দ আসিয়া উপস্থিত হন। স্বামীজী তখনও ঔষধ ব্যবহার করিতেছিলেন, কারণ শরীর তখনও সম্পূর্ণ নিরাময় হয় নাই। এই সময় স্বামীজী প্রায় ৩।৪ মাস মীরাটে বাস করেন। ১৮৯০ খৃঃ শেষ ভাগ হইতে ১৮৯১ খৃঃ জানুআরি মাসের শেষ পর্যন্ত স্বামীজী মীরাটে ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

এই কয়মাস স্বামীজীর সাহচর্যে থাকার ফলে যজ্ঞেশ্বরবাবুর হৃদয়ে ত্যাগ-বৈরাগ্য উদিত হয়। পরে যজ্ঞেশ্বরবাবু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'স্বামী জ্ঞানানন্দ' নামে পরিচিত হন। তিনি ভারত-ধর্মমহামণ্ডলের নেতা ছিলেন।

১৮৯৫ খৃঃ ই. টি. স্টার্ডির ঠিকানায় থাকাকালে স্বামীজী স্বামী অখণ্ডানন্দকে পত্রে লিখেন, 'যজ্ঞেশ্বরবাবু মীরাটে একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। একটি পত্রিকাও ঐ সমিতি হইতে প্রকাশিত হইতেছে।' স্বামীজী স্বামী অভেদানন্দকে মীরাটে পাঠাইতে নির্দেশ দেন এবং যদি সম্ভব হয় ওখানে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া পত্রিকাটি হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করিতে লিখেন। তিনি মাঝে মাঝে কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন—এইরূপ আশ্বাসও দেন। স্বামী

অভেদানন্দ মীরাটে যাইয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ-পূর্বক বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইলে কিছু অর্থ দিবেন বলিয়া লিখেন; আজমীরেও একটি শাখা স্থাপনের চেষ্টা করিতে নির্দেশ দেন পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী সাহারানপুরে একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং স্বামীজীকে পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দকে তাঁহাদের সহিত যোগাযোগ রাখিতে স্বামজী উপদেশ দেন এবং সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে লিখেন।

অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে আদর্শগত ও অন্যান্য বিষয়ে অমিল হওয়ায় ধর্মমহামণ্ডলের সহিত রামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বামী অভেদানন্দের সহযোগিতা করা সম্ভব হয় নাই এবং স্বামী জ্ঞানানন্দও স্বকীয় চেষ্টায় ও কর্তৃত্বে ভারত-ধর্মমহামণ্ডলের নেতৃত্ব করেন।

স্বামী নিত্যানন্দ

স্বামী নিত্যানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম যোগেন চট্টোপাধ্যায়। তিনি স্বামীজী অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। বরাহনগর মঠের প্রায় সূচনা হইতেই তিনি মঠে যাতায়াত করিতেন। বরাহনগর পল্লীতেই তাঁহার বসবাস ছিল। তাঁহার কিছু পৈতৃক বিষয় ছিল। তিনি খুব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন এবং গল্প বলিতেন। তাঁহার স্বভাব অত্যন্ত উদার ছিল। তিনি খাইতে ও খাওয়াইতে ভালবাসিতেন এবং ভালবাসার দ্বারা মঠের সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। মঠের প্রথম অবস্থায় অনেক সময় আহারের যখন প্রায় কিছুই থাকিত না, তিনি জানিতে পারিলে বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিতেন।

যোগেন চট্টোপাধ্যায় বিবাহিত ছিলেন, তাঁহার কোন পুত্রাদি ছিল না, পত্নীবিয়োগের পর তিনি কাশীবাস করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী ১৮৯৭ খৃঃ যে চারজনকে আলমবাজার মঠে প্রথম সন্ন্যাস-দীক্ষা দেন, স্বামী নিত্যানন্দ তাঁহাদের মধ্যে একজন।

কেহ কেহ এই ব্যক্তিকে সন্ন্যাসদান-বিষয়ে আপত্তি জানাইলে স্বামীজী বলেন, যদি পতিত দুর্বল ও দুঃখীকে তাঁহারা না কোলে তুলিয়া নেন, তবে তাহারা তাপিত প্রাণ শীতল করিবার স্থান পাইবে কোথায়?

১৮৯৭ খৃঃ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মুর্শিদাবাদের মহুলা গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকার্য শুরু হইলে সেখানে স্বামী অখণ্ডানন্দের অন্যতম সহকারী ছিলেন নিত্যানন্দ। তিনি শেষ জীবন মাদ্রাজে অতিবাহিত করেন।

স্বামী শুভানন্দ

স্বামীজীর যে কয়জন সন্ন্যাসী শিষ্য সেবা-ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্বামী শুভানন্দ অন্যতম। মোক্ষতীর্থ কাশীধামে যে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম অবস্থিত, তাহা শুভানন্দের অক্ষয় কীর্তি।

পূর্বাশ্রমে স্বামী শুভানন্দের নাম ছিল চারুচন্দ্র দাস। চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। ১৮৯১ খৃঃ চারুচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় রিপন কলেজে ভরতি হন। কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি অনুভব করেন, অর্থকরী বিদ্যা তাঁহার জীবনে অনাবশ্যক। সেইজন্য কলেজ ছাড়িয়া তিনি সাধুসঙ্গ করিতে ও ধর্মপ্রসঙ্গে যোগ দিতে লাগিলেন। প্রতি মঙ্গলবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া দেবী ভবতারিণী দর্শন করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভাগবত-ব্যাখ্যা

শ্রবণ করিতেন। এই সময় তাঁহার 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও স্বামীজীর গ্রন্থাবলী পড়িবার সুযোগ হয়। এই-সকল ধর্মগ্রন্থপাঠে তাঁহার অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য হয়।

১৮৯৭ খৃঃ স্বামীজী পাশ্চাত্য হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে সংবর্ধনা জানাইবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে যে বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে চারুচন্দ্রও ছিলেন। স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করিয়া চারুচন্দ্রের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বামীজীর গাড়ির ঘোড়াগুলি ছাড়িয়া দিলেন এবং নিজেরাই গাড়ি টানিতে লাগিলেন। স্বামীজীর গাড়ি টানিবার সময় তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন ৺জগন্নাথদেবের রথ টানিতেছেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া সেদিন চারুচন্দ্র দিব্য অন্তপ্রেরণা লাভ করিলেন। আলমবাজার মঠে গিয়া চারুচন্দ্র বলিলেন, স্বামীজীই বর্তমান যুগের আদর্শ।

বেলুড় মঠ স্থাপিত হইলে চারুচন্দ্র সেখানে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণের সহিত পরিচিত হইলেন। তাঁহাদের পূত সান্নিধ্যে আসিয়া চারুচন্দ্রের বিবেক-বৈরাগ্য ও ভক্তি-বিশ্বাস শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি লিথোগ্রাফ ছবি চারুচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃঃ যখন চারুচন্দ্রের পিতামাতা কাশীবাসী হন, তখন চারুচন্দ্রও তাঁহাদের সঙ্গে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিখানিও তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কাশীতে কেদারঘাটের উত্তরে ক্ষেমেশ্বর-ঘাটে একটি ভগ্ন শিবমন্দিরে এই ছবিখানি বসাইয়া চারুচন্দ্র পূজা করিতেন ও ধ্যানধারণায় কাটাইতেন। এই সময় একদিন হঠাৎ স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত তাঁহার দেখা হয় এবং আলাপের পর স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কাশীতে উপস্থিতির কথা জানিয়া সেই দিন হইতে প্রতিদিন তাঁহার পুণ্য সঙ্গ লাভ করিতে যাইতেন।

১৮৯৯ খৃঃ 'উদ্বোধন' পত্রিকা বাহির হইলে চারুচন্দ্র ইহার গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা করেন। এই সূত্রে তিনি হরিনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি সেবাপরায়ণ ও ধর্মপ্রাণ যুবকদের সহিত পরিচিত হন। ক্রমে এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। কেদারনাথের গৃহে যুবকদের ধর্মালোচনার বৈঠক বসিত। তাঁহারা স্বামী নিরঞ্জনানন্দের নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ শুনিতেন।

ইহার কিছুকাল পরে স্বামী কল্যাণানন্দ গুরুভ্রাতা স্বামী শুদ্ধানন্দের পরিচয়-পত্র লইয়া কাশীধামে কেদারনাথের গৃহে অতিথি হইলেন। তিনি এই তরুণদলের নিকট স্বামীজীর সেবাধর্মের বাণী প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে সেবাব্রতী হইতে উৎসাহিত করিলেন। চারুচন্দ্র প্রভৃতি যুবকগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে নারায়ণজ্ঞানে নরসেবায় ব্রতী হইলেন। তখন চারুচন্দ্রের হৃদয়-বীণায় সর্বদা স্বামীজীর এই বাণী অনুরণিত হইত:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

মোক্ষতীর্থ কাশীধামে বহু সাধু ও ভক্ত বাস করিতেন। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা ছিল না; ইহার যে প্রয়োজন আছে, সে-কথা কাহারও মনে উঠিত না। যখন চারুচন্দ্র-প্রমুখ যুবকগণ এই কাজে অগ্রসর হইলেন, তখন ধীরে ধীরে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা কেদারনাথের গৃহে দরিদ্রসেবা-কার্যালয় স্থাপন করিলেন। রাস্তা হইতে দুঃস্থ অসহায় রোগীদিগকে তুলিয়া বা

কুটির হইতে আনিয়া তাঁহারা হাসপাতালে পাঠাইতেন এবং তাহাদের ঔষধপথ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের আবশ্যকীয় খরচ ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিতেন।

১৯০০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে সেবাসমিতি একটি স্বতন্ত্র বাড়িতে স্থানান্তরিত হইল এবং সেখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। একটি ঘরে অসহায় রোগীদিগকে রাখিয়া চিকিৎসা করা হইত এবং আর একটি ঘরে চারুচন্দ্র এক বন্ধুর সহিত থাকিয়া রোগীদের পরিচর্যা করিতেন। সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত তরুণ-দিগকে এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবাকার্যে ব্রতী দেখিয়া প্রমদাদাস মিত্র প্রমুখ কাশীর বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণেরও দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয়। সেবাকার্যের প্রসারের সঙ্গে বৃহত্তর ভাড়া-বাড়িতে সেবাসমিতি উঠাইয়া লইতে হয়। প্রথম দেড় বৎসরে সমিতিতে মোট ৬৬৪ জন নরনারী কোন না কোন প্রকারে সেবা বা সাহায্য লাভ করে। আন্তরিক সেবানুরাগ ও প্রাণপাতী পরিশ্রম দ্বারা কত মহৎ কার্য করা যায়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই সেবাসমিতি। জনৈক বন্ধুপ্রদত্ত চার আনা মাত্র সম্বল করিয়া এই সমিতির সূত্রপাত হয়।

১৯০২ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে স্বামীজী কাশী-ধামে শুভাগমন করেন। চারুচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণ সহ স্বামীজীকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানান। স্বামীজী সেবাধর্ম সম্বন্ধে যে-সকল হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য আলোচনা করেন, তাহাতে চারুচন্দ্রের মনেপ্রাণে অনুভব হইল—তাঁহারা জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অতি মহৎ। এই সময় চারুচন্দ্র বন্ধুগণ সহ স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। সেই পরম শুভ মুহূর্তে সিদ্ধগুরু নবদীক্ষিত শিষ্যগণকে বলিলেন: 'অসহায় নররূপী নারায়ণের সপ্রেম সেবাই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য। শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মচারী ত্যাগব্রতী নিষ্কাম কর্মী ও জনসাধারণের পক্ষে সেবাধর্ম সমভাবে উপযোগী।' স্বামীজীর এই কথাগুলি শিষ্যগণের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিল। স্বামীজী আবার বলিলেন, 'সাহায্য বা দুঃখমোচন করবার তুমি কে? সপ্রেম সেবা ছাড়া আর কি করবার আছে? অভিমান ত্যাগ ক'রে কামনাশূন্য হয়ে নারায়ণ-বুদ্ধিতে মানুষের সেবা ক'রে ধন্য হও। নিষ্কামভাবে সেবা করতে পারলে নিশ্চয়ই লক্ষ্যে পৌছুবে। আর এই কার্যের দ্বারা সমাজের ও দেশের প্রভূত কল্যাণ হবে। যে দয়া দেখাইতে চায়, সে গর্বিত; সে অপরকে নিজের চেয়ে হীন মনে করে। দয়া নয়—সেবাই তোমাদের জীবনের প্রধান নীতি হোক। নিঃস্বার্থ সেবা ভগবানের উপাসনাতুল্য। শিষ্যগণ! তোমরা এই প্রতিষ্ঠানের নাম রাখ Home of Service (সেবাশ্রম)।'

স্বামীজী চারুচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'দরিদ্রসেবার জন্য যে পয়সাটি সংগৃহীত হয়, তাকে তোমার বুকের রক্ত ব'লে মনে করবে। যারা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তাদের দ্বারাই এই কাজ ঠিক ঠিক ও স্থায়িভাবে হ'তে পারে।'

এই সময় ভিঙ্গার মহারাজা উদয়প্রতাপ সিংহ কাশীধামে বেদান্ত-প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি আশ্রম স্থাপনের জন্য স্বামীজীকে পাঁচ শত টাকা দেন। স্বামীজী এই ভার মহাপুরুষ মহারাজের উপর ন্যস্ত করিয়া বেলুড় মঠে ফিরিলেন। কাশী-ত্যাগের পূর্বে সেবকবৃন্দের অনুরোধে সেবাশ্রমের জন্য স্বামীজী ইংরেজীতে একটি আবেদন লিখিয়া দেন। পরে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ এই অর্থ লইয়া কাশীধামে যান এবং ১৯০২ খৃঃ ৪ঠা জুলাই কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দিনই স্বামীজী রাত্রি ৯টার সময় বেলুড় মঠে

মহাসমাধি লাভ করেন। এই সংবাদে চারুচন্দ্র মর্মাহত হইয়া বলিলেনঃ স্বামীজী বলিতেন, 'কাশীর কাজই আমার শেষ কাজ।' তাঁর কথা কী আশ্চর্যভাবে ফলে গেল! কয়েক মাস পূর্বে তিনি আমাদের অন্তরে সেবা-ধর্মের বীজ বপন করলেন এবং তাঁরই ইচ্ছানুসারে অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিনই তিনি মহাসমাধিমগ্ন হলেন। এই ঘোর বিপদ দ্বারা ভারতের কি কল্যাণ হবে, কে জানে? ঠাকুর ও স্বামীজী যে কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন, তাই ভারতের কল্যাণের একমাত্র পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সংযুক্ত হওয়ার পর সেবাশ্রমের দ্রুত কর্মপ্রসার হইতে থাকে। ভগিনী নিবেদিতা মাঝে মাঝে সেবাশ্রমে থাকিতেন এবং সেবকদের সহিত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অর্থভিক্ষা করিতেন।

চারুচন্দ্র ১৯২১ খৃঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট কাশীধামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—নাম হয় 'স্বামী শুভানন্দ।'

স্বামী শুভানন্দ অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন, তিনি ভ্রাতাদের নিকট হইতে প্রতি মাসে পৈতৃক সম্পত্তির আয়ের কিয়দংশ পাইতেন। উক্ত অর্থে তাঁহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত।

১৯২০ খৃঃ সেবাশ্রমের কার্যভার অন্যের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি দূরে চলিয়া যান। কিন্তু কর্মীদের আহ্বানে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। দেরাদুনের কিষেনপুর সাধন কুটির প্রধানতঃ শুভানন্দের জন্যই নির্মিত হয়। ১৯২৬ খৃঃ শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি কনখল সেবাশ্রমে গমন করেন এবং সেখানে সে-বৎসর (১৩৩৩ সালের ১লা বৈশাখ) স্বামী শুভানন্দের মহাপ্রয়াণ হয়।

যুগশঙ্খ বিবেকানন্দ

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

দীপ্তানল বিভাবসু, বিদ্যুতের সম্মিলিত দ্যুতি
বজ্রগর্ভ মেঘসম গভীর গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি
করুণায় বিগলিত সেই কণ্ঠে সুধা-পরিস্রুতি
তেজঃপুঞ্জ কলেবরে যেন ঝরে স্বর্গের লাবণি।

নরেন্দ্র—সার্থকনামা ইন্দ্রসম অসমদ্বিতীয়
যুগ-শঙ্খ বাজাইয়া ভগীরথসম মহাপ্রাণ
দ্বৈতহীন বেদান্তের অন্তকথা অনির্বচনীয়—
মন্ত্র দিয়া করিল সে পতিত সগর-বংশ ত্রাণ।

উভয় গোলার্ধে সেই বিরচিল সম্মিলন-সেতু,
দেশকাল-নির্বিশেষে সত্যের সে নিকষ-প্রস্তর
'ধর্ম' কভু গণ্ডি নয় মানবের একাত্মতা হেতু
নর-নারায়ণ-তত্ত্বে ব্রহ্মভূত বিশ্ব-চরাচর।

জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে তথা সর্বধর্মে করি সমন্বয়,
অধুনাতনের মনে সনাতন প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী-সংবাদ

বেলুড় মঠঃ গত ২১শে পৌষ (৬ই জানুআরি) সোমবার কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে প্রত্যূষে মঙ্গলারতি দ্বারা স্বামীজীর শতবার্ষিক সমাপ্তি-উৎসবের শুভারম্ভ হয়। বেদপাঠ, ভজন, কঠোপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা, বিবেকানন্দ-সঙ্গীত ও কালীকীর্তন, বিশেষ পূজা, হোম, আরাত্রিক, ভোগরাগ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সহস্র সহস্র ভক্ত বসিয়া ও হাতে হাতে প্রসাদ-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। স্বামীজীর মন্দির ও স্বামীজীর ঘর পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। অপরাহ্নে স্বামী প্রভবানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় স্বামী চিদাত্মানন্দ হিন্দীতে, স্বামী যুক্তানন্দ বাংলায় এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও খৃষ্টফার ঈসারউড ইংরেজীতে স্বামীজীর ভাবাদর্শ অবলম্বনে সময়োপযোগী ভাষণ দেন।

অপরূপ কারুকার্য-মণ্ডিত বিরাট্ মণ্ডপ ও ও তোরণ, প্রদর্শনী এবং প্রতিটি মন্দিরের অপূর্ব আলোকসজ্জা দর্শকবৃন্দের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সারাদিন প্রায় তিন লক্ষ নরনারীর আগমনে মঠ-প্রাঙ্গণ জনারণ্যে পরিণত হয়।

সন্ধ্যারতির পর সানাই ও ধ্রুপদ-সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। রাত্রে শ্রীশ্রীকালীপূজা ও হোম হয়। রাত্রিশেষে মঠাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ২০ জনকে সন্ন্যাস-ব্রতে এবং ৭ জনকে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করেন।

৭ই জানুআরি পূর্বাহ্ণে বেদ আবৃত্তি ও কালী-কীর্তন, অপরাহ্নে মহাভারত-আলোচনা এবং সন্ধ্যায় যন্ত্রসঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়।

৮ই জানুআরি পূর্বাহ্ণে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সম্মেলন, অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী-বিষয়ক ভজন ও কীর্তন হয়। সন্ধ্যায় স্বামী ওঙ্কারানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৯ই জানুআরি প্রাতে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ও কালীকীর্তন এবং অপরাহ্নে কীর্তন হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী ওঙ্কারানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১০ই জানুআরি প্রাতে শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা পাঠ, নরেন্দ্রপুর আশ্রমের অন্ধ বালকগণ কর্তৃক বিবেকানন্দ-লীলাগীতি, অপরাহ্নে সঙ্গীত-সহযোগে স্বামীজীর মহাবির্ভাব-বিষয়ক কথকতা হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী ওঙ্কারানন্দ বিবেকানন্দ-সাহিত্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১১ই জানুআরি প্রাতে স্বামী গম্ভীরানন্দ উপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত-সম্মেলন হয়। সভায় স্বামী বীতশোকানন্দ, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং সভাপতি মহারাজ বক্তৃতা দেন।

১২ই জানুআরি সকালে প্রভাতফেরি সহ বেলুড় গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। দ্বিপ্রহরে সমবেত সকলে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই দিনের অপর অনুষ্ঠানের মধ্যে বিবেকানন্দ-লীলাকীর্তন ও গীতি-আলেখ্য উল্লেখযোগ্য। অপরাহ্নে স্বামী নিখিলানন্দ মহারাজের সভা-পতিত্বে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় স্বামী গম্ভীরানন্দ বাংলায় ও স্বামী পুরাণানন্দ হিন্দীতে স্বামীজীর জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা দেন।

মেদিনীপুর : শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ৬ই ডিসেম্বর হইতে ২৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনসপ্তাহব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে স্বামীজীর জীবনের ঘটনা অবলম্বনে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার। ৮ই হইতে ২৭শে ডিসেম্বরের মধ্যে সাতদিন অপরাহ্নে জনসভার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন বক্তাগণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কয়েকজন সন্ন্যাসী বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, পুণ্যানন্দ, বিশ্বদেবানন্দ, ধ্যানাত্মানন্দ ও শুদ্ধসত্ত্বানন্দ মহারাজের নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা শ্রীসারদা মঠের প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা ১৯শে ভাষণ দেন। যাত্রা, নাটক, রামায়ণগান ইত্যাদির মাধ্যমে আশ্রম-কর্তৃপক্ষ ভক্তদিগের মনোরঞ্জনের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। ১৫ই ডিসেম্বর এক শোভাযাত্রা আশ্রম-প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া স্বামীজীর প্রতিকৃতি-সহ শহর পরিক্রমা করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসে। ২৯শে ডিসেম্বর প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়, এবং প্রায় ১০,০০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন।

বন্যার্ত-সেবা

গত ৩রা নভেম্বর (১৯৬৩) হইতে ১১ই নভেম্বর বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট এলাকায় প্রধান কর্মকেন্দ্র বেলুড় মঠের অর্থসাহায্যে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-কর্তৃক বন্যাপীড়িতদের সেবাকার্য (Relief) পরিচালিত হয়। ৯৭২টি পরিবারের মধ্যে মোট ৪০০ খানি ধুতি ও শাড়ি, ৫০০ খানা কম্বল, ১৫/০ মণ চাল এবং ৩০/০ মণ আটা বিতরণ করা হয়। এই সেবাকার্যে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫,৫০০৲ টাকা।

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

১৯৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী

গত ২২শে ডিসেম্বর বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সভায় সাধারণ সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হয়, নিম্নে তাহার সারানুবাদ প্রদত্ত হইল :

নূতন নির্মাণ-কার্য

কাঁথি আশ্রমে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, রহড়া বালকাশ্রমে স্নাতকোত্তর বুনিয়াদী শিক্ষণ কলেজ ও হস্টেল এবং বিবেকানন্দ অ্যাসেম্ব্লি হল, রেঙ্গুন সেবাশ্রমে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মারক ভবন, বরাহনগর আশ্রমে গ্রন্থাগার, রাঁচি স্যানাটোরিমে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, নরেন্দ্রপুরে ছাত্রাবাস, কলম্বো আশ্রমে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-কেন্দ্র, নরেন্দ্রপুর আশ্রমে সিনিয়র বেসিক স্কুল ও হস্টেল, বেলুড় বিদ্যামন্দিরে ফিজিকস্ ল্যাবরেটরি এবং মাদ্রাজ স্টুডেন্টস্ হোমে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী স্মৃতি-ভবনের উদ্বোধন করা হয়। বেলুড় বিদ্যামন্দিরে হস্টেল ব্লক, রেঙ্গুন সেবাশ্রমে বিবেকানন্দ শত-বার্ষিকী স্মৃতি-ভবন, রহড়া বালকাশ্রমে স্নাতকোত্তর বেসিক ট্রেনিং কলেজ এবং মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজে লাইব্রেরির ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে মিশনের ৬জন সাধু-সদস্য ও ৬জন ভক্ত-সদস্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯৬৩, মার্চ-এর শেষে মোট সদস্য-সংখ্যা ছিল ৬৭৫ (সাধু ৩৪১, ভক্ত ৩৩৪)।

কেন্দ্র-সংখ্যা

বেলুড়ের মূল কেন্দ্র ধরিয়া '৬৩ মার্চ মাসে মিশনের কেন্দ্র-সংখ্যা[১] ছিল ৭২ ; তন্মধ্যে পূর্ব

[১] মঠ কেন্দ্রগুলি ধরা হয় নাই।

পাকিস্তানে ৮; ব্রহ্মদেশে ২; ফ্রান্স, ফিজি, সিঙ্গাপুর, সিংহল ও মরিশাসে ১টি করিয়া; বাকী ৫৭টি ভারতে। ভারতের কেন্দ্রগুলি রাজ্য-হিসাবেঃ পশ্চিমবঙ্গে ২৩, মাদ্রাজে ৮, উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহারে ৬, আসামে ৪, অন্ধ্রে ২, ওড়িষ্যায় ২; দিল্লী, রাজস্থান, পঞ্জাব, বোম্বাই, মহীশূর ও কেরলে ১টি করিয়া।

কার্যবিভাগ

মিশনের কার্যধারার প্রধানতঃ ৫টি বিভাগঃ (১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (৪) সাহায্য, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ম।

(১) রিলিফঃ ১৯৪৭ খৃঃ স্বাধীনতা-লাভের পর হইতে ভারত সরকারের উদ্যোগে বন্যা বাত্যা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে রিলিফ কার্য পরিচালিত হয়, তজ্জন্য রামকৃষ্ণ মিশন পূর্বের মতো আর রিলিফ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সেবাকার্য করা হইয়া থাকে। ১৯৬২-৬৩ খৃঃ মিশন কর্তৃক উল্লেখযোগ্য রিলিফ করা হয় নাই।

(২) চিকিৎসাঃ ভারত, পাকিস্তান ও ব্রহ্মদেশে মিশনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিধর্ম-নির্বিশেষে রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করা হয়, তন্মধ্যে প্রধান—বারাণসী, বৃন্দাবন, কনখল ও রেঙ্গুন সেবাশ্রম, রাঁচির যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং কলিকাতার 'সেবাপ্রতিষ্ঠান'। রেঙ্গুন সেবাশ্রমে রেডিয়াম ও এক্স-রে সাহায্যে ক্যান্সার-চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মিশনের তত্ত্বাবধানে ৭টি অন্তর্বিভাগযুক্ত হাসপাতালে মোট শয্যা-সংখ্যা (bed) ছিল ১,০৫২; ২৩,০৪২ রোগী ভরতি করা হয়। ৪৭টি বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়ে ২৫,৪৪,২৫৪ (পুরাতন-সহ) রোগী চিকিৎসিত হয়। বহির্বিভাগীয় চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে দিল্লী ও রাঁচিতে টি. বি. চিকিৎসা হয়; বোম্বাই, সালেম ও কানপুরে বহির্বিভাগের সহিত কতকগুলি শয্যা আপৎকালীন ব্যবস্থা-হিসাবে রাখা হইয়াছিল।

(৩) শিক্ষাঃ মিশন-পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মপ্রসার নিম্নলিখিত তালিকায় পরিস্ফুটঃ

প্রতিষ্ঠান	স্থান বা সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রী-সংখ্যা	
কলেজ	মাদ্রাজ	১,৯১১	
„ (আবাসিক—বেলুড়, নরেন্দ্রপুর)			
বি. টি. কলেজ	বেলুড়, কোয়েম্বাতুর	২১৬	
বেসিক ট্রেনিং স্কুল	২		১৭৯
বেসিক ট্রেনিং কলেজ (একটি পোস্ট গ্রাজুয়েট)		২৯২	৫৭
শারীর শিক্ষা কলেজ		৮০	
গ্রামীণ „ „		২০৮	
কৃষি „ „		৬২	
সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র	২	১৯৩	
ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল	৪	১,৩১২	
জুনিয়র টেকনি. স্কুল	৮	৬৪০	১৩৫
ছাত্রাবাস (অনাথাশ্রমসহ)	৭৪	৫,৯৮০	৪৮১
চতুষ্পাঠী	২	৩৮	
বহুমুখী বিদ্যালয়	১৩	৪,১৬৩	৭৬৯
উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৭	২,৪৫৫	১,২০৪
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৪	৫,৯৬৭	২,৭৫৪
সিনিয়র বেসিক ও মধ্য ইংরেজী	২৫	৫,৪৩৮	৩,২৮৪
জুনিয়র বেসিক ও প্রাথমিক	৪৪	৫,৬৫২	২,৬৩৬
নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয় ও অন্যান্য		১,২১৭	১,৩৯৮

কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ও রেঙ্গুন সেবাশ্রমে পরিষেবিকা-শিক্ষণের ব্যবস্থা (Nurses' Training Centre) আছে, আলোচ্য বর্ষে ১৩৯ শিক্ষার্থিনী শিক্ষালাভ করিয়াছে। ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে মোট ৩৫,৭৮৫ ছাত্র এবং ১৩,৯৭৮ ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

নিম্নলিখিত স্থানের শিক্ষা-বিস্তার-কেন্দ্রগুলি উল্লেখযোগ্য:

বেলুড়, বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর, মাদ্রাজ, রহড়া, চেরাপুঞ্জি, সরিষা, মনসাদ্বীপ, মেদিনীপুর, জামসেদপুর, আসানসোল, দেওঘর, পেরিয়া-নায়কেনপালায়ম্, কালিকট, কানপুর।

(৪) সাহায্য: প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে প্রদত্ত সাহায্য:

	পরিবার	ছাত্র	বিদ্যালয়
নিয়মিত:	১০৮	২৩২	
সাময়িক:	১৮৬	৮৫	২

এই জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৭,৪৪৭৲ টাকা। ইহা ছাড়া কয়েকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পরিবারকে যে সাহায্য দেওয়া হয়, তাহার পরিমাণ ৭,৬৯৫৲ টাকা।

(৫) কৃষ্টি ও সংস্কৃতি: মিশনের কেন্দ্রগুলি ভারতের কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক ভাব-বিস্তারের উপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের 'সর্ব ধর্ম সত্য' এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করেন।

জনসভা, আলোচনা-সভা, ক্লাস, পুস্তক-ও পত্রিকা-প্রকাশন প্রভৃতির দ্বারা বিভিন্ন ধর্মের সহিত সংযোগ স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগার, পাঠগৃহ ও চতুষ্পাঠীগুলি কৃষ্টিবিস্তারের সহায়ক। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা কৃষ্টি-প্রতিষ্ঠানের (Institute of Culture) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে কৃষ্টিগত সহযোগিতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছে।

*　　*　　*

বার্ষিক সভার কার্য শেষ হইলে অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ তাঁহার ভাষণে বলেন: আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে যে সেবাকার্য প্রতিষ্ঠিত—তাহাই উপাসনা।

সারদানন্দ-জন্মোৎসব

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি: গত ২২শে ডিসেম্বর 'উদ্বোধন'-ভবনে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের শুভ জন্মোৎসব পূর্ব-পূর্ব বৎসরের ন্যায় মহা উৎসাহে ও আনন্দে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভোগরাগ, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, পূজ্যপাদ মহারাজের পুণ্য জীবন আলোচনা, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। পূজ্যপাদ মহারাজের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হয়। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভক্তসমাগমে উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখর ছিল।

কল্পতরু-উৎসব

কাশীপুর উদ্যানবাটী: যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুআরি—ভক্তবৃন্দকে দিব্যভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া 'তোমাদের চৈতন্য হউক' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, সেখানে সেই ঘটনার পুণ্যস্মৃতিতে গত ১লা জানুআরি 'কল্পতরু-দিবস' উদ্‌যাপিত হয়। ঐ দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, কথকতা ও কালীকর্তন হয়। সহস্র সহস্র ভক্ত ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন এবং প্রায় ১৫,০০০ নরনারী প্রসাদ-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। অপরাহ্নে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ব্যাখ্যার পর স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও শুদ্ধসত্ত্বানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জীবন আলোচনা করেন। সভান্তে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী রামায়ণের 'শবরীর প্রতীক্ষা' পালা কথকতা করেন।

কাঁকুড়গাছি: যোগোদ্যানেও প্রতি বৎসরের ন্যায় 'কল্পতরু-দিবস' উপলক্ষে সারাদিন আনন্দোৎসব হয়। এতদুপলক্ষে পূজা, হোম, ভোগরাগ, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যোগোদ্যানে বহু ভক্তের সমাগম হয়।

স্বামী ত্রৈলোক্যানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী ত্রৈলোক্যানন্দ (দামোদরন্) গত ১৭ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে ৪২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ৬ই ডিসেম্বর কালিকট আশ্রমে তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হন এবং ১০ই ডিসেম্বর তাঁহাকে স্থানীয় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়। ১৫ই ডিসেম্বর তিনি সাধারণভাবে প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭ই ডিসেম্বর পুনরায় জ্বর বৃদ্ধি পায় এবং তাহাতেই তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

স্বামী ত্রৈলোক্যানন্দ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন; ১৯৫০ খৃঃ তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯৫৯ খৃঃ সন্ন্যাস লাভ করেন।

মালয়ালম্ ভাষায় স্বামীজীর গ্রন্থাবলী-প্রকাশ প্রধানতঃ তাঁহার প্রচেষ্টাতেই হইয়াছে। অল্প-বয়সে তাঁহার দেহত্যাগে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একজন উৎসাহী কর্মীর অভাব ঘটিল।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী

প্রদর্শনী ঃ কলিকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৬৩) হইতে প্রায় মাসাবধি স্বামীজীর জীবনী ও বাণী এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি-ও শিল্প-সম্পর্কিত একটি প্রদর্শনী চলিতে থাকে। প্রদর্শনীতে মাটি ও কাঠের তৈরী মূর্তি, ছবি ও পোস্টারের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ-শিষ্যগণের জীবন ও শিক্ষা যেভাবে পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র ভারত ও বহির্ভারত হইতে যোগদানকারী নরনারী-প্রতিনিধিদের এবং কলিকাতাবাসীদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান্, শিক্ষাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। স্বামীজীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদিও প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৬ই ডিসেম্বর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ও লোকসভার সভ্য শ্রীঅতুল্য ঘোষ। উদ্বোধনী বক্তৃতায় শ্রীঘোষ স্বামীজীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, স্বদেশপ্রীতি ও আদর্শ-নিষ্ঠার উল্লেখ করিয়া বলেন, যে-দেশে স্বামীজীর মতো মহাপুরুষের জন্ম, সে-দেশে হতাশার কোন কারণ নাই। সভাপতির ভাষণে বিচার-পতি শ্রী পি. বি. মুখার্জি বলেন, আত্মনির্ভরশীল, সুখী ও সমৃদ্ধ ভারত গঠনের জন্য দেশের শিল্প-উন্নয়নের প্রতি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া-ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিল্পের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ ও অনুরাগ আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা হইয়াছে। শতবার্ষিকীর সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ প্রারম্ভে স্বস্তি-বাচন উচ্চারণ করেন।

প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ এবং স্বল্পমূল্যের অন্যান্য শতবার্ষিকী প্রকাশন-পুস্তকগুলি বিক্রির জন্য রাখা হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (স্বরাষ্ট্র) প্রচার-বিভাগ কর্তৃক প্রযোজিত 'ডকুমেণ্টারী ফিল্ম' প্রত্যহ দেখানো হয়। প্রত্যহ অগণিত নরনারী ও বালক-বালিকা প্রদর্শনী দেখিতে যায়।

ছাত্র ছাত্রী সম্মেলন ঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতা পার্ক-সার্কাস ময়দানে ১৯শে ডিসেম্বর (১৯৬৩) হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন দিন ছাত্র-ছাত্রী-সম্মেলনে বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীর ধর্মবিশ্বাস, আত্মশক্তিতে আস্থা, দেশপ্রীতি ও সর্বোপরি তাঁহার মানবপ্রেমের মহৎ আদর্শের উল্লেখ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের এই মহাজীবন হইতে প্রেরণা-লাভ করিতে আহ্বান জানাইয়া বক্তৃতা করেন। ভারতের ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্র-ছাত্রী প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। স্বামীজীর জীবনী-আলোচনা, বাণীপাঠ, ভক্তি-মূলক গান, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্মেলন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়। বিচার-পতি পি. বি. মুখার্জি সমবেত সকলকে স্বাগত জানান। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্র-নাথ চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বলেন—স্বামীজীর বাণী ছাত্র-ছাত্রীদের উপলব্ধি করার চেষ্টা করিতে হইবে; তাঁহার বাণী আধ্যাত্মিকতার বাণী, এই বাণী স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশেও বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনের প্রথম দিনে সভাপতিত্ব করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী বি. বি. মালিক তাঁহার বক্তৃতায় ধর্মগুরু ও স্বদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের অবদান সম্বন্ধে বলেন। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রী পি. সি. ভি. মৌলিক।

বিভিন্ন দিনে ব্রহ্মচারী প্রেমচৈতন্য (জন ইয়েল), স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীনিমাই মুখোপাধ্যায়, লেডী ব্র্যাবোন কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী অলকা সিংহ রায়, রাঁচি ডেল্টনগঞ্জ কলেজের ছাত্র শ্রীরামেশ্বর প্রসাদ সিং, কামার-পুকুর রামকৃষ্ণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমানবেন্দ্র সাহা, শ্রীজগদীশ দত্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। নরেন্দ্রপুর ব্লাইণ্ড বয়েজ একাডেমির অন্ধ ছাত্র শ্রীস্বপন গুপ্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং শ্রীঅজয় দে স্বামীজীর রচনা হইতে আবৃত্তি করেন।

মহিলা-সম্মেলন ঃ গত ২৫শে ডিসেম্বর হইতে ২৮শে ডিসেম্বর চারদিন মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গোয়ালিয়রের মহারানী রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়া মহিলা সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বলেনঃ জাতীয় জীবন পুনর্গঠনের প্রয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর আলোকে সীতা-সাবিত্রীর আদর্শে ভারতীয় নারীদের চরিত্র গঠন করিতে হইবে এবং আচারে ও আচরণে উগ্র আধুনিকতা পরিহার করিতে হইবে। সত্যদ্রষ্টা স্বামীজী বলিয়াছেন, নারীজাতির মুক্তি ব্যতীত জাতির কল্যাণ সম্ভব নয়।

সভার প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীর বাণী পাঠ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী যতীশ্বরানন্দজী।

সভাপতি তাঁহার ভাষণে বলেনঃ স্বামীজী দেশের স্ত্রীজাতির সম্মুখে শ্রীশ্রীমায়ের আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। কল্যাণরূপা ভগিনী নিবেদিতার মাধ্যমে স্বামীজী দেশের নারীজাতি সম্পর্কে নিজ আদর্শকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন।

সভায় ডক্টর রমা চৌধুরী, সুইজারল্যাণ্ডের প্রতিনিধি ডক্টর মারিয়া বুর্গি এবং প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা নারী-জাতির উন্নয়নে স্বামীজীর চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে জাপান, মালয়েশিয়া, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে প্রায় তিন শতাধিক মহিলা প্রতিনিধি সহ ভারতের বিভিন্ন

অঞ্চলের দুই সহস্রাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন।

শ্রীসারদা মঠের ব্রহ্মচারিণীগণ বেদগান, প্রখ্যাতা শিল্পী শ্রীমতী যূথিকা রায় উদ্বোধন-ও সমাপ্তি-সঙ্গীত করেন। শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত উপসমিতির পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয় ২৬শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, বিকাল ৫টায়। এইদিন সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন শ্রীমতী রক্ষা-শরণ এবং ভাষণ দেন শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ, শ্রীমতী রেণুকা রায়, শ্রীমতী সরযূ বাল। সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'নারী-জাতির উপর ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের প্রভাব।' লেডী ব্র্যাবোর্ন কলেজের ছাত্রীগণ বেদগান করেন, শ্রীমতী উর্মিলা আগরওয়াল উদ্বোধন-সঙ্গীত এবং শ্রীমতী কল্পনা দে সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডক্টর ফুলরেণু গুহ।

২৭শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, বিকাল ৫টায় তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন সভানেত্রী মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'বর্তমান জগতে বেদান্ত' এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডক্টর রমা চৌধুরী, মাদাম মারিয়া বুর্গি, শ্রীমতী মণি সাহুকার, প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা।

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের ছাত্রীগণ বেদগান, শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন-সঙ্গীত এবং শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

২৮শে ডিসেম্বর, শনিবার, সকাল ৯টা এবং বিকাল ৫ টায় দুইবার অধিবেশন হয়। প্রথম অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জার্মানির মিসেস হিলডেগুড রুস্টন, শ্রীমতী রুক্মিণী আম্মল, শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, শ্রীমতী কে. আম্মা, শ্রীমতী মেনন, শ্রীমতী লীলালতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী রুক্মিণী কুপ্পাম্মা, শ্রীমতী উমা সাম্মথন, শ্রীমতী দেবকী সিংহ ও শ্রীমতী সাবিত্রী দত্ত। এই দিন আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী'। এই সভায় শ্রীসারদা মঠের অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বাণী পাঠ করা হয়। বেথুন কলেজের ছাত্রীগণ বেদগান, শ্রীমতী প্রতিভা কাপুর উদ্বোধন-ও সমাপ্তি-সঙ্গীত করেন এবং শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বৈকালীন সভায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন পশ্চিম-বঙ্গের মাননীয়া রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। তাঁহার লিখিত ভাষণ পাঠ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়। সভায় আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন মিসেস রুথ উইলসন (ভিয়েনা), মিস কুমিকো ইনু (জাপান), শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্ত, শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসার ও প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা। সমাগত প্রতিনিধিদের বিদায় অভিনন্দন জানান ডক্টর রমা চৌধুরী এবং শ্রীমতী অদিতি দে প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীসারদা মঠের ব্রহ্মচারিণীগণ বেদগান, শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র উদ্বোধন-সঙ্গীত এবং শ্রীমতী কল্পনা দে সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্রীমতী সরস্বতী গৌরীশঙ্কর কর্তৃক ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের পর চারিদিনব্যাপী মহিলা-সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। প্রতিটি সভায় সহস্রাধিক মহিলা যোগদান করিয়া এই সম্মেলনকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন

সঙ্গীত-সম্মেলন: ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩ হইতে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চার দিন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সঙ্গীত-সম্মেলন পার্ক-

সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের বিখ্যাত শিল্পিগণ উক্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী ডক্টর বি. গোপাল রেড্ডী সঙ্গীত-সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বলেন: স্বামী বিবেকানন্দ একজন সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতরসিক ও সঙ্গীতরচয়িতা ছিলেন। তাঁহার জন্মশতাব্দীতে সঙ্গীত-সম্মেলন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও উপযোগী হইয়াছে।

কণ্ঠ-ও যন্ত্র-সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন:

পণ্ডিত ওঁকারনাথ ঠাকুর (সুরাট), পণ্ডিত ভি. এন. পটবর্ধন (পুনা), শ্রীমতী হীরাবাঈ বর্দেকার (পুনা), শ্রীমতী প্রভা আত্রে (নাগপুর), শ্রীমতী সুনন্দা পট্টনায়ক (কটক), শ্রীমতী ইন্দিরাবাঈ খাদিলকর (পুনা), পণ্ডিত সীয়ারাম তেওয়ারী (পাটনা), ওস্তাদ মঃ দবির খাঁ, শ্রীদীনকর কাইকিনি (দিল্লী), লতাফত্ খাঁ (বোম্বাই), শ্রীপ্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রবিশঙ্কর (সেতার), ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ (সরোদ), পণ্ডিত গজানন রাও যোশী (বেহালা), নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার), স্বামী পার্বতীকর দত্তাত্রেয় (বীণা), শ্রীমতী শরণ রানী (সরোদ), নিখিল ঘোষ (তবলা), পান্তুর দেবদাস যোশী (বেহালা), বীরেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরী (বীণা), রামরাও পাশ্চওয়ার (জলতরঙ্গ), ডি. আর. নেরুনকর (তবলা), ইমরাত খাঁ (সেতার), শ্যামল বোস (তবলা), শঙ্কর ঘোষ (তবলা), রামনাথ মিশ্র (সারেঙ্গী), মহম্মদ সগিরুদ্দিন, মহেশপ্রসাদ মিশ্র, দিলীপ দাশ ও মহাপুরুষ মিশ্র প্রভৃতি।

ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন: পঙ্কজ কুমার মল্লিক, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, যূথিকা রায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা মিত্র।

বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন: স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩ হইতে ৫ই জানুআরি, ১৯৬৪ পর্যন্ত আট দিন কলিকাতা পার্ক সার্কাস ময়দানে নির্মিত বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপে বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০শে ডিসেম্বর হইতে প্রত্যহ দুইটি করিয়া অধিবেশন হয়—প্রাতঃকালে ৯ ঘটিকায় এবং অপরাহ্ণে। প্রাতঃকালীন অধিবেশনগুলি বসিত গোলপার্কস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব্ কালচার ভবনের বিবেকানন্দ-হলে এবং সান্ধ্য অধিবেশনগুলি পার্ক সার্কাস ময়দানের মণ্ডপে। প্রতিদিন অধিবেশনগুলির প্রারম্ভে গুরুগম্ভীর বৈদিক প্রার্থনা ও উদ্বোধন-সঙ্গীত এবং শেষে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও সমাপ্তি-সঙ্গীত হয়।

২৯শে ডিসেম্বর (১৯৬৩) রবিবার—অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় ধর্ম-মহাসম্মেলনের উদ্বোধন হয়। বৈদিক প্রার্থনা ও শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য কর্তৃক গীত উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহা-রাজের উদ্বোধন-অভিভাষণ পঠিত হয়। স্বামী মাধবানন্দজী তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে বলেন: আমরা বিশ্বের সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আজিকার হিংসায় উন্মত্ত বিশ্বকে ধর্ম-মহাসম্মেলনের মাধ্যমে প্রেম, সৌভ্রাত্র ও শান্তির বাণী শোনাইতে হইবে। তৎপর শতবার্ষিকী কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীপি. বি. মুখার্জি ধর্ম-সম্মেলনে পাশ্চাত্য জগতের বিভিন্ন দেশ, জাপান এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতে সমাগত প্রতিনিধিগণকে স্বাগত জানাইয়া বলেন: ধর্ম মনুষ্য-সভ্যতার বিরাট ঐতিহ্য বহন করিতেছে। মানুষের নিজ হৃদয়কে জানিবার ও আবিষ্কার করিবার পথই ধর্মের পথ। আমরা

যেন ধর্মের পথে অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে অমৃতে যাইতে পারি। সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দ্বারা বিদেশ হইতে ধর্ম-মহাসভায় যোগদানকারী প্রতিনিধিগণকে শ্রোতৃবর্গের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রেরিত বাণীগুলি পাঠ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন: শান্তি ও সর্বপ্রকার আত্মিক সৌন্দর্যের জন্য আজ যখন বিশ্ব উন্মুখ, তখন স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই ধর্ম-মহাসম্মেলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দেশ-বিদেশ হইতে আগত বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তাঁহাদের আনন্দ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং তাঁহার ভাষণে বিশ্বে শান্তি, শুভেচ্ছা, সৌভ্রাত্র ও ঐক্য-স্থাপনের অপরিহার্য নীতিরূপে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে সকলকে আহ্বান জানান। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীর সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ধন্যবাদ-জ্ঞাপক বক্তৃতা দেন। সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয়।

৩০শে ডিসেম্বর সোমবার প্রাতঃকালীন অধিবেশন হয় গোলপার্কস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচারের বিবেকানন্দ-হলে। সভাপতি: জার্মানির অধ্যাপক ডি. ডক্টর জর্জ ফোরের। বক্তা: কলিকাতার অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য (স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান মানবিক মূল্যবোধ) এবং কলিকাতার শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত (বিবেকানন্দের শিবজ্ঞানে জীবসেবাতত্ত্ব)। জার্মানির অধ্যাপক ডক্টর গুস্টভ মনশিং-লিখিত প্রবন্ধ (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আধুনিক জগতে ইহার মূল্য) এবং নিউইয়র্কের স্বামী পবিত্রানন্দ-লিখিত প্রবন্ধ (স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের ভবিষ্যৎ) পাঠ করা হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় সান্ধ্য অধিবেশন হয়। সভাপতি: পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধ্যক্ষ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বক্তা: আমেরিকা-হলিউডের মিঃ খৃষ্টফার ঈশারউড (স্বামী বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য জগৎ)। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, স্বামীজী পাশ্চাত্যকে ভারতের শাশ্বত ও সনাতন আধ্যাত্মিকতার সন্ধান দিয়াছেন। পাশ্চাত্যবাসীদের যদি কিছু হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা বিবেকানন্দেরই দান। অন্যান্য বক্তা ছিলেন—শিলং-এর মিস মার্গারেট বার (শিক্ষায় ধর্মের স্থান), হলিউডের ব্রহ্মচারী প্রেমচৈতন্য (আমেরিকাবাসীদের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ) এবং কাপ্তেন ভাগ সিং (শিখধর্ম)।

৩১শে ডিসেম্বর প্রাতে—সভাপতি: যুক্তরাষ্ট্রের মিন্নেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহাধ্যক্ষ ডক্টর এম. এম. উইল্লে। বক্তা: পুনার শ্রী সি. জি. কাশীকার (বৈদিক ধর্মে ক্রিয়াশীলতা), জার্মানির অধ্যাপক ডি. ডক্টর জর্জ ফোরের (প্রাচীন ক্যানানাইট ও বাইবেলের ইজরাইলী ধর্মে বিশ্বজনীন ভাব), কলিকাতার অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সর্বধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ) এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য সেন (ধর্ম ও রাজনীতি)। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়—সভাপতি: দক্ষিণ-ক্যালিফর্নিয়া-হলিউড বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন, বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা ক্রমশই বর্ধিত হইতেছে। সকল ধর্মেরই মূল কথা ব্রহ্মানুভূতি। ঈশ্বরকে জানা, তাঁহাকে অনুভব করাই ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মের পথ অনুসরণ করিয়া সকল পথেই ঈশ্বরকে জানিয়াছিলেন। কোন ধর্মের সহিতই কোন

ধর্মের বিরোধ নাই। বিরোধ গোঁড়ামির—কুসংস্কারের। সারা বিশ্বে একটি মাত্র ধর্ম প্রচলন করা সম্ভব নয়। বক্তা: ইজরাইলের অধ্যাপক আব্রাহাম এন. পোলিয়াক (আব্রাহামের ধর্ম—ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলামে হিন্দু প্রভাব), কলিকাতার অধ্যাপিকা ডক্টর রমা চৌধুরী (সকল ধর্মের মূলগত ঐক্য), বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী (স্বামী বিবেকানন্দ—একজন আধুনিক সন্ন্যাসী) এবং সুইজারল্যাণ্ডের ডক্টর মিসেস মারিয়া বুর্গ (পাশ্চাত্য চিন্তা ও স্বামী বিবেকানন্দ)। মিসেস বুর্গি তাঁহার ভাষণে বলেন, ভারতীয় মায়াবাদ যে ভ্রান্তি নয়, বিবেকানন্দ তাহা পশ্চিমী দার্শনিকদের কাছে প্রমাণ করিয়াছেন। বিবেকানন্দ ভারতের শাশ্বত প্রজ্ঞা ও প্রেমের আলোক-বর্তিকা হাতে লইয়া পশ্চিমে গিয়াছেন। গ্রীকদের মতো ভারতীয়েরা প্রধানতঃ ব্যাবহারিক জগতের বস্তু দ্বারা পরিচালিত হন নাই। সত্যানুসন্ধান ভারতীয় জীবনের বড় কথা।

১লা জানুআরি (১৯৬৪) প্রাতে—সভানেত্রী: সুইজারল্যাণ্ডের ডক্টর মিসেস মারিয়া বুর্গ। বক্তা: কলিকাতার অধ্যাপক হীরালাল চোপরা (ভারতে সুফীবাদ), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী (বিশ্বজনীন ধর্ম—ইহার ধারণা ও উপলব্ধি) এবং জাপানের মিঃ নিশীন উচীগাকী (স্বামী বিবেকানন্দকে আমি কি বুঝি)। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়—সভাপতি: খৃষ্টফার ঈশারউড। বক্তা: কলিকাতার অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (হিন্দু-ধর্ম), বারাণসীর ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ (বৌদ্ধ-ধর্ম), কলিকাতার অধ্যাপক ডি. পি. সেন (অধ্যাত্ম-অনুসন্ধানে দর্শনের ভূমিকা) এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর (ধর্মীয় বোঝা-পড়ায় স্বামী বিবেকানন্দের দান।

২রা জানুআরি বৃহস্পতিবার প্রাতে—সভাপতি: বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন নস্কো। বক্তা: জেকো-শ্লোভাকিয়ার ডক্টর মিরোশ্লেভ নোভাক (খৃষ্টধর্ম), বারাণসীর অধ্যাপিকা শোভারানী বসু (যেখানে হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদ এবং সুফী মতবাদের মিলন ঘটে), ডক্টর প্রফুল্লকুমার সরকার (স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-দর্শন ও ভাবধারা) এবং জাপান-কিয়োটোর অধ্যাপক হিদিও হৃদয়াকুমারা কিমুরা (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বিশ্বশান্তি)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব-লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায়—সভাপতি: বারাণসী গোবিন্দ মঠের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী কৃষ্ণানন্দ। সভাপতি তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে বেদান্তের মূলতত্ত্ব আলোচনা করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দকে ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মা—আত্মজ্ঞ মহাপুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। বক্তা: বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন নস্কো (খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম), বোম্বের অধ্যাপক এ আর ওয়াডিয়া (বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম), জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ই. আসিরোয়াথান, অধ্যক্ষ জে. সি. ব্যানার্জি এবং প্রব্রাজিকা আত্মপ্রাণা।

৩রা জানুআরি শুক্রবার প্রাতে—সভাপতি: বোম্বের মিসেস সোফিয়া ওয়াডিয়া। বক্তা: শিলং-এর শ্রীমতী লীলালতিকা ব্যানার্জি (উপনিষদ্ ও ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম), চণ্ডীগড়ের ডক্টর ইউ. সি. সরকার (বর্তমান পৃথিবীতে ধর্ম), কলিকাতার ব্রহ্মকুমারী কৃষ্ণা (ধর্ম কি বর্তমান সমস্যাসকলের সমাধান করিতে পারে?) এবং অধ্যাপক এম. চক্রবর্তী। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায়—সভাপতি: জেকোশ্লোভাকিয়ার ডক্টর মিরোশ্লেভ নোভাক। বক্তা: দিল্লীর ডক্টর এ. সি. বসু (বেদের মূল ভাবসমূহ),

কলিকাতার কাজি আব্দুল ওয়াদুদ (ইসলাম), জাপানের শ্রীকুমাও কানায়া (ভারত-জাপানের আধ্যাত্মিক সম্পর্ক) এবং কলিকাতার প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা।

৪ঠা জানুআরি শনিবার প্রাতে—সভাপতি: কলিকাতার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। বক্তা: জার্মানির মিস হিলট্রুড রুএস্টাউ (বিবেকানন্দ ও ম্যাক্সমূলার), কলিকাতার শ্রীক্ষিতীন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত (সত্যধর্মের দর্শন), নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের স্বামী নিখিলানন্দ (স্বামী বিবেকানন্দ—বিশ্বজনীন মানব) এবং কলিকাতার আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীবগলাকুমার মজুমদার। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায়—সভাপতি: আন্নামালাইনগরের ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আইয়ার। বক্তা: কলিকাতার স্বামী রঙ্গনাথানন্দ (স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়) বোম্বের মেজর বামজী (জরথুষ্ট্র-ধর্ম) এবং শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য (ধর্ম ও দর্শন: বর্তমান যুগে ঐক্য ও অনৈক্য কোথায়)।

৫ই জানুআরি রবিবার প্রাতে—সভাপতি: কলিকাতার মাননীয় বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র। বক্তা: কলিকাতার অধ্যাপিকা অরুণা মজুমদার (ধর্ম ও অতীন্দ্রিয়বাদ), কলিকাতার ডক্টর ডি. সি. সরকার (ভারতীয় পিতা-ঈশ্বর ও মাতা-ঈশ্বরী), ডক্টর জে. স্মিথ এবং গোরক্ষপুরের আচার্য সত্যদেব শাস্ত্রী। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায়—সভাপতি: নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ। তিনি তাঁহার ভাষণে বেদ-উপনিষদ্-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে বহু উদ্ধৃতির সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম শুধু উচ্চ অধ্যাত্মবাদই প্রচার করে নাই, ঐহিকতার—ব্যাবহারিক জগতে কল্যাণ-সাধনের কথাও বলিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের এই দুইটি দিকের কথাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রচার করিয়াছেন এবং ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্তের ব্যাপক প্রয়োগের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা এবং পাশ্চাত্যের ব্যাবহারিক কুশলতার সমন্বয়ই সর্বতোভাবে কল্যাণকর। বক্তা: কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার (বিবেকানন্দ ও বিশ্বজনীন ধর্ম), পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ (প্রত্যাদেশ ও উপলব্ধি) এবং পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় (বিবেকানন্দ)।

ধর্ম-মহাসম্মেলনের সান্ধ্য অধিবেশনগুলির পর প্রত্যহ শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য 'স্বামীজী', 'ভারত-বিবেকম্' (সংস্কৃত), 'রাণী রাসমণি', 'গুরু-শিষ্য-সংবাদ', 'মহা উদ্বোধন', 'নচিকেতা' প্রভৃতি নাটিকার অভিনয় এবং রামায়ণগান ও কীর্তন হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২রা ফাল্গুন (১৫.২.৬৪) শনিবার শুভ শুক্লা-দ্বিতীয়ায় বেলুড় মঠে ও অন্যত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, পাঠ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং পরদিবস রবিবার (১৬.২.৬৪) এতদুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।



কথাপ্রসঙ্গে

শুক্লা দ্বিতীয়ার ইঙ্গিত

অমানিশার অন্ধকারের পর পশ্চিম আকাশের কোণে শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ এক নূতন সৃষ্টির ইঙ্গিত বহিয়া আনে, এক নূতন আশার দীপশিখা জ্বালিয়া যায়। তাই আশাহীন ব্যক্তিগত জীবনে, মুমূর্ষু জাতির জীবনে শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ এত প্রিয়, এত আকাঙ্ক্ষিত। শূন্যতার মাঝেও সে এক পূর্ণতার আভাস!

ভারতের জাতীয় জীবনে যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘোরতম অমানিশা দৃষ্টি অন্ধ করিয়াছিল, গতি রুদ্ধ করিয়াছিল, তখন ধীরে ধীরে সেই সেই তমসা ছিন্ন করিয়া দেখা দিল ক্ষীণতম আশার আলো, ধর্ম জাতি ও ভাষার প্রাচীরে শতধা-বিভক্ত, জাতীয় জীবনে ঐক্যের অভাবে বারংবার-পরপদানত ভারতে দেখা দিল এক মহাসমন্বয়ের আদর্শ, যে সমন্বয়ের ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিতে পারে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী এক নূতন মহাজাতি। তাঁহারই ইঙ্গিত আমরা পাইয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ও সাধনায়—স্বামী বিবেকানন্দের দিগ্‌বিজয়ী বিশ্বপরিক্রমায়।

জাতীয় জীবনে আজ আবার আমরা এক সঙ্কট-মুহূর্তের সম্মুখীন হইয়াছি, ইহাকে অস্বীকার করিয়া কেহই অব্যাহতি পাইবে না। জাতীয় জীবনের এই রক্তক্ষয়ী মহাব্যাধিকে স্বীকার করিয়া যথাসম্ভব ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া রোগ নিবারণ করার শেষ চেষ্টা করিবার সময় আসিয়াছে। অবাস্তব আদর্শের শূন্য বুলি আওড়াইয়া এ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে না। নগ্ন সত্যকে স্বীকার করিয়া আজ প্রতীকার বা প্রতিরোধের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—এখানে যে শুধু এক ভাবের, এক ভাষার, এক ধর্মের একটি জাতি বাস করিবে—এ-কথা কেহ কখনও ভাবে নাই বা ভাবিতে পারে না। জোর করিয়া যে একত্ব বা একরূপতা আনয়ন করা হয়, তাহা মানুষের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করিয়া। তাই ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বরং বৈচিত্র্যের সাধনাকে উৎসাহিত করিয়া ভারত-মনীষা চিরদিন এক সমন্বয়ের সাধনা করিয়াছে। মাঝে মাঝে এই সাধনা স্তিমিত হইয়াছে, তখনই ভারতে অন্ধকার যুগ নামিয়া আসিয়াছে—তারপর এক মহামানবের সাধনার তরঙ্গে সমগ্র জাতি আন্দোলিত হইয়াছে। এই অন্তর্নিহিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া. শুধু বাহিরের ঘটনা-সংঘাত দেখিলে বা পাশ্চাত্যে প্রচলিত রীতি অনুসারে অধ্যয়ন করিলে ভারতের ইতিহাস চিরদুর্বোধ্য প্রহেলিকা হইয়া থাকিবে।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, ভারতে বহু ধর্ম ও সম্প্রদায় আছে। কিন্তু তাহার জন্য জাতীয় জীবন ব্যাহত হইবে কেন? যে-সব দেশে

একটি ধর্ম আছে, সেখানেও সম্প্রদায়ের অন্ত নাই, সম্প্রদায় তো মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তাস্বাধীনতার বিকাশের লক্ষণ। সম্প্রদায় থাকিবে, অথচ সাম্প্রদায়িকতা থাকিবে না—মানসিক স্তরের এমন এক সাধনাই আজ আমাদের একান্ত প্রয়োজন।

রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বলিয়া আমরা গর্ব ও গৌরব অনুভব করি; 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ ধর্মকে অস্বীকার করা নয়, ধর্মমত-নিরপেক্ষ হওয়া। তবে দুঃখের বিষয় বহু রাজনীতিক মনে করেন, সংখ্যালঘুর পক্ষপাতী হওয়া দোষের নয়, বরং গুণের। কিন্তু আদর্শের দিক দিয়া ইহা ক্ষতিকর, ইহাও একপ্রকার প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা। ইহাতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রশ্রয় পায়, এবং প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা ব্যাহত হয়।

রাষ্ট্রকে যথার্থভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মমত-নিরপেক্ষ করিতে পারিলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ জাতীয় জীবনকে কলুষিত করিতে পারে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বার্থপূর্ণ নির্বাচনী দ্বন্দ্বে সহজে জয় লাভ কারবার জন্য সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে নিয়োজিত করা হয়, এবং এইখানেই আমাদের জাতীয় জীবনে নূতন ফাটল ধরিয়াছে!

এখন প্রশ্ন: রাষ্ট্রকে যথার্থভাবে ধর্মনিরপেক্ষ করা যায় কি উপায়ে? ইহার সহজ ও সরল পথ—প্রথমে নিজ নিজ ধর্ম আচরণ করা, দ্বিতীয়—অপরের ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করা, এবং কোন ধর্মমতের নিন্দা না করা। শ্রীরামকৃষ্ণের সুদীর্ঘ সাধনাময় জীবন হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে, সকল ধর্মই সত্য, সকল ধর্মই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হইয়াছে, সকল ধর্মের মূলনীতি এক; তবে দেশ-কাল ভেদে তাহাদের প্রকাশভঙ্গী পৃথক্, আচার-অনুষ্ঠান পৃথক্। এই মূলনীতি স্বীকার করিলে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়ের অনুভূতিই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দৃঢ়ভিত্তি।

বিশাল দেশ ভারতবর্ষে বহু ধর্মমত উদ্ভূত হইয়াছে, একই ধর্মের মধ্যে বহু সম্প্রদায় দেখা দিয়াছে, বাহির হইতেও একাধিক ধর্ম ভারতে আসিয়াছে; সকলেই ভারতের বক্ষে আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

সকল ধর্মই প্রচার করে ঈশ্বরের বাণী এবং বলে—শান্তিই তাহাদের লক্ষ্য। অথচ শেষ পর্যন্ত যখন দেখা যায়—শান্তির নামে অশান্তি হইতেছে, ধর্মের নামে হত্যালুণ্ঠন হইতেছে, পুণ্যের নামে অগ্নিসংযোগাদি পাপানুষ্ঠান হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, গোড়ায় কোথাও গলদ ঢুকিয়াছে। ঐ প্রকার কাজকর্ম কখনই ধর্ম নহে বা কোন ধর্মের অনুমোদিত নহে। ঈশ্বরের পুণ্যনামের সহিত পরপীড়ন-মূলক ঐ সকল কাজ যুক্ত করা ঘোরতর পাপ, এই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ঈশ্বরীয় বিধানে ঐ সকল পাপকারী নিজ নিজ ধ্বংসেরই পথ প্রস্তুত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

পরিশেষে জাতির এই দুর্দিনে আমরা মানুষের শুভবুদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি। আধুনিকতার মোহে এবং তথাকথিত বিশ্বের জনমতের মোহে আমরা যেন আর আবিষ্ট না থাকি। 'বিশ্বজনমত' বলিয়া কিছু আছে কিনা, এবং 'আধুনিক সভ্যতা' মানুষকে ক্রমশঃ সভ্য করিতেছে, না বন্যজন্তু অপেক্ষা হিংস্র ও হৃদয়হীন করিতেছে, তাহাও আজ ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। রাজনীতি-অর্থনীতি-মূলক এই 'আধুনিক সভ্যতা'কে আধ্যাত্মিক ভাবমণ্ডিত—যথার্থ ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত করিতে না পারিলে অবশিষ্ট মানুষকে শীঘ্রই আবার অরণ্যে গুহায় ফিরিয়া যাইতে হইবে।

যথার্থ ধর্মভাব বলিতে এই বুঝি: জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মানুষকে 'মানুষ' বলিয়া বোধ করা, স্বীকার করা। তাহার পূর্বে নিজের মধ্যে মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, পশুসুলভ হিংসাদ্বেষ স্বার্থদ্বন্দ্বের ভাব জয় করিয়া প্রেমপ্রীতি সহানুভূতি ও সহযোগিতার ভাব অনুশীলন করিতে হইবে।

শুক্লা দ্বিতীয়া মানুষের মধ্যে সেই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করুক, মানুষকে পূর্ণমানবতালাভে উদ্বুদ্ধ করুক।

সারদা-রামকৃষ্ণ

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

শিবরঞ্জনী—ঝাঁপতাল

স্বরলিপি : সঙ্গীতবিশারদ শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার নাথ

সারদা-রামকৃষ্ণ নামে এলে নেমে ধরাতলে।
(তুমি) এক হয়ে মা দুই নামেতে দুইটি রূপে দেখা দিলে ॥
রামকৃষ্ণ-নাম শুনিলে যাও মা তুমি আপন ভুলে।
(আবার) ঠাকুর আমার মা-নামেতে মহানন্দে পড়ে ঢলে ॥
যাঁরে তুমি কর পূজা গুরু ইষ্ট প্রভু ব'লে,
সেই যে তোমায় পূজে গো মা লয়ে জবা বিল্বদলে
নব যুগে নতুন খেলা ভূতলে আনন্দ মেলা
(তুই) দেখ চেয়ে মন থাকতে বেলা হেসে খেলে যাবি চলে ॥

	+			২				০			৩			
II	সা	রা	I	জ্ঞা	পা	পা	I	ধা	র্সা	I	ধর্সা	ধর্সা	ধপা	I
	সা	র		দা	০	রাম		কৃ	ষ্ণ		না০	মে০	০০	
	পধা	পা	I	জ্ঞা	জ্ঞরা	সা	I	সরা	সা	I	ধ্‌সা	ধ্‌সা	—	II
	এ	লে		নে	মে০	০		ধ০	রা		ত	লে০	০	
	সা	জ্ঞা	I	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞরসা	I	সরা	রজ্ঞা	I	রা	সা	সা	I
	এ	ক		হ	য়ে	মা০০		দুই	না০		মে	০	তে	
	সা	রা	I	জ্ঞা	পা	পজ্ঞা	I	জ্ঞরা	রসা	I	ধ্‌সা	ধ্‌সা	--	II
	দুই	টি		রূ	০	পে০		দে০	খা০		দি০	লে০	০	
	জ্ঞা	পা	I	জ্ঞা	পা	পা	I	ধর্সা	ধর্সা	I	ধা	পা	প	I
	রা	ম		কৃ	০	ষ্ণ		নাম	শু০		নি	০	লে	
	পা	ধা	I	র্সা	র্রা	র্রা	I	র্সর্রা	র্সর্জ্ঞা	I	র	—	র।	I
	যাও	মা		তু	০	মি		আ০	প০ন		ভু	০	লে	
	র্সর্রা	র্সর্র্সা	I	ধা	পা	পা	I	পধা	পা	I	জ্ঞা	রা	সা	I
	ঠা০	কু০র		আ	০	মার		মা০	না		মে	০	তে	
	সা	রা	I	জ্ঞা	পা	পজ্ঞা	I	জ্ঞরা	রসা	I	ধ্‌সা	ধ্‌সা	—	II
	ম	হা		ন	০	ন্দে০		প০	ড়ে০		ঢ০	লে০	০	
	সা	সজ্ঞা	I	জ্ঞা	—	জ্ঞরসা	I	সরা	রজ্ঞা	I	রা	রা	সা	I
	যাঁ	রে০		তু	০	মি০০		ক০	র০		পূ	০	জা	
	সা	রা	I	জ্ঞা	পা	পা	I	ধা	ধর্সা	I	ধর্সা	ধর্সা	ধপা	I
	গু	রু		ই	০	ষ্ট		প্র	ভু০		ব০	লে০	০০	

পধা	পা	I	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	I	রজ্ঞা	রজ্ঞা	I	রা	রা	সা	I
সেই	যে		তো	০	মায়		পূ০	জে০		গো	০	মা	
সা	রা	I	জ্ঞা	পা	পজ্ঞা	I	জ্ঞা	রসা	I	ধ্‌সা	ধ্‌সা	—	I
ল	যে		জ	০	বা০		বি	স্ব০		দ	লে০	০	
পা	পা	I	ধা	র্সা	র্সা	I	ধা	ধর্সা	I	র্সা	র্সা	র্সা	I
ন	ব		যু	০	গে		ন	তুন		খে	০	লা	
পা	ধা	I	র্সা	র্রা	র্রা	I	র্রা	র্সর্রজ্ঞা	I	র্রা	—	র্রা	I
ভু	ত		লে	০	আ		ন	ন্দ০০		মে	০	লা	
র্সার্রা	র্সা	I	ধা	পা	পা	I	পধা	পা	I	জ্ঞা	রা	সা	I
দেখ	চে		য়ে	০	মন		থাক	তে		বে	০	লা	
সা	রা	I	জ্ঞা	পা	পজ্ঞা	I	জ্ঞরা	সা	I	ধ্‌সা	ধ্‌সা	—	I
হে	সে		খে	০	লে০		যা০	বি		চ০	লে০	০	

সর্বধর্ম-সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ*

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ কেবল সর্বধর্মের সমন্বয়ের উপদেশই দেন নাই, তাঁহাদের জীবনেই সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী সাধনাকালে বিভিন্ন ধর্মের সাধনা করেন এবং প্রত্যেক ধর্মের সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ করা যায় অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন করা যায়, তাহা প্রতিপন্ন করেন। তাঁহার সাধনালব্ধ অনুভূতির মূলে তিনি সর্বধর্মের ঐক্যের ও সমন্বয়ের উপদেশ করেন। কিন্তু তিনি যে যুগে তাঁহার সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন, ধর্মের ইতিহাসে সে-যুগে ভারতে ও তথা পৃথিবীতে ধর্মের দ্বন্দ্ব ও কলহ অতি ভীষণাকার ধারণ করিয়াছিল। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহার ধর্মমতই সত্য ও মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, পরন্তু অন্য সকল ধর্মমত ভ্রান্ত এবং অন্যধর্মাবলম্বীরা কোন কালেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, তাহাদের অনন্তকাল নরকে বাস করিতে হইবে। প্রথমতঃ নির্গুণ ও নিরাকার-ব্রহ্মোপাসক এবং সগুণ ও সাকার-ঈশ্বরোপাসকদের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। নিরাকারবাদীর মতে—নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ও পরমতত্ত্ব; সগুণ ও সাকার ঈশ্বর ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে স্বীকার্য হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৎ বা সত্য নহেন, তিনি ব্রহ্মের মায়িক বা কল্পিত রূপমাত্র। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ রূপ আকার ও গুণবর্জিত। তাহাতে রূপ ও গুণের কল্পনা ভ্রান্ত ও অজ্ঞানপ্রসূত। সাকার-উপাসনা দ্বারা পরমার্থ বা মোক্ষ লাভ হয় না, ইহা সংসারে বন্ধনেরই কারণ হয়। অপর পক্ষে সাকারবাদীর মতে—নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া কিছু নাই, সকল তত্ত্বই সগুণ ও সাকার; কোন বস্তুই নির্গুণ ও নিরাকার হইতে পারে না, এইরূপ

* গত ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতা ধর্মসম্মেলনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধ অবলম্বনে।

নিরাকারের কোন ধারণা বা চিন্তা করাও সম্ভবপর নহে। তারপর সাকারবাদীদের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবল মতভেদ ও দ্বন্দ্ব-কলহ দেখা যায়। কেহ বলেন, বিষ্ণুই পরমেশ্বর , কেহ বলেন শিব, কেহ বলেন কৃষ্ণ। আবার কেহ বলেন কালী, কেহ বলেন দুর্গা পরমা দেবী—পরমেশ্বরী, বিষ্ণু শিব বা কৃষ্ণ ইঁহারা নগণ্য, দেবতাপদবাচ্যই নহেন। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা, বিদ্বেষ ও বৈরভাব পোষণ করিতেন। পরিশেষে দেখা যায় হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের দ্বন্দ্ব ও কলহ, বিদ্বেষ ও বৈরিতা ধর্মের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে ও করিতেছে।

ধর্মজগতের ইতিহাসের এই সঙ্কটময় যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনালব্ধ অনুভূতির মূলে সর্বধর্মের ঐক্য ও সমন্বয়ের বাণী প্রকাশ করেন। তৎপরে তাঁহার বিশ্ববরেণ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সেই বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন যে, দেবদেবীর প্রতিমা ও প্রতীক পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া নিরাকার-ব্রহ্মোপাসনা পর্যন্ত সকল ধর্মমতই সত্য এবং যে-কোন মত অনুসরণ করিয়াই ঈশ্বরলাভ করা যায়। এখানে কোন গর্বিত বুদ্ধিবাদী হয়তো বলিবেন যে, প্রতিমা-পূজা ভ্রান্ত ও অজ্ঞান ব্যক্তির কর্ম, ইহা পুতুল-পূজার সামিল। কারণ ঈশ্বর অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপী, তিনি কখন কোন ক্ষুদ্র প্রতিমাতে সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না। কিন্তু বুদ্ধিবাদী জানে না যে, প্রতিমা-পূজা পুতুল-পূজা নয়। প্রতিমা-পূজাতে মাটি বা কোন ধাতুনির্মিত মূর্তির পূজা করা হয় না, প্রতিমাতে কোন দেবতাকে আহ্বানপূর্বক ও তাঁহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই দেবতারই পূজা করা হয়। আর যদি মাটির প্রতিমাকে দেবতার প্রতীকরূপেই পূজা করা হয়, তাহাতেও দোষ হয় না, কারণ যাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যানধারণা করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ প্রতীক-পূজার বিশেষ উপযোগিতা আছে। আরও এক কথা, প্রতিমা-পূজা যদি ভ্রান্তই হয়, ভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি জানেন যে, প্রতিমার মাধ্যমে তাঁহারই পূজা করা হইতেছে। যদি তাহাতে কোন ভুল হয়, আবশ্যক হইলে তিনিই ভুল সংশোধন করিবেন, সেজন্য বুদ্ধিবাদীর কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রতিমা-পূজা ভ্রান্ত নয়। ভগবান্ যদি সর্বব্যাপী হন, তবে তিনি যেমন মানুষের মধ্যে আছেন, তেমনি প্রতিমাতেও আছেন—বলিতে হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "প্রতিমা-পূজাতে দোষ কি? বেদান্ত বলে, যেখানে 'অস্তি, ভাতি আর প্রিয়', সেখানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তিনি ছাড়া কোন জিনিস নাই।" অদ্বৈত বেদান্ত-মতে ব্রহ্ম সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ বা অস্তিমাত্র, চিৎ বা প্রকাশস্বরূপ এবং আনন্দ বা প্রিয়ভাবরূপ। অতএব যাহাতে অস্তি, ভাতি ও প্রিয়—এই তিনটি লক্ষণ আছে, তাহাতেই তিনি আছেন। সর্ববস্তুতেই এই তিন লক্ষণ থাকায় ব্রহ্ম সর্ববস্তুতেই আছেন, বলিতে হইবে। এ-সব লক্ষণ প্রতিমাতেও আছে। সুতরাং প্রতিমাতেও তিনি আছেন, ইহা স্বীকার্য। এই ভাবে দেখা যায়, প্রতিমা-পূজা ভ্রান্ত নয়। স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, 'কেহ কেহ প্রতিমা গড়িয়াও দ্রব্যযজ্ঞ করিয়া ঈশ্বরের পূজা করেন, এগুলি আমাদের নিকট ঈশ্বরারাধনার স্থূল ও ও অসংস্কৃত পদ্ধতি বলিয়া প্রতিভাত হইলেও এরূপ পূজা ভ্রান্ত নয়, এ-সব সত্য ও যথার্থ পূজা, সত্য পূজারই বিভিন্ন স্তর, নিম্নস্তর হইতে উচ্চ স্তরে গমনমাত্র।' অতএব প্রতিমা-পূজা যে ঈশ্বরেরই পূজা, তাহা স্বীকার্য।

সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বেদান্তধর্মেরও সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তিনি এই সকল ধর্ম সাধন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন—শিব, শক্তি, বিষ্ণু ও ব্রহ্ম একই পরম তত্ত্বের বিভিন্ন নাম ও রূপ-মাত্র। পরমেশ্বর তাঁহার বিভিন্ন ভক্তের নিকট বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন, যে ভক্ত বা সাধক যে রূপটি ভালবাসে, তিনি তাহার নিকট সেই রূপেই আবির্ভূত হন। আমাদের বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রেও এই কথা আছে। বেদে বলা হইয়াছে—'এক সৎ বা তত্ত্বকে বিপ্রগণ অর্থাৎ ব্যক্তিরা বিবিধ নামে অভিহিত করিয়াছেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'কারু উপর বিদ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি, --সব একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে, সেই ধন্য।' তিনি আরও বলিয়াছেন, 'শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্তমত সবই সেই এককে ল'য়ে। যিনি নিরাকার তিনিই সাকার, তাঁরই নানারূপ। বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা আছে, পুরাণেও তাঁরি কথা। সেই এক —সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। বেদে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ শিব। পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণব শাস্ত্রেও আছে,—কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।' অতএব শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিদ্বেষ-ভাব থাকা উচিত নয়, বরং তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ও মৈত্রী-ভাবাপন্ন হওয়া কর্তব্য।

তারপর বেদান্তধর্মের অন্তর্গত অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল মতভেদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা যায়। অদ্বৈত-মতে পরম ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, সকল নাম-রূপ-বর্জিত। ব্রহ্ম ও জীবাত্মা স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন, তাহাদের ভেদজ্ঞান অজ্ঞান বা অবিদ্যা-কল্পিত। আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব-বিষয়ক বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান অর্থাৎ একত্ব উপলব্ধি হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি এবং মোক্ষ লাভ হয়। বৈদিক কর্ম বা ঈশ্বরে ভক্তি দ্বারা মুক্তি লাভ না হইয়া সংসারে বন্ধনই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সগুণ ও সাকার তত্ত্ব, সর্ব কল্যাণগুণের আধার, তিনি অনন্তজ্ঞানগুণ-যুক্ত। জীবাত্মা তাঁহার অংশমাত্র, তাঁহা হইতে ভিন্ন। ক্ষুদ্র ও সান্ত জীবাত্মা কখন ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন হইতে পারে না। ভক্তির দ্বারাই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ও মুক্তিলাভ হয়, কেবল শাস্ত্র বা বেদান্ত-বাক্যের জ্ঞান দ্বারা অথবা কর্ম দ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ও মুক্তিলাভ হয় না। অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞান ও কর্মানুষ্ঠান ভক্তির সহায়করূপে জীবের করণীয়। কিন্তু শেষকালে একমাত্র ঈশ্বরে ভক্তি ও শরণাগতি দ্বারাই জীবাত্মা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তাঁহাদের জীবনে ও উপদেশে অদ্বৈত, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত-ধর্মের সমন্বয় করিয়াছেন এবং কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের মিলন ঘটাইয়াছেন। তাঁহারা অদ্বৈতবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অদ্বৈতবাদ দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিরোধী নয়, বরং ইহাদের সহিত মিলিত ও ঐক্যসূত্রে সম্বদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন, 'ব্রহ্ম সগুণও বটেন, নির্গুণও বটেন, আবার সগুণ-নির্গুণের অতীতও বটেন। তিনি সাকার, আবার নিরাকার। যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ম করেন, তখন তাঁহাকে শক্তি, কালী বা সগুণ ঈশ্বর বলা যায়। আবার যখন তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কোন কর্ম করেন না, তখন তাঁহাকে

নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হয়। কালী ও ব্রহ্ম একই তত্ত্ব, অভিন্ন সত্তা। নিত্যরূপে যিনি ব্রহ্ম, লীলারূপে তিনিই কালী, যেমন জল স্থির থাকলেও জল, আর হেললে দুললেও জল' অদ্বৈতবাদী যাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করেন, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তাঁহাকেই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপে সাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন! স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন যে, 'ঈশ্বরকে এককালেই সগুণ ও নির্গুণ বলা যায়, নির্গুণ তত্ত্ব—এক জীবন্ত তত্ত্ব। মানুষকেও একইকালে সগুণ ও নির্গুণ বলা যায়। শুদ্ধ আত্মারূপে মানুষ নির্গুণ ও অপৌরুষেয় তত্ত্ব, কিন্তু দেহবিশিষ্ট জীবরূপে মানুষ একটি পুরুষ বা ব্যক্তি। অতএব অদ্বৈতবাদের সহিত দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিরোধ নাই, বরং মিলনই আছে। অদ্বৈতবাদে দ্বৈত ও অন্য সব পূর্ববর্তী মতবাদ সাগ্রহে ও শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ, অদ্বৈতবাদী বিশ্বাস করেন—এইসব মতবাদও সত্য, একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র, অদ্বৈতবাদ অনুসরণ করিয়া যে সত্যে বা তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, এইসব মতবাদ অনুসরণ করিয়াও তাহাই লাভ করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগ এই চারিটি মোক্ষমার্গেরও সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ করিয়াছেন: জ্ঞানীরা যাঁকে 'ব্রহ্ম' বলে, যোগীরা তাঁকেই 'আত্মা' বলে, ভক্তেরা তাঁকেই 'ভগবান্' বলে। কিন্তু একই বস্তু, নাম ভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম; যোগীর পরমাত্মা; ভক্তের ভগবান্। জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সব মার্গই সাধককে পরমার্থ ও মোক্ষ-লাভে সমর্থ করে। নিষ্কাম কর্মমার্গ অনুসরণ করিলেও সাধক ইহা লাভ করিতে পারেন। এইসব মার্গ ভিন্ন হইলেও ইহাদের লক্ষ্য একই। যেমন বিভিন্ন পথ দিয়া একই গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো যায়, তেমনি জ্ঞান, কর্ম ভক্তি ও যোগ—বিভিন্ন মার্গ অনুসরণ করিয়া একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে তাঁহাকে লাভ করিবার বিভিন্ন পথ সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন মা তাঁহার সন্তানদের রুচি ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করেন।

স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মপথের নির্দেশ থাকা উচিত। যোগ্যতা বিচার না করিয়া সকলের জন্য একই মত ও পথ নির্দেশ করিলে অনেকের ধর্মজীবন ক্ষুণ্ণ বা ব্যর্থ হইয়া যাইতে পারে। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগমার্গের এক একটি এক এক শ্রেণীর লোকের উপযোগী। কাহারও জন্য জ্ঞান, কাহারও জন্য কর্ম, কাহারও জন্য ভক্তি, কাহারও জন্য বা যোগমার্গের নির্দেশ করা কর্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দ আরও বলিয়াছেন যে, আদর্শ ধর্মমার্গে এই চারিটি মার্গেরই মিলন ও সমন্বয় সাধন করা উচিত। তিনি এমন একটি আদর্শ ধর্মপথ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, যাহা জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত ও যোগীর সমভাবে আদরণীয় ও অনুসরণীয় হইবে তাঁহার আদর্শ ধর্মপথ জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের মিলন ও সমন্বয়ের পথ। ইহা তাঁহার অভিলষিত আদর্শ ধর্মপথ হইলেও তিনি উপদেশ করিয়াছেন যে, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগের যে-কোন একটি পথ আন্তরিক ও নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিলে ধর্মজীবনে সিদ্ধি লাভ করা যায়। তিনি বলিয়াছেন—'আমাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। কর্মমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ—ইহাদের যে-কোন একটি মার্গ,

অথবা একাধিক মার্গ অথবা সকল মার্গ অনুসরণ করিয়া এই উদ্দেশ্য সাধন কর---মুক্তিলাভ কর।'

পৃথিবীর ইতিহাসে হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের দ্বন্দ্বকলহ বহুকাল হইতে চলিতেছে। তাহার অবসান করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী একান্ত প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন এইসব এবং অন্যান্য ধর্মে একই ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। "তিনি একই; কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা'; কেউ বলছে 'গড্'; কেউ বলছে 'ব্রহ্ম'; কেউ বলছে 'কালী'; কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা। যেমন জল, ওয়াটার, পানি। একই বস্তুকে হিন্দুরা বলে 'জল', ইংরাজেরা বলে 'ওয়াটার', মুসলমানেরা বলে 'পানি'।" তিনি আরও বলিয়াছেন, 'হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান,—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায়ই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাব রক্ষা ক'রে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে ভগবান্ লাভ হবে। এ-কথা বোলো না—আমারই পথ সত্য, আর সব মিথ্যা—ভুল। সব পথই সত্য, যত মত তত পথ।' শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মের সাধনা করিয়া ইহা দেখাইয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সর্বধর্ম-সমন্বয়-বিষয়ে উপদেশাবলীতে শ্রীরামকৃষ্ণের কথার দার্শনিক ব্যাখ্যা ও সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন: 'হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রয়োজন সাধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছে। এক একটি ধর্মের এক একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এক একটি আদর্শ ও সদ্‌গুণ আছে। যতকাল কোন ধর্ম উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিবে, ততকাল উহা সজীব ও সগৌরবে বর্তমানে থাকিবে। এই সব ধর্ম যে আজও বাঁচিয়া আছে, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, ইহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহাদের প্রাণশক্তি অটুট আছে। ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কোন জাতিগত ভেদ-বিভাগ নাই, ইঁহারা সকলেই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ। তবে ইসলাম পৃথিবীতে শুধু মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বই প্রচার করিয়াছে। হিন্দুধর্মের আদর্শ আধ্যাত্মিকতা, ত্যাগ ও সেবা। এ ধর্মে মানুষকে তাহার আধ্যাত্মিক সত্তায় অর্থাৎ জড়াতিরিক্ত চেতন আত্মায় বিশ্বাস করিতে শিখাইয়াছে। ইহা আরও শিখাইয়াছে যে, ঈশ্বরকে অন্তর্যামী-রূপে নিজ আত্মায় উপলব্ধি করিতে হইবে, কোন সুদূর দেশে বা স্বর্গে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে না। এই ধর্মে মানুষকে স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া সর্বলোকহিতে কর্ম করিতে শিক্ষা দিয়াছে। এই সব আদর্শ যত দিন জীবিত থাকিবে, তত দিন হিন্দুধর্মও জীবিত থাকিবে। খ্রীষ্টান ধর্মে মানুষকে পবিত্রতা, ঈশ্বরোপাসনা এবং স্বর্গরাজ্যের আগমন-প্রতীক্ষায় প্রস্তুত থাকিতে শিক্ষা দিয়াছে। যত কাল খ্রীষ্টানরা এই আদর্শ অনুসরণ করিবেন, তত কাল তাঁহাদের ধর্ম জীবিত থাকিবে। অতএব আমাদিগকে অন্য ধর্মের প্রতি কেবল সহনশীল না হইয়া সহানুভূতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাবান্ হইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ আরও বলিয়াছেন, 'আমি অতীতকালের সকল ধর্মই মান্য করি, সকল ধর্মমত অনুসারে ঈশ্বরের পূজা করি। ভবিষ্যতে যে-সব ধর্মের আবির্ভাব হইবে, সে-সব ধর্মও মান্য করিব, কারণ ধর্মের ইতিহাস ঈশ্বরের আত্মপ্রকাশের ইতিহাস, সে ইতিহাস এখনও শেষ হয় নাই।' শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী জগদ্বাসী শ্রবণ করিলে এবং তাঁহাদের উপদিষ্ট সমন্বয়ধর্ম আচরণ করিলে পৃথিবীতে ধর্মদ্বন্দ্বের অবসান হইবে, ধর্মজগতে শান্তি ও মৈত্রী বিরাজ করিবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মরণে

শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ

বর্ষে বর্ষে আমরা যুগগুরু ও মানবগুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করিয়া আসিতেছি। এই স্মৃতি-পূজার মাধ্যমে দেশে দেশে বিশ্বমানবের সম্মুখে তাঁহার উপলব্ধ এবং আচরিত মহান্ ধর্মাদর্শের মৃত্যুঞ্জয় মহিমাকে নবতর ঔজ্জ্বল্যে বিভাসিত করা হইতেছে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আদর্শ-সংঘাতের ডমরু-নিনাদের মধ্যে তাঁহার আবির্ভাব ; ফলে সর্বতোমুখী মানব-ধর্মকে তিনি যে সর্বজনীন পূর্ণতার রত্নবেদীতে স্থাপন করিলেন, তাহার নিত্য নূতন আলোক-রশ্মি ভবিষ্যতের প্রহরে প্রহরে মানবোৎকর্ষের নব নব অধ্যায় রচনা করিতে থাকিবে।

শ্রীঅরবিন্দ বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে বলিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে যে সাধনা আরম্ভ হইয়াছিল, কর্মক্ষেত্রে তাহার যে সম্যক্ রূপায়ণ হয় নাই শুধু তাহা নহে, সেই সাধনার নিগূঢ় মর্মবার্তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হইল না। অর্ধশতাব্দীর পরেও আজ সেই কথার জলন্ত সজীবতা চিন্তাশীল মানবমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বস্তুবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কারসমূহ দুইটি রক্তপঙ্কিল মহাযুদ্ধের বিভীষিকার মধ্য দিয়া মানবজাতিকে এখনও এই চেতনায় জাগ্রত করিতে পারিল না যে, মানবপ্রকৃতির উদ্দামতাকে শৃঙ্খলিত করিবার পূর্বে বিশ্বপ্রকৃতির উপর মানববুদ্ধির তথাকথিত বিজয় সভ্যতার আত্মহত্যার কারণীভূত হইতে পারে। আত্মজয়ের রহস্যের সহিত এই যে নিদারুণ অপরিচয়, তাহাই আজ আধুনিক মানবের তথাকথিত 'উন্নতি'র বজ্রনির্ঘোষের মধ্যেও মানুষকে এত অসহায়তার পঙ্কস্তরে নিমজ্জিত করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানুষের এই মর্ত্যজীবনের দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্যেও সেই আত্মজয়ের অমোঘ সত্যামৃতকে স্বকীয় অলৌকিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রস্ফুরিত করিয়া অস্খলিত আচরণের ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে কঠোর তপস্যার দ্বারা সূর্যালোকের মতো প্রকটিত করিলেন। এই কারণেই মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো পাশ্চাত্য-ভাবধারানিষিক্ত চিকিৎসক, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মতো যুক্তিবাদে অভ্যস্ত প্রথিতকীর্তি ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক, গিরিশচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবান্ অভিনেতা-নাট্যকার চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ-খণ্ডের মতো তাঁহারই পূত স্নিগ্ধ পরিমণ্ডলে ভিড় জমাইয়া বসিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি তৎকালীন মনীষী সাধক ও কর্মযোগিগণ শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রভাবের পুণ্যময় আকর্ষণ এড়াইতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ সচেতন আগ্রহে বা সুচিন্তিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন ধর্মমত প্রচারের জন্য কখনও উন্মুখতা প্রদর্শন করেন নাই। তথাপি তাঁহার অলোকসামান্য আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও লোকদৃষ্টিবহির্ভূত আন্তর তপস্যার সর্বজয়ী প্রভাব অনির্দেশ্য উপায়ে ও অচিন্ত্য পথে চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্ঞানঘন সুগভীর অনুভূতিসমূহ ছোট ছোট কথার মধ্য দিয়া গৈরিক নিস্রাবের মতো প্রবাহিত হইয়া শ্রোতৃ-বর্গকে মুগ্ধ করিত। অনেক সময়ে এই অনুভূতি-প্রকাশের মধ্যেও সমাধিতে ডুবিয়া যাইতেন, ইহাতে কোন সজ্ঞান প্রয়াস ছিল না। সমাধি

ও তাহা হইতে ব্যুত্থান উভয়ই অতি সহজ সৌকর্যে সম্পন্ন হইত। তাঁহার এই প্রকার উপলব্ধির পরম লগ্নে সঙ্গীতের স্বরলহরীর মতো তিনি সা-থেকে নি-পর্যন্ত অনায়াসে উঠিয়া যাইতেন, এবং তিনিই বলিতেন, 'আবার আমি নি-থেকে সা-তে ফিরিয়া আসি।' মুহূর্তে মুহূর্তে এই ভাবে জাগ্রত চেতনার প্রত্যক্ষ অনুমোদন ব্যতীত ইন্দ্রিয়রাজ্য হইতে অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রে তাঁহার যাতায়াত চলিত অতি সহজ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

এই সমাধির অন্তর্গূঢ় রহস্যবার্তা চিরদিন রহিয়া গেল অনুদ্ঘাটিত, 'ভাষার অতীত তীরে'। যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা জানেন 'মূকাস্বাদনবৎ'। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমাধির দুরধিগম্যতা উপলব্ধি করিতেন; তাই তিনি কোন কোন অনুরাগী শিষ্যের ব্যবহারে এই সমাধির 'অভিনয়' দেখিয়া রূঢ় কঠোরতায় তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্র বলিতেন—বীর্যময় বীরের সাধনা ও তপস্যা দ্বারা যে সমাধি গুরুদেব আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে ছিল প্রজ্ঞান-আহরণের প্রাণহর সংগ্রাম, অন্যের পক্ষে তাহা যে কপটতা-মুক্ত নহে, ইহা নিঃসন্দেহ। তিনি আরও বলিতেন: অপরের পক্ষে তাহা শুধু অলস আবেশ-ভাব, পীড়িত কল্পনার প্রাণহীন বাষ্পোচ্ছ্বাস মাত্র। যাহারা এই সাড়ম্বর ভাবোচ্ছ্বাসের অসার 'ধর্ম'কে উৎসাহিত করিত, তাহাদের অনেকের জীবন পরিশেষে দুর্বৃত্ততা এবং মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে পর্যবসিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের অধ্যাত্মসাধনার সম্পদ্-সমূহ সচেতন আগ্রহে প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ না করিলেও জীবনমরণের একমাত্র পরমা গতি তাঁহার সেই আদ্যাশক্তি জননীই যেন তাঁহাকে এই দিকে আকর্ষণ করেন। একদা তিনি ভাব-সমাধিতে নিবিষ্ট থাকাকালে যেন দেখিতেছিলেন—তাঁহার কাছে আসিবেন কতকগুলি শুদ্ধচিত্ত বিশ্বাস-প্রবুদ্ধ জ্ঞানী পুরুষ এবং তাঁহারাই হইবেন তাঁহার বাণীপ্রচারের অগ্রদূত। এই প্রচারও যেন তাঁহার সেই জগজ্জননীর ইচ্ছারই পরিপূরণ।

এতদিন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানবগুরু অত্যুত্তম ধর্মের কোন না কোন বিশেষ দিক্-মাত্র অবলম্বন করিয়া চরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বর্তমান যুগের অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনানুযায়ী সকল শ্রেষ্ঠ ধর্মের, মানবের অধ্যাত্মসাধনার সর্বপ্রকার বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার তত্ত্বার্থজ্ঞানকে নিজের সাধনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত করিয়া যে সর্বোপলব্ধির অখণ্ড মহিমার অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা হইল প্রকৃষ্ট অর্থে সর্বজনীন, ঈশ্বর-সাধনার সর্বদিকের সমন্বয় ও ঐক্য, জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের দিব্য সমুচ্চয়, এক কথায় বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মসাধনার ঐক্য। শ্রীরামকৃষ্ণই এই মহান্ দিব্য ঐক্যভাবের মূর্ত বিগ্রহ। তিনিই অখণ্ড মানবের প্রতিটি খণ্ড সত্তার সঙ্গে সর্বতোভাবে একাত্মতা সম্পাদনের দ্বারা তাহাদের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে যেন তাঁহার বিশ্ববিস্তৃত চৈতন্যের সঙ্গে একীভূত করিয়া লইলেন, তাই তিনি হইলেন এই যুগের চালক ও কর্ণধার, ভাবজগতের একচ্ছত্র সম্রাট্। কেননা তিনি গীতার ভাষায় 'সর্বভূতাত্মা,' তাঁহার আত্মা হইয়াছে সর্বভূতের আত্মস্বরূপ।

এই অপূর্ব সাধনসম্পদ্ কেমন করিয়া নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবেন? আমাদের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে এমন সঙ্কীর্ণতা চিরধিক্কৃত। পক্ষান্তরে ভাগবতের ঋষিকবি বলিতেছেন—যাঁহারা অধ্যাত্মসাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়া সংসার-সমুদ্র গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছেন—'কুর্বন্তি গোবৎস-

পদং ভবাব্ধিম্'—তাঁহাদের সাধনা প্রচারের জন্য উপযুক্ত সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা পরবর্তী মানবের পথ প্রদর্শনের উপায় করিয়া দিয়াছেন। দেবগণের প্রার্থনায় তাহাই স্পষ্টীকৃত: হে জ্যোতির্ময়! আপনি সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহশীল; তাই সর্বানুগ্রহশীল জ্ঞানিগণ দুস্তর ভয়ানক সংসারসাগর নিজেরা অতিক্রম করিয়া সংসারসাগরেই পাদতরণী স্থাপনপূর্বক অর্থাৎ ভাগবত সম্প্রদায় প্রবর্তনপূর্বক পারে গমন করিয়া থাকেন। আচার্য শঙ্করের 'বিবেক-চূড়ামণি' নামক গ্রন্থেও এই আদর্শের নির্দেশ রহিয়াছে—যাঁহারা ভবনদী পার হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই অপরের পার হইবার উপায় করিয়া দিবেন, কারণ তাঁহারা সর্বভূতে অতিপ্রীতিযুক্ত বলিয়া নিজেদের মুক্তিতে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে আবার প্রহ্লাদের স্তুতিতে যাহা ধ্বনিত, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তাহারই জ্যোতির্ময় রূপায়ন:

প্রায়েণ দেব! মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥ ৭।৯।৪৪

—হে দেব! মুনিগণ প্রায় নিজ নিজ মোক্ষাভিলাষী হইয়া নির্জনে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, পরের জন্য তাঁহাদের যত্ন নাই। এই-সকল দীনজনকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমি মুক্তি কামনা করি না। এই-সকল সংসারভ্রান্ত লোকের আপনি ভিন্ন আর আশ্রয় দেখিতেছি না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও অনুরূপ ভাবনায় আকুল হইলেন। কেমন করিয়া জন্ম-মরণপ্রবাহে ভ্রমণশীল মানবের একমাত্র শরণ ভগবানে দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায়, কিভাবে এই পরমা বিদ্যার রহস্য স্বীয় জীবনে আয়ত্ত করিয়া শুদ্ধচিত্ত মানবের মধ্যে বিতরণ করা যায়, তাহা উদ্ভাবন না করিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তারপর হইতে তিনি পবিত্রচিত্ত 'দেববালকদের' আগমনের জন্য দিবারাত্রি উৎকণ্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শুভমুহূর্ত সমুপস্থিত, শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, দিন যায় রাত্রি আসে। কোথায় তাহারা? সে কী আর্তনাদ, সে কী করুণ ক্রন্দন! 'কোথায় তোরা আমার সন্তান-গণ, চলে আয় তোরা, তোরা যে আমার অতি আপন, আমি যে তোদের ছাড়া থাকতে পারি না'—এই ভাবে তিনি ছটফট করিতেছিলেন। ইহার পরেই একে একে আবির্ভূত হইলেন নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), রাখাল (ব্রহ্মানন্দ) বাবুরাম (প্রেমানন্দ), তারক (শিবানন্দ), শরৎ (সারদানন্দ) প্রভৃতি ভাবশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভক্তবৃন্দ; তাঁহারাই হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-বাণীর ধারক বাহক এবং প্রচারক—যাহা আজ নিখিল বিশ্বে প্রতিধ্বনিত।

অপরের মুক্তিপথ বিঘ্নমুক্ত করিবার জন্য তিনি রাখিয়া গেলেন তাঁহারই পরীক্ষিত, তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান্, তাঁহারই কৃপায় কৃতকৃত্য মহাত্মগণ। ভাগবতে রন্তিদেবের সুরদুর্লভ কামনাই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবেদের শ্রেষ্ঠ সামঝঙ্কার:

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তা-
মপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো
যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥ ৯।২১।১২

—আমি পরমেশ্বরের নিকট অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি-যুক্ত গতি অথবা মুক্তি কামনা করি না; আমার প্রার্থনা এই, আমি যেন সমস্ত দেহীর অন্তঃস্থিত হইয়া তাহাদের সকলের দুঃখ অনুভব করিতে পারি এবং আমা হইতে যেন সকল দেহীর দুঃখ দূরীভূত হয়। তাঁহার এই মহান্

ভাবে উদ্বুদ্ধ চিত্তে সর্ব মানবের অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ হিতসাধনার গভীর মন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ-বর্গকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। আজ পৃথিবীর সর্বত্র যে রামকৃষ্ণ মিশনের 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' সেবাধর্মের জয়ধ্বজা উড্ডীন হইয়াছে, ইহার মূলে রহিয়াছে ঐ অমৃত মন্ত্রের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির দ্যোতনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনার একটি প্রধান অঙ্গরূপে সর্বধর্মসমন্বয় পরিগৃহীত হইলেও উহার মধ্যেই তাঁহার জীবন-বিজ্ঞান পর্যবসিত হয় নাই। পৃথিবীর সকল ধর্মসম্প্রদায়ের বাস্তব বা কল্পিত, ব্যক্ত বা অর্ধব্যক্ত বিরোধসমূহকে এক মহান্ সর্বব্যাপী প্রেমের আবেষ্টনে বলিষ্ঠ সমন্বয়ের মধ্যে সংযোজিত করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মমত নিঃশেষিত হয় নাই। এই সমন্বয় দুঃসহ তপস্যার হোমাগ্নিতে পরিশোধিত হইয়া যতই মহিমময় হউক, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহারও উর্ধ্বে উঠিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মাহাত্ম্যে বিশ্বের পুলকিত দৃষ্টির সম্মুখে এই সত্যই প্রকটিত করিলেন যে, প্রতিটি মানুষের যথার্থ কল্যাণ সুনিহিত রহিয়াছে সর্বমানবের সামগ্রিক কল্যাণের মধ্যে; ইহাই হিন্দু সংস্কৃতির মূলগত কথা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে—শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের পর কাত্যায়নী মহামায়া বরপ্রদানে অগ্রসর হইয়া বলিলেন:

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্॥

—হে অমরগণ, আমি তোমাদের অভীষ্টদাত্রী; জগতের উপকারক তোমরা যাহা মনে মনে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা প্রার্থনা কর, আমি দিতেছি। জগতের মঙ্গল হইলেই নিজের মঙ্গল; অতি বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিবিশেষের যে-মঙ্গল, তাহা ছদ্মবেশে অমঙ্গলের সমান। সর্ব মানবের অবিমিশ্র কল্যাণ ব্যতীত কোন আত্মসুখনিরত ব্যক্তিজীবনে প্রকৃত কল্যাণের স্ফূরণ হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় জীবনে সম্প্রদায়গত, সমাজগত, দেশগত বা কালগত সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের প্রতি ব্যষ্টিসত্তাকে ভগবানের মূর্তবিগ্রহরূপে পূজার্হ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রতি ব্যষ্টিমানবের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভগবজ্জ্যোতির পরমসুখদ দিব্য লীলার অনুভূতিতে নিত্যমোদিত থাকিয়া ঘোষণা করিলেন যে, প্রতি মানবই অবিনাশী শাশ্বত ধর্মের এক একটি দিব্য রূপ এবং প্রতি মানবকে এই সর্বোত্তম দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে, নতুবা আধুনিক অতিস্পর্ধিত 'সভ্যতা' বিচিত্র সজ্জার বোঝা লইয়া নিজেরই শ্মশান-শয্যা রচনা করিবে। রামকৃষ্ণ মিশনের জনহিতকর কার্যাবলী ঐ দিব্য ভাবেরই ক্রম-বর্ধমান বিজয়াভিযান।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্যবর্গকে সতর্ক করিয়াছিলেন—তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া যেন কোন অভিনব ধর্মমত গড়িয়া না উঠে; এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাধর্মে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে, ভাবে চিন্তায় বা কল্পনায় ধর্মান্তরিত করিবার কোন প্রচেষ্টাই চলিতে পারে না। ইসলাম ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মমতের আশ্রয়ে, সাধনার মাধ্যমে, অপরোক্ষ উপলব্ধির বলে তিনি প্রতিটি মতকে ধর্ম-সাধনার প্রকৃষ্ট পথ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি চাহিলেন, প্রত্যেক মানুষ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠ নির্দেশাবলীর অনুসরণে দিব্যজীবন লাভ করুক, যাহার ফলে প্রতিটি মানুষ অপর সকল মানুষকে 'আত্মৌপম্যেন'—আপনার মতো করিয়া ভালবাসিতে শিখিবে। স্বামী বিবেকানন্দ ইওরোপ ও আমেরিকায় খৃষ্টীয় ধর্মযাজকগণের বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়াও বজ্রনাদে প্রচার করিলেন যে, হিন্দুর সনাতন্ ধর্ম কাহাকেও হিন্দুধর্মগ্রহণে প্ররোচিত করে না। ধর্মান্তরগ্রহণ নহে, দিব্যজীবনের উদ্বোধন—ইহাই হিন্দুধর্মের শাশ্বত মঙ্গলমন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মঙ্গলবার্তা 'ডুবায়ে ধরার রণহুঙ্কার, ভেদি বণিকের ধন-ঝঙ্কার' মহামানবের চিত্তাকাশে মানবধর্মের অনাহত কল্যাণ-রাগিণী রচনা করিয়া চলিয়াছে।

কঃ পন্থাঃ*

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

কঃ পন্থাঃ—রাস্তাটি কি? তাঁকে লাভ করবার, তাঁকে দর্শন করবার কি পথ? পথটা না জানলে কিছুই হবে না। সেই পথকে আগে জেনে নিতে হবে। কঃ পন্থাঃ?

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

পথটি জানতে হবে, জেনে নিয়ে সে আনন্দ-পূর্ণ শান্তিময় ধামে এগোতে হবে। পথ না জানলে আমরা অগ্রসর হ'তে পারব না। কঃ পন্থাঃ? 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।' বেদ নানা রকম কত কথা বলছেন, কত বিভিন্ন মত, স্মৃতি-শাস্ত্রাদি গ্রন্থ কত উপায় ব'লে দিচ্ছে। এ-সবের মধ্যে পড়ে পথ নির্দেশ করা যায় না, অধিকন্তু মাথা গুলিয়ে যায়। শাস্ত্রের ভেতর দিয়ে পথ-নির্দেশ পাওয়া যায় না। বিবিধ নিয়ম-কানুনের ভেতর দিয়ে পথ পাওয়া যায় না—এক একটা পথ আলাদা মনে হয়। এ নিয়েই যত দ্বেষ-বিদ্বেষ, ধর্ম-কলহ। প্রকৃতপক্ষে পথ কি? তাই বলছি শাস্ত্রের ভেতর দিয়ে পথ পাওয়া যায় না। 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।' ধর্মের মূল তত্ত্বটি কোথায় আছে? গুহায়—গুহা বলতে হৃদয়-গুহা। এই আমাদের ভেতরে যা কিছু—সব আমাদের ভেতরে। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'—যে পথ অবলম্বন ক'রে মহাজনেরা সেই হৃদয়-গুহায় ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সব আমাদের ভেতরে—এইটে আমরা ভুলে গেছি। পথ না জানা হেতু আমরা কি করি? সব ঘুরে বেড়াই। মনে করি ধর্ম এখানে আছে, ধর্ম ওখানে আছে। তীর্থাদি ভ্রমণ যত কিছু সব ব্যাপার এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে মনের উচাটন ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল ধর্মের তত্ত্বটি কোথায়? ঘুরে ফিরে আবার আসতে হয়, এই হৃদয়ের ভেতরে যেতে হয়। ভেতরেই ভগবান্ রয়েছেন—সর্বভূতে, সকলের ভেতরে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। কাজেই আমাদের এই হৃদয়-গুহা হচ্ছে হৃদয়-মন্দির। এইখানেই সব—এইখানেই কৈলাস, এইখানেই বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন—যা কিছু সব আমাদের ভেতরে। কাজেই মহাজনেরা এসে এইটিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। এই যুগের মহাজন হলেন ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুর এসেছিলেন এই পথ দেখাতে। অমৃতধামে পৌঁছবার পথ তিনি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। মস্তিষ্কের ভেতর দিয়ে কি দেখিয়ে গেছেন? মোটেই নয়। তিনি অনুভূতি করেছেন। তাঁর দিব্য চোখে তিনি 'যত মত তত পথ' দেখেছেন। এইটি সাধনার ভেতর দিয়ে জেনেছেন, বই পড়ে নয়। সাধনার ভেতর দিয়ে দিব্য চোখে দেখেছিলেন যে, কোন ধর্মের সঙ্গে গোলযোগ নেই, বিদ্বেষ নেই, কলহ নেই। সব এক একটা রাস্তা। কাজেই ঠাকুরের এই যে দান, এই যে অনুভূতি, তা জগতের কত সমস্যা সমাধান ক'রে গেছে। ভেতরে আসতে হবে। ভেতরে না এলে কিছুই হবে না। যীশুখ্রীষ্টের কথা মনে ক'রে দেখো, তিনি বলছেন: স্বর্গরাজ্য আমাদের ভেতরেই রয়েছে—

* ডিগবয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ২৪. ৪. ৬০ তারিখে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণের সংক্ষিপ্তসার

বাইরে নয়, ভেতরে। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি।' সকলের ভেতরে ভগবান্ বিরাজ করছেন। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—সকলের ভেতরে সেই ভগবান্ রয়েছেন। কাজেই আমাদের বাইরে থেকে ভেতরে আসতে হবে। উপনিষদের ঋষিরা বলেছেন—'অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ঃ'। এই আমাদের ভেতরে সেই জ্যোতির্ময় ভগবান্ রয়েছেন। কোথায় ধর্ম খুঁজতে যাচ্ছি, বাইরে খুঁজে মরছি? মহাজনেরা শিক্ষা দিয়েছেন ভেতরে আসতে। 'আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারো ঘরে। যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।' —ঠাকুর গাইতে খুব ভালবাসতেন।

ধর্মের জন্য কোথাও যেতে হয় না, কোথাও ছুটতে হয় না। নিজে বসে ভেতরে দেখো, ভেতরে গিয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কর। ভগবান্ সকলের ভেতরে, তিনি ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন—শুধু রয়েছেন নয়, তাঁর থেকে আমরা এসেছি। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি।' তাঁর থেকে আমরা সকলেই এসেছি, এসে তাঁতেই আমরা স্থিতি লাভ করছি, আবার তাঁতেই যাচ্ছি। সেই তিনি কে? উপনিষদ্ বলেছেন—তিনিই সেই আনন্দ, তাঁর স্বরূপও আনন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দ। সকলের ভেতর ভগবান্ রয়েছেন—এটা সত্য, সকলেই এটা জানে; কিন্তু সকলেই কি ভগবানের ভেতরে আছে ব'লে অনুভব করছে? লাখের মধ্যে একজন। তাই ধর্মলাভ করতে গেলে পথটি জেনে নিতে হবে—মহাজনের প্রদর্শিত পথ। সেই পথে গিয়ে আমাদের কি করতে হবে? ভেতরে আসতে হবে। ঠাকুর কি সুন্দর একটি গান গাইতেন—'যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।' ভেতরে গিয়ে সাধনা দ্বারা এটা অনুভূতি করতে হবে—সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ। ঠাকুর আর একটি সুন্দর কথা বলতেন—ঘুরে বেড়িয়ে ধর্মলাভ হয় না, ভেতরে আসতে হবে। ঠাকুর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—একটি জাহাজের মাস্তুলে একটি পাখি বসেছে, তারপর জাহাজটা সমুদ্রে গিয়ে প'ড়ল। অনন্ত সমুদ্র। যে দিকে তাকানো যায়—জল, জল আর জল। পাখিটা তখন ভাবলে—কি করি? যাই হোক, সে উড়তে আরম্ভ করলে। উত্তর দিকে উড়ে উড়ে বসবার একটা জায়গা পেলে না, কাজেই তাকে ফিরে আসতে হ'ল। পাখিটিকে আবার এসে মাস্তুলে আশ্রয় নিতে হ'ল। সে স্থির শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারছে না বলেই তো উড়ছে। মাস্তুলকে ছেড়ে দিচ্ছে। আবার দক্ষিণ দিকে ধেয়ে গেল। দক্ষিণ দিকে গিয়ে দেখল যে, কোথাও বসবার জায়গা নেই, স্থান নেই—ফিরে এলো সেই মাস্তুলে। এইভাবে পুবে পশ্চিমে উড়ে দেখল মাস্তুল ছাড়া আর গতি নেই। এই উপদেশটি তোমরা মনে রাখবে। ঠাকুরের এই অমূল্য উপদেশটি ভুলবে না—মাস্তুল ছাড়া আর গতি নেই। ঐ পাখিটা ফিরে এসে মাস্তুল আশ্রয় করেছে। এই ফিরে আসার অর্থ কি?—ডানা-ব্যথা, কাজেই সেই ডানাব্যথা না হওয়া পর্যন্ত আমরা মাস্তুলে এসে বসি না। এই তীর্থ-ভ্রমণ পূজা জপ ধ্যান যতকিছু—এগুলো আর কিছুই নয়, ডানা-ব্যথা। মাস্তুলে বসা মানে একেবারে অনন্যশরণ হওয়া। আত্মসমর্পণ, পূর্ণ নির্ভরতা আসে শেষে। রামপ্রসাদের গানে আছে: 'ডুব দেরে মন কালী ব'লে, হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।' এই হ'ল সাধনা। রামপ্রসাদ একজন মহাজন ছিলেন। মহাজনদের প্রদর্শিত পথই হ'ল পথ। ভেতরে ডুবতে হবে।

তোমরা সব 'কথামৃত' পড়ে থাকবে। পাঁচ খণ্ড কথামৃত আছে—ঠাকুরের অমূল্য বাণী।

আজকাল ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই কথামৃতে'র তর্জমা হয়েছে। সেই পাঁচ খণ্ড 'কথামৃত' নিংড়ুলে আসল সার জিনিস কি পাই? তিনটি কথা, তিনটি বাক্য সার। ঠাকুর বলছেন—ডুব দাও, এগিয়ে পড়, ঝাঁপ দাও। রামপ্রসাদের গানেও পাবে—ডুব দাও, ঝাঁপ দাও। কোথায়? ভেতরে। সব মহাজনদের এক কথা। কাজেই ঐ কথাটা মনে রাখবে যে, আসল ধর্মটি ভেতরে। মূলতত্ত্বটি ভেতরে। সেইখানে ডুব দিতে হবে, ঝাঁপ দিতে হবে। আমরা কি ডুব দিইনি? ডুব দিয়েছি বৈকি। ঝাঁপও দিয়েছি, এগিয়েও পড়েছি। কোথায়?—বিষয়ে। সব ডুবে গেছি, হুঁশ নেই। আমরা কি এগিয়ে পড়িনি? খুব এগিয়ে পড়েছি, পথহারা হয়ে পড়েছি। কোথায়?—এই বিষয়ে। এই সংসার—তুলসীদাসের ভাষায় বলতে গেলে, জরু, জমি, টাকা। এই তো সংসার। এখানে আমরা ডুবে গেছি—ভাল করেই। কালী ব'লে ডুব দিইনি। রত্নাকর ভেতরে রয়েছে। এই সংসারসমুদ্রে ডুবেছি, তলিয়ে গেছি। কত এগিয়ে গেছি, কত এগিয়ে চলেছি, পথের শেষ নেই। তবুও যাচ্ছি কিসের আশায়?—শান্তির। শান্তির—আনন্দের এ রাস্তা নয়। কোথায় আসল শান্তি? সেই আনন্দধাম আমাদের ভেতরে। ভেতরে এগোতে হবে। ভেতরে ডুব দিতে হবে। ভেতরে ঝাঁপ দিতে হবে। ভেতরে যেতে হবে। আমরা উলটো করেছি, ভেতরে ঝাঁপ দিইনি।

উপনিষদের ঋষি বলেছেন—ভগবান্ ইন্দ্রিয়গুলোকে বহির্মুখ ক'রে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই ইন্দ্রিয়গুলি বহির্মুখ, মন বহির্মুখ। তারা ছুটেছে বিষয়ের দিকে। ভেতরে মোহরের ঘড়া। 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।' আমরা বাইরে ছুটেছি, বাইরে চলেছি শান্তির জন্য। ভেতরের দিকে দৃষ্টি নেই। অন্তরাত্মা যে ভেতরে রয়েছেন। আসল আত্মা ভগবান্। সেই অমৃতলাভের পথ কি? ইন্দ্রিয়গুলোই তো আমাদের নাচাচ্ছে। সেই জন্যই গীতায় বার বার ভগবান্ বলছেন—'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ'। ইন্দ্রিয়গুলোর অধীন হবে না। এগুলোকে সংযত কর। বঙ্কিমবাবুকে ঠাকুর বললেন—ডুবতে হবে, ডুব দিতে হবে। অত বড় সাহিত্যিক বঙ্কিমবাবু সরলভাবেই উত্তর দিলেন—মশাই, আপনি তো বললেন ডুবতে হবে, কিন্তু ডুবি কি ক'রে? পিছুতে যে সোলা বাঁধা আছে। আসল শান্তি লাভ করতে হ'লে সাধন করতে হবে। ইন্দ্রিয়গুলোকে বশীভূত করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে—সাধন করতে হবে। 'আবৃতচক্ষু' হ'তে হবে। বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলোকে টেনে আনতে হবে। চক্ষু আবৃত করার অর্থ প্রত্যাহার। বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়গুলো গুটিয়ে নিয়ে অন্তর্মুখ করা। অমৃতে অভিলাষ—অমৃতত্ব লাভ ক'রব। অমর হবো, শান্তি পাবো, আনন্দ লাভ ক'রব। অনাবিল আনন্দ, শান্তি কোথায়? ভেতরে। গীতামুখে ভগবান্ বলছেন—'ত্বমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।' তাঁর শরণাগত হও।

সকলের মূলে রয়েছেন মহামায়া। 'সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ। ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ' (চণ্ডী)॥ তাই মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ চাই। মা, আমার মন অন্তর্মুখ ক'রে দাও। এজন্য সাধন চাই, চেষ্টা চাই, পুরুষকার চাই। সব শিক্ষা শান্ত মনে অভ্যাস করবে। রামপ্রসাদ সাধক ছিলেন। তাঁর কান্না শুনে দেখা দিলেন স্বয়ং জগদম্বা, তিনি বেড়া বেঁধে দিয়ে গেলেন। সমুদ্র রত্নাকর, রত্ন তুলতে হ'লে ডুব দিতে হবে। 'কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে, আহারলোভে সদাই চলে। তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে যাও

ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।' কাম-ক্রোধাদি কুম্ভীর। বিবেক-হলদি গায়ে মেখে নে। আমরা পথভ্রষ্ট হই কেন? ঐ বিবেকের অভাবে। বিবেকই আমাদের ব'লে দেবে যে, আসল অমৃতধামে কি ক'রে আমরা যাব। কাজেই বিবেককে সঙ্গে রাখতে হবে। রামপ্রসাদের আর একটি গানে আছে—'আয় মন বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরুমূলে চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।' কল্পতরু কোথায় আছে? কল্পতরু হ'ল মা সাক্ষাৎ জগদম্বা। তিনি ভেতরে রয়েছেন। বেড়াতে যেতে হবে বাইরে নয়—ভেতরে ডুব দিতে হবে, ভেতরে।

জগদম্বাকে কল্পতরু বলেছেন। কল্পতরুর কাছে গিয়ে যা চাওয়া যায়, তা-ই পাওয়া যায় —ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। মা হলেন কল্পতরু। রামপ্রসাদ বলেছেন—'প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।' সেই কল্পতরু-মূলে যেতে গেলে নিবৃত্তিকে সঙ্গে নিতে হবে। প্রবৃত্তিকে সঙ্গে নিলে শুধু সংসার হবে। প্রবৃত্তির সন্তান হ'ল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা ইত্যাদি। উপনিষদ্ও বলেছেন—শ্রেয়ঃ আর প্রেয়। যখন ভগবানের ধ্যানে বসবে, পূজায় বসবে, তাঁর জপ করবে, প্রার্থনাদি ভজন করবে, তখন এই নিবৃত্তি জায়াকেই সঙ্গে নিয়ে তোমাদের যেতে হ'বে। রামপ্রসাদ আবার বলেছেন—'বিবেক নামে তারই বেটা তত্ত্বকথা তায় শুধাবি।' নিবৃত্তি জায়ার একটিমাত্র সন্তান—বিবেক। এই পথটি জেনে নিয়ে আমাদের সাধন করতে হবে। সাধন না করলে কিছু পাওয়া যায় না। বিবেকই আমাদের পথ ঠিক ক'রে দেবে। যেমন নৌকোর হালখানা—মাঝি হাল ধরে থাকে, হাজার ঝড় বৃষ্টি আসুক না কেন নৌকা নিরাপদে থাকবে। ছোট একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর বিবেক কাকে ব'লে বুঝিয়েছেন। কি সুন্দর সহজ সরল উপমা! কালিদাসের উপমাও হার মেনে গেছে। মানব-প্রকৃতি দুই রকম—কুলোর প্রকৃতি আর চালুনির প্রকৃতি। কুলো সারবস্তু গ্রহণ করে, অসার বস্তু ত্যাগ করে। আমাদের কুলোর প্রকৃতি লাভ করতে হবে। এই সংসারে সার অসার দুই মেশানো আছে—বিবেকের দ্বারা অসার ত্যাগ ক'রে সার গ্রহণ করতে হবে। চালুনির প্রকৃতি হ'লে হবে না। চালুনি ফেলে দেয় সারটা, সারটা ফেলে দিয়ে অসারটা রেখে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটা কথা বলেছেন: সাধুসঙ্গ কর। সাধুসঙ্গে বিবেক জেগে ওঠে। ঠাকুরের কাছে কত লোক আসত। তাঁর উপদেশ শুনে তাদের বিবেক জেগে উঠতো।

স্বামীজীর সহিত নয় মাস

স্বামী অচলানন্দ-কথিত

১৮৯৯ খৃঃ প্রথম আমি শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে অবগত হই। সেই সময়ে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামীজী তখন বেলুড়েই ছিলেন, তখন স্বামীজীকে দেখিবার জন্য তত আগ্রহ হয় নাই। ঐ বৎসরের শেষভাগে আমি বেলুড়ে গিয়াছিলাম। স্বামীজীর সঙ্গে তখন দেখা হয় নাই, কারণ তিনি ইওরোপ চলিয়া গিয়াছিলেন। তারপর ১৯০০ খৃঃ রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষে রিলিফ কার্য করিয়া যখন বৃন্দাবনে উপনীত হই, তখন শুনিলাম যে, স্বামীজী ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ স্বামী কল্যাণানন্দকে লিখিলেন, 'স্বামীজীকে ইচ্ছা করিলে তোমরা এখন দর্শন করিতে পারো।' তারপর কাশীতে আসি। এখানে আসিয়া দেখি যে, অনাথ-আশ্রমটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে আছে। চারুবাবু একাই আছেন, সুতরাং কাজের অসুবিধা হইতেছে। এজন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া মঠে যাইতে আর প্রবৃত্তি হইল না। অতঃপর নয় মাস পরে ১৯০১ খৃঃ আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজার পূর্বে স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য অন্তরে প্রবল আগ্রহ অনুভব করিলাম।

১৯০১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ভারতে আসিয়াই পূজ্যপাদ স্বামীজী অবগত হইলেন কাশীতে মঠের কয়েকটি যুবক ভক্ত মিলিয়া দরিদ্রদের সাহায্যার্থে একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি যুবক কর্মী বেলুড়ে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য যাইলে তিনি তাহার কাছে আশ্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর লইয়া তাহাকে অতিশয় উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলিয়াছিলেন, 'এরূপ আশ্রম ভারতের প্রত্যেক তীর্থস্থানে হওয়া উচিত।' সেই সময়ে তিনি অনাথাশ্রমের প্রত্যেক কর্মীর বিষয় অবগত হন এবং এই কার্যে এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, কর্মীটিকে শরীর সুস্থ রাখিবার উপদেশ দেন এবং তাহাকে মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করেন। ইতিমধ্যে স্বামীজী তুলসী মহারাজকে অনাথাশ্রম পরিদর্শন করিয়া বিস্তারিত সংবাদ জানাইবার জন্য কাশীতে পাঠাইলেন। তুলসী মহারাজ কাশীতে আসিয়া অনাথাশ্রম দেখিবার পর বিস্তারিত খবর স্বামীজীকে জানাইয়াছিলেন।

১৯০১ খৃঃ শারদীয়া পূজার পূর্বেই স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য মন একান্ত ব্যাকুল হইল। চারুবাবুকে আমার আন্তরিক ইচ্ছা জানাইলাম। তিনি আমাকে ১৫ দিনের ছুটি দিলেন। আশ্রম হইতে পনর দিনের জন্য আমি বেলুড় রওনা হইলাম।

১৯০১ খৃঃ শারদীয়া পূজার ষষ্ঠীর দিন আমি বেলুড় মঠে উপস্থিত হই। সেবার যে মঠে পূজা হইবে, তাহা আমি পূর্ব হইতে অবগত ছিলাম না। হাওড়ায় নামিয়াই আমি বাগবাজারে বোসপাড়ায় শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য যাই। মার দর্শন সেখানে পাইলাম না। ভাবিলাম তিনি বেলুড়ে গিয়াছেন। তিনি তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের ভাড়াটিয়া বাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন। মঠে আসিয়া দেখিলাম পূজার আয়োজন চলিতেছে। পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ মহারাজও খুব ব্যস্ত। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব হইতেই পরিচয় ছিল। প্রথমেই তাঁহার চরণ দর্শন করিলাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনিই

পূজ্যপাদ স্বামীজীর নিকট আমার পরিচয় দেন। বেলুড় মঠে তাঁহার দোতলার নিজ ঘরে মুণ্ডিত-মস্তক কৌপীনমাত্র-পরিহিত স্বামীজীকে প্রথম দর্শন করি। তাঁহার পরিধানে অন্য কোন পোশাক ছিল না। আমি তাঁহার শ্রীচরণ-বন্দনা করিলাম। তিনি আমার কাছে কাশীর বিস্তারিত সংবাদ লইলেন।

আমি মঠেই রহিলাম। সপ্তমীর দিন পূজা বিশেষ আড়ম্বরে সম্পন্ন হইল। শ্রীশ্রীমার নামে পূজার সংকল্প হইল। কৃষ্ণলাল মহারাজ পূজক ও পূজনীয় শশী মহারাজের (রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী) পিতা তন্ত্রধারক ছিলেন। প্রথম দিনের পূজায় স্বামীজী খুব আনন্দ করিয়াছিলেন। অষ্টমীর দিন তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, কিন্তু অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি সর্বদা আনন্দ ও হাস্য-পরিহাস করিতেন, বিশেষ যন্ত্রণা না হইলে কেবল খানিকটা চুপ করিয়া থাকিতেন। যদি কখনও হাঁপানি হইত তখন একটু চুপ করিয়া থাকিতেন এবং তাহা কাটিয়া গেলে আবার যথাপূর্ব স্ফূর্তি ও হাস্যরসে নিমগ্ন হইতেন। নবমীর দিন 'নল-দময়ন্তী' নাট্যাভিনয়ের সময় তিনি কতই রঙ্গ ও হাস্য-পরিহাসাদি করিয়াছেন! ইহাতে বেশ বোঝা যায় যে, শারীরিক অসুস্থতা বা কষ্ট তাঁহাকে বড় একটা কাতর করিতে পারিত না। আশ্রিতদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা অসুখের সময়েও হীনপ্রভ না হইয়া বরং বাড়িয়া যাইত। তাঁহার অসুখের সময় একটি সেবকেরও অসুখ হয়। স্বামীজীর ১০৫° ডিগ্রী জ্বর। সে সময়ে তাঁহার পার্শ্বে অনেক লোকজন দেখিতে পাইয়া তিনি অসুস্থ সেবকের খবর লইতেন এবং তাহার সেবা করিতে বলেন। এই দারুণ রোগযন্ত্রণায়ও তিনি আশ্রিতদের অসুখের নিয়মিত সংবাদ লইতেন।

দশমীর দিন বিসর্জনের সময় প্রতিমা মুন্সীদের নৌকায় তুলিয়া পূজনীয় রাখাল মহারাজ বৃন্দাবনী আঁচলা পরিয়া মা-দুর্গার সামনে ব্যাণ্ড বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সুমধুর নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। মনে হইল শ্রীকৃষ্ণ যেন মার সম্মুখে লীলায়িত ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছেন। স্বামীজী মঠের বারান্দা হইতে শ্রীমহারাজের সেই অপূর্ব নৃত্য উপভোগ করিয়াছিলেন। পূজার পরই স্বামীজীর শরীর সুস্থ হয়। কোজাগরী পূর্ণিমায় স্বামীজী মঠে প্রতিমায় প্রথম লক্ষ্মীপূজা করেন। তারপর কালীপূজা আসিল। স্বামীজী বলিলেন, 'এবার আর মার নামে সংকল্প হইবে না। আমাদের নামে পূজা হইবে।' বিশেষ সমারোহে কালী-পূজা হইল। সেবার কালীপূজায় যে আনন্দ-প্রবাহ ছুটিয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কালীপূজার দিন রাত্রির প্রথম ভাগে—তখনও পূজা আরম্ভ হয় নাই—স্বামীজী পূজার দালানে ধ্যান করিতে বসিয়াছিলেন। ধ্যান করিতে করিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সমাধি-মগ্ন হইলেন। তাঁহার আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। অনেকক্ষণ এইভাবে চলিবার পর স্বামীজীর সংজ্ঞা ফিরিতেছে না দেখিয়া পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ তাঁহার কানে বারংবার ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তারপর জগদ্ধাত্রীপূজা আসিল। এই পূজা স্বামীজীর গর্ভধারিণী মাতার কলিকাতায় সিমলার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হইল। আমরা সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। স্বামীজী নিজে তত্ত্বাবধান করেন। সেখানেও বেশ আনন্দ হইয়াছিল। তারপর স্বামীজী মঠে প্রতিমা আনাইয়া সরস্বতীপূজারও অনুষ্ঠান করেন। ইহার পূর্বে মঠে প্রতিমায় সরস্বতীপূজা হয় নাই।

আমাদের প্রতি পূজ্যপাদ স্বামীজীর যে কী

গভীর ভালবাসা ছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করিবার নয়। আমার পক্ষে তাহার গভীরতা পরিমাপ করার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। ভালবাসা প্রাণের জিনিস, তাহা মুখে বা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, কেবল অনুভব করা যাইতে পারে। স্বামীজীর ভালবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা তাহা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমার পরে স্বামীজীর ভালবাসা আমাকে অভিভূত করিয়াছিল। এরূপ ভালবাসা কোথাও পাই নাই। শুনিয়াছি মহাপুরুষদিগের চরিত্রে দুইটি বিপরীত ভাবের সমাবেশ থাকে। স্বামীজীর চরিত্রেও এইরূপ দুইটি বিপরীত ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদিকে তিনি যেমন প্রেমের প্রতীক, অন্যদিকে তেমনি কঠোরতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। যখন তাঁহাকে প্রেমের প্রতীকরূপে দেখিতাম, তখন তিনি সকলকেই একেবারে প্রেমরসে ডুবাইয়া দিতেন, সকলকেই কোল দিতেন এবং বালক-সুলভ আনন্দে মুগ্ধ করিতেন। আবার যখন তিনি রুদ্ররূপ ধারণ করিতেন, তখন সকলেই তাঁহার নিকট হইতে ভয়ে দূরে সরিয়া দাঁড়াইত। কাহারও সাধ্য ছিল না যে, তাঁহার কাছে অগ্রসর হয়। এমন কি পূজনীয় রাখাল মহারাজ পর্যন্ত তাঁহার কাছে যাইতে ভয় পাইতেন।

স্বামীজীর ভালবাসা কেবল মানুষেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছাগল গরু প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের প্রতিও প্রসারিত হইত। জন্তু-জানোয়ারের প্রতি তাঁহার ভালবাসার উদাহরণ দিতেছি। স্বামীজীর মন শারীরিক অসুস্থতায়ও সব সময় উচ্চভাবে থাকে দেখিয়া ডাক্তাররা তাঁহার শরীর সম্বন্ধে একটু চিন্তিত হইলেন। এজন্য তাঁহারা তাঁহার গুরুভ্রাতা রাখাল মহারাজকে জানাইলেন যে, স্বামীজীর মন যাহাতে উচ্চভাব হইতে নামিয়া জাগতিক ব্যাপারে থাকে, সেজন্য জন্তু-জানোয়ার—যেমন কুকুর প্রভৃতি কাছে রাখা প্রয়োজন। তদনুসারে মঠে ছাগল, গরু, কুকুর, হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী পোষা হইত। তাঁহার একটি ছাগল ছিল—নাম 'মটরু'। তিনি ছাগলটিকে এত ভালবাসিতেন যে, ছাগলটি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। ছাগলটি অনেক দূরে থাকিলেও মটরু বলিয়া ডাক দিলে দূর হইতে দৌড়িয়া স্বামীজীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইত। ছাগলটি এত ভাগ্যবান্ যে, শেষ সময়ে স্বামীজীর কোলে মাথা রাখিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার দুইটি কুকুর ছিল—একটির নাম 'বাঘা', অপরটির নাম 'লায়ন'। কুকুর দুইটিও তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। একবার বাঘাকে তিনি কি এক কারণে মঠ হইতে তাড়াইয়া ওপারে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সে দুই দুইবার খেয়া নৌকায় পুনরায় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। গরু, ভেড়া, হাঁস প্রভৃতির প্রতিও তাঁহার ভালবাসা ঠিক এইরূপই ছিল। তিনি এগুলির সঙ্গে এমনভাবে খেলা করিতেন যে, তাহারা তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইত।

জন্তু-জানোয়ারের প্রতিই তাঁহার যখন এত ভালবাসা ছিল, তখন মানুষের প্রতি ভালবাসা কী অপার ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কুলি মজুর চাকর-বাকরের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতিশয় সৌহার্দাপূর্ণ ছিল। সাঁওতাল কুলি, চাকর প্রভৃতি যাহারা মঠে কাজ করিত, তাহাদের সঙ্গে তিনি একত্র গল্পগুজব করিতেন এবং তাহাদের খাওয়া-দাওয়া সুখ-দুঃখের খবর লইতেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে এমনভাবে মিশিতেন যে, তাহারাও যেন তাঁহাকে নিজেদের জন বলিয়া মনে করিত এবং তাঁহার কাছে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিত।

আমাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল অপার। আমরা তাঁহার ভালবাসা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতাম। সেই ভালবাসা কাগজে কলমে বা ভাষায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। তাঁহার আশ্রিতেরা প্রত্যেকেই ইহা মনে প্রাণে বুঝিয়াছে। আমি নিজে যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই বলিতেছি। আমি তখন মঠে নূতন গিয়াছি। সামান্য একটু অসুখ করিয়াছে। বেদানা খাইতে খাইতে স্বামীজীর হয়তো আমার কথা মনে পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি সেই বেদানার অংশটুকু তিনি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। অথবা কোন সময়ে অন্য কোন খাবার জিনিস খাইতে হয়তো তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, তখনই তিনি ঐ জিনিসটির অংশ পদাশ্রিতদের দিয়াছেন। এরূপও ঘটিয়াছে যে, যে-সব ছেলেকে অন্য মহারাজগণ বেশী আমল দিতেন না—তাহারা স্বামীজীর শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। লোকের গুণাবলীর প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি ছিল, দোষগুলি তিনি দেখিতেন না। কাহারও সামান্য গুণ দেখিলে তাহাই তিনি অতিশয় বড় করিয়া দেখিতেন। কেহ একটু ভাল কাজ করিলে তিনি তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ফলে সেই ব্যক্তি দ্বিগুণ উৎসাহে সৎকার্যে মন দিত এবং স্বামীজীর গুণ-গ্রাহিতায় মুগ্ধ হইয়া পরমানন্দে কাজে আত্ম-নিয়োগ করিত। তাঁহার ভালবাসা সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে বলিবার শক্তি আমার নাই, অধিকারও নাই। তবে এইটুকু বলিতে পারি, তাঁহার সঙ্গে অল্পদিনের জন্যও যে মিশিয়াছে, সেই তাঁহার ভালবাসা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি প্রেমের প্রতিমূর্তি ছিলেন।

একবার কানাই মহারাজ (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) তাঁহার সেবা করিতে করিতে তাঁহার বুকে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। পাছে সেবকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় স্বামীজী অনেকক্ষণ শান্ত হইয়া শুইয়া থাকেন। পরে কানাই মহারাজের ঘুম ভাঙিলে স্বামীজীও বিছানা হইতে উঠিলেন। তাঁহার শিষ্যদিগকে তিনি যখন 'বাবা, বাবা' বলিয়া ডাকিতেন, তখন যে কী স্বর্গীয় আনন্দ অনুভূত হইত, তাহা আর কি বলিব! একবার তিনি আমাকে বলিলেন, 'বাবা, তুই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারিস্? তুই যা চাস্, তোকে আমি তাই দেবো।' আমার এমন কি শক্তি ছিল যে, তাঁহার ঘুম পাড়াইয়া দিই? তাঁহার তখন নিদ্রা বেশী হইত না। শারীরিক গ্লানি ছিল যথেষ্ট। তিনি আমাকে বলিলেন, 'জ্ঞান হওয়ার পর হইতে আমি জীবনে কখনও চার ঘণ্টার বেশী ঘুমুইনি।' ইদানীং তো তাঁহার একেবারেই ঘুম হইত না।

স্বামীজী যখন উগ্রমূর্তি ধারণ করিতেন, তখনও তাঁহার মধ্যে একটা মাধুর্য থাকিত। তাঁহার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ক্রোধের পর মুহূর্তেই তাঁহার উগ্রভাব চলিয়া যাইত, আবার সেই প্রেমপূর্ণ মধুর ভাব আত্মপ্রকাশ করিত। কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তিনি একটু পূর্বেই রাগিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার রুদ্র ভাবের সময় কেহ নিকটে যাইতে সাহস করিত না, এমন কি তাঁহার গুরুভ্রাতারাও দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন, কিন্তু সেই রুদ্রমূর্তি শান্ত হইবার পর যাহার প্রতি তিনি রুষ্ট হইয়াছিলেন, সেও নিকটে আসিয়া বুঝিতে পারিত না যে, তাঁহার মধ্যে রুদ্রতা থাকা সম্ভব। তিনি আবার সকলের সঙ্গে সপ্রেম ব্যবহার করিতেন। গুরুভ্রাতা ও আশ্রিত শিষ্য-ভক্ত সকলেই সমভাবে ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন।

কি একটা অন্যায় কাজের দরুন স্বামীজী একবার কানাই মহারাজের উপর অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করেন। স্বামীজী একটি ছড়ি লইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে কিছু সময় ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়েন। পরক্ষণেই তাঁহার ক্রোধের ভাব একেবারে চলিয়া গেল। আর একবার বৃষ্টির সময় মঠে ব্রহ্মচারীরা বৃষ্টির পরিস্রুত জল (distilled water) ধরিতেছিল। কি একটা কারণে স্বামীজী দুইজন ব্রহ্মচারীকে খুব গালি দিতেছিলেন। তাঁহার গালির চোটে আমি কাঁপিতে লাগিলাম এবং আমার হাত হইতে পরিস্রুত জলের বোতলটি পড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া স্বামীজীর ভাবের পরিবর্তন হইল। সেই মুহূর্তে তাঁহার রাগ চলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, 'বাবা, তুই nervous হয়ে (ঘাবড়িয়ে) পড়েছিস্? যা, আমার ঘরে একটা ঔষধ আছে, খেয়ে শুয়ে পড়গে যা।'

আশ্রিতদের প্রতি স্বামীজীর শিক্ষাদান সম্বন্ধে কিছু বলিতে প্রয়াস পাইব। স্বামীজী আশ্রিতগণকে যে শুধু শিক্ষাই দিয়াছেন তাহা নয়, অহরহঃ তাহাদের মঙ্গলকামনা করিতেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। আমি কাশী সেবাশ্রম হইতে ১৫ দিনের ছুটি লইয়া মঠে গিয়াছিলাম। সেবাশ্রমে লোকজনের অভাব এবং সেজন্য কাজের অসুবিধা হওয়ায় সেবাশ্রমে ফিরিয়া যাইবার জন্য সংবাদ আসিল। আমি অসুখের পর তখন সামান্য সুস্থ হইয়াছি। স্বামীজী আমার যাওয়ার তাগিদ শুনিয়া বলিলেন, 'আগে ওর শরীর সুস্থ হোক, তারপর ঢের সেবাশ্রম হবে।' স্বামীজীর ইচ্ছা যে, আমার কল্যাণের জন্য তিনি আমাকে তাঁহার কাছে আরও কিছুদিন রাখেন। তিনি এই-ভাবে সকলের কল্যাণের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

গুরুভ্রাতাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, স্বামীজী তাহাও তাঁহার আশ্রিত শিষ্য-দিগকে শিক্ষা দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান-দিগকে তিনি একটি বৃহৎ 'ঠাকুরের সংসার' বলিয়া মনে করিতেন। ঠাকুর যাঁহাদিগকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, স্বামীজী তাঁহাদিগকে যথোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে বলিতেন। ঠাকুরকেই তিনি এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বা মূল বলিয়া ধরিয়া লইতেন। ঠাকুর যাঁহাদিগকে যে পর্যায়-ভুক্ত বলিয়া গিয়াছেন, স্বামীজী তাঁহাদের সেইরূপ সম্মান করিতে বলিতেন। স্বামীজীর আশ্রিত ভক্তেরা যাহাতে ঠাকুরের সন্তানগণকে বাবা, খুড়া, জেঠা ইত্যাদিরূপে যথাযোগ্য সম্মানের চক্ষে দেখে, সেজন্য তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন। একবার মঠে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ আসিয়াছিল। আমার উপর তাহা বিতরণের ভার পড়িল। গুরুজনদিগকে আমি বাবা, খুড়া, জেঠা হিসাবে বিবেচনা করিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলাম। স্বামীজীর শিষ্য জনৈক বৃদ্ধ সাধু আগে প্রসাদ না পাওয়ায় চটিয়া গেলেন। ফলে একটু বচসা শুরু হইল। স্বামীজী বিষয়টির তদন্তের ভার পূজনীয় শরৎ মহারাজের উপর অর্পণ করিলেন। শরৎ মহারাজের কাছে সমস্ত বিষয় শুনিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'সে ঠিক কাজই করেছে। যাকে আগে দেবার কথা তাকে আগে, যাকে পরে দেবার কথা তাকে পরে দিয়ে ন্যায্য কাজই করেছে।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাব ও শিক্ষা যাহাতে গুরুভ্রাতাগণ ও আশ্রিত ভক্তেরা কার্যে পরিণত করেন, এ-বিষয়ে স্বামীজীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঠাকুর যে-ভাব ও শিক্ষা জগৎকে দিয়া গিয়াছেন, সেই ভাব ও শিক্ষা যাহাতে তাঁহারা

জীবনে ও কার্যে প্রতিফলিত করেন, সে-বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। ঠাকুরের নাম প্রচারের জন্য তিনি তত ব্যগ্র ছিলেন না। একবার কাশী সেবাশ্রম হইতে মঠে ফিরিয়া যাইবার পর অনাথ আশ্রমের নাম কি হইবে, তাহা স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কাশীর লোকেরা আমাকে লিখিয়াছিলেন। স্বামীজী 'Home of Service' নাম প্রস্তাব করিলেন। শুনিয়া রাখাল মহারাজ বলিলেন, 'Ramakrishna Home of Service নাম হোক।' ইহাতে স্বামীজী বলিলেন, 'এই তোমাদের কেবল ঠাকুরের নাম প্রচারের চেষ্টা। ঠাকুরের ভাব ও উপদেশ-প্রচারই আসল কথা। ঠাকুরের নাম প্রচারের জন্য এত ব্যগ্রতা কেন?'

কাশী সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে আসার প্রাক্কালে স্বামীজী সকলকে সেবাশ্রমের সঠিক হিসাব রাখিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহার আরও নির্দেশ ছিল: যিনি যে উদ্দেশ্যে অর্থ দেন, তাঁহার সেই অর্থ সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হওয়া উচিত। 'শাকের কড়ি মাছে, মাছের কড়ি শাকে' যাওয়া উচিত নয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশান্তশীল দাশ

তোমার মতো আমি তো কই চোখের জলে ভাসিনেকো,
কেঁদে কেঁদে বলি না, 'মা, দেখা দে গো, দেখা দে গো।'
অনেক জ্বালায় জ্বলে মরি,
তবু কি হায় মাকে স্মরি;
মায়ের দেখা পাই নে ব'লে নয়ন আমার কই ঝরে গো।

আর কিছু না, কাঁদতে শেখাও, আকুল হয়ে মা মা ব'লে,
বেদন-ভরা নয়ন দু'টি ভরে উঠুক নয়ন-জলে।
কেঁদে কেঁদেই পাব মাকে,
আকুল হয়ে যে জন ডাকে—
চোখের জলে, ডাক শুনে মা দেয় যে সাড়া সেই জনে গো।

শ্রীরামকৃষ্ণের 'মা'

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

সাধক রামপ্রসাদের একটি গান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ প্রিয় ছিল। উহার প্রথম লাইনদুটি: 'মন কি কর তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে। সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে?' আর শেষের দুইটি পঙ্‌ক্তি হইল :—

'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি, বোঝ্ না রে
মন ঠারে ঠোরে॥'

দ্বাদশ বৎসর নানা সাধনায় ব্যাপৃত থাকিয়া এবং পর পর ঐ-সকলে সিদ্ধি লাভ করিয়া যাহা শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে বিশেষভাবে গাঁথিয়া গিয়াছিল, তাহারই প্রতিধ্বনি তিনি যেন শুনিতে পাইতেন রামপ্রসাদের এই গানটির ভিতর। ভগবানের ভাবের ইয়ত্তা নাই। তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, আবার তিনি ইহাদের অতীত। তিনি সগুণ, তিনি নির্গুণ, আবার তিনি এই দুই ছাড়া আরও কত কি তাহা বলিতে পারা যায় না। 'চরম তত্ত্ব এই'—জোর করিয়া ইহা যিনি ঘোষণা করিতে চান, তাঁহার বুদ্ধিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন 'মতুয়ার বুদ্ধি'। সেইজন্য ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি সুবিন্যস্ত দার্শনিক মত খ্যাপন আমাদিগের নিকট যতই প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান্ হউক না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উহা আঁধার ঘরে উন্মত্তের লম্ফ-ঝম্ফের তুল্য। উহাতে হাত-পা ভাঙিতে পারে, কিন্তু যাহা খুঁজিতেছি তাহা হাতের নাগালের বাহিরেই রহিয়া যাইবার সম্ভাবনা। উপর্যুক্ত গানের আর একটি লাইনে আছে: 'ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন আগম নিগম তন্ত্রসারে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, শাস্ত্র হইতে তত্ত্বের আমরা একটা আভাস মাত্র পাই, কিন্তু তত্ত্ব বস্তুতঃ অনুভবগম্য। তর্ক-বিচার করিয়া যাহা বুঝা যায় না, অনুভূতিতে তাহা সুস্পষ্ট হইতে বাধা নাই। পক্ষান্তরে অনুভূতিতে যাহা সংশয়াতীত সত্য, তাহাকে তর্ক-বিচারের আঙিনায় টানিয়া আনিলে সত্যটি কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে!

সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক অনুভূতি কোনও একটি নির্দিষ্ট মতবাদের মাপকাঠিতে বিশ্লেষণ করিতে গেলে আমরা তাঁহার প্রতি অবিচার করি। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন ঠিক কথা, কিন্তু উহাই তাঁহার চরম পরিচয় নয়; তিনি দ্বৈতবাদী ভক্তোত্তম ছিলেন, কিন্তু অদ্বৈত সত্যকে বর্জন করিয়া নয়। তিনি অদ্বৈত-দ্বৈত এবং অন্যান্য আরও অনেক মতবাদকে সম্মান করিয়াছেন, অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু উহাদের প্রত্যেকটিকে ছাড়াইয়াও গিয়াছেন। তাঁহাকে কোনও 'বাদী' না বলিলেই ভাল হয়। তাঁহার কোনও 'দর্শন' নাই; তাঁহার জীবনই তাঁহার দর্শন। সীমাহীন অনন্ত আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতিমূর্তি তিনি। সে সত্যকে বলিয়া ফুরানো যায় না, মন তাহা 'ঠারে ঠোরে বুঝিতে' পারে মাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনা আরম্ভ করেন মা-কালীর পূজা এবং সরল উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারা। ইহা মূর্তিপূজা এবং দ্বৈতসাধনা। কিন্তু প্রথম হইতেই তিনি মনে এমন কোনও জেদী ধারণা পুষিয়া রাখেন নাই যে, ভগবান্ শুধু মূর্তির মধ্য দিয়াই অথবা কালীমূর্তির মাধ্যমেই প্রকাশ পান অথবা দ্বৈত-

ভাবই চরম সত্য। তাঁহার পথ ছিল একান্ত নির্ভরতার পথ, বিনয়ের পথ, বিশ্বাসের পথ। তিনি জানিতেন, জগন্মাতার উপর যখন নির্ভর করিয়াছি, তখন সেই নির্ভরতার সম্মান তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন। জানিতেন, মা-কালীর মূর্তিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছি, তিনি ভগবান্—তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত। তিনি মূকও নন, বধিরও নন। তিনি সর্বদৃক্, সর্বদ্রষ্টা। তাঁহার ভালবাসা অসীম। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে সরল বিশ্বাস ও নির্ভরতাই তো প্রকৃষ্ট পথ। যখন যাহা আমার প্রয়োজন, যে উপলব্ধি যেভাবে আমার পক্ষে উপযুক্ত, তাহা তিনি নিশ্চয়ই আমার নিকট উপস্থিত করিবেন। আমার শুধু চাই আন্তরিকতা, মায়ের প্রতি অনুরাগ বাড়ানো, হৃদয়ের সকল আবেগকে মায়ের অভিমুখে নিযুক্ত করা। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এবং হৃদয়কে সর্বদা কোন একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি হইতে উন্মুক্ত রাখিয়া তিনি সাধনায় নামিয়াছিলেন বলিয়া 'মা' সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের 'রাশ ঠেলিয়া' দিয়াছিলেন। কত সাধনা, কত দর্শন, কত অনুভূতি! কত ভাব, কত তন্ময়তা, কত আনন্দ, কত সার্থকতা! ভগবান্ অশেষ, তাঁহার প্রকাশও অশেষ। শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে কখনও কোন ভয় বা সংশয় আসে নাই। জানিতেন, মা হাত ধরিয়া আছেন, তাঁহাকে যখন বিশ্বাস করিয়াছি তিনি বিশ্বাস কখনও ভঙ্গ করিতে পারেন না। অদ্বৈত বেদান্ত সাধনা করিতে গিয়া যখন কল্পনায় জ্ঞানখড়্গ দ্বারা সেই মায়েরই মূর্তিটি কাটিয়া ফেলিতে হইল, রূপকে অরূপে মিশাইয়া দিতে হইল, তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ কুণ্ঠিত হন নাই। জানিতেন, ইহাও মায়েরই নির্দেশ। যে মা রূপময়ী, তিনিই যে অরূপ। তিনি বিশেষ, আবার তিনিই যে নির্বিশেষ।

তাই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া সমাধি হইতে ব্যুত্থানের পর পুনরায় রূপময়ী মাকে ফিরিয়া পাইলেন। অদ্বৈত বেদান্তের চরম লক্ষ্যে পৌঁছিয়াও 'মা মা' বুলি ছাড়িতে পারিলেন না। নির্মায়িক সন্ন্যাসী গুরু তোতাপুরী ভাবিতেন এবং বলিতেন, ইহা তাঁহার দুর্বলতা, ভাবুকতা। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেন। স্বয়ং জগন্মাতা তাঁহাকে যে অন্যরূপ বুঝাইয়াছিলেন। তাই গুরুর নিকট বসিয়া বেদান্তবাক্য শ্রবণ ও আলোচনা করিলেও জ্ঞানের সহিত ভক্তির সম্পর্ক-বিষয়ে কোনও পাঠ তাঁহার কাছে লইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। প্রয়োজনও ছিল না, কেননা স্বয়ং জগজ্জননীর নিকট তিনি শিক্ষা পাইয়াছিলেন। সেই শিক্ষার খানিকটা বরং তিনি গুরু তোতাপুরীকেই দিয়াছিলেন—গুরুদক্ষিণা। এই দক্ষিণা পাইয়া গুরুর জীবন ধন্য হইয়াছিল। তাঁহার নিকট শাস্ত্রের সত্য নূতনভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। শিষ্যের নিকট তিনি বেদান্তের নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পাঠ পাইয়াছিলেন—নেতি ও ইতির, জ্ঞান ও ভক্তির, নির্গুণ ও সগুণের, ব্রহ্ম ও শক্তির সমন্বয়ের পাঠ।

বলিও না—নেতি ও ইতির, নির্গুণ ও সগুণের, ব্রহ্ম ও শক্তির সমন্বয় অযৌক্তিক, অশাস্ত্রীয়। কেননা সকল ইতিকে ঘুচাইয়া তবে তো নেতি, সকল গুণকে বিসর্জন দিবার পরই তো নির্গুণ, শক্তিকে নস্যাৎ করিয়াই তো ব্রহ্ম; যাহা ঘুচিয়া গেল, মুছিয়া গেল, তাহা ফিরিয়া আসিবে কি করিয়া? অতএব সমন্বয়ের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। চরম ও পরম সত্য নির্গুণ, নির্বিশেষ, নির্মায়িক ব্রহ্ম—অবাঙ্‌মনসোগোচরম্। এই বিতর্কের উত্তরে বলিতে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নির্গুণ নির্বিশেষ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, একদিন নয়, দিনের পর দিন। উহা যে 'অবাঙ্-মনসোগোচরম্' তাহাও তাঁহার নিকট নূতন সংবাদ নয়।

'সব জিনিস এঁটো হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, কেউ মুখে বলতে পারে নাই। মুখে বললেই জিনিসটা এঁটো হয়। বিদ্যাসাগর পণ্ডিত, শুনে ভারি খুশী।' (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫।৫।২)

'ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নাম রূপ—এ-সব স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না; তিনি যে ব্যক্তি, তাও বলার জো নাই।' (ঐ, ১।২।৩)

'ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। ···ব্রহ্ম--- সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণের অতীত। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি ক'রে ক'রে যা বাকী থাকে আর যেখানে আনন্দ, সেই ব্রহ্ম।'

(ঐ, ৩।৫।১)

তথাপি তিনি 'ইতি', 'সগুণ' ও 'শক্তি'কে নস্যাৎ করেন নাই। যাহা চিন্তাধারায় এবং যুক্তি-বিচারে অসম্ভব প্রতীয়মান হয়, তাহা অনুভবে সম্ভবপর হইতে পারে। তাই পণ্ডিতদের তর্ক শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভীত হন নাই। বলিতেন, 'মা যে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন।'

নির্বিকল্প সমাধিতে দ্বৈতকে বিলীন করিয়া, নির্বিশেষকে উপলব্ধি করিবার পর সমাধি হইতে নামিয়া আসিয়া দ্বৈতের কথা বলিলে অদ্বৈতের কৌলীন্য নাশ হইয়া যায়—শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে এই প্রকার কুলীন মনে করিতেন না। তিনি কুলীন অদ্বৈতবাদীদের পদধূলি লইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মা তাঁহাকে যাহা দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতে পারিতেন না। মা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন—বিশ্বপ্রকাশও ব্রহ্ম; যাঁহার নিত্য, তাঁহারই লীলা। তিনি সেইজন্য দুইটাই লইবার পক্ষপাতী ছিলেন। ইহাতে তিনি অদ্বৈতকে লঘু করেন নাই, বরং অদ্বৈতের গৌরব বাড়াইয়াছেন। অদ্বৈত শুধু নির্বিকল্প সমাধিতে নয়, নির্বিকল্প সমাধি হইতে নামিয়াও। নির্গুণ নির্বিশেষ অবাঙ্‌মনসোগোচরম্ সত্য, তাঁহার মায়েরই সত্য, মায়ের নিত্য সত্য। আবার সগুণ সবিশেষ বাক্যমনের দ্বারা প্রতিভাত যাহা, তাহাও মা—লীলাময়ী মা। কোন অবস্থাতেই মা ব্যতীত কিছু নাই। ইহাতে হয়তো বহু-শাস্ত্রবেত্তা অদ্বৈতাচার্যেরা ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিবেন, ইহা অদ্বৈতকে তরল করা; আদি-মধ্য-অন্ত সর্বাবস্থায় সর্বকালে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এই ডিণ্ডিম ধ্বনিত না করিলে বেদান্তকে বিশুদ্ধ রাখা যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর: 'তবে নিরাকারবাদীদের ভুল কি জানো? ভুল এই—তারা বলে, তিনি নিরাকার, আর সব মত ভুল। আমি জানি—তিনি সাকার নিরাকার দুই-ই, আরও কত কি হ'তে পারেন। তিনি সবই হ'তে পারেন।' (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৫।৮।২)

'তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর ক'রে বোলো না যে, তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। বলো, আমার বিশ্বাস--তিনি নিরাকার, আর কত কি হ'তে পারেন, তিনি জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পারি না। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? একসের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা ক'রে কখনও দর্শন দেন আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়, নচেৎ নয়। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।'

(শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।১২।৯)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'যদি তিনি বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়, নচেৎ নয়।' অর্থাৎ মানুষের সীমাবদ্ধ যুক্তি-বিচারে যাহা দুর্বোধ্য প্রহেলিকা, তাহা প্রত্যক্ষানুভূতিতে নিঃসন্দিগ্ধ সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। তাঁহাকে তাঁহার 'মা' 'বুঝাইয়া দিয়াছিলেন', আমাদেরও তিনি আহ্বান করিতেছেন, এই আশ্চর্য সমন্বয়—বিচার দ্বারা নয়, অনুভূতিতে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য।

'ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে তারপর লীলা আস্বাদন ক'রে বেড়াও।' সর্বনামরূপের অতীত নির্বিশেষ সত্যকে সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়া, সমাধি হইতে নামিয়া, 'নাম-রূপ মিথ্যা' না বলিয়া নাম-রূপও সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মই—এই দৃষ্টি। নিম্নাধিকারীর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এ-কথা বলিয়াছেন—ইহা মনে করিবারও কোন সঙ্গত কারণ নাই, কেননা তিনি অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানলাভের 'পর' এই লীলা আস্বাদন করিবার কথা বলিতেছেন। যাঁহারা নাম-রূপের সহিত আদৌ কোন সম্পর্ক রাখিতে চান না, সমাধি হইতে নামিয়া ইন্দ্রিয় ও মনের বেদ্য সকল জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়াই ঘোষণা করিয়া চলেন, তাঁহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের কোন বিরোধ নাই। বহুস্থলে তাঁহাকে এই সকল তীব্র জ্ঞানযোগীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দেখি। তিনি নিজেও এই অবস্থায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন দিনের পর দিন নিজের দেহের কোন হুঁশ তাঁহার ছিল না।

'ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; নাম রূপ এ-সব স্বপ্নবৎ।' (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ১।২।৩)

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই বিচার। সব স্বপ্নবৎ—বড় কঠিন পথ। এ পথে তাঁর লীলা স্বপ্নবৎ, মিথ্যা হয়ে যায়। আবার 'আমি'টাও উড়ে যায়। এ পথে অবতারও মানে না। বড় কঠিন।' (ঐ, ৫।১২।৫)

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা বুঝাইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীর ও অনন্ত মাঠের গল্প বলিতেন। 'প্রাচীরের ওপারে অনন্ত মাঠ। চারজন বন্ধু প্রাচীরের ওপারে কি আছে দেখতে চেষ্টা করলে। এক একজন প্রাচীরের উপরে ওঠে, ঐ মাঠ দর্শন ক'রে হা হা ক'রে হেসে অপর পারে পড়ে যেতে লাগলো। তিনজন কোন খবর দিলে না। একজন শুধু খবর দিলে। তার ব্রহ্মজ্ঞানের পরও শরীর রইল লোকশিক্ষার জন্য।'

ব্রহ্মজ্ঞানের পর তাঁহার নিজের শরীর যায় নাই। মা তাঁহাকে 'লোকশিক্ষা'র জন্য, 'লীলা আস্বাদন' করিবার জন্য তাঁহার শরীর রাখিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই, ব্রহ্মজ্ঞানে একটুও মরিচা পড়ে নাই। বরং মা তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন—যাঁর নিত্য, তাঁরই লীলা। চোখ বুজিলেও ব্রহ্ম, চোখ খুলিলেও ব্রহ্ম। এই যে নূতন দৃষ্টি, তাঁহার নিকট ইহার মূল্য 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'-জ্ঞানের অপেক্ষা এক পয়সা কম নয়। বরং অনেক সময়ে তিনি এই নূতন দৃষ্টিকে খুব উৎসাহের সহিত উপদেশ দিয়াছেন। একটি নূতন পারিভাষিক শব্দ তিনি অনেক সময়ে ব্যবহার করিতেন—'বিজ্ঞান'। বলিতেন—জ্ঞানের পর 'বিজ্ঞান', জীব জগৎ তিনি হয়েছেন—এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।'

'জ্ঞানী নেতি নেতি ক'রে বিষয়বুদ্ধি সব ত্যাগ ক'রে তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে, যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি, তিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈরী—সেই ইট, চুন, সুরকিতেই সিঁড়িও তৈরী। নেতি নেতি ক'রে যাঁকে ব্রহ্ম ব'লে বোধ হয়েছে, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে—যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।' (থামৃত, ৩।১।৪)

জ্ঞানের 'পর' বিজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞানের 'পর' লীলা-আস্বাদন প্রভৃতি উক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণ 'পর' শব্দ ব্যবহার করিয়া একটি শাস্ত্রীয় কলহ নিশ্চিতই সৃষ্টি করিতে চান নাই। নিত্য ও লীলা—এই দুইয়ে তাঁহার নিকট কোনও পার্থক্য

ছিল না—দুই-ই তাঁহার 'মা'। তবে যুগোপযোগী কার্যকরী আধ্যাত্মিক সাধনার দিক দিয়া 'ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ'—এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর তিনি যে জোর দিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেননা জগৎ মিথ্যা মুখে বলিলেই জগৎ মিথ্যা হইয়া যায় না।

'হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার জো নাই। আমি ধ্যান করছি, আমি চিন্তা করছি, এ-সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্যের মধ্যে।'

(শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১।২।৪)

'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের লেখক মাষ্টার মহাশয় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করিলেন—'জগৎ কি মিথ্যা?' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, 'জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও-সব বিচারের কথা, তাঁর দর্শন হ'লে তখন বোঝা যায়—তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন।'

'আমায় মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে, মা-ই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়! প্রতিমা চিন্ময়, বেদী চিন্ময়, কোশাকুশী চিন্ময়, চৌকাট চিন্ময়, মার্বেলের পাথর চিন্ময়—সব চিন্ময়।

'ঘরের ভিতর দেখি, সব যেন রসে রয়েছে—সচ্চিদানন্দ রসে! কালীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্ট লোককে দেখলাম, কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জ্বলজ্বল করছে দেখলাম।···তাই তো বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্যন্ত। ···তাঁকে লাভ করলে দেখা যায় তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন। শুধু বিচারে হয় না।'

(শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪।৭।৩)

শ্রীরামকৃষ্ণের 'মা' তাঁহার নিকট ছিলেন সকল মতবাদ ও তর্ক-বিচারের ঊর্ধ্বে। পারাবারহীন মহাসমুদ্র—কখন নিস্তরঙ্গ, কখন বক্ষে অনন্ত তরঙ্গবিলাস। কখন নেতি, কখন ইতি। নেতি বড়, কি ইতি বড়—এই বিচার শাস্ত্রজ্ঞেরা করুন, শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উহা অর্থহীন। জগৎ আধ্যাত্মিক কি তাত্ত্বিক, ব্রহ্ম সর্বদাই শক্তিশবলিত কি শক্তি ব্রহ্মে একটি কল্পনামাত্র—এই প্রকার বিচার শাস্ত্রপাঠকের নিকট যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন, ইহার মীমাংসা শ্রীরামকৃষ্ণের মতে—কথা দ্বারা হইবার নয়। কথায় শুধু কথা বাড়ে, ভেদের সৃষ্টি হয়, সর্বভেদাতীত অদ্বৈতবাদেও নানা বিকল্প গড়িয়া উঠে, পরস্পরবিবদমান সম্প্রদায়সমূহ দেখা দিতে থাকে। কিন্তু একান্ত সরল বিশ্বাস, নির্ভরতা সাহস ও উদ্যম লইয়া তত্ত্বানুভূতির জন্য চেষ্টা করিলে তত্ত্বস্বরূপিণী 'মা' কোন জ্ঞানই অপূর্ণ রাখেন না—যখন যাহা প্রয়োজন, যতটুকু প্রয়োজন, তাহা পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আদিতে মা, মধ্যে মা, অন্তে মা। মা ছাড়া অন্য কিছু নাই।

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনাগারিক ধর্মপাল

দেবমিত্ত ধর্মপাল ১৮৬৫ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে কলম্বোর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলম্বো সেণ্ট টমাস কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং সরকারী কাজ গ্রহণ করেন। পরে ১৮৮৬ খৃঃ বৈরাগ্যের প্রেরণায় উক্ত কর্ম ছাড়িয়া দেন এবং সংসার ত্যাগ করেন। ভারতে বুদ্ধদেবের পবিত্র স্মৃতি-বিজড়িত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গয়া, সারনাথ প্রভৃতি স্থান পুনরুদ্ধার করিতে তিনি প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৯২ খৃঃ গয়ায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ-সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। ১৮৯৩ খৃঃ তিনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে সিংহল হইতে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতে প্রেরিত হন। সেখানে তাঁহার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচয় হয় এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তিনি যে-সকল বক্তৃতার বিষয়বস্তু লিখিতেন, তাহা স্বামীজীকে পূর্বেই দেখাইতেন এবং প্রয়োজন হইলে পরিবর্তনাদি করিয়া লইতেন।

ধর্মপাল খুব নম্র এবং মধুর স্বভাবের লোক ছিলেন। স্বামীজী পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পাণ্ডিত্য অপেক্ষা চরিত্রবলেই আমেরিকাবাসীর মনে তিনি বিশেষ প্রভাব-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন।

তিনি ধর্মমহাসভায় বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত চার কোটি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোকের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি খুব কৃশ এবং খর্বকায় ছিলেন। ধর্মমহাসভা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ধর্মপাল বুদ্ধগয়ার মন্দির বৌদ্ধদের হাতে আনিতে প্রায় ছয় বৎসর সংগ্রাম করেন।

১৮৯৮ খৃঃ শ্রীমতী ওলি বুল যখন বেলুড়ে বাস করিতেছিলেন তখন ধর্মপাল তাঁহার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে বেলুড়ে আসেন। স্বামীজীর সহিত প্রথম দেখা করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন—এইরূপ ইচ্ছা ছিল। স্বামীজী ধর্মপালের সহিত বেলুড়ের জমিতে যখন হাঁটিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় বেলুড়ের জমি কর্দমাক্ত থাকায় ধর্মপালের পা কাদায় ডুবিয়া যায়। স্বামীজী তাঁহাকে কাদা হইতে উঠিতে সাহায্য করেন এবং সম্মানিত অতিথি বলিয়া পা ধুইয়া দিতে চাহিলে ধর্মপাল তাহাতে আপত্তি করেন।

যাহা হউক এই পর্ব শেষ হইলে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া হাসিখুশী-ভাবে বাকী পথ অতিক্রম করেন।

১৯২০ খৃঃ ধর্মপাল কলিকাতায় ধর্মরাজিক বিহার নির্মাণ করেন, ১৯২৪ খৃঃ লণ্ডনের রিজেণ্ট পার্কের নিকট বৌদ্ধ মিশন এবং ১৯২৫ খৃঃ নিউইয়র্কে মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। নিয়মিতভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ইওরোপে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রেরণ করিতেন।

১৯৩০ খৃঃ সারনাথ মূলগন্ধকুটীবিহারে উপসম্পদাগ্রহণের পর তিনি 'ভিক্ষু ধর্মপাল' নামে পরিচিত হন।

১৯৩৩ খৃঃ ২৯শে এপ্রিল সারনাথে নিউ-মোনিয়া রোগে ধর্মপাল দেহত্যাগ করেন। অন্তিম কালে তিনি এই কয়টি কথা মাত্র বলিতে পারিয়াছিলেন, 'শীঘ্রই যেন আমার মৃত্যু হয়, আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে চাই। আমি দুঃখ-যন্ত্রণার কাল বৃদ্ধি করিতে পারিব না।

ভগবান্ বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করিবার জন্য আরও পঁচিশবার জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।'

লালা বদ্রীসা

আলমোড়ার লালা বদ্রীসা নামক ধনাঢ্য ব্যক্তির জীবনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের স্মৃতি বিশেষরূপে জড়িত। বরাহনগর মঠ-জীবনে প্রায়শঃ নবীন ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ হিমালয়ের গুরুগম্ভীর সৌন্দর্য ও প্রশান্ত নিস্তব্ধতায় আকৃষ্ট হইয়া পরিব্রাজকরূপে সেখানে বিচরণ করিতেন। আলমোড়ায় আসিলে প্রায়ই তাঁহারা লালা বদ্রীসার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন অথবা তাঁহার নিকট হইতে নানারূপ সাহায্য পাইতেন। লালাজীও স্বকীয় ধর্ম-প্রবণতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহাদিগের সাহচর্য লাভ করিলে বা কিঞ্চিন্মাত্র সেবাধিকার পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।

এইরূপে একবার স্বামী সারদানন্দ ও বৈকুণ্ঠ-নাথ সান্যাল লালাজীর অতিথিরূপে আলমোড়ায় থাকাকালে স্বামীজী ও স্বামী অখণ্ডানন্দ আলমোড়ায় আসিয়া উপস্থিত হন। স্বামীজীকে অম্বা দত্তের বাগানে পৌছাইয়া দিয়া অখণ্ডানন্দ স্বামীজীর আগমন-বার্তা গুরু-ভ্রাতাগণকে দিবার উদ্দেশ্যে লালাজীর গৃহে যান। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র স্বামী সারদানন্দ, সান্যাল মহাশয় এবং লালাজী ব্যস্ত হইয়া অবিলম্বে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হন। অর্ধপথ অতিক্রম করিয়াই তাঁহারা স্বামীজীর সাক্ষাৎ পান। লালাজী অতি বিনীতভাবে স্বামীজীকে তাঁহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। স্বামীজী সম্মত হইয়া লালাজীর গৃহে গুরুভ্রাতাগণসহ কয়েক দিন বাস করেন। স্বামীজী লালাজীর আতিথেয়তা ও ভক্তি দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন, লালাজীর ন্যায় ভক্ত সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই প্রথম সাক্ষাতেই লালাজীও এই তেজস্বী এবং মহাজ্ঞানী যুবক-সন্ন্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ যোশী নামক একজন সেরেস্তা-দারের সহিত সন্ন্যাস-গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিয়া অকাট্য যুক্তিসহকারে স্বামীজী প্রমাণ করেন, ত্যাগই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। ব্রাহ্মণ যোশীও এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লন।

লালাজীকে লিখিত স্বামীজীর দুইখানি পত্র পাওয়া যায়। ১৮৯৬ খৃঃ ৫ই অগস্ট লণ্ডন হইতে পত্র লিখিয়া স্বামীজী আলমোড়ায় একটি আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় পত্রও ঐ বৎসর ২১শে নভেম্বর লণ্ডন হইতেই লিখিত। এই পত্রে স্বামীজী জানান—১৮৯৭ খৃঃ ৭ই জানুআরির মধ্যে তিনি মাদ্রাজে পৌছিবেন এবং কয়েক দিন সমতল-ভূমিতে থাকিয়া তাঁহার আলমোড়া যাইবার ইচ্ছা। তাঁহার সহিত তিনজন ইংরেজ বন্ধুও যাইবেন, তন্মধ্যে সেভিয়ার-দম্পতি আল-মোড়াতেই বসবাস করিবেন। তাঁহারা স্বামী-জীর শিষ্য এবং হিমালয়ে স্বামীজীর জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। স্বামীজী এই পত্রে তিনজনের থাকিবার উপযুক্ত একটি বাংলো ভাড়া করিতে লালাজীকে নির্দেশ দেন। সেখানে থাকিয়া সেভিয়ার-দম্পতি আশ্রমের উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিবেন। লালাজীকেও এই বিষয়ে সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন।

১৮৯৭ খৃঃ মে মাসে উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে স্বামীজী আলমোড়ায় উপস্থিত হইলে বদ্রীসা তাঁহাকে গুরুভ্রাতা ও শিষ্যগণসহ তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং স্বামীজীও ইহাতে স্বীকৃত হন। 'এই সময় লালাজীর প্রচেষ্টায় এক জনসভা আহূত হয় এবং

স্বামীজীকে হিন্দী ও সংস্কৃতে অভিনন্দন দেওয়া হয়। লালাজীর পক্ষে পণ্ডিত হরিরাম পাঁড়ে একটি মনোজ্ঞ অভিনন্দন পাঠ করেন। এ-যাত্রায় স্বামীজী যতদিন আলমোড়ায় ছিলেন, লালাজীর অতিথিরূপেই বাস করিয়াছিলেন।

ধর্মপ্রাণ লালাজী সর্বদা রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বন্ধু ও সহায় ছিলেন। স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দ ১৮৮৯ খৃঃ শেষভাগে আলমোড়ায় কয়েক মাস কঠোর তপস্যায় কাটান। শিবানন্দজীর এখানে অবস্থানকালে লালা বদ্রীসা তাঁহার পরম অনুগত ভক্ত হইয়াছিলেন। ধনাঢ্য বদ্রীসা অপুত্রক ছিলেন; একটি পুত্রসন্তান লাভের জন্য একদিন অতি কাতরভাবে শিবানন্দজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। তাঁহার আশীর্বাদে যথাসময়ে বদ্রীসার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সিদ্ধ মহাপুরুষের আশীর্বাদে লব্ধ বলিয়া লালাজী পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন সিদ্ধদাস। ফলতঃ বদ্রীসা শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যদের সেবা করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। বরাহ-নগর মঠের সন্ন্যাসীরা আলমোড়ায় গেলে বদ্রীসারই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন।

লেগেট-দম্পতি

মিঃ ফ্রান্সিস লেগেট ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী লেগেট আমেরিকায় স্বামীজীর প্রচার-কার্যে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দম্পতি নিউইয়র্ক-সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৪ খৃঃ শেষ-ভাগে যখন স্বামীজী নিউইয়র্কে স্বাধীনভাবে বক্তৃতা এবং ক্লাস প্রভৃতি করিতে আরম্ভ করেন, তখন মিঃ লেগেটের সঙ্গে মিসেস স্টার্জিস ও মিস জোসেফাইন ম্যাকলাউড নাম্নী দুই ভগিনী এই-সকল বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন। মিঃ লেগেট পূর্ব হইতেই এই দুই ভগিনীর সহিত পরিচিত ছিলেন। মিসেস স্টার্জিস বিধবা ছিলেন। স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও বাণী ইঁহাদের সকলকেই অত্যন্ত প্রভাবিত করে। মিঃ লেগেট এক সময় বলেন, স্বামীজী একজন অনন্য-সাধারণ জ্ঞানী। ক্রমে ইঁহাদের সহিত স্বামীজীর বিশেষ অন্তরঙ্গতা হয়।

মিঃ লেগেট একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। স্বামীজীর বিশ্রামের প্রয়োজন হওয়ায় ১৮৯৫ খৃঃ গ্রীষ্মকালে মিঃ লেগেট তাঁহাকে নিউ হ্যাম্পসায়ারে পার্সীতে আমন্ত্রণ করেন। স্বামীজী কয়েকদিন এখানে বাস করেন। এই স্থানে পাইন বনের নিস্তব্ধতায় একাকী গীতা পাঠ করিয়া স্বামীজী বেশ আনন্দ লাভ করিতেন। এই তপোবনের পরিবেশে বাস করিয়া যেন তাঁহার আয়ু বৃদ্ধি হইল, এরূপ মনে হইয়াছিল

এই সময় মিঃ লেগেট ও মিসেস স্টার্জিস বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে মনঃস্থ করিয়া স্বামীজীকে ফ্রান্সের পারী নগরীতে তাঁহাদের বিবাহকালে উপস্থিত থাকিতে আমন্ত্রণ করেন। এই সময়েই লণ্ডন হইতে মিঃ স্টার্ডি এবং মিস মূলার স্বামীজীকে লণ্ডনে যাইয়া বেদান্ত প্রচারের জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। ফলে তিনি ইওরোপ যাওয়া স্থির করিয়া মিঃ লেগেটের সহিত ১৮৯৫ খৃঃ অগস্ট মাসের মধ্যভাগে রওনা হন এবং ঐ মাসের শেষ-ভাগে পারী পৌছান। ইংলণ্ডে দুইমাস কাটাইয়া আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিলে স্বামীজী ১৮৯৫ খৃঃ খৃষ্টমাস মিঃ লেগেটের গ্রাম্য নিবাস 'রিজলী মেনর'-এ অতিবাহিত করেন।

১৮৯৬ খৃঃ স্বামীজী আমেরিকা ত্যাগ করিবার কথা চিন্তা করিতেছিলেন এবং আমেরিকায় স্থায়ী বেদান্ত-প্রচারের ব্যবস্থা করিবার মানসে বেদান্ত-সমিতি গঠন করেন এবং মিঃ লেগেটকে উহার প্রেসিডেন্ট পদে মনোনীত করেন।

স্বামীজী মিঃ লেগেটকে 'ফ্রাঙ্কিন্সেন্স' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার গুণসৌরভে সকলেই মুগ্ধ হইতেন বলিয়া স্বামীজী ধূপের সহিত তুলনা করিয়া এই নাম দিয়াছিলেন। চিঠিপত্রেও ঐ নাম ব্যবহার করিতেন। মিসেস লেগেটকে তিনি 'মাতা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এই মহিলা সম্রাজ্ঞী-সদৃশা—ইহাই ছিল স্বামীজীর অভিমত। মিসেস লেগেট স্বামীজী সম্বন্ধে বলেন: দুইজন মাত্র লোক তিনি জীবনে দেখিয়াছেন, যাঁহারা নিজের সম্ভ্রম একটুও ক্ষুণ্ণ না করিয়া অপরের সহিত সহজভাবে মিলিতে পারেন—একজন জার্মান সম্রাট্, অপর ব্যক্তি স্বামীজী।

১৮৯৯ খৃঃ স্বামীজী দ্বিতীয়বার স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে লইয়া আমেরিকা পৌঁছিয়া সেই দিনই বিকালে মিঃ ও মিসেস লেগেটের গ্রামের বাড়ি ক্যাটস্কিল পাহাড়ে স্টোনব্রিজে 'রিজলী মেনর'-এ চলিয়া যান। সেখানে কয়েক দিন বাস করার পর তিনি পশ্চিম আমেরিকা ক্যালিফর্নিয়াতে উপস্থিত হন।

মিসেস লেগেটও ক্যালিফর্নিয়া যাইয়া স্বামীজীর কয়েক দিন সাহচর্যলাভে ধন্যা হন। তাঁহার ভগিনী মিস ম্যাকলাউড ক্যালিফর্নিয়াতে স্বামীজীর দেখাশুনার ব্যবস্থা করেন।

মিঃ লেগেট বেশী দিন বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষের কাজ করিতে পারেন নাই। তিনি ব্যবসায়ের প্রয়োজনে এই দায়িত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

এই পরিবারের সকল ব্যক্তিই—এমনকি শিশুগণও স্বামীজীর বিশেষ অনুরক্ত ছিল। মিসেস লেগেটের অর্থেই স্বামীজীর স্মৃতি-মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দির এই মহীয়সী মহিলার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি।

মাদাম কালভে

১৮৯৪ খৃঃ কোন সময় আমেরিকায় বিখ্যাত ফরাসী গায়িকা মাদাম এমা কালভে স্বামীজীর সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেন। সাক্ষাতের পর এই মহিলা বিশেষ উপকৃতা হন এবং স্বামীজীর একজন অনুরক্ত ভক্তে পরিণত হন। স্বামীজীর সহিত পরিচয়ে তাঁহার জীবনে কিরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হয়, তাহা মাদাম এইরূপে ব্যক্ত করেন, 'আমার সৌভাগ্য যে, আমি এমন এক ব্যক্তির সহিত পরিচয়ের আনন্দ লাভ করিয়াছি, যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করেন। আমার আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁহার প্রভাব অতুলনীয়। তিনি আমার দৃষ্টিপথে নব আলোক দান করিয়া, আমার ধর্মীয় আদর্শ ও ভাব প্রশস্ত ও ঐক্যবদ্ধ করিয়া আমাকে সত্য সম্বন্ধে বিস্তৃততর উপলব্ধি শিক্ষা দিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।'

প্রথম সাক্ষাতের বিবরণও মাদামের জীবন-স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করা হইল: আমার চিকাগোতে থাকাকালে স্বামীজী প্রায় এক বৎসর বক্তৃতা করিতেছিলেন। তখন আমার শরীর ও মন দুই-ই অবসন্ন। আমার কয়েকজন বন্ধু তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে জানিয়া আমিও তাঁহার নিকট যাইব স্থির করিলাম। সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট হইল। উপস্থিত হওয়া মাত্র আমাকে তাঁহার পাঠকক্ষে হাজির করা হয়। পূর্বেই আমাকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি সম্বোধন করার আগে যেন আমি কথা না বলি। ঘরে ঢুকিয়া আমি মুহূর্তের জন্য চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহার পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, মাথায় পাগড়ি এবং দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ এবং তিনি ধ্যানস্থ। অল্প সময় পরে তিনি দৃষ্টি ঊর্ধ্বে না তুলিয়াই বলিলেন, 'বৎসে, তোমার চতুষ্পার্শ্বে দুঃখের আবহাওয়া বহিতেছে; স্থির

হও, ইহাই অত্যাবশ্যক। তারপর যদিও তিনি আমার নাম পর্যন্ত জানিতেন না, তথাপি ধীরস্বরে এবং অবিচলিতভাবে আমার জীবনের গোপন সমস্যা ও দুশ্চিন্তার কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন সব কথা বলিলেন, যাহা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও জানে না—এই আমার বিশ্বাস। আমি বিস্মিত হইলাম এবং ইহা অলৌকিক মনে হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কে আপনাকে এই সব খবর দিয়াছে? কিরূপে আপনি এইসব জানিলেন?' তিনি তাঁহার প্রশান্ত হাসিমুখে আমার দিকে তাকাইলেন, যেন আমি একটি অবোধ শিশু এবং ধীরে উত্তর করিলেন, 'কেহ বলে নাই; তুমি কি মনে কর, বলিবার প্রয়োজন আছে? আমি তোমার ভিতর পর্যন্ত দেখিতে পাই।'

চলিয়া যাইবার জন্য আমি উঠিলে তিনি বলিলেন, 'তোমাকে দুঃখ ও অশান্তি ভুলিয়া থাকিতে হইবে। প্রফুল্ল ও সুখী হও। স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাও। একাকী বসিয়া দুঃখের কথা চিন্তা করিও না। ভাবাবেগ কোন স্থায়ী বহিঃপ্রকাশে রূপান্তরিত কর। তোমার আধ্যাত্মিক সুস্থতার জন্য ইহা প্রয়োজন।' তাঁহার কথা ও ব্যক্তিত্ব গভীরভাবে আমার মর্ম স্পর্শ করিল। আমার মনে হইল, তিনি যেন আমার মন হইতে সকল জটিল চিন্তা দূর করিয়া সেখানে পবিত্র ও শান্তিপ্রদ ভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অমোঘ ইচ্ছাশক্তিকে ধন্যবাদ। আমি সজীবতা ও উৎসাহ পুনরায় ফিরিয়া পাইলাম। তিনি তথাকথিত সম্মোহন-বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার চরিত্রবল, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা ও গভীরতাই দৃঢ় বিশ্বাস আনিয়া দেয়। পরে যখন আমি তাঁহাকে ভালভাবে জানিবার সুযোগ পাইলাম, তখন মনে হইত তিনি লোকের এলোমেলো চিন্তাগুলিকে এমন এক শান্তিপূর্ণ স্তরে লইয়া যাইতেন, যাহাতে তাঁহার কথায় তাহারা সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে পারে।

প্যারীতে অবস্থানকালে স্বামীজী আবার মাদামের নিকটতর সংস্পর্শে আসেন। মাদাম রোমান ক্যাথলিক প্রথা অনুযায়ী স্বামীজীকে 'আমার পিতা' (mon pere) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। স্বামীজী মাদাম কালভের অতিথিরূপে দ্বিতীয়বার ইওরোপ-সফরে বাহির হন। মিশর পর্যন্ত মাদাম সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিকথা হইতেই এই সময়ের কতিপয় বিশেষ ঘটনা জানা যায়।

স্বামীজীর দেহত্যাগের বহু পরে মাদাম বেলুড় মঠে একবার আসিয়া স্বামীজী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। শেষ বয়সে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম অবলম্বন করেন। ফরাসী দেশের স্বাভাবিক ধর্মই রোমান ক্যাথলিক।

পাশ্চাত্য মনোবৃত্তি অনুযায়ী মাদাম একবার বলেন, 'আমার ব্যক্তিত্ব যতই নগণ্য হউক, তাহা আমি ত্যাগ করার কথা ভাবিতে পারি না। আমি মুক্তি পাইয়া ব্রহ্মে লীন হইতে চাই না।' স্বামীজী তাহাতে উত্তর করেন, 'একদিন একটি জল-বিন্দু সমুদ্রে পড়িয়া তোমার ন্যায় দুঃখে কাঁদিতেছিল। সমুদ্র হাসিয়া জলবিন্দুকে প্রশ্ন করিল, 'কেন কাঁদিতেছ? আমি কাঁদার কারণ বুঝিতেছি না। তুমি আমাতে আসিয়া তোমার অন্য ভাই-ভগিনীদের—অন্যান্য জলবিন্দু যেগুলি আমার উপাদান, তাহাদের সহিত মিশিয়াছ। তুমি এখন সমুদ্রই হইয়াছ। অবশ্য যদি আমায় ত্যাগ করিতে চাও, সূর্য-কিরণের সহিত মেঘলোকে উঠিয়া যাও। সেখান হইতে তুমি—ছোট জল-বিন্দু হইয়া তৃষ্ণার্ত পৃথিবীর বুকে পুনরায় শুভাশীর্বাদ রূপে বর্ষিত হইতে পারিবে।'

স্বামীজী একবার মাদাম সম্বন্ধে লিখেন,

গরিবের ঘরে তাহার জন্ম হয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত প্রতিভা, কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা এবং বহু ক্লেশের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে এখন অত্যন্ত ধনী এবং রাজা-মহারাজার নিকটও সম্মান লাভ করে। সৌন্দর্য, যৌবন, প্রতিভা এবং কিন্নর-কণ্ঠের একত্র সমাবেশ তাহাকে পাশ্চাত্য গায়িকাদের মধ্যে উচ্চতম স্থান দিয়াছে। দুঃখ-দারিদ্র্য অপেক্ষা ভাল শিক্ষক নাই। তাহার বালিকা-বয়সে নিদারুণ দুঃখদারিদ্র্য এবং কষ্টের সহিত অনবরত সংগ্রাম—যাহাতে সে বর্তমানে জয়ী হইয়াছে—তাহার জীবনে এক সহানুভূতি ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন চিন্তার গভীরতা আনিয়াছে।

হরিপদ মিত্র ও ইন্দুমতী মিত্র

হরিপদবাবু বেলগাঁও সাব-ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার ছিলেন। তাঁহার দিনপঞ্জীতে লিখিয়াছেন: '১৮ই অক্টোবর ১৮৯২ খৃঃ মঙ্গলবার একজন উকীল বন্ধুর সহিত স্বামীজী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। আমি তাঁহাকে একজন সাধারণ সাধুই মনে করি এবং সকল সাধুকেই আমি প্রতারক মনে করিতাম; ঈশ্বর এবং ধর্মও আমি বিশ্বাস করিতাম না। মারাঠা পরিবারে বাসের অসুবিধা হওয়ায়, আমার বাসায় থাকার জন্য বা প্রার্থী হিসাবেই সাধু আমার নিকটে আসিয়াছেন—এইরূপ মনে করি। কিন্তু আলাপে বুঝিলাম—সাধু আমাপেক্ষা সর্ববিষয়েই সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ এবং কোন আকাঙ্ক্ষাও তাঁহার নাই। আমি তখন তাঁহাকে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আমার গৃহে বাস করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি বলেন, মারাঠা ভাট-সাহেবের গৃহে তিনি বেশ ভাল ভাবেই আছেন, বিশেষতঃ তিনি যদি বিনা কারণে একজন বাঙালীর গৃহে চলিয়া আসেন, তবে ঐ ভদ্রলোক বড়ই দুঃখিত হইবেন। পরদিন ভোরে আমার গৃহে প্রাতরাশে স্বীকৃত হন। কিন্তু তিনি সময়ে উপস্থিত না হওয়ায় আমি যাইয়া দেখি যে, স্বামীজীকে ঘিরিয়া শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ভিড়। প্রশ্ন এবং উত্তর চলিতেছে। যাহা হউক ভাট-সাহেবকে অনুনয় করিয়া রাজী করাইয়া স্বামীজীকে আমার গৃহে লইয়া আসি। আমার গৃহে তিনি প্রায় ৯ দিন বাস করেন। এই সময়ে আমার বহু বৎসরের পুঞ্জীভূত সংশয় দূর হইয়া যায়।'

চতুর্থ দিবসে স্বামীজী বেলগাঁও ত্যাগ করিতে চান; কিন্তু হরিপদবাবু বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় তিনি আরও কয়েকদিন থাকেন। স্বামীজী তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনের নানা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি অর্থ স্পর্শ না করার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাও বলেন। বহু লাঞ্ছনা ও ক্লেশ, যাহা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়া 'এ-সবই মায়ের খেলা' বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেন।

হরিপদবাবু স্বামীজীর অসাধারণ স্মরণশক্তি ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য হন। হরিপদবাবু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া উহার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এবং বাস্তব জীবনে উহার কোন উপকারিতা নাই ভাবিয়া পাঠ ত্যাগ করেন। স্বামীজীর নিকট উহার কতকাংশের ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, গীতা কি অপূর্ব গ্রন্থ! উহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এবং বাস্তব জীবনে উহার কি উপকারিতা, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। স্বামীজীর উপদেশে শুধু গীতাই নয়, টমাস কার্লাইলের রচনা এবং জুল ভার্নের উপন্যাসও তিনি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন।

হরিপদবাবু স্বামীজীর গভীর দেশপ্রেমেরও পরিচয় পান। তিনি ভিক্ষা দেওয়ার বিরুদ্ধে মত পোষণ করিলেও স্বামীজী তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, তাহাতে তাঁহার মত কতকটা পরিবর্তিত হয়। স্বামীজী বলেন, 'যাহাদের দিবার সামর্থ্য আছে, ভিখারীকে তাহাদের কিছু দেওয়া উচিত। ঐ পয়সায় ভিখারী কি করে, তাহা দেখার প্রয়োজন নাই। চুরি করার চেয়ে ভিক্ষা দিয়া চুরির পথ বন্ধ করা ভাল; সমাজের পক্ষে ইহা বিশেষ মঙ্গলকর।'

হরিপদবাবুর নানা ঔষধ খাইবার অভ্যাস ছিল। স্বামীজীর উপদেশে তিনি এই অভ্যাস ত্যাগ করেন। যদিও তাঁহার বেশ বড় চাকরিই ছিল এবং ভাল মাইনেও পাইতেন, তবু উপরওয়ালা (ইংরেজ) কখনও ভর্ৎসনা করিলে খুবই রাগিয়া যাইতেন। স্বামীজীর উপদেশে এই অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। তিনি তাঁহাকে পরের দোষ দেখিতে নিষেধ করেন। স্বামীজী বলেন, 'অন্যেরা আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, তাহাতে আমাদেরই মনের অবস্থা প্রতিফলিত হয়।' এইরূপে হরিপদবাবু নবজীবন লাভ করেন।

হরিপদবাবু ও তাহার স্ত্রী ইন্দুমতী দেবী, উভয়ে স্বামীজীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিয়া সফলকাম হন এবং নিজেদের জীবন ধন্য করেন। স্বামীজী হরিপদবাবুর নিকটেও চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় যাইবার বাসনা ব্যক্ত করেন। মিত্র মহাশয় উৎসাহ সহকারে পাথেয়-সংগ্রহের জন্য চাঁদা উঠাইতে প্রস্তুত হইলে স্বামীজী নিষেধ করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে হরিপদ মিত্রকে লিখিত স্বামীজীর ৬ খানি পত্র এবং শ্রীমতী মিত্রকে লিখিত ৪ খানি পত্র পাওয়া যায়।

লিমডির ঠাকুর-সাহেব

১৮৯২ খৃঃ স্বামীজী গুজরাটের অন্তর্গত লিমডিতে যান। পথে একদল সাধুর সহিত দেখা হওয়ায় তিনি তাহাদের আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনি তাহাদের হাতে বন্দী এবং এই সাধুর দল নিতান্তই ভণ্ড এবং নানারূপ কুৎসিত ক্রিয়ায় লিপ্ত। তিনি কৌশলে লিমডির শাসক ঠাকুর-সাহেবকে তাঁহার বিপদের সংবাদ পাঠাইতে সমর্থ হন এবং ঠাকুর-সাহেবও তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া নিজ রাজ-প্রাসাদে রাখেন। ঠাকুর-সাহেব স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়ে স্বামীজী বহু পণ্ডিতের সহিত সংস্কৃতে আলাপ-আলোচনা করেন। পুরী গোবর্ধন মঠের ভূতপূর্ব শঙ্করাচার্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বামীজীর শিক্ষা ও সহিষ্ণুতায় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন লিমিডিতে বাস করিয়া তিনি জুনাগড় রওনা হন। ঠাকুর-সাহেব পূর্বঘটনা স্মরণ করাইয়া স্বামীজীকে পথে সাবধান হইতে অনুরোধ করেন।

অতঃপর পুনায় থাকাকালে স্বামীজী জানিতে পারেন যে, লিমডির ঠাকুর-সাহেব মহাবালেশ্বরে আছেন। তাই তিনি ঠাকুর-সাহেবের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে মহাবালেশ্বরে যান। ঠাকুর-সাহেব স্বামীজীকে তাঁহার সহিত লিমডিতে যাইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। শুধু তাহাই নহে, সেখানে বাকী জীবন বসবাস করিতে অনুরোধ করেন। স্বামীজী সম্মত হন না এবং বলেন, তাঁহার বিশ্রামের সময় আসে নাই, তাঁহাকে কাজ করিতে হইবে। যদি কখনও তাঁহার জীবনে বিশ্রাম লইবার সময় আসে, তবে তিনি লিমডিতে আশ্রয় লইতে স্বীকৃত আছেন। কিন্তু এই মহামানবের কর্মবহুল জীবনে সেই দিন আর আসে নাই।

স্বামী সচ্চিদানন্দ (দ্বিতীয়)

পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দার্জিলিঙে স্বামীজী ১৮৯৭ খৃঃ কিছুকাল এম. এন. ব্যানার্জীর গৃহে অবস্থান করেন। মতিলাল মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তিও ঐ সময় উক্ত পরিবারে বাস করিতেছিলেন। ঐ সময় মতিলালের জ্বর হইয়া বিকারে পরিণত হয়। স্বামীজী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দেন। ইহার পরই জ্বর বন্ধ হইয়া যায় এবং মতিলাল স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করিয়া আরোগ্য লাভ করেন।

মতিলাল অতিশয় ভাবপ্রবণ ছিলেন। সংকীর্তনেরসময় প্রায়ই তাঁহার ভাব হইত। তখন তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতেন, আর্তনাদ করিতেন এবং গড়াগড়ি দিয়া মাটিতে হাত-পা ঘষিতেন। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া স্বামীজী একদিন তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দেন। সেইদিন হইতে মতিলালের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, তিনি একজন অদ্বৈতবাদীতে পরিণত হন। মতিলাল ইহার পর হইতে ভাবপ্রবণতার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া জ্ঞানযোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত হন এবং জ্ঞানমার্গের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব ভাব আর তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইত না।

এই মতিলালই পরে বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া সন্ন্যাস লইয়া 'স্বামী সচ্চিদানন্দ' নামে স্বামীজীর শিষ্যগণ মধ্যে পরিগণিত হন। স্বামীজী ইহাকে ১৮৯৯ খৃঃ সন্ন্যাস দান করেন, তিনি 'দ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ' নামে পরিচিত।

সচ্চিদানন্দকে একবার আমেরিকায় পাঠানো হয় এবং তিনি লস এঞ্জেলেসে একটি বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসেন।

স্বামী সদাশিবানন্দ

স্বামী সদাশিবানন্দ 'ভক্তরাজ মহারাজ' নামেই সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম হরিনাথ ওহদেদার। তিনি সাত বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। তাঁহার পিতৃব্য তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। বাল্যকালে হরিনাথ ইংরেজী ও হিন্দী ব্যতীত ফারসী ও উর্দু শিক্ষা করেন। তিনি কয়েক বৎসর যুক্ত প্রদেশে এবং কিছু সময় বিহারে অতিবাহিত করিয়া প্রায় অষ্টাদশ বৎসর বয়সে মাতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কাশীধামে বসবাস করিতে আসেন। এখানেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শৈশব হইতেই হরিনাথের ভিতরে ভক্তিভাব দেখা যাইত। বাল্যাবধি তিনি গীতা ও ভাগবত পাঠ শুনিতে ভালবাসিতেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি একবার হরিদ্বারে যান। হৃষীকেশে সাধুদিগকে দেখিয়া তাঁহার মনে সন্ন্যাসী হইবার বাসনা জাগে। কিন্তু দশনামী সম্প্রদায়ের একজন মঠাধীশ তাঁহাকে গৃহে যাইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিতে বলেন।

কাশীতে আসিয়া হরিনাথ কেদারনাথ (অচলানন্দ) ও চারুচন্দ্রের (শুভানন্দ) সহিত পরিচিত হইলেন। ক্রমে এই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই বন্ধুদের নিকটই হরিনাথ প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার সহিত পরিচয় লাভ করেন। হরিনাথের নিজস্ব ভাব ছিল অন্যরূপ, সেবা ইত্যাদি দ্বারা ধর্মলাভ হয়—এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল না, কিন্তু চারুচন্দ্রের চেষ্টায় হরিনাথ ১৮৯৮ খৃঃ সেবাকার্যে ব্রতী হন এবং ক্রমে তিনি কাশী সেবাশ্রমের কাজে চারুচন্দ্রকে আন্তরিক সাহায্য করিতে থাকেন।

১৯০২ খৃঃ প্রারম্ভে স্বামীজী কাশীধামে

আসিলে বন্ধুগণসহ হরিনাথ স্টেশনে যাইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। হরিনাথ স্বামীজীর গলায় মাল্যদান করেন। সকলে মিলিয়া স্বামীজীর পাদবন্দনা করেন।

এই সময় হরিনাথ স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা-প্রাপ্ত হন। কিন্তু সাংসারিক দুর্বিপাকে হরিনাথকে এলাহাবাদ বাংলা স্কুলে প্রায় ১৮ বৎসর শিক্ষকতা করিতে হয়। ১৯২০ খৃঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। এতকাল পরে হরিনাথের কৈশোর স্বপ্ন সফল হইল। গুরু-নির্দেশে তিনি পরিব্রাজক সাধুজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। সকল কর্ম ত্যাগ হইয়া গেল। শিক্ষকতা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাক্তন ছাত্রগণ তাঁহাকে 'মাষ্টার মহাশয়' নামেও ডাকিতেন।

উত্তর ভারতে গঙ্গার উপকূলেই তিনি 'রমতা-সাধু'-রূপে ভ্রমণ করিতেন। ভক্তরাজ মহারাজ বলিতেন, 'এক হাতে ঠাকুরকে ধরে আছি, অন্য হাতে স্বামীজীকে।' হঠাৎ কোনও খবর না দিয়া আসিয়া কাশীতে উপস্থিত হইতেন, তখন যেন আনন্দের হাট বসিয়া যাইত।

৮২ বৎসর বয়সে ১৯৬০ খৃঃ ১০ই ফেব্রুআরি এই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী ইহলীলা সংবরণ করিয়া বাঞ্ছিত ধামে প্রয়াণ করেন।

অসতো মা সদ্গময়

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পরম-আনন্দঘন মুরতি মাধব,
মাতা-পিতা-বন্ধু-সখা তুমি মোর সব!
আমার ঐশ্বর্য তুমি, তুমি বিদ্যা মম!
ধন নয়, জন নয়; ওগো নিরুপম,
জন্মে জন্মে তোমারেই যেন ভালোবাসি!
আর যাহা ক্ষণিকের—ক্ষণতরে আসি
ক্ষণেকে মিলায়ে যায় বুদ্বুদের প্রায়!
প্রসারিয়া দুই বাহু মৃত্যুর ছায়ায়
প্রার্থনা করিল তাই আর্য ঋষিগণ:
'অনিত্য হইতে নিত্যে, সত্যনারায়ণ,
লহো মোরে!' আজ আমি কাঁদি হীনমতি;
তোমার ধ্যানের যাগ-প্রদীপের জ্যোতিঃ
আমার মনের মাঝে নিয়ত জ্বালায়ে
মায়াসিন্ধু করো পার চরণের নায়ে।

স্বামীজীর গ্রন্থপ্রীতি

অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভার কথা আজ বিশ্ববাসী সকলেই স্মরণ করিতেছে। আমাদের অধঃপতিত এই দেশে তাঁহার মতো এক মহাপুরুষের আবির্ভাব সত্যই এক অভিনব ব্যাপার। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগ্রহ ও প্রেম অবশ্যই নরেন্দ্রনাথকে কর্মযোগী সন্ন্যাসীতে পরিবর্তিত করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অন্তরের ভক্তি নিষ্ঠা ও ভালবাসা তিনি তাঁহার পিতা-মাতার তথা তাঁহার বংশের ধারা হইতেই পাইয়াছিলেন। তাঁহার বাল্যজীবন তথা স্কুল-কলেজের ছাত্রজীবনের যে পরিচয় আমরা পাই, তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, চারিত্রিক গাম্ভীর্য, সহৃদয়তা, আত্মসম্মানজ্ঞান, জ্ঞানানুরাগ ও অনুশীলন, বন্ধুপ্রীতি ও সংগঠনশক্তি—এই সমস্তই তাঁহার ভিতর বাল্যাবস্থা হইতেই অঙ্কুরিত ছিল। জ্ঞানানুশীলন তথা গ্রন্থপ্রীতিও অনুরূপভাবে তাঁহার চরিত্রে বাল্য হইতেই প্রবেশ করিয়াছিল। ক্রমে উত্তর-জীবনে বহুমুখী জ্ঞান-পিপাসা এই গ্রন্থপ্রীতি হইতেই কি-ভাবে পরিতৃপ্ত হয়, তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই।

প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় হইতেই নরেন্দ্রনাথ তাঁহার সমবয়সী বালকদের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞান-আহরণে সমর্থ হন। ঐ সময়ের পূর্বেই তিনি বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের বহু উৎকৃষ্ট তথা প্রামাণিক পুস্তক পাঠ করেন। ছাত্রজীবনে তাঁহার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন ও বিজ্ঞানের উপরে অধিকতর আকর্ষণ ছিল এবং এই সব বিষয়ের তৎকালীন প্রামাণিক পুস্তকাদির অধিকাংশই তিনি পাঠ করেন। ১৬।১৭ বয়সের যুবক ভারতীয় ইতিহাসের কঠিন পুস্তকাদি যথা—মার্শমেন ও এলফিনস্টোনের লিখিত প্রামাণিক পুস্তকসমূহ পাঠ শেষ করেন। পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা অন্যান্য পুস্তকাদি পাঠের উপর তাঁহার আগ্রহ বেশী থাকায় অনেক সময়ে দেখা যাইত যে, পরীক্ষার অল্প কিছুদিন পূর্বে তাঁহার পাঠ্য পুস্তক অপঠিত রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে রাত্রি জাগিয়া পাঠ্য পুস্তক শেষ করিতে হইত। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ২।৩ দিন পূর্বে তিনি দেখিলেন, জ্যামিতি তাঁহার পড়াই হয় নাই। এমতাবস্থায় তিনি ঐ অল্প সময়ের ভিতরই সারা রাত্রি জাগিয়া জ্যামিতি-পাঠে মনোনিবেশ করেন এবং ২৪ ঘণ্টায় অদ্ভুত মননশীলতায় জ্যামিতির চারিখণ্ড পুস্তক আয়ত্ত করেন!

পুস্তকপ্রীতি ও পুস্তকপাঠের এক অদ্ভুত ধারার পরিচয় আমরা পাই তাঁহার নিজের লেখা হইতেই। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যে-কোন লেখকের লেখা তাঁহাকে আর প্রতিটি লাইন ধরিয়া পড়িতে হইত না। পুস্তকের বিভিন্ন পরিচ্ছেদের প্রথম ও শেষ কয় পঙ্‌ক্তি পড়িলেই পৃষ্ঠার ভিতর যাহা আছে, তাহা তাঁহার অজানা থাকিত না। অনেক সময়ে এমনও হইত যে, লেখক কোন এক বিষয়ের অবতারণা করিয়া ৫।৭ পাতা ধরিয়া তাহার আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু স্বামীজীর কাছে তাহা ২।১টা লাইন পাঠের পরই সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইত। দ্রুত পাঠের এই অদ্ভুত ক্ষমতা স্বামীজীকে উত্তর জীবনে বহুলাংশে অতি অল্প সময়েই নানা বিষয়ের জ্ঞান-গর্ভ পুস্তকাদির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। এই ক্ষমতা সকলের থাকে না, অথবা সকলে আয়ত্ত করিতে পারে না।

অন্তরঙ্গ শিষ্য ও গুরুভাইদের সহিত মীরাটে অবস্থানকালে স্বামীজী সেখানকার সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে বহু পুস্তকাদি পাঠ করেন। একবার তিনি স্বামী অখণ্ডানন্দকে গ্রন্থাগার হইতে John Lubback-এর গ্রন্থাবলী আনিতে বলেন। মাত্র একদিনের ভিতরই বইগুলি পড়িয়া পরদিন গ্রন্থাগারে সেগুলি প্রত্যর্পণ করিতে পাঠান। গ্রন্থাগারিক কোনরূপেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, মাত্র একদিনের ভিতরই কেহ Lubback-এর সমুদয় পুস্তকাদি পাঠ শেষ করিতে পারেন। তখন স্বামীজী নিজে গ্রন্থাগারে যাইয়া গ্রন্থাগারিককে স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, সত্যই তাঁহার সমুদয় পুস্তক পড়া হইয়া গিয়াছে এবং গ্রন্থাগারিক ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে এ বিষয়ে যে-কোন প্রশ্ন করিতে পারেন—তিনি তাহার উত্তর দিতে প্রস্তুত। গ্রন্থাগারিক নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া নিজ ভুল বুঝিতে পারেন এবং স্বামীজীর পুস্তক-পাঠের অদ্ভুত রীতি দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হন। পরে স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বলেন যে, তিনি কখনও কোন পুস্তকের আদ্যোপান্ত লাইন ধরিয়া পড়েন না—অনুচ্ছেদের আরম্ভ ও শেষাংশ ধরিয়া কোথাও বা পাতার পর পাতা এক নিমেষে দেখিয়া লইয়া লেখকের অভিপ্রায় ও বক্তব্য সব বুঝিয়া লন।

স্বামীজীর দার্শনিক জ্ঞান তাঁহার কর্মপ্রবৃত্তির ভিতর অঙ্কুরিত ছিল এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তি প্রেম ও নিষ্ঠার অদ্ভুত সংমিশ্রণে তাহা এক অপরূপ রূপ ধারণ করে। পরিব্রাজক-জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বামীজী যখন যেখানে গিয়াছেন, স্থানীয় রাজা-মহারাজা সকলেই তাঁহাকে সাদরে নিজ নিজ প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সব আতিথ্যের সুযোগে স্বামীজী রাজা-মহারাজাদের যে-সব বিভিন্ন পুস্তক-সংগ্রহ ছিল, তাহার সদ্ব্যবহারের সুযোগ ছাড়েন নাই। বিভিন্ন শাস্ত্র, বেদ, পাণিনি ও নানা বিষয়ের বিভিন্ন পুস্তক তিনি তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনে পাঠ করেন খেতড়ি-মহারাজের প্রাসাদে, মহীশূর রাজপ্রাসাদে ও গুজরাটে বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা-কালে। পোরবন্দর শহরে স্থানীয় দেওয়ান প্রখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের আতিথ্য গ্রহণ করেন। পণ্ডিত পাণ্ডুরঙ্গ তখন বেদের অনুবাদে ব্যস্ত ছিলেন। স্বামীজীর বেদের উপর অদ্ভুত জ্ঞান ও দখল দেখিয়া তিনি প্রায় ১১ মাসকাল স্বামীজীকে তাঁহার কাছে রাখেন এবং বেদের গূঢ় তথ্যাদির রহস্য ও জ্ঞান স্বামীজীর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা হইতে সহজেই আয়ত্ত করিয়া নিজ অনুবাদের সহায়তা করেন। পণ্ডিতের সাহায্যে স্বামীজীও তাঁহার জ্ঞানানুশীলন অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও পাণিনির ব্যাকরণ আদ্যোপান্ত পাঠ শেষ করেন। পণ্ডিত পাণ্ডুরঙ্গ স্বামীজীকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতে অনুরোধ করেন ও বলেন যে, উহা ভবিষ্যতে তাঁহার কাজে লাগিবে। স্বামীজী ফরাসীও কিছুটা আয়ত্ত করেন এবং উত্তরকালে এই ভাষাজ্ঞান তাঁহার ইওরোপ-ভ্রমণে বেশ কিছু কাজে লাগে। ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম তথা ভারতীয় কলা ও কৃষ্টির সম্যক্ পরিচয় দিয়া পশ্চিমের জনসাধারণকে ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া ও ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করাই ছিল তাঁহার অন্যতম লক্ষ্য। তজ্জন্যই ভারতের বেদ বেদান্ত উপনিষদ্ পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি ও ও বিভিন্ন ধর্মমতাদির বিষয় বিশদ জ্ঞানলাভ এবং ভারতকে যথাযথরূপে জানিবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করিয়াছিলেন; শুধু তাহাই নহে, পশ্চিমে যাইয়া ভারতের বেদান্ত প্রচার করিতে

হইলে পশ্চিমের বিভিন্ন ধর্মের সহিতও প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রয়োজন, ইহাও তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এই সব বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ বিভিন্ন প্রামাণিক পুস্তক পাঠ ভিন্ন সম্ভব নয়—তাহা তিনি বুঝিতেন এবং এইজন্যই তিনি পুস্তকপাঠের যতপ্রকার সুযোগ যখন যেখানেই পাইয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থপ্রীতি অসীম এবং গ্রন্থপাঠের তাঁহার পন্থাও অভিনব। যে ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে তিনি আদ্যোপান্ত না পড়িয়াও লেখকের বক্তব্য তথা লেখার সারাংশ গ্রহণে কৃতকার্য হইতেন, তাহা সত্যই আশ্চর্যজনক।

পশ্চিমে প্রবাসকালে তাঁহার এই গ্রন্থপ্রীতি ও গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ বহুল পরিমাণে বর্ধিত হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের পুস্তক-পত্রিকা, সমসাময়িক পত্র—যাহা ভারতবর্ষে দুর্লভ ছিল, তাহা পড়িবার সুযোগ পান এবং তাঁহার অভিনব পাঠকৌশলে অতি অল্প সময়েই বিরাট বিরাট গ্রন্থসমূহ পড়িয়া শেষ করিতে থাকেন। পুরাতন ইতিহাস, ঈজিপ্টের পুরাতত্ত্ব, খৃষ্টধর্মের পূর্বাবস্থা, ইওরোপীয় দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং আমেরিকা ইংলণ্ড ও ইওরোপের মনীষীদিগের সহিত আলাপ-আলোচনা তথা শাস্ত্রচর্চা-কালে বিভিন্ন সারগর্ভ পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাইয়া তৎসমুদয় আয়ত্ত করিয়া নিজের জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করেন। এ বিষয়ে তাঁহার লিখিত বিভিন্ন পত্র হইতে আমরা তাঁহার পুস্তকপাঠের তথা পুস্তক-প্রীতির নানারূপ পরিচয় পাইয়া থাকি। বিদেশের বিভিন্ন বক্তৃতাবলীতে তাঁহাকে উদাত্ত ভাষায় ভারতীয় ধর্ম ও বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতে হইত। পশ্চিমের ধর্ম ও ধর্মজীবন সম্বন্ধেও তাঁহাকে কিছু কিছু তুলনামূলক ভাবে উল্লেখ করিতে হইত—পশ্চিমের জনসাধারণ আমাদের দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অনেকাংশেই বিদ্বান্ ও অনুসন্ধিৎসু। প্রতি বক্তৃতার পরই বক্তাকে শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া তাহাদের সন্দেহ দূর করিতে হয়। এজন্য তাঁহাকে উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইত। এই প্রস্তুতির পথে তাঁহার অদ্ভুত পাঠ কৌশল তথা গ্রন্থপ্রীতি তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিত। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা না থাকিলে স্বামীজী যাহা করিয়াছেন, তাহা করা সম্ভব হইত না—এ-কথা তিনি চিকাগো ধর্মসম্মেলনে বক্তৃতার প্রাক্কালে কী অদ্ভুতভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়াছেন। বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া কি বলিবেন—কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। গুরুকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই কৃপাবলে সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জাগ্রত হইল—'মূক বাচাল হইল—পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিল'। 'আমেরিকার ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ' বলিয়া উদাত্ত স্বরে তিনি নিজ বক্তব্য আরম্ভ করিলেন—বিদগ্ধ জনতা সচকিত হইল—এ যাবৎ কেহ কখনও এভাবে তাহাদের সম্বোধন করে নাই! স্বামীজীর সারগর্ভ উদাত্ত আহ্বানে আমেরিকার তথা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্মিলিত জনতা তাহার আবেদনে সাড়া দিল। তিনি সকলেরই হৃদয় জয় করিলেন।

ইওরোপ পরিভ্রমণকালে যখন স্বামীজী কীল (Kiel) শহরে দর্শনের অধ্যাপক প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ ডয়সনের (Paul Deussen)-এর গৃহে যান এবং অধ্যাপকের নিজস্ব গ্রন্থাগারে সংস্কৃত ও প্রাচ্য দর্শনের বিভিন্ন পুস্তকাদির সংগ্রহ দেখিয়া পুলকিত হইয়া ধর্মের নানা বিষয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যায় উভয়েই পরিতৃপ্ত হন। এই সময়ে স্বামীজী একটি কবিতার বই দেখিয়া সোৎসাহে তাহা পড়িতে থাকেন,

অধ্যাপক স্বামীজীকে দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইয়া ক্ষুণ্ণ হন। স্বামীজী পরে তাহা জানিতে পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন ও বলেন তিনি কবিতা-পুস্তকটির প্রতি এতই আকৃষ্ট হন যে, অধ্যাপকের প্রশ্ন শুনিতে পান নাই। অধ্যাপক স্বামীজীর এই কথা প্রথমে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে যখন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী ঐ কবিতা-পুস্তক হইতে বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেন, তখন অধ্যাপক বিস্ময়াভিভূত হইয়া স্বামীজীর মননশীলতায় মুগ্ধ হন। স্বামীজীর গ্রন্থপ্রীতির এইরূপ বহু নিদর্শন পাওয়া যায় এবং তাঁহার যে-কোন বিষয়ে মনঃ-সংযোগ এতই গভীর যে, তাঁহার নিজের কথায় যে-কোন ব্যাপারেই তিনি যোগিগণের ন্যায় মনোনিবেশ করিতে পারেন, এমনকি জ্বলন্ত অঙ্গার তাঁহার দেহে স্পর্শ করিলেও তাঁহার ধ্যান ভাঙিত না বা মন বিক্ষিপ্ত হইত না। এই অদ্ভুত মননশীলতার বলেই তিনি দিগ্বিজয় করিতে পারিয়াছিলেন। একাগ্রতার অভাবে আজ আমাদের ছাত্রেরা এত বিক্ষিপ্তচিত্ত। 'ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ'—এইভাবে তপ বা ধ্যান করিবার মতো পড়িয়া অনন্যমনে যদি আমাদের ছাত্রেরা অধ্যয়ন করিতে পারে, তবে তাহাদের কৃতকার্যতা সুনিশ্চিত। স্বামীজীর চরিত্রে এই মননশীলতা সর্বদাই তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে। মাকে যখন ভাবিতে হইবে, সেই শিশুর মতো—অকপটে অনন্যমনা হইয়া ভাবিতে হইবে, তবেই না বিশ্বজননী সে ডাকে সাড়া দিবেন। ডাকার মতো ডাকিতে পারিলে, যাঁকে ডাকা যায়, তিনি না আসিয়া পারেন না—এ বিশ্বাস স্বামীজীর মনে গভীর ভাবেই ছিল এবং এই বিশ্বাসের মূলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও ভালবাসা। স্বামীজীর কর্মময় জীবনমাত্র ৯।১০ বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল—কিন্তু ঐ অল্পসময়ের ভিতর তিনি যে অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়া জ্ঞান-গরিমা ও কর্মশক্তি-বলে ভারতকে—জগৎসভায় লুপ্ত আসন উদ্ধারের পথে ধর্ম-কলা-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহার নত মস্তক উন্নত করিবার প্রচেষ্টায় অগ্রসর, দেশকে ও দেশের জনসাধারণকে আত্মগরিমায় উদ্বুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—তাহা জানিলে শ্রদ্ধায় সকলেরই মস্তক তাঁহার চরণে আপনা হইতেই নত হয়।

বিবেকানন্দের কবিতা

শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন্ সে সুদূর যুগের বাণী :
'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ।'

এটি আজও অমর হয়ে আছে। অমর হয়ে আছে অমর কবির বাণী ব'লে। 'কবয়ো বদন্তি'—কবিরা বলেন অর্থাৎ শাশ্বত বাণী উচ্চারণ করেন। গভীর অনুভূতি নিয়ে সত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে বলেন বলেই তা অবিনশ্বর। কবিরা বলেছেন : 'ওঠ, জাগো, অভীষ্ট লাভের পথে এগিয়ে চল। ক্ষুরধার দুর্গম পথে যাত্রা করতে হবে। যত দূরই হোক, লক্ষ্যে পৌঁছতেই হবে তোমাকে।

এমনি ক'রে যিনি বলতে পারেন, ডাক দিতে পারেন, তিনিই কবি। মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে ডাক দিয়ে যিনি সুপ্তি ভাঙতে পারেন, পরম কল্যাণের নির্দেশ দিতে পারেন, তিনিই সত্যিকারের কবি।

মানুষ শুধুই জীব নয়, সে সামাজিক জীব। জীবনধারণ করা আর সমাজের যোগ্য হওয়া—এই উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত হ'তে হয়। সুতরাং মানুষ হিসেবে পূর্ণতা লাভের জন্য—সকলের সঙ্গে মিলনে ও নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণের জন্য তৈরি করতে পারলেই মানুষের সার্থকতা ঘটে। বিশ্বের মাঝে পূর্ণভাবে সমর্পণের জন্য তাই মানুষকে নিজের পূর্ণতার পানে অগ্রসর হ'তে হয়। এই পথে নিজের সঙ্গে পরের, স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের সংঘাত দেখা দেয়। এই সংঘাতের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা যেমন কঠিন, তেমনি সুন্দর। কবি এই কাজ করেন। তাই কবির ভাষা তার নিজের সৃষ্টি নয়। তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে সুন্দরের অনুভূতির যে আবেগ সৃষ্ট হয়, আপন বেগে তা বাইরে প্রকাশিত হ'তে চায় এবং বিকাশলাভ করে ভাষার বন্ধনে সৃষ্ট কবিতায়। কবি যে ভাবটি যেমন ক'রে ব্যক্ত করতে চান, ভাষা ঠিক তেমনি ক'রে রাশ মানে না। যেটা বলবার ভাষা, ঠিক সেটা বলতে পারেন না—কতক বলা যায় এবং কতক বলা যায় না। তারই মধ্যে কবি সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে অন্তর্গূঢ় ভাবটি প্রকাশ করেন।

প্রকৃত কবির ধর্মই এই। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের একটি ঘটনা কবি বিবেকানন্দকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছে—যেন প্রভাতের প্রথম আলোয় শতদলের পাপড়িগুলিকে মেলে ধরেছে। ভগিনী নিবেদিতা 'The Master as I saw Him'—(স্বামীজীকে যেরূপ দেখেছি)—গ্রন্থের 'ক্ষীরভবানী' অধ্যায়ে লিখেছেন যে, অমরনাথ দর্শনের পর থেকে স্বামীজীর ভাবজগতে জগন্মাতার অনুধ্যান চলছিল। কথাপ্রসঙ্গে একদিন স্বামীজী বললেন—তাঁর মস্তিষ্ক কতকগুলি ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এগুলি লিপিবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না! সেদিন সন্ধ্যায় বেড়িয়ে ফিরে এসে নিবেদিতা ও সঙ্গীরা 'Kali the Mother' কবিতাটি দেখতে পান। এক সুতীব্র দিব্য প্রেরণার আবেগে কবিতাটি রচনার পর অবসন্ন স্বামীজী মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।

এই 'Kali the Mother' কবিতাটির সার্থক অনুবাদ করেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত :

মৃত্যুরূপা মা আমার আয় !
করালি ! করাল তোর নাম,
মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ;
তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ
প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে।
কালি, তুই প্রলয়রূপিণী,
আয় মাগো আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়,
মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,
কালনৃত্য করে উপভোগ,
মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।

এটি কি শুধু কবিতা ? আত্মার অক্ষরে লেখা একটি জীবন্ত ভাবানুভূতি। এ যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গনের আলেখ্য। মৃত্যুরূপাকে প্রত্যক্ষ দর্শন। এই অনাবরণ প্রস্ফুটন, মৃত্যুর এই মহান্ অনুভব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্যানুভূতি আর কি হ'তে পারে ? তাই বিবেকানন্দ শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু কবি সেই অর্থে, যে অর্থে কবি দ্রষ্টা, সত্যদ্রষ্টা, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাতীতের দ্রষ্টা।

একদিন ভারতবর্ষের তপোবনে যে অমৃতবাণী উত্থিত হয়েছিল, মূঢ়তা স্বার্থপরতা ও দ্বন্দ্বের উচ্চরোলে তা চাপা পড়েছিল। যে ভারতের ঋষি বিশ্ববাসীকে ডেকে বলেছিলেন—

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

—সেই ভারতবর্ষ বিশ্বের চারদিক থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে নিজেকে বদ্ধ ক'রে রেখেছিল। সেই বদ্ধ দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হেনে উদাত্ত আহ্বান জানালেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

নবযুগের কবির আহ্বান সমগ্র পৃথিবীর আকাশ-বাতাস, গিরি-প্রান্তর, বন-জনপদ এক গভীর আবেগে পরিপ্লাবিত ক'রে তুলেছিল। যেন বিদ্যুৎপ্রবাহে সমস্ত সমাজের শিহরিত হয়ে উঠল।

তিনি আরও বললেন, 'পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু আমরা সিদ্ধিলাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে।… বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি—অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না। অগ্রসর হও, সম্মুখে—সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব—একজন পড়িবে, অন্য একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।'

এ তো বহুযুগের ওপার থেকে, কালসমুদ্রের অনন্ততরঙ্গ উত্তীর্ণ হয়ে ভেসে আসা উপনিষদের ঋষিরই সেই বাণী—এই অগ্নিময় ঝঙ্কার কি কাব্যবীণার ঝঙ্কার নয় ?

স্বামী বিবেকানন্দের কথা ভাবা মাত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে—তেজোদীপ্ত এক ব্রহ্মসত্তা কল্পনাতীত এক গতিবেগ নিয়ে সমগ্র ভারতে, ভারত থেকে আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইওরোপ প্রভৃতি ভূখণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমগ্র জগৎ বিস্মিত নেত্রে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখে শ্রদ্ধায় মস্তক নত করছে। মানুষের প্রতি অসীম প্রেমে তিনি বিগলিত হচ্ছেন। তাঁর পরম সত্তাটি সর্বদাই যেন অসীমের মধ্যে মিলিয়ে রয়েছে, অথচ তিনি আমাদের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তা জড়দেহে ধরা দিয়েছে। সূক্ষ্ম প্রকাশ পেয়েছে স্থূলের আবরণে। যেন একটা বহিরাবণের তেজের অন্তরালে সেই তেজোতীত জ্যোতিষ্মান্ বিরাজ করছেন। যেন তিনি বলছেন,

'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।'

বিবেকানন্দের কবি-মানস বুঝতে হ'লে তাঁর ঐ বহিঃপ্রকৃতির চিত্রটি মনে রাখতে হবে। আরও মনে রাখতে হবে—স্বামীজীর বহিঃরূপ আর অন্তঃরূপ অভিন্ন। তাই কবি বিবেকানন্দের যিনি অন্তর্যামী জীবনদেবতা, তিনিই বিশ্বদেবতা আত্মারূপে, প্রাণরূপে চরাচরে পরিব্যাপ্ত। দৃশ্যমান জগৎ সন্ন্যাসী কবির ভাবরাজ্যে অভিসারে চলেছে, মর্ত্য রূপ নিরন্তর অমৃত-লোকের দিকে যাত্রা করেছে। মর্ত্যের স্থূলরূপটি অবলুপ্ত হয়ে যখন তার ভাবরাজ্যে প্রবেশ করছে, তখনই তাঁর অন্তর মথিত ক'রে অমৃতবাণী নিঃসারিত হচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দের কবিতার ধর্ম এই। তিনি উপনিষদের কবি। যখনই তিনি নয়ন মেলে প্রকৃতিকে দেখেছেন, তখনই তিনি বহিঃ-প্রকৃতিকে দেখেননি, দেখেছেন দেশাতীত পরাৎপরকে—ব্রহ্মকে—সচ্চিদানন্দকে।

'সৃষ্টি' কবিতায় তাই স্বামীজী বলছেন—অনাদি অনন্ত নামবর্ণহীন অতি সূক্ষ্মভাবে বহু হবার বাসনা, তার থেকে অহংবুদ্ধির উদয়। সেই থেকে সূক্ষ্ম ও জড়জগৎ এবং তার সুখ-দুঃখের উৎপত্তি। কি অপূর্ব অনুভূতি কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে। অরূপের কামনা থেকেই রূপের সৃষ্টি। আমিত্বের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অপার ইচ্ছা-সমুদ্রে লাখে লাখে নানা রূপের জন্ম। এই রূপধারী জড় জীব ও প্রাণীর গতি, স্থিতি ও শক্তির শেষ নেই।

অনন্তকাল ধরে স্রষ্টার এই সৃষ্টিস্রোত বয়ে চলেছে। সেই এক অরূপ বিশ্বের অগণ্য রূপের মাঝে নিজেকে প্রকাশ করছেন। খণ্ডখণ্ড রূপ বা দেহের পৃথক্ কোন অস্তিত্ব নেই—প্রতিটিই অনন্ত ব্রহ্মের এক একটি অংশ মাত্র। আকাশের প্রতিটি তারা, বৃক্ষের প্রতিটি ফুল, মানুষ, কীট, পতঙ্গ—সব সেই ব্রহ্মের প্রকাশ।

'গাই গীত শুনাতে তোমায়'—কবিতাটি আত্মোপলব্ধির যেন একটি আলেখ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বা ভগবৎসত্তার সঙ্গে একাত্মবোধ—তুমি প্রভু, তুমি প্রাণসখা। আবার অনুভব করেছেন—আমি, তুমি অর্থাৎ স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণ অভিন্ন। আবার সেই এক সত্তাই বহুরূপে বিকাশলাভ করছে।

'নাচুক তাহাতে শ্যামা'—কবিতায় বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন সার্থক কাব্য-রূপে পরিস্ফুট। জীবনের কোমল ও কঠিন, রুদ্র ও মধুর ভাবগুলির সংঘাত কাব্যশিল্পে অপরূপভাবে ফুটে উঠেছে। জগতের নয়নাভিরাম মাধুর্য, পৃথিবীর নির্মম ভয়ঙ্কররূপ, তার ললিত সৌন্দর্য, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত-মুখর সংগ্রামের রূপ এবং কোমলতার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রকাশ ক'রে অবশেষে বলা হয়েছে—'সত্য তুমি মৃত্যুরূপা কালী।'

এই জগতের, এই জীবনের বাস্তব চিত্র এঁকে কবি বিবেকানন্দ বলছেন—মৃত্যুই যেখানে সত্য, সেখানে সমস্ত ভয় বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে এসে সংগ্রাম কর:

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তার
প্রেতভূমি চিতামাঝে।
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক তাহাতে শ্যামা।'

মৃত্যুর যে লীলা কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে, তা সকল পার্থিব বন্ধন-মুক্তির উপায়। মৃত্যুরূপ মহৎ সর্বনাশের পথেই অনন্তের সঙ্গে মিলন।

'সখার প্রতি' কবিতাটিতে স্বামীজীর জীবনের অভিজ্ঞতা যেন ছন্দের বন্ধনে ধরা দিয়েছে। এ

পৃথিবীতে মানুষ দুঃখকেই সুখ ব'লে ভেবে তৃপ্তি পায়। আসলে যা অন্ধকার, তাকেই আমরা আলো ব'লে ধরে নিচ্ছি, দুঃখকে সুখ, রোগকে স্বাস্থ্য বলতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ক্রন্দনই শিশুর জীবনের লক্ষণ—অর্থাৎ এ জগৎটার পরিচয়ই দুঃখে। এখানে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সুখের আশা করে না। অতএব—

'দাও আর ফিরে নাহি চাও,
থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
দাও দাও—যেবা ফিরে চায়,
তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।'

কবিতার শেষ চরণ-দুটি আপ্তবাক্যে পরিণত হয়েছে। মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে আজ এই শ্লোক ধ্বনিত হচ্ছে। যেমন ধ্বনিত হয়েছিল ঋষিদের সেই বাক্য—

'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'

বিশ্বজগতে যা কিছু চলছে, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখতে হবে। স্বামীজীও সেই অর্থেই বলেছেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?'

কবিত্বের চরম সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে 'সখার প্রতি' কবিতাটি।

সংখ্যায় অনেক কবিতা রচনা করেননি স্বামীজী। বাংলাতে গোটা-দশ, ইংরেজীতে হয়তো এর দু-তিন গুণ হবে, তাছাড়া সংস্কৃত ও হিন্দীতেও কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। গভীর আন্তরিকতা, প্রবল আবেগের স্পন্দন, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, আলোড়নকারী উদ্দীপনা কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে মাখানো রয়েছে!

বেদান্ত ও দর্শনের যে তত্ত্বপিপাসু হৃদয় নিয়ে তিনি ঈশ্বরান্বেষণে ব্রতী হয়েছিলেন, সেই তত্ত্ব-পিপাসু হৃদয়টিই কবিতার শতদলে পাপড়ি মেলেছে। ব্রহ্মদর্শীর দিব্যানুভবে কবিতাগুলি যেন বৈদিক ঋষির মন্ত্রের ভাবে অনুরঞ্জিত। তাঁর কবিতার শব্দে শব্দে যেন প্রাণের স্পন্দন, ছন্দে ছন্দে যেন তড়িৎপ্রবাহ, ভাববিন্যাসে যেন ব্রহ্মানুভূতি নির্গলিত হ'তে থাকে।

বিবেকানন্দের কবিতা যেন আমাদের ডেকে বলে: 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত'—ওঠ, জাগো।

'নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্'

শ্রীমতী ভারতী সেনগুপ্ত

১

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-রচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বাংলা সাহিত্য ও বৈষ্ণব দর্শনের একটি অমূল্য সম্পদ্। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথাকে অবলম্বন ক'রে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য ভাববস্তু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনদর্শন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর জীবনদর্শন পরবর্তী কালে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ও ভক্তবৃন্দের দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। এই দর্শন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সার-নির্যাস, কেবল ধর্ম নয়, কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁর অসাধারণ প্রতিভা- ও পাণ্ডিত্যবলে ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-কাব্য ও জীবন-আলেখ্যের সার্থক সমন্বয় করেছেন এই মহাগ্রন্থটিতে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলাদেশের ধর্ম সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিক যুগের নবসূচনা হয়েছিল। সাহিত্য-শাখায় প্রথম জীবনীকাব্যের মুদ্রণও হয় চৈতন্যজীবনীগুলির মধ্য দিয়ে। কিন্তু এই জীবনী-কাব্যগুলির সম্বন্ধে বিশেষ একটু কথা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর জীবৎকালেই ভক্তবৃন্দের চক্ষে ঈশ্বরের অবতার ব'লে গণ্য হয়েছিলেন, কাজেই চৈতন্য-জীবনীগুলির মধ্যে ভক্তের 'মানস-চৈতন্যে'র রূপ যতটা পরিস্ফুট হয়েছে, 'মানুষ-চৈতন্যে'র রূপ সব জায়গায় ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি, কারণ চৈতন্য-ভক্তবৃন্দ নিঃসন্দেহে ও নিঃসঙ্কোচে শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার ব'লে মনে করেছেন, তাই তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকে অলৌকিক লীলা ব'লে মনে করেছেন—

'অলৌকিক লীলা ইহ পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইবে তর্কে হয় বহু দূর॥'

শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর যে কাব্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যেও উল্লেখ করা হয়েছে—

'অদ্যাপিহ সেই লীলা করেন গৌররায়
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥'

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর গ্রন্থে কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলাকে একত্র বর্ণনা করেছেন :

'নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে পাঞি।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি॥'

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিবর্ণিত এই অলৌকিক ঘটনাকে সত্য ব'লে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হই বটে, কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, চৈতন্য-ভক্তবৃন্দের আবেগের এই আতিশয্য একেবারে অমূলক নয়। এঁরা পরমবৈষ্ণব, পরমভক্ত। এই ভক্তবৃন্দের হৃদয় তাঁদের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য ভক্তির রাগে রঞ্জিত, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ-ভাবলীলা তাই তাঁদের কাছে রাধাভাবে ভাবিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এইজন্য ভক্তহৃদয়ে তাঁদের আরাধ্য দেবতার যে অনন্ত দৈবলীলা তাঁরা অনুভব করেছেন, যে নিত্যলীলা তাঁদের হৃদয়ে অহরহ স্ফুরিত হয়েছে, সেগুলিকে তাঁরা পরমসত্য ব'লে বিনা-দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। বাস্তবিক এই দিক দিয়ে চৈতন্য-জীবনীগুলি হ'ল 'চরিতামৃত।' এখানে অমৃতের সন্ধান মেলে বেশী, চরিতের অংশ কম। এইজন্য এই জীবনী-কাব্যগুলিকে ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিকের সত্যান্বেষণের দৃষ্টিতে কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীর নিখুঁত বিচারের মানদণ্ডে সর্বদা বিচার করা চলে না। এগুলি হ'ল 'ভক্তিশাস্ত্র'। এই ভক্তিশাস্ত্রগুলির কাব্যরস পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করতে হ'লে

সে যুগের বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের কল্পনা ভক্তি ও বিশ্বাসের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিতে হবে। তা না হ'লে কাব্যগুলির প্রকৃত রসাস্বাদন থেকে থেকে আমরা বঞ্চিত হব।

২

বৈষ্ণব কবি বলেছেন—

'কি কহু প্রেমের কথা কহিতে ডরাই।
এমন আশ্চর্য ভাব কভু দেখি নাই॥'

কবি-উপলব্ধ এই 'আশ্চর্যভাব'কে দর্শনের ভাষায় বলা যায় 'অন্তরঙ্গ-স্বরূপ'। এই স্বরূপে—

'রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥'

সচ্চিদানন্দ পূর্ণকৃষ্ণের স্বরূপ তিনটি শক্তির মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

'আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥'

হ্লাদিনী শক্তির কাজ—

'হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

হ্লাদিনী শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভাব-জীবনে। বৈষ্ণব ভক্তকবির মতে এই হ্লাদিনী শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশকল্পে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর'-রূপে নদীয়ায় রূপ পরিগ্রহ করেন। মূলতঃ এই ভাবকে গ্রহণ করেই কৃষ্ণদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের জন্মের কারণকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমটি গৌণ কারণ, আর দ্বিতীয় কারণটি হ'ল মূল বা মুখ্য কারণ। গৌণ কারণ হ'ল—

'সেই তো গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥'

আপামর দ্বিজ চণ্ডালকে তিনি ঐশ্বর্যজ্ঞানশূন্য প্রেমভক্তির বলে উদ্ধার করেছেন। এই ঐশ্বর্য জ্ঞানশূন্য প্রেমভক্তি প্রদানের মূল পথ 'রাগমার্গ।' এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস গোস্বামী বলেছেন—

'রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ॥'

চৈতন্যরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। কবি-বর্ণিত 'রাগমার্গ' ভক্তির স্বরূপ কি?

'রাগমার্গ' ভক্তির স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্ত করেছেন গীতায়—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥'

—যাহারা যে ভাবেই আমাকে আরাধনা করে, আমি তাহাদিগের প্রতি সেই ভাবেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করি। হে পার্থ, সকল ব্যক্তি মৎ-প্রদর্শিত পথের অনুগামী।

রাগমার্গের উদাহরণ—

'মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধাভক্তি॥
আপনারে বড় ভাবে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥'

প্রেমের ক্ষেত্রে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই সমান। রাগমার্গ ভক্তি সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর উদ্ধৃতিটি বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না—'ভগবান সেখানে (প্রেমের ক্ষেত্রে) আমার চেয়ে বড় নহেন। তাই প্রেমের ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যের বা ঈশ্বরত্বের জুলুম চলে না। ঈশ্বরত্বের বা অধিকারের জুলুম থাকিলেই প্রেমের সব মহত্ত্ব গেল। তাই ভগবান্ বলেন—'ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।' প্রেম-রসে রসিকরূপে তিনি বলেন—'আমার ঈশ্বরত্ব যে মানিয়া লইল, সে তো আমার স্বকীয়। তাহাকে পাইব কি?······যে আমার অধীন, তাহাকে পাওয়া না পাওয়ার তফাত কি? যে যদি মুক্তবুদ্ধিতে আমাকে স্বীকার করে, তবেই তো সেই পাওয়াই হইল পাওয়া। শক্তির ক্ষেত্রে আমি ঈশ্বর হইলেও প্রেমের ক্ষেত্রে সে আমার সমান বা উচ্চে। সেখানে আমি তাহার অপেক্ষা বড় নহি, হয়তো বা হীনই হইব। তবেই তো প্রেম।'

শ্রীচৈতন্যদেব এই রাগমার্গ-ভক্তি-প্রচার-কল্পে অবতারত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই ভক্তিকে অস্ত্র করেই তিনি কলিযুগের জীবকে নিস্তার করতে এসেছিলেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামী-কৃত 'বিদগ্ধমাধব' গ্রন্থে আছে

'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥'

-যিনি করুণার বশবর্তী হইয়া সকলকে অন্য অবতার কর্তৃক অনর্পিত, মুখ্য উজ্জ্বল-রসগভ, স্বীয় উপাসনার সম্পত্তিরূপ ভক্তিপ্রদানের জন্য কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি সুবর্ণ অপেক্ষাও অধিক কান্তিমান্, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয়রূপ পর্বত-কন্দরে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হউন।

বৈষ্ণব দার্শনিকের মতে কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্বের ক্ষেত্রে এ কারণটি বাহ্য। তাঁর মতে প্রেম ও ভক্তি প্রদান ক'রে জগৎকে উদ্ধার করা চৈতন্য-অবতারত্বের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু মুখ্য নয়, গৌণবৃত্তি। মুখ্য কারণ হ'ল রাধা-ভাবের মধ্যে দিয়ে 'প্রেমরসনির্যাস করিতে আস্বাদন' সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্য-রূপে আবির্ভাব। কারণ চৈতন্যদেবের সমস্ত ভাবজীবন ছিল অপ্রাকৃত রাধা-প্রেমের ভাব-ব্যাখ্যা। বাস্তবিক চৈতন্য-আবির্ভাবের পর থেকেই চৈতন্য-ভক্তবৃন্দের কবিতা ও দার্শনিক-তত্ত্ব ব্যাখ্যা মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের স্থির বিশ্বাস—'আমার গোরা ভাবের রাধারাণী।' কৃষ্ণদাস কবিরাজও এই কথাই বলেছেন—'রাধিকার ভাবমূর্তি প্রভুর অন্তরে'। মূলতঃ এই ভাবের প্রেক্ষাপটে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। তত্ত্বটি কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের মৌলিক সৃষ্টি নয়। শ্রীরূপ-সনাতন-স্বরূপদামোদর প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকবৃন্দের রসতত্ত্ব-ব্যাখ্যা এবং কবিতায়ও এই সুরটি অনুরণিত হয়েছে। বৈষ্ণব-পদাবলীকার কোন এক 'মহাজন' লিখেছেন—

'যদি গৌরাঙ্গ না হইত, কি মেনে হইত,
　　কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা
　　জগতে জানাতো কে॥
মধুর বৃন্দাবিপিনমাধুরী-প্রবেশচাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥'

বাস্তবিক রাধাপ্রেমের মহিমা জগতে প্রচারিত হয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে। উপরি-উক্ত কাব্যের তত্ত্বটি চৈতন্য-লীলা উপলব্ধির সার-কুঞ্চিকা। শ্রীরাধা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির স্বরূপ। হ্লাদিনী শক্তির অপর নাম 'মহাভাব'। মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধা ও রসরাজরূপী শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে বৃন্দাবনে দ্বৈতরূপে লীলা ক'রে গেছেন, কিন্তু মূলে তাঁদের 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।' বৃন্দাবনে এই অদ্বৈত রূপের দ্বৈতপ্রকাশ হয়েছিল—মাত্র। কিন্তু এই দ্বৈতপ্রকাশে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ছিল আচ্ছন্ন, আর ব্রজলীলাও তাই অসম্পূর্ণ লীলা। ব্রজের অসম্পূর্ণ লীলা পূর্ণকল্পে কলিযুগে শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার ক'রে চৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নদীয়ায় আবির্ভূত হয়েছেন।

বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের যে তিনটি বাসনা পূর্ণ হয়নি, এবং মূলতঃ যেগুলি পূর্ণ করতে তিনি চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই তিনটি বাসনার স্বরূপ শ্রীস্বরূপদামোদর তাঁর কড়চায় একটিমাত্র শ্লোকে অতি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই শ্লোকটি চৈতন্যরূপ-পরিগ্রহের মূল কারণ ও সর্বসার ব্যাখ্যা :

'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥'

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জানতে চান—(১) শ্রীরাধার প্রেমের স্বরূপ কি? (২) রাধা কর্তৃক আস্বাদিত কৃষ্ণপ্রেমের যে অদ্ভুত অনন্ত মাধুর্য, সেই মাধুরীর স্বরূপ কি? (৩) এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় প্রেমরস-আস্বাদনে শ্রীরাধা যে 'সুখ' অনুভব করেন, সেই সুখ আস্বাদনের যে আনন্দ, সেই সুখেরই বা স্বরূপ কি? এই তিনটি বাসনাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ণ ছিল ব্রজলীলায়, কারণ ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ 'রসরাজ' ও 'মহাভাব' এই দুই ভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্যলীলায় নদীয়ায় তিনি রাধাকৃষ্ণের অদ্বৈতরূপে শচীগর্ভসিন্ধু থেকে চন্দ্রের ন্যায় উদ্ভূত হয়েছেন।

শ্রীস্বরূপদামোদর-কৃত দার্শনিক ভাবটিকে কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী তাঁর অপূর্ব কাব্য-প্রতিভাবলে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে দার্শনিক তত্ত্বটি পাঠকের কাছে প্রাঞ্জল হয়েছে। কবি কৃষ্ণদাসকে অনুসরণ ক'রে আমরা এই তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।

রাধাপ্রেমের স্বরূপ—'অধিরূঢ় মহাভাব-স্বরূপা' শ্রীরাধা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমলীলার কামেশ্বরী। (বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রথম যুগে কাম ও প্রেমের প্রভেদ ছিল না) এই অপ্রাকৃত কামকে একমাত্র স্বর্ণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। জাগতিক কাম 'অন্ধতম' 'লৌহপিণ্ড' আর গোপীপ্রেম বিশুদ্ধ, নির্মল হেম।

'সেই গোপীগণের মধ্যে উত্তমা রাধিকা।
রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেম সর্বাধিকা ॥'

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে রাধার প্রেম সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে—

'না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমায় করে সর্বদা বিহ্বল ॥'

কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম হ'ল 'বিষয়জাতীয়', সেই বিষয়ের 'আশ্রয়' হলেন শ্রীরাধা। কৃষ্ণের অন্তরে শ্রীমতী রাধিকার 'আশ্রয়জাতীয় সুখ' আস্বাদনে মন ধায়। কিন্তু সে সুখের রস আস্বাদন করতে হ'লে রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করতে হবে। বৈষ্ণবকবি মানসচক্ষে শ্রীকৃষ্ণের সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন—

রাইরূপে তার অঙ্গ ঢাকা!
দেখে এলেম গৌর বাঁকা ॥

দ্বিতীয় বাসনা—কৃষ্ণপ্রেমের স্বরূপ কি? স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলায় স্বীয় প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি। কারণ 'বিজাতীয়' রূপে কৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্যের পূর্ণ প্রকাশ হয় না। অথচ ভগবান্ জানেন 'অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।' এই অনন্ত মাধুর্য-সংবলিত প্রেম আস্বাদন করতে পারেন একমাত্র মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা। রাধা-উপলব্ধ কৃষ্ণ-প্রেম-মাধুর্য আস্বাদনকল্পে 'রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়।' শ্রীকৃষ্ণের এই বাসনাটি অন্য একটি পঙ্ক্তিতে বিশ্লেষণ করা চলে—

'আপনি আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন।'

বাস্তবিক কৃষ্ণময় অন্তর কিন্তু ভাবকান্তি শ্রীরাধার—এই মিলন সম্ভব হয়েছে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের জীবনে। তাই বৈষ্ণব ভক্তগণের দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান্ তাঁর দ্বিতীয় বাসনাটি পূর্ণ করেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবজীবনের মধ্যে দিয়ে।

তৃতীয় বাসনাটি—কৃষ্ণপ্রেমের রসাস্বাদনে রাধার মনে যে জাতীয় সুখের সঞ্চার হয়, সেই সুখের রূপ কি?

'আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥'

যে 'সুখ' পূর্ণানন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেও আনন্দ দেয়, সে সুখের বিশেষণ আর কি হ'তে পারে! সমস্ত জগৎ কৃষ্ণপ্রেমসুখে নিমজ্জিত, কিন্তু

একমাত্র 'রাধারসে আমা করে বশ'।

'যদ্যপি আমার প্রেমে কোটীন্দু শীতল।
রাধিকার প্রেম আমা করে সুশীতল॥'

এই সুশীতল প্রেমের আস্বাদ ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সম্ভব হয়নি। কারণ সেই লীলায় ভগবানের 'রসরাজ' ও 'মহাভাব' দ্বৈতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। চৈতন্যলীলায় সেই ভাব অবিচ্ছেদ্য ভাবে দেখা দিয়েছে, যেমন অবিচ্ছেদ্য মৃগমদ ও তার গন্ধ; যেমন অবিচ্ছেদ্য অগ্নি ও জ্বালা। শ্রীচৈতন্যলীলায় ভগবান্ তাঁর বাসনা-তিনটিকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছেন এবং এই বাঞ্ছাত্রয় পূর্ণ করবার জন্যই তাঁর আবির্ভাব।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের এইটি হ'ল মূল সুর। এই মূল সুরটি অপূর্বভাবে প্রকাশিত হয়েছে কৃষ্ণদাস গোস্বামী-রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'। কবিরাজের অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব তিনি বৈষ্ণব-দর্শনের কঠিন তত্ত্ব ও তথ্যকে পরিবেশন করেছেন অপূর্ব কাব্যের মধ্য দিয়ে। দর্শনের দুরূহ তত্ত্বকে প্রাঞ্জল করেছেন এমন সব উপমা ও অলঙ্কারের সাহায্যে, যার জন্য কেবল দার্শনিক বা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বিগণের কাছে নয়, সাহিত্য-রসিকদের কাছেও পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক কৃষ্ণদাস গোস্বামীর গ্রন্থে চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভাবলীলার অপূর্ব ব্যাখ্যার পর শ্রীরাধার অধ্যাত্মমূর্তি আরও মহিমময় হয়ে উঠেছে। শ্রীচৈতন্য-আবির্ভাবের পূর্বে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার যে বর্ণনা পাই ('শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—বিদ্যাপতি), তার মধ্যে শ্রীরাধিকার মানবীমূর্তি বেশী ক'রে প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু চৈতন্য-আবির্ভাবের পর সেই মানবী রাধিকার মূর্তিকে বেষ্টন ক'রে একটি অপ্রাকৃত ছায়ামণ্ডিত অধ্যাত্ম-ভাব তার চারিপাশে বিরাজ করেছে। চৈতন্য-পরবর্তী পদকর্তাদের পদাবলীতে শ্রীরাধার যে অধ্যাত্ম-ভাবমূর্তি আমরা উপলব্ধি করি, সে মহিমা অনেকাংশে রাধাভাব-সুবলিত চৈতন্য-বিগ্রহের ঐতিহ্যের স্পর্শ। এইজন্য ধর্মকে বাদ দিয়েও নিছক কাব্যরস আলোচনা করতে গিয়ে রাধার অধ্যাত্মভাবময় ধ্যানমূর্তিকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না। বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তির ঐতিহ্যস্পর্শ ব্যতিরেকে বৈষ্ণবসাহিত্যের রস-আস্বাদনে কোথায় যেন অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

সমালোচনা

বেদমূর্তি-শ্রীরামকৃষ্ণঃ—স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষজয়ন্তী প্রকাশন (১৯৬৩)। স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। প্রকাশক—স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সেক্রেটারি, বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষজয়ন্তী সমিতি, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃষ্ঠা—২৯৯; মূল্য তিন টাকা।

ভারতের সংহতি ও ঐক্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়—সংস্কৃতকে সর্বভারতের ভাষারূপে গ্রহণ ও প্রচলন করা। ভারতদেহের রক্ত যদি হয় ধর্ম, তবে সংস্কৃত সেই রক্তবাহী ধমনী। স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কৃত শিক্ষা ও প্রচলনের গভীর অনুরাগী ছিলেন। তিনি বলিতেন, ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার সহিত মর্যাদা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যুগাচার্য স্বামীজীর শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত 'বেদমূর্তি-শ্রীরামকৃষ্ণঃ' নামীয় এই সংস্কৃত জীবনীগ্রন্থের প্রকাশন যথার্থই সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রথমাংশে জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্মের সমন্বয়মূর্তি ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের এবং শেষাংশে তাঁহার শক্তিরূপিণী শ্রীসারদাদেবীর দিব্য চরিতকথা সহজ সুবোধ্য ও সুললিত সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে ১১টি শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র, ৫টি শ্রীসারদাস্তব এবং ঈশ্বর, আত্মজ্ঞান, মায়া, জীব, গুরু, ধর্ম, সংসার, সাধন, জ্ঞান, ভক্তি, ধর্মসমন্বয় প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের দুইশত অমিয় উপদেশ সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের পূর্বপ্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা' নামীয় বাংলা পুস্তকের সংস্কৃতানুবাদ। কাশীর কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও অধ্যাপক অনুবাদ ও সম্পাদনা-কার্যে সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী-মন্দির ও পঞ্চবটীর চিত্রশোভিত প্রচ্ছদ মনোরম এবং মুদ্রণ সযত্নকৃত হইয়াছে। সংস্কৃত-জানা পাঠক-পাঠিকাদের নিকট গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

Classical Indian Philosophies: Their Synthesis in The Philosophy of Sri Ramakrishna by Satish Chandra Chatterjee, M. A., Ph. D. Formerly Head of the Department of Philosophy, Calcutta University, Visiting Professor, University of Hawaii, U. S. A. Published by the University of Calcutta, 1963. Pp. XI+152. Price Rs. 5·50

আলোচ্য পুস্তকের লেখক ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতাস্থ রামকৃষ্ণ মিশন সাংস্কৃতিক ভবনে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়-সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। পুস্তকটির অধিকাংশ এই বক্তৃতামালা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন দর্শনের এবং ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ ও মীমাংসা দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বেদান্তদর্শনের অধ্যায়ে শ্রীশঙ্করাচার্যের অদ্বৈত, শ্রীরামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈত এবং শ্রীমধ্বাচার্যের দ্বৈতমতের কিছু বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। সর্বত্রই দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়ের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলির বিশেষ আলোচনা ও বিচার করা হইয়াছে।

পূর্বাচার্যেরা ভারতীয় দর্শনের যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহা অধিকারী-ভেদ-নীতির মূলে করা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে এই নীতি বর্জিত না হইলেও অন্যপ্রকারে ভারতীয় দর্শনগুলির সমন্বয় করা হইয়াছে। লেখকের

মতে পরম তত্ত্ব এক হইলেও তাহা বহুরূপে ও বহুপ্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন দর্শনশাখা জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর হইতে পরমতত্ত্বের বিভিন্ন দিকের বা রূপের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব ইহাদিগকে পরস্পরবিরোধী না বলিয়া পরস্পরের পরিপূরক বলিতে হয়। এক একটি দর্শনশাখা পরমতত্ত্বের এক একটি দিক্ প্রকাশ করায় কোনটিই একেবারে ভ্রান্ত নহে, বরং একভাবে সবগুলিকেই সত্য বলা যায়। এইভাবে লেখক ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও উপদেশাবলী অনুধ্যান করিয়া তিনি এই সমন্বয়-নীতির সন্ধান পাইয়াছেন। এজন্য গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের অন্তর্নিহিত দার্শনিক মতগুলির ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়াছেন। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ তথাকথিত দার্শনিক ছিলেন না, অথবা কোন দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তথাপি তাঁহার অতি সরল ও সহজ উপদেশের মধ্যে যে অতি গভীর দার্শনিক তথ্যের ও তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনমতের ব্যাখ্যা করিবার যে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। লেখকের ব্যাখ্যা ও আলোচনার ভাষা সর্বত্রই সরল ও সুস্পষ্ট, ইহা বুঝিতে পাঠকপাঠিকার কষ্ট হইবে না। পুস্তকটি সুধীসমাজে সমাদৃত হইবে, আশা করা যায়।

নরেন্দ্রনাথ হইতে বিবেকানন্দ—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। প্রকাশক: স্বামী অপর্ণানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর, চিল্কাপেটা, আলমোড়া। পৃষ্ঠা ১৯৮; মূল্য টাকা ৪·৮০।

যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে এইরূপ একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নরেন্দ্রনাথ কিরূপে আদর্শ শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে প্রতিমুহূর্তে গড়িয়া উঠিয়া তাঁহার সীমাহীন আধ্যাত্মিক ধনভাণ্ডারের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং বিবেকানন্দে পরিণত হইয়া সেই সম্পদ্ যুগপ্রয়োজনে জগৎকল্যাণে বিলাইয়া দিয়াছেন, তাহা অতি চিত্তাকর্ষক ভাষায় বিন্যস্ত হইয়াছে।

বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়: বিবেকানন্দ-দিগ্‌দর্শন, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচারক—বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেরণা ও স্বামীজী, 'আবার এস', 'টাকা মাটি, মাটি টাকা', জনগণের শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর ইঙ্গিত, 'তোমাদের চৈতন্য হোক', রাজপথে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-দৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণ-'দর্শন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও সমন্বয়, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ, শ্রীরামকৃষ্ণের অপপ্রয়োগ ও স্বামীজীর সতর্কতা, স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারত-নারী, স্বামীজী এবং জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা, স্বামীজী ও ভারতীয় জনতা, 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'।

আলোচিত প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভিন্ন দিক্ হইতে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোক সম্পাত করা হইয়াছে। এইগুলি পাঠ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার ভ্রম প্রমাদ ও বিকৃত ভাব দূরীভূত হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-রহস্যের এইরূপ তাৎপর্য-পূর্ণ বিশ্লেষণ অতি বিরল। সূর্যের আলো যে রঙের উপর পড়ে, সেই রঙই দেখায়, সেইরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবহ স্বামীজীর প্রভাবও মানুষের চিন্তাধারায় রঞ্জিত হওয়া স্বাভাবিক। এই পুস্তক-পাঠে সকল মানুষই সত্যানুসন্ধানে সমর্থ হইবে, আশা করা যায়। পুস্তকটির বহুল প্রচার

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নিখিল ভারত সাধু-সম্মেলন

বারাণসী: স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে ২২শে নভেম্বর (১৯৬৩) হইতে ২৪শে নভেম্বর পর্যন্ত তিন দিন বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বিশেষভাবে সজ্জিত একটি মণ্ডপে নিখিল ভারত সাধু-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সাধু-সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত সাধু এবং ছয়শত ভক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রথম দিন বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সমবেত সাধুবৃন্দকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানান এবং বারাণসীধামে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য স্বামী মহেশ্বরানন্দজী মহারাজ পৌরোহিত্য করেন। স্বামী চিদাত্মানন্দজী মহারাজ, স্বরূপানন্দজী মহারাজ, ধর্মানন্দজী মহারাজ, মস্তরামজী মহারাজ, রুদ্র-চৈতন্য পুরীজী মহারাজ, এবং সর্বেশ্বরানন্দজী মহারাজ 'হিন্দুধর্ম ও স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা' সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন।

দ্বিতীয় দিন সম্মেলনের সভাপতি হন বারাণসী হাতিয়ারাম মঠের মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বালকৃষ্ণ যতিজী মহারাজ। স্বামী চিদাত্মানন্দজী মহারাজ, ব্রহ্মচারী দত্তাত্রেয়জী এবং ডক্টর সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

তৃতীয় দিন পৌরোহিত্য করেন মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বালকৃষ্ণ যতিজী মহারাজ। 'ভারত ও জগতের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-বিষয়ে বিবেকানন্দের দান' সম্বন্ধে স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ, যোগেন্দ্রানন্দজী মহারাজ, ব্রহ্মচারী মাধব-চৈতন্যজী মহারাজ, স্বরেশ্বর ভারতীজী, বিষ্ণু-পুরীজী মহারাজ, ধর্মানন্দজী মহারাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের মৃড়ানন্দজী মহারাজ (সংস্কৃতে) ভাষণ দেন। সম্মেলনে উপস্থিত সাধুবৃন্দের প্রত্যেককে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী উপহার দেওয়া হয়। শেষ দিনের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সাধুদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরিত হয়।

উৎসব-সংবাদ

জামসেদপুর: বিবেকানন্দ সোসাইটিতে স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তীর দ্বিতীয় পর্যায় গত ৭ই ডিসেম্বর হইতে বারো দিন শহরের বিভিন্ন অংশে ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়।

৭ই সোসাইটি-প্রাঙ্গণে শ্রীকে. খোসলার সভাপতিত্বে এক জনসভায় স্বামী মহানন্দ, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্মা যথাক্রমে ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দীতে ভাষণ দেন। সভাশেষে লক্ষ্মীসরাই বালিকা সঙ্গীত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ সঙ্গীতাচার্য শ্রীগণেশশঙ্কর ঝা ভজন গান করেন।

পরদিন ৮ই মহিলা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। স্থানীয় মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা মিসেস মেহতার সভানেত্রীত্বে স্বামী বীতশোকানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার ও অধ্যাপক শ্রীসত্য দেও ওঝা ভাষণ দেন। সোসাইটি-পরিচালিত শ্রীসারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ স্বামীজীর জীবন অবলম্বনে লীলাগীতি পরিবেশন করে এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য' সবাক্‌চিত্র প্রদর্শিত হয়।

৯ই সিদগোরা মধ্যবিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে এবং ১০ই টেলকো নিউ কলোনী সবুজ কল্যাণ সংঘ-ভবনে জনসভা হয়।

১১ই বার্মা মাইনস্‌ অঞ্চলে সোসাইটির সিস্টার

নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ে এক জনসভায় অধ্যাপক বি. পাঠক, স্বামী বীতশোকানন্দ ও অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ ভাষণ দেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ 'স্বামী বিবেকানন্দ' সংস্কৃত নাটক অভিনয় করে।

১৩ই প্রাতে জামসেদপুরের স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ স্বামীজীর সুসজ্জিত প্রতিকৃতি পুরোভাগে স্থাপন করিয়া ব্যাণ্ডপার্টি ও বহু ভজন-কীর্তনের দলসহ শোভাযাত্রা করিয়া সোসাইটি-প্রাঙ্গণে উপনীত হয়। এই শোভাযাত্রা প্রায় এক মাইলেরও বেশী দীর্ঘ হইয়াছিল। যোগদানকারী প্রায় ৫ হাজার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরি ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

ছাত্রদিবসে স্বামী নিরাময়ানন্দ সভাপতিত্ব করেন। বহু ছাত্রছাত্রী ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলায় স্বামীজীর বাণী ও জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করে। ১৫ই সাকচী বেঙ্গল ক্লাব-ভবনে এক মহিলা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ডেপুটী কমিশনার শ্রীজে. পি. শ্রীবাস্তব সভাপতি এবং কলিকাতা সারদা মঠের প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা প্রধান অতিথি ছিলেন। সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ নাটক অভিনয় করে।

১৮ই সন্ধ্যায় সোসাইটি-প্রাঙ্গণে সঙ্গীতাচার্যগণ উচ্চাঙ্গ ধর্মসঙ্গীত পরিবেশন করে।

সিদগোড়া অঞ্চলে সোসাইটি-পরিচালিত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে নয়দিনব্যাপী বিশেষ উৎসবের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী

মাদ্রাজ: বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকীর উদ্যোগে মায়লাপুরস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে নির্মিত বিশেষ মণ্ডপে গত ১০ই জানুআরি (১৯৬৪) হইতে ২৬শে জানুআরি পর্যন্ত ১৮দিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই জানুআরি শুক্রবার—মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দের সভাপতিত্বে মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী শতবার্ষিকী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ১১ই জানুআরি শনিবার—ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে হলিউড বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দজী বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী ভবন এবং ধর্মসম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ১২ই জানুআরি—বিবেকানন্দের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর পারায়ণ এবং শিশুদের অনুষ্ঠান—নাটক, আবৃত্তি, ব্যায়াম ইত্যাদি। ধর্মসম্মেলন (প্রথম অধিবেশন) — সভাপতি : ডক্টর রামস্বামী আয়ার; বক্তা: অধ্যাপক এস. এ. জৈন (জৈনধর্ম), রেভা. ডক্টর এন্থনি এলেঞ্জিমিত্তম্ (খ্রীষ্টধর্ম) এবং দস্তর মিনোচেচা হোমিজী (জরথুষ্ট্রের ধর্ম)। এইদিন তামিল ও তেলুগু ভাষায় বিবেকানন্দের সমগ্র গ্রন্থাবলীর প্রকাশন ঘোষিত হয়। ১৩ই জানুআরি—ধর্মসম্মেলন (দ্বিতীয় অধিবেশন)—সভাপতি: সি. রাজগোপালাচারী। বক্তা: সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেভা. আনন্দ কৌশল্যান (বৌদ্ধধর্ম), ডক্টর বুখারি (ইসলাম) এবং নিউ দিল্লীর ডক্টর গোপাল সিং (শিখধর্ম)। এই দিন পূর্বাহ্ণে রুদ্রযাগ অনুষ্ঠিত হয়। এবং শ্রী আর. গণপতি-লিখিত তামিল ভাষায় বিবেকানন্দ-চরিত প্রকাশিত হয়। ১৪ই জানুআরি—ধর্মসম্মেলন (৩য় অধিবেশন)—সভাপতি: স্বামী প্রভবানন্দজী। বক্তা: ডক্টর পি. নাগরাজ রাও (দ্বৈতবাদ), শ্রীঅগ্নিহোত্রম্ রামানুজ তথাচারিয়ার (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ) ও ডক্টর টি. এম. পি মহাদেবন (অদ্বৈতবাদ)। এইদিন হাসপাতালে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরিত হয়। ১৫ই জানুআরি—ধর্মসম্মেলন (৪র্থ অধিবেশন) —সভাপতি: মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম.

ভক্তবৎসলম্‌। বক্তা: বেঙ্কটরাম আয়ার (স্বামী বিবেকানন্দ), স্বামী রঙ্গনাথানন্দ (বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত যোগচতুষ্টয়) এবং হলিউডের স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ (আমেরিকা-বাসীর দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ)। এইদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা এবং পি. এস. হাই স্কুল-প্রাঙ্গণে আতসবাজি পোড়ানো হয়। ১৬ই জানুআরি—স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মদিবস উপলক্ষে স্বামী প্রভবানন্দজী ও অন্যান্য সাধুদের ভাষণ। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন—বক্তা: ডক্টর টি. এম. পি. মহাদেবন ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ।

১৭ই জানুআরি—মহিলা সম্মেলন (১ম অধিবেশন)—সভানেত্রী: ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন। বক্তা: স্বামী প্রভবানন্দজী (বিবেকানন্দ), ভগিনী শুভলক্ষ্মী (শ্রীঅণ্ডাল) এবং মিসেস মামুদ হাজা শেরিপ (সন্ত রাবেয়া)। ১৮ই জানুআরি—মহিলা সম্মেলন (শেষ অধিবেশন)—সভানেত্রী: ম্যারিয়া বুর্গী। বক্তা: স্বামী রঙ্গনাথানন্দ (বিবেকানন্দ), অধ্যক্ষা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী (সীতা), মিস স্যামুয়েল (সন্ত টেরেসা) এবং শ্রীমতী মণি সাহুকর (মীরাবাঈ)। ১৯শে জানুআরি—এগমোর রেলস্টেশন হইতে বিবেকানন্দ-ভবন (আইস হাউস) পর্যন্ত চার মাইল পথ পরিক্রমা করিয়া সহস্র সহস্র লোকের এক সুদীর্ঘ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ এবং ভক্তবৃন্দ ছিলেন। বিভিন্ন পতাকা, বাদ্যযন্ত্র, সঙ্গীত, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি শোভাযাত্রার অঙ্গ ছিল। শোভাযাত্রার শেষভাগে স্বামীজীর একটি বৃহৎ সুসজ্জিত মূর্তি শোভা পায়। এই দিন বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ২০শে জানুআরি—ছাত্রদিবস উপলক্ষে বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে বক্তৃতা। প্রধান অতিথি: ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও শ্রম বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীপট্টভিরমন। বক্তা: কুমারী মৃদুলা রাও (ছাত্রী), শ্রীসুন্দরম্‌ (ছাত্র) এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ।

২১, ২২ ও ২৩শে জানুআরি-সঙ্গীত সম্মেলন। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন বোম্বাইএর রামরাও পারসতবার, মুরলীস্বামী ও মাষ্টার দীপক মুখার্জি, দিল্লীর পবিত্রকুমার আচার্য, আরিয়াকুডি রামানুজ আয়েঙ্গার ও মাদুরাই মণি আয়ার এবং তাঁহাদের দল। ২৪শে জানুআরি—সুব্রহ্মণ্য ও রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ কর্তৃক গীতা-হোম এবং বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ কর্তৃক পাচটি ভাষায় বিবেকানন্দ-নাটক অভিনয়। ২৫শে জানুআরি—আন্তঃকলেজীয় ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা এবং মাদ্রাজ মঠে কলিকাতার প্রখ্যাত ব্যায়ামবিদ্‌ শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ ও তাঁহার দলের ব্যায়াম-প্রদর্শন। ২৬শে জানুআরি—ধর্মসম্মেলন (শেষ অধিবেশন)—সভাপতি: শ্রীরামস্বামী শাস্ত্রী; বক্তা: কে ভি. জগন্নাথন (আধুনিক চিন্তাধারায় বিবেকানন্দের প্রভাব), বালসুব্রহ্মণ্য আয়ার (বিবেকানন্দের সেবাধর্ম) এবং পঞ্চপগেসা আয়ার (ভারতের বর্তমান জাগরণে বিবেকানন্দের দান)। এতদ্ব্যতীত এইদিন সপ্তশতী চণ্ডী-হোম, বিষ্ণুচরণ ঘোষের ব্যায়াম-প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে জানুআরি ৩,০০০ দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করানো হয়।

স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো ঃ বেদান্ত সোসাইটিতে স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী। শতবার্ষিকী বৎসরের প্রারম্ভে ১৯৬৩ খৃঃ ১৭ই জানুআরি স্বামীজীর জন্মতিথির দিন স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির প্রধান কেন্দ্র এবং চারটি শাখাকেন্দ্রে বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পরবর্তী রবিবারে সর্বসাধারণের জন্য স্বামীজীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো নূতন মন্দিরে বক্তৃতা করেন স্বামী অশোকানন্দ; বার্কলী শাখাকেন্দ্রে স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ এবং স্যাক্রামেণ্টো শাখাকেন্দ্রে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

১লা মার্চ স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকার ভারতীয় ছাত্র-সমাজের উদ্যোগে একটি সভায় স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ স্বামীজীর বাণী সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন।

৩০শে মে শাখাকেন্দ্র ওলিমা বেদান্ত তপোবনে শতবার্ষিকীর একটি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। আরণ্য পরিবেশে পত্রপল্লবাদি দ্বারা গঠিত একটি বেদীতে স্বামীজীর একটি বড় ছবি নিপুণভাবে সাজাইয়া তাহার সম্মুখে ভূমিতে বসিয়া শহর হইতে আগত ভক্তবৃন্দ স্তোত্র, গান এবং স্বামীজীর সম্বন্ধে পাঠ ও আলোচনাদি করেন। স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ এই উৎসবটি পরিচালনা করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ স্বামীজীর গীত একটি গান গাহিয়া শুনান এবং স্বামীজীর বাল্যকালের ঘটনাবলী গল্পাকারে বর্ণনা করেন। সকলকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়।

২৯শে জুন প্রধান ও শাখাকেন্দ্রের ভক্ত ও বন্ধুগণের সমবেত সম্মেলনে স্যান্‌ফ্রান্সিস্কো নূতন মন্দিরে শতবার্ষিকীর একটি অনুষ্ঠান হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মসঙ্গীত এবং স্বামীজীর জীবন ও শিক্ষার আলোচনা ছিল বিশেষ কর্মসূচী। 'Swami Vivekananda in America—New Discoveries' গ্রন্থের লেখিকা মিসেস মেরী লুই বার্ক—'স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে যে ধর্ম দিয়াছেন' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ঐ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর হয়। মধ্যস্থতা করেন কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী অশোকানন্দজী। ব্রহ্মচারী বিমুক্তচৈতন্য কর্তৃক তৎপরে 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার বাস্তব দিক্' নামে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই বিষয়ে আলোচনায় মধ্যস্থ ছিলেন স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মধ্যস্থতা করেন অধ্যাপিকা মিসেস জেমস্ জ্যাক্‌ম্যানের 'ভারত ও আমেরিকা' সংজ্ঞক প্রবন্ধের বিতর্কে।

২৭শে অক্টোবর সমিতির ভক্ত ও বন্ধুগণের উপস্থিতিতে ওলিমা বেদান্ত তপোবনে শতবার্ষিকীর স্মরণে একটি বৃক্ষকুঞ্জ রোপিত হয়। উন্মুক্ত আকাশতলে পূজা এবং বৈদিক আবৃত্তি পুরঃসর অনুষ্ঠানটি আরম্ভ করা হয়। ৫০টি গিংকো, ফার ও দেওদার বৃক্ষের এই কুঞ্জের এই নাম দেওয়া হয় 'বিবেকানন্দ বৃক্ষকুঞ্জ'।

শতবার্ষিকী বৎসরে স্বামী অশোকানন্দ সোসাইটির নূতন মন্দিরে স্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে চারটি বিশেষ বক্তৃতা দেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ স্যাক্রামেণ্টো শাখাকেন্দ্রে এই বৎসরে প্রতিমাসে একদিন স্বামীজীর শিক্ষার বিভিন্ন দিক্ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

১০ই ডিসেম্বর এবং ১৪ই ডিসেম্বর বার্কলী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণের উদ্যোগে দুইটি সভা হয়। প্রথম সভায় বক্তৃতা করেন ইতিহাস-বিভাগের অধ্যাপক টমাস মেটকাফ। বিষয় ছিল : 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় সমাজের পুনরুজ্জীবন।' বক্তৃতার পর 'ভারতের গুহামন্দিরসমূহ' নামক চলচ্চিত্র দেখানো হয়। দ্বিতীয় সভার বক্তা ছিলেন স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোর

ভারতীয় কনসাল জেনারেল শ্রী পি. এন. মেনন এবং স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ। আলোচ্য বিষয় ছিল—'বর্তমান কালে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা।' এই বৎসর (১৯৬৪) ৬ই জানুআরি স্বামীজীর তিথিপূজার দিন স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোর উভয় মন্দির এবং বার্কলী, ওলিমা ও স্যাক্রামেণ্টো শাখাকেন্দ্রসমূহে বিশেষ পূজা ও সঙ্গীতাদি এবং পরবর্তী রবিবারের বক্তৃতাদি দ্বারা শতবার্ষিকী পরিসমাপ্ত হয়।

ব্রেজিলে বেদান্ত-প্রচার

দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা রাজ্যের বুয়েন্স এরিস বেদান্ত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক স্বামী বিজয়ানন্দজী গত অগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৬২) ব্রেজিলের রিও-ডি-জেনারিও শহরে অবস্থান করিয়া বেদান্তানুরাগী ভক্ত ও বন্ধুদের বিশেষ উদ্দীপনা দিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাকে সর্বসাধারণের জন্য ৮টি বক্তৃতা দিতে হয়। রেডিও ও টেলিভিশনেও তাঁহাকে কয়েকবার ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর করিতে হইয়াছিল। শহরের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আন্তরিক ধর্মজিজ্ঞাসুগণ তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত ধর্মালোচনা ও উপদেশ গ্রহণ করিবার সুযোগও লাভ করিয়াছিলেন। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃহৎ হলে ১৩ই অগস্ট স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর সভার পরিচালনা করেন। বক্তা ছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, স্থানীয় একজন বিখ্যাত মহিলা কবি, জনৈক আইনজীবী, জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ এবং স্বামী বিজয়ানন্দজী। স্থানীয় বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করিতেছে। কয়েক বৎসর হইল রিও-ডি-জেনারিও শহরে একটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমও স্থাপিত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

বেজোয়াদা (অন্ধ্রপ্রদেশ): স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির উদ্যোগে গত ২৫শে ডিসেম্বর স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসব স্থানীয় বণিক্-সমিতির হলঘরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পূজা হোম ইত্যাদির পর প্রায় ৫০০ ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রায় ৩০০ দরিদ্র নর-নারায়ণকে ভোজন করানো হয়। সন্ধ্যায় স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ভাষণ দেন। অতঃপর বালক-বালিকারা স্বামীজীর জীবনালেখ্য ভক্তমণ্ডলীর নিকট উপস্থাপিত করে।

বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া): ১৯৬৩ খৃঃ স্বামীজীর জন্মদিবসে বিষ্ণুপুরে শতবর্ষ-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমায়ের দুইটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রা নগর পরিক্রমা করে। প্রায় ৪ হাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদ দানে পরিতুষ্ট করা হয়। স্বামীজীর একটি জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। স্থানীয় মহকুমা-শাসকের সভাপতিত্বে জনসভায় স্বামী গদাধরানন্দ ভাষণ দেন।

পূর্ব সিঁথি (কলিকাতা ৩০): বিদ্যুচ্চক্র সাধারণ পাঠাগার-ভবনে গত ২১শে ডিসেম্বর স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় স্বামী জীবানন্দ 'যুবসম্প্রদায়ের প্রতি স্বামীজীর বাণী' আলোচনা করেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (৮, কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা): কর্মিবৃন্দের উদ্যোগে গত ২৮ ডিসেম্বর স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী জীবানন্দ 'যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

স্বামী শিবানন্দ-জন্মোৎসব

বারাসত: গত ১১ই ডিসেম্বর (১৯৬৩) হইতে পাঁচ দিন স্বামী শিবানন্দ মহারাজের ১০৮তম জন্মোৎসব তাঁহার জন্মস্থান বারাসত শহরস্থিত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজার্চনা, চণ্ডী ও শিবমহিম্নঃস্তোত্র পাঠ, শিবানন্দ-জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা ও বক্তৃতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও শিবানন্দ-বাণী অখণ্ডপাঠ, রামনাম ও রামকৃষ্ণলীলা-কীর্তন, ধর্মসভা, শোভাযাত্রা, ভজন-সঙ্গীত এবং প্রসাদ বিতরণ উৎসবের কর্মসূচী ছিল।



কথাপ্রসঙ্গে

'পতিত জাতি'

যে স্বামীজী হিন্দুধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন ছিলেন, যিনি ভারতের অতীত গৌরব ও ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা দেশে বিদেশে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে দেখা যাইত, তিনিও দেশের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশায় মুহ্যমান ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারও মুখে মাঝে মাঝে শোনা যাইত কঠোর সমালোচনা—অনলবর্ষী ভাষায় ভারতবাসীর দোষ-দুর্বলতা দেখাইয়া দিতেছেন, কখনও চিঠিপত্রে হিন্দুজাতির অজস্র দোষ প্রদর্শন করিয়া তাহার বর্তমান অবনতির কারণ নির্দেশ করিতেছেন। অবশ্য তাঁহার উদ্দেশ্য উন্নতির উপায় নির্ণয় করিয়া দেশকে জাতিকে স্থায়ী উন্নতির পথে আগাইয়া দেওয়া।

একটা সুপ্ত মৃতপ্রায় জাতিকে নাড়া দিয়া স্বামীজী তাহার ঘুম ভাঙাইতে চাহিয়াছিলেন; কতটুকু সাড়া পাইয়াছিলেন বা তাঁহার আহ্বান ভারতের জাতীয় জাগরণে কতটা কার্যকর হইয়াছে, তাহা আজ ইতিহাসের বিবেচ্য বিষয়।

জীবৎকালে স্বামীজী যে আশানুরূপ সাড়া পান নাই, তাহা তাঁহার কথাবার্তায় চিঠিপত্রে ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু সেজন্য তিনি দুঃখিত নন, তিনি জানিতেন—ভারতবর্ষ যত মহান্ দেশই হউক, ভারতবাসী যত মহৎ ঐতিহ্যের অধিকারীই হউক, ভারতবাসী বর্তমানে একটা পতিত জাতি।

একদা তাঁহার এক গুরুভ্রাতা দেশের দুরবস্থা-দর্শনে তাঁহাকে মুহ্যমান দেখিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'ভাই, ঠাকুর এলেন, এত ত্যাগ-তপস্যার জীবন দেখিয়ে গেলেন, তুমিও দেশবিদেশে এত নাড়া দিলে, তবু এদেশ জাগছে না কেন?' সকরুণ নয়নে স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন, 'ভাই, এ যে পতিত জাত, এদের লক্ষণই এই'।

আজ আমাদের স্বামীজীর এই ব্যথা-বেদনা-মথিত কথাগুলির তাৎপর্য বুঝিবার সময় আসিয়াছে। সাহিত্য ও রাজনীতির আচ্ছন্ন দৃষ্টি হইতে স্বামীজীকে আমরা যতই অবহেলা করি না কেন, স্বামীজীকে দূরে সরাইয়া রাখিলে জাতীয় জীবনের সুপ্তির ঘোর কাটিবে না, স্বামীজীর অফুরন্ত ভাব ও শক্তি কাজে লাগাইতে পারিলে এখনই জাতীয় জীবনে জোয়ার জাগিবে। বিশেষ সংকট-মুহূর্তে আমরা আজও স্বামীজীকে স্মরণ করি, সংকট একটু কাটিয়া গেলে আবার সহজ সুখে গা ভাসাই। কিন্তু জানিয়া রাখা ভাল, জাতীয় জীবনের সংকট এখনও কাটে নাই।

'পতিত জাতি' বলিয়া স্বামীজী আমাদের ঘৃণা করিতেছেন না, বরং করুণা ও সহানুভূতি দ্বারা এই পতিত জাতিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। এ জাতি সহস্র বৎসর ধরিয়া পতনের অভিমুখে চলিতেছে, মাঝে মাঝে

মহামানবগণের আবির্ভাবে কিছুকাল অবনতির গতিরোধ হইয়াছে, তাই এই মহান্ জাতি আজও বাঁচিয়া আছে, নতুবা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। অভ্রান্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া স্বামীজী দেখিয়াছিলেন, মনুষ্যজাতির উন্নয়নের জন্য এ-জাতির জাগরণ প্রয়োজন ; এ শুধু রাজনীতিক আর্থনীতিক উন্নয়ন নয়, আগামী যুগে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়নের জন্য ভারতের প্রয়োজন। ভারতবাসীকে এই মহান্ উদ্দেশ্যেই স্বামীজী অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এতদুদ্দেশ্যে ভারতের রাজনীতিক মুক্তি যে একান্ত প্রয়োজন, তাহাও স্বামীজী উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই রাজনীতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা পরানুকরণ ও পরমুখাপেক্ষা দ্বারা লব্ধ হইতে পারে না, কোনরূপে লব্ধ হইলেও রক্ষিত হইতে পারে না। এ সম্বন্ধেও স্বামীজী সাবধান করিয়া গিয়াছেন, 'স্বাধীনতা বীরভোগ্যা', তাই মহাবীর স্বামীজী বজ্রকণ্ঠে বলিয়াছেন, 'তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন ; তোমরা বীর হও।' 'ভারত মাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান,—মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।' 'মানুষ' বলিতে স্বামীজী বুঝিতেন—শক্ত সবল, সাহসী, মনেপ্রাণে অকপট পরিপূর্ণ একটি মানব। স্বামীজীর এই সব বীরবাণী হইতে আমরা বুঝিতে পারি, স্বামীজী এই 'পতিত জাতি'কে কিভাবে উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন, এই সুপ্ত জাতির নিদ্রা তিনি কিভাবে ভাঙিতে চাহিয়াছিলেন। ত্যাগ তপস্যা ও সেবার পথেই তিনি নব ভারত গড়িতে চাহিয়াছিলেন। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই স্বামীজীর সাবধান-বাণী : চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না।

স্বামীজী ঘোষণা করিয়াছেন, 'ভারত মৃত নয়, নিদ্রিত', নিদ্রা তমোগুণের লক্ষণ। ভারত তমোগুণে আচ্ছন্ন—যুগযুগব্যাপী গভীর নিদ্রায় মৃতপ্রায়। তিনি দেখিয়াছিলেন, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া দেশ তমঃসমুদ্রে ডুবিতেছে, উচ্চতম আদর্শের কথা মুখে বলিয়া অনেকেই অতি নীচের মতো কাজ করিতেছে। এই তমোভাব হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য স্বামীজী রজোগুণাত্মক কর্মযোগ বা সেবার পথের ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। এই পথেই ভারতের জাগরণ সুনিশ্চিত। ত্যাগপূত সেবার মাধ্যমেই জাতীয় জীবনে নূতন শিক্ষাদীক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইবে। যুগযুগব্যাপী জড়তা, তথা ক্লীবতা দূরীভূত হইবে। পরশ্রীকাতরতা, পরমুখাপেক্ষা, পরানুকরণস্পৃহা এবং জাতীয় জীবনের গুরুতর সমস্যাকে লঘু মনে করার স্বভাব দূরীভূত হইলে জাতির জীবন শক্ত সবল হইবে, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি বাড়িবে, সংঘশক্তি দেখা দিবে। তবেই এই আত্মরক্ষাহীন, আত্মসম্মানহীন—আত্মবিশ্বাসহীন পতিত জাতি স্থায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে—তাহার পূর্বে নয়।



বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা

স্বামী ধীরেশানন্দ

[পঞ্চবিধ সংজ্ঞা]

কোশাঃ পঞ্চ সমাখ্যাতাস্তথা জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি হি।
শব্দাদয়শ্চ পঞ্চৈব তথা কর্মেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৪২

চ (এবং কর্মেন্দ্রিয়সমূহও) পঞ্চ এব (পঞ্চবিধই হইয়া থাকে) ॥৪২॥

কোশ[১]সমূহ, জ্ঞানেন্দ্রিয়[২]সমূহ, শব্দাদিবিষয়[৩]স হ এবং কর্মেন্দ্রিয়[৪]সমূহ পঞ্চবিধরূপে প্রসিদ্ধ।

১. পঞ্চকোশ : অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ। অন্নপরিণাম স্থূল দেহই **অন্নময় কোশ**। পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় মিলিত হইয়া **প্রাণময় কোশ** নামে অভিহিত হয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন যুক্ত হইলে **মনোময় কোশ** হইয়া থাকে। ঐ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধিকে **বিজ্ঞানময় কোশ** বলে এবং ইষ্টবস্তু দর্শন, লাভ ও ভোগজনিত প্রিয় মোদ ও প্রমোদ-বৃত্তি-বিশিষ্ট অজ্ঞানই **আনন্দময় কোশ** নামে কথিত হয়। আত্মার আবরক বলিয়া এইগুলিকে কোশ বলা হয়। এই পঞ্চকোশ দ্বারা আবৃত হইয়া স্বরূপ-বিস্মৃতি-বশতঃ নিত্যমুক্ত আত্মার অবিদ্যাজনিত সংসার-প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই কোশগুলির মধ্যে অন্নময় কোশই **স্থূলশরীর**। প্রাণ , মনোময় ও বিজ্ঞানময়—এই তিনটি কোশ মিলিত হইয়া 'সূক্ষ্মশরীর' হইয়া থাকে এবং অজ্ঞানকেই 'কারণ শরীর' বলা হয়। বিবেকসহায়ে এই ত্রিবিধ শরীর বা পঞ্চকোশকে অনাত্মাবোধে বা মিথ্যা-জ্ঞানে পরিত্যাগ করত (অর্থাৎ তাহাতে আত্মাভিমান ত্যাগ করত) নিজেকে উহা হইতে পৃথক্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ কূটস্থ প্রত্যগাত্মারূপে জানার নামই আত্মজ্ঞান বা শুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থের জ্ঞান। পঞ্চকোশ-বিবেক বা অবস্থাত্রয়বিবেক ইত্যাদি সহায়ে শুদ্ধ 'ত্বং' পদার্থের জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান সাধিত হইলেও তাহাতে কৃতকৃত্য হওয়া যায় না। পরন্তু আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ নিশ্চয় করিবার জন্য পুনরায় 'মহাবাক্য' বিচার করা আবশ্যক হয়। পঞ্চকোশ-বিবেকের পরেও মহাবাক্যার্থ জ্ঞান আবশ্যক।

২. জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক : শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়। তমঃপ্রধান মূলপ্রকৃতির দ্বারা বিশেষিত পরমাত্মা হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী—এই সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাংশ হইতে যথাক্রমে অর্থাৎ (সত্ত্বগুণপ্রধান) আকাশ হইতে **শ্রোত্র**, বায়ু হইতে **ত্বক্**, তেজ হইতে **চক্ষু**, জল হইতে **জিহ্বা** এবং পৃথিবী হইতে **ঘ্রাণেন্দ্রিয়**—এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহারা যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের গ্রাহক।

৩ শব্দাদি বিষয়পঞ্চক : শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। আকাশের **শব্দ**গুণ, বায়ুর **স্পর্শ**গুণ, তেজের গুণ **রূপ**, জলের গুণ **রস** ও পৃথিবীর গুণ **গন্ধ**—এইগুলি পঞ্চভূতের নিজস্ব গুণ। স্বীয় কারণের সহিত অন্বিত হইয়া বায়ু শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ বিশিষ্ট হয় ; এইরূপ তেজের—শব্দ স্পর্শ ও রূপ—এই তিন গুণ ; জলের—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিগুণ ; এবং পৃথিবী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

৪. কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চক : বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। সূক্ষ্ম পঞ্চ-মহাভূতের পৃথক্ পৃথক্ রজঃ অংশ হইতে বাগাদি কর্মেন্দ্রিয়সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ (রজোগুণপ্রধান) আকাশ হইতে বাক্, বায়ু হইতে পাণি, অগ্নি হইতে পাদ, জল হইতে পায়ু ও পৃথিবী হইতে উপস্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। (বেদান্তসার-মতে)

বচনাদীনি পঞ্চৈব প্রাণাদ্যা বায়বস্তথা।
পঞ্চোপবায়বো দেহে কর্ম পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ॥৪৩॥

বচনাদি[১] ক্রিয়া, এই দেহস্থ প্রাণাদি[২] বায়ু ও উপবায়ুসমূহ[৩] এবং কর্ম[৪]—এই সকল পঞ্চবিধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

১. বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপে প্রসিদ্ধ।

২. পঞ্চপ্রাণ : প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। যে প্রাণ হৃদয়ে থাকে এবং ক্ষুৎ-পিপাসার কারক হয় তাহাকে **প্রাণ** বলে। যাহা নাভির অধোভাগে কোষ্ঠস্থিত, এবং মলমূত্রাদি অধোনয়নকারী, তাহাকে **অপান** বলে। যাহা নাড়ীদেশে থাকে, এবং যাহার ক্রিয়া ভুক্ত অন্ন-জলাদি পাচন করে, অর্থাৎ সমতা করে, তাহাকে **সমান** বলে। কণ্ঠদেশে যাহার স্থান ও ঊর্ধ্বে উৎক্রমণ যাহার ক্রিয়া, তাহাকে **উদান** বলা হয়। সর্বশরীর যাহার স্থান এবং রসমেলন যাহার ক্রিয়া, তাহাকে **ব্যান** বলে। সূক্ষ্ম পঞ্চ-মহাভূতের মিলিত রজঃ অংশ হইতে পঞ্চ প্রাণবায়ু এবং পঞ্চ উপপ্রাণবায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে।

৩. পঞ্চ উপপ্রাণবায়ু : নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। উদ্‌গার, চক্ষুরুন্মীলন, হাঁচি (ক্ষুৎ), বিজৃম্ভন (হাই তোলা) এবং মৃত শরীরেও সর্বব্যাপী হইয়া থাকা ও মৃত দেহকে ফুলাইয়া তোলা—ইহাই যথাক্রমে নাগাদি পঞ্চ উপবায়ুর ক্রিয়া। এই উপবায়ুসকল প্রধান পঞ্চবায়ুর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়। (বেদান্তসার দ্রষ্টব্য)

৪. পঞ্চবিধ কর্ম : নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসাদি কর্ম-পদবাচ্য নহে ; কারণ পুরুষের প্রবৃত্তির বা নিবৃত্তির জন্য 'বেদ' যাহা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন, তাহাই কর্ম। এইরূপ কর্ম দুই প্রকার—বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ। স্বভাবসিদ্ধ যে সকল কর্ম, যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি, সেগুলি কর্ম-পদবাচ্য নহে। উদাসীন ক্রিয়া অর্থাৎ বেদ যে-বিষয়ে বিধি বা নিষেধ কিছুই বলেন নাই, তাহা কর্ম বলিয়া গণ্য হয় না। সুতরাং কর্ম দুই প্রকার, তিন প্রকার নহে। তন্মধ্যে বিহিত কর্ম—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও কাম্য ভেদে চারি প্রকার। যাহা না করিলে পাপ হয় এবং করিলে পুণ্যাদি ফল হয় না ও সর্বদা যাহার অনুষ্ঠান বিহিত, এইরূপ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্মকে **নিত্যকর্ম** বলে। 'না করিলে পাপ হয়'—ইহা মীমাংসকগণের মত। অকরণ অভাবরূপ, পাপ ভাবরূপ। অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি হইতে পারে না—এই বলিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। বেদান্ত-মতে নিত্য কর্মের ফলও স্বর্গাদি। **নৈমিত্তিক কর্ম :** যে কর্ম না করিলে পাপ হয় এবং করিলে পুণ্যাদি কিছুই হয় না এবং যাহা নিত্য করিবার জন্য বিহিত নহে। পরন্তু বিশেষ কোন নিমিত্ত উপলক্ষে যাহার বিধান, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম। যেমন গ্রহণকালে শ্রাদ্ধাদি বা পুত্রজন্মনিমিত্তক জাতেষ্টি আদি কর্ম। অথবা যেমন অবস্থাবৃদ্ধ (অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধ), জাতিবৃদ্ধ, আশ্রমবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ, ধর্মবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তির

আগমনে আসন হইতে উত্থানরূপ কর্ম। পাপক্ষয়-সাধন কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি **প্রায়শ্চিত্ত কর্ম** নামে কথিত হয়। সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে প্রায়শ্চিত্তও দুই প্রকার। বিশেষ পাপ অর্থাৎ জ্ঞাত পাপ দূর করিবার জন্য শাস্ত্রের যে বিধান, তাহা অসাধারণ প্রায়শ্চিত্ত। যেমন প্রমাদগ্রস্ত সন্ন্যাসীর অর্থগ্রহণ নিমিত্ত পাপনিবৃত্ত্যর্থ ঐ অর্থ ত্যাগ ও তিনদিন উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত। সমস্ত অজ্ঞাত পাপ দূর করিবার জন্য শাস্ত্রের যে বিধান, তাহাই সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত। যেমন গঙ্গাস্নান এবং ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ বা জপাদি কর্মরূপ প্রায়শ্চিত্ত। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত দুই প্রকার। বেদান্তমতে সকল কর্মই সকাম পুরুষের সংসারজনক হয় এবং নিষ্কাম পুরুষের চিত্তশুদ্ধি দ্বারা মোক্ষজনক হয়। এইরূপে একই গঙ্গাস্নান বা নাম-জপাদি কর্ম সকাম ব্যক্তির পক্ষে কাম্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত ও নিষ্কাম ব্যক্তির পক্ষে কেবল প্রায়শ্চিত্তরূপ হইয়া থাকে। মুমুক্ষু কেবল সাধারণ প্রায়শ্চিত্তই করিয়া থাকেন। স্বর্গাদি ফলের জন্য বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম **কাম্য কর্ম** নামে কথিত। অনিষ্টকর নরকাদি প্রাপ্তির সাধন ব্রহ্মহত্যাদি **নিষিদ্ধ কর্ম** বলিয়া খ্যাত।

সূক্ষ্মভূতানি পঞ্চৈব তথা স্থূলানি পঞ্চধা।
যমাঃ পঞ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈব নিয়মাস্তথা ॥ ৪৪ ॥

সূক্ষ্মভূত[১], স্থূলভূত[২], যম[৩] এবং নিয়মসমূহ[৪] পঞ্চবিধ কথিত হইয়া থাকে।

১. আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী—এইগুলিকেই সূক্ষ্ম (অপঞ্চীকৃত) পঞ্চ-মহাভূত বলা হয়। শব্দাদি গুণগুলি সূক্ষ্মভূতে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। সূক্ষ্মভূতগুলি পঞ্চীকৃত হইলে তখন ঐ শব্দাদি স্থূলভূতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে অভিব্যক্ত হয়।

প্রলয়ে জীবের অবশিষ্ট কর্মসকল সূক্ষ্মরূপে মায়াতে অবস্থান করে। জীবের কর্মানুরোধেই ঈশ্বর জীবের কর্মফল-প্রদানে উন্মুখ হন ও তখন ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির ইচ্ছা উৎপন্ন হয়। এরূপ ইচ্ছার ফলে মায়া তমোগুণ-প্রধান হইয়া থাকে এবং উহা হইতে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়।

[নিজ প্রয়োজনবশতঃ ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহার কৃপাও জীবকর্মের ফল। যাঁহারা লীলাবাদী বা ঈশ্বর-স্বাতন্ত্র্যবাদী তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের লীলাই সৃষ্টির হেতু। অথবা ঈশ্বর নিজ স্বতন্ত্রস্বভাব-বশেই জগৎ সৃষ্টি করেন। জীবকর্মানুসারে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। কিন্তু তাঁহাদের মত স্বীকার করিলে ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যরূপ দোষদ্বয় অপরিহার্য হইয়া পড়ে।]

সৃষ্টি-শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জগৎ সত্য নহে। জগৎ সত্য হইলে শ্রুতি জগৎ উৎপত্তি একপ্রকারই বর্ণন করিতেন, অনেক প্রকার বলিতেন না। শ্রুতির অভিপ্রায় প্রপঞ্চের নিষেধ। অদ্বৈত বস্তুকে লক্ষ্য করাইবার জন্যই প্রপঞ্চের নিষেধ। অতএব মিথ্যা প্রপঞ্চ যে-কোন প্রকারে ব্রহ্মে আরোপ করা হইয়াছে মাত্র। এই জন্যই উৎপত্তি-শ্রুতি বহুবিধ। উপনিষদে বিরুদ্ধ বর্ণনা বিদ্যমান, এইরূপ সন্দেহাকুল মন্দজিজ্ঞাসুর ঐ বিরোধ-শঙ্কা পরিহার করিবার জন্যই সূত্রকার ও ভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতি অনুসারে সমস্ত উৎপত্তিবোধক বাক্যগুলির তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন।

২. পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতকেই স্থূল পঞ্চমহাভূত বলে। সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতই পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূল পঞ্চমহাভূত হইয়া থাকে। পঞ্চীকরণের প্রক্রিয়া এইরূপ :

সূক্ষ্ম আকাশ	সূক্ষ্ম বায়ু	সূক্ষ্ম তেজ	সূক্ষ্ম জল	সূক্ষ্ম পৃথিবী	
১/২	১/৮	১/৮	১/৮	১/৮	= স্থূল আকাশ
১/৮	১/২	১/৮	১/৮	১/৮	= „ বায়ু
১/৮	১/৮	১/২	১/৮	১/৮	= „ তেজ
১/৮	১/৮	১/৮	১/২	১/৮	= „ জল
১/৮	১/৮	১/৮	১/৮	১/২	= „ পৃথিবী

৩. অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এইগুলিই পঞ্চবিধ **যম** নামে খ্যাত। বাক্য, মন, ও শরীরদ্বারা সর্বপ্রাণিপীড়া-বর্জনই **অহিংসা**। অশাস্ত্রীয় প্রাণিপীড়া-ত্যাগকে মীমাংসকগণ অহিংসা বলিয়া থাকেন। প্রিয় হিত ও যথাদৃষ্টশ্রুতার্থ-বিষয়ক ভাষণকে **সত্য** বলে। পরস্বাপহরণাভাব **অস্তেয়** নামে খ্যাত। অষ্টাঙ্গমৈথুন-বর্জনই **ব্রহ্মচর্য**। দেহযাত্রা-নির্বাহের উপযুক্ত সাধন-সামগ্রীর অতিরিক্ত ভোগসাধন দ্রব্যের অস্বীকার অপরিগ্রহ নামে কথিত।

৪. শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—পঞ্চবিধ **নিয়ম** নামে প্রসিদ্ধ। মৃত্তিকা ও জলাদি সহায়ে হস্তপদাদি প্রক্ষালন বাহ্য শৌচ ও মৈত্রী-আদি অভ্যাস সহায়ে মদমানাদি চিত্তমল দূর করা আন্তর শৌচ—এইরূপে **শৌচ** দ্বিবিধ। যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বস্তুর অতিরিক্ত লাভের আকাঙ্ক্ষা না করাকে **সন্তোষ** বলে। অর্থাৎ যথাপ্রাপ্তিতে তুষ্ট এবং অলাভে অবিষাদই **সন্তোষ**। অশনা-পিপাসা, শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহনপূর্বক ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতার অভ্যাস **তপঃ** নামে কথিত হয়। উপনিষদাদি মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন অথবা 'প্রণব'-জপ **স্বাধ্যায়** নামে অভিহিত। ফলনিরপেক্ষ হইয়া পরমগুরু শ্রীপরমেশ্বরে সর্বকর্ম-সমর্পণকে **ঈশ্বর-প্রণিধান** বলে। মানস উপচার দ্বারা ইষ্টদেবতার অভ্যর্চনাকেও **ঈশ্বর-প্রণিধান** বলা হয়।

ভূমিকাঃ প্রলয়স্তদ্বদ্ ভ্রমা বৈ তন্নিবর্তকাঃ।
দৃষ্টান্তাস্তে চ দৃষ্টান্তাঃ প্রত্যেকং পঞ্চধা মতাঃ॥ ৪৫॥

ভূমিকা[১], প্রলয়[২], ভ্রম[৩], ভ্রমনিবর্তক-দৃষ্টান্ত[৪] এবং ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম বিষয়ে[৫] দৃষ্টান্ত—এইগুলির প্রত্যেকটিই পঞ্চবিধ হইয়া থাকে।

১. চিত্তের পাঁচপ্রকার ভূমিকা বা অবস্থা আছে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ—ইহাই যোগ-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ চিত্তভূমিকা। লোকবাসনা, দেহবাসনা, শাস্ত্রবাসনা প্রভৃতি রজোগুণের পরিণামভূত ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক দৃঢ়ভোগবাসনাযুক্ত চিত্তকে **ক্ষিপ্ত** বলে। তমোগুণোদ্ভূত নিদ্রা-তন্দ্রাগ্রস্ত চিত্ত **মূঢ়** নামে কথিত। ক্ষিপ্তাবস্থা হইতে ভিন্ন, কদাচিৎ ধ্যানযুক্ত অর্থাৎ ধ্যানে প্রবৃত্ত যোগীর মধ্যে মধ্যে বাহ্যবিষয়ক চিন্তায় প্রবৃত্ত চিত্ত **বিক্ষিপ্ত** নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা অন্তঃকরণের সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণের পরিণাম।

ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্তের সমাধিলাভের কোন অধিকারই নাই। বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধিতে অধিকার আছে। পরবর্তী ভূমিকাদ্বয়—একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থাই সমাধি। চিত্ত একাগ্র হইলে সদ্বস্তু

প্রকাশিত হয়। ধ্যাতা ও ধ্যান ডুবিয়া গিয়া চিত্ত ধ্যেয় বস্তুর সহিত একাকার ভাব প্রাপ্ত হয়, ক্লেশসমূহ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়, কর্মবন্ধনসমূহ শিথিল হয় এবং ক্রমশঃ চিত্ত নিরোধাভিমুখী হইতে থাকে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা সত্ত্বপ্রধান চিত্তের **একাগ্র ভূমিকা**। উক্ত একাগ্রতা-বৃদ্ধিকে নিরোধ বলা হয়। এই সময় অন্তঃকরণ কেবল ধ্যেয় বিষয়ের আকার ধারণ করে। জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় ভাব আর থাকে না বা অনুভূত হয় না। সর্ববৃত্তিনিরোধরূপ এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেই চিত্তের **নিরুদ্ধ** ভূমিকা বলা হইয়া থাকে। [একাগ্রতার পরিপাকে চিত্তের বিশুদ্ধি হইলে প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকদ্বারা পুরুষতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়। উহার পর স্বতই বুদ্ধি পুরুষনিষ্ঠ হইতে থাকে। ক্রমশঃ ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এই ত্রিপুটী লয় প্রাপ্ত হয়, এবং চিত্ত নিরুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান।]

২. পঞ্চপ্রলয়ঃ নিত্যপ্রলয়, অবান্তরপ্রলয়, দৈনন্দিনপ্রলয়, ব্রহ্মপ্রলয় ও আত্যন্তিক প্রলয়। প্রাণিগণের প্রাত্যহিক সুষুপ্তিই **নিত্যপ্রলয়**। ব্রহ্মার একদিনের মধ্যে চতুর্দশ মনু ও চতুর্দশ ইন্দ্রের আধিপত্য হইয়া থাকে। একের আধিপত্য অপগত হইলে অপরের আধিপত্যপ্রাপ্তিকাল পর্যন্ত যে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাই চতুর্দশ **অবান্তর প্রলয়**।

সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হইয়া থাকে। উহার গণনা এরূপঃ

সত্যযুগ	১,৭২৮,০০০	মনুষ্য-বৎসর ,	ইহা কলিযুগের চতুর্গুণ
ত্রেতাযুগ	১,২৯৬,০০০	„ „ ,	ইহা কলিযুগের ত্রিগুণ
দ্বাপরযুগ	৮৬৪,০০০	„ „ ,	„ „ দ্বিগুণ
কলিযুগ	৪৩২,০০০	„ „ ।	
	৪,৩২০,০০০	„ „	এক চতুর্যুগ বা মহাযুগ

এক মহাযুগ সহস্রগুণিত হইলে ব্রহ্মার একদিন হইয়া থাকে, অর্থাৎ মনুষ্যগণনায় ৪,৩২০,০০০ × ১০০০=৪,৩২০,০০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার একদিন। তাবৎ পরিমাণ কাল ব্রহ্মার রাত্রি। অর্থাৎ ৮,৬৪০,০০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিনরাত্রি হইয়া থাকে। এই হিসাবে ৩৬০ দিনে বৎসর ধরিয়া ৩১১০,৪০০,০০০,০০০ মনুষ্য-বৎসরে ব্রহ্মার এক বৎসর। এইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার পরমায়ু। অর্থাৎ মানবীয় হিসাবে ব্রহ্মার ৩১১,০৪০,০০০,০০০,০০০ বৎসর আয়ুষ্কাল। ইহা এক মহাকল্প নামে কথিত।

প্রতি দিবসান্তে রাত্রির আগমনে ব্রহ্মার সুষুপ্তি। ইহাই **দৈনন্দিন প্রলয়**। ইহাকে নৈমিত্তিক প্রলয়ও বলে। শতবর্ষ পরমায়ু শেষ হইলে ব্রহ্মার বিলয় অবস্থাকে **ব্রহ্মপ্রলয়** বলে। ইহাকেই 'প্রাকৃতিক প্রলয়' বা 'মহাপ্রলয়ও' বলা হইয়া থাকে। [যখন জীবের কর্মফল-প্রদানে জীবকর্মানুরোধেই ঈশ্বর উদাসীন থাকেন, তখনই প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রলয়ে সর্বকার্যদ্রব্যের নিজ নিজ কারণে বিলয় হয়। সর্বপদার্থই তখন সংস্কার-রূপে মায়াতে থাকে। জীবের অবশিষ্ট কর্মও তখন সূক্ষ্মরূপে মায়াতে অবস্থান করে।] মুক্তি অবস্থাকে **আত্যন্তিক প্রলয়** বলা হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে সর্বপ্রপঞ্চের আত্যন্তিক বিলয়।

৩ ও ৪. পঞ্চভ্রম ও ভ্রমনিবর্তক দৃষ্টান্ত :

(ক) জীবাত্মা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন—এই ভ্রম বিম্ব-প্রতিবিম্ব দৃষ্টান্ত সহায়ে নিবর্তনীয়। (খ) আত্মাতে প্রতীয়মান কর্তৃত্বাদি বাস্তব—এই ভ্রম স্ফটিকলৌহিত্য দৃষ্টান্তবলে নিবর্তনীয়। (গ) শরীরত্রয়াবচ্ছিন্ন আত্মা সসঙ্গ—এই ভ্রম ঘটাকাশ ও মহাকাশের দৃষ্টান্তদ্বারা নিবৃত্তিযোগ্য। (ঘ) বিকারী জগতের কারণ বলিয়া ব্রহ্মাও বিকারী—এই ভ্রম রজ্জু-সর্প দৃষ্টান্ত সহায়ে দূর হইয়া থাকে। (ঙ) কারণ হইতে ভিন্ন এই জগৎপ্রপঞ্চ সত্য—এই ভ্রম স্বুবর্ণ ও ভূষণাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা অপনীত হয়।

৫. ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্মে জগৎ প্রতীত হয় ; এই বিষয়ে শুক্তিকাতে রজত, রজ্জুতে সর্প, স্থাণুতে পুরুষ, আকাশে নীলত্বাদি এবং মরীচিকাতে জল—এই পাঁচটি দৃষ্টান্ত বোদ্ধব্য। [ক্রমশঃ

অপরাজেয় আত্মা

শ্রীনারায়ণ পাত্র

বলেছি তো, দুশ্চরিত্র কাপুরুষ সাময়িক ঘাতকবৃত্তির কাছে
অমৃতের পুত্রগণ করবে না কখনও জানি ভয়ে নতশির,
অপমান, লাঞ্ছনা, অভাব-দারিদ্র্য সে তো মানুষের কৃত্রিম রচনা ;
বাহ্যিক দুঃখের ভারে কিংবা হতাশায় মহৎ আত্মারা তাই হয় না অস্থির !

নিপীড়িত জীবাত্মার মোহমুক্তি-সাধনার্থে প্রাণ-বলিদান
নিতান্তই তুচ্ছ তাঁহাদের। গতানুগতিক এই জীবনের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি থেকে
ঈশ্বরচিন্তার ক্ষুধা অহরহ জ্বালাতে অন্তর মধ্যে তাই
অনির্বাণ দীপহস্তে দিব্যবাণী যান তাঁরা যুগে যুগে রেখে !

নৃশংস নির্বোধ ঐ গুপ্তঘাতকেরা শাণিত ছুরিকা হাতে
তাঁদের পবিত্র ন্যায়ের পথে অন্তরাল এনে যতবার হবে হন্তারক
ব্যর্থ হবে ততবারই। কেননা, কালজয়ী, রিপুজয়ী, মৃত্যুজয়ী তাঁরা
অন্যায়ের পাশ থেকে বাঁচাতে ধর্মকে মহাকালরূপে হয়ে বিচারক

আবির্ভূত হন এই নিষ্ঠুর জগতে কালে কালে। এই সত্য কোনোদিন হবে না বিকৃত,
মৃত্যুবিষ পান ক'রে নীলকণ্ঠ অমর-আত্মারা তাই আনবেন চিরকালই অজেয় অমৃত !

স্বামীজীর সহিত নয় মাস

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী অচলানন্দ-কথিত

স্বামীজী যেমনে উচ্চ আদর্শের শিক্ষা দিতেন, গুরুভ্রাতা ও আশ্রিতদের সর্বাঙ্গীণ নৈতিক পবিত্রতা বা উৎকর্ষ যাহাতে হয়, সে-বিষয়েও তাঁহার তেমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ছোটখাট সামান্য কাজেও শিক্ষা দিবার দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। অন্যের চিঠি পড়া, অন্যে চিঠি লিখিতে থাকিলে গায়ে পড়িয়া তাহা দেখা, অন্যে আলাপ করিতে থাকিলে গোপনে তাহা শুনা—এ-সব তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। পরন্তু কেহ এরূপ কাজ করিলে অতিশয় তিরস্কার করিতেন। এ-বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।

একবার স্বামীজী চিঠি লিখিতেছিলেন, আমি কাছে বসিয়াছিলাম। তাঁহার চিঠি দেখিবার দিকে আমার মন ছিল না বটে, তবে হয়তো অন্যমনস্কভাবে একবার আমার দৃষ্টি তাঁহার চিঠিতে পড়িয়া থাকিবে। স্বামীজী তৎক্ষণাৎ রুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'খবরদার, কখনও অন্যের চিঠি পড়িস্‌নি। এ ভারী অন্যায় পূজ্যপাদ হরি মহারাজের কাছে শুনিয়াছি, একবার স্বামীজী তাঁহাকে একখানা চিঠি ডাকে ফেলিতে দিয়াছিলেন। হরি মহারাজ চিঠির , ঠিকানাটা দেখিয়াছিলেন। স্বামীজী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হরি ভাই, তোমাকে আমি চিঠিটা ডাকে ফেলতে দিয়েছিলাম, address (ঠিকানা) পড়তে তো বলিনি। অন্যের চিঠির address তুমি কেন পড় ? এ-কাজ তোমার ঠিক নয়।' স্বামীজীর সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা হরি মহারাজের নিকট শুনিয়াছিলাম। স্বামীজী ও হরি মহারাজ সে-বার আমেরিকা যাইতেছিলেন। জাহাজের কেবিনে টেবিলের উপর ঘড়ি রাখিয়া অনেক সময় হরি মহারাজ অন্য কাজে যাইতেন। দু-একবার স্বামীজী ইহা লক্ষ্য করিলেন। পরে হরি মহারাজকে বলিলেন, 'হরিভাই, what right have you (তোমার কি অধিকার আছে) যে, তুমি একটি দরিদ্র cabin-boyকে (কেবিন-বালক) এরূপ চুরি করতে প্রলুব্ধ ক'রছ ? ও গরীব, ঘড়িটি দেখে ওর চুরি করবার লোভ হওয়া স্বাভাবিক।' এই প্রকার তাঁহার শিক্ষণ-প্রণালী ছিল।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে স্বামীজীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মঠে অগোছালো ভাব তিনি মোটেই দেখিতে পারিতেন না। প্রত্যেক জিনিস যাহাতে যথাস্থানে থাকে, বিছানাপত্র কাপড়চোপড় সুপরিষ্কৃত থাকে, সে-বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। প্রত্যেকের বিছানার চাদর রোজ সকালে ঝাড়িতে হইত এবং রোদ হাওয়া লাগাইতে হইত, যাহাতে বিছানা পরিষ্কার থাকে ও ছারপোকা না থাকিতে পারে এজন্য তিনি কাহারও কাহারও বিছানায় শুইয়া পরীক্ষা করিতেন। একবার মঠে স্বামীজী কি একটা অপরিষ্কার জিনিস দেখিয়াছিলেন। আমি কাছে ছিলাম। তিনি রাখাল মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, 'রাজা, এরূপ অপরিচ্ছন্নতা কেন ? মঠ যদি পরিষ্কার না রাখতে পারো, তবে গাছতলায় থাকলেই তো হয়। মঠ যখন হয়েছে, তখন ঠিক ঠিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।' এইভাবে তিনি সামান্য বিষয়েও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতেন।

কাহারও নখে ময়লা থাকিলে তিনি তাহার

হাতে জল খাইতে চাহিতেন না একদিন এজন্য তিনি আমাকে তিরস্কারই করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'দেখ্, তোর নখে যদি ময়লা থাকে, তবে তোর হাতে জল খাবো না।' হাতে জল লাগাইয়া কাপড়ের কোঁচায় হাত মুছিলে তিনি রাগ করিতেন। একবার তাঁহার বেদানা ছাড়াইয়া হাত ধুইয়া পরিবার কাপড়ে হাত মুছিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'ঐ কাপড়ে হাত মুছে আবার আমাকে খাবার দিবি? খবরদার, কখনও এরূপ করিসনি।' এ-সবের জন্য তিনি তীব্র ভাষায় গালি দিয়াছেন। প্রস্রাব করিবার সময় তিনি জল লইতে বলিতেন। বলিতেন, 'যদি জল না নিস, তবে ঠাকুর বড় রাগ করেন। কাজেই প্রস্রাবের সময় জল নিবি এবং আমাকেও মনে করিয়ে দিবি।' এইরূপে তিনি ঠাকুরের নাম করিয়া আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন। শুনিয়াছি, ঠাকুর নাকি এইরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করিতেন এবং শিষ্যদের তাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। যেখানকার জিনিস সেখানে রাখা, গোছানো ভাব ঠাকুরও পছন্দ করিতেন। হরি মহারাজ বলিতেন, 'যাহার ভিতরে গোছানো ভাব আছে, তার বাইরেও গোছানো আছে। যার ভিতরে গোছানো নেই, তার বাইরেও গোছানো নেই।'

অভ্যাগত সাধু-ব্রহ্মচারীদের মধ্যে সাধুভাব জাগাইয়া রাখার জন্য তিনি যেভাবে শিক্ষা দিতেন এবং গুরুভ্রাতাদের যাহা বলিতেন, তাহাই এখন বলিতেছি। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল—মঠে দুইশ্রেণীর সাধু থাকিবে। একদল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, আর একদল সন্ন্যাসী। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা আজীবন নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী থাকিবে। তাহারা দাড়ি-গোঁফ রাখিবে, আত্মপাকী হইবে, পঠন-পাঠন করিবে এবং খুব নিষ্ঠার সঙ্গে চলিবে। আর একদল সন্ন্যাসী থাকিবে, তাহারা 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজের মুক্তি ও জগতের হিতের জন্য জীবন যাপন করিবে। কোন নূতন ব্রহ্মচারী মঠে প্রথম আসিলে তিনি তাহাকে বেলুড়-গ্রাম ও উহার নিকটবর্তী স্থানে ভিক্ষা করিতে পাঠাইতেন। তাহাকে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল নিজে পাক করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতে হইত এবং পরে তাহা প্রসাদরূপে গ্রহণ করিতে হইত। সন্ন্যাসীদের মাঝে মাঝে তিনি মাধুকরী অন্নগ্রহণ করিতে বলিতেন। 'আমরা সাধু'—এই ভাবটা সব সময় রাখিতে বলিতেন। এই ভাবটা কার্যে পরিণত করিবার জন্য শরীর-ত্যাগের একমাস পূর্বে তিনি পূজনীয় রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতিকে মাধুকরী করিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারা মাধুকরী করিয়া আনিলে স্বামীজী তাহা হইতে একটু অতি আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন। সেই সময় স্বামীজী পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে বলিয়াছিলেন, 'মাধুকরী-বৃত্তি ত্যাগ করবেন না, সহ্য হোক আর নাই হোক।' মহাপুরুষ মহারাজের তখন কাশীতে আসিবার কথা হইতেছিল। আমরা যে সাধু—এই ভাবটি জাগাইয়া রাখাই স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল!

সাধু-ব্রহ্মচারীর পক্ষে মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না, ঐরূপ করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি সাধুদের পক্ষে গৃহস্থদের সঙ্গে বিশেষ মেশামেশি বা ঘনিষ্ঠতা করাও বেশী পছন্দ করিতেন না। সাধুদের বিছানায় গৃহস্থদের বসা—তাঁহার অপছন্দ ছিল। এমন কি গৃহস্থদের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া সাধুদের আহার করাও তিনি অপছন্দ করিতেন। এজন্য মঠে প্রত্যেক সাধুকে তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি মুখস্থ করিতে বলিতেন—

'মেরুসর্ষপয়োর্যদ্ যৎ সূর্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্ যৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥'

গৃহস্থদের সঙ্গে সাধুদের এক পঙ্‌ক্তিতে খাওয়া সম্বন্ধে তিনি কত strict (কড়া) ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতে বুঝা যাইবে। তখন মঠে ঠাকুরঘরের নীচের হলে খাওয়া হইত। ভিতরে সাধুরা এবং বারান্দায় গৃহস্থরা বসিতেন। একবার স্বামীজীর গৃহস্থ ভক্ত-শিষ্য সাঁতরাগাছির গোবিন্দবাবু ভিতরে বসিলে স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি সাধুদের সঙ্গে বসেছ কেন? বাইরে এসে বোস।' পরে ভক্তটি বাইরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। এইরূপে তিনি গৃহস্থদের সঙ্গে সাধুদের পৃথক্‌ভাব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

স্বামীজী কাজ-কর্ম ও ধ্যান-ধারণা—দুইটিই একসঙ্গে করিতে বলিতেন; বলিতেন, 'একসঙ্গে তো বেশীক্ষণ ধ্যান-ধারণা করতে পারবে না, অতএব ধ্যান-ধারণার পর বাকী সময় কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকবে। কাজ-কর্মে মন শুদ্ধ হয়।' ধ্যান-ধারণা বা কাজ-কর্ম না করিয়া শুধু গল্প করা বা আড্ডা দেওয়া তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। কুঁড়েমি তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। যখন কোন কাজ-কর্ম থাকিত না, তখন কোন কাজ আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে তাহাতে লাগাইয়া দিতেন। চুপ করিয়া থাকা বা গল্প করা তাঁহার একেবারে রীতি-বিরুদ্ধ ছিল। স্বামীজী নিজে পঠন-পাঠন, পড়াশুনার চর্চা যেমন করিতেন, তেমনি মঠে যাহাতে এ-সব নিয়মিতভাবে হয়, তাহাতেও উৎসাহ দিতেন। নিয়মিত পঠন-পাঠন রাত্রে আহারের পর আলোচনা-ক্লাস তাঁহার সময়ে খুবই হইত। সেবা-কার্যের জন্য পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের অনাথাশ্রম ও কাশীর সেবাশ্রম—এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই তখন আরম্ভ হইয়াছিল। কাশীর সেবাশ্রমের প্রতি তাঁহার খুবই সহানুভূতি ছিল এবং এ-বিষয়ে সেবকদিগকে তিনি খুব উৎসাহ দিতেন। এজন্য তিনি নিজে আবেদন পর্যন্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন। আগে সেবাশ্রমের নাম ছিল 'Home of Relief—Poormen's Relief Association'। ইহা তখন গৃহস্থদের অধীনে ছিল। তিনি বলিলেন, 'Home of Relief' কিরে? কেউ কি কাউকে রিলিফ দিতে পারে? 'Home of Service' নাম দে। ত্যাগীদের হাতে এ-সব কাজ দে। তা না হ'লে কি এ-সব জিনিস স্থায়ী হ'তে পারে?' স্বামীজীর দেহত্যাগের পর কাশী সেবাশ্রমের নাম 'Home of Service' রাখা হইল এবং কর্মীরা ইহা রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে দিয়া দিলেন। জীবৎকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী কালীকৃষ্ণ ঠাকুর পূজনীয় স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'আমি কাশীর অনাথাশ্রমের যা কিছু দরকার, ক'রে দেব।' এই সংবাদ শুনিয়া স্বামীজী স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে একপত্রে অন্যান্য খবরের মধ্যে এ-কথাও লেখেন, 'কালীকৃষ্ণ ঠাকুর যদি কাশীর অনাথাশ্রমের জন্য কিছু ক'রে দেন, তবে তাঁহার সহস্র শিব-প্রতিষ্ঠার ফল হবে।'

স্বামীজী নিজেও একদিন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের কাছে যাইতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন। তাহাতে গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন, 'একজনের কাছ থেকে আমরা সব নেবো কেন? সকলে মিলে দেবে, তাই হচ্ছে ঠিক।' ১৯০২ খৃঃ স্বামীজী যখন কাশীতে আসেন, তখন তিনি সেবাশ্রমের কার্য দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী—যত কর্মী আছে, সব আমার কাছে নিয়ে আয়। সবাইকে দীক্ষা দেবো।' সে-সময় যে-কয়জন কর্মী ও সেবক ছিলেন, সবাইকেই তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর কাশী সেবাশ্রমের কাজের বিবরণাদি শুনিয়া স্বামীজী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলিয়াছিলেন, 'এরূপ সেবার কাজ প্রত্যেক তীর্থস্থানে হওয়া উচিত।' তাঁহার নির্দেশমত কনখলে ১৯০১ খৃঃ সেবার কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের সেবাকার্যের প্রতি তাঁহার খুব সহানুভূতি ছিল। তবে সেবার কাজ কলিকাতায় হয়, এরূপও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। ইহা স্বামীজীর কাছে শুনিয়াছিলাম। এ-সব কাজে তিনি খুবই উৎসাহ দিতেন। একদিন তিনি নিজেই বলেন, 'ছোঁড়ারা কেউ কিছু করলে না। যাই হোক, তবু কাশীর ছেলেরা আমার spirit-এ (ভাবানুযায়ী) কিছু কাজ করছে।' তিনি এই-সব কাজে বুলডগের মতো নাছোড়বান্দার ভাব (Bull-dog's tenacity) নিয়ে লেগে থাকতে বিশেষ ক'রে বলতেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, 'দেখ্, আমি বারো বছর হন্যে হয়ে ঘুরেছি—ঠাকুরকে গঙ্গার ধারে বসাবো ব'লে। তোরা কোন কাজে লেগে থাকতে পারিস না, তবুও এই বুড়োর (সচ্চিদানন্দ স্বামীর) কাজে লেগে থাকার ক্ষমতা আছে।' যাহাতে সেবার কাজগুলি ঠিক ঠিক ভাবে হয়, সে-বিষয়ে তিনি খুব উপদেশ দিতেন। একদিন আমি কাছে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় স্বামীজী কল্যাণানন্দ-স্বামীকে বলিতেছেন, 'দেখ কল্যাণ, আমার কেমন ইচ্ছা হয় জানো? একদিকে ঠাকুরের মন্দির থাকবে, সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাতে ধ্যান-ধারণা করবে, তারপর যা ধ্যান-ধারণা করলে, তা Practical field-এ (ব্যাবহারিক জগতে) কাজে লাগাবে।' তাঁহার আসল ভাব ছিল Practical (কার্যকর) বেদান্ত। শুধু Theoretical (তাত্ত্বিক) নয়, বেদান্তকে কাজে পরিণত করতে হবে। শুধু কথায় বা বিচারে চলবে না।

পঠন-পাঠন, শাস্ত্রালোচনার দিকে স্বামীজীর অতিশয় অনুরাগ ছিল। এ-সব তিনি নিজে তো করতেনই, অধিকন্তু মঠের সকলকেই এ-বিষয়ে উৎসাহ দিতেন। আমাকে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আর কিছু পারিস না পারিস, গীতাটা পড়িস। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মঠে পাণিনির টোল হয়। পাণিনির বিশেষ পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মঠের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি একবার মঠে আসিয়াছিলেন। স্বামীজী তখন তাঁহাকে এ-বিষয়ে বলিয়াছিলেন এবং টোল খুলিবার জন্য তাঁহাকে খুব উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বাংলা দেশে বেদের প্রচার হোক, ইহাও তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। এই-সব পঠন-পাঠন, শাস্ত্রাদির ক্লাস ইত্যাদি করিতে তিনি সুধীর-মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ)-কে খুব উৎসাহ দিতেন। সুধীর মহারাজের উপর তিনি এই বিষয়ের ভার দেন। স্বামীজী তাঁহাকে এই আশীর্বাদও করিয়াছিলেন, 'আশীর্বাদ করি, তুই পণ্ডিত হ।' আমি যখন স্বামীজীর কাছে ছিলাম, তখন সুধীর মহারাজ উদ্বোধনেও কাজ-কর্ম করিতেন। পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য তিনি তাঁহাকে উদ্বোধন হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া মঠে রাখিয়াছিলেন। স্বামীজীর পঠন-পাঠনের প্রতি এতটা ঝোঁক ছিল!

প্রচার সম্বন্ধে স্বামীজীর কাছ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি। 'মণ্ডলী' বাহির করার কথা তিনি বলিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, ঠাকুরের flag (পতাকা) লইয়া মঠ হইতে সাধুদের মণ্ডলী গ্রামে গ্রামে যাইবে এবং ঠাকুরের ভাব প্রচার করিবে।

ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে স্বামীজী খুব strict

(কড়া) ছিলেন তাঁহার সময়ে ভোর চারটায় ধ্যানের ঘণ্টা পড়িত। তাঁহার সেবক প্রত্যেক সন্ন্যাসীর—এমনকি গুরুভাইদের কানের কাছে গিয়া ঘণ্টা বাজাইত। প্রত্যেককেই তখন ঠাকুর-ঘরে আসিয়া ধ্যান-ধারণা করিতে হইত। তিনি নিজেও আসিয়া বসিতেন এবং কে আসিল, না আসিল—খবর লইতেন। কেউ না আসিলে তিনি প্রথম প্রথম কাহারও ঘরের কাছে গিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিতেন, 'ওহে সন্ন্যাসী-বাবুরা, আর কতক্ষণ নিদ্রা যাবে ?' তিনি ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে এত strict ছিলেন যে, ঠাকুরঘরে গিয়া ধ্যান-ধারণা না করিলে কড়া শাসন করিতেন। একদিন ধ্যানের সময় ঠাকুরঘরে খুব অল্পসংখ্যক সাধু দেখিয়া তিনি নীচে আসিয়া খুব অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া বলেন—'দেখি, চাবি আমাকে দাও, আজ কেউ খেতে পাবে না। ভিক্ষা ক'রে খাক্।' বিজ্ঞান মহারাজ সেদিন ঠাকুরঘরে গিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে চাবি দিয়া স্বামীজী কলিকাতা চলিয়া আসেন। পরে মঠে ফিরিয়া গিয়া খবর লইলেন—কে কি করিয়াছিল। সে-দিন যাহারা ঠাকুরঘরে যায় নাই, তাহারা ভিক্ষা করিয়াই খাইয়াছিল।

এ-বিষয়ে তিনি এত কড়া ছিলেন যে, পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকেও আমার সামনেই বলিয়াছিলেন, 'তারক-দা, আপনি মহাপুরুষ হয়েছেন, তবু লোকশিক্ষার্থ আপনার ঠাকুর-ঘরে যাওয়া উচিত।' সেই অবধি মহাপুরুষ মহারাজ—যতদিন তাঁহার শরীরে সামর্থ্য ছিল, ততদিন ঠাকুরঘরে গিয়া বসিতেন। ইহা পুরাতন সাধুরা বিদিত আছেন। সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষেও স্বামীজী জপধ্যান ইত্যাদি করিতে বলিতেন এবং উৎসাহ দিতেন। তিনি নিজে শেষ জীবনেও ধ্যান-ধারণাদি খুব করিতেন। অসুস্থ হইলেও বাদ দিতেন না। সকলকে দু-বেলা ধ্যান-ধারণাদি করিতে বলিতেন এবং অন্য সময় কাজ-কর্ম করিতে বলিতেন।

যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে পূজ্যপাদ স্বামীজীর গুরুভাবও আমার কাছে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। সে-সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। তিনি একদিন স্বরূপানন্দ-স্বামীকে বলিতেছেন,—'দেখ্ স্বরূপ, আমি যার মাথায় হাত বুলিয়েছি, তার কোন ভাবনা নেই। এ নিশ্চিত জানবি।' শিষ্য গুপ্ত-মহারাজের (স্বামী সদানন্দ) কথা উঠিলে একদিন স্বামীজী পূজনীয় বাবুরাম মহারাজকে বলেন, 'আমার চেলারা যদি হাজারবার নরকে যায়, তাহলে আমি হাজারবার তাদের হাত ধ'রে তুলব। এ যদি সত্য না হয়, তবে ঠাকুরাদি সব মিথ্যা জানবি।'

একদিন দেখি—পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের নিত্য পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময় স্বামীজী গিয়া উপস্থিত। স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে উঠাইয়া দিলেন। উঠাইয়া নিজেই পূজা করিতে বসিয়া গেলেন। এক-আধবার ঠাকুরের শ্রীচরণে অর্ঘ্য দিয়াই নিজের মাথায় অর্ঘ্য দিতে আরম্ভ করিলেন। তখনই আবার ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। তারপর আসন ত্যাগ করিয়া ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসিবার সময় তাঁহার কী এক অপূর্ব গদ্‌গদভাব! আমরা সকলে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম।

একদিন একজন কাহাকে বলিতেছেন, 'দেখবি, দু-শ বছর পরে বিবেকানন্দের এক একটি চুলের জন্য লোক অস্থির হয়ে পড়বে।'

গুরু আর সঙ্ঘের অধ্যক্ষ যে এক—এ-কথা তিনি একদিন আমাকে বুঝাইয়া দেন। একদিন তিনি গম্ভীর হইয়া মঠে ঠাকুরঘরের নীচে বসিয়া আছেন আর পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ তাঁহার

পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি ঐ দিক অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'এই দিকে আয়। যা, ফুল তুলে নিয়ে আয়।' আমি ফুল তুলিয়া আনিলাম। পরে আমাকে বলিলেন—'আমাকে পূজা কর্—নিত্য পূজা করবি।' আবার বলিলেন, 'ফুল তুলে নিয়ে আয়।' ফুল তুলিয়া আনার পর আমাকে বলিলেন, 'অধ্যক্ষের পূজা কর্। গুরু আর অধ্যক্ষ এক, জানবি। নিত্যপূজা করবি।' এরূপ নানাভাবে তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন।

একদিন শাস্ত্রালোচনা হইতেছিল। প্রশ্ন হইয়াছিল—'ধ্যান জপ বড়, না কাজ বড়?' এই বিষয়ে অনেকক্ষণ আলোচনার পর (স্বামীজী বরাবর চুপ করিয়াই ছিলেন) শেষকালে তিনি বলিলেন, 'যা হয় বাবা, একটা কর্ দেখি ভাল ক'রে। তাহলেই এর মীমাংসা আপনা হতেই হয়ে যাবে।' একদিন স্বামী স্বরূপানন্দ প্রশ্ন করেন, 'আপনারা বরাহনগর মঠে কিভাবে জীবন কাটিয়েছেন? সেটা ভাল, না আমরা এখন যেভাবে কাটাচ্ছি, সেটা ভাল? অনেকে বলেন, বরাহনগর মঠে সময়টা খুব ভাল কেটেছে।' তাহাতে স্বামীজী উত্তর দেন, 'তখনকার জন্য বরাহনগর মঠের life (জীবন) আবশ্যক ছিল। এখনকার জন্যে এরূপই আবশ্যক, ওভাবে থাকলে আর চলবে না।'

সন্ন্যাসকে স্বামীজী খুব উচ্চ স্থান দিতেন। যখন সন্ন্যাস দিতে যাইতেন, তখন বলিতেন, 'ঠাকুরের কাছে বলিদান দিতে হবে।' ধ্যানান্তে একটা ভাব লইয়া তিনি আসিতেন। সন্ন্যাসের মন্ত্রাদি তিনি নিজেই সব বলিতেন। মন্ত্রপাঠ করিয়া শিক্ষাসূত্র আহুতি দিয়া তাহার একটু ভস্ম খাইতে বলিতেন। আর বলিতেন, 'আজ হ'তে তোকে ছত্রিশ জাতের অন্ন খাবার অধিকার দেওয়া হ'ল।'

স্বামীজীর সহিত মঠে বাস করিবার কালে সন্ন্যাস-গ্রহণ যে আমার প্রাণের ইচ্ছা, তাহা তাঁহাকে একদিন জানাই। তিনি বলিলেন, 'দশ বাড়ি ভিক্ষা ক'রে খেতে পারবি?' আমি বলিলাম, 'আপনার আশীর্বাদ হলেই পারি।' শুনিয়া বলিলেন, 'এইখানে পড়ে থাক্, সব ঠিক হয়ে যাবে।' স্বামীজীর তখন মায়াবতী যাইবার কথা হইতেছিল, পরে তাহা স্থগিত হয়। আমি এই অবকাশে আবার একবার সন্ন্যাস-গ্রহণের ইচ্ছা নিবেদন করিলাম। তিনি বুদ্ধপূর্ণিমা-দিবস সন্ন্যাসের দিন স্থির করিয়া স্বামী বোধানন্দকে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। সেই রাত্রি এমন উদ্বেগে কাটাইয়াছিলাম যে, ভোর ভোর উঠিবার কথা ছিল, হঠাৎ ঘুম ভাঙায় ঘড়ি দেখিলাম—৪-১০, আসলে কিন্তু তখন ২-২০ মিঃ, কাঁটা দুটির স্থান দেখিতে ভুল! উঠিতে দেরি হইয়াছে মনে করিয়া স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে ঘণ্টা বাজাইতে বলি। তিনি ঘণ্টা বাজাইলে স্বামী বোধানন্দ ঠাকুরঘরের দিকে যাইতেছেন, এমন সময় স্বামীজী উঠিয়া পায়খানা যাবার পথে উহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এতরাত্রে ঠাকুরঘরে কে যায়?' স্বামী বোধানন্দ ঘণ্টার কথা বলায় স্বামীজী বলিলেন, 'সে খুব nervous হয়ে (ঘাবড়িয়ে) গেছে।' কিছু পরে স্বামীজী নিজেই ঠাকুরঘরে গিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন এবং বিরজাহোম নিজেই করিলেন। আহুতি দিবার পর বলিলেন, 'আজ হ'তে তোর সমস্ত সাংসারিক কাজ নাশ হয়ে গেল।' আমার সন্ন্যাস নাম দেন 'অচলানন্দ'। আমিই তাঁর শেষ সন্ন্যাসী শিষ্য।

স্বামীজী নানাভাবে অনেককে অনেক রকম শিক্ষা দিয়াছেন। যাহাকে দিয়া যতটুকু করাইয়াছেন, সে ততখানি করিয়া ধন্য হইয়াছে। ভবিষ্যতে যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা যদি এই ভাবে ভাবিত হইয়া নিজেদের জীবন তৈরি করিতে পারেন, তাঁহাদের জীবন ধন্য হইবে এবং পরমার্থ লাভ হইবে।

স্বামীজীর আর একটি শিক্ষা ছিলঃ জাগতিক কাজকর্ম যে ঠিক ঠিক করিতে পারে, তাহার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান-লাভও সম্ভব।

শ্রীশঙ্করাচার্য ও স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী নির্মলানন্দ গিরি

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। এই ভারততীর্থে শাশ্বত সত্য ও সনাতন ধর্মে যখনই কোনও গ্লানি আসিয়াছে—অধর্ম, অনাচার ও নিছক মতবাদ ধর্মের মূল তথ্যগুলিকে বিকৃত করিয়া জনমানসকে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং ধর্ম ও নীতির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া মানুষ যখন অন্যায়, অসত্যকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন জানিয়া প্রেয়বস্তুকেই চরমশ্রেয়ঃ রূপে গ্রহণ করিয়া পথভ্রষ্ট ও দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে; তখনই জাতির মহাসঙ্কটময় মুহূর্তে বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত মানবের পুরোভাগে যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি, ব্রহ্মবেত্তা জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ। সেই জন্যই উদাত্তকণ্ঠে কবি গাহিয়াছেন—'হেথায় দাঁড়ায়ে দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে'। কবির এই মঙ্গলাচরণ নিছক কল্পিত নহে। লোকশিক্ষার জন্য 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' শ্রীভগবানেরই বিভূতিস্বরূপ অমিতশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া দিব্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এমনই দুই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছেন জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য ও বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতের অধ্যাত্মগগনের অতি উজ্জ্বল এই দুই জ্যোতিষ্ক চল্লিশটি শরৎও ধরাধামে ছিলেন না, তাহার পূর্বেই তাঁহারা লীলাসংবরণ করিয়াছেন। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের যে অপূর্ব সমন্বয়; ত্যাগ, তিতিক্ষা ও পরদুঃখকাতরতার যে অলৌকিক নিদর্শন তাঁহারা আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিংশ শতাব্দীর জড় বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ অপেক্ষাও বিস্ময়কর।

ভগবৎপাদাচার্য শঙ্কর সনাতন বৈদিক ধর্মকে তৎকালীন বৌদ্ধ, তান্ত্রিক এবং ধর্মের নামে যাহারা কেবল কুসংস্কার ও নানা অনাচারকেই হিন্দুধর্মের সার বলিয়া প্রচার করিতেছিল, তাহাদের কবল হইতে রক্ষা করিয়া সনাতন হিন্দুধর্মকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, যাহার অমোঘ পরিণাম আজও আমরা সমগ্র ভারতে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। শঙ্কর-প্রবর্তিত শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদিত অদ্বৈত বেদান্ত শ্রীমৎ পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, তোটক, হস্তামলক প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাশাত্ম যতি, অখণ্ডানন্দ মুনি, বিদ্যারণ্য ও মধুসূদন সরস্বতী-প্রমুখ পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয়। বর্তমান ভারতে দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মণ্ডলেশ্বর ও পীঠাধীশ-শঙ্করাচার্যগণের দ্বারা প্রচারিত হইয়া আজিও হিন্দুধর্মের মহিমা আসমুদ্রহিমাচল ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ হৃষীকেশ কৈলাস আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীমৎ স্বামী ধনরাজ গিরি মহারাজের নিকট অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রবর্তিত বৈদিক হিন্দুধর্মকে বিশ্বের দরবারে বিজয়মাল্য অর্পণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈততত্ত্বকে এক বিশ্বজনীন রূপ দান করিয়া উহাকে আরও ব্যাপক ও অধিকতর মাধুর্য-মণ্ডিত করিয়াছেন।

আধুনিক সভ্যজগৎ—বিজ্ঞান ও যুক্তির জগৎ। আচার্য শঙ্কর বেদান্তধর্মকে পূর্বেই বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং আচার্য সম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন, 'এই ষোড়শবর্ষীয়

বালকের লেখায় আধুনিক সভ্যজগৎ বিস্মিত হইয়া আছে।' 'The marvellous Sankaracharya arose. The writings of this boy of sixteen are the wonders of the modern world, and so was the boy'. (From 'Sages of India'—a lecture delivered in 1897.) স্বামীজী পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন—এই মৃতপ্রায় জাতির শরীরে সজীবতা ফিরাইয়া আনিতে হইলে বেদান্তের বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক।

আজিও কালের তামস প্রভাবকে ব্যাহত করিয়া আচার্য শঙ্করের অলৌকিক কীর্তিকলাপ আলোকস্তম্ভের ন্যায় সতত দেদীপ্যমান থাকিয়া দিগন্ত উদ্ভাসিত করিতেছে। যখন কোনও যান-বাহন ছিল না, তখন কেমন করিয়া আচার্যপাদ শঙ্কর ভারতের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেদান্ত-ধর্মকে বহুকালের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও আবিলতা হইতে মুক্ত করিয়া জনগণের উপযোগী আনুষ্ঠানিক ধর্মে রূপায়িত ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপনা আজও ভগবান্ শঙ্করাচার্যের দূরদর্শিতা ঘোষণা করিতেছে প্রহরীর মত চতুর্বেদ ভারতের চতুঃসীমা রক্ষা করিয়া হিন্দুধর্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছে।

যদিও অদ্বৈতানুভূতিই সাধনার শেষ লক্ষ্য, তথাপি এই অদ্বৈতানুভবে স্থিত হইতে হইলে যে-সব স্তর্ বা সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে হয়, সেইগুলিকে শঙ্করাচার্য মোটেই উপেক্ষা করেন নাই। অধিকন্তু তিনি সাধনচতুষ্টয়, উপাসনা, ভক্তি, পূজার্চনা প্রভৃতি প্রধান অঙ্গগুলিকে সমধিক মহত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞানমূর্তি শঙ্কর কেবলমাত্র অদ্বয়ব্রহ্মবিজ্ঞানীই ছিলেন না; পরন্তু উপাসনা ও পরাভক্তির অপূর্ব সমন্বয় তাঁহার সমগ্র অধ্যাত্মজীবনকে উদ্ভাসিত করিয়াছে এবং সমগ্র হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মকে তিনি নূতন ভাবে গঠিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। সনাতন বৈদিকধর্মকে তিনি যে অভিনব রূপ ও সংহতি দিয়া গিয়াছেন, কালপ্রভাবে তাহা ম্লান হইলেও একেবারে লোপ পায় নাই। বস্তুতঃ তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজজীবনে এক বৈপ্লবিক যুগান্তর আনিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আচার্য শঙ্করের সমন্বয়ভাবেরই পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ইহার সহিত তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবার প্রবর্তন করিয়া হিন্দুধর্মকে যুগোপযোগী মাহাত্ম্য প্রদান করিয়াছেন।

আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব ঐতিহাসিক দিক দিয়াও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি সনাতন হিন্দুধর্মকে এমন এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া বলিষ্ঠ শক্তিসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, যাহার মধুময় ফলস্বরূপ আজও এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা হিন্দু বলিয়া গর্ব অনুভব করিতেছি। শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয় না হইলে হিন্দুধর্ম বিলুপ্ত হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না। অবশ্য রামানুজ প্রভৃতি অন্যান্য পরবর্তী আচার্যগণ হিন্দুধর্মের বনিয়াদে প্রভূত বলাধান করিলেও কি দার্শনিক, কি সামাজিক, কি আনুষ্ঠানিক সকল ক্ষেত্রেই তাঁহারা আচার্য শঙ্করের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শাঙ্কর মতে সর্ববিকার অসত্য ও ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য। ভগবান্ শঙ্কর বলিয়াছেন, 'শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ, ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। আচার্যপ্রবর বলেন—ব্রহ্মের শক্তিও মিথ্যা, এবং উহা অবিদ্যায় অধ্যস্ত বা অজ্ঞানের

দ্বারা কল্পিত নামরূপ হইতে অতিরিক্ত কিছুই নহে। ভ্রান্তিবশতই লোকে শক্তিকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ শক্তি ঈশ্বরের স্বরূপও নহে এবং ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহে বলিয়া উহা অনির্বচনীয়া বা মিথ্যা। আচার্য শঙ্কর নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী হইয়াও আদিশক্তি, মহামায়া ও জগজ্জননীরূপে ঈশ্বরোপাসনার বিধান দিয়াছেন। কারণ তাঁহার সর্বব্যাপক অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে সর্বকর্ম, উপাসনা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতির যথাযথ স্থান রহিয়াছে।

বেদান্তোক্ত অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ অনুভূতি-লাভে কৃতার্থ হইলেও আচার্য শঙ্কর ও স্বামীজী কিন্তু জগতের প্রতি উদাসীন থাকেন নাই। জীব ও জগতের কল্যাণের জন্যই শঙ্কর আসমুদ্র-হিমাচল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেদান্তের সারগর্ভ উপদেশে তৎকালীন ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। সেইরূপ স্বামী বিবেকানন্দও সর্বভূতে এক ব্রহ্ম দর্শন করিয়া তাঁহারই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়া উদাত্তকণ্ঠে বলিয়াছেন —'ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়, মনপ্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায়।' ঈশ্বরে ফলার্পণ-বুদ্ধিতে নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনা-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হইলে এবং আত্মজিজ্ঞাসা না জাগিলে বেদান্ততত্ত্ব সাধকহৃদয়ে স্ফুরিত হয় না —ইহা বেদান্তের সুস্পষ্ট নির্দেশ। সেজন্য স্বামীজী যুগের অনুকূল সাধন বিধান করিলেন ঃ

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

শিববুদ্ধিতে জীবের সেবাদ্বারা চিত্তশুদ্ধি কর—ইহাই যুগাচার্যের অভিনব বাণী। বিভিন্ন জীবরূপে স্বীয় ইষ্টই সাধকের সম্মুখে উপস্থিত—এইজ্ঞানে সেবাধর্ম গ্রহণ করিলে সেই কর্ম ও উপাসনায় আর কোন পার্থক্য থাকে না। কর্ম তখন উপাসনায় পরিণত হয়। সাধকের চিত্ত ক্রমে সত্ত্বগুণের উদয়ে শান্ত, অন্তর্মুখ ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া পড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও ধর্ম—উভয়েরই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উভয়ের সমন্বয়ের পথও দেখাইয়া দিয়াছেন। বিজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি যে বিশেষ উন্নতিলাভ করে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ; কিন্তু প্রকৃত দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভাবে তাহা সমাজ ধ্বংস করিতে পারে। করুণা ও সহানুভূতিশূন্য বিচারবুদ্ধি পৃথিবীকে রক্তবন্যায় প্লাবিত করিতে পারে। অপরদিকে বিজ্ঞানের প্রদর্শিত ব্যাবহারিক পথ অস্বীকার করিয়া, মানুষের জরুরী ঐহিক প্রয়োজনগুলি স্পর্শ না করিয়া ধর্মও কেবলমাত্র শূন্যগর্ভ আদর্শ-রূপেই থাকিয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্র বলে, অপরা বিদ্যা বা লৌকিক বিজ্ঞানদ্বারা মানুষ রোগ, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর করিয়া পরাবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান দ্বারা অমরত্ব লাভ করে। শ্রুতি বলিতেছেন—'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে। পরা চৈবাপরা চ।' স্বামী বিবেকানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান ও ধর্মের সহযোগিতায় হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী বর্তমান যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

অনেকের ধারণা—অদ্বৈতবাদের দ্বারা মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিবে। কারণ অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়—আমরা সকলেই এক, সকলেই ঈশ্বর ; অতএব আমাদের আর নীতি-পরায়ণ হইবার প্রয়োজন নাই। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, অদ্বৈতের যে সমদর্শন, তাহা এই সমস্ত আসুরিকভাবাপন্ন ঘোর তামসিক ব্যক্তি-গণের নিকট প্রতিভাত হইতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'যদি তুমি পশু-

প্রকৃতি হও, তবে শুধু কশাঘাতে শাসনযোগ্য মনুষ্যপদবাচ্য হইয়া থাকা অপেক্ষা তোমার পক্ষে বরং আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ। কশাঘাত বন্ধ করিলেই তোমরা সকলে অসুর হইয়া দাঁড়াইবে।' (বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, ৩৩১ পৃঃ)।

নিম্নতম কীট ও উচ্চতম মানুষের মধ্যে সেই একই ঈশ্বরীয় সত্তা বিদ্যমান। কীটের দেহই নিম্নতম রূপ, সেখানে দেবত্ব মায়াদ্বারা অনেক বেশী পরিমাণে আবৃত রহিয়াছে। যেখানে দেবত্বের উপর আবরণ ক্ষীণতম, তাহাই উচ্চতর রূপ বা দেহ। সকল কিছুর পশ্চাতে সেই এক দেবত্বই বিরাজমান—'একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ'। এই সত্য অবলম্বন করিয়াই নীতির ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সত্য হইতেই অদ্বৈত-নীতির মূলতত্ত্বের উদ্ভব এবং ইহাকেই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে—আত্মত্যাগ। যখন কেহ একটি ক্ষুদ্র কীটের জন্যও জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হন, বুঝিতে হইবে তিনি তখন অদ্বৈতবাদীর ঈপ্সিত পূর্ণত্বে পৌছিয়াছেন। যে মুহূর্তে তিনি এইভাবে প্রস্তুত হন, সেই মুহূর্তেই তাঁহার সম্মুখ হইতে মায়ার আবরণ অপসৃত হয়। তখন তাঁহার অনাদিকালের ভুল ভাঙিয়া যায়। বেদান্তবাদী যখন নিজ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁহার নিকট সমগ্র জগৎ লুপ্ত হয়। জগৎ আবার তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু পূর্বের সেই দুঃখময় জগৎরূপে নহে। যে জগৎ জ্ঞানলাভের পূর্বে দুঃখের কারাগার ছিল, জ্ঞানলাভের পর সেই দুঃখপূর্ণ জগৎই সচ্চিদানন্দে—নিত্য সত্তায়, নিত্যজ্ঞানে, নিত্য আনন্দে পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে। এই অবস্থা লাভ করাই অদ্বৈত-বেদান্তের লক্ষ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, 'অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত করিবার উপায়—নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি সাংসারিক ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাদ কার্যে পরিণত কর, টাকা তোমার নিকট আসিবে। যদি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইতে ইচ্ছা কর, তবে অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রয়োগ কর, তুমি মহামনীষী হইবে। যদি তুমি মুক্তি লাভ করিতে চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ করিতে হইবে—তাহা হইলে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে, পরমানন্দস্বরূপ নির্বাণ লাভ করিবে'। (বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ)।

আজ আমাদের যতকিছু গ্লানি, যতকিছু দুর্বলতা ও হীনতা, তাহার জন্য দায়ী আমরাই। যদি আমাদিগকে এই সব অবিদ্যার বন্ধন অতিক্রম করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা আমাদের নিজদিগকেই করিতে হইবে। অপর কেহ কিছু করিয়া দিবে না। শাস্ত্র ও আচার্য সহায়তা করিতে পারেন মাত্র। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ,' 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ', 'আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ", 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' প্রভৃতি বেদান্তের বাণীগুলি জড়তা ও দুর্বলতা পরিহার করিয়া সকল অবস্থায় অভীঃ ও বীর্যবান্ হইতে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করিতেছে। বৈজ্ঞানিক সভ্যতার কুহকে আমরা বেদান্তের শাশ্বত সত্যকে ভুলিতে বসিয়াছি। এই আত্মবিস্মৃতিই আমাদের সমূহ সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছে। ভারতের এই জাতীয় দুর্দিনে ত্যাগ, তিতিক্ষা, শৌর্য ও বীর্যের মূর্ত বিগ্রহ—এই দুই আচার্যের অমর আত্মা যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের মধ্যে তাঁহাদের অনন্ত শক্তি সংক্রমিত ও সঞ্চারিত করুন—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ওঁ অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেওয়ান পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ

পোরবন্দরের রাজা নাবালক থাকায় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী দেওয়ান শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পোরবন্দর রাজ্য শাসন করিতেন। জুনাগড়ের প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে পরিচয়পত্র লইয়া স্বামীজী পোরবন্দরে দেওয়ানজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি খুবই সমাদরে স্বামীজীকে অতিথিরূপে গ্রহণ করেন।

দেওয়ানজী একজন বড় বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি বেদের অনুবাদ করিতেছিলেন। স্বামীজীর জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাইয়া দেওয়ানজী প্রায়ই বেদের জটিল ও দুর্বোধ্য অংশগুলির ব্যাখ্যা করিতে স্বামীজীর সাহায্য লইতেন। স্বামীজীও দুর্বোধ্য বিষয়গুলির স্বাভাবিক প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন।

দেওয়ানজী স্বামীজীকে তাঁহার এই অনুবাদে সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। ফলে পোরবন্দরে ১১ মাস কাটাইয়া ঐ কাজে তিনি সহায়তা করেন। উভয়ে অবিশ্রান্ত কাজ করিতেন। স্বামীজী বেদের অন্তর্নিহিত চিন্তা-ধারার মহত্ত্ব যতই উপলব্ধি করেন, ততই উহাতে বেশী আকৃষ্ট হন। তিনি পাণিনি-ব্যাকরণের বৃহৎ-টীকা পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' পাঠ সমাপ্ত করেন। দেওয়ানজী তাঁহাকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতেও উৎসাহিত করেন। কারণ তিনি বলেন, ভবিষ্যতে এই ভাষা স্বামীজীর কাজে লাগিবে।

দেওয়ানজী স্বামীজীর প্রতিভা, মেধা এবং মতের উদারতা ও মৌলিকতা বুঝিতে পারিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাশ্চাত্যই তাঁহার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র হইবে, ভারতে তাঁহার উপযুক্ত সমাদর হওয়া সম্ভব নয়। সনাতন ধর্ম প্রচার করিয়া নিশ্চয়ই তিনি পাশ্চাত্য কৃষ্টির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন।

স্বামীজী এই কথা শুনিয়া বিশেষ প্রীত হন, কারণ তাঁহার মনেও এইরূপ চিন্তার উদয় হইয়াছিল। জুনাগড়ে শ্রী সি. এস. পাণ্ডের নিকটেও তিনি ঐরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশ্য ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা তাঁহার মনে তখনও গড়িয়া উঠে নাই।

এখানেই স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। একদল হিংলাজ-যাত্রীর জন্য পাথেয়-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সেখানে যান এবং একজন বাঙালী সাধু দেওয়ানজীর বাড়িতে আছেন জানিতে পারেন। যাত্রীরা ত্রিগুণাতীতানন্দকে বাঙালী জানিয়া তাঁহাকেই উক্ত সাধুকে বলিয়া দেওয়ানজীর নিকট হইতে অর্থ-সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পাঠান। স্বামীজী অবশ্য কোনও সাহায্য বা অর্থ ভিক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া দেন।

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

স্বামীজী বরোদার গাইকোয়াড়ের মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর মণিভাই-এর গৃহে কিছুদিন অবস্থান করেন। তারপর ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্য ভারতে খাণ্ডোয়ার উকীল হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে উপস্থিত হন। হরিদাসবাবু কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজীকে তাঁহার গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান দেখেন। প্রথমতঃ

তিনি স্বামীজীকে একজন সাধারণ সন্ন্যাসীই মনে করেন। কিন্তু কথাবার্তায় বুঝিলেন, যত লোকের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় আছে, এই সাধু তাঁহাদের সকলের চেয়ে বেশী শিক্ষিত। ফলে তিনি সন্ন্যাসীকে তাঁহার গৃহে বাস করিতে আমন্ত্রণ করেন এবং তাঁহার পরিবারের একজনের ন্যায় ব্যবহার করিতে থাকেন। স্বামীজী এই গৃহে প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন; মাঝে একবার ইন্দোর দেখিয়া আসেন।

খাণ্ডোয়ার বাঙালী বাসিন্দারা এবং অন্যান্য বহু লোক স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন এবং শাস্ত্রে ও ইংরেজী-সাহিত্যে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহারা সকলেই অভিভূত হন। হরিদাসবাবু এ-বিষয়ে এইরূপ বলিতেন: স্বামীজীর বাক্যালাপে কৃত্রিমতার লেশ ছিল না। তাঁহার উচ্চভাব ও উদারমত মার্জিত ভাষায় সহজ সরলভাবে নিঃসৃত হইত। তাঁহার কথায় এমন আন্তরিকতা ছিল, যাহাতে তাঁহাকে প্রত্যাদিষ্ট মনে হইত। হরিদাসবাবু তাঁহাকে সভায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু নানা কারণে উহা সম্ভব হয় নাই।

সিভিল জজ বাবু মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর সম্মানার্থ বাঙালী প্রবাসীদের এক ভোজ দেন। ভোজের পূর্বে ও পরে আলোচনায় সাহায্য হইবে মনে করিয়া স্বামীজী একখানি উপনিষদ্ সঙ্গে লইয়া যান। অতিথিগণ উপস্থিত হইলে স্বামীজী উপনিষদের কতিপয় জটিল ও দুর্বোধ্য শ্লোক পাঠ করেন এবং এত সরলভাবে ঐগুলি ব্যাখ্যা করেন যে, বালকগণও তাহা বুঝিতে পারে। অভ্যাগতদের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও উকীল প্যারীলাল গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সমালোচনা করিবার সংকল্প লইয়া আসেন, কিন্তু স্বামীজীর আলোকপ্রদ ভাষ্য ও উত্তর শুনিয়া সম্পূর্ণ নিরস্ত হইলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে প্যারীবাবু হরিদাসবাবুকে বলিয়াছিলেন, স্বামীজীর চেহারাই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক। হরিদাসবাবু এই কথা স্বামীজীকে বলিলে স্বামীজীর মুখমণ্ডল এক অপূর্ব দীপ্তিতে মণ্ডিত হয় এবং তিনি বলেন, 'আমি জানি না, কিন্তু আমার গুরুদেব আমার সম্বন্ধে এইরূপই বলিতেন।'

খাণ্ডোয়াতেও চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য আমেরিকায় যাইবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হয়। জুনাগড় বা পোরবন্দরে অবস্থানকালে স্বামীজী জানিতে পারেন, পর বৎসর ধর্মমহাসভার অধিবেশন হইবে। তিনি হরিদাসবাবুকে বলেন, 'যদি কেহ আমাকে পাথেয় বাবদ অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে আমি আমেরিকা যাইব।'

খাণ্ডোয়া ত্যাগ করার পূর্বে হরিদাসবাবুর ভ্রাতা বোম্বাই-এর বিখ্যাত ব্যারিস্টার শেঠ রামদাস ছবিলদাসের নিকট একখানা পরিচয়-পত্র স্বামীজীর হাতে দেন।

১৮৯৭ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীজী খেতড়ি হইতে কিশেনগড়, আজমীর, যোধপুর ও ইন্দোর পরিভ্রমণান্তে আর একবার খাণ্ডোয়ায় উপস্থিত হন।

যোধপুরে প্রধান মন্ত্রী প্রতাপসিংহের গৃহে স্বামীজী প্রায় ১০ দিন ছিলেন। খাণ্ডোয়ায় পৌঁছিয়া পুনরায় তিনি হরিদাসবাবুর গৃহেই অতিথি হন। এই সময় স্বামীজী প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন, কিন্তু শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠেন। প্রায় এক সপ্তাহ এভাবে কাটাইয়া তিনি খাণ্ডোয়া ত্যাগ করেন।

খাণ্ডোয়া ত্যাগ করিবার পূর্ব দিন রাত্রে হরিদাসবাবু স্বামীজীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন, এমনকি দীক্ষালাভের জন্য স্বামীজীর চরণ ধরিয়া বহু অনুনয় করেন। স্বামীজী কিন্তু

দীক্ষা দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। স্বামীজী বলিলেন, তিনি শিষ্য করিয়া গুরুগিরির অভিমান বাড়াইতে চান না। হরিদাসবাবুকে তিনি উপদেশ দেনঃ যাহা একজন মানুষ করিতে সমর্থ, তাহা করা সকলের পক্ষেই সম্ভব। মানব-দেহেই সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ আছেন এবং এই অনুভূতি লইয়া মানুষের সকল কর্ম করা উচিত।

ডাক্তার লোগান

ডাক্তার এম. এইচ. লোগান স্বামীজীর একজন আমেরিকান শিষ্য। তিনি স্যান-ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন।

১৮৯৯ খৃঃ দ্বিতীয়বার আমেরিকা-সফরের সময় ক্যাম্প টেলারে তিন সপ্তাহ বাস করার পরে ওক স্ট্রীটে ডাক্তার লোগানের গৃহে স্বামীজী বাস করিতে থাকেন। কারণ স্বামীজীর শিষ্য ও অনুরাগিগণ তাঁহার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে সর্বদা ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখার প্রয়োজন বোধ করেন। ডাক্তার উইলিয়াম ফস্টারও তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেন।

এই সময় কয়েকদিনের জন্য তাঁহার বক্তৃতা বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু ৬নং গিয়ারী স্ট্রীটের বৈঠকখানায় এবং ৭৭০ নং ওক স্ট্রীটের গৃহে গীতা সম্বন্ধে স্বামীজী চারিটি বক্তৃতা দেন। এগুলির সঠিক তারিখ মে মাসের ২৪, ২৬, ২৮, ও ২৯শে।

ক্যালিফর্নিয়াতে স্বামীজীর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন লস এঞ্জেলেসের মিসেস হান্সবরো, ডাঃ লোগান, মিঃ প্যাটারসন ও ওয়লবার্গ। শেষোক্ত তিনজন যথাক্রমে নবগঠিত স্যান-ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত-সমিতির অধ্যক্ষ, সহকারী অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারি ছিলেন। মে মাসের শেষ পর্যন্ত স্বামীজী এই স্থানেই অতিবাহিত করেন।

স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দকে ক্যালিফর্নিয়ায় যাইয়া শিষ্য ও ভক্তদের ভার গ্রহণ করিতে লিখেন। স্বামীজী ক্যালিফর্নিয়া ত্যাগ করার পূর্বেই তাঁহার অনুরক্ত ছাত্রী মিস মিনি. সি. বুক ১৬০ একর জমি বেদান্ত-সমিতিকে দান করেন। স্বামীজী সেই জমি দেখিতে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু জমির পরিচয় পাইয়া বিশেষ খুশী হন।

পরে স্যানফ্রান্সিস্কোতে যে বেদান্ত-প্রচার প্রসার লাভ করে, তাহাতে ডাঃ লোগান স্বামীজীর পরবর্তী ভারতীয় সন্ন্যাসিগণকে প্রভূত সহায়তা করেন।

মিসেস ফাঙ্কি

১৮৯৪ খৃঃ ১৪ই ফেব্রুআরি মিসেস ফাঙ্কি স্বামীজীকে প্রথম দেখিবার এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই সময় স্বামীজী ডেট্রয়েটে বক্তৃতা দিতেছিলেন।

মিসেস ফাঙ্কি ডেট্রয়েট-সমাজে একজন সম্ভ্রান্ত ও বিশেষ পরিচিতা মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় লিখিয়াছেনঃ ডেট্রয়েটে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিবার পর প্রায় দেড় বৎসর কোন সংবাদ না পাইয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি হয়তো দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। হঠাৎ জানিলাম যে, তিনি Thousand Island Park-এ (সহস্র-দ্বীপোদ্যানে) গ্রীষ্ম কাটাইতেছেন। আমরা দু-জন—মিস গ্রীনস্টিডেল ও আমি—পরদিনই ভোরে রওনা হই। আমরা স্থির করিলাম, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব এবং আমাদিগকে শিক্ষা দিতে অনুরোধ জানাইব। আমরা ভয়ে ভয়ে বৃষ্টিপাতের মধ্যে অন্ধকার রাত্রিতে এমন একজনের সঙ্গে দেখা করিতে চলিয়াছি, যিনি আমাদিগকে চেনেন না। কিন্তু যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, তখন আমরা সব ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম, আমরা

ডেট্রয়েট হইতে আসিয়াছি। সেখানে শিক্ষার্থীদের দলে আমরা স্থান পাইলাম।

সহস্র দ্বীপোদ্যানে অবস্থানকালে স্বামীজী মিসেস ফাঙ্কিকে দীক্ষা দেন। এই স্থান ত্যাগ করার পূর্বদিন স্বামীজী ফাঙ্কি ও ক্রিস্টিন সহ বেড়াইতে বাহির হন। মিসেস ফাঙ্কি লিখিয়াছেন, 'আমরা দুজন শেষ দিন স্বামীজীর সহিত বেড়াইতে বাহির হই। একটি বৃক্ষশাখার নীচে বসিয়া তিনি বলিলেন, 'এখানে আমরা এখন বুদ্ধের ন্যায় বৃক্ষতলে ধ্যান করিব।' ধ্যানে বসিয়া তিনি একটি ব্রোঞ্জের মূর্তির মতো স্থির ও নিশ্চল হন! হঠাৎ ঝড় আসে ও বৃষ্টি হয়। আমি ছাতা খুলিয়া তাঁহাকে ঝড়বৃষ্টি হইতে যথাসম্ভব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। তাঁহার মন যেন কোন্ অতলে ডুবিয়া গিয়াছিল! **এমন সময়** ছাতা ও বর্ষাতি লইয়া আমাদের খোঁজে বন্ধুরা আসিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর স্বামীজী আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কি এই বৃষ্টিতে আবার কলকাতায় এসেছি?'

পরে স্বামীজী ডেট্রয়েটে নিমন্ত্রিত হইয়া দুই সপ্তাহ ক্লাস ও বক্তৃতা করেন। এই সময়েও এই মহিলা তাঁহার ক্লাসে যোগ দেন ও বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

দ্বিতীয় বার ১৮৯৯ খৃঃ শেষভাগে স্বামীজী যখন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা সহ বিদেশে যান, তখন মিসেস ফাঙ্কি স্বামীজীর আগমনবার্তা জানিতে পারিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যান এবং স্বামীজীর প্রতীক্ষায় থাকেন। টিলবেরী জাহাজ-ঘাটে নামিয়াই স্বামীজী মিসেস ফাঙ্কিকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য ও প্রীত হন। এই দর্শনের কথা মিসেস ফাঙ্কি এইরূপ বলিয়াছেন, 'স্বামীজী খুব রোগা হইয়া গিয়াছেন এবং চেহারায় ও কান্দে তাঁহাকে বালকের ন্যায় দেখায়।'

স্বামীজীর সঙ্গে একই জাহাজে এই মহিলা আমেরিকা যান। জাহাজের এই দিনগুলি সম্বন্ধে মিসেস ফাঙ্কি লিখিয়াছেন, 'আমেরিকার পথে দশদিন আমরা স্বামীজীর দিব্য সঙ্গে জাহাজে কাটাই। এই দিনগুলির স্মৃতি ভুলিবার নয়। মনে হইল, মধুর দিনগুলি যেন খুব তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া গেল।' ফাঙ্কি তাঁহার স্মৃতিকথায় স্বামীজীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন।

মিসেস ব্যাগলি

মিসেস জন জে. ব্যাগলি স্বামীজীর একজন অতীব গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। তিনি মিশিগানের ভূতপূর্ব গভর্নরের বিধবা পত্নী। ১৮৯৪ খৃঃ ডেট্রয়েটে অবস্থানকালে স্বামীজী এই মহিলার অতিথিরূপে সর্বসমেত প্রায় চারি মাস অতিবাহিত করেন। এই মহিলা বলিতেন, এই সময় স্বামীজীর কাজে ও কথায় সর্বদাই উচ্চভাব প্রকাশ পাইত তিনি ইহাও বলেন, স্বামীজীর সান্নিধ্য যেন বিশেষ আশীর্বাদ।

আমেরিকার কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণ ধর্মযাজক —এই গৃহে বাসকালে স্বামীজীর ন্যায় একজন নিষ্কলুষ এবং আদর্শ পুরুষেরও নামে কুৎসা রটনা করে। এই মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে মিসেস ব্যাগলি ও তাঁহার বিবাহিতা কন্যা— উভয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহাদের লিখিত পত্র হইতেই বুঝা যায়, স্বামীজীর উপর তাঁহারা কিরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। ১৮৯৪ খৃঃ ২২শে জুন একটি মহিলা-বন্ধুকে এক পত্রে মিসেস ব্যাগলি লেখেন, 'স্বামীজী নির্মলচরিত্র এবং আমেরিকাবাসীদিগের অভূতপূর্ব উচ্চ আদর্শের পথপ্রদর্শক, এইজন্য তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। যাহারা এইরূপ মিথ্যা রটনা করে, তাহারা তাঁহার মহত্ত্বের

জন্য ঈর্ষান্বিত। ধর্মপ্রচারক ও মানুষের আদর্শ-রূপে তিনি অতুলনীয়।' এই পত্রে তিনি আরও লেখেন: তাঁহার এনিস্কোয়ামস্থিত গ্রীষ্মাবাসে স্বামীজী অতি ভদ্র, শিষ্ট ও বিনীত একজন মনোরঞ্জনকারী অতিথি এবং সর্বদাই বাঞ্ছনীয়। স্বামীজী কাহাকেও শত্রু করেন না, মানুষকে উচ্চ স্তরে লইয়া যান। আশ্চর্যের বিষয়, এমন মহামানবেরও শত্রু হয় কি করিয়া!

আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া স্বামীজী এনিস্কোয়ামে মিসেস ব্যাগলির গৃহে তিন সপ্তাহ কাটাইয়া আসেন। ১৮৯৫ খৃঃ ২০শে মার্চ লিখিত এক পত্রে জানা যায় যে, স্বামীজী ব্যাগলি-পরিবারে ছয় সপ্তাহ বাস করেন এবং স্বামীজীর উপস্থিতি ও সান্নিধ্য মিসেস ব্যাগলি ও পরিবারস্থ সকলকে প্রচুর আনন্দ দান করে। মিসেস ব্যাগলি ডেট্রয়েট-সমাজে অসামান্য সংস্কৃতি- ও নীতিজ্ঞানসম্পন্না নারীরূপে পরিচিতা ছিলেন।

ডক্টর উইলিয়াম জেমস

ডক্টর উইলিয়াম জেমস যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর নিকট ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। দার্শনিক পণ্ডিত হিসাবেও তাঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। ১৮৯৫ খৃঃ জুন মাসে স্বামীজীর 'রাজযোগ' সম্বন্ধে বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই অভিনব পুস্তক অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি ইহা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করেন। মনীষী টলস্টয়ও ঐ পুস্তক পাঠে মুগ্ধ হন, বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে তাহা জানা যায়।

মিসেস ওলি বুলের গৃহে যখন স্বামীজী অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ডক্টর জেমস ও স্বামীজীর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। অধ্যাপক জেমস ওলি বুলের বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং একদিন নৈশ ভোজে নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। ভোজ-সমাপ্তির পর উভয়ের মধ্যে নানা আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। অধ্যাপক এতই মুগ্ধ হন যে, স্থান-কাল ভুলিয়া মধ্যরাত্রি পর্যন্ত স্বামীজীর সহিত আলোচনায় নিমগ্ন থাকেন। এই আলাপের পর হইতেই অধ্যাপক স্বামীজীর ভাবে প্রভাবিত হন এবং উভয়ের মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গতা জন্মে। স্বামীজীর সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর অধ্যাপক তাঁহার 'Varieties of Religious Experiences' নামক গ্রন্থ লিখেন। অধ্যাপক এই সময় হইতেই স্বামীজীকে 'আচার্য' (Master) বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি তাঁহার লিখিত পুস্তকে স্বামীজীকে 'বৈদান্তিকদের আদর্শ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম সাক্ষাতের কিছু-দিন পরে অধ্যাপক তাঁহার গৃহে স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়া যে পত্র পাঠান, তাহাতে তিনি স্বামীজীকে 'Master' (আচার্য) সম্বোধন করেন। 'The Energies of Man' নামক রচনায় অধ্যাপক লিখেন যে, রাজযোগ অভ্যাসের ফলে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানসিক অশান্তি হইতে মুক্তি পান। ঐ প্রবন্ধে অধ্যাপক আরও লিখেন যে, শারীরিক উপকারের সঙ্গে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক আলোক প্রাপ্ত হইয়াও তিনি ধন্য হইয়াছেন। রচনাটি পড়িয়া এই ধারণাই হয় যে, অধ্যাপক এই সকল কথা নিজের সম্বন্ধেই লিখিয়াছেন।

বিপিনচন্দ্র পাল*

উনবিংশ শতকের শেষ ভাগে ও বিংশ-শতাব্দীর প্রথমপাদে বিপিনচন্দ্র পাল ভারতের রাজনৈতিক গগনে এক সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক

* যদিও এই প্রবন্ধে স্বামীজীর সহিত শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালের সাক্ষাৎকারের কোন প্রসঙ্গ নাই, তথাপি স্বামীজীর ভাবসন্নিধানের একটি সুন্দর চিত্র থাকায় ইহা এখানে সন্নিবেশিত হইল। —সম্পাদক

ছিলেন। স্বামীজী ইংলণ্ডে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে ১৮৯৮ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুআরি তিনি লণ্ডন হইতে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় লিখিয়া পাঠান: ভারতের কিছু লোক মনে করে যে, স্বামীজী ইংলণ্ডে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা খুব সামান্যই ফল প্রসব করিয়াছে, তাঁহার বন্ধু ও অনুরাগিগণ তাঁহার কাজ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত সংবাদ দেয়। কিন্তু ইংলণ্ডে আসিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, তিনি এদেশের সর্বত্র বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। আমি ইংলণ্ডের নানা স্থানে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দকে গভীর শ্রদ্ধা ও বিশেষ মান্য করেন। যদিও আমি তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত নই এবং আমার মতের সঙ্গে তাঁহার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই, তথাপি আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, তিনি এদেশে বহু লোকের চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে উদারতা আনিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষায় এখানে বহু লোকেই বিশ্বাস করেন যে, প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রসমূহে অতি আশ্চর্য উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্য আত্মগোপন করিয়া আছে। এই ধারণা সৃষ্টি করাই শুধু স্বামীজীর একমাত্র কৃতিত্ব নয়, তিনি এদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি উত্তম সম্পর্ক গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিবেকানন্দের মতবাদ প্রসার লাভ করায় বহুশত লোক খৃষ্টধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। এই দেশে তাঁহার কাজ কত দৃঢ় ও বিস্তীর্ণ হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে তাহা সহজেই অনুমেয়—

গত কল্য সন্ধ্যায় লণ্ডনের দক্ষিণাঞ্চলে আমি এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলাম। পথভ্রষ্ট হইয়া একটি রাস্তার কোণ হইতে চারিদিকে চাহিয়া চিন্তা করিতেছিলাম, কোন্ দিকে যাওয়া উচিত। মনে হয়, তখন আমাকে পথ দেখাইবার উদ্দেশ্যেই একটি ভদ্রমহিলা একটি বালক-সহ আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! মনে হয়, আপনি পথ খুঁজিতেছেন। আমি কি আপনাকে সাহায্য করিতে পারি? পথ-প্রদর্শনের পর তিনি আমাকে বলিলেন, কয়েকটি পত্রিকা হইতে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি লণ্ডনে আসিতেছেন। আপনার প্রথম দর্শন লাভ করিয়াই আমি আমার ছেলেকে বলিলাম, ঐ দেখ, বিবেকানন্দ।'

আমাকে তাড়াতাড়ি গাড়ি ধরিতে হইবে, সুতরাং আমি বিবেকানন্দ নই, ইহা মহিলাকে বুঝাইবার আমার সময় ছিল না, আমি দ্রুত চলিয়া যাইতে বাধ্য হই। যাহা হউক, আমি সত্যই আশ্চর্য হই এই ভাবিয়া যে, ভদ্রমহিলা বিবেকানন্দের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হইয়াও তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করেন! এই চিত্তাকর্ষক ঘটনায় আমি অত্যন্ত পরিতৃপ্তি লাভ করি। আমার মস্তকোপরি গেরুয়া রং-এর পাগড়িকে আমি ধন্যবাদ দিলাম, কারণ উহাই আমার এই সম্মান-লাভের হেতু। এই ঘটনা বাদ দিলেও আমি বহু শিক্ষিত ইংরেজ ভদ্রলোক দেখিয়াছি, যাঁহারা ভারতকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের যে-কোন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সত্য সাগ্রহে শ্রবণ করেন।

অচ্যুতানন্দ সরস্বতী

অচ্যুতানন্দ সরস্বতীর অন্য নাম গুণনিধি ভট্টাচার্য। স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনের প্রথম দিকে গুণনিধি তাঁহার সঙ্গে পরিব্রাজকরূপে বাহির হন। ১৮৮৯ খৃঃ ২৪শে ডিসেম্বর বলরাম বসুকে লিখিত পত্রে জানা

যায়, দেওঘরে অচ্যুতানন্দের সঙ্গে স্বামীজীর দেখা হয় এবং পরেও আর একবার দেখা হয়। ১৮৮৯ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর কাশীর প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত পত্রে জানা যায়, গুণনিধি বাঁকিপুর পর্যন্ত স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন এবং ঐ স্থানে দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়।

অচ্যুতানন্দ যদিও দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন, তথাপি স্বামীজী তাহার পত্রে তাঁহাকে গুরুভাই-রূপে প্রমদাদাসবাবুর নিকট পরিচয় দেন। তাহার কারণ হয়তো স্বামীজীর মনের উদারতা।

১৮৯৪ খৃঃ স্বামীজী স্বামী অখণ্ডানন্দকে এক পত্রে লিখেন, 'গুণনিধি বোধ হয় পঞ্জাবে আছে, তাহাকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাইয়া খেতড়িতে আনিবে এবং তাহার সাহায্যে সংস্কৃত শিখিবে ও তাহাকে ইংরেজী শিখাইবে। যে প্রকারে পারো, তাহার ঠিকানা আমাকে দিবে। গুণনিধি, অচ্যুতানন্দ সরস্বতী'।

এই বৎসরেই স্বামীজী স্বামী অভেদানন্দকে পত্রে লিখেন, 'বলি, গুণনিধি কোথায় আছে, খোঁজ ক'রে মঠে (বরানগর) যত্ন ক'রে আনবার চেষ্টা করবে। সে লোকটা অতি sincere (অকপট) ও বড়ই পণ্ডিত।'

১৮৯৫ খৃঃ মঠে গুরুভাইদের নিকট এক পত্রে স্বামীজী লিখেন, 'গুণনিধি কোথায়? তাকে তোমরা তোমাদের সঙ্গে রাখিবে।' ১৮৯৫ খৃঃ ১৩ই নভেম্বর স্বামী অখণ্ডানন্দকে আর এক পত্রে লিখেন, 'লাহোর আর্যসমাজের সেক্রেটারিকে লিখবে যে, অচ্যুতানন্দ ব'লে যে একজন সন্ন্যাসী তাঁদের কাছে থাকেন, তিনি এক্ষণে কোথায়? সে লোকটির বিশেষ সন্ধান করিবে।' ১৮৯৫ খৃঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দকেও পত্রে গুণনিধির কথা লিখেন।

উপরি-উক্ত ঘটনাসমূহ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, স্বামীজী অচ্যুতকে অশেষগুণসম্পন্ন মনে করিতেন এবং তাঁহার দ্বারা বহু কাজের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন।

দেশে ফিরিয়া স্বামীজী যখন উত্তর ভারতে লাহোরে বক্তৃতা দেন এবং কাশ্মীর-ভ্রমণে বহির্গত হন, সেই সময় 'অচ্যুত' তাঁহার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন। অচ্যুতানন্দ স্বামীজীর সহিত কাশ্মীর-ভ্রমণের ঘটনাগুলি দিনপঞ্জীতে লিখিয়া রাখিতেন, তাহা হইতেই ঐ সময়ের অনেক তথ্য জানা সম্ভব হইয়াছে। স্বামীজী ১৮৯৭ খৃঃ ২৫শে অক্টোবর জম্মুতে আর্যসমাজ সম্বন্ধে কিছু বলেন। এই সময় বন্ধুভাবে তিনি অচ্যুতকে আর্যসমাজের দোষ-ত্রুটিগুলি দেখাইয়া দেন। স্বামীজী পঞ্জাবীদিগকে ভক্তি চর্চা করিতে উপদেশ দেন, কারণ তাঁহার মতে—পঞ্চনদের দেশে হৃদয় বড় শুষ্ক।

১৮৯৭ খৃঃ ১লা জুন স্বামীজী আলমোড়া হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দকে সংস্কৃতে এক পত্র লিখেন ; তাহাতে জানা যায়, অচ্যুতানন্দ প্রত্যহ সন্ধ্যায় আলমোড়ায় লোকদের নিকটে গীতা ও শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া শুনান। উহা শুনিতে শহরের বহু অধিবাসী এমনকি ছাউনির সৈন্যেরাও অনেকে উপস্থিত হয়। সকলেই তাঁহার পাঠ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইত।

স্বামী সুরেশ্বরানন্দ

স্বামী সুরেশ্বরানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু। সুরেন্দ্রনাথ স্বামীজীর ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া তদানীন্তন অন্যান্য বহু যুবকের ন্যায় 'ত্যাগ ও বৈরাগ্য' জীবনের ব্রত স্থির করিয়া চাকুরি ত্যাগ করিয়া মঠে যোগ দেন। স্বামীজী তাঁহাকে ১৮৯৭ খৃঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় মহুলা গ্রামে দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্যে রত স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দেন। সুরেন্দ্রনাথ

সেখানে স্বামী অখণ্ডানন্দের সহকারী-রূপে সেবাকার্য করিতে থাকেন।

সদ্য চাকরি-জীবনে ইস্তফা দিয়া সন্ন্যাস-জীবনের সহিত পূর্ণ পরিচয় লাভ করার পূর্বেই সুরেন্দ্রনাথকে ঐরূপ গুরুদায়িত্বপূর্ণ ও কঠোর পরিশ্রমের কাজে অবতীর্ণ হইতে হয়; ইহাতে স্বামী অখণ্ডানন্দের চিন্তা ও উদ্বেগের অবধি ছিল না। যাহা হউক, দুর্ভিক্ষের সেবাকার্যে বহু দিন কাজ করার পরে বেলুড় মঠে প্রেরিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ স্বামীজীর সান্নিধ্য লাভ করেন। এই সময় ১৮৯৮ খৃঃ ২৯শে মার্চ স্বামী স্বরূপানন্দের সহিত তাঁহাকেও স্বামীজী সন্ন্যাস-দানে কৃতার্থ করেন এবং নাম হয় 'সুরেশ্বরানন্দ'। তিনি দাক্ষিণাত্যে মঠ স্থাপন করিয়া শেষ জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন।

নটরাজ

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিঃশেষে পান করি বিশ্বের যতকিছু হলাহল,
সাথে লয়ে ভূতদল
নাচে নটরাজ তাথৈ তাথৈ আনন্দ-বিহ্বল।

শিরে সুরধুনী পতিতপাবনী ফণিফণা দোলে গলে
ভালমন্দের ছলে,
গরলামৃত একাধারে ধৃত কৌতুক-কুতূহলে।

জরা-জড়তায় পঞ্জর ভেদি বিষম ত্রিশূলাঘাতে
মৃত্যু-নিবিড় রাতে
নব জনমের উন্মেষ করে শুভ্র নূতন প্রাতে।

ভোগের ভস্মে বিভূতিভূষণ ত্যাগের কৃত্তিবাস
মুক্ত সকল পাশ
আপনার মাঝে হারায়ে আপনা রূপে রূপে পরকাশ।

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'

[মহাপ্রভু-জীবনে রূপায়িত]

শ্রীমতী সুধা সেন

(১)

'না—জননীরও বৈষ্ণবাপরাধ আছে, আচার্য অদ্বৈত পরম বৈষ্ণব, জননী তাঁহার কাছে অপরাধী, তিনি আচার্যের চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা না করিলে আমি তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারিব না।'

শ্রীবাসের বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট মহাপ্রভু ভগবৎ-আবেশে, মহাগম্ভীর কঠোর স্বরে এই কথা যখন ভক্ত শ্রীবাসকে বলিলেন, ভয়ে বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলেন ভক্তগণ—এ কি নিদারুণ কথা উচ্চারণ করিতেছেন প্রভু! যিনি বিশ্বম্ভর পুত্রের গর্ভ-ধারিণী, জগজ্জননী—তাঁহার অপরাধ?

প্রিয়তম পুত্রের কণ্ঠ যেন এ নয়—যেন দূরাগত কোন অমোঘ দৈববাণী, বৃদ্ধা জননী কম্পিতা হইতে লাগিলেন. মনে পড়িল তাঁহার 'অপরাধের' কথা!

সুন্দর কিশোর বিশ্বরূপ পুত্র তাঁহার যেদিন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, সেদিন শোকশীর্ণা জননীর বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল! একমাত্র আচার্য অদ্বৈতের সঙ্গ-লালসাই যেন নবদ্বীপে বিশ্বরূপকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, নতুবা কৃষ্ণভক্তহীন ও ভক্তিবিহীন নবদ্বীপে বিশ্বরূপের কোন আকর্ষণই ছিল না। জননী জানিতেন, বৈষ্ণব-শিরোমণি অদ্বৈত আচার্যই সংসারের অসারত্ব বুঝাইয়া ক্রমেই বিশ্বরূপকে অন্তর্মুখী—কৃষ্ণমুখী করিয়া তুলিতেছিলেন; কাজেই যেদিন বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিলেন, সেদিন সন্তপ্তা জননীর বিরহবিধুর হৃদয়ে একটি কথাই বার বার ধ্বনিত হইতেছিল, 'অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিলা বাহির।'—তথাপি বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে জননী সেদিন কিছুই বলিলেন না, অসহ্য ব্যথার ভার নীরবেই মনের মধ্যে বহন করিয়া চলিলেন। তাঁহার সমস্ত দুঃখের কাঁটা ধন্য করিয়া, তাঁহার ব্যথার রঙে রাঙা হইয়া যে অবশিষ্ট মুকুলটি ক্রমেই বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই প্রাণের নিমাই'ও যখন গৃহমুখ পরিহার করিয়া, বালিকা-বধূর প্রতীক্ষা-রজনী ব্যর্থ করিয়া আচার্য-সঙ্গে কৃষ্ণকথায় মত্ত হইয়া রহিলেন, জননী যেদিন প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন—নিমাইকেও আর গৃহে রাখিতে পারিবেন না তিনি, সেদিনই বুঝি, বুকের ধনকে হারাইবার ভয়ে আর্ত ক্রন্দনে জননী বলিয়া উঠিয়াছিলেন: কে তাঁহাকে 'অদ্বৈত' বলে, আমি তো দেখিতেছি তিনি 'দ্বৈত'! সকলের প্রতি তাঁহার অখণ্ড, অভেদ দৃষ্টি, দেবদুর্লভ করুণা, শুধু কি হতভাগিনী আমারই প্রতি তাঁহার দ্বৈত মায়া, তাঁহার ভেদদৃষ্টি, তাঁহার এ নিষ্ঠুর নির্দয়তা!

শুধু এইটুকুই জননীর অপরাধ! একদিন মনের অসহ্য যন্ত্রণায় শুধু এই কথাটিই বুঝি জননী কাহার কাছে উচ্চারণ করিয়াছিলেন—তাই বিশ্বম্ভর পুত্র তাঁহার আজ এই দণ্ড বিধান করিতেছেন! ভক্তগণ 'হায়, হায়!' করিয়া উঠিলেন, 'একি কথা বলিতেছেন প্রভু।'

কিন্তু যিনি প্রভু, তিনি সকলেরই প্রভু—তিনি নিরপেক্ষ দ্রষ্টা, সাক্ষিস্বরূপ, কেবা তাঁহার জননী, কেবা আপন, কেই বা পর! তাঁহার প্রতি কৃত অপরাধের ক্ষমা তিনি করিতে পারেন—ভগবান্‌ও তাহা পারেন, কিন্তু ভক্তের প্রতি, বৈষ্ণবের প্রতি কৃত অপরাধের ক্ষমা তাঁহার

কাছেও নাই, ভগবানের কাছেও নাই। তিনি তো শুধু নবদ্বীপের নিমাই-পণ্ডিত তথা শচী-পুত্রই নহেন, তিনিই তো পরম তত্ত্ব, স্বয়ং ভগবান্!

পুত্র কৃষ্ণপ্রেমধন অর্জন করিয়াছেন, দুই হাত ভরিয়া বিলাইতেছেন জনে জনে! 'প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়', অথচ পতিহীনা শচীমাতার ভাগ্যে কি সেই ধন জুটিবে না? অনাথিনী জননীর একমাত্র অবলম্বন পুত্র নিমাই কি জননীকে বঞ্চিত করিবেন?

নিমাই হয়তো বা জননীকে অর্জিত ধন হইতে বঞ্চিত করিতেন না, কিন্তু নিষ্ঠুর কঠোর বিশ্বম্ভর জননীকে বলিলেন—'আগে বৈষ্ণবাপরাধের খণ্ডন হোক, নতুবা জননীর ভাগ্যে প্রেমধন লাভ হইবে না!'

ভক্তগণ আচার্যের কাছে গিয়া যখন প্রভুর এই কঠোর আদেশের কথা জানাইলেন, ভয়ে বিস্ময়ে আচার্য আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, 'হায় প্রভু! আমার প্রাণ সংহার করিবে তুমি, কিন্তু জননীর এই লাঞ্ছনা করিবে তুমি আমাকে নিমিত্ত করিয়া! সন্ত্রস্ত আচার্য কোথায় নিজেকে লুকাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না!

ভয়কম্পিতা বৃদ্ধা জননী শচীদেবী অশ্রু-সজল নয়নে আসিয়া আচার্যের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন, আচার্য মূর্ছিতপ্রায় হইয়া গেলেন, জননীও! জননীর প্রেমধন লাভ হইল। হর্ষ, কম্প, অশ্রু, রোমাঞ্চে পুলকিতাঙ্গী হইয়া জননী উঠিয়া আসিলেন কৃতার্থা, ধন্যা!

ভক্তগণ বিস্ময়বিমূঢ় নয়নে একবার দেখিতেছেন জননীর দিকে, একবার ভগবদ্-ভাবাবিষ্ট প্রভুর দিকে! বৈষ্ণবাপরাধ কি এতই কঠিন, এতই কঠোর, যাহা বিশ্বজননীকেও ক্ষমা করে না? ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন ভক্তগণ, স্বপ্নেও যেন বৈষ্ণবাপরাধ কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত না হয়, সে-বিষয়ে সকলেই সচেতন হইয়া গেলেন।

প্রভু ত্রিকালদর্শী, মাতাকে উপলক্ষ্য করিয়া সকলকেই শিক্ষা দিলেন—এমনকি স্বয়ং আচার্যকেও যেন সতর্ক করিয়া দিলেন ভবিষ্যতের জন্য।

নতুবা প্রভু কি জানেন না জননীর তত্ত্ব? 'তুমি পৃশ্নি, তুমি অদিতি, তুমি দৈবকী, তুমি বিশ্বজননী' বলিয়া স্তুতি করিতে করিতে প্রভু কতদিন জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন! সন্ন্যাসের পরেও শান্তিপুরে আচার্য-গৃহে জননীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া যেন সন্ন্যাস-গ্রহণের অপরাধে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন বার বার! জননীর বক্ষে অশ্রুসিক্ত মুখখানি রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন শিশুর মতো, 'মাগো! আমি তোমার অধমপুত্র, আমার মতি স্থির নাই—তাই তোমাকে ব্যথা দিয়া আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি। কি করি মাগো, কৃষ্ণ ছাড়া আমি আর যে থাকিতে পারি না! কৃষ্ণ-বিরহে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যায়, যাক তবুও তোমার দুঃখ দূর হোক। তুমি বলো, আমি কি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিব গৃহে, তোমার বক্ষে?'

যেমন পুত্র, তেমনই জননী! বিশ্বম্ভর পুত্র গর্ভে ধারণ করিয়াছেন যিনি, তিনি তো সর্বং-সহা! পুত্র-বিরহের অসহ্য যন্ত্রণায় বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাক, তবুও পুত্রের জীবন-ব্রত অক্ষুণ্ণ থাকুক, অটুট থাকুক তাহার সন্ন্যাস! রুদ্ধকণ্ঠে জননী বলিলেন—'না বাপ! তুমি সুখী হও, তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ! আমাকে সুখী করিতে, নবদ্বীপের ভক্তদের আনন্দ দিতে তুমি ব্রত ভঙ্গ করিবে, তাহা তো আমি চাহি না প্রাণধন! ঘরে থাকুক জলন্ত অগ্নি বিষ্ণুপ্রিয়া, তাহাকে আমিই আমার এই পাষাণ-বক্ষের তলে আবৃত করিয়া রাখিব, তোমার ভক্তগণ

দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমাকেই স্মরণ করিয়া চোখের জলে ভাসিবেন, তবুও তোমার সন্ন্যাস ভঙ্গ আমি করিব না! আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইবে না নিমাই! তুমি নীলাচলে সুখে থাকো!'

নীলাচলের পথেই যাত্রা করিলেন প্রভু! দূরে মিলাইয়া গেল শান্তিপুর, সুদূরদিগন্তে মিলাইয়া গেল জননীর শুভ্র সীমন্ত-রেখা!

আজ সেই জননীকেই দণ্ডদান করিলেন প্রভু সর্বজন-সমক্ষে! উপলক্ষ্য জননী, লক্ষ্য ভক্তগণ, এমনকি আচার্য স্বয়ং!

যে আচার্যের চরণে প্রভু জননীকে দিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করাইলেন, যাহাকে প্রভু মহাবিষ্ণুর অংশ বলেন, যাঁহার আহ্বানে তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়া আসিতে হইল এই ধূলার ধরণীতে, তাঁহাকেও সাক্ষী করিলেন প্রভু জননীর উপলক্ষ্যে।

শ্রীপাদ অদ্বৈত আচার্য মহাবিষ্ণুর অংশ—কিন্তু পরম বৈষ্ণব—ভক্তাবতার-রূপেই তিনি অবতীর্ণ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ প্রভুর প্রতি তিনি দাস্যাভিমানই করেন। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ প্রভু জানেন, এমন দিন আসিবে যেদিন আচার্যের কোন কোন শিষ্য আচার্যকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিবেন এবং ইহার পরিণাম শুভ হইবে না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ—উচ্চ অধিকারী—তাঁহাতে ভগবত্তা আরোপিত হইলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না—কিন্তু এই দৃষ্টান্ত সাধন জগতের নিম্ন অধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, ইহাতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই সর্বনাশঃ

'বড় অধিকারী হয় আপনে এড়ায়,
ক্ষুদ্র হৈলে গণ সহ অধঃপাতে যায়।'

চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড, ২২ অধ্যায়

প্রভু জননীকে দণ্ড দান করিলেন বৈষ্ণবাপরাধে। জননীর অপরাধ পরমবৈষ্ণব ভক্তাবতার শ্রীপাদ অদ্বৈত আচার্যের কাছে, স্বয়ং ভগবানের কাছে নয়। ভগবদ্-অপরাধের খণ্ডন আছে, বৈষ্ণবাপরাধের খণ্ডন নাই। আচার্য স্বয়ং কৃষ্ণ নহেন—অংশ, ভক্ত, বৈষ্ণব; কাজেই তাঁহার কাছে জননীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল এবং প্রভুই তাহা করাইলেন দূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া!

(২)

'ভগবানের ভক্ত, দাস'—ইহাই ভক্তের অভিমান এবং ইহাই তাঁহার গৌরব।

প্রভুর ত্রিকালপ্রসারী স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বহু-পূর্বেই যাহা ধরা পড়িয়াছিল, তাহারই একটি প্রকাশ ঘটিল অনতিবিলম্বে।

আচার্যের কর্মচারী কমলাকান্ত বিশ্বাস উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে আচার্যের ঋণশোধ মানসে কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়া এক আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্রে আচার্যের মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্থাপনের যথেষ্টই প্রয়াস ছিল।

প্রভু তখন নীলাচলে, কেমন করিয়া তাঁহার কাছেও এই পত্রের খবর পৌছিল। প্রভু দুঃখিত হইলেন, তথাপি হাসিয়াই পার্শ্বচরগণকে বলিলেন—'কমলাকান্ত অদ্বৈত আচার্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তিনি করুন, আচার্য 'দৈবত ঈশ্বর', কিন্তু ঈশ্বরের আবার দৈন্য কি এবং তাঁহার জন্য আবার অর্থ-প্রার্থনাই বা কেন?'

গম্ভীর কণ্ঠে প্রভু বলিলেন—'গোবিন্দ! কমলাকান্তকে আমার কাছে আর আসিতে দিবে না। ঈশ্বর পরম ঐশ্বর্যময়, তাঁহার দৈন্য থাকা যে সম্ভব নয়, কমলাকান্তের এই শিক্ষা এখনও বাকী?

বস্তুতঃ আচার্য এই পত্রের কথা জানিতেন না। কমলাকান্তের এই প্রগল্‌ভতায় তিনি লজ্জিত হইলেন এবং কমলাকান্তের দণ্ড

তাঁহাকেই বাজিল। দুঃখিত ভীত কমলাকান্তকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দান করিয়া আচার্য লজ্জানত মুখে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, 'প্রভু, আমি কি অপরাধ করিয়াছি, তুমি আমাকে কেন স্বহস্তে দণ্ডপ্রসাদ দান করিলে না!' আচার্যের কাকুতিতে প্রভুর মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল—নিরীহ সরল কমলাকান্তকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, 'কমলাকান্ত, আচার্যকে ঈশ্বর বলিয়া আবার তাঁহার জন্য রাজার কাছে অর্থ কেন প্রার্থনা করিলে? তুমি কি বুঝিতে পারনা—ইহাতে আচার্যের কতখানি লজ্জা। তাঁহার ধর্মের হানি করিয়া তুমি তাঁহাকে বিষয়ীর অন্ন তথা অর্থ প্রতিগ্রহ করাইতে চাও? ভক্ত কখনও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করেন না, করিলে মন দুষ্ট হয় এবং দুষ্ট মনে কিছুতেই কৃষ্ণস্মৃতি হয় না, কৃষ্ণস্মৃতি-বিহীন জীবনে ভক্তের কি কাজ?'

কমলাকান্তকে উপলক্ষ্য করিয়া এইবার আর এক শিক্ষা ভক্তগণকে প্রভু দিলেন। কৃষ্ণভজন তথা ঈশ্বর-প্রাপ্তির আশা করিলে বিষয় বা বিষয়ীর সংস্পর্শ যে ত্যাগ করিতে হইবে—ইহাই প্রভুর শিক্ষা!

(৩)

আচার্য মহাবিষ্ণুর অংশ—মহাশক্তিধর-প্রভুও তাঁহাকে মান্য করেন। নবদ্বীপে বহুদিন আচার্যের মন তাহাতে প্রসন্ন হয় নাই। যিনি গোলোকপতি—বিশ্বপতি, তিনি কেন আমার চরণ ধারণ করেন—কেন তিনি আমাকে মান্য করেন, পূজ্যের আসনে আমাকে বসান? আচার্য প্রভুর দেওয়া এই সম্মানের আড়াল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন—'তিনি প্রভু, আমি দাস—ইহাই তো আমার সাধনা—ইহাই আমার গৌরব।' আচার্য নিজেকে গৌরবের উচ্চাসন হইতে নিম্নে ভূমিতলে দাসের আসনে নামাইয়া আনিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বারবার, কত প্রকার পরীক্ষার পর আচার্য এতদিনে জানিয়াছেন জগন্নাথ-শচীর পুত্র এই নিমাই-ই তাঁহার আরাধ্য—তাঁহার সাধনের ধন শ্রীকৃষ্ণ, কাজেই আর তিনি বিড়ম্বিত হইবেন না—এইবার 'কপট' প্রভুকেই আসিতে হইবে তাঁহার কাছে আপন ষড়ৈশ্বর্যের মহিমায় পূর্ণ হইয়া।

আচার্য এইবার আর এক কঠিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মহাজ্ঞানী আচার্য শান্তিপুরে স্বগৃহে বসিয়া শিষ্যভক্তগণের নিকটে অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। শুষ্কজ্ঞান তথা মায়াবাদী ভাষ্যের উপরেই ব্যাখ্যা ও অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। যিনি পরম ভক্ত, তিনি ভক্তিকে একেবারেই বর্জন করিলেন।

একদিন এইরূপ ভক্তিহীন ব্যাখ্যাই চলিতেছে, সহসা নবদ্বীপ হইতে কখন আসিয়া শান্তিপুরে আবির্ভূত হইলেন প্রভু—জ্বলন্ত অনলের ন্যায় রুদ্রতেজে; বৃদ্ধ পরম মান্য আচার্যকে কেশাকর্ষণ করিয়া অধ্যাপকের মহিমান্বিত আসন হইতে নীচে টানিয়া নামাইয়া প্রহার করিতে লাগিলেন, গর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বৈকুণ্ঠ হইতে তুই আমাকে কেন এই পৃথিবীতে আনিলি। ভক্তিহীন এই সংসারে ভক্তি বিলাইবার জন্যই না তুই আমাকে আনিয়াছিলি, এখন কেন তোর এই দুর্ব্যবহার?'

অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী প্রভুর এই অভাবনীয় আচরণে প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অবশেষে বৃদ্ধ স্বামীর নির্যাতন আর সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া আসিলেন প্রভুর কাছে—'একি করিতেছ নিমাই। রাখো রাখো, বৃদ্ধকে প্রাণে মারিও না বাপ।'

বৃদ্ধ আচার্য ভূলুণ্ঠিত হইতেছেন—আঘাত পড়িতেছে অঙ্গে—কিন্তু হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিতেছে সাফল্যের আনন্দে! 'আমি আনিয়াছি—আনিয়াছি, গোলোকবিহারীকে আজ নামিয়া আসিতে হইয়াছে এই ধূলার ধরণীতে—আজ আমারও বাসনা পূর্ণ হইয়াছে—এ তো আমার নিগ্রহ নয়—এ যে পরম অনুগ্রহ আমার প্রতি প্রসন্ন বিধাতার পরম প্রসাদ!'

প্রভুর দুই চরণতলে মাথা লুটাইয়া দিলেন আচার্য, দুই নয়নের ধারায় সিক্ত হইল প্রভুর চরণতল—বলিলেন, 'ওগো কপট! ওগো চোর! আজ কোথায় গেল তোমার ছদ্মবেশ, কোথায় গেল অভিনয়? আর নিজেকে লুকাইতে পারিবে না, এইবার ধরা পড়িয়াছ, আর সম্মান দিয়া দূরে ঠেলিতে পারিবে না আমাকে!'

শান্ত-স্তিমিত হইয়া আসিল প্রভুর ক্রোধবহ্নি, দুই আরক্ত নয়নে আসিল করুণা, প্রেম! সহসা যেন মূর্ছাহত চৈতন্য জাগিয়া উঠিল—সকরুণ কণ্ঠে আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচার্য! আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি?'

আচার্য মধুর হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'না, তেমন বেশী কিছু নয়—সামান্যই করিয়াছ।'

করুণাঘন মহাপ্রভু—প্রেমের অবতার; তীর নয়, তূণ নয়, নির্দয় সুতীক্ষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্র—এইবার অস্ত্র হরিনাম, শস্ত্র অশ্রুজল! 'আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়—' কান্না শুধুই কান্না—'হা কৃষ্ণ! প্রাণকৃষ্ণ!' বলিয়া কেবলই অঝোর ঝরা কান্না!

কিন্তু সত্যই কি কেবল কান্না—সেই কান্নার ফাঁকে—বর্ষণমুখর আকাশে কি কখনও দেখা যায় নাই প্রখর উজ্জ্বল সূর্যকিরণ-লেখা?

প্রভু নিজে কাঁদিয়াই সৃষ্টি করিলেন নির্বীর্য, ভীরু, অসহায় একদল বৈষ্ণব—শুধু কি কাঁদিবার জন্যই?

শুধু কুসুমের কোমল স্পর্শ দিয়াই কি তিনি ভক্তগণকে স্নিগ্ধ, দ্রবীভূত করিয়া গেলেন—বজ্রদহনে কি ভক্তের সকল কালো, সকল মলিনতাকে দহন করিয়া যান নাই?

নবদ্বীপের জগাই মাধাই একদিন দেখিয়াছিলেন সেই বজ্রাগ্নি—সেই উদ্যত মহাভয়:

'ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥'

কঠ উপ. ২।৩।৩

—অগ্নি ইঁহার ভয়ে তাপ দেন, সূর্যও ইঁহার ভয়ে তাপ দিতেছেন—ইঁহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চম মৃত্যুও ধাবিত হন।

মৃত্যুও যাঁহার ভয়ে ধাবমান—মহাবিশ্ব যাঁহার শাসনে নিয়ন্ত্রিত, যেন সেই মহাকালরূপী প্রভু দণ্ডায়মান জগন্নাথ মাধবের সম্মুখে; আর রক্ষা নাই, ঐ যে আসিতেছে কালরূপী সুদর্শন চক্র! শ্রীপাদ নিত্যানন্দের দেহে রক্ত দেখিয়া অপরিসীম ক্রোধে প্রভু যেন জ্ঞান হারাইলেন:

রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে,
চক্র চক্র চক্র (সুদর্শন চক্র) বলি ডাকে ঘনে ঘনে
আথে ব্যথে চক্র আসি উপনীত হৈল,
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল।

মুহূর্তেই সেই ক্রোধাগ্নি, সেই প্রলয়-বহ্নি ভস্মীভূত করিত জগন্নাথ আর মাধবকে, যদি না পরম দয়াল নিত্যানন্দের কৃপামেঘে তাঁহারা আবৃত হইতেন।

(ক্রমশঃ)

চরণ তোমার

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

চরণ তোমার শীতল-স্নিগ্ধ
করুণার নির্ঝর,
তাপিত প্রাণের শান্তি-সলিল
সংসার মরু 'পর !
চরণ তোমার বিকচ-কমল,
মেলে শতদল করে ঝলমল,
রূপের আলোয় ভ'রে সদা দেয়
সব হৃদি-সরোবর !
চরণ তোমার শীতল-স্নিগ্ধ
করুণার নির্ঝর !

চরণ তোমার দীন-আর্তের
চিরদিন আশ্রয়,
শত বিপত্তি দুঃখের মাঝে
ভঞ্জন করে ভয় !
চরণ তোমার তরণের তরী,
ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সমুদ্র 'পরি,
প্রলয়ের মাঝে বটের পত্র
মহামৃত্যুঞ্জয় !
চরণ তোমার দীন-আর্তের
চিরদিন আশ্রয় !

চরণ তোমার সুধায় সিক্ত
সব-ব্যথা-নিরসন,
আকুল প্রাণের চির সান্ত্বনা
আনন্দ-পরশন !
চরণ তোমার দূর করে নিশা,
আনে উজ্জ্বল মুক্তির দিশা,
জড়তার রূপ শেষ ক'রে দেয়,
দ্যুতি করে বিকিরণ !
চরণ তোমার সুধায় সিক্ত
সব-ব্যথা-নিরসন !

চরণ তোমার অরূপের জ্যোতি
অনুপম সুন্দর !
যোগি-ঋষি-মুনি জ্ঞানী ও ভক্ত
সবার মুগ্ধকর !
চরণ তোমার আঁখির তৃপ্তি,
জীবন-ঊষার পুণ্য-দীপ্তি,
চরণ তোমার কল্প-বৃক্ষ
জীবনের নির্ভর !
চরণ তোনার অরূপের জ্যোতি
অনুপম সুন্দর !

চরণ তোমার চির-চাওয়া-ধন
সাধনার গৌরব,
প্রেমিক প্রাণের প্রেমের আকর,
ভক্তির অর্ণব !
চরণ তোমার এ ভুবনে সার,
কি আছে কাম্য ইহা ছাড়া আর,
জীবনে মরণে পরম কাম্য
জীবনের বৈভব !
চরণ তোমার চির-চাওয়া ধন
সাধনার গৌরব !

চরণ তোমার চাহিতে জানি না
আমি মূঢ় অভাজন,
তবু ও-চরণে দাও গো শরণ,
কর কৃপা বরিষণ !
এ ভব-তরণে দূর কর ভয়,
রাতুল-আভায় রাঙাও হৃদয়,
দূরে দূরে আর রাখিও না মোরে,
দাও তব পরশন !
চরণ তোমার চাহিতে জানি না
আমি মূঢ় অভাজন !

ঊনবিংশ শতাব্দী ঃ বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায়

১

প্রাক্-ইংরেজী যুগে বাঙলা দেশ ছিল বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক ও পরিবর্তনবিমুখ কতকগুলি গ্রাম নিয়ে তৈরি। এই কূপমণ্ডূকতায় বাঙালী জাতির আত্মবিকাশ ব্যাহত না হয়ে পারেনি। অনৈক্যবোধ থেকে একটা নিরুদ্যম ভাব বেরিয়ে এসে আমাদের অস্থিমজ্জায় ছড়িয়ে পড়ে ও মনুষ্যত্বের হানি ঘটায়। সেই ভাব সমগ্র জাতির মধ্যে গতি-সঞ্চারে বাধা দিয়েছে, তার প্রাণের বিস্তারকে ব্যাহত করেছে, নষ্ট ক'রে দিয়েছে জীবনের সৃষ্টিধর্মিতাকে। বাঙালীর এমনিতর নিঃসাড় অবস্থায় ইংরেজ-শাসন শুরু হয়। এটা একটা বড় রকমের ঘটনা; কারণ জাতির জীবনে এর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। এর যেমন ভালোর দিক আছে, তেমনি আছে মন্দের দিক। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'অবশেষে আমাদের সৌভাগ্যবশতই হউক বা দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, ইংরেজ ভারত জয় করিল। অবশ্য পরদেশ-বিজয় মাত্রেই মন্দ, বৈদেশিক শাসন নিশ্চয়ই অশুভ। তবে অশুভের মধ্য দিয়াও কখন কখন শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইংরেজের ভারত-বিজয়ে এই বিশেষ শুভ ফল হইয়াছে: ইংলণ্ড ও সমগ্র ইওরোপ সভ্যতার জন্য গ্রীসের নিকট ঋণী; ইওরোপের সব কিছুর মধ্যে গ্রীসই যেন কথা বলিতেছে; উহার প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক আসবাবটিতে পর্যন্ত যেন গ্রীসের ছাপ; ইওরোপের বিজ্ঞান, শিল্প—সর্বত্র গ্রীসের ছায়া। আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন হিন্দু একত্র মিলিত হইয়াছে। এই মিলনের ফলে ধীরে ও নিঃশব্দে একটা পরিবর্তন আসিতেছে, আমরা চতুর্দিকে যে উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন দেখিতেছি, তাহা এই-সব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের ফল। মানব-জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রশস্ততর হইতেছে।'[১] সুতরাং ভারতে বৈদেশিক শাসনের কুফল সম্পর্কে বিবেকানন্দ যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি ইংরেজের মাধ্যমে য়ুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আমাদের 'উদার জীবনপ্রদ পুনরুত্থানের আন্দোলন' অর্থাৎ রেনেসাঁস সম্পর্কে সপ্রশংস ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ-শাসনের গোড়াপত্তন হলেও ভারতীয় সমাজে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা দেয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। সেই প্রভাব ও পরিবর্তন এসেছে নতুন আর্থিক বিলি-ব্যবস্থা ও ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে। ইংরেজরা নিজেদের শাসনযন্ত্র কায়েমী করার প্রয়োজনে যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পরিবর্তন সাধন করে, তা-ই আমাদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত জীবনে নতুন আদর্শের সন্ধান দেয়। ইংরেজের শাসন ও শোষণের ফাঁকে ফাঁকে, সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভেতরে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন আসে। সেই আলোড়ন সবচেয়ে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র—'ইয়ং বেঙ্গলে'র চিন্তা, আচরণ ও কর্মে। এদের রেভেলিউশনপন্থী বলা যেতে পারে, যা কিছু

১. 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য'—পৃঃ ১৬৫, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড।

বিদেশী ও য়ুরোপীয় তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করাই এদের লক্ষ্য ছিল। বিজাতীয় আদর্শের এই নির্বিচার পূজা বিবেকানন্দ সমর্থন করতে পারেন-নি। তিনি বলেছেন—'পাশ্চাত্যবিদ্যার মদিরা-পানে মত্ত হইয়া আজকাল কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছে, তাহারা সব জানে; তাহারা প্রাচীন ঋষিগণের কথায় উপহাস করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট হিন্দুজাতির সমুদয় চিন্তা কেবল কতকগুলি আবর্জনার স্তূপ, হিন্দুদর্শন কেবল শিশুর আধ আধ কথা এবং হিন্দুধর্ম নির্বোধের কুসংস্কারমাত্র।'[২] এখানে যে আজকালকার[৩] কতকগুলি ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, তারা ইয়ংবেঙ্গলেরই উত্তরপুরুষ। সুতরাং এ-সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে, বিবেকানন্দ উনিশ শতকের রেনেসাঁস সম্পর্কে মূলতঃ বিশ্বাসী হলেও ঐ শতাব্দীতে আবির্ভূত তথাকথিত বিপ্লবপন্থী ইয়ং বেঙ্গলকে সমর্থন করতে পারেননি। তার কারণ এই যে, এরা 'জাতীয় জীবন-প্রবাহের বিরুদ্ধে' 'ঘোর জড়বাদকে' প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং বিবেকানন্দের মতে তার পরিণাম ছিল 'বিনাশ'।

কিছুসংখ্যক ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে পশ্চিমের প্রায় সব কিছুকে নির্বিচারে গ্রহণ করার প্রবণতা শুধু ভাব ও চিন্তার রাজ্যে ওলট-পালট ঘটিয়ে ক্ষান্ত থাকেনি, তা আমাদের সামাজিক আদর্শ ও ধর্মকে অস্বীকার করবার দিকেও ঝুঁকে পড়েছিল। ফলে কেউ কেউ গ্রহণ করেন। তখন সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্য এবং যুক্তি, যুগধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের ভিত্তিতে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে পুনর্গঠিত করার জন্য একের প্রতিভা বা বহুর অধ্যবসায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এমনি সময়ে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে। খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ ও হিন্দুর ধর্ম-দর্শনের ওপর কাণ্ডজ্ঞানহীন আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি উপনিষদ্-ভিত্তিক ব্রহ্মবাদ প্রচার করেন। রামমোহনের এই ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেছেন—'রামমোহন রায় সেই ভগ্নমন্দির[৪] ভাঙিলেন। সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত করিলেন।···কী সংকটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দু সমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎ-বেগে অগ্রসর হইতেছিল---রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খ্রীষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল।'[৫] তাঁর পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিগণ ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র ক'রে যে সামাজিক ও ধর্মগত আদর্শ প্রচার করতে থাকেন, তাকে রিফর্মেশানের ধারা নামে অভিহিত করা যায়। বিবেকানন্দ উনিশ শতকের বিচিত্র ও জটিল ভাবাবর্তের অন্তর্গত এই

২. ঐ, পৃঃ ১৭৩

৩. এই উক্তি আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য-সমিতিতে প্রদত্ত 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' নামক বক্তৃতার অন্তর্গত। সুতরাং 'আজকাল' কথাটি প্রত্যক্ষতঃ ইয়ং বেঙ্গলের অনেক পরবর্তী কালের ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

৪. এই ভগ্নমন্দির অর্থে রবীন্দ্রনাথ ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুধর্মকে বুঝিয়েছেন। তিনি অন্যত্র এ-সম্বন্ধে বলেছেন: 'রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীন কালের জীবন্ত হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র।'

৫. এই ধরনের কথা রবীন্দ্রনাথের মুখে অন্যত্রও শুনতে পাওয়া যায়।

রিফর্মেশানপন্থী ব্রাহ্মসমাজীদের কার্যকলাপ ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে রামমোহনের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁকে একজন গঠনকারী সংস্কারক ব'লে মনে করতেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন—'আমাদের আধুনিক সংস্কারকেরা ইওরোপীয় ধ্বংসমূলক সংস্কার চালাতে চেষ্টা করেন—এতে কারও কোন উপকার হয়নি, হবেও না। কেবল একজন মাত্র আধুনিক সংস্কারক গঠনকারী ছিলেন—রাজা রামমোহন রায়। কেশবচন্দ্র সেনের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের কথা তিনি উল্লেখ করলেও তাঁর সম্পর্কেও অনুকূল মনোভাব পোষণ করতেন ব'লে মনে হয় না।[৭] শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে বিবেকানন্দের সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সে কেবল সমাজসংস্কারের ব্যাপারে। সন্ন্যাস ছিল তাঁর কাছে সর্বোচ্চ আদর্শ, ব্রাহ্মসমাজীরা সন্ন্যাসী হওয়া অন্যায় ব'লে মনে করেন ব'লে তাঁর ধারণা ছিল।[৮] এমনি অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ ব্রাহ্মনেতা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান্ হলেও সমগ্রভাবে ব্রাহ্মসমাজ ও তার ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি সমালোচনা করেছেন: ব্রাহ্মসমাজ আপনাদের দেশের 'ক্রিশ্চান সায়েন্স' দলের মতো কিছু সময়ের জন্য কলকাতায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল, তারপর গুটিয়ে গেছে। এতে আমি সুখীও নই, দুঃখিতও নই। তার কাজ সে করেছে, যেমন সমাজ-সংস্কার। তার ধর্মের দান এক কানাকড়িও নয়। সুতরাং এ জিনিস লোপ পেয়ে যাবে। যদি ম— মনে করেন, আমি সেই মৃত্যুর অন্যতম কারণ, তিনি ভুল করেছেন। আমি এখনও ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারকার্যের প্রতি প্রভূত সহানুভূতিপূর্ণ। কিন্তু ঐ 'অসার' ধর্ম প্রাচীন 'বেদান্তের' বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না।[৯]

শতাব্দীর বিচিত্র ও জটিল ভাবাবর্তের আর একটি ধারা হচ্ছে চিরাচরিত হিন্দুধর্ম-কেন্দ্রিক সংরক্ষণশীলতার। সমাজে যখন এক দিকে খৃষ্টান মিশনারীদের আক্রমণ ও ইয়ং বেঙ্গলের বিপ্লব, অন্য দিকে ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারকার্য চলছিল, তখন তার প্রতিক্রিয়া হিন্দুসমাজে প্রবল না হয়ে পারেনি। তাই রামমোহনের 'ব্রহ্মসভা' ও 'আত্মীয় সভা'র সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় রক্ষণশীলদের 'ধর্মসভা'। রাধাকান্ত দেব, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি ছিলেন এই সভার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। 'সমাচার-চন্দ্রিকা' ছিল এঁদের মুখপত্র। খৃষ্টান মিশনারীরা যেদিন আমাদের ধর্মের ক্ষেত্রে ও সামাজিক বৃত্তে আক্রমণ চালাতে শুরু করে, সেদিন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও প্রগতিবাদী ব্রাহ্মসমাজ সেই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে মিলিত হয়। সে-দিনের ব্রাহ্মদের ভারতীয় সত্যসন্ধিৎসা ও সনাতনীদের হিন্দুজাতীয়তাবাদ মিলে মিশে যে ঐক্যের সৃষ্টি করেছিল, তা কখনই সামাজিক প্রয়োজন ছাড়িয়ে উঠে স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারেনি। তাই শতাব্দীর পঞ্চম দশক পেরিয়েই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চিন্তা ও লেখায় হিন্দু মনের পরিচয় দেখতে পাই। বঙ্কিমের পুনর্গঠন প্রয়াস ও সমন্বয়ধর্ম-প্রচার শ্লাঘার বিষয় হলেও

৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৮। আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন: 'আমাদের পতনের অন্যতম কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর জাতির সহিত নিজেদের তুলনা করি নাই; আপনারা সকলেই জানেন, যে-দিন হইতে রাজা রামমোহন রায় এই সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে একটু স্পন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আরম্ভ হইয়াছে।'—বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২১৩-১৪।

৭. 'আমি কখনই মিঃ মজুমদারের নেতার মতাবলম্বী হইনি। যদি মজুমদার তেমন কথা ব'লে থাকেন, তিনি সত্য বলেননি।'—অধ্যাপক রাইট্‌কে লিখিত পত্র, বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪২৭। এখানে 'মিঃ মজুমদারের নেতা' বলতে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নেতা কেশবচন্দ্র সেনকে বোঝানো হয়েছে।

৮. ঐ, পৃঃ ৪২৮

৯. ঐ

তাঁর মানসিক পরিমণ্ডলে হিন্দু-পুনরুজ্জীবন-বাদেরই প্রাধান্য। তার পর ব্রাহ্ম রাজনারায়ণের হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭৩) সেই হিন্দুত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে পরিচালিত করে। এই ভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, উনিশ শতক ধরে বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতি-সাধনায় কোন-না-কোন ভাবে একটা হিন্দুভাব প্রশ্রয় পেয়েছে। আর পূর্বাপর এই হিন্দুমনোভাব বিদ্যমান ছিল বলেই শতাব্দীর শেষ দিকে শশধর তর্কচূড়ামণির দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পেরেছিল। ভূদেব বা বঙ্কিমের হিন্দু-ঐতিহ্যবাদের সঙ্গে নানা বিচারসহ নতুন চিন্তা ও আদর্শের অনুশীলন ছিল, কিন্তু শশধর তর্কচূড়ামণির ধর্মব্যাখ্যায় সেই বিচারমুখী চিন্তা, যুক্তিধর্মী বুদ্ধি ও অনুভূতিবেদ্য মানবতাবাদের কোন ছাপ নেই; তাঁর চোখে হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠান-আকীর্ণ লৌকিক ও পৌত্তলিক রূপটার মূল্য ছিল অনেক। বিবেকানন্দ বুঝতে পেরেছিলেন, এই তথাকথিত হিন্দুত্বের ধ্বজা-ধারীরা একটা আদর্শের ছবি তুলে ধরছেন; তাই তাদের সম্বন্ধে তিনি কঠোর মন্তব্য করেছেন—'অপরদিকে আবার কতকগুলি শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, কিন্তু তাঁহারা কতকটা বাতিকগ্রস্ত, তাঁহারা আবার উহাদের ('পাশ্চাত্যবিদ্যার মদিরাপানে মত্ত' ব্যক্তিদের) সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহারা সব ঘটনাকেই একটা শুভ বা অশুভ লক্ষণরূপে দেখিয়া থাকেন। তিনি যে জাতিবিশেষের অন্তর্ভুক্ত, তাঁহার বিশেষ জাতীয় দেবতার অথবা তাঁহার গ্রামের যাহা কিছু কুসংস্কার আছে, তাহার দার্শনিক আধ্যাত্মিক এবং সর্বপ্রকার ছেলেমানুষি ব্যাখ্যা করিতে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার নিকট প্রত্যেক গ্রাম্য কুসংস্কারটিই বেদবাণীর তুল্য এবং তাঁহার মতে সেইগুলি প্রতিপালন করার উপর জাতীয় জীবন নির্ভর করিতেছে। এই-সব হইতে তোমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে।'[১০] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, চন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদির প্রচারিত হিন্দুধর্মাদর্শকে বিবেকানন্দ 'কুসংস্কার' ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না এবং অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দকে তার সর্বনাশা প্রভাব থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

২

বিবেকানন্দ উনিশ শতকের যে ভাব ও আদর্শগত পটভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে-সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও মতামত খুবই স্পষ্ট ছিল। ইয়ং বেঙ্গলের রেভেলিউশন, ব্রাহ্ম-সমাজের রিফর্মেশন আন্দোলনের মধ্যে ভালো কিছু ছিল না, এমন কথা তিনি কখনও বলেননি।[১১] পাশ্চাত্য বিদ্যাধরদের প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি, ব্রাহ্মদের সমাজসংস্কারস্পৃহা ও ও সংরক্ষণশীলদের ঐতিহ্য-চেতনা নিশ্চয়ই তাঁর সন্তোষ বিধান করতে পেরেছিল। তবু সমগ্র-ভাবে বিচার করলে মনে হয়, উপরি-উক্ত তিনটি ভাবধারার কোনটিই তাঁর কাছে ত্রুটিহীন ব'লে মনে হয়নি, তাদের ভিত্তি ক'রে নতুন জাতীয় জীবন সংগঠিত করা যাবে ব'লে তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাদের মধ্যে কোথায় ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা, বিকৃতি ও বিজাতীয়তা, তা তাঁর বিভিন্ন মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে পূর্বে দেখিয়েছি। বিচিত্র ও জটিল ভাবাবর্তের ঘাত-প্রতিঘাতে জাতি যে ভাবে ও যে দিকে এগিয়ে চলেছে, তার পরিবর্তন প্রয়োজন ব'লে তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। তাই একদিকে মিশনারী

১০. 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য'—স্বামীজীর রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩।

১১. আসল কথা, তিনি কোন বিষয়কেই নিছক ভালো বা মন্দ-রূপে বিচার করতেন না।

(ও ইয়ং বেঙ্গল), অন্যদিকে ব্রাহ্ম-কোলাহল[১২] —এই দুয়ের মধ্যে অভ্রান্ত ভারতীয় আদর্শটিকে বেদান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার কার্যক্রম অনুসরণের ঐতিহাসিক ভূমিকায় তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কিন্তু বিবেকানন্দের পূর্বে আর একজন মনীষী—বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের ভাবগত ত্রিধারার ত্রুটি অনুধাবন ক'রে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সমকালীন বিভিন্ন মত ও পথের সঙ্গে আর একটি মত ও পথ জুড়ে দেননি, যুক্তির ভিত্তিতে প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছিলেন। তিনি অবশ্য স্বাজাত্যগর্বে প্রথম দিকে শশধর-চন্দ্রনাথের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক নব্যহিন্দুমতবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন, কিন্তু পরে বুঝতে পারলেন—'পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনও টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।[১৩] তিনি আরও লিখলেন: হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে "সত্য সত্য" বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়—এ সকল কি হিন্দুধর্ম?...মূর্খের আচার-মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্মের পুনর্জীবন চাহি না।[১৪] আসল কথা, তাঁর পাশ্চাত্য-বিদ্যাই তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিল, কোন্ কোন্ বিষয়ে ভাবতে হবে, ভাবতে হবে কি কি রীতিতে। তিনি মন দিয়ে পড়েছিলেন—বেকন, বার্কলে, বার্কার, সীলি, লেকি, রুশো, বেন্থাম, মিল, স্পেনসার, কোঁত, ডারুইন ইত্যাদি বহু মনীষীর বিচিত্র-বিষয়ক গ্রন্থ। তাঁর মন আকৃষ্ট হয়েছে র‍্যাশনালিজম্, এম্পিরিসিজম্, ন্যাশনেলিজম্, ইউটিলিটারিয়ানিজম্, পজিটিভিজম্, অ্যাগ্‌নষ্টিসিজম্ ইত্যাদি কত 'ইজমে'র প্রতি। ভারতীয় দর্শন ও শাস্ত্র সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান কালক্রমে অর্জন করেছিলেন। চিন্তা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন: (১) পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে দেশের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে। বুদ্ধির নবাবিষ্কারের সঙ্গে রক্তগত সংস্কারের মিলন ঘটাতে হবে। (২) রামমোহন থেকে যে বুদ্ধিবাদ ন্যায় ও যুক্তির নামে ধীরে ধীরে জীবনকে সঙ্কুচিত ক'রে দিচ্ছিল, তা জীবনের একটা প্রধান বৃত্তি মাত্র এবং সেই কারণেই অন্যান্য সমস্ত বৃত্তির সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। (৩) নবজাগরণের বিচিত্র ভাবপ্লাবনের ফলে ও সত্তার মুক্তির নামে যে ইওরোপীয় নীতিজ্ঞান ও স্পর্শকাতর বিবেকবুদ্ধি দেখা দেয়, তার আতিশয্যে উদার মানবতা-ধর্ম ক্ষুণ্ণ হয়। তিনি বুঝেছিলেন, এই অতি-শুচিতার সঙ্কীর্ণতাকে রোধ করতে হবে। (৪) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে যে স্বার্থবুদ্ধির পূজা শুরু হয়েছে, তাকে সর্বভূতহিতবাদে রূপান্তরিত না করলে চলবে না। গীতার নিষ্কামকর্ম ও কৃষ্ণচরিত্র এই সব সিদ্ধান্তের দিক থেকে তাঁর কাছে আদর্শ ব'লে মনে হয়েছিল। গুরু-শিষ্য-সংবাদে তিনি বলেছেন:

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্‌তের চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry—গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ-

১২. 'ব্রাহ্ম-কোলাহল' কথাটি বিবেকানন্দ নিজেই ব্যবহার করেছেন। দ্রষ্টব্য: স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১২।

১৩. 'প্রচার' শ্রাবণ সংখ্যা, পৃঃ ১২৯১।

১৪. ঐ। পৃঃ ১২৯২।

তত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের দ্বারা আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তারপর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে ?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই—Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্ঞা করিবে।

শিষ্য। তারপর ঈশ্বর জানিবে কিসে ?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে, উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।'[১৫]

এই উদ্ধৃতিতে বঙ্কিম-দর্শন নির্দিষ্ট রূপ লাভ করছে। এই দর্শন-চিন্তায় একদিকে যেমন পাশ্চাত্যবিদ্যার প্রভাব আছে, অন্য দিকে তেমনি ভারতীয় শাস্ত্রতত্ত্ব, বিশেষ ক'রে গীতাতত্ত্ব স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গি যে সম্পূর্ণ ভারতীয় ছিল না, তার প্রমাণ আছে কোঁতের উল্লেখে। তাই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মন্তব্য করেছেন :

—'Evidently the view on man and the Universe held by thinkers like Mill, Spencer and Darwin, have vitally affected Bankim Chandra's interpretation of Hindu religion and philosophy ; but the profoundest influence of all has been that of August Comte, whose Positive Polity and religion unconciously appear in almost everything that our author has to say on domestic, social and political ideals and institutions and the creation and conservation of national life specially in his novels Devi Chaudhurani and Ananda-Matha.'[১৬]

আমার মনে হয়, বঙ্কিমের ধর্মদর্শনের এই বিজাতীয় উপাদান বিবেকানন্দের মনঃপূত হয়নি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে—ধর্ম, দার্শনিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা এবং এ-সব বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশ থেকে গ্রহণ করবার মতো কিছু নেই। তিনি নিজেই বলেছেন—'পাশ্চাত্যদিগকে আমাদের নিকট আসিয়া ধর্ম ও অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা ও আয়ত্ত করিতে হইবে। আমাদিগকে—হিন্দুগণকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমরাই জগতের আচার্য।'[১৭] দ্বিতীয়তঃ বঙ্কিম-দর্শনের ভিত্তি ছিল গীতা, কিন্তু বিবেকানন্দ-দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে বেদান্ত, বঙ্কিম গীতার সমন্বয়ের আদর্শকে চরম সত্যরূপে গ্রহণ ক'রে য়ুরোপীয় বিচারপদ্ধতির সাহায্যে কৃষ্ণকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রতীক-রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মতে গীতার মধ্যেও যোগ-জ্ঞান-ভক্তি ইত্যাদির সামগ্রিক সামঞ্জস্য ঘটেনি ; গীতাকার 'যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন নাই, এই উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ পরমহংসের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছে।'[১৮] তৃতীয়তঃ তিনি মনে করতেন—'গীতা নিশ্চয়ই এতদিনে হিন্দুধর্মের বাইবেল-স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপেই ঐ সম্মানের উপযুক্ত ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মূল চরিত্র বর্তমানে এতটা কুয়াশায় ঢেকে আছে যে, তা থেকে জীবনপ্রদ উদ্দীপনা লাভ করা বর্তমান কালে অসম্ভব।'[১৯]

এই প্রসঙ্গে একজন উত্তর-ভারতীয় ধর্মনেতার কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। তিনি হচ্ছেন আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪

১৫. এই সংলাপে বঙ্কিম-দর্শনের মূল কথাগুলি ব্যক্ত হয়েছে ব'লে মনে করি।

১৬. New Essays in Criticism'-এর অন্তর্গত এই মন্তব্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-রচিত 'রবীন্দ্র-জীবনী'র (১ম খণ্ড) ১৩৬৭ সালের সংস্করণের ১৮৫ পৃঃ পাদটীকা থেকে উদ্ধৃত।

১৭. 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব'—স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২।

১৮. 'গীতাতত্ত্ব' ঐ। পৃঃ ২৫১-৫২।

১৯. 'পত্রাবলী'—বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫।

—১৮৮৩)। ব্রাহ্মরা যেখানে প্রধানতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণে জাতির পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখতেন, সেখানে দয়ানন্দ বিশুদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন ও রানাডের সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দয়ানন্দ গ্রহণ করেননি, তিনি চেয়েছিলেন শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বৈদিক ধর্ম ও আচারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যদিও ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর মনের জাগরণ ও সমাজ-সংস্কারমূলক নানা কর্তব্যসাধনও তাঁর কর্মসূচীর

পণ্ডিত নেহরু বলেছেন—'আর্যসমাজের মূলমন্ত্র ছিল, বৈদিক যুগে ফিরে যাও। বেদ পরবর্তী যুগে আর্য ধর্মে যে যে বিকৃতি এসেছে, বেদান্তদর্শনের গলদ, অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ - সব কিছু অন্যান্য কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে কঠোর ভাবে পরিহার করা হ'ল। বেদেরও ব্যাখ্যা হ'ল বিশেষ একটা ধরনে।'[২০]

এই ধর্মাচারের অঙ্গ-হিসেবে আর্যসমাজ অহিন্দুদের শুদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করে। বিবেকানন্দ দয়ানন্দের ধর্মচিন্তা ও সমাজ-সংস্কারমূলক কর্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতায় তাঁর কথা আছে। তবুও তিনি তাঁর সমর্থক ছিলেন না। দয়ানন্দ বেদান্ত-সূত্রের বোধায়ন-সূত্র ছাড়া আর কোন ভাষ্য মানতেন না, কিন্তু বিবেকানন্দ শঙ্কর-ভাষ্যেরই অনুবর্তী ছিলেন। দয়ানন্দ বৈদিক ধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বেদ বলতে যা বুঝতেন ও তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তা বিবেকানন্দ স্বীকার ক'রে নেননি। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—'(সংহিতা, ব্রাহ্মণ উপনিষদের মধ্যেও) কেবল সংহিতা অংশটিই বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দই এই মতের প্রথম প্রবর্তক। প্রাচীন হিন্দুসমাজের ভেতর এই মতের প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয়নি। স্বামী দয়ানন্দের এই মত অবলম্বন করার কারণ এই যে, তিনি ভেবেছিলেন, সংহিতার নূতন ধরনের ব্যাখ্যা ক'রে তিনি একটি পূর্বাপরসঙ্গত মতবাদের সৃষ্টি করবেন, কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা-প্রণালীতে গোল সমভাবেই থেকে গেল; শুধু এইটুকু হ'ল যে, তিনি 'সংহিতা'র ভেতর যে অসামঞ্জস্য নিবারণের চেষ্টা করলেন, সেই অসামঞ্জস্য—সেই গোলযোগ 'ব্রাহ্মণের' উপর গিয়ে প'ড়ল। আর প্রক্ষিপ্ত-বাদ ও অন্যান্য ব্যাখ্যা-প্রণালী সত্ত্বেও এখনও এমন অনেক স্থল আছে, যার ভেতর গোল তখনও যেমন, এখনও তেমনি রয়েছে। যদি সংহিতার উপর ভিত্তি ক'রে পূর্বাপর সামঞ্জস্য পূর্ণ একটি ধর্মপ্রণালী গঠন করা সম্ভব হয়, তবে উপনিষদকে ভিত্তি ক'রে যে আরও অনেক বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম স্থাপন করা যেতে পারে, এ-কথা সহস্রগুণে বেশী নিশ্চিত। অধিকন্তু এ পক্ষে সমগ্র জাতির পূর্বপ্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যেতে হয় না। এ পক্ষে প্রাচীন সকল আচার্যই থাকবেন, আর নূতন নূতন পথে অগ্রগতিরও যথেষ্ট অবকাশ থাকবে।'[২১]

৩

অতএব উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের ফলে নতুন জীবন-স্পন্দন অনুভব করা গেলেও জাতি ঠিক পথে চলেছে ব'লে বিবেকানন্দ মনে করতে পারেননি। বঙ্কিমের সমন্বয়-সাধনা বা দয়ানন্দের বৈদিক আর্যামি জাতীয় সংগঠনের যথার্থ ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হয়েছে এই বিশ্বাসও তাঁর ছিল না। এযাবৎ ভারতবর্ষের

২০. 'ভারত সন্ধানে' (সিগনেট সং, ১৩৫৬), পৃঃ ৩৭২-৭৩।

২১. 'পত্রাবলী'—স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৪-৪৫।

নূতন সংস্কৃতির যাঁরা বাহক হয়েছেন, তাঁদের পায়ের তলায় ঠিক মাটি নেই, দেশের মধ্যে তাঁদের অবস্থিতি কম-বেশী পরিমাণে উৎকেন্দ্রিক—এই-সব কথা বিবেকানন্দ নানাভাবে বলেছেন। যাঁরা অতীত ঐতিহ্য ও ধর্মপ্রবণতার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তাঁরাও ঠিক জাতির প্রাণ-প্রবৃত্তি ও ধাতু-প্রকৃতি ধরতে পারেননি ব'লে তিনি মনে করতেন। তাই জাতীয় সংগঠনের যথার্থ ভিত্তি নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি প্রথমতঃ বলেছিলেন—'অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পারো অতীতের দিকে তাকাও, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার জলপান কর।'[২২] সেই অতীতের গর্ভে দৃষ্টিপাত ক'রে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, ধর্মই ভারতবর্ষের চিরকালের মর্ম এবং সেই ধর্মকে অবলম্বন করেই একদা আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ উচ্চ গৌরবশিখরে আরোহণ করেছিলেন। এ-কথা যখন আমরা জানতে পারব, বুঝতে পারব, আমরা ধর্মের উপাদানে গঠিত—ধর্মের রক্ত আমাদের ধমনীতে প্রবাহিত, একমাত্র তখনই বর্তমানের জাতীয় সংগঠন ও ভবিষ্যতের মহত্তর ভারত গঠন সম্ভব হবে। তিনি বলেছেন—'তারপর সেই পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে ('ধর্মই আমাদের শোণিতস্বরূপ') বিশ্বাসী হইয়া, তাঁহাদের সেই অতীত কার্যে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাসবলে অতীত মহত্ত্বের চেতনা হইতেই পূর্বে যাহা ছিল, তাহা অপেক্ষাও মহত্তর নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে।'[২৩] সেই নূতন ভারত গঠনে সব চেয়ে বড় বাধা হচ্ছে ভারতবাসীর জাতিগত, বর্ণগত ও ধনগত বিভেদ। অথচ ভারত গঠনের জন্য ঐক্যের প্রয়োজন সর্বাধিক। এই কারণেই বিবেকানন্দ বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছেন—'কেবল আমাদের জাতির পবিত্র ঐতিহ্য—আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি, ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইওরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐ ঐক্যের মূল।'[২৪]

যে ধর্ম অতীত ভারতের মর্ম এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভারতের ভিত্তিভূমি, তা সত্য কি মিথ্যা, সে-প্রশ্ন বিবেকানন্দ তুলতে চাননি; কারণ তা তুলে লাভ নেই। অনাদি কাল থেকে যে বস্তুকে ভারতবাসী আঁকড়ে ধরে আছে, যাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, যা হচ্ছে তাদের জীবনচর্যার মূলমন্ত্র—আধুনিক যুগে তার সত্যতা বিচার করা অর্থহীন। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে যদি মনেও হয় যে, ধর্ম বর্তমানে অচল ও তার পরিণাম কল্যাণকর হবে না, তবু ধর্মকে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ এ-বিষয়ে অন্য কিছু ইচ্ছামত বেছে নেওয়ার অধিকারও আমাদের নেই। বিবেকানন্দ এ-কথাটাই বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছেন—'আমি এখন এ বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্ম সত্য কি মিথ্যা; আমি বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্মেই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন করায় পরিণামে আমাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে; ভালই হউক বা মন্দই হউক, ধর্মে আমাদের জাতীয় ভিত্তি রহিয়াছে, তোমরা উহা ত্যাগ করিতে পার না, চিরকালের জন্য উহাই তোমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ রহিয়াছে।'[২৫]

২২. ভারতের ভবিষ্যৎ'—ঐ। পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৮২।
২৩. ঐ
২৪. ঐ, পৃঃ ১৮৩।
২৫. 'ভারতের ভবিষ্যৎ'—স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৮৫।

এইভাবে জাতীয় জীবনের ভিত্তিরূপে ধর্মের দিকটাকে দৃঢ় করতে গিয়ে তিনি ধর্মকে বিশুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ধর্ম বলতে তিনি যা বুঝতেন, তা উচ্চ আদর্শ এবং সেই উচ্চ আদর্শের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা নেই। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে ধর্মসম্প্রদায়-গুলির মধ্যে নানা রকমের দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই বিবেকানন্দ ভারতবাসীর 'ধর্মরূপ রক্তকে পরিষ্কার ক'রে নেওয়ার কথা বলতে ভোলেননি 'যদি রক্ত তাজা ও পরিষ্কার হয়, সে দেহে কোন রোগের বীজ বাস করিতে পারে না। ধর্মই আমাদের শোণিত-স্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ-চলাচলের কোন বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশুদ্ধ ও সতেজ হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি এই রক্ত বিশুদ্ধ হয়, তবে রাজনীতিক, সামাজিক বা অন্য কোনরূপ বাহ্য দোষ, এমনকি আমাদের দেশের ঘোর দারিদ্র্যদোষ—সবই সংশোধিত হইয়া যাইবে।...একমাত্র কর্তব্য হইবে—লোকের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করা, রক্তকে বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, যাহাতে উহা সর্বপ্রকার বাহ্য বিষের প্রবেশ প্রতিরোধ করিতে পারে ও ভিতরের বিষকে বাহির করিয়া দিতে পারে।'[২৬]

ধর্মকে বিবেকানন্দ জাতীয় জীবনের ভিত্তি করতে গিয়ে বেদান্তদর্শনের দিকেই দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তাঁর মতে—ভারতের মন বহির্জগৎ থেকে যা পাওয়ার তা পেয়েছিল (প্রমাণ—বেদের প্রথম ভাগ), কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট হয়নি, আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়াসী হয়েছিল, নিজের অভ্যন্তরে আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে সমস্যা মীমাংসা করার চেষ্টা করেছিল; শেষে উত্তর এল। বেদের এই ভাগের নাম—উপনিষদ বা বেদান্ত, আরণ্যক বা রহস্যবিদ্যা, এখানে আমরা দেখতে পাই, ধর্ম বাহ্য ক্রিয়াকলাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এখানে আমরা দেখতে পাই, আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি জড়ের ভাষায় নয়, চৈতন্যের ভাষায় বর্ণিত।[২৭] বেদের এই দ্বিতীয় ভাগের মর্মকথা খুঁজতে গিয়ে তাঁর চোখে পড়েছিল—'প্রথমতঃ শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষদ্, দ্বিতীয়তঃ ব্যাস-সূত্র। আমাদের দর্শনশাস্ত্রসমূহের মধ্যে এই ব্যাসসূত্রই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, উহা পূর্ববর্তী অন্যান্য দর্শনসমূহের সমষ্টি ও চরম পরিণতিস্বরূপ।[২৮] কেউ কেউ বেদান্তদর্শন বলতে অদ্বৈতবাদকেই বুঝে থাকেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মত ছিল, বেদান্ত-শব্দটিকে একটিমাত্র মতের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখা অন্যায়। 'বেদান্ত-শব্দে প্রকৃতপক্ষে এই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতগুলিকেই বুঝায়।...আমি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতে চাই, আমরা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-শব্দের দ্বারা বৈদান্তিকই বুঝিয়া থাকি।[২৯] এই যে বেদান্তধর্ম, তা-ই বিবেকানন্দ প্রচার করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এই ধর্ম ও দর্শনের প্রচারেই বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক ভূমিকা আবদ্ধ থাকেনি। সত্য ধর্মকে হারিয়ে, কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, কর্মকাণ্ড বিসর্জন দিয়ে বাঙালী তথা ভারতবাসী বীর্যহীন দুর্বল হয়ে পড়েছে—এ-কথা তিনি জানতেন। তাই নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্রত উদ্‌যাপন ক'রে, জাতীয় সংগঠন-কার্যে আত্মনিয়োগ ক'রে, ভাবোদ্দীপ্ত অগ্নিগর্ভ বাণী শুনিয়ে তিনি জাতীয় জীবনে বীর্যবত্তা সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, পরাধীন স্বদেশবাসীর নিষ্প্রভ ইতিহাসে একটা

২৬. ঐ, পৃঃ ১৮৪-৮৫।

২৭. 'বেদান্ত'—ঐ, পৃঃ ২৯৮।

২৮. ঐ, পৃঃ ৩০০।

২৯. ঐ

বীরযুগের দ্বারোদ্ঘাটন করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম সোশ্যালিষ্ট।[৩০] তাঁর সমাজতান্ত্রিক চেতনা সকল মানুষকে নিম্নশ্রেণীতে নামিয়ে আনতে চায়নি, আপামর সকলকেই ব্রাহ্মণ ক'রে তুলতে চেয়েছিল, এ-কথার তাৎপর্য আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। তিনি প্রাচীন ভারতীয় বেদান্তধর্মের অনুবর্তী হলেও সত্যিকারের প্রগতির বিরোধী ছিলেন না। ভারতবাসী, বিশেষতঃ বাঙালীরা বহু পরিমাণে বৈদেশিক ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, সন্দেহ নেই, তবু স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন—'পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমাদের অনেক শিখিবার আছে। পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমাদিগকে তাহাদের শিল্প-বিজ্ঞান—বহিঃপ্রকৃতি-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানসমূহ শিখিতে হইবে।'[৩১] বিদেশ-ভ্রমণকালে ইংরেজের অধ্যবসায় ও মার্কিনদের জীবনীশক্তির প্রাচুর্য তাঁর মনোহরণ করেছিল। তিনি আধুনিক দৃষ্টি নিয়ে জীবন-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সেই সমস্যার সমাধানে পাশ্চাত্যের কাছে শিক্ষা-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পাই—

'র নিকট আমাদের যে অনেক জিনিস শিখিতে হইবে—এ-ধারণা ত্যাগ করিতে পারি না।'[৩২] তিনি জানতেন, জীবন গতির লীলা ছাড়া আর কিছু নয়। জগতের গতি লক্ষ্য ক'রে আমরা যদি চলতে শিখি, তবে উন্নতি অবধারিত। আর তা করিনি বলেই আমরা অবনতিকে স্বীকার ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছি। তাঁর চরম কথা—'জীবনের প্রথম চিহ্ন—বিস্তার। যদি বাঁচিতে চাও, তবে তোমাদিগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িতে হইবে। যে মুহূর্তে তোমাদের বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই মুহূর্তে হইতেই জানিবে মৃত্যু তোমাদিগকে ঘিরিয়াছে।'[৩৩] ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই বিশেষ মনোভাব আসলে সমস্ত জগৎ-ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁর মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি—'সমগ্র জগৎকে নিজের সঙ্গে না টানিয়া জগতের একটি পরমাণু পর্যন্ত নড়িতে পারে না। সমগ্র জগৎকে সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পথে অগ্রসর না করাইয়া জগতের কোন স্থানে কোনরূপ উন্নতি সম্ভব নহে। আর প্রতিদিনই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর রূপে বুঝা যাইতেছে যে, শুধু জাতীয় বা কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।'[৩৪] এখানে রয়েছে বিবেকানন্দের সার্বভৌম ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টির প্রকাশ।

বিবেকানন্দ বলেছেন—'সাম্য, স্বাধীনতা, কর্ম ও শক্তি-প্রয়োগের ক্ষেত্রে একেবারে পাশ্চাত্য হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে সাধনায় ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুত্ব (ভারতীয়ত্ব) যেন তোমার অস্থিমজ্জায় মিশে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে ঐতিহাসিক ভূমিকার এই হচ্ছে সার কথা।

৩০. 'আমি সমাজতন্ত্রী; সমাজতন্ত্রের অবস্থা সর্বতোভাবে ভাল ব'লে আমি মনে করি না, কিন্তু নেই-মামার চাইতে কানা মামা ভাল। অন্যান্য রাজনৈতিক মতবাদ কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে দেখা গেছে সেগুলির দ্বারা সমস্যা মেটে না। একবার সমাজতন্ত্র নিয়েই পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক না, আর কিছু না হলেও এ একটা নূতন চেষ্টা তো বটে।'—বিবেকানন্দ

৩১. 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব'—স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২

৩২. 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য'—ঐ, পৃঃ ১৬৬

৩৩. ঐ, পৃঃ ১৬৭

৩৪. ঐ, পৃঃ ১৬৩

মানবতা-ধর্মী স্বামীজী

শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তী

বিশ্বের ধর্মাকাশে স্বামীজী হইলেন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক-স্বরূপ। স্বীয় পবিত্রতা ও মূল সত্যের আলোকে সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রকার ধর্মান্ধতার জটিল অন্ধকার অপসারিত করিয়া এক মহৎ দ্যুতির পরিমণ্ডল তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই অত্যাশ্চর্য আলোকে স্নাত বিশ্বে সকল ধর্মের মানুষ এক ও পরম উপলব্ধির জন্য চৈতন্যস্বরূপ উদ্ঘাটনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। উপরন্তু মানব-সন্তানগণ যেন পরমাত্মার বিচিত্র বিভাময় বহু রূপ---পরমসন্ধানী স্বামীজী এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন হৃদয়াবেগ ও যুক্তি-তর্কের দ্বারা। পুরুষসিংহ স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত বাণী—শুধু কেতাবের বুকে মাথা কুটিয়া মরে নাই, সমগ্র বিশ্বের মর্মমূলে আত্মার ঐ অমৃতময় বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। এখানেই কর্মবীর ধর্মবীর স্বামীজীর সার্থকতা।

স্বামীজীর ধর্ম মানবতার পথ-পরিক্রমায় পরমকে অনুভব করিয়াছে। তিনি সকল জীবাত্মার মধ্যে অমৃতময় পরমাত্মার সম্যক্‌রূপ দর্শন করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। জড়জগৎ, শক্তিজগৎ, জীবজগৎ, বস্তুজগতের সকল স্তরে ও বহিঃপ্রকাশে –অন্তরে নিভৃতে সেই এক অখণ্ড চৈতন্য ও অদ্বৈতভাবের অস্তিত্ব তিনি অনুভব করিয়াছেন।

বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও সেগুলির বিভিন্ন মত ও পথ একই নদীর শাখাপ্রশাখা-রূপে ব্যাপ্ত, সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন স্বামীজী। সকল ধর্মের আদি-অন্ত এক ও অদ্বিতীয়। বহু ধর্মের বিভেদ, বিরুদ্ধ ভাবাপন্নতাকেও তিনি এক সত্তার বিচিত্র প্রকাশ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তথাপি তিনি হিন্দুধর্মের উদারতা, পরমানুভূতি, ধী-শক্তি যে বিশ্বের সকল ধর্ম হইতে অধিক-তর শক্তিময়, তাহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনে চিকাগো-মঞ্চে। সেখানে বিশ্বের সকল ধর্মের প্রচারকেরা উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব ধর্মের উৎকৃষ্টতা প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু পুতুল-পূজারী হিন্দু ও তাহার ধর্ম তাঁহাদের মনে ঘৃণার ভাব উদ্রেক করিয়াছিল। তথাপি স্বামীজী বীরদর্পে হিন্দুধর্মের মহান্ ঐতিহ্যের গৌরব-পতাকা সেই ধর্মসভায় উড্ডীন করিয়াছিলেন।

সকল ধর্মের ভিন্ন মত ও ভিন্ন পথকে এক মৈত্রী-সূত্রে গ্রথিত করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন, সকলেই সেই এক লক্ষ্য ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে। সেখানে ভিন্নতা নহে, অভেদ ভাব; বহুত্ব নহে, একত্ব -এক পরম চৈতন্যের উপলব্ধি।

এইরূপে তিনি বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম, পার্শী ও ইহুদী ধর্মের বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, লক্ষ্য এক -এক স্থানে উপনীত হওয়া—বিচিত্র বিভিন্ন মত ও পথের দ্বারা পরমানুভূতির আনন্দলাভ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এইরূপ ক্ষেত্রে মহিমময় পরমেশ্বর বহুরূপে পরিব্যাপ্ত ও বিভিন্ন প্রকাশে বিরাজিত হইয়া আপনার অনন্ত শক্তিকে বহুভাবে দেখাইয়াছেন।

স্বামীজী বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের গভীর সম্বন্ধ অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই হিন্দুজাতির উপাস্য শাক্যমুনি, হিন্দুধর্মের মূল শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনার উদার মহত্ত্ব ও

অহিংসাবাদ সংমিশ্রিত করিয়া এক মহানুভব মহাধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তিগণ দুই ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক ছিন্ন করিল।

হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজাকে স্বামীজী ধর্মের বাল্যাবস্থা (First Stage) বলিয়াছেন। রূপকে আশ্রয় করিয়া ভাবের উৎপত্তি। ভাবের গভীরতা রূপের আরাধনায়। ভাব ও রূপের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিত হিন্দুধর্মের মানসে। শিল্পী এইরূপে পরম জ্ঞানে মুক্তিলাভ করিতে চাহে। বন্ধন পূর্বে, মুক্তি অন্তে। জটিল আঁধার হইতে তীক্ষ্ণ-সন্ধানী সাধনা দ্বারা মহানন্দময়ের কৃপালাভ !

কর্মবীর স্বামীজীর ধর্ম মহান্ কর্মের মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়াছে। তিনি নিরলস, সুকঠিন কর্মময় সন্ন্যাসী ছিলেন। শুধু নির্জনে বসিয়া—তপস্যা করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না, তিনি ছিলেন রুগ্ন ও পীড়িত সমাজের পার্শ্বচর বন্ধু; তাঁহার অসাধারণ মানবপ্রীতি হিন্দু জাতিকে নব উদ্দীপনায় বলীয়ান করিয়াছে। তাঁহার মহান্ আদর্শ—মানবসেবার মধ্য দিয়া ভগবানকে উপলব্ধি করা। এই বিশ্বব্যাপী মানব-হৃদয়সত্তা সেই পরম হৃদয় হইতে জন্মলাভ করিয়া অনন্ত প্রকাশে মহীয়ান্ হইয়াছে। তিনি অমৃতানন্দকে মানবপুত্রের স্বর্গস্থ পিতারূপে অভিহিত করিয়াছেন। মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ সর্ব অবস্থায় মানব-মনের আয়নায় সুন্দরতমের মধুর মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার,
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

মানবের নিভৃত অন্তর্নিহিত সেই পরম সত্যানন্দকে সর্বতোভাবে অনুভব করিয়া তাঁহারই ভজনা কর। তিনি কোন অদৃশ্য লোকে অবস্থান করেন না; এই মৃত্তিকায় জলবায়ু বৃক্ষলতায়, সকল জড় ও জীবাত্মার সর্ব অস্তিত্বে, সকল সৃষ্টির অঙ্কে তাঁহার পূর্ণ অবস্থিতি—অপরূপ রূপ-মাধুরী! সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার অবস্থান, তাঁহারই সৃষ্ট সংসার-রাজ্যে তিনি বিরাজিত। বহু রূপ ও রঙে বিচিত্র রূপধর! বিপুল প্রকাশে, নিত্য পরিবর্তনশীল ভূ-লোকে, নব নব রূপে তিনি আবির্ভূত! নব ভাবসম্ভারে প্রমূর্ত!

স্বামীজীর মানবতার আদর্শ—মানবপ্রীতির ও মানবসেবার মধ্য দিয়া পরমেশ্বরের অনুসন্ধান করা। তিনি মানবকে ভগবানের পুত্ররূপে—স্বরূপরূপে পূজা করিয়াছেন। অপার এই মানব-প্রেম তাঁহার মহিমময় সত্য হৃদয়ের সন্ধান দিয়া থাকে। তিনি বলিয়াছেন: ক্ষুধার্তের মুখে এক-দিনও যে অন্ন দিয়াছে, ব্যথিতের চোখের জল একদিনের তরেও যে মুছিয়া দিয়াছে, আমি তার দাসানুদাস। মানবদরদী বীর সন্ন্যাসীর উদাত্ত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল—'বল, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, আমার ভাই।' কি অপরিসীম মানবতা-বোধ! মহান্ আত্মজ্ঞ পুরুষ আরও বলিলেন, 'তোমার সম্মুখে পাপী, দুষ্ট, দুরাচার, যাহাকেই দেখ না কেন, তাহার আত্মশক্তিকেই দর্শন কর, পূজা কর। তাহার বহিরাবরণ দেখিও না, অন্তঃস্থ দেবতাকে দেখিও। কাহারও প্রতি ঘৃণার ভাব আনিও না, সকল মানব-হৃদয়ে বাস করেন পবিত্র পরমেশ্বর। জানিবে, তুমি সেই দেবতারই পূজা করিতেছ।

আজিও বিশ্বমানবপ্রেমিক, আপনার অনন্ত দৃপ্তপ্রেমে নব নব দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল ভাস্করের ন্যায় অপার মহিমায় মহিমান্বিত।

রাম রঘুবীর

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সরযূর স্রোতোধারা ওঠে নেচে স্মৃতি লয়ে তব,
কবিগুরু বাল্মীকির বীণাখানি রামায়ণী সুরে সুরে বাজে ;
তোমার জীবন-কাব্য মহাকাব্য বিশ্বে অভিনব,
সর্বোত্তম আদর্শের মহান্ বিগ্রহ তুমি নিখিল সমাজে।
দুঃখের সম্রাট্‌রূপে দেখেছি তোমারে আমি রাম রঘুবীর,
পিতৃসত্য পালিবারে ত্যাগের দীপ্তিতে তব সমুন্নত শির।

দক্ষিণারণ্যের পথে হে বৈরাগী দেখালে সংযম
জীবনের বিচিত্রতা মাঝে তব বিশিষ্টতা সত্যে সমুজ্জ্বল,
শোভন চরিত্র তব হিমালয় সম অনুপম।
সন্তাপেরে মহীয়ান্ করিয়াছ তুমি, যত কিছু অমঙ্গল
বরণ করেছ প্রভু কর্তব্য-নিষ্ঠায়, পরিশুদ্ধ আত্মজয়—
লঙ্কা-বিজয়ের চেয়ে গরীয়ান্—দেখায়েছ সারা বিশ্বময়।

পূর্ণব্রহ্ম-সনাতন দেখায়েছ চরিত্র-বৈভব
অধর্মের জয়যাত্রা আসুরিক মদোল্লাস রুদ্ধ করিবারে।
ভরত লক্ষ্মণ সম সহোদর একান্ত দুর্লভ,
কীর্তির হিমাদ্রি তব রচিয়াছে বীর হনু পূজিয়া তোমারে।
তোমার কীর্তির চেয়ে কীর্তিভাক্ ভক্ত তব অঞ্জনা-তনয়,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে রাম-নামে আপনারে করেছে দুর্জয়।

সীতার সিন্দূরে লিপ্ত ঐতিহ্যের দিক্‌চক্র-বাল,
তুমি তার প্রাণ-সূর্য, সহিয়াছ তার লাগি ঘাত-প্রতিঘাত।
সীতার সতীত্ব-তেজে দীপ্যমান্ নিত্য মহাকাল,
ত্যাগের কাহিনী-দৃপ্ত পবিত্রতা মাঝে তবু মিথ্যা অপবাদ !
কত ঝড়, কত মেঘ, ভাগ্যাকাশে দিল দেখা—বর্ষণমুখর
হ'ল কত অশ্রুধারা, স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলে তুমি রাম রঘুবর।

সেই সব স্মৃতি আজও রোমন্থন করি মোরা হায় !
প্রাণের জানকী কাঁদে, কোথা সেই মহাবীর অঞ্জনা-নন্দন !
লক্ষ্মণের শক্তিশেলে বিপন্নতা দুর্দিনে ঘনায়,
নরমেধে অগ্নি-ধূমে আকাশ হয়েছে কালো—জীবের ক্রন্দন
কর্ণে তব পশিল কি ! ক্লীবতার পরিস্থিতি আর আর্ত রব—
প্রত্যাসন্ন কালান্তর, যুগযাত্রী অসহায়, শিব আজি শব।

সমালোচনা

Swami Brahmananda in pictures (Birth Centenary Souvenir—1863-1963). Published by Swami Vireswarananda, General Secretary, Ramakrishna Math & Mission, P. O. Belur Math, Dist. Howrah Pp 100; Price Rs. 10/-

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের মানস-পুত্র পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী জীবনচরিত-সহ ১২৫টি আলেখ্যের সুন্দর চিত্র-পুস্তকটি (Album) তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত হওয়ায় বহুদিনের একটি অভাব পূর্ণ হইয়াছে। প্রখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক ক্রীষ্টফার ঈশারউড সরল ও মনোজ্ঞ ইংরেজীতে শ্রীশ্রীমহারাজের জীবনচরিত অংশটি লিখিয়াছেন।

পুস্তকখানি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। মহারাজের বাল্যজীবনের ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গে অবস্থানের চিত্রগুলি প্রথম পরিচ্ছেদে স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বরাহনগর মঠ এবং তপস্যা ও পরিব্রাজক-জীবন সংক্রান্ত চিত্রাবলী এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলমবাজার ও বেলুড় মঠের ঘটনা সংক্রান্ত চিত্রসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ থাকাকালে গৃহীত চিত্রগুলি চতুর্থ ও শেষ পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত। সময় ও ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত হওয়ায় সমগ্র জীবনটি মানস-পটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রতিটি চিত্রের নিম্নে সময় ও প্রয়োজনীয় বিবরণ দেওয়া আছে। ইটালিয়ান ৮০ পাউণ্ড আর্ট-পেপারে মুদ্রিত মূল্যবান্ এই আলেখ্য-গ্রন্থটি সংরক্ষণযোগ্য; ইহা ভক্তগণের নিকট বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইবে।

বিবেকানন্দ-শতাব্দী জয়ন্তী প্রকাশন

(১) The Sixth Shri Ramakrishna Mela—1963, (২) Vivekananda Centenary Volume, (৩) অভীঃ (আবাসিক মহাবিদ্যালয় পত্রিকা), **(৪) ফাল্গুনী** (আবাসিক বহুমুখী বিদ্যালয় পত্রিকা), **(৫) আরুণি** (আবাসিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় পত্রিকা), **(৬) সমাজ-শিক্ষা** (লোকশিক্ষা পরিষদ)।

প্রকাশক: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, সম্পাদক রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, ২৪ পরগনা।

(১) **The Sixth Shri Ramakrishna Mela** 1963: গত কয়েক বৎসর যাবৎ নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মেলা জনসাধারণের নিকট প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভের ক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। এই মেলাকে কেন্দ্র করিয়া স্বামীজীর শতবার্ষিকী স্মরণে প্রকাশিত সচিত্র শোভন পত্রিকাখানির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে:—প্রবন্ধ নির্বাচন, চিত্র-বাহুল্য ও সুন্দর মুদ্রণ।

Swamiji and the Evolution of a World Culture, The World Crisis and Swami Vivekananda, On Vivekananda's Karma-Yoga, The Education of Masses—Swami Vivekananda wanted, দেশপ্রেমের দীক্ষা, মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ, শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্রসৃষ্টি ও স্বামী বিবেকানন্দ, মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ (হিন্দী প্রবন্ধ) --এই সুচিন্তিত লেখাগুলি পত্রিকাটির অলঙ্কার-স্বরূপ। সূচীপত্র ও পৃষ্ঠাঙ্ক না থাকায় পাঠক-গণের একটু অসুবিধা হয়।

(২) **Vivekananda Centenary Volume:** পৃষ্ঠা: ১৩২ + ১২ + ৮ + ১৫ = ১৬৭। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দীতে সুলিখিত প্রবন্ধাবলী সমন্বিত আলোচ্য পত্রিকাখানি স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। Swamiji's Interpretation of the Upanishads, Swami Vivekananda and His Gospel

of Practical Vedanta, Swami Vivekananda's Synthesis of Science and Religion, Vivekananda and American Tradition, Swami Vivekananda on Crucial Points of Advaita Vedanta—প্রবন্ধগুলিতে চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

পত্রিকাটিতে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা লেখকদের স্বামীজী-সম্বন্ধে চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম: স্বামী নিখিলানন্দ, ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উইলিয়ম এ কন্‌রার্ড, ডক্টর এম. এন. এল. শ্রীবাস্তব, এরিক জনস্, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

দেশ-বিদেশে বিভিন্ন স্থানে স্বামীজীর উৎসব-সংবাদের সচিত্র মনোজ্ঞ বিবরণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রসমূহের পরিচিতি পত্রিকাটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃত বাংলা ও হিন্দীতে লিখিত প্রবন্ধাবলীও উচ্চাঙ্গের। উৎকৃষ্ট কাগজে মনোরম ছাপা চিত্র-সংবলিত পত্রিকাখানি সকলেরই আদরণীয় হইবে।

(৩) **অভীঃ**—পৃষ্ঠা ৮৮ + ৭৭ = ১৬৫। স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে এই আবাসিক মহা-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ বাংলা ও ইংরেজীতে শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন। 'জনগণের বিবেকানন্দ', 'স্বামীজীর শিক্ষাদর্শন', 'বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ', 'দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী', 'স্বামীজী ও সংস্কৃত', 'সুর ও স্বামীজী', 'স্বামীজী ও মাতৃজাতি', 'পত্রাবলী: মানুষ বিবেকানন্দের জীবন', 'পত্রাবলী: স্বামী বিবেকানন্দের মনের মুকুর', 'Swami Vivekananda on Socialism', 'Swamiji's Idea of Education', 'Vivekananda—a Social Reformer', 'Swamiji as a Humanitarian', 'World-Peace and Vivekananda' প্রভৃতি প্রবন্ধ সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ হইয়াছে এবং স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করিয়াছে। এই জয়ন্তী সংখ্যা শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে স্বামীজীর ভাব-ধারা উদ্দীপিত করিবে।

(৪) **ফাল্গুনী:** পৃষ্ঠা: ১৪৮ + ৬৭ + ২৪ = ২৩৯। পত্রিকাখানিতে মুখ্যতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ স্বামীজীর জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে প্রবন্ধ-রাজি লিখিয়াছেন। কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি কয়েকজনের স্বামীজী সম্বন্ধে মনোজ্ঞ কবিতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'নরেন্দ্রনাথ' নাটিকা, স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতা: সখার প্রতি, 'পূজা তার সংগ্রাম অপার': কবি ও সন্ন্যাসীর জীবন—এই তিনটি লেখা পাঠক-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। 'He spoke, He conquered' নামক লেখাটিকে স্বামীজীর প্রথম আমেরিকা সফরকালীন বক্তৃতাগুলির বিষয়, স্থান ও তারিখ পর পর সংক্ষেপে সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছে। এই জয়ন্তী সংখ্যাটিতে বিদ্যার্থীদের জ্ঞাতব্য অনেক কিছু রহিয়াছে।

(৫) **আরুণি:** পৃষ্ঠা: ১৪২ + ৪২ = ১৮৪। আবাসিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এই পত্রিকাখানি প্রবন্ধ-নির্বাচন ও সম্পাদনার দিক দিয়া প্রশংসার দাবি করিতে পারে। বর্তমান জগতের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, জাতি-গঠন ও শক্তি-সাধনায় স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা, নচিকেতা (নাটিকা), Swami Vivekananda—Mediator of East and West, স্বামীজীর উত্তর সাধক—নেতাজী, ভারত-ভাস্কর বিবেকানন্দ—এই লেখাগুলি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। 'সন্ন্যাস নিয়েও যিনি সন্ন্যাসী হ'তে পারেননি'—প্রবন্ধের এইরূপ নামকরণের তাৎপর্য বোধগম্য হইল না। ছাত্রদের প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি সযত্নে লিখিত। উনিশটি চিত্রে পত্রিকাটি অলংকৃত।

(৬) **সমাজশিক্ষা**: পৃষ্ঠা :—৬০। লোক-শিক্ষা পরিষদ হইতে প্রকাশিত সমাজশিক্ষা ও সংগঠনমূলক মাসিক পত্রিকাখানির এই বিশেষাঙ্ক নানাদিক দিয়া আকর্ষণীয় হইয়াছে। 'অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইয়া যাও' স্বামীজীর এই বাণী নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদের মাধ্যমে রূপায়িত করিবার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। 'সমাজশিক্ষা' ইহারই মুখপত্র। আলোচ্য পত্রিকাটিতে সমাজ-সংস্কার প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, সমাজশিক্ষার ধারা, গ্রামোন্নয়ন ও স্বামী বিবেকানন্দ—লেখাগুলি সমাজ-সেবীদের বিশেষ কাজে লাগিবে। নব-সাক্ষরদের জন্য বড় অক্ষরে ছাপা কবিতা ও প্রবন্ধগুলি লিখিত। —**জীবানন্দ**

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস: অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, এম-এ (ট্রিপ্‌ল্), ডি-লিট্। পরিবেশক: ডি-এম লাইব্রেরী, কলিকাতা-৬। দাম ৪·২৫।

একথা বললে অন্যায় হয় না যে আধুনিক ভারতবর্ষে সৃষ্টিশীল ভাষা হিসেবে বাংলার পাশেই উর্দুর স্থান। বিশেষ করে কাব্যে এবং কথা-সাহিত্যে উর্দুর সমৃদ্ধি নিঃসন্দেহে গৌরব করবার মতো। শিক্ষিত এবং সাহিত্যরসিক বাঙালী মাত্রেরই অন্ততঃ পঠনগত ভাবেও আজ উর্দুর সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত।

ডক্টর পাল তাঁর এই বইখানি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে একটি দীর্ঘ দিনের অভাব মোচন করলেন। হিন্দু-মুস্‌লিম সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধিকা, ঐশ্বর্যশালী এবং জীবনদীপ্ত, পাঞ্জাব থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত এই উর্দু বিপুলসংখ্যক মানুষের মুখের ভাষা, অগণ্য কৃতী সাহিত্যিকের সাধনভূমি। ডক্টর পাল এই ভাষা এবং সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ক্রম-পরিণতির ইতিহাস গভীর পাণ্ডিত্য এবং একান্ত নিষ্ঠা সহযোগে সহজ-সরল ভাবে আমাদের সামনে এনে দিয়েছেন। যোগ্যতম ব্যক্তির দ্বারাই এই দায়িত্ব পালিত হয়েছে।

অবশ্য সাহিত্যপাঠকের আশার অন্ত নেই। মীর, দর্দ, ঘালিব কিংবা হালী সম্পর্কে আরো কিছু পেলে মন খুশি হয়। বিশেষতঃ মীর্জা ঘালিবের সঙ্গে ফার্সী কবি রুমীর ভাবগত ঐক্য আরো পরিস্ফুট হলে কিংবা সুফীবাদ উর্দুর মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধারায় কিভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক আলোক-পাত থাকলে আমাদের সাহিত্য আলোচনায় আর একটা নতুন দিগন্ত খুলে যায়। ফার্সী সাহিত্যের ডি-লিট্ অধ্যাপক পালের কাছে এ দাবি আমরা নিশ্চয় জানাতে পারি। ইক্‌বাল সম্পর্কে আলোচনায় আরো কি কিছু জায়গা দেওয়া যেত না? একটি নাম-পঞ্জী (Index) না থাকায়ও অসুবিধে অনুভব করেছি।

শুদ্ধিপত্র ব্যতিরিক্ত মূল উর্দুর পাশে বাংলা লিপ্যন্তরে আরো কিছু কিছু গোলযোগ চোখে পড়ল। যেমন ২৪০ পৃষ্ঠায় আকবরের বয়্‌ৎ-এর প্রথম পংক্তিতে বাংলায় দেখছি: "জিস্ মেঁ কি আয়ী", উর্দুতে দেখছি "জিস্ মেঁ কহ্ আয়ী"। ২৬৭ পৃষ্ঠায় নাসিরী কাব্যের আলোচনায় জাফর আলী খান আসর-এর উক্তির দ্বিতীয় পংক্তিতে বাংলায় দেখছি "বেশতর হিস্বায়ে-কলাম তাসীর কা তিলিসম্ হৈ", অথচ উর্দুতে পাচ্ছি: "বেশতর কলাম কা তিলিসম্ হৈ।"

ছাত্রতুল্য আর একটি প্রশ্ন: 'ঘ' দিয়েই কি 'গায়েনে'র উচ্চারণ সুনিশ্চিত?

এই মহামূল্য বইটি প্রকাশ করে ডক্টর পাল আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। সেই সঙ্গে অর্থানুকূল্য করবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। আয়তনের তুলনায় এবং বিষয়ের গুরুত্বে বইখানি অবিশ্বাস্য রকমের সুলভ, সুতরাং প্রতিটি সাহিত্যপাঠকের পক্ষে এটি আহরণ করবার যে সহজ সুযোগ রয়েছে, তা তাঁদের অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত। —**নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়**

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

বেলুড় মঠঃ গত ২রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুআরি) শনিবার শুক্লা দ্বিতীয়ায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৯তম জন্মতিথি-উৎসব মহা আনন্দে ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। উপনিষদ্‌-আবৃত্তি, উষাকীর্তন, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, দশাবতারের পূজা, ভোগারতি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ এবং 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, কীর্তন ও ভজন, কালীকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, দশমহাবিদ্যার পূজা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। ৩,০০০ নরনারী বসিয়া এবং কয়েক সহস্র ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

অপরাহ্নে মঠ-প্রাঙ্গণে স্বামী নিখিলানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ ও আদীশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনে সময়োপযোগী ভাষণ দেন। স্বামী ভাষ্যানন্দ ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। স্বামী নিখিলানন্দ তাঁহার ইংরেজী ভাষণে বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশই বর্তমান বিশ্বের ক্ষুব্ধচিত্ত মানুষের অন্তরে শান্তির সন্ধান দিতে পারে।

পরদিন রবিবার ১৬ই ফেব্রুআরি মহোৎসব-দিনে বেদ ও গীতা আবৃত্তি, স্তবপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীত, কালীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী পুণ্যানন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন (কথকতা), কাসুন্দিয়া (হাওড়া) 'মায়ের মন্দিরে'র ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনগীতি এবং শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বিবেকানন্দ-গীতি-আলেখ্য শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সুবৃহৎ তৈলচিত্র ও তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রদর্শনার্থ সজ্জিত রাখা হয়। অপরাহ্নের দিকে লোকসমাগম বৃদ্ধি পায়। প্রায় ৫,০০০ নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইদিন প্রায় ৩০,০০০ লোকের সমাগম হয়। পঞ্জিকা-বিভ্রাট ও নানা কারণে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় উভয় দিনেই এবার লোকসমাগম কম হইয়াছিল।

রাঁচিঃ মোরাবাদি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ১৫ই ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা, শাস্ত্রপাঠ, ভজন, হোম ও ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। ৩,০০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট বক্তাগণ ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

তমলুকঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ২রা ফাল্গুন উষাকীর্তন, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, 'কথামৃত' পাঠ, পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আরতি ও ভজনের পর স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে 'বিশ্বধর্মে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান' প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন।

উৎসব-সংবাদ

ফরিদপুরঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত ৭ই ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। সন্ধ্যায় শ্যামা-সঙ্গীত হইয়াছিল। ২০শে ডিসেম্বর আয়োজিত সভায় মহিলা ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবন আলোচনা করেন।

শিলচর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে গত ৮ই হইতে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচদিন-ব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে স্বামীজীর জীবনের ঘটনা অবলম্বনে একটি পুতুল-প্রদর্শনী খোলা হয়।

উষাকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ১০০টি বোমা ফাটাইয়া উৎসবের আরম্ভ ঘোষণা করা হয়। অপরাহ্নে স্বামী নিরাময়ানন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করেন। সন্ধ্যায় স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুরোভাগে রাখিয়া এক শোভাযাত্রা শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করিয়া আসে। শোভাযাত্রায় ১০০টি মশাল জ্বালাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। রাত্রে ভারত সরকারের প্রচার-বিভাগের ধর্ম- ও কৃষ্টি-বিষয়ক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

পরদিবস ৯ই মহিলাদিবস ধার্য করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে সভায় প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধা-প্রাণা বক্তৃতা দেন।

১০ই বৈকালে পূজ্যপাদ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী সৌম্যানন্দ, নিরাময়ানন্দ, গহনানন্দ, ভব্যানন্দ, স্বাহানন্দ ও প্রণবাত্মানন্দ ভাষণ দেন।

১১ই ছাত্রদিবসে বহু ছাত্রছাত্রী বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। সন্ধ্যায় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সভাপতিত্বে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে সমাগত সন্ন্যাসিগণ সময়োচিত ভাষণ দেন। আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পারিতোষিক সভাপতি মহারাজ বিতরণ করেন।

১২ই প্রাতে এক সভা আহূত হয় এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, সৌম্যানন্দ ও নিরাময়ানন্দ ভাষণ দেন। মধ্যাহ্নে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে এক জনসভায় শ্রী নটরাজন্ সভাপতি হন। প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ভাষণ দেন। ছায়াচিত্র প্রদর্শনের পর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

কাঁথি ঃ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে ২৫শে ফেব্রুআরি হইতে ১লা মার্চ (১৯৬৩) স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব পূজা পাঠ ধর্মসভা, ভজন-কীর্তন, শোভাযাত্রা, চলচ্চিত্র-প্রদর্শন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে ৩৮টি স্থানে আয়োজিত উৎসবের ৩০টিতে সেবাশ্রমের সাধুগণ যোগদান করেন। এই উৎসবগুলির অধিকাংশই বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্রগণের দ্বারা আয়োজিত হয়। আবৃত্তি ও প্রবন্ধপাঠ প্রভৃতি উৎসবের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

কার্যবিবরণী

বেলঘরিয়া ঃ কলিকাতা রামকৃষ্ণ-মিশন বিদ্যার্থী-ভবনের বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৬২—১৯৬৩ খৃঃ)। এই প্রতিষ্ঠানটির ৪৪ বৎসর পূর্ণ হইল।

বৎসরের প্রথমে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৯৩। ইহার মধ্যে ৬২ জন বিনা-খরচে, ১৬ জন অর্ধেক খরচে ছিল। এই বৎসর ৩৫ জন নূতন ভরতি হয়।

১৯৬২ খৃঃ পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

৪১ জন ছাত্রকে তাহাদের পরীক্ষার ফি-বাবদ ভানু দাশগুপ্ত ফণ্ড হইতে ৫৯০৲ ও কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি ফণ্ড হইতে ১৩১৲ সাহায্য করা হয়।

লাইব্রেরিতে ২,৮৪৮ খানি বাছাই-করা পুস্তক আছে। ১৮টি মাসিক ও ৬ খানা দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। ১,২১০ খানি পুস্তক ছাত্রেরা পড়িতে লয়। ইহা ছাড়া লাইব্রেরির পাঠ্য পুস্তক বিভাগে ১,৯৩৮টি পুস্তক আছে, তন্মধ্যে ১,৪৭৪টি ছাত্রাবাসের ছাত্রদিগকে পড়িবার জন্য ধার দেওয়া হয়।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও ৩৬ জন ছাত্র দুইজন সন্ন্যাসী সহ পুরীতে যায়। নববর্ষ ও বিজয়া-সম্মিলনে নিকটবর্তী প্রাক্তন ছাত্রগণ যোগদান করে। ১৯৬৩ খৃঃ ২৬শে ও ২৭শে জানুআরি ছাত্র-পুনর্মিলন দিবস পালিত হয় এবং বহু প্রাক্তন ছাত্র যোগদান করে। ৺কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা এবং অন্যান্য জন্মতিথি-উৎসব যথারীতি পালিত হয়। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী এই ছাত্রাবাসে ২৪শে ডিসেম্বর পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই স্মৃতি উপলক্ষে প্রতি বৎসরের ন্যায় উৎসব হয় এবং এই বৎসর জানুআরি মাসে মহারাজের জন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

১৫ই অগস্ট পুরাতন ছাত্রগণ নরাগতদের স্বাগত জানায়। উভয় পক্ষে একটি ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা হয়।

শিল্পপীঠ : ১৯৫৮ খৃঃ সরকারী সহায়তায় একটি শিল্পপীঠ খোলা হয়। ৫৪০ জন ছাত্র এখানে শিক্ষা গ্রহণ করে। অধ্যক্ষ ব্যতীত ২৪ জন অধ্যাপক, ২ জন ফোরম্যান এবং ২০ জন মিস্ত্রী উপদেষ্টা আছে। শিল্পপীঠের জন্য স্বতন্ত্র লাইব্রেরিতে ২,৫৫৭ বই আছে এবং ২ খানি দৈনিক ও ১২ খানি সাময়িক পত্র রাখা হয়।

এল. সি. ই. ছাত্রদের জন্য ১৬ই নভেম্বর মধুপুরে সার্ভে ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রায় একমাস তাহারা সেখানে থাকে। তৃতীয় বার্ষিক মেকানিকাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়রিং-এর ছাত্রগণ মাদ্রাজ, বোম্বাই, নূতন দিল্লী ইত্যাদি স্থানে তাহাদের শিক্ষা-সফরে যায়।

বৃন্দাবন : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, ১৯৬২-৬৩ খৃঃ কার্যবিবরণীর তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। চক্ষুরোগী সহ মোট ২,১২১ রোগী হাসপাতালে স্থান পায়। তন্মধ্যে ১,৪৫০ জন আরোগ্য লাভ করে, ৪৯৯ জন কিছুটা উপকৃত হইয়া চলিয়া যায়, ৯৩ জনকে অন্য কারণে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং ৫৩ জন চিকিৎসাধীনে আছে। গড়ে প্রত্যহ হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ৪৮ জন। এই বৎসর চক্ষু অস্ত্রোপচার সহ মোট ৮০৯টি অস্ত্রোপচার করা হয়।

নন্দবাবা চক্ষু হাসপাতাল : ১৯৪৩ খৃঃ বোম্বাইএর শেঠ বানারসীদাস ভগবানদাস ও পহলাদ্রাই রামেশ্বরদাসের দানে এই হাসপাতাল খোলা হয় এবং তাহাদেরই সাহায্যে প্রধানতঃ চলিতেছে।

ডিস্পেন্সারী : এখানে এই বৎসর মোট ৪৬,৯৪১ নূতন রোগী এবং মোট পুরাতন রোগী ১,৭০,৯৩০ জনকে চিকিৎসা করা হয়। চক্ষু-রোগী সহ মোট ১,৯৭৩ জন রোগীকে অস্ত্র-চিকিৎসা করা হয়। গড়ে এই বিভাগে ৫৯৭ জনকে প্রত্যহ চিকিৎসা করা হয়।

হোমিওপ্যাথি বিভাগ : সেবাশ্রমে একটি হোমিপ্যাথি বিভাগও আছে এবং এই বিভাগে বৎসরে ৭,৮৮৪ নূতন রোগী এবং ১৭,৬৩৯ পুরাতন রোগীকে চিকিৎসা করা হয়।

এক্‌স্‌রে বিভাগ : শেঠ শ্রীনটবরলাল, এম. ছিনাই, শেঠ শ্রীরতনসী চাম্পসী এবং বোম্বাইএর অপর দাতাদের নিঃস্বার্থ চেষ্টায় ১৯৪৭ এবং ১৯৫৫ খৃঃ এক্‌স্‌রে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভব হয়। মোট ৪৯৭ রোগীকে এক্‌স্‌রে করা হয়।

ক্লিনিক্যাল লেবরেটরীতে ৩,৯৬৬টি বিভিন্ন নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

১৯৬২ খৃঃ ১৮ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ লাইব্রেরি ঘরের ভিত্তি প্রোথিত করেন।

১৯৬৩ খৃঃ ১৭ই জানুআরি স্বামীজীর শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বাণী সংবলিত ২,৬০০ খানি হিন্দী পুস্তক এই উপলক্ষে বিতরণ করা হয়। ২০শে জানুআরি মথুরাতে অনুষ্ঠান করা হয়।

১৯৬৪ খৃঃ পর্যন্ত এই উৎসব চলিবে। 'হামারী মিলন-ভূমি' নামক একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মথুরা জিলার সর্বত্র নানারূপে জয়ন্তী উৎসব পালন করার কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৭৯ জন অভাবগ্রস্ত লোককে অর্থ সাহায্য করা হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি) **:** নূতন মন্দিরে প্রতি রবিবার বেলা ১১টার সময় কেন্দ্রাধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং বুধবার রাত্রি ৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃতা দেন।

জুলাই : 'স্বামী বিবেকানন্দ; সমুদ্রের সহিত নদীর মিলন', 'গীতার শিক্ষা'; 'ভারতীয় সন্ন্যাসী ও মঠ'; 'ঈশ্বরের মানবতা ও মানবের দেবত্ব'; 'মন কিরূপে স্থির এবং একাগ্র করা যায়'; 'চেতনার বিভিন্ন স্তর।'

সেপ্টেম্বর : 'ধ্যানের ফল'; 'কর্ম এবং পুনর্জন্মবাদ'; 'অস্থির মন—কিরূপে স্থির করা যায়'; 'নূতন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন-দিবসের বাৎসরিক উৎসব'; 'গুরু ও শিষ্য।'

অক্টোবর : 'আমরা কেন কষ্ট পাই?' 'পৌরুষ ও অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা'; 'আমি সর্বদা তোমার সঙ্গে আছি'; 'শ্রীকৃষ্ণ : তাঁহার তরবারি ও বাঁশী'; 'আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন আমরাই করি'; 'আমাদের জীবনে অদৃশ্য-শক্তি'; 'আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রমাণ', 'দেহ ও মন আধ্যাত্মিক করার উপায়'; 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ।'

নভেম্বর : 'মৃত্যুঞ্জয়ী না হইলে সত্য উপলব্ধি হয় না'; 'চেতন হইতে অতিচেতনে'; 'অনাসক্তি অভ্যাসের উপায়'; 'মানুষ—আত্মার সন্ধানে'; 'সাধু, ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ ও অবতার'; 'পাশ্চাত্যে বেদান্তের কেন প্রয়োজন?' 'স্বামী প্রেমানন্দকে আমি যেমন জানিতাম'; 'আধ্যাত্মিক দর্শন।'

পুরাতন মন্দিরে প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় ধ্যান ও ছান্দোগ্য উপনিষদের ক্লাস করেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করেন। নূতন মন্দিরে প্রতিদিন পূজা হয়, বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা করিলে ধ্যান-ধারণা করিতে পারেন।

স্বামী অচ্যুতানন্দের দেহত্যাগ

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৯ই ফেব্রুআরি রাত্রি ১টার সময় বারাণসী-ধামে স্বামী অচ্যুতানন্দ (শ্যামাচরণ মহারাজ) ৭৯ বৎসর বয়সে শান্তিপূর্ণভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি নিম্ন-রক্তচাপে ভুগিতেছিলেন। গত ৭ই ফেব্রুআরি তাঁহাকে সেবাশ্রমে ভরতি করা হয়।

স্বামী অচ্যুতানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। ১৯১৩ খৃঃ তিনি বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করেন। মঠ হইতে প্রেরিত হইয়া নানাস্থানে তিনি আর্ত ও বন্যাপীড়িতের সেবা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৬ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৬ খৃঃ হইতে তিনি বারাণসীতে ছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বোম্বাই : স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর সমাপ্তি-উৎসব উপলক্ষে প্রধান শিক্ষকদের সমিতি ও ছাত্রদের সমাবেশ সমবেতভাবে 'শিক্ষা' সম্বন্ধে আলোচনা-সভার আয়োজন করিয়াছিল। জন-সভায় ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন এবং বাগ্মিতা-প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। বৃহত্তর বোম্বাই করপোরেশনের সিদ্ধান্তে ঘোড় বন্দর রোডের নামকরণ হইয়াছে—'স্বামী বিবেকানন্দ রোড'। স্বামীজীর স্মৃতিরক্ষার স্থায়ী চিহ্ন হিসাবে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীকে 'বিবেকানন্দ ফাউণ্ডেশনের' সভাপতি-ট্রাস্টি করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা তুলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য—স্বামীজীর বাণী এবং বেদান্তদর্শনের শিক্ষা ভারতে ও বিদেশে প্রচার করা।

নাসিক : স্থানীয় শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশন, বিভিন্ন স্থানে ২৬টি বক্তৃতা, বিভিন্ন কলেজে রচনা-প্রতিযোগিতা, সমগ্র জিলায় ছয় হাজার ছাত্রের মধ্যে স্বামীজীর প্রতিকৃতি বিতরণ, স্বামীজীর গ্রন্থাবলী-সংবলিত একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি আয়োজিত হইয়াছিল।

পুনা : ১৯৬৩ খৃঃ মে মাসের শেষ সপ্তাহে সাতদিনব্যাপী জনসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্ম-সম্মেলন, কীর্তন, নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত-সম্মেলন প্রভৃতি শতবার্ষিকীর প্রধান কর্মসূচী ছিল।

আবুপাহাড় (রাজস্থান) **:** স্থানীয় শতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে ১৯৬৩ খৃঃ ২০শে জানুআরি রামকৃষ্ণ আশ্রম-প্রাঙ্গণে জনসভায় বক্তৃতা, ছাত্রদের আবৃত্তি, পুরস্কার-বিতরণ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়।

আমেদাবাদ : ৬.১.৬৪ তারিখে স্বামীজী মহারাজের ১০২তম জয়ন্তী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (মণিনগর) আমেদাবাদে দিবসব্যাপী বিভিন্ন কার্যসূচী দ্বারা প্রতিপালিত হয়। প্রভাত হইতে বিশেষ পূজা, মঙ্গল আরতি, ভোগরাগ এবং ৯-৩০ হইতে দুপুর পর্যন্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও নবচণ্ডী পাঠ। বৈকাল ৫টা হইতে বিভিন্ন মনীষীর স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনসূচক লেখা পাঠ ও প্রাসঙ্গিক প্রবচন, শ্রীশ্রীকথামৃত পাঠ, শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ পাঠ ও স্বামিশিষ্য-সংবাদ পাঠ। পাঠচক্রের কার্যক্রমে বেদমন্ত্র ও ভজন-কীর্তন মুখ্য ছিল। রাত্রি ১০টায় প্রসাদ পাইবার পর উৎসবের কার্যসূচী সম্পন্ন হয়।

গত ৭.১২.৬৩ তারিখে অনুরূপ কার্যসূচী দ্বারা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ১১১তম জয়ন্তী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (মণিনগর) আমেদাবাদে প্রতিপালিত হয় এবং ১৪.২.৬৪ দিবসব্যাপী বিভিন্ন কার্যসূচী দ্বারা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৯তম জয়ন্তী প্রতিপালিত হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও নবচণ্ডী পাঠ মুখ্য ছিল। সন্ধ্যায় শ্রীবিবেকানন্দ পাঠচক্রের কার্যক্রমে ভজন কীর্তন ও পাঠ হয়।

স্থানীয় টাউনহলে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর অধ্যক্ষতায় ১৬.২.৬৪ তারিখে রবিবার বৈকালে বিবেকানন্দ শতাব্দীর পূর্ণাহুতি এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৯তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শতাব্দী-সমিতির সভাপতি শ্রীমতী সরলাদেবী সারাভাই স্বাগত-প্রসঙ্গে রাজ্যপাল মহোদয়ের লিখিত চিঠি পাঠ করিয়া সকলকে শুনান। শতাব্দী সমিতির প্রধান সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ ঠাকুর বর্ষব্যাপী কার্যের রূপরেখা প্রকাশ করেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী ভূতেশানন্দজী (রাজকোট) আচার্য শ্রীমতী ইন্দুমতী মেহতা, পণ্ডিত

শ্রীবিষ্ণুদেবজী, অধ্যাপক আলাবক্স শেখ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর জীবন ও উপদেশ সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। সভার অন্তে শতাব্দী-সমিতির সহ-সভাপতি শ্রীআম্বালাল হিম্মতলাল ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভার প্রারম্ভে ও অন্তে কুমারী নির্মলা ব্যাস স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে গুজরাতী ভজন গান করেন।

শ্রীবিল্লীপুত্তুর (রামনাদ)ঃ এই গ্রামে বিখ্যাত আলোয়ার শ্রীমতী অণ্ডাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ২রা হইতে ৪ঠা নভেম্বর এখানে নবনির্মিত লাইব্রেরির সুবৃহৎ হলে বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সভায় মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ ভাষণ দেন। 'শ্রীশ্রীমা' ছায়া-চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রাতে 'গীতা' ও সন্ধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ—সমন্বয়ের অবতার' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ে ও কলেজে সভার আয়োজন করা হইয়াছিল।

সিউড়িঃ বিবেকানন্দ বাণিজ্য বিদ্যাপীঠে স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৬ই জানুআরি পূজা পাঠ ও ভজন হয়। ১১ই ও ১২ই জানুআরি আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজী-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। দশবৎসর-বয়স্ক বীরবালক শ্রীধীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তাহার সাহসিকতার পুরস্কার-স্বরূপ 'বিবেকানন্দ বীরচক্র' স্বর্ণখচিত রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হয়। এই বালক নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া পুষ্করিণীতে নিমজ্জমান তাহার অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ একটি বালকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

তমালতলা (নোয়াখালি)ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ প্রিয়নিকেতনে গত ১৮ই হইতে ২১শে পৌষ শতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা, সংকীর্তন, ভজন, পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা উৎসবের অঙ্গ ছিল।

দমদমঃ পার্ক মন্দির-প্রাঙ্গণে গত ৯ই ফেব্রুআরি সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামীজীর শতবার্ষিকীর সমাপ্তি-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে স্বামীজীর প্রতিকৃতি লইয়া বন্দনাগীতি গাহিতে গাহিতে নগর-পরিক্রমা খুবই সুন্দর হইয়াছিল। অপরাহ্নে শ্রীবিনয়কুমার সেন 'কথামৃত' পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সভা-পতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ও জীবানন্দ ভাষণ দেন।

কৃষ্ণনগরঃ বিবেকানন্দ-জন্মজয়ন্তী উৎসবের পরিসমাপ্তি উপলক্ষে স্থানীয় আশ্রম-প্রাঙ্গণে চতুর্দশদিবসব্যাপী মেলা ও প্রদর্শনী গত ৬ই জানুআরি শেষ হইয়াছে। এই মেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রেরিত স্বামীজীর বাল্যকাল হইতে মহাসমাধি পর্যন্ত জীবনালেখ্যের পুতুল-প্রদর্শনী ও বিভিন্ন জেলার উৎপন্ন দ্রব্যের প্রদর্শনী। স্বামী মৃত্যুঞ্জয়া-নন্দ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বিভিন্ন দিনে কথকতা, শোভাযাত্রা, কীর্তন, রামায়ণ-গান, অভিনয়, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের সভায় স্বামী জীবানন্দ 'স্বামীজীর ভাবাদর্শ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

কৈলাসহর (ত্রিপুরা)ঃ বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কমিটির ব্যবস্থাপনায় গত ২০শে ও ২১শে জানুআরি স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসবের শেষ পর্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা পাঠ, কীর্তন ভজন, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অঙ্গ ছিল। আয়োজিত সভায় স্বামী আদীশ্বরানন্দ, শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

অন্নপূর্ণা-মন্দির (কলিকাতা ৪) : শ্রীশ্রী৺তারকনাথ জীউ ও ৺অন্নপূর্ণা দেবীর ঠাকুর-বাড়ীতে গত ১৪ই অক্টোবর হইতে ১৮ই অক্টোবর পাঁচদিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের শতবার্ষিকী জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়।

১৪ই অক্টোবর প্রত্যুষে বেদপাঠ ভজন, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পূজা এবং হোম, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন একশত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। ঐ সভাগুলির মাধ্যমে স্বামীজীর অলোকসামান্য জীবনের সুমহৎ অবদানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়। বিভিন্ন দিনের সভায় অংশগ্রহণকারী বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, নিবৃত্ত্যানন্দ, জীবানন্দ ও শ্রীপাচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্চম ও শেষ দিনের অনুষ্ঠানটি কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে ৬০ জন ভক্ত মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা স্বামীজীর বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় : ৩০শে ও ৩১শে জানুআরি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসব বর্ধমান বিশ্ব-বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার প্রভাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক ও কর্মিবৃন্দ সঙ্গীতসহ স্বামীজীর প্রতিকৃতি বহন করিয়া গোলাপবাগ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে সমবেত হন। তৎপর উপাচার্য শ্রীব্রজকান্ত গুহ মহাশয় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে একটি করিয়া 'স্বামীজীর বাণী' নামক পুস্তিকা বিতরণ করেন। অপরাহ্ন দুই ঘটিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে (রাজবাটী) উপাচার্য শ্রীগুহের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী স্বামীজীর রচনা হইতে পাঠ করেন। অতঃপর শতবার্ষিকী কেন্দ্রীয় উৎসব-কমিটীর সাধারণ সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী রঙ্গনাথানন্দ স্বামীজীর মহতী প্রেরণা—মানুষ গঠনের আদর্শ সুললিত ভাষায় বর্ণনা করেন এবং অধ্যাত্মবাদের উপর মানুষের ব্যক্তিত্ব, দেশের রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সমাজ-জীবন গঠন করিতে আহ্বান জানান। শুক্রবার দ্বিতীয় অধিবেশনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। পরিশেষে "পূর্ব ও পশ্চিম" নামক একটি নাট্যালেখ্য পরিবেশিত হয়।

জাপান : জাপানে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য একটি কমিটি স্থাপিত হয়। কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর হেজিমি নাকামুরা, সাধারণ সম্পাদক মিঃ এস. ইমাসোকা এবং পৃষ্ঠপোষক ভারতীয় দূত শ্রী মেরহোত্র। কমিটির উদ্যোগে টোকিও, কিওটো, ওসাকা প্রভৃতি স্থানে জনসভায় বক্তৃতা, ছাত্রদের ধর্মসম্মেলন, স্মারকগ্রন্থ প্রকাশন, স্বামীজীর জীবনী ও গ্রন্থাবলীর অনুবাদ, ধর্মমহাসভা, ভারতে সমাপ্তি-উৎসবে প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি কর্মসূচী সম্পন্ন হইয়াছে।

সাকাই-ওসাকার রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আকাদামির উদ্যোগে গত মে মাস হইতে জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ জাপানে যান। নাগাসাকি হইতে নাগোয়ের পর্যন্ত আটটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা এবং কোবিতে একটি আন্তর্জাতিক ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান-গুলি সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং যোগদানকারীদের মনে গভীর রেখাপাত করে।

বক্তৃতা-সফর

গত ৫ই হইতে ২২শে ফেব্রুআরি মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহর ও কেলোমাল, মহিষাদল, নাটশাল, ডিমারী, রাধাবল্লভপুর, লক্ষ্মীবসান, রামপুর, পুরুষোত্তমপুর, নন্দীগ্রাম, সুভাষপল্লী, কল্যাণচক, নরঘাট, ব্যবর্তা প্রভৃতি গ্রামে গ্রন্থাগারে ও বিদ্যায়তনে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছাত্রচিত্রযোগে 'ছাত্রজীবনের কর্তব্য ও স্বামী বিবেকানন্দ', 'জাতীয় জাগরণে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ', 'বিশ্বসভ্যতায় স্বামীজীর দান', 'হিন্দুধর্ম ও ও সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে মোট ১৭টি বক্তৃতা এবং স্বামী অন্নদানন্দ ৯টি ভাষণ দেন। বিভিন্ন স্থানে শ্রোতার সংখ্যা ছিল ২০০ হইতে ১,৫০০।

গদাধরের মেলা

বড়-আন্দুলিয়া (নদীয়া) : এই গ্রামে লোকসেবা-শিবিরের উদ্যোগে গত ২৭শে হইতে ২৯শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাজীবনের মহিমা ও অমৃতবাণীর সহিত গ্রাম্য জনসাধারণের যাহাতে পরিচয় ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে 'গদাধরের মেলা' আয়োজিত হইয়াছিল। গ্রামীণ শিল্প ও সংস্কৃতিকে পুনর্জীবন দিবার মহৎ সংকল্পও ছিল এই মেলার অন্যতম লক্ষ্য। জেলার কুটির জাত দ্রব্যাদি ও অন্যান্য জিনিসের প্রদর্শনী, বাউলগান, কীর্তন, কবিগান, ছায়াচিত্র ও অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী অবলম্বনে বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী নিরাময়ানন্দ, অধ্যাপক রেজাউল করীম প্রভৃতি। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি নূতন মন্দির হইয়াছে। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণ এই মেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সানন্দে যোগদান করেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বাস্তু-সেবাকার্য

আবেদন

পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে গেদে সীমান্তে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন; চিড়া, গুড়, কাপড়, কম্বল প্রভৃতি বিতরণ করিতেছেন। এই কার্যের জন্য সহৃদয় দেশবাসীর কাছে আমরা অর্থের জন্য আবেদন করিতেছি। সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ—বেলুড় মঠ, জিলা—হাওড়া, এই ঠিকানায় সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ, হাওড়া
৬. ৩. ৬৪.



রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বাস্তু-সেবাকার্য

আবেদন

পূর্ব পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত আশ্রয়প্রার্থী ভ্রাতাভগিনীদিগের চরম দুর্ভাগ্যের কথা সর্বজনবিদিত, ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যহ সহস্র সহস্র নরনারী ভারতে আসিয়া পৌঁছিতেছেন। খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি, ঔষধ এবং পুনর্বাসন-ব্যবস্থা তাঁহাদের আশু প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ মিশন গত ৫ই মার্চ হইতে এই হতভাগ্য নরনারীদিগকে পশ্চিমবঙ্গ-সীমান্তে গেদে নামক স্থানে পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং পেট্রাপোল নামক স্থানে রান্না করা খাদ্য বিতরণ করিতেছেন। অন্য স্থানেও সেবার কর্মক্ষেত্র বিস্তার করিবার বাসনা রামকৃষ্ণ মিশনের রহিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মিশন এই সেবাকার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে চালাইয়া যাইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সহৃদয় জনগণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইতেছে। সকল সাহায্য—তাহা যত সামান্যই হউক—'সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া'—এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ
সাধারণ সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ, হাওড়া
১. ৪. ৬৪

কথাপ্রসঙ্গে

মানুষের ব্যাপক অবনতি

যে-কোন কারণেই হউক, দেখা যায়—একই সময়ে পৃথিবীতে বহু মহানুভব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিতেছেন এবং সাধারণ মানুষও সেই সঙ্গে কিছুটা উন্নততর চিন্তা করিতেছে, স্বার্থত্যাগ করিয়া সমষ্টি-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিতেছে, আবার কিছুদিন পরে সেই ভাবের জোয়ার মন্দীভূত হয়, দুর্বলচিত্ত বা দুর্বৃত্ত ব্যক্তিগণই জন-জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, সাধারণ মানুষও স্বার্থপর ভোগপরায়ণ হইয়া নিজের ও সমাজে অনেকের দুঃখভার বৃদ্ধি করে। বর্তমান বিশ্ব—অন্ততঃ মনোজগতে যে এইরূপ এক ভাঁটার মধ্য দিয়াই চলিতেছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গত মহাযুদ্ধে তথাকথিত আদর্শগত জয়-লাভের পর হইতে মানবমনের এই পতন শুরু হইয়াছে; আর একটি মহাযুদ্ধ এড়াইবার জন্য পাশ্চাত্যজাতিগুলি যেন 'শয়তানের নিকট আত্মাকে বিক্রয়' করিতেও প্রস্তুত। আগামী যুদ্ধ অন্যত্র হয় হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, উহা যেন আমার কেশ স্পর্শ না করে; ভাবটা এই—আমরাই উহার শেষ সুফল ভোগ করিব। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরই জের চলিয়াছে নানাদেশে নানাভাবে—কোরিয়ায়, কাশ্মীরে, কঙ্গোয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।

সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্‌বাস্তু নরনারী যেভাবে উৎপীড়িত অত্যাচারিত ও অপমানিত হইয়া ভারতে আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ হয়, আমরা 'সভ্য' বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেছি—না মধ্যযুগের নাদিরশাহী নৃশংসতা বা চেঙ্গিজ খাঁর বর্বরতার সম্মুখীন হইয়াছি। তফাৎ এই যে, এ যুগে উৎপীড়কগণ আদিম অস্ত্রশস্ত্রের সহিত বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রে অধিকতর সুসজ্জিত এবং সংঘবদ্ধ। তাহাতে দুঃখের মাত্রা যেমন বাড়িয়াছে, দুর্ভোগও তেমনি দীর্ঘস্থায়ী হইতেছে। উৎপীড়ক-গণ এই বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি এতদিন নিজেদের উন্নতির জন্য কাজে লাগাইলে তাহাদের ঈপ্সিত উন্নতি হইত এবং অযথা ব্যাপক পরপীড়নের পাপে লিপ্ত হইয়া স্বার্থসুখের সন্ধান করিতে হইত না। পরপীড়ন যে পরিণামে নিজেরই দুঃখকষ্টের কারণ হয়, অন্তর্জগতের এই সহজ প্রাকৃতিক নিয়মটি বুঝিবার মতো শুভবুদ্ধিরও আজ একান্ত অভাব। আজ সীমান্তের ওপারের পাপবুদ্ধি এপারেও সংক্রামিত হইতেছে। দুর্বলকে পীড়ন করা, দরিদ্রকে শোষণ করা, অজ্ঞ জনসাধারণকে বঞ্চনা করা, ধর্মের জন্য মানুষকে নির্যাতিত করা—সংক্রামক রোগের মতো সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িলে কেহ কি আর শেষরক্ষা করিতে পারিবে? কথায় বলে—রোগ বা অগ্নিকে বাড়িতে দিতে নাই: বাড়িয়া গেলে তখন আর তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। উহা ক্রমশই বাড়িয়া যায়, সব ছারখার করিয়া তবেই শেষ হয়। আমরা কি সেই পরিণামের দিকেই চলিয়াছি?

ভারতে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছি বলিয়া বড় বড়াই করিয়া থাকি! কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতা বা গণতন্ত্রের ছায়ামাত্র নাই। রৌদ্র মরুভূমির মধ্যে সুরম্য উদ্যান রচনার প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয়; কিন্তু কার্যতঃ তাহা কতটা সম্ভব? উদ্যান-রচনার পূর্বে মরুপ্রান্তে বন-রচনা প্রয়োজন, নতুবা মরুর বালুকারাশি অনুপ্রবেশ করিয়া উদ্যানকে গ্রাস করিবে। এই সহজ সত্যটি আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে বুঝিতে পারি, তদনুযায়ী বনবিভাগকে বৃক্ষরোপণের নির্দেশও দিয়া থাকি, কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্রে

ইহা বুঝি না বা বুঝিয়াও কিছু করিতে পারি না, এমনই দুর্দৈব।

মানসিক অবক্ষয়ের এই ব্যাধি যে ভারতীয় উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ, তাহা নয়। পৃথিবীর তথাকথিত সকল সভ্যজাতিগুলির মধ্যেই এই মহাব্যাধির বিষ-বীজাণু ক্রিয়াশীল। যে ব্রিটেন ও আমেরিকা নাৎসীগণের ইহুদীপীড়ন ও গণ-হত্যাকে প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক অপরাধ বলিয়া মনে করেন এবং আজও তাহার বিচার-তদন্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারা পূর্ববঙ্গের হিন্দুপীড়ন ও গণহত্যায় এত নীরব কেন? পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ কি মানুষ নয়, তাহারা কি একটি জাতি নয়? আন্তর্জাতিক আইন-কানুনের কোনটিই কি তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে না? তাহাদিগকে রক্ষা করা দূরে থাক, প্রকারান্তরে গণতন্ত্রের আত্মনিয়োজিত এই রক্ষকগণ উৎপীড়ককেই সমর্থন করিতেছেন। ইহাই এ যুগের চরম দুর্লক্ষণ। ইহাই মানুষের ব্যাপক অবনতির সূচনা করিতেছে।

গারো পাহাড় অঞ্চলে কয়েক হাজার খৃষ্টান উদ্‌বাস্তুর আগমনের জন্য সমস্যাটি আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। বিশ্ব চার্চ-সংঘের টনক নড়িয়াছে, পোপের প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে; খৃষ্টান দেশগুলির নানা সংঘ সমিতি সাহায্য করিতে তৎপর হইয়াছেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর আর্তনাদ বিশ্বজনের মনে বিশেষ কিছু আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। অবশ্য তাহার কারণ—হিন্দুর দুর্বলতা, সংঘবদ্ধ কার্যের অভাব এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে রাষ্ট্রের উদাসীনতা। কিন্তু এখন খৃষ্টান উদ্‌বাস্তুর আগমনে ব্যাপারটি একটু ব্যাপক হওয়ায় আর ভয় নাই, আর কেহ বলিতে পারিবে না—ভারতরাষ্ট্র সাম্প্রদায়িক! এখন শুধু হিন্দুই—আসিতেছে না, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টানগণও নিপীড়িত হইয়া আসিতেছে; তবে অসহায় দুর্বল হিন্দুই আত্মরক্ষাহীন, কোন রাষ্ট্রশক্তিই তাহার পিছনে নাই।

ধর্মের নামাবলী ছাড়া আমরা আজও মানুষকে চিনিতে পারি না; জাতিধর্ম-বর্ণ-(গাত্রবর্ণ)-নির্বিশেষে নিপীড়িত মানবের সেবা করিবার প্রবৃত্তি এখনও 'সভ্য' জাতিগুলির মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। ইহাই বর্তমান সময়ের একটি বিশেষ অশুভ লক্ষণ! মুখে সকলেই বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়—নিজ দেশ, জাতি বা দলের ঊর্ধ্বে কেহই উঠিতে চায় না বা পারে না। এইভাব দূর করিতে না পারিলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যেই শক্তিশালী দুর্বৃত্তদলের হাতে দুর্বল 'ভাল-মানুষে'র দল বারংবার নির্যাতিত হইতে হইতে নিশ্চিহ্ন হইবে।

বিশ্বশাসনের ভার কি অবশেষে দুর্বৃত্তদলের হাতেই গিয়া পড়িবে? এখনও সময় আছে। প্রকাশ্য দুর্বৃত্ততাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন করা মনুষ্যত্ব-বিরোধী; ইহা রোধ করিতে হইবে। স্বামীজীর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি: সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে সকল শুভশক্তি প্রয়োগ কর।

সর্বদা মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মন্দের মতো ভালোও সংক্রামক! আমরা যদি আমাদের দেশে—সমাজে ও রাষ্ট্রে শুভবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি এবং যথোপযুক্তভাবে সম্মিলিতভাবে ঐ শক্তি কাজে লাগাইতে পারি, তবেই ক্রমবর্ধমান অশুভশক্তি পরাভূত হইবে। মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব বা শুভ ভাবকে আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তাহাকে জাগ্রত করা বড়ই কঠিন সাধনা। এই সাধনায় সফল হইলে তবেই মানুষের ব্যাপক অবনতির গতি রুদ্ধ হইবে।

শ্রীভগবান্ বুদ্ধ*

স্বামী আদিনাথানন্দ

ভারতবর্ষেই বিগত চার হাজার বৎসরব্যাপী দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরিবর্তনের পথে সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হয়ে নানা নূতন নৈতিক ধারণা এবং ধর্মমত প্রচার করেছেন, যেগুলি মানবজাতির চিন্তাধারা, সমাজগঠন ও কৃষ্টিতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। তাঁরা এক অতীন্দ্রিয় জগৎ আবিষ্কার করেছেন—সত্য শিব সুন্দর জগৎ। শ্রেষ্ঠ অনুভূতির দৃঢ় ভিত্তি আশ্রয় ক'রে তাঁরা প্রচার করেন যে, মানুষের বুদ্ধি ও মনঃশক্তির অতীত আত্মোপলব্ধি-জাত শান্তির তুলনায় অহংকার, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য ও পার্থিব গৌরব অকিঞ্চিৎকর।

কবি জয়দেব ভগবান্ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার ব'লে কীর্তন করেছেন। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব পূর্ব গোলার্ধে এক আধ্যাত্মিক জোয়ার নিয়ে আসে, তিনি ছিলেন এমনই একটি আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক। আর্নল্ডের দেওয়া তাঁর 'এশিয়ার আলো' নাম সার্থক, কারণ গুপ্ত সম্রাট্‌দের শাসনকালে হিন্দু নবজাগরণ পর্যন্ত এক হাজার বৎসরেরও বেশী সময়, ভারত-ভূমিতে তাঁর আবির্ভাবে জীবে দয়া প্রেম ও অহিংসায় গুরুত্ব আরোপ ক'রে জগৎ-কৃষ্টির ভিত্তি স্থাপিত হয়, যা পূর্ব গোলার্ধে অনেক দেশকে সভ্য ক'রে তুলেছিল।

এই মহাদিন তিনটি কারণে পবিত্র। প্রথম কারণ ভগবান্ বুদ্ধ এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন, এবং এমন যোগাযোগ ঘটে যে, এই দিনই বিখ্যাত বোধিবৃক্ষ-তলে বুদ্ধগয়াতে তিনি 'বোধি' লাভ করেন। অবশেষে এই দিনই তিনি 'মহাপরিনির্বাণ' লাভ করেন। মানবজাতির ইতিহাসে এই স্মরণীয় দিনটিকে আসুন আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আপনারা জানেন—'বুদ্ধ' শব্দ একটি বিশেষণ, কোন নামবাচক বিশেষ্য নয়, ইহার অর্থ 'প্রবুদ্ধ'। বাসনা জয় ক'রে গৌতম শাক্যমুনি যখন নির্বাণের শান্তি লাভ করলেন, যখন জীবনের স্বরূপ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞান দূর হ'ল, যখন ধ্যানের গভীরতায় চতুর্বিধ মহাসত্য ও ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার পশ্চাতে এক নৈতিক শৃঙ্খলা সহসা তাঁর চিত্তে স্ফুরিত হ'ল এবং তিনি অন্তরে বাহিরে প্রকৃতির নিগড় হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হলেন, তখনই তাঁর নাম হ'ল 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানপ্রাপ্ত।

নির্বাণ অবস্থা উপলব্ধির পর তাঁর আনন্দোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি এত প্রবল হয়েছিল যে, কথিত আছে, তিনি সেই আনন্দবন্যা সংযত করার পূর্বে প্রায় এক সপ্তাহ মত্ত হস্তীর ন্যায় বিচরণ করেছেন। যুগপৎ তাঁর হৃদয় মহাকরুণা, ক্লিষ্ট মানবের জন্য অপরিসীম সহানুভূতি পরিপূর্ণ হ'ল এবং তিনি মানবজাতিকে উদ্ধারের পথ দেখাতে প্রথম সারনাথে এলেন। বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বৈশিষ্ট্য কীর্তন ক'রে বলেছেন, তিনি আদর্শ কর্মযোগী, তাঁর মধ্যে অনুপম হৃদয়বত্তার সহিত বুদ্ধির সমাবেশ, এবং কদাচ-দৃষ্ট আত্মশক্তির বিকাশ। এই শক্তিমান্ আধ্যাত্মিক অতিমানব নিঃস্বার্থতার মূর্ত বিগ্রহ—তিনি অপরের জন্য জীবিত ছিলেন এবং সকল মানুষকে আত্মবৎ ভালবাসতেন। মনে হয়, ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত মহত্তম আধ্যাত্মিক

---

* গত বৎসর জামসেদপুর বুদ্ধজয়ন্তী উৎসবে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ : শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদর্শ রূপায়িত করতেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন।

স্বামীজীর মতে বুদ্ধ ইতিহাসে অদ্বিতীয়। তিনিই সর্বপ্রথম দেখান সর্বোচ্চ ধর্ম—সর্বজীবে প্রেম, সমদর্শিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণেই সম্ভব, অনুষ্ঠানে মতবাদে বা কল্পনায় নয়। তিনি বলেছেন, বুদ্ধের সত্যানুসন্ধান, রাজকীয় গৌরব ও সংসার-সুখ ত্যাগ, কঠোরতা ও আত্মনিগ্রহ সকলই পরার্থে। মানবজাতিকে বহু প্রকার দুঃখ ও ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্য, এই জীবনেই নীচ প্রবৃত্তি, আত্মাভিমান ও অহংকার জয় ক'রে যে-পথে শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়, তা দেখাতে তিনি ঐ সকল সাধনা করেছিলেন।

শ্রীবুদ্ধের চমৎকার বাণীর কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বলছি। তিনি কোন মতবাদ, ধর্মোপদেশ, আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষা দেননি বা ঐ সকল অনুমোদন করেননি। তাঁর শিক্ষা ছিল সরল, নৈতিক, উদার এবং বিশ্বজনীন। প্রথমতঃ তিনি বেদবিরোধী ছিলেন, তাই তিনি ঈশ্বরের প্রকৃতি, শাশ্বত আত্মা, বিশ্বের সৃষ্টি-লয় ইত্যাদি আলোচনা করতেন না। কেউ ঐ রকম প্রশ্ন করলে তিনি মৌন থাকতেন। এ রকম কেন করতেন? ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, তা নয়; তাঁর নীরবতার কারণ—এই সকল বিষয় যুক্তিতর্ক দ্বারা সমাধান করা যায় না। তাঁর সময়ে ভারতবর্ষ অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত বহু দার্শনিক সম্প্রদায়ে ভরা ছিল এবং তারা অতিসূক্ষ্ম তর্কে জনসাধারণের বুদ্ধি বিভ্রান্ত ক'রত। এগুলি ধর্মজীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন ক'রত না, সুতরাং জনসাধারণ প্রকৃত ধর্মশিক্ষাহীন ছিল। ভগবান্ বুদ্ধের মতে ধর্ম অনুভূতির বিষয়, শুধু তত্ত্ব ও মতের স্বীকৃতি নয়, ধর্ম আমাদের সত্তার রূপান্তর। ধর্ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বর্ধিত করা নয়, পরন্তু নিজ ব্যক্তিত্ব পরমাত্মার সমপর্যায়ে উন্নীত করা।

ধর্ম পুরুষার্থের প্রত্যক্ষঅনুভূতি। তাই তিনি নৈতিক প্রস্তুতি, দেহমনের সংযম অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস সমর্থন করতেন। এইভাবে মানুষের মনের ময়লা ধুয়ে যায় এবং বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, তখনই পরম সত্যোপলব্ধি সম্ভব। তিনি বলতেন, 'সৎ, সত্যবাদী, স্বার্থশূন্য হও, অপরকে ভালবাসো, বাকিটা আপনিই হয়ে যাবে।' মন ও বুদ্ধি একবার শুদ্ধ হ'লে উচ্চতর জ্ঞান ও নির্বাণের শান্তি এবং মুক্তি আস্বাদন করা যায়।

তিনি একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত-সহায়ে এই বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাতে চেষ্টা করতেন—যদি কেউ বিষাক্ততীরবিদ্ধ হয়, আমাদের সমূহ কর্তব্য তার কষ্টের লাঘব করা; কি রকম তীর ইত্যাদি বিচার করা নয়। সুতরাং তিনি বলেছেন, 'তোমরা জন্ম ব্যাধি জরা এবং মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভুগছ, জীবনে অসংখ্য অন্য ক্লেশ আছে। এই সকল যন্ত্রণার কারণ দূর ক'রে উদ্ধার পাবার চেষ্টা কর। পুরোহিতদের কাছে যাবার দরকার কি?' উপনিষদের ঋষিদের ন্যায় তিনি আবিষ্কার করেন, 'মানুষের নীচপ্রবৃত্তিই সকল ক্লেশের মূল। অষ্টশীল অভ্যাসদ্বারা তা দূর কর এবং সুখী হও।' এই সরল কথা সাধারণ মানুষের মন আকৃষ্ট করে এবং দুঃখকষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য অসংখ্য মানুষ তাঁর জ্ঞানগর্ভ বচন-সুধা পান করতে দলে দলে সমবেত হয়।

বুদ্ধ ভারতে প্রচলিত-ধর্ম-বিরোধী-রূপে আবির্ভূত হন। তিনি বেদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। সেকালের ধর্মাচার পৌরোহিত্য ও জীবহত্যা দ্বারা কলুষিত ছিল। বুদ্ধের মতে এগুলি ধর্মের বহিরঙ্গ; ধর্মের অন্তরঙ্গ সাধন হচ্ছে প্রেম, সহানুভূতি, মনের

স্থৈর্য ও নৈতিক গুণরাজি। তিনি সর্বপ্রকার ন্যায়বিরুদ্ধ সুবিধা ধ্বংস করেন ও সাম্য প্রচার করেন। বুদ্ধের বাণী শিষ্যদিগকে অনুপ্রাণিত ক'রত: 'সকল মানুষকে শোনাও—দরিদ্র, নীচ, ধনী ও উচ্চ সকলে এক ; এবং নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হয়, তেমন এই ধর্মে সকল জাতি এক হয়।' দরিদ্র ও নির্যাতিতদের জন্য তাঁর গভীর প্রেম সর্বজনবিদিত। যদিও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং রাজোচিত ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন, তবুও তিনি দরিদ্র ও নির্যাতিত জনসাধারণের মাঝে নিঃস্ব ভিখারীর বেশে এগিয়ে আসেন। তাই তিনি পণ্ডিতদের ভাষা সংস্কৃত ত্যাগ ক'রে ঐ সময়ের প্রকৃত নিপীড়িত জনসাধারণের অমার্জিত ভাষা প্রচার-কার্যে ব্যবহার করেন। এদেরই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিত্রাণের চেষ্টা করেন তিনি।

বুদ্ধ বিচারের যুগ প্রবর্তন করেন, তাঁর ঘোষণা ছিল এইরূপ: প্রাচীন পুঁথিতে যা আছে, তাই বিশ্বাস ক'রো না, তোমার সহজাত বিশ্বাসের দরুণ বিশ্বাস ক'রো না, কারণ শিশুকাল থেকে তুমি বিশ্বাস করতে শিখেছ, কিন্তু সমস্তই বিচার ক'রে দেখ এবং যদি মনে কর, এতে সকলের ভাল হবে, তবে বিশ্বাস কর ও অভ্যাস কর এবং অপরকে এই আদর্শ অনুসরণে সাহায্য কর।

মানবজাতির ধর্মেতিহাসে বুদ্ধই দেখান যে, মানুষ নিজের চেষ্টায় এবং আত্মবিশ্বাসে ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস বা কোন প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রবচন গ্রহণ না করেও ঠিকঠিক ধার্মিক হ'তে পারে। জীবনে যে সব দুঃখ আছে, তা দূর করাকেই তিনি 'ধর্ম' বলেছেন এবং প্রেম দয়া, ভ্রাতৃত্ব ও অহিংসা অভ্যাসদ্বারা আমাদের ক্ষুদ্র অহমিকা বিলোপ ক'রে তা লাভ করা যায়। অষ্টশীল অভ্যাসে এই সকল গুণ যত বাড়বে ততই আত্মপ্রসার ঘটবে, অবশেষে সর্বভূতে আত্মদর্শন হবে। এ-দ্বারা সকল ভয় ও দুঃখ দূর হবে।

বুদ্ধ কখনও অলৌকিকত্ব দাবি করেননি। তিনি বলতেন, 'আমি হচ্ছি পথ', এর তাৎপর্য তাঁকে সত্য ও নিয়মের আবিষ্কারক মনে করা। তিনি মানুষকে দুঃখকষ্টের স্বরূপ জেনে বিচার-সাহায্যে তার কারণ জানতে এবং তাঁর মতো আত্মানুশীলন এবং অষ্টশীল সাধন দ্বারা, তা দূর করতে বলতেন। তিনি বলতেন, তিনি যে সত্য প্রচার করছেন, তা তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং যে-কোন লোক তা পরীক্ষা করতে পারে, শান্তি ও আনন্দ পেতে পারে, সকল দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে।

উপরি-উক্ত আলোচনায় প্রতিপন্ন হয় যে, বুদ্ধের শিক্ষা এমন এক ধর্ম আন্দোলনের সূত্রপাত করে, যা পরে পৃথিবীতে 'মানবতার আন্দোলন' নামে পরিচিত হয়। মানবতা, যার সম্বন্ধে আজ এত শোনা যায়, বৌদ্ধধর্মের ন্যায় তা ধর্মের ভার-কেন্দ্র পুরোহিত এবং শাস্ত্র থেকে দূরে সরাতে চেষ্টা করে এবং জীবনের কর্মপ্রচেষ্টায় শক্তির উৎস প্রেম, ত্যাগ, দয়া এবং নৈতিক গুণরাশি থেকেই পেতে চায়।

সর্বশেষ—বুদ্ধই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সন্ন্যাসী-সংঘ দ্বারা ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। এই প্রচারকগণ এক নূতন আধ্যাত্মিক কৃষ্টির দীপবর্তিকা পূর্ব গোলার্ধের বিভিন্ন অংশে বহন ক'রে নিয়ে যান এবং ভারতবর্ষে এক গৌরবময় সভ্যতা গড়ে তোলেন। তা এমন নৈতিক উৎসাহ আনে এবং বাস্তব শক্তির উৎস উদ্‌ঘাটন করে যে, ভারতের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের সৃষ্টি হয়।

এ-কথা ঐতিহাসিক সত্য যে, বুদ্ধের আদর্শবাদ সন্ন্যাসী-সংঘে নারীকে সমান অধিকার দিয়েছিল এবং একের পর এক বহু সন্ন্যাসিনী নারীদের

দীপ্যমান গৌরবের সাক্ষ্য দান করেন। তাঁদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বর্তমান নারীজাতিকে পৃথিবীর উপকারের জন্য ত্যাগ ও সেবার জীবনে পরিচালিত করতে অবিরত অনুপ্রেরণা যোগায়।

বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের মতে—বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মেরই পরিণতি, এবং পরবর্তী কালে হিন্দু-ভারতের অধঃপতনের কারণ সকলকে অবাধ সন্ন্যাস-দান। পুনর্বার তিনি আমাদিগকে শঙ্করের বিস্ময়কর মেধা ও দর্শনের সঙ্গে এই মহান্ ধর্মগুরুর উদারতা, মহানুভবতা এবং মানবতার শক্তি সম্মিলিত করতে উৎসাহিত করেছিলেন।

সকল মহাপুরুষ ও ঋষিদের বাণী আমাদের 'স্বচ্ছ সত্তা' উপলব্ধি করবার বাণী। এই উপলব্ধি হ'লে আমরা মানুষের সেই ভয়াবহ অনুকৃতি হয়েই থাকব না—আত্মপ্রকাশে বিরত যে-মানুষ ক্রুদ্ধ বানরের মতো ভগবানের সাথে অদ্ভুত প্রতারণা করে, যাতে দেবদূতরাও অশ্রুবিসর্জন করেন।

আসুন, আমরা ভগবান বুদ্ধের বাণী শুনে আমাদের জীবন সেই উজ্জ্বল আদর্শে গঠন করতে চেষ্টা করি।

বিবেকানন্দ-মানসে বুদ্ধ

বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। * * *

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, তাহার যদি কোনরূপ দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, সে যদি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতেও না যায়, এমনকি প্রকাশ্যে নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে সেই চরমাবস্থা লাভ করিতে সমর্থ। তাঁহার মতামত ও কার্যকলাপ বিচার করিবার অধিকার আমাদের কিছুমাত্র নাই। আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব হৃদয়বত্তার লক্ষভাগের একভাগেরও অধিকারী হইতাম, তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতাম। হইতে পারে, বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা হয়তো বিশ্বাস করিতেন না, তাহা আমার চিন্তনীয় বিষয় নয়। কিন্তু অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনিও তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাতে উহাতে বিশ্বাস করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না। কেবল মুখে ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা আওড়াইলেই কিছু হয় না। তোতা পাখিকেও যাহা শিখাইয়া দেওয়া যায়, তাহাই সে আবৃত্তি করিতে পারে। নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্যান্য মহাপুরুষগণের সকলেই বাহ্য প্রেরণার বশে নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।······মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, 'আমি ঈশ্বর-সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হইবে? ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য যাহাই হউক না, সেই সত্যে লইয়া যাইবে।'

শঙ্করাচার্য

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

তপঃক্লিষ্ট বৈশাখের অগ্নিকেন্দ্রে জন্ম তব আচার্য শঙ্কর !
মূর্ছাপন্ন শতাব্দীতে বেদনার পদাবলী-গানে নিরন্তর
দ্বিধাদ্বন্দ্ব লয়ে নর অসত্যের উপধর্মে, বিকৃত দর্শনে
হয়েছে কাতর যবে, সহস্র প্রপাতসম দুরন্ত গর্জনে
ধ্বনিয়া তুলেছ বিশ্বে—ব্রহ্ম সত্য, জীব ব্রহ্ম, মিথ্যাময় ধরা ;
অদ্বৈতের অমৃতের বীতিহোত্র হে কিশোর ! তব মধুক্ষরা
অখণ্ড অব্যক্ত তত্ত্ব প্রাণখণ্ড শিলা ভেদি বর্ণ-মন্দাকিনী
বহায়েছে তৃষাতুর চিত্তমরু-সাহারায়—সে-কথা ভুলিনি।

ধ্বংস ধারা মাঝে এসে ক'রে গেলে সৃষ্টি নব বৈদিক ভারত,
লুপ্ত ধর্ম উদ্ধারিয়া শুনায়েছ জনে জনে ব্রহ্ম ভাগবত।
মায়াচ্ছন্ন বস্তু-বিশ্বে রুদ্ধ করি শূন্যবাদ আর ভ্রান্ত পথ
সহজাত সারস্বত প্রজ্ঞালোকে দিয়ে গেছ অমূল্য সম্পদ্।
বোধির অতীত স্তরে সত্যজ্ঞান ভূমানন্দে তপস্যা-প্রভাবে
বৈরাগ্যের মহামন্ত্রে অদ্বৈত-বেদান্ত বার্তা দোর্দণ্ড প্রতাপে
করেছ প্রচার। নিঃশ্রেয়স লভিবার দিয়ে গেছ সত্য ধন
জ্ঞান কর্ম ভক্তি যোগে সভ্যতার রূপান্তর করেছ সাধন।

মদমত্ত মানুষের আসুরিক স্বেচ্ছাচার প্রতিহত করি
গৈরিক পতাকা তুলি তরুণ তাপস তুমি দুরন্ত শর্বরী
মেঘের তোরণ হ'তে করিয়াছ দূর, আজো তাই পূর্বাকাশে
অমর কুসুম ফোটে অনন্ত মহিমা লয়ে, নিত্য নেমে আসে
সৌর সমারোহে তব শুভ আশীর্বাদ। আত্মার সন্ধান লভি
মানসলোকের যাত্রী আত্মসমাহিত হয়ে আপনার ছবি
হেরিতেছে সমগ্র ভুবনে আনুকূল্যে তব,—তোমারে প্রণাম,
বিরাট্ চৈতন্যসত্তা আমার সত্তাতে আজি ধ্যানে বরিলাম।

প্রেমানন্দ-স্মৃতি

[জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীর ডায়েরী হইতে]

১৯১৭ খৃঃ গ্রীষ্মাবকাশে পুণ্যতীর্থ ৺পুরী-ধামে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীরাজামহারাজের পবিত্র দর্শন লাভের পর কয়েকমাস বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল। কারণ তখন বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পড়াশুনার চাপ হইতে কিছুদিনের জন্য মুক্ত হইয়াছি। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়িবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া একটি **Post-graduate** ছাত্রাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। অনেক পুরাতন বন্ধুবান্ধবের সহিত পুনর্মিলন ঘটিল এবং অনেক নূতন বন্ধুও ধীরে ধীরে জুটিতে লাগিল। কলিকাতা আসিবার পর শ্রীশ্রীমহারাজের দেব-বাঞ্ছিত পূত সঙ্গলাভের স্পৃহা পুনরায় জাগিয়া উঠিল—ভাবিলাম কোন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে পূঃ মহারাজের দর্শনে যাইব। ইতোমধ্যে জনৈক সহাধ্যায়ীর নিকট শুনিলাম,

ঠাকুরের অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ সেই সময় বাগবাজারে 'বলরাম-মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'বাবুরামের হাড় পর্যন্ত শুদ্ধ।' এমন শুদ্ধসত্ত্ব প্রেমবিগ্রহ মহাপুরুষের দর্শনের জন্য যে হৃদয়ে প্রবল আগ্রহ অনুভব করিব, তাহা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নহে। জীবনে এই সকল লোকোত্তর মহাপুরুষের দর্শন যে জন্ম-জন্মান্তরের মহাসুকৃতির ফলে ঘটিয়া থাকে, তাহা অনস্বীকার্য। কখন যে আমাদের চিত্তে জন্মান্তরীণ শুভকর্মের ফলস্বরূপ সৎসঙ্গলাভের তীব্র বাসনা জাগিয়া উঠিবে, তাহা আমাদের নিকট চির অজ্ঞাত। নানা পরিবর্তনের মধ্যে হয়তো একদিন এই শুভ সংস্কারটি উন্মুখ হইয়া উঠিল এবং করুণাময় ভগবানের অসীম কৃপায় সেই মুকুলিত ভাবগুলি চরিতার্থতা লাভ করিয়া জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিল। বলা বাহুল্য ভাল-মন্দ, আলোক-আঁধার, পুণ্য-পাপ—এই দ্বন্দ্বের মধ্যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষীণ ধারা অনির্দিষ্ট পথ বাহিয়া চলিয়াছে। কত বিবর্তন জীবনকে কতবার লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে। পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি অণু-পরমাণু হইতে বৃহত্তম পদার্থ পর্যন্ত সেই এক নৈসর্গিক নিয়মের অনুবর্তন করিয়া চলিয়াছে। এই পরিবর্তন-বহুল জীবন-যাত্রার কোথায় সমাপ্তি, কোথায় অতৃপ্ত বাসনানিচয়ের চির পরিতর্পণ, তাহা আমাদের নিকট বিদিত নহে। শুধু নাট্যশালার পটপরিবর্তনের ন্যায় জীবনের সংস্কারসকল নিত্য নূতন আশার আলোকে হৃদয় মন উল্লসিত করিয়া তুলিতেছে। জীবনের সে-এক শুভ মুহূর্ত—যখন হৃদয়ের অনন্ত ক্ষুধা ও পিপাসার শান্তির আশায় বিশ্বপ্রেমিকের চরণ-তলে আত্মনিবেদন করিবার জন্য প্রাণ সত্য-সত্যই আকুল হইয়া উঠে, বিশ্ববিধাতার এই প্রহেলিকাচ্ছন্ন স্বপ্নরাজ্যে আলোর রেখা কদাচিৎই মিলিয়া থাকে। কবি তাই আবেগভরা কণ্ঠে গাহিয়াছেন :

চারিদিকে মায়াজাল
সংসার আচ্ছন্ন করি রাখিয়াছে আদি অন্তকাল
দুর্গম করিয়া মুক্তি-পথ। নাহি জানি কতদিন,
যাত্রা মোর চলিয়াছে বিরাম-বিহীন।
কত দুঃখ, কত সুখ, কত পাপপুণ্যের মাঝারে
জন্ম-জন্মান্তর হ'তে আজো নাহি
চিনি আপনারে।
অব্যক্ত শিহর উঠে—সারা অঙ্গে বিপুল পুলকে,
নয়নে ঝরিছে অশ্রু, নিখিলের আঁধার-আলোকে
হেরি তব বিরাট মহিমা।

আজ বুকভরা ব্যাকুলতা লইয়া কলিকাতার জনাকীর্ণ রাজপথ ধরিয়া তিনবন্ধু বাগবাজার অভিমুখে আকুল আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়াছি; সকলের অন্তরে সেই এক অভিলাষ—এমন শুদ্ধ-সত্ত্ব মহাপুরুষের চরণতীর্থ-সলিলে অবগাহন করিয়া আমাদের কলুষকলঙ্কমাখা জীবন পবিত্র ও নির্মল করিয়া তুলিব।

বলা বাহুল্য, কলিকাতা আসিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের সাঙ্গোপাঙ্গদের সহিত মিলনের এই সর্ব প্রথম প্রয়াস। এখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের মানস-পুত্র রাজা মহারাজের সঙ্গে কলিকাতায় সাক্ষাৎ-কার হয় নাই। জনৈক সহপাঠীর আগ্রহাতি-শয্যে প্রথমেই বাবুরাম মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনের জন্য যাত্রা করিয়াছি। বেলা প্রায় ৫॥টা হইবে। বলরামবাটীতে পৌছিয়া দেখিলাম পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ তাঁহার শয়নঘরের মেজেতে একখানি চাদর-গায়ে বসিয়া আছেন। এমন নির্মল ও সরলস্বভাব মহাপুরুষ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। তাঁহার শুভ্র কান্তি ও স্নিগ্ধ দৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রেম ও পবিত্রতা শতধারে ক্ষরিত হইতেছিল। তাঁহার পূত সন্নিধানে উপবেশন করিয়া প্রাণে এমন শান্তি ও বিপুল আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, যাহা জীবনে কখনও ভুলিবার নহে। আমরা সকলেই পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণকমল স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি একে একে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, আমরা তিনজনই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি একটু বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'হ্যারে, তোদেরও সাধু দেখবার ইচ্ছা হয়? তোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া-শুনা করিস, জীবনে কত কি চাকরি—কাজকর্ম করবি, তোদেরও কি এই সব মূর্খ সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে আসতে ইচ্ছা হয়?' কথাগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ না থাকিলেও তখনকার দিনে সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি ছাত্রদের মধ্যে যে একটা অশ্রদ্ধার ভাব ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হয়তো পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ সেই ভাবকে কটাক্ষ করিয়াই এইভাবে আমাদিগকে ঐ কথা কয়েকটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি শ্রদ্ধা-সহকারে অতি মৃদুকণ্ঠে উত্তর করিলাম, মহারাজ, যদি সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভের ইচ্ছাই না হইত, তবে আর এখানে আসিয়াছি কেন? আপনাদের আশীর্বাদ পাইলে এ-জীবন পবিত্র ও ধন্য হইয়া যাইবে। কথাকয়টি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং একজনকে ডাকিয়া কিছু মিষ্টি প্রসাদ আমাদের তিনজনকে দিলেন। তারপর তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিতে লাগিলেন, 'তোরা ধন্য। তোরা শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর কাজের জন্য জন্মগ্রহণ করেছিস। তোদের মতো শিক্ষিত যুবকদের দিয়ে অনেক কাজ হবে। স্বামীজী ইয়ং বেঙ্গল (Young-Bengal)-এর নিকট হ'তে অনেক কিছু আশা ক'রে গেছেন। তোরা স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কাজের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়্—তোদের সার্থক হয়ে উঠবে।' সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া আমরা সেদিনের মতো বিদায় গ্রহণ করিলাম। আসিবার সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আর এক দিন আসিস।' আমি বলিলাম, আগামী সপ্তাহে শনিবার দিন আবার আসিব। এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া আমরা আমাদের ছাত্রাবাসে ফিরিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া সর্বদাই মনে হইতে লাগিল—আহা, এই স্বামীজীর কথাগুলি যেমনি মধুর তেমনি প্রাণজুড়ানো। ইঁহাদের পবিত্র সঙ্গলাভ না করিতে পারিলে জীবনের পুঞ্জীভূত আবিলতা কখনও দূর হইবে না। শাস্ত্র সত্যই বলিয়াছেন :

সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
কালেন ফলতি তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥

শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন :

জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যম্,
মানোন্নতিং দিশতি পাপমপাকরোতি।
চিত্তং প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীর্তিম্,
সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাম্॥

—সাধুসঙ্গে হৃদয়ের সমস্ত জড়তা বিদূরিত হয়, বাগিন্দ্রিয় সত্য ভিন্ন মিথ্যা উচ্চারণ করে না, পাপচিন্তা চিরদিনের জন্য দূরে পলায়ন করে, আর মানবচিত্ত চিরপ্রসন্নতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। বাস্তবিকই সৎসঙ্গ জীবের যে কত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে।

ছাত্রাবাসে ফিরিয়া কেবলই সেই মহাপুরুষের পবিত্র সমুজ্জ্বল সৌম্যমূর্তি ও স্নেহমাখা কথাগুলি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং প্রাণের ভিতর তাঁহার পুনর্দর্শনের জন্য তীব্র প্রেরণা অনুভব করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আমাদের সেই নির্দিষ্ট দিনটি উপস্থিত হইল। এবারও সেই তিনজনেই যাইব স্থির করিয়াছি, কিন্তু হঠাৎ বেলা ৩টা হইতে অবিরলধারায় বৃষ্টিপাত হইতে আরম্ভ করিল। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন; মধ্যে মধ্যে বজ্রপাতের প্রলয়ঙ্কর শব্দে প্রকৃতি আরও ভীষণাকার ধারণ করিল। পবনদেবও সুযোগ বুঝিয়া প্রকৃতির এই তাণ্ডব-লীলার পরিপূর্ণতাসাধনে স্বমূর্তি ধারণ করিলেন। এই ভীষণ দুর্যোগে বাহিরে যায়, কাহার সাধ্য। রাস্তাঘাট দেখিতে দেখিতে জলে ভরিয়া গেল ট্রাম, মটরকার, গাড়ির গমনাগমন একদম বন্ধ হইয়া গেল। ভাবিলাম, বুঝি আজ সত্যরক্ষা করিতে পারিলাম না। এই প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে কেমন করিয়া এত দূরের পথ অতিক্রম করিয়া কলেজ স্ট্রীটের ছাত্রাবাস হইতে বাগবাজার যাইব? নানা দুশ্চিন্তায় মন বড়ই অবসন্ন ও বিষাদগ্রস্ত হইয়া উঠিল। অপর বন্ধুদ্বয়ের একজন এই বৃষ্টির মধ্যে যাইতে চাহিলেন না। পরিবর্তে আমার অন্য এক বন্ধু (যিনি পরবর্তীকালে 'বেদান্তদর্শন' নামক সর্বজনাদৃত পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সুধীসমাজের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন) বৃষ্টির কিঞ্চিদুপশম হইলে আমাদের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমরা ছত্রদ্বারা যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিয়া বিকালে প্রায় ৫॥ ঘটিকায় ছাত্রাবাস হইতে বহির্গত হইলাম। তখন বৃষ্টির প্রবল বেগ কমিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বাত্যাতাড়িত জলধারা আমাদের বস্ত্র ও গাত্রাবরণ সিক্ত করিতেছিল।

ঘনায়মান সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভিজিতে ভিজিতে আমরা তিন বন্ধু বলরাম-বাটীতে পৌছিলাম। যাইয়া দেখি, সেই ঘরের ভিতর পূঃ বাবুরাম মহারাজ ও আরও ২।৩টি সাধু বসিয়া আছেন। মহারাজ আমাদিগকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে তোরা এসেছিস্। এমন দুর্যোগের মধ্যে কেমন ক'রে এলি? আজ না এলেই তো হ'ত।' আমরা সকলে তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। তারপর আমি তাঁহার কথার উত্তরে বলিলাম, মহারাজ, আজ আসব ব'লে আপনাকে কথা দিয়েছিলাম। তাই না আসলে চলবে কেন? সাধুর নিকট সত্যভঙ্গ করা মহাপাপ। আপনাদের দর্শনলাভের জন্য এই সামান্য কষ্টও যদি স্বীকার করতে না পারি, তবে আর লেখাপড়া শিখে লাভ কি? কথা-কয়টি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'এই তো চাই। সত্যনিষ্ঠা না হ'লে জীবনে কেহ কোনদিনই কিছু করতে পারবে না—এটা ঠিক জেনো। এক সত্যকে ধরে থাকলে সব হয়ে যাবে।' আমাদের কাপড়, চাদর কতকটা ভিজিয়া গিয়াছে দেখিয়া তিনি নিজ হস্তেই একখানা শুষ্ক গামছা দিয়া আমাদের

গা-মাথা মুছিয়া দিবার জন্য আসিলেন। আমরা তাঁহার হাত হইতে গামছাখানা লইয়া মাথা ও হাত মুছিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, 'ছাখ্, বাইরে কেমন ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি হচ্ছে, আর কোন সাড়াশব্দও নেই। এখন কেউ একটা গান গাইলে বেশ হয়। তোদের কেউ গান গাইতে জানিস্?'

স্থ—(ইনিও এখন মঠ-মিশনের একজন সন্ন্যাসী) আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া করিয়া বলিয়া দিল, 'ইনি গান জানেন।' আমি তো মহা বিপদে পড়িলাম। বন্ধু-বান্ধবদের নিকট কখন কখন তাল-লয়বিহীন গান গাহিয়াছি বটে, কিন্তু এই ভগবৎ-প্রেমিক মহাপুরুষের সম্মুখে কি করিয়া সেই সব গান গাহিব। বুকের ভিতর বড়ই অস্বস্তি-বোধ করিতে লাগিলাম—বাবুরাম মহারাজও নাছোড়বান্দা। তখনই হারমোনিয়াম আনিবার হুকুম হইয়া গেল। মহারাজের সেবক ছোট কানাই মঃ (অনন্তানন্দজী) হারমোনিয়ামে স্থর দিতে লাগিলেন। আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া গান আরম্ভ করিলাম ঃ

কি স্থখ জীবনে মম ওহে নাথ দয়াময় হে।
যদি চরণ-সরোজে পরাণ-মধুপ
চির মগন না রয় হে ॥
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে।
যদি লভিয়ে সে-ধনে পরম রতনে
যতন না করয় হে ॥
স্থকুমার কুমার মুখ দেখিতে না চাই হে।
যদি সে চাঁদ-বয়ানে তব প্রেমমুখ
দেখিতে না পাই হে ॥
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি দেখি আঁধারময় হে।
যদি সে চাঁদ প্রকাশে তব প্রেমচাঁদ
নাহি হয় উদয় হে ॥
সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে।
যদি সে-প্রেমকনকে তব প্রেমমণি
নাহি জড়িত রয় হে ॥
তীক্ষ্ণবিষা ব্যালী সম সতত দংশয় হে।
যদি মোহ পরমাদে নাথ তোমাতে
ঘটায় সংশয় হে ॥
কি আর বলিব নাথ বলিব তোমায় হে।
তুমি আমার হৃদয় রতনমণি আনন্দনিলয় হে ॥

গানটি বেশ আবেগের সহিতই গাহিয়াছিলাম—তাই ভাবের প্রাবল্যে নিজেও অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। বাবুরাম মঃ আমার পিঠে হাত দিয়া স্নেহভরে দুতিন বার বলিয়া উঠিলেন, 'ছাখ্, তোর হবে রে, তোর হবে।' আমি তাঁহার কথার কি নিগূঢ় তাৎপর্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে ভাবিলাম, বোধহয় ভবিষ্যতে একজন ভাল গায়ক হইতে পারিব; তাই তিনি ঐরূপ বলিলেন। এদিকে রাত্রি হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আমরাও প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলাম; কারণ ছাত্রাবাসের নিয়মানুযায়ী রাত্রি ৮টার মধ্যেই সেখানে পৌছিতে হইবে। বাবুরাম মঃ একজনকে কিছু মিষ্টি আনিতে বলিলেন। একজন সন্ন্যাসী একটি পাত্রে করিয়া অনেক রসগোল্লা আনিয়া বাবুরাম মহারাজের হাতে দিলেন। তিনি আমাদের তিনজনকে উহার প্রায় সমস্তটাই খাওয়াইলেন। এখন বিদায় গ্রহণ করিব। কিন্তু এমনি দুর্জয় আকর্ষণ—সেখান হইতে আর ফিরিবার ইচ্ছা হইতেছে না। কেবলই মনে হইতেছে—আহা, ইনি আমাদিগকে কত ভালবাসেন! এমন সরলমধুর সপ্রেম ব্যবহার তো কোথাও পাই নাই। পিতামাতা, ভাই-বন্ধুর ভালবাসা ইহার নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এমন আপনভোলা প্রেমিক পুরুষের অহেতুকী কৃপা ও ভালবাসা ছাড়িয়া

ছাত্রাবাসের সেই কোলাহল ও পুঁথিপুস্তকের আবর্জনার মধ্যে পুনঃ ফিরিয়া যাইতে মন স্বতই কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই—অশ্রুপূর্ণ নয়নে বাবুরাম মহারাজের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিলাম। কেমন এক অজ্ঞাত প্রেরণায় আমার অন্তস্তল আজ উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল! নিজেকে সামলাইতে পারিলাম না—কেবলই ক্রন্দন—কেন কাঁদিতেছি, তাহাও জানি না—অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বাবুরাম মহারাজ আমাকে আকর্ষণ করিয়া তাঁহার কোলের উপর চাপিয়া ধরিলেন, মনে হইল—যেন মা জগজ্জননীর কোলে আজ সত্য সত্যই আশ্রয় পাইয়াছি। তিনি আমার পৃষ্ঠদেশে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আজ তোর ভূত ছাড়িয়ে দেবো।'—এই বলিয়া তিনি একটু জোরে পৃষ্ঠে চাপড় দিতে লাগিলেন আর পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, 'যা তোর ভূত ছেড়ে গেছে; তোর ভূত ছেড়ে গেছে।' মহারাজের সুকোমল হস্তের পুণ্যস্পর্শে হৃদয়মন শান্ত হইয়া আসিল। হৃদয়ের আবেগও ধীরে ধীরে কমিয়া আসিল। তারপর তিনি সু-কেও ঠিক তেমনি করিয়া পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন—'আয়, তোরও ভূত ছাড়িয়ে দেবো।' আহা, ইহাকেই বলে অহৈতুকী কৃপা। ইঁহাদের কৃপা না হইলে এই বিপৎসঙ্কুল জীবনসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা আমাদের মতো দুর্বল জীবের পক্ষে মোটেই সম্ভব নহে। ধন্য এই বসুন্ধরা, যিনি যুগে যুগে জীবোদ্ধারের জন্য এই সকল প্রেমিক মহাপুরুষকে তাঁহার বিশাল বক্ষে ধারণ করিয়া সকলের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন, আর ধন্য সেই যুগাবতার করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁহার অপার করুণায় আমাদের মতো নগণ্য জীবও তাঁহার নিজহস্তে গড়া সন্তানগণের চরণতীর্থে বসিয়া জীবন পবিত্র ও সার্থক করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে আমার এই শেষ কথোপকথন। তিনি তারপর কার্যব্যপদেশে অন্যত্র চলিয়া যান এবং খুবই অসুস্থ হইয়া পড়েন। অনেক দিন পর অসুস্থ অবস্থায় বলরাম-বাটীর সেই ঘরে পুনঃ তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল। সেদিন আমি একাই আসিয়াছিলাম। তিনি খাটের উপর রোগশয্যায় শায়িত, শরীর অত্যন্ত দুর্বল, কথা-বলা ডাক্তার নিষেধ করিয়াছেন। ঘরে সর্বদাই দুইজন সতর্ক সেবক-প্রহরী। আমাকে দেখিয়াই বাবুরাম মঃ বিছানা হইতে উঠিতে চেষ্টা করিলেন। সেবকদ্বয় বাধা দিতেই তিনি ডান পাশে শুইয়া আমার দিকে সস্নেহে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই ভাবেই বিছানার উপর পড়িয়া রহিলেন। আহা, কি প্রেমমাখা দৃষ্টি! তাঁহার অন্তরের অপরিসীম স্নেহ-ভালবাসা সেই দেব-দুর্লভ নয়নের সকরুণ দৃষ্টির মধ্য দিয়া উথলিয়া উঠিতেছিল। আমি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না—প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া আসিলাম। জীবনে এই আমার শেষ দর্শন। স্বাস্থ্য-পরিবর্তনের জন্য মহারাজকে অন্যত্র লইয়া যাওয়া হয়। তাই আর তাঁহার পূত সঙ্গলাভের সৌভাগ্য আমার জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তিনি আমার এই জীবনের উপর যে অক্ষয় রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনদিনই মুছিয়া যাইবার নহে। তাঁহার পবিত্র স্পর্শ ও অমোঘ আশীর্বাদই এই জীবনকে মুক্তির মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—তিনি সত্য সত্যই ওঝা হইয়া এই মায়ামুগ্ধ জীবনের ভূত ছাড়াইয়া না দিলে সংসারের সর্পিল বন্ধুর পথে সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া চলিবার সৌভাগ্য হইত কিনা, কে জানে। আজ বাবুরাম মহারাজের স্মৃতির উদ্দেশে কেবলই মনে হইতেছে :

শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।
সাধবঃ নৈব সর্বত্র চন্দনং ন বনে বনে।

—জীব-কল্যাণকামী কৃপাসিন্ধু মহাপুরুষ জগতে সত্য সত্যই দুর্লভ।

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা

স্বামী ধীরেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি—পঞ্চবিধ সংজ্ঞা]

আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
অনির্বচনীয়খ্যাতিঃ খ্যাতয়ঃ পঞ্চ সম্মতাঃ ॥ ৪৬ ॥

আত্মখ্যাতি,[১] অসৎখ্যাতি,[২] অখ্যাতি,[৩] অন্যথাখ্যাতি[৪] ও অনির্বচনীয়খ্যাতি[৫]—এইরূপ পঞ্চবিধ খ্যাতি প্রসিদ্ধ।

১. 'খ্যাতি' অর্থ ভ্রমের প্রতীতি ও কথন। ভ্রম-বিষয়ে পাঁচটি মত প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে আত্মখ্যাতি ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণের মত। আত্মা অর্থাৎ ক্ষণিকবুদ্ধিরূপ বিজ্ঞানের সর্পাদিরূপে (রজ্জুসর্পভ্রমস্থলে) খ্যাতি বা প্রতীতিই **আত্মখ্যাতি**।

২. মাধ্যমিক শূন্যবাদী বৌদ্ধ বলেন যে, সদা-অবিদ্যমান—অসৎ বা শূন্য সর্পই রজ্জুতে প্রতীত হইয়া থাকে, ইহাই **অসৎখ্যাতি**।

৩. রজ্জুসর্পভ্রম-স্থলে 'ইহা সর্প' এই জ্ঞানে দুটি অংশ বিদ্যমান। 'ইহা' ও 'সর্প'। 'ইহা' অর্থাৎ রজ্জুর সামান্যাংশে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ও 'সর্প' এই অংশে পূর্বদৃষ্ট সর্পের স্মৃতিজ্ঞান মাত্র হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দুইটি জ্ঞান হইলেও ভ্রমবশতঃ এক জ্ঞান বলিয়া মনে হয়। স্বরূপতঃ এবং বিষয়বস্তু ভিন্ন এই দুইটি জ্ঞানের দোষবশতঃ অখ্যাতি অর্থাৎ ভেদের প্রতীতির অভাবই সাংখ্য ও প্রভাকর-সম্মত **অখ্যাতিবাদ**।

৪. অন্যথা অর্থাৎ প্রকারান্তরে রজ্জুরূপ জ্ঞেয়বস্তুর সর্পরূপে খ্যাতি বা ভানকেই ভাট্ট ও ন্যায়বৈশেষিকগণ **অন্যথাখ্যাতি** বলেন।

৫. রজ্জু-আদিতে অবিদ্যা-বশতঃ সদসদ্‌বিলক্ষণ-অনির্বচনীয় সর্পাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ক খ্যাতি অর্থাৎ প্রতীতি ও কথন—ইহাই বেদান্তিগণের **অনির্বচনীয় খ্যাতি** নামে প্রসিদ্ধ। রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে অন্তঃকরণবৃত্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা বহির্গত হয় এবং রজ্জুর সহিত ঐ বৃত্তির সম্বন্ধও হয়, কিন্তু চক্ষুতে তিমিরাদি দোষবশতঃ অন্তঃকরণ-বৃত্তি রজ্জুর সমানাকার ধারণ করে না এবং এইজন্য রজ্জুর আবরণ-ভঙ্গও হয় না। আবরণ-ভঙ্গের কারণ বৃত্তি ও রজ্জুর সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধ-হেতু রজ্জুর আবরণ-ভঙ্গ যখন হয় না, তখন রজ্জু-চৈতন্যে অবস্থিত অবিদ্যাতে ক্ষোভ (চাঞ্চল্য) উৎপন্ন হইয়া ঐ অবিদ্যা অনির্বচনীয় সর্পাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। মায়ার অনির্বচনীয় পরিণামরূপে জগৎও এইরূপে ব্রহ্মে প্রতীত হইতেছে।

[বিভিন্ন 'খ্যাতি'-মতে অধ্যাসের লক্ষণ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের ভূমিকায় এইরূপে উক্ত হইয়াছে। যথা: 'স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্বাদৃষ্টাবভাসঃ'—ইহা অনির্বচনীয়খ্যাতি-মতে অধ্যাসের লক্ষণ। অন্যথাখ্যাতি ও আত্মখ্যাতির জন্য 'অন্যত্র অন্যধর্মাধ্যাসঃ', অখ্যাতিবাদীর জন্য 'যত্র যদধ্যাসঃ তদ্‌বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ ভ্রমঃ' এবং অসৎখ্যাতির জন্য 'যত্র যদধ্যাসঃ তস্যৈব বিপরীতধর্মত্বকল্পনা'—

এইরূপ ভিন্ন লক্ষণ করা হইয়াছে।] এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'বিচার-সাগর' বা অন্য আকর-গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

অবিদ্যা চাস্মিতা রাগো দ্বেষশ্চাভিনিবেশকঃ।

পঞ্চক্লেশা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৪৭ ॥

তত্ত্বদর্শী মুনিগণ বলিয়াছেন—ক্লেশ পঞ্চবিধ, যথাঃ অবিদ্যা[১], অস্মিতা[২], রাগ[৩], দ্বেষ[৪], ও অভিনিবেশ[৫]।

১. কারণাবিদ্যা ও কার্যাবিদ্যাভেদে অবিদ্যা দ্বিবিধ। পুনঃ মূলাবিদ্যা ও তুলাবিদ্যাভেদে কারণাবিদ্যাও দুইপ্রকার। মূলাবিদ্যা নিরুপাধিক শুদ্ধ-চৈতন্যাচ্ছাদিকা ও তুলাবিদ্যা উপাধ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাচ্ছাদিকা। মূলাবিদ্যা-বশে জগদ্ভ্রম ও তুলাবিদ্যা-বলে রজ্জুসর্পাদি-ভ্রম হইয়া থাকে। পঞ্চক্লেশ মধ্যবর্তী **অবিদ্যা** বিপর্যয়রূপ কার্যাবিদ্যা। ইহা চতুর্বিধ—যথাঃ অনিত্যে নিত্যত্ব-ভ্রম (যেমন অনিত্য কার্যভূত স্বর্গ, ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে নিত্যত্ববুদ্ধি), মলাদি পরিপূর্ণ পরমবীভৎস অশুচি শরীরে শুচিত্ব-ভ্রম, দুঃখসাধন স্ত্রী-পুত্র-ধনাদিতে দৃঢ় আসক্তি-বশতঃ সুখত্ব-ভ্রম, এবং অনাত্ম-দেহেন্দ্রিয়াদি পদার্থে 'আমি কৃশ, স্থূল, অন্ধ, মূক, সংকল্পবান্, নিশ্চয়বান্'—এইরূপ আত্মত্ব-ভ্রম। এ-সমস্তই অবিদ্যা।

২. অত্যন্ত পৃথক্ আত্মা ও অনাত্মার একাত্মবুদ্ধির নাম **অস্মিতা** বা সামান্য অহংকার।

৩. সুখানুশয়ী **রাগ**। অর্থাৎ পূর্বানুভূত সুখস্মৃতিপূর্বক সুখ বা তৎসাধনের প্রতি যে তৃষ্ণা, তাহাই রাগ।

৪. দুঃখানুশয়ী দ্বেষ। অর্থাৎ পূর্বানুভূত দুঃখস্মৃতিপূর্বক দুঃখ বা তৎসাধনের প্রতি যে ক্রোধ, তাহাই **দ্বেষ** নামে কথিত।

৫. সর্বলোকপ্রসিদ্ধ মরণভীতি **অভিনিবেশ** নামে প্রসিদ্ধ।

ইহাদিগকে তমঃ, মোহ, মোহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র—এই পাচটি নামেও বলা হইয়া থাকে। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ অবিদ্যাই **তমঃ**, অশ্রেয়স্কর অণিমাদি ঐশ্বর্যে শ্রেয়োবুদ্ধি **মোহ**, সংসারের মূল কারণ রাগ **মহামোহ**, ভোগেচ্ছা প্রতিহত হইলে উৎপন্ন ক্রোধ **তামিস্র**-নামক দ্বেষ এবং কল্পান্তে সর্ববস্তু নাশ হইয়া যাইবে, এইরূপ ভীতিই **অন্ধ-তামিস্র**-নামক অভিনিবেশ।

অথবা অবিদ্যা, অস্মিতা, অসূয়া, স্পর্ধা ও অভিনিবেশ—ইহাদিগকে পঞ্চক্লেশ বলা হয়। ইহাদের অন্য ব্যাখ্যা যথাঃ শরীরে 'আমি' অভিমানই **অবিদ্যা**, তাপত্রয়ানুভবের নাম **অস্মিতা**, গুণে দোষ-দর্শন অথবা রাগাদিদ্বারা পরিভবের বোধ **অসূয়া**, সজ্জনদর্শনে দ্বেষ-বুদ্ধিবশতঃ তাঁহাকে তিরস্কার করা **স্পর্ধা** এবং লোকরঞ্জনের নিমিত্ত তদুচিত কর্মের উদ্যোগ ও বেশাদিধারণ অভিনিবেশ। (পাতঞ্জল যোগসূত্রে ইহাদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

জীবেশ্বরভিদা হ্যেকা জীবানাঞ্চ পরস্পরম্।

দ্বিতীয়া জড়জীবানাং তৃতীয়া চ ভিদোচ্যতে॥ ৪৮ ॥

তুর্যেশ্বরজড়ানাঞ্চ জড়ানাঞ্চ পরস্পরম্।

পঞ্চমী চ ভিদা বিজ্ঞৈরুদিতাঽদ্বৈতদৃষ্টয়ে॥ ৪৯ ॥

অদ্বৈততত্ত্বনির্ণয়ার্থ তত্ত্বদর্শিগণ শাস্ত্রে জীবেশ্বর-ভেদ, জীবসমূহের পরস্পর ভেদ, জড় ও জীবের ভেদ, ঈশ্বর ও জড়ের ভেদ এবং জড়বর্গের পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চবিধ[১] ভেদ বলিয়াছেন।

১. এই ভেদনিরূপণ লোকপ্রসিদ্ধ ভেদ-বুদ্ধির অনুবাদ-মাত্র। অদ্বৈততত্ত্ব-নিরূপণই ইহার উদ্দেশ্য। ভেদ বাস্তব—ইহা প্রতিপাদন করা উদ্দেশ্য নহে। কারণ—ভেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ ও উহার সিদ্ধির জন্য শাস্ত্র-প্রমাণ আবশ্যক নহে এবং প্রসিদ্ধ ভেদের জ্ঞানে পুরুষার্থ-সিদ্ধিও হয় না। অজ্ঞাতবস্তুর জ্ঞাপক এবং চরম পুরুষার্থের প্রাপক বলিয়াই শাস্ত্রের প্রামাণ্য। ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অদ্বৈতবস্তুই পুরুষার্থরূপ ও প্রত্যক্ষাদি দ্বারা অজ্ঞাত—ইহা সর্ববেদান্তে প্রসিদ্ধ। অতএব সর্ব শাস্ত্রের সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে পরম তাৎপর্য—অদ্বৈতবস্তু-প্রতিপাদন এবং ঐ উদ্দেশ্যে লোকপ্রসিদ্ধ ভেদের উল্লেখ করা হয় মাত্র। [বস্তুতঃ ভিন্নরূপে কোন বস্তুই সিদ্ধ হয় না। যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা ভেদমিশ্রিত অভেদই হইয়া থাকে। অগ্নি ও জলে যে অভেদ তাহা ভূতরূপে। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে অভেদ সত্তারূপে। আত্মা ও অনাত্মার অভেদ 'আত্মা সত্য এবং অনাত্মা মিথ্যা বলিয়া নাই' এইরূপে ইত্যাদি। অভেদ-ভাব ব্যতীত ভেদই হয় না! শ্রুতি অনুসারে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে সর্ব দৃশ্যবস্তুর আবির্ভাব, সুতরাং সর্ববস্তুর মূলে অভেদ। এক অভিন্ন বস্তুই অজ্ঞানবশতঃ ভিন্নরূপে প্রতীত হয় মাত্র। অভেদই সত্য এবং ভেদ মায়িক, অতএব মিথ্যা]।

অস্তি-ভাতি-প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্ ॥ ৫০ ॥

পরিদৃশ্যমান সর্ববস্তুই অস্তি, ভাতি, প্রিয়, রূপ ও নাম—এই পাঁচটি অংশ-বিশিষ্ট। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি অংশ অর্থাৎ অস্তি বা সত্তা, ভাতি বা জ্ঞান ও প্রিয় বা আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপভূত, তদ্ভিন্ন অপর দুটি অংশ অর্থাৎ রূপ ও নাম জগতের স্বরূপ (মায়ার স্বরূপ, মিথ্যা)[১]।

১. 'বাক্যসুধা' ২০ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

[সকল জ্ঞেয় পদার্থেই এই পাঁচটি অংশ আছে। 'ঘট'—এইটি **'নাম'**। গোল আকারটি ইহার **'রূপ'**। 'ঘট আছে'—ইহাই তাহার **'অস্তি'** অংশ। 'ঘট প্রতীত হয়' ইহাই ঘটের **'ভাতি'** অংশ। 'ঘট (ব্যবহারকারীর) প্রিয়'—ইহাই ঘটের **'প্রিয়'** বা আনন্দাংশ। এইরূপে সর্ব বস্তুই পঞ্চঅংশবিশিষ্ট। সকল বস্তুতে অনুগত 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়'-রূপটি ব্যাপক, সত্য, অধিষ্ঠান এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, সুতরাং আত্মস্বরূপ। এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মাতেই ব্যভিচারী নাম-রূপাদি প্রপঞ্চ কল্পিত হইয়া থাকে।]

(ক্রমশঃ)

‘বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি’

[পূর্বানুবৃত্তি]

শ্রীমতী সুধা সেন

(১)

মহাপ্রভুর বজ্রাগ্নি দহনে গোপালচাপালও দগ্ধ হইয়াছিলেন একদিন! গোপালচাপাল নবদ্বীপবাসী, ভবানীপূজক—পূজারী নয়, অভিচারী ; মদ্য, মাংস ও ব্যভিচারই সেই পূজার অঙ্গ! বৈষ্ণবের অবলম্বন নিরাবরণ শুদ্ধাভক্তি, উপচার—অশ্রু ও নাম, তাহাই লইয়া বৈষ্ণব দীনাতিদীন চিত্তে উপস্থিত হন আরাধ্যের মন্দির-দ্বারে নীরবে! এই আড়ম্বরবিহীন সাধনা ও ভক্তিকে উপহাস করিয়া গোপাল একদিন পরম-ভক্ত শ্রীবাসের গৃহদ্বারে মদ্য মাংস প্রভৃতি নানা উপচার রাখিয়া আসিলেন শ্রীবাসকে হেয় ও নিন্দিত করিবার বাসনায়! শ্রীবাস স্বহস্তে সেই সমস্ত অস্পৃশ্য উপচার পরিষ্কার করিলেন, মনে ক্ষোভ হইলেও নীরব বিষণ্ণ হাস্যে গোপালকে মনে মনে ক্ষমা করিলেন—কিন্তু ভক্তের যিনি ভগবান্, তিনি ভক্তদ্রোহীকে ক্ষমা করিলেন না—তিনি যে ভক্তের কাঙাল। স্বকৃত অপরাধ বিকৃত গলিত মূর্তি ধারণ করিয়া আশ্রয় করিল গোপালের দেহে—গোপালের কুষ্ঠব্যাধি হইল। গোপালের আত্মীয় বান্ধব এমনকি স্ত্রীপুত্র পর্যন্ত যেদিন ঘৃণায় মুখ ফিরাইল, সেদিন গোপাল আসিয়া প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন—ব্যাকুল মিনতি ঝরিয়া পড়িল—‘প্রভু! আমি তোমার আত্মীয়, তোমারই প্রতিবেশী—আমাকে রক্ষা কর দয়াল।’ প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—গোপালের কাতর ক্রন্দনে তিনি দ্রব হইলেন না!

অথচ আর একদিন যাচিয়াই কৃপা করিলেন, তেমনই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অপর এক বিপ্রকে!

কূর্মতীর্থে এক বিপ্র—নাম বাসুদেব, লোকে বলে ‘কুষ্ঠীবিপ্র’, মহাব্যাধির প্রকোপে অঙ্গ গলিতপ্রায়—ক্ষতস্থানে শতসহস্র কীট। বিপ্র বসিয়া আছেন পথের ধারে—ভক্তোত্তম, তথাপি মানুষের ভয়, ঘৃণা অথবা করুণার পাত্র। কিন্তু আপন দুর্ভাগ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ তাঁহার মনে নাই। কেহ কাছে নাই আসুক, ঘৃণা করুক সকলে—ইহাই যেন তাঁহার কাম্য। অন্তরতম যিনি, তিনি তো দূরে নহেন—তিনি আছেন অন্তরেই, আর বাহিরে তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে শত শত কীট, একটি যদি দেহচ্যুত হইয়া পড়ে, বাসুদেব আবার তাহাকে সযত্নে দেহের মধ্যেই তুলিয়া রাখেন, এই দেহ তো মাটির নীচেই মিশিয়া যাইবে একদিন, তবুও যতদিন তিনি আছেন, এই তুচ্ছ ঘৃণিত দেহ দিয়াই পোষণ করিবেন কীটগুলিকে ‘হোক না কীট, তবুও কৃষ্ণের জীব!’

কূর্মতীর্থে—কূর্মবিগ্রহ দর্শনান্তে এক বিপ্রগৃহে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে প্রভু যাত্রা করিলেন অপর তীর্থপথে। প্রভু যখন বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন, তখন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাসুদেব কোন মতে জীর্ণ দেহটিকে টানিয়া আনিলেন বিপ্রগৃহে প্রভুর চরণ দর্শনের আশায়। আসিয়া দেখেন প্রভু নাই—এতক্ষণে কতদূর গিয়াছেন কে জানে? হতভাগ্য মৃত্যুপথযাত্রী বাসুদেব চরম হতাশায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ‘হায় দয়াল, হায় পতিতপাবন, এই পতিত অধমের প্রতি তোমার করুণা হইল না প্রভু! একবার দেখা দিলে না নাথ!’

বিপ্রের করুণ আর্তনাদ বুঝি মুহূর্তে গিয়া আঘাত করিল প্রভুর অন্তরে—প্রভু দ্রুত অধীর চরণে ফিরিয়া আসিলেন বিপ্রের কাছে। চমকিত বাসুদেব চাহিয়া দেখে—সম্মুখে দাঁড়াইয়া তপ্তসুবর্ণদ্যুতিমান্ সুপ্রসন্ন দেবতা—স্তম্ভিত পুলকিত বাসুদেব প্রভুর চরণে নিজেকে লুটাইয়া দিলেন, দুই বরাভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রভু বক্ষে তুলিয়া লইলেন বাসুদেবকে। সেই পুণ্য-স্পর্শে বাসুদেবের দেহ শীতল হইয়া যাইতেছে, চন্দন-সৌরভে বাতাস ব্যাপ্ত, আলোয় ভরিয়া গিয়াছে আকাশ। মুহূর্তে অঙ্গের সমস্ত ক্ষত যেন মন্ত্রবলে কোথায় অন্তর্হিত হইল, পরম সুন্দর উজ্জ্বল দেহ লইয়া বাসুদেব প্রভুর চরণতলে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন :

বহু স্তুতি করি কহে—শুন দয়াময়,
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতেই হয়!
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর,
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া। চৈঃ চঃ

'ওগো করুণাময়! ঘৃণিত ব্যাধিগ্রস্ত দেহ লইয়া এক কোণে পড়িয়াছিলাম—তাহাই তো ছিল ভালো, আজ সুন্দর এই দেহ লইয়া আমি কি করিব বলো! যেই দেহে ছিল কেবল কীটের বাস, আজ যে অহঙ্কার আসিয়া আশ্রয় করিবে সেই দেহে!'

'প্রভু কহে—কভু তোমার না হবে অভিমান,
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম!
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার,
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার।'

বাসুদেবকে দর্শন দান করিয়া তাহার দেহকে নিরাময় করিয়া প্রভু আবার চলিয়া গেলেন আপন গন্তব্য পথে।

গোপালচাপালও সেই ব্যাধিগ্রস্ত দেহ লইয়াই উপস্থিত হইলেন প্রভুর চরণে, কিন্তু প্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন নয়ন মেলিয়া একবারও তাকাইলেন না!

গোপালের আর্তক্রন্দনে প্রভুর হৃদয় গলিল না, ক্রুদ্ধ কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'দূর হও নরকের জীব! কোটি জন্ম-জন্মান্তরেও রৌরব-দাহ হইতে তোমার মুক্তি নাই। প্রভুর চরণে পড়িয়া গোপাল আর্তনাদ করিতেছেন—'রক্ষা করো, ওগো দয়াল! আমাকে তুমি কৃপা কর?

এইবার পাষাণে হয়তো একটি ক্ষীণ রেখা-পাত হইল, প্রভু বলিলেন—'আমার কাছে তোমার ক্রন্দন একান্তই নিষ্ফল, তোমাকে মুক্তি দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত নয়, যিনি তোমাকে কৃপা করিতে পারেন তিনি শ্রীবাস, তুমি তাঁহার কাছে যাও।'

শ্রীবাসের চরণেই গিয়া পড়িলেন গোপাল, অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন বার বার। শ্রীবাস দুঃখে লজ্জায় অভিভূত হইয়া গেলেন, ক্ষমা তো তিনি কবেই করিয়াছেন, তবে কেন আজ আবার প্রভু গোপালকে তাঁহার কাছেই পাঠাইলেন? করুণায় শ্রীবাসের চোখে আসিল অশ্রু, আর সেই জাহ্নবীধারায় অবগাহন করিয়া স্নিগ্ধ সুস্থ হইয়া উঠিলেন গোপাল!

ভক্তের মান রক্ষা করা ভগবানের ধর্ম, তাহাই করিলেন প্রভু শ্রীবাসকে উপলক্ষ্য করিয়া। ভক্তের মনে বাড়াইতে প্রভু ব্যগ্র, কিন্তু অভিমান নয়। ভক্তের মনে যদি অভিমানের বিন্দুমাত্রও স্ফুরণ হয়, তবে কঠোর হস্তে তাহা খর্ব করিতে প্রভুর এতটুকুও দ্বিধাও হয় না।

(২)

মথুরা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু যখন প্রয়াগে আসিলেন, তখন ভক্ত বল্লভ ভট্টের সঙ্গে

তাঁহার পরিচয় হয় এবং প্রভু তাঁহার আতিথ্যও গ্রহণ করেন।

তীর্থ-পরিক্রমান্তে প্রভু ফিরিয়া আসিবার পরে ভট্ট একবার নীলাচলে আসিলেন। প্রভু তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন—তিনি যখন প্রভুর কাছে আসিলেন, প্রভু তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিয়া কাছে বসাইলেন।

ভট্ট প্রভুকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেন কে জানে প্রভুর কানে সেই স্তুতি কিছুটা বেসুরা বাজিল! তিনি সবিনয়ে ভট্টকে বলিলেন, 'ছিঃ ছিঃ! আমাকে আপনি এ কি বলিতেছেন, আমি এক সাধারণ মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমার ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই! শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, রায় রামানন্দ ও স্বরূপাদি পরম জ্ঞানী, পরম কৃষ্ণভক্তগণ সর্বদাই আমাকে ঘিরিয়া রাখেন—আমার যাহা কিছু সামান্য ধন, যেটুকু কৃষ্ণভক্তি সব আমি ইঁহাদেরই কৃপায় লাভ করিয়াছি, আমার নিজের কোন সম্বলই নাই!' ভক্তগণের মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া ভট্ট হয়তো বা কিছুটা বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের দর্শন করিতে চাহিলে প্রভু ক্রমে ক্রমে সকলের সঙ্গেই তাঁহাকে মিলাইলেন। ভট্টের মনে হইল ইঁহারা ভক্ত—বৈষ্ণব, কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার মতো পাণ্ডিত্য তাঁহাদের নাই। ভক্তের বিনয় ও নম্রতার অন্তরালেও যে শুদ্ধ জ্ঞান লুকাইয়া থাকে, তাহা হয়তো বা ভট্ট বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আপন পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়া একদিন প্রভুকে ভাগবতের স্বকৃত টীকা শুনাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, 'আমি সাধারণ সন্ন্যাসী, নাম জপ করাই আমার ধর্ম, সারা দিনরাত্রি বসিয়া আমি কৃষ্ণনাম জপ করি, তথাপি আমার সংখ্যা পূর্ণ হয় না, ভাগবতের অর্থ শুনিবার আমার অধিকার নাই!'

পরম বিজ্ঞের মতো ভট্ট বলিলেন, 'ভালোই তো, যে কৃষ্ণনাম আপনি জপ করিতেছেন, সেই কৃষ্ণনামের কত প্রকার অর্থ এবং ব্যাখ্যা আমি করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন।'

প্রভু বলিলেন, 'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন—আমি কৃষ্ণনামের এই একটি অর্থই জানি, অন্য নাম, অন্য অর্থ আমার জানা নাই এবং তাহাতে আমার প্রয়োজনও নাই।'

বিষণ্ণ ক্ষুব্ধ মনে ভট্ট স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন—তাঁহার মন হইতে 'প্রভুভক্তি' কিছুটা কমিয়া গেল।

প্রভু শ্রবণ না করুন, তাঁহার ভক্তগণও যদি শ্রবণ করেন, তবুও ভট্টের মান রক্ষা হয়, কিন্তু প্রভু যাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, ভক্তগণ কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিলেন না।

নৈরাশ্যের চরম সীমায় পৌছিয়া ভট্ট এইবার পণ্ডিত গদাধরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। গদাধর প্রভুর প্রিয় সখা—নির্বিরোধ নিরীহ ভক্ত! ভট্টের আগ্রহাতিশয্যে ভট্টের ব্যাখ্যা শুনিতে বাধ্য হইলেন—ভট্টকে নিষেধ করিতে তাঁহার আভিজাত্যে বাধিল! প্রভু এবং তাঁহার ভক্তগণকৃত উপেক্ষার কিছুটা প্রতিকার করিতে পারিয়া ভট্টের মন এতদিনে যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। অপরদিকে প্রভুর ভয়ে বিশেষতঃ তাঁহার ভক্তগণের ভয়ে পণ্ডিত কম্পিত হইতে লাগিলেন। উভয় সঙ্কটে পড়িয়া অবশেষে পণ্ডিত অগতির গতি কৃষ্ণের শরণ লইলেন।

প্রভুর সভায়ও ভট্ট উপস্থিত হন এবং প্রায়ই রায় রামানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তের সঙ্গে নানা কূট-তর্কের অবতারণা করেন—উদ্দেশ্য তাঁহাদের 'লঘু' প্রতিপন্ন করা, কিন্তু নিজেই পরাজিত হন প্রতিবার, তথাপি তাঁহার অহঙ্কার দমিত হয়

না। একদিন ভট্ট আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচার্য! জীবমাত্রেই ঈশ্বরের 'প্রকৃতি'—তাহাই যদি হয়, তবে আপনারা পতির নাম গ্রহণ করেন কোন ধর্মের বিধানে?

প্রভুকে দেখাইয়া আচার্য বলিলেন, 'এই যে মূর্তিমান্ ধর্ম আপনার সম্মুখেই বিদ্যমান, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

প্রভু তখন ভট্টের দিকে ফিরিয়া বলিলেনঃ ভট্ট, তুমি পতিব্রতা ধর্মের মর্ম জানো না, তাই এই অহেতুক প্রশ্ন করিতেছ। 'পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে', অতএব পতির নাম জপ করাই পতিব্রতার ধর্ম এবং তাহার ফল কৃষ্ণপ্রাপ্তি।

ভট্ট অধৈর্য হইয়া উঠিলেন—আর কত অপমান তিনি সহ্য করিবেন—একদিনও কি তাঁহার জয় হইবে না?

এইবার ভট্ট নিজের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া একদিন প্রভুর সভায় উপস্থিত হইলেন। প্রভুর দিকে গর্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'আমি ভাগবতের যে টীকা রচনা করিয়াছি, তাহাতে শ্রীধর স্বামীর অনেক মত খণ্ডন করিয়াছি, তাঁহার বাক্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই, কাজেই আমি স্বামী (শ্রীধর স্বামী) মানি না।'

শুনিবামাত্র প্রভু হাসিয়া উঠিলেন—কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে যে বজ্র লুকানো ছিল, ভট্ট তাহা জানিতেন না প্রভু বলিলেন, 'যে নারী স্বামীকে মানে না, সে তো সহধর্মিণী নহে—সে স্বৈরিণী'।

'…স্বামী না মানয়ে যেই জন,

বেশ্যার ভিতর তারে করিয়ে গণন।' চৈঃ চঃ

এই একটি মাত্র চরম কথা বলিয়াই প্রভু নীরব হইলেন। রুদ্ধনিঃশ্বাসে ভক্তগণও বসিয়া রহিলেন নীরবে।

ভট্টের সমস্ত গর্ব চূর্ণ হইল—লজ্জিত নত মস্তকে ভট্ট ফিরিয়া চলিলেন নিজগৃহে—রজনীর অন্ধকারে নির্জন শয্যাতলে নিজেকে লুকাইয়াও যেন তাঁহার মন সান্ত্বনা পাইল না—ভাবিতে লাগিলেন—কেন এমন হইল, যে প্রভু প্রয়াগে তাঁহাকে এত অনুগ্রহ করিলেন—আজ কেন তাঁহার এই নিগ্রহ? অবশেষে নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন ভট্ট—ইহা যে প্রভুর নিগ্রহ নয়, তাঁহার প্রতি পরম প্রসাদ—তাহা বুঝিতে পারিয়া পরদিন প্রত্যুষে ভট্ট গিয়া প্রভুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলেন, তখন প্রসন্ন নির্মল হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল প্রভুর শ্রীমুখ—ভট্টের হৃদয়ও হইয়া উঠিল আনন্দমুখর। ভট্টকে ভক্তি-নম্রচিত্তে শ্রীধর স্বামীর আনুগত্যে ভাগবতের টীকা রচনা করিবার আদেশ দিলেন প্রভু!

এদিকে গদাধর বসিয়া আছেন প্রতীক্ষায়—প্রভু কবে ডাকিবেন, প্রভুও ডাকেন না, গদাধরেরও সাহস হয় না প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে। অন্তরঙ্গগণ হাসিয়া গদাধরকে বলেন—'তুমিও কেন ক্রোধ প্রকাশ কর না—তবেই প্রভু জব্দ হইবেন।' জিহ্বা দংশন করিয়া শান্ত গদাধর বলেন, ছিঃ ছিঃ! তিনি প্রভু, আমি দাস, তাঁহার সঙ্গে 'হঠ' করা আমার উচিত নয়।'

আজ গদাধরেরও ডাক আসিল—হাসিতে কান্নায় আনন্দে গদাধরের হৃদয় ভরিয়া গেল—প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন পণ্ডিত। প্রভুর কপট ক্রোধ মুহূর্তে যেন দূর হইয়া গেল, বলিলেন—'তোমার ক্রোধ দেখিবার জন্য এত করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তুমি ক্রুদ্ধ হইলে না—প্রিয়তম গদাধর, তুমি আমাকে কিনিয়া লইলে।'

(৩)

রায় রামানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ সাড়ে তিন জন পাত্রের একজন। তাঁহার পিতা ভবানন্দ রায়

ও তাঁহার অপর পুত্রচতুষ্টয়ও রামানন্দের সম্বন্ধেই প্রভুর একান্ত প্রিয়; ভবানন্দ রায়কে পঞ্চ পাণ্ডবের পিতা 'পাণ্ডু' বলিয়া প্রভু মান্য করিতেন।

সেই ভবানন্দ রায়ের পুত্র রামানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথও উড়িষ্যা রাজসরকারে কাজ করিতেন। রাজসরকারের কিছু অর্থের তিনি অপব্যয় করেন। তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র 'বড় জানা' সেই অর্থ আদায়ের জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কথায় কথা বাড়িতে লাগিল, হঠাৎ গোপীনাথ 'বড় জানা'কে উদ্ধতভাবে একটি কথা বলিয়া ফেলিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া বড় জানা গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করিলেন।

গোপীনাথকে বধ্যভূমিতে আনা হইল, এক উচ্চ মঞ্চের উপরে তাঁহাকে তোলা হইল, হস্ত পদ বাঁধা, নীচে তীক্ষ্ণধার খড়্গ পাতা—উপর হইতে ফেলিয়া হত্যা করা হইবে।

চারিদিকে সংবাদ রটিয়া গেল—রায়ের আতঙ্কিত ভীত বান্ধবগণ একে একে ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর কাছে ভীষণ হইতে ভীষণতর সংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন—কণ্ঠে আকুল আবেদন—'প্রভু রক্ষা করুন।'

প্রভু স্থির হইয়া বসিয়া আছেন—ক্রমে জানিতে পারিলেন, ভবানন্দ রায়ের অপর পুত্রদেরও বাঁধিয়া আনা হইয়াছে।

তখন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—কি অপরাধে গোপীনাথের এই কঠোর শাস্তি? অপরাধের কথা শুনিয়া কিছুটা যেন বিরক্ত হইয়াই প্রভু বলিলেন, 'রাজার প্রাপ্য অর্থ রাজা নিশ্চয়ই আদায় করিবেন—আমি নিঃসম্বল বিরক্ত সন্ন্যাসী—আমি ইহার কি করিব?'

ভক্ত বান্ধবগণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, হয়তো এখনই আশার বাণী—অভয় বাণী উচ্চারিত হইবে প্রভুর মুখ হইতে, কিন্তু যখন শেষ সংবাদ আসিল যে, এই মুহূর্তেই গোপীনাথকে খড়্গের উপরে ফেলা হইতেছে—তখনও প্রভুকে নির্বাক্ নির্বিকার দেখিয়া এইবার স্বরূপাদি অন্তরঙ্গগণ ব্যাকুল হইয়া প্রভুর চরণে মিনতি করিতে লাগিলেন:

'প্রভু! রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী, তোমার সব দাস।
তোমার উচিত নহে ঐছন উদাস॥' চৈঃ চঃ

শুনিয়া প্রভু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'তোমাদের সকলের কি ইহাই ইচ্ছা যে, আমি রাজার নিকটে গিয়া অঞ্চল পাতিয়া অর্থ ভিক্ষা করি?'

'তোমা সভার এই মত রাজার ঠাঞি যাঞা,
কৌড়ি মাগি লঙ মুঞি আঁচল পাতিয়া।'

'না, আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, আমি কিছুতেই তাহা পারিব না।' ভক্তগণ আবার মিনতি করিতে লাগিলেন, হয়তো প্রভুর তখন একটু কৃপা হইল—বলিলেন, 'গোপীনাথকে রক্ষা করিতে যদি সকলে এতই ব্যগ্র হইয়া থাকো, তবে যিনি পরম পরিত্রাতা—জগতের নাথ তাঁহার কাছেই গিয়া শরণ গ্রহণ কর।'

প্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হওয়া মাত্রই রাজপাত্র হরিচন্দন রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া গোপীনাথের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিবার অনুরোধ জানাইলেন।

রাজা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন: 'কই, আমি তো এই দণ্ডের কথা জানি না—আমার প্রাপ্যই শুধু আমি চাই, গোপীনাথের প্রাণ লইব কেন?' রাজা গোপীনাথের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলেন। হরিচন্দন বধ্যভূমিতে ছুটিয়া আসিয়া গোপীনাথকে বন্ধনমুক্ত করাইলেন; কতগুলি শ্রেষ্ঠ অশ্ব বিক্রয় করিয়া গোপীনাথও ঋণের অনেকাংশই শোধ করিয়া দিলেন।

গোপীনাথও মুক্তি পাইলেন, ভক্ত বান্ধবগণও স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রভু বসিয়া আছেন—এমন সময়ে রাজগুরু কাশীমিশ্র প্রভুর কাছে আসিলেন, প্রভু বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, 'মিশ্র, আমি আর এইস্থানে থাকিব না, আলালনাথে চলিয়া যাইব। ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী রাজকার্য করেন, তাঁহারা অপরাধ করিবেন আর লোকে আসিয়া আমাকে বিরক্ত করিবে? বিষয়ীদের কথা শুনিতে শুনিতে আমার মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে, এইরূপ স্থানে থাকিবার আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহাও নাই, প্রয়োজনও নাই।' কাশীমিশ্র চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, নানাভাবে প্রবোধ দিয়া প্রভুকে আপাততঃ কিছুটা শান্ত করিয়া কাশীমিশ্র নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহারাজা প্রতাপরুদ্র গুরু সন্নিধানে আসিলে গুরু মহাপ্রভুর নীলাচল ত্যাগের সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। ক্ষোভে ভয়ে বেদনায় রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, 'গুরুদেব! এ কি নিদারুণ কথা আপনি বলিলেন—কেন প্রভু চলিয়া যাইবেন? তিনি যে আমার কোটি চিন্তামণি তুল্য মহাধন—তাঁহার দর্শন পাইবার জন্য আমি রাজ্য ধন সমস্তই অনায়াসে বিসর্জন করিতে পারি। তাঁহার চরণের নিছনি লইয়া আমার প্রাণ সমর্পণ করিতেও আমি প্রস্তুত—গোপীনাথের কাছে প্রাপ্য লক্ষ কাহন তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ, আপনি প্রভুকে মিনতি করিয়া এইখানে রাখুন।'

কাশীমিশ্র বলিলেন, 'না মহারাজ, প্রাপ্য অর্থ ছাড়িয়া দিয়া গোপীনাথের অন্যায়ের সমর্থন করা প্রভুর অভিপ্রেত নহে, বরং ইহাতে তিনি বিরক্তই হইবেন।'

রাজা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'না, না, প্রভুর জন্য আমি প্রাপ্য ছাড়িতেছি—এ-কথা কিছুতেই আপনি প্রভুকে বলিবেন না। ভবানন্দ রায় আমার পরমপূজ্য, তাঁহার পুত্রগণ, বিশেষতঃ রায় রামানন্দ আমার পরম প্রীতিভাজন, তাই আমি তাঁহাদের প্রতি এইটুকু কর্তব্য করিতেছি মাত্র। তাহা ছাড়া আমি জানিতাম না যে, পুরুষোত্তমদেব (বড় জানা) প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়াছেন, সম্ভবতঃ গোপীনাথকে ভয় দেখাইবার জন্যই কুমার এই পরিহাস করিয়াছিলেন।'

মহারাজ প্রতাপরুদ্র গোপীনাথকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন—ঋণ আদায় করা দূরে থাকুক—গোপীনাথের মাসিক বেতন দ্বিগুণ বর্ধিত করিয়া দিলেন। গোপীনাথকে ডাকিয়া আনিয়া বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া সসম্মানে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন একটি মাত্র অনুরোধ করিয়া—'আর যেন তুমি রাজস্বের অপচয় করিও না।'

অত্যন্ত আহ্লাদিত চিত্তে কাশীমিশ্র রাজার এই মহৎ কার্যের কথা যখন প্রভুকে জানাইলেন—মিশ্রের আনন্দকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া বিষণ্ণ কণ্ঠে প্রভু বলিলেন—'একি করিলে মিশ্র! আমাকে দিয়া রাজপ্রতিগ্রহ করাইলে?'

বহু কষ্টে কাশীমিশ্র প্রভুকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন—রায়গোষ্ঠীর প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির জন্যই মহারাজ এই কার্য করিয়াছেন—প্রভুর জন্য নহে।

প্রভু যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। পঞ্চপুত্র সঙ্গে করিয়া ভবানন্দ রায় আসিয়া প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন। অশ্রুসজল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন: প্রভু! কি তোমার বিচিত্র লীলা, কি তোমার অপরিসীম করুণা! কোথায় বধ্যমঞ্চে 'মরণ-প্রসাদ', আর কোথায় ঐশ্বর্য

লাভ—এই 'পরম প্রসাদ'! তোমার চরণ স্মরণেরই এই ফল! কিন্তু প্রভু! আমি বিষয়ী, অধম, তাই কি তোমার চরণ-স্মরণের গৌণ ফলটিই তুমি আমাকে দিলে, মুখ্য ফল যে তোমার চরণ-প্রাপ্তি, তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলে কেন দয়াল? রামানন্দ ও বাণীনাথকে তুমি গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ বিষয়কূপে, আমাকেও তুমি বিষয় হইতে মুক্তি দাও!

প্রভু হাসিয়া বলিলেন: 'সকলেই যদি বিষয়-বিমুক্ত সন্ন্যাসী হইবে, তবে 'কুটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ?' বিষয়ীই হও আর বিরক্তই হও—তোমরা আমার নিজ জন, গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া সৎপথে অর্থ উপার্জন কর, এবং ধর্মার্থে ও পরার্থে তাহা ব্যয় কর—রাজার মূলধন কখনও গ্রহণ করিবে না, আদর্শ গৃহী ভক্ত হও—ইহাই আমার আদেশ।

অলঙ্ঘ্য এই আদেশ মাথায় লইয়া রায় ভবানন্দ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বরদ

(কীর্তন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

তোমারি প্রেমে বেসুরে নিতি
উছলে গীতি,
পঙ্কে ম্লান নিরবসান
ফোটে আলোকমল।
সলিলকণা উর্ধ্বটানে
গগন পানে
উড়ি আবেগে ফলায় মেঘে
রামধনু অমল।
মলিন কীট সগৌরবে
জনম লভে
প্রজাপতির রূপে অধীর
মুরলী তব শুনি'।
নিশার ব্যথা রূপান্তরি'
কে, তুমি মরি!
শ্যামল হাসি কলোচ্ছ্বাসি'
গাও প্রভাতী, গুণী।

ধর্ম-শব্দের অর্থ-সন্ধানে

শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়

ধর্মের শব্দগত ও মর্মগত অর্থের মাধ্যমে ধর্ম সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিতেছি। অরবিন্দ বলেন : যে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ নিয়মের দ্বারা ভগবান্ মানবজাতির আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করেন, তাহাকেই 'ধর্ম' বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভারতে 'ধর্ম' বলিতে কেবল সদসৎ কর্মের নীতি, ন্যায়-অন্যায়ের বিধান বা নৈতিক অনুশাসন বুঝায় না; বাহ্য ও অন্তর্জগতে নানা রূপ, নানা কর্ম, নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ভগবানের ইচ্ছা সাধিত ও বিকশিত হইতেছে—ইহার জন্য মানুষের সহিত ভগবানের, জগতের ও অন্যান্য জীবের সকল প্রকার সম্বন্ধ যে-নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সমগ্র অনুশাসনই ধর্ম। আমরা যাহাকে ধরিয়া রাখি এবং যাহা আমাদের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কার্যাবলীকে ধরিয়া রাখে—এই দুইই ধর্ম। ··· ধর্ম-শব্দের মূল নীতি অপরিবর্তনশীল বটে, কিন্তু ইহার রূপের পরিবর্তন ও বিকাশ সকল সময়ে চলিতেছে। ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রাম চলিবেই, রূপক দেবাসুরের সংগ্রামের মতো। ··· ধর্ম-শব্দের প্রাথমিক অর্থ—আমাদের প্রকৃতির মূলনীতিকে বুঝায় এবং ইহা অলক্ষ্যে আমাদের সমস্ত কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে, এবং এই অর্থে প্রত্যেক বস্তু, শ্রেণী, জাতি, ব্যক্তি বা সংঘের স্ব স্ব ধর্ম আছে। আবার আমাদের মধ্যে ভাগবত প্রকৃতির বিকাশ করিতে হইবে; যে রকম আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার দ্বারা সেই ভাগবত প্রকৃতি আমাদের সত্তায় বিকশিত হইয়া উঠে, সেই সকল ক্রিয়ার নীতিকেও ধর্ম বলা যায়, এবং ইহাই ধর্ম-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। আবার নিজেদের এবং সমগ্র মানবজাতিকে সুষ্ঠুভাবে ভাগবত আদর্শের দিকে অগ্রসর করাইবার জন্য আমাদের বহির্মুখী চিন্তা ও কর্ম, এবং আমাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ যে-নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়, তাহাকেও ধর্ম বলা হয়; ইহাই ধর্ম-শব্দের তৃতীয় অর্থ। ··· ধর্ম-শব্দটির একটি নৈতিক অর্থ আছে, একটি দার্শনিক অর্থ আছে, এবং একটি আধ্যাত্মিক অর্থ আছে (ethical, philosophical, religious); ধর্ম-শব্দের নৈতিক অর্থ হইতেছে সৎকর্মে প্রীতি, ন্যায্য আচরণের বিধান, অথবা আরও বাহ্য ও ব্যাবহারিক অর্থে—ধর্মের নৈতিক অর্থ হইতেছে : সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়ের বিধান; সংক্ষেপে এই অর্থে, ধর্ম হইতেছে কেবল সমাজের অনুশাসন-পালন। ··· কিন্তু এইরূপ বাহ্য প্রয়োজনই যদি সব হইত, তাহা হইলে খৃষ্ট ও বুদ্ধকে অবতার-পর্যায় হইতে বাদ দিতে হয়। ভগবানের অবতার-জীবনে সকল সময়েই আমরা দুই প্রকারের কর্ম দেখিতে পাই এবং এইরূপই হইবার কথা, কারণ জগতের মধ্যে অবতার ভগবানেরই কার্যের ভার গ্রহণ করেন, জগতে ভগবানের ইচ্ছা ও জ্ঞানের অনুসরণ করেন; এবং এই কার্যের সর্বদা দুইটি দিক আছে, একটি হইতেছে অন্তর্জগতে আত্মার উন্নতি-সাধন ও অপরটি হইতেছে মানবসমাজের—মানবজীবনের বাহ্য পরিবর্তন।

স্বধর্ম তাহা, যাহা জন্ম হইতে প্রাপ্ত, সহজাত ধর্ম নিষ্কামভাবে প্রতিপালন করা স্বধর্ম। গীতা ইহাকেই চাতুর্বর্ণ্যের মাধ্যমে ধর্ম বলিয়াছেন। ভগবান্ স্বধর্ম-পালনের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া অর্জুনকে যুদ্ধে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, মানবতা ধর্মের একটি প্রধান ধাপ; তাই বলা হয়, 'শোনরে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।' প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিতে পারা যায়, আমাদের উঠিবার শেষ ধাপঃ নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন, নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্। মনে হয়, ইহাই গীতার সাধনার লক্ষ্য।

ধর্মতত্ত্ব সহজ কথা নহে। এ-বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং হইতেছে। ধর্ম-শব্দ লইয়াই ('ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে') গীতা আরম্ভ হইয়াছে; আবার ধর্ম-শব্দ লইয়াই যেন গীতা শেষ হইয়াছে ('সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য')। ধর্ম কি? এ-প্রশ্নের উত্তর কঠিন। ধর্ম-শব্দে সাধারণতঃ আমরা বুঝি—হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম ইত্যাদি। প্রতি ধর্মেই বলা হয়—সেই ধর্মে নির্দেশিত আচরণাদি পালন করিলে ফল ভাল হইবে, পুণ্য হইবে, পূর্ণ বিকাশের দিকে যাওয়া হইবে, মৃত্যুর পরে সদ্গতি লাভ হইবে। অনেকে এই সব বিশ্বাস করেন, কেহ পূর্ণভাবে, কেহ আংশিকভাবে; অনেকে আবার বিশ্বাস করেন না। অনেকে অন্য ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সেই ধর্ম গ্রহণ করেন।

নিজস্ব ভাব বজায় রাখিতে বস্তু যাহাকে ধরিয়া থাকে, তাহাই ধর্ম; সাহায্যের ভাবে যাহাকে ধরিয়া আমরা আমাদের পূর্ণ বিকাশে উঠিতে পারি, তাহাই ধর্ম; ধর্মের সংজ্ঞায় দুইটিই পড়ে। প্রথম সংজ্ঞার উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, অগ্নির ধর্ম দাহিকা শক্তি, অর্থাৎ যাহাতে এই দাহিকা শক্তি নাই, তাহা অগ্নি নহে। ধর্মের দ্বিতীয় সংজ্ঞায় পড়ে পারলৌকিক ধর্ম, অর্থাৎ যাহা দ্বারা পরকালে সুগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা, এবং আরও অনেক ধর্ম (অর্থাৎ নীতি-সংবলিত স্থিতি), যথা বেদধর্ম, লোকধর্ম, আত্মধর্ম, কুলধর্ম, সমাজধর্ম, রাজধর্ম ইত্যাদি। পরিচিত ধর্মগুলি বিভিন্ন প্রকারের পারলৌকিক ধর্মের সহিতই সংযুক্ত।

মহাভারতে পারলৌকিক ধর্মের শাস্ত্রকে মোক্ষশাস্ত্র, এবং অন্যান্য কর্তব্য কর্মের শাস্ত্রকে ব্যবস্থাশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

সাধারণ বুদ্ধিতে ইহা স্পষ্ট যে, চারটি বিশেষ বিষয় মানুষের প্রয়োজন। এই চারটিকে চতুর্বর্গ বা পুরুষার্থ বলে; এগুলি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এখানে 'ধর্ম' অর্থে নীতি লইলে ভুল হইবে না। ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিদের বুঝিতে সরল হইবে, যদি এই চারিটি Study of ethics, of social economics, of aesthetics, and spiritual studies বলা হয়। মানুষ এগুলি ধরিয়া নিজেকে বিকশিত করিতে পারে, সে-হিসাবে এই চারিটির সমষ্টি 'ধর্ম' নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। আমাদের চতুরাশ্রম ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ+সন্ন্যাসাশ্রম, ধর্ম, অর্থ +কাম ও মোক্ষ-সম্বন্ধীয় শিক্ষা পাইবার জন্য ইহা সকলেরই স্বীকার্য যে, প্রথমেই চাই—নীতি-শিক্ষা, ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে অর্থমূলক ও কামমূলক শিক্ষা অনর্থমূলক হইয়া যাইবে এবং যাহার মন দুর্নীতিতে পূর্ণ, তাহার মন মোক্ষের দিকে যাইবেই না। তাই প্রথমে ব্রহ্মচর্যাশ্রম। সেখানে সে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই ব্যবহার করা হয় গার্হস্থ্যাশ্রমে। অর্থ ও কামের অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের নৈতিক ভাবে আহরণ ও ভোগেরও ব্যবহার এই আশ্রমে। তাহার পর বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রম অর্থাৎ সংসার হইতে সরিয়া আসা ও সমস্ত প্রাণমন দিয়া মোক্ষের সাধনে থাকা। চতুর্বর্গের 'ধর্ম' অর্থাৎ নীতি একটি বৃহৎ ব্যাপার—শারীরিক, মানসিক, সকল প্রকার নীতিই ইহার অন্তর্গত।

অর্থও সেইরূপ একটি বৃহৎ ব্যাপার; ইহা শুধু অর্থোপার্জন নহে—সে উপার্জনও নৈতিক ভাবে করিতে হইবে। ব্যাপক অর্থে ইহার ভিতর পড়ে নৈতিক ভাবে করণীয় আমাদের পেশাসমূহ, ডাক্তারি, মাষ্টারি, ব্যবসা ইত্যাদি, এবং মানুষের পারিবারিক কর্তব্য কি, সামাজিক কর্তব্য কি, প্রজার কর্তব্য কি, রাজার কর্তব্য কি ইত্যাদি অর্থাৎ মানুষের বহির্বিষয়ক ব্যবহার-ব্যাপার। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এই-সম্বন্ধীয়। স্বর্গপ্রাপ্তি ইত্যাদি কামনা করিয়া যাগযজ্ঞাদি এই আশ্রমের করণীয়, এইরূপ কামনাদি এই 'অর্থ' শব্দের ভিতরই পড়ে।

'কাম'ও সেইরূপ একটি বৃহৎ ব্যাপার; ইহা মাত্র সাধারণ তৃষ্ণা নহে—উহাও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে (ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ। ৭।১১)। ইহা মুখ্যতঃ বাহিরের ব্যবহার নহে, নিজের অন্তরের সহিত ব্যবহার, মনের বিকাশের জন্য যাহা প্রয়োজন, যথা স্বাধ্যায়, কাব্যচর্চা, সঙ্গীতচর্চা, শিল্পচর্চা ইত্যাদি। চতুর্থ মোক্ষ—সংসার হইতে মুক্ত হইবার সাধনা—বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম। গৃহে থাকিয়া ত্যাগের ভাবে থাকা যায় না, তাহা নহে। জীবিত থাকিতে থাকিতে সকল কামনা হইতে মুক্ত হইয়া যাওয়াই জীবন্মুক্তি, সর্বসঙ্কল্প-সন্ন্যাস। মনকে মোক্ষের সাধনায় নিযুক্ত রাখিতে ব্রহ্মচিন্তন, ভগবদ্-ভজন ইত্যাদি ব্যবস্থিত হইয়াছে, এবং ফলস্বরূপ কথিত হয় যে, উহা দ্বারা জীবনান্তে 'ক্রমমুক্তি' লাভ হইবে বা ব্রহ্মে বিলীনতা-প্রাপ্তি হইবে, বা বৈষ্ণবীয় সারূপ্য-সাযুজ্যাদি মুক্তি পাওয়া যাইবে। কয়েকটি ধর্মে ঈশ্বরের কোন কথা আনা হয় নাই, যথা বৌদ্ধধর্মে ও জৈনধর্মে; ষড়্দর্শনের বেদান্ত-দর্শন ছাড়া, অন্য পাঁচটিতে ঈশ্বরকে অতি গৌণভাবে রাখা হইয়াছে।

যে চতুর্বর্গের একদিকে 'ধর্ম' ও অন্যদিকে 'মোক্ষ' শব্দ রহিয়াছে, তাহা যে শুধু 'আশ্রমে'রই ক্রমনির্দেশক তাহা নহে, ইহার অর্থ—'অর্থ ও কাম' অর্থাৎ জীবনের সব জাগতিক ব্যাপার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিবে, এবং সকল সময়ে—শুধু বৃদ্ধাবস্থায় নহে, ঊর্ধ্বে দৃষ্টি থাকিবে অর্থাৎ মোক্ষের দিকে। নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রবৃত্তি-ধর্মের ভিতর দিয়া নিবৃত্তি-ধর্মে আসিতে হইবে। জীবনকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করিতে প্রবৃত্তি-ধর্ম ও নিবৃত্তি-ধর্ম দুইয়েরই প্রয়োজন। নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত প্রবৃত্তি-ধর্ম মোটেই নিন্দনীয় নহে। ইহাই মহাভারতোক্ত 'নারায়ণীয় ধর্ম'। প্রবৃত্তি-ধর্ম সর্বদাই নিজের অন্তরে নিবৃত্তি-ধর্মের বীজ নিহিত রাখে, সময়ে সে বীজ আপনি অঙ্কুরিত হয়। পূর্ণ ধর্ম এ দুইয়েরই মিলনে ও চতুবর্গ এই পূর্ণ ধর্মের সমগ্র চিত্র।

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটা এইভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার সংক্ষেপ এই যে, যাহাকে 'মনুষ্যত্ব' বলা হয়, তাহাই 'ধর্ম'। এই মনুষ্যত্ব-ভাবনা বঙ্কিম-বাবু চার ভাগে ফেলিয়াছেন—(১) শারীরিকী (২) কার্যকারিণী (৩) জ্ঞানার্জনী (৪) চিত্তরঞ্জিনী। ইহার সহিত পারমার্থিকী আর একটি কথা আমাদের মনে আসে। দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগকে বলা যাইতে পারে, কর্ম জ্ঞান ও আনন্দ, ত্রিবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল, এগুলি সৎ চিৎ ও আনন্দ—এই মহাতত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়।

ইচ্ছা করিলে আরও তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: (১) নিজের উৎকর্ষ-সাধন, (২) সকল প্রাণীর সহিত সুব্যবহার ও তাহাদের মঙ্গল-সাধন, (৩) ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সর্বকর্মের ফল তাঁহাকে অর্পণ।

মনুসংহিতা চারভাগে ধর্মের বিচার করিয়াছেন: বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও 'স্বস্য প্রিয়মাত্মনঃ' অর্থাৎ আত্মবিচারসিদ্ধ আত্মগ্লানি-হীন যাহা (মনু, ২ অধ্যায়)। বেদ সর্বোপরি, তন্নিম্নে স্মৃতি, তন্নিম্নে আচার।

ধর্ম তিন শ্রেণীতে এই ভাবেও ফেলা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণী, যাহা 'সামান্য' ধর্ম অর্থাৎ যাহা সকলের পালন করা কর্তব্য, যথা মনুনির্দেশিত দশটি ব্যবহার: ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ঃ শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকম্ ধর্মলক্ষণম্॥ এগুলি সর্বজনীন। তুলনীয়: Moses-এর 'Ten Commandments'। উপরি-উক্ত দশ লক্ষণে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কোন কথা নাই, তাহা বোধ হয় এই জন্য যে, লক্ষণগুলি যাহাতে সর্বজনীন হয়। পতঞ্জলির যমনিয়মাদি অনেকটা সর্বজনীন, তবে তাহাতে 'ঈশ্বর-প্রণিধান' আছে। গীতার ১৬।১—৩ শ্লোকের ভাব সর্বজনীন।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে স্ব-ধর্ম-পালন, অর্থাৎ বর্ণ-ধর্ম-পালন। সর্বজনীন না হইলেও কিছুটা সর্বজনীন, কারণ ইহা সকল দেশে কোন-না-কোন আকারে আছে—কেহ অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও যাজকতা করে, কেহ সৈন্যদলে যায়, কেহ ব্যবসায়াদি করে, কেহ চাকরি করে। ভারতবর্ষে বর্ণ জন্মগত হইয়াছে; জাত ব্যক্তি নিজের ধর্মের একটি আচার না পালন করিলেও জন্ম-প্রাপ্ত শ্রেণীগত নাম দ্বারা আখ্যাত হয়। গীতা এই বর্ণ-ধর্মের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, তবে গুণকর্মের দ্বারা ইহা প্রাপ্তব্য, গীতায় এইরূপ ইঙ্গিতও রহিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে উপাসনা পূজা ইত্যাদি। ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ধর্ম, এবং মানুষ ইহা আলোচনা করে নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাসে ও সাধারণতঃ পারলৌকিক কল্যাণ পাইবার জন্য, তবু যত গণ্ডগোল এই শ্রেণীতেই থাকে; ইহারই উপর গড়িয়া য়াছে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম, আবার প্রতি দলে বহু সম্প্রদায়। এই সব ধর্মে ও সম্প্রদায়ে, শুধু ঝগড়া মারামারি নহে, খুনো-খুনি পর্যন্ত হয়।

'ধর্মে' দুর্নীতিমূলক অনেক কিছু আসিয়াছে। কর্তব্য প্রতিপালন না করা তো আছেই, ধর্মের মুখোস-পরা নানা ভাবের অধর্মও আসিয়াছে। ভাগবতে (১৫।১১-১২) এইরূপ কয়েকটির নাম আছে, যথা: ধর্মচ্ছল (শব্দের দ্বি-অর্থের, বা কল্পিত ব্যুৎপত্তির সুযোগ লইয়া যেন ধর্মপ্রচার করা হইতেছে, এই ভাবে বিকৃত এমনকি বিপরীত ব্যাখ্যা প্রচার করা), ধর্মাভাস (অপ-যুক্তির সাহায্যে নিজ মতের প্রচার) ইত্যাদি।

ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান (ritual) যেমন কলহের কারণ, অবিশ্বাস্য পৌরাণিক কাহিনী (mythology)-ও তেমনি অনেক সময় ধর্মকে খাটো করিয়া দেয়। ফলবিবৃতি এত অর্থবাদপূর্ণ হইয়াছে যে, অনেক মানুষ তাহা শুনিয়া হাসিয়া ফেলে। ধর্মপ্রচারকেরা না বুঝিয়া ধর্মকে এরূপ করিয়া ফেলিয়াছে যে, অনেকে ইহাকে পুরোহিতের কারসাজি ও 'আফিং' বলিতে শুরু করিয়াছে, কারণ সাধারণ লোকে এইসব আখ্যায়িকায় ও ফলশ্রুতিতেই রস পায়, আবিষ্টের মতো হইয়া পড়ে; দার্শনিক তত্ত্বের দিকে কেহই মন দেয় না, শাঁস ছাড়িয়া খোলা চিবাইতে থাকে। এজন্যই চার্বাক পুরোহিত-দিগকে 'ভণ্ড ধূর্ত নিশাচর' বলিয়াছিল। ধর্মের নামে আমাদের বহু অনাচার গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং এখনও বলিষ্ঠ ভাবে রহিয়াছে—তাহার ভিতর বিশেষ একটি 'ছুঁৎমার্গ'। বড় দুঃখেই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: 'এখনকার হিন্দুর ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই। ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের

হাঁড়ির ভিতর। এখনকার হিন্দুর ধর্ম বিচার-মার্গে নয়, জ্ঞানমার্গে নয়, 'ছুঁৎমার্গে'। মন ও শরীরের উপর ভোজনের প্রভাব আছে বটে, তবে সে এক জিনিস, আর ছুঁৎমার্গ অন্য জিনিস। ছুঁৎমার্গ আহারশুদ্ধির অপপ্রয়োগ। অনেকে অনেক বিষয়ে নিষ্ঠার দোহাই দেন; কিন্তু নিষ্ঠা অন্তরের জিনিস। সীতারামের ভক্ত বলিয়া রাধাশ্যামের মূর্তি দেখিব না, তাহাদের মন্দির চূর্ণ করিয়া দিব, ইহা কিরূপ ধর্ম? আমরাই না বলি, 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'?

'ধর্ম কি?' ইহার উপর পাশ্চাত্য দেশেও অনেক কিছু লিখিত হইয়াছে ও হইতেছে। এক Encyclopædia Britannica-তেই শুধু Religion-এর উপরে দশ বার পৃষ্ঠা রহিয়াছে। ইহা সকলের পড়া উচিত। ইহা ছাড়া সম্বন্ধিত -বিষয়সমূহের উপর বহু আলোচনা ঐ বিশ্বকোষের নানা স্থানে আছে। ছোট বইয়ের ভিতর Comparative Religion (Penguin book series) উল্লেখযোগ্য পুস্তক। Science and Religion (Broadcast Symposium) একটি অনতিবৃহৎ উল্লেখযোগ্য পুস্তক, যাহাতে পাওয়া যাইবে বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও বহু ধর্ম-যাজকের ভাষণ। স্বামী বিবেকানন্দের Study of Religion, ডঃ রাধাকৃষ্ণনের Hindu view of life, রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' ও The Religion of man, শ্রীরামকৃষ্ণ Centenary প্রকাশিত Religions of the world, ভগিনী নিবেদিতার Dharma and Religion এবং অ্যানি বেসান্তের বইগুলিও উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম-সম্বন্ধে অতি প্রাচীন ঈশোপনিষদ্, প্রথম দুইটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি মূল্যবান্ কথা, চাই—ঈশ্বরকে সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন বলিয়া ভাবা, ও চাই—নিষ্কাম ভাবে নিজ কর্তব্য করা।

ধর্মসম্বন্ধে শাস্ত্রসমূহ অনেক কথা বলিয়াছেন। যাহা দুর্গতি ও পতন হইতে মানুষকে রক্ষা করে, তাহাই ধর্ম। আবার পাওয়া যায়, পাঁচটি যম (অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ) এবং পাঁচটি নিয়ম (শৌচ সন্তোষ তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান); ইহাদের পালনই ধর্ম—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শন বলেন, 'যতোঽভ্যুদয়ঃ, নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ'। মহা-ভারতে, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, 'অহিংসা সত্যমক্রোধ আনৃশংস্যং দমস্তথা। আর্জবং চৈব রাজেন্দ্র নিশ্চিতং ধর্মলক্ষণং ॥' (অনুশাসন-পর্ব ২২।২১)। মহাভারতে শান্তিপর্বে আরও অনেক কথা আছে। মনুসংহিতার অনুশাসন যাহা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, তাহাও আছে। ধর্মের ব্যাখ্যায় মহাভারত পূর্ণ। বনপর্বে (১৩১,১১) সুন্দর একটি কথা পাই, 'অবিরোধাৎ তু যো ধর্মঃ স ধর্মঃ সত্যবিক্রমে।' বৌদ্ধ বলেন, চিত্তের শুভ বাসনাই ধর্ম। সাংখ্য ও যোগমতে মনের বৃত্তি বিশেষই ধর্ম। প্রভাকর ও নৈয়ায়িক মতে ও বশিষ্ঠের মতে বিহিত যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় পাইবার জন্য 'অপূর্ব'ই ধর্ম-শব্দের বাচ্য। ভট্টমতে যাগাদি ক্রিয়া ধর্ম। জৈমিনি (পূর্বমীমাংসা) বলেন, 'চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ', অর্থাৎ যাহা লোকের প্রেরণার হেতু, অথচ বেদের বিধিবাক্য হইতে গম্য তাহা ধর্ম, যথা: যাগাদি স্বর্গাদি প্রাপ্তির হেতু, ও বেদবিধিগম্য। চোদনা—অভিলষিত বিষয়ে প্রবৃত্তি, ও অনিষ্ট বিষয়ে নিবৃত্তি যে বাক্য হইতে হয়। শবরস্বামী, কুমারিল আদি বলেন: বেদ, স্মৃতি, শীল, ধার্মিকগণের আচার ও আত্মতুষ্টি এই পাঁচটি ধর্মে লইয়া যায়। চিত্তশুদ্ধি (যজ্ঞ দান তপস্যা ইত্যাদি) ধর্মের একটি ধাপ। সৎসঙ্গ, শ্রদ্ধা, শ্রবণ, মনন, নিদি-ধ্যাসন ইত্যাদি সোপান ও কর্মযোগাদি মার্গ। শাস্ত্র অনন্ত, অনন্তভাবে ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ধর্মসম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের অনেক পুস্তকে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে। আমাদের দেশের মনীষীরাও অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়াছেন। ধর্মবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দুই-একটি বাণী উদ্ধৃত করা হইল:

'ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড় হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে।...বর্তমান হিন্দু সমাজে নিজের মধ্যে তার বিভাগের অন্ত নাই।...হিন্দুর ধর্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে জানালা দরজা বন্ধ, এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলই বেড়া ও প্রাচীর।' 'ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে, তখনি সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মের মৈত্রী করুণা, এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়-প্রসারতাই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ মুছিয়ে দিয়েছিল।'

রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের ভক্ত ছিলেন। সরল অথচ চোখ ফুটিয়ে দেওয়া গান 'তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে; তোমার ডাক শুনি সাঁই, চল্‌তে না পাই, রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরুসেদে।' 'ও তোর কিসের ঠাকুর ঘর? (যারে) ফাটকে তুই রাখলি আটক, (তারে), আগে খালাস কর।' 'মন্ত্রে তন্ত্রে পাতলি যে ফাঁদ, দেবে সে কি ধরা? উপায় দিয়ে কে পায় তারে, শুধু আপন ফাঁদে মরা।'

আচরণ ধর্মের বিশেষ অঙ্গ, তাই চৈতন্যদেব বলিয়াছেন, শুধু হরিনামকীর্তন করিলে হইবে না। অমানী ও মানদ হইয়া কীর্তন করিতে হইবে: 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥' 'মানুষকে ভালবাসো,' এই কথাই রহিয়াছে Bible-এর বহুস্থানে (যথা: Love thy neighbour as thyself), এবং গীতার বহুস্থানে ইহাই ফুটিয়াছে। 'Abou Ben Adhem' কবিতাটিতে বাল্যকালে পড়িয়াছি: I pray thee then,

Write me as one who loves
his fellowmen,
And lo! Ben Adhem's name
led all the rest.

জীবকে শিববৎ দেখিবে, জীব শিব; দয়া নয়, আর্তের সেবা করিবে—এই সব কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব অনেক কিছুই বলিয়াছেন। আর, প্রাণের ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়! ......বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?'

আর বলিয়াছেন: কায়মনোবাক্যে জগৎ-হিতায় হ'তে হবে, আর 'দরিদ্রদেবো ভব,' দরিদ্র নারায়ণ, অর্থাৎ নারায়ণ-ভাবে দরিদ্রকে দেখবে, দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, দুঃস্থ, এরাই তোমার দেবতা হোক, এদের সেবা পরম ধর্ম জানবে। আর বলিয়াছেন: I do not believe in a God or a religion which cannot wipe the widow's tears or bring a piece of bread to an orphan's mouth. এই যুগাচার্য সুন্দরভাবে বলিয়াছেন: 'Religion is the manifestation of the Divinitiy already in man.'

গীতায় বহুবার 'ধর্ম' শব্দ আসিয়াছে। 'ধর্ম' শব্দ খুব জোরের সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে ভগবানের এই দুইটি শ্লোকে:

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৪।৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৪।৮

কিন্তু ধর্ম কি, অধর্ম কি—ভগবান্ তো কই এখানে কিছু বলিলেন না। আমরা শুধু আন্দাজ করিয়া বলি যে, ধর্ম হয় তো সেই যোগ,

যে যোগ ভগবান্ বিবস্বান্‌কে বলিয়াছিলেন, হয়তো তাহা, যাহা নারায়ণীয় 'প্রবৃত্তি' ধর্ম; বা চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম, যাহার কথা পাচ শ্লোকের পরেই আসিয়াছে। এই চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম, বা নিষ্কাম ভাবে স্ব-ধর্ম পালনের উপর গীতা বহুস্থানে জোর দিয়াছেন। যথা:

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥৩।৩৫
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥১৮।৪৭
স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥১৮।৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥১৮।৪৬
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥১৮।৪৮

উপরি-উক্ত কয়েকটি শ্লোকে স্ব স্ব বর্ণের কর্মকেই ধর্ম বলা হইতেছে, 'স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য' শ্লোক হইতে 'পাপমবাপ্স্যসি' পর্যন্ত (২।৩১-৩৩) কয়েকবার 'ধর্ম' শব্দ আসিয়াছে, ইহার অর্থ সর্বত্রই ক্ষাত্র ধর্ম বা অর্জুনের স্বধর্ম। কিন্তু গীতার সর্বত্র 'ধর্ম'-শব্দ বর্ণ-ধর্মের অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই; 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য' চরণের (২।৪০) ধর্মের অর্থ কর্মযোগ পাই; আবার 'প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যম্' ও 'অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ' (৯।২,৩, এই চরণগুলিতে ধর্মের অর্থ ভক্তি পাই, আর 'যে তু ধর্মামৃতমিদং' বাক্যে (১২।২০) ধর্মের অর্থ অমৃততুল্য ভক্তি ও গুণাতীতত্ব পাই। 'শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য' চরণে (১৪।২৭) ধর্মের কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাই না, তবে ভাবটা বুঝা যায়; রাজসী বুদ্ধি ও রাজসী ধৃতির শ্লোক-গুলিতে (১৮।৩১,৩৪) ধর্মের কোন ব্যাখ্যা পাই না। গীতা শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা কার্যাকার্য নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন (১৬।২৪)। কিন্তু সে কোন্ শাস্ত্র? উত্তর—গীতা নিশ্চয়ই। কিন্তু গীতা তো বহু শাস্ত্রের সমষ্টি।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মঃ ধারয়তে প্রজাঃ।
যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

অর্থাৎ ইহাই স্থির যাহার দ্বারা সকল প্রজার ধারণ, যাহা চলিয়া গেলে সকল বন্ধন ছিন্ন হয়, তাহাই ধর্ম।

বিবেকানন্দের বুদ্ধভক্তি

শ্রীসুধাংশুবিমল বড়ুয়া

স্বামী বিবেকানন্দ আজীবন ভগবান্ বুদ্ধকে ভক্তি ক'রে এসেছেন। বুদ্ধদেবের প্রতি প্রগাঢ় আকর্ষণ-হেতু সন্ন্যাস-জীবনের সূচনাতেই তিনি বুদ্ধগয়ায় ছুটে গিয়েছিলেন। বুদ্ধগয়ার সেই সুমহান্ বোধিদ্রুমতলে উপবেশন ক'রে তিনি ভাবতে লাগলেন, 'একি সম্ভব যে, তিনি যে বায়ুতে শ্বাস নিয়েছিলেন, আমিও সে বায়ুতে শ্বাস নিচ্ছি? তিনি যে মাটিতে বিচরণ করেছিলেন, আমিও সে মাটিতে বিচরণ করছি?' আবার জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তিনি জাপানী মনীষী ওকাকুরার সঙ্গে বুদ্ধগয়া দর্শন করতে যান। ভারত-ভ্রমণকালে একসময়ে ভগবান্ বুদ্ধের ভস্মাবশেষ স্পর্শ ক'রে যেভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, সে-কথা তিনি বহুবার উল্লেখ করেন। এ-থেকে অনুমান করা যায়, বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর কি গভীর ভক্তি ছিল।

ভগবান্ বুদ্ধের প্রতি বিবেকানন্দের এই আকর্ষণের কারণ ছিল তাঁর জীবনের মর্মমূলেই। লৌহের মধ্যেও আকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে বলেই চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করতে পারে। বিবেকানন্দের জীবনের মূলে সেই আকর্ষণী শক্তি ছিল বলেই বুদ্ধের সীমাহীন মহত্ত্ব তাঁকে এমনি-ভাবে আকর্ষণ করতে পেরেছে। তিনি শুধুমাত্র দার্শনিক মতবাদ কিংবা ঐতিহাসিক পর্যালোচনা হিসাবে বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন করেননি। নিজের জীবন দিয়ে যা উপলব্ধি করেছেন এবং নিজের জীবনে যা প্রমাণ করেছেন, সেই সত্যকেই তিনি এখানে প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া ধর্মীয় মত-বাদের দিক থেকে তিনি ছিলেন বেদান্তের অনুগামী, বৌদ্ধদর্শনের নয়। কিন্তু অন্যদিকে তাঁর নিকট আদর্শের চেয়ে জীবন অনেক বড়, মত-বাদের চেয়ে মানুষ বেশী সত্য। মহৎ আদর্শ যেখানে জীবনসত্যে বিকশিত হয়ে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ সাধন করেছে, বিবেকানন্দ সেখানে অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাই আমরা দেখতে পাই, 'যে শঙ্করের দার্শনিক মতবাদ বৌদ্ধ দর্শনকে ছাড়িয়ে গেছে' ব'লে তিনি মনে করেন, 'সেই শঙ্কর আবার বুদ্ধের অপূর্ব হৃদয়বত্তার অণুমাত্র পাননি'—এ কথাও তিনি বলেছেন। বুদ্ধদেবের মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

নির্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্মের যে-সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect এবং heart, যাহা জগতে আর হইল না।

ক্ষুদ্র ছাগশিশুর জন্য বুদ্ধদেবের জীবনদানের সংকল্প, বারবনিতা আম্রপালির প্রতি করুণা, মৃত্যুর পূর্বেও অন্ত্যজ অস্পৃশ্যের গৃহে অন্নগ্রহণ, পাঁচ-শ বার পরহিতার্থে জন্মগ্রহণ ও জীবন-বিসর্জন প্রভৃতি তিনি বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধের জীবনের এই সীমাহীন মহত্ত্বের জন্যই বিবেকানন্দ নিজেকে বুদ্ধের দাসানুদাস ব'লে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন।

'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' বুদ্ধ-বচনটি বিবেকানন্দের রচনাবলীর মধ্যে বহুস্থানে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দের জীবনের প্রধান ব্রতই ছিল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'।

আর যে মহামানব বুদ্ধ মানবকল্যাণের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তাঁর প্রতি বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা থাকা খুবই স্বাভাবিক।

'আমি একমাত্র কর্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই।'[১]

বুদ্ধদেবের মতো মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প ছিল তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা। এর কাছে তিনি ভক্তি-মুক্তি ও শুষ্ক পাণ্ডিত্যকে অতি তুচ্ছ মনে করতেন। একদিন উত্তেজিত হয়ে তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে বলেন:

সরে দাঁড়াও! কে তোমার শ্রীরামকৃষ্ণকে চায়, কে তোমার 'ভক্তি, মুক্তি' নিয়ে মাথা ঘামায়? শাস্ত্র কি বলছে না বলছে—কে শোনে? যদি আমি আমার তমোহ্রদে নিমজ্জমান স্বদেশবাসীকে কর্মযোগের দ্বারা অনুপ্রাণিত ক'রে প্রকৃত মানুষের মতো নিজের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, তাহলে আনন্দের সঙ্গে আমি লাখ নরকে যাব। আমি তোমার রামকৃষ্ণ বা অপর কারো চেলা নই; যারা নিজেদের ভক্তি-মুক্তির কামনা ত্যাগ ক'রে দরিদ্র-নারায়ণ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে, আমি তাদের চেলা—ভৃত্য—ক্রীতদাস।

আর্ত ও নিপীড়িত মানবের কাতর ক্রন্দনে মহাকারুণিক বুদ্ধ একদিন ঘরছাড়া সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তেমনি দুঃখ-দৈন্য-নিপীড়িত পতিত ভারতবাসীর কাতর আহ্বানে বিবেকানন্দ সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বাস্তব জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতাও তাঁকে পরবর্তীকালে দুঃখজয়ের সাধনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। চোখের সুমুখে দেখেছেন অনাহারে ক্লিষ্ট মা-ভাই-বোনের শীর্ণ মুখচ্ছবি! সেই দৃশ্য একদিন দেখতে পেলেন স্বদেশের বৃহৎ পটভূমিকায়। স্বজাতির অধঃপতিত মানুষের জন্য চিরদিন তাঁর হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ হয়েছে। দেশের মানুষকে তিনি যেভাবে ভাল বেসেছেন, তেমন ক'রে আর কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ। দেশের এই নিরীহ পদদলিত মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসা একটি পত্রে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে:

এস, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরোহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি। দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর। বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই; না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি। আমি এদেশে (পাশ্চাত্যে) যাদের গরিব বলা হয়, তাদের দেখছি—আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকের হৃদয় এদের জন্য কাঁদছে! কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশকোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বলো? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক—এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য কাজ কর, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা কর—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাকেই আমি মহাত্মা বলি, যার হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়, তা না হ'লে সে দুরাত্মা।[২]

১ পত্রাবলী, ১ম ভাগ, পৃ. ৪১৯।

২ ঐ পৃ. ৩১২।

১৮৯৮ খৃঃ ২৫শে মার্চের পুণ্যতিথিতে মানস-কন্যা নিবেদিতাকে দীক্ষাদানের সময়ও মহাপ্রেমিক বিবেকানন্দ যে-পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, তার থেকেও তাঁর চরিত্রের প্রধান দিকটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ভগবান্ বুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ক'রে তিনি আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললেন[৩], 'যাও বৎসে, যিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে পাঁচশত বার অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও প্রাণবিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অনুসরণ কর।'

বুদ্ধদেবের ত্যাগধর্মও বিবেকানন্দকে কম মুগ্ধ করেনি। যিনি রাজপুত্র হয়েও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তাঁর প্রতি বিবেকানন্দ অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি দেশের যুবক-সম্প্রদায়কে বারে বারে ডাক দিয়েছেন দেশের সেবায়—নরনারায়ণের সেবায় নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দেবার জন্য। বিবেকানন্দ কর্তৃক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গঠনের মধ্যেও বৌদ্ধ সংঘের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আজও বিবেকানন্দের অনুগামিগণ আমাদের দেশে মহান্ সেবাধর্মের আদর্শ উজ্জ্বল ক'রে রেখেছেন।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জগতের মহাপুরুষদের মধ্যে একমাত্র গৌতমবুদ্ধই সম্পূর্ণ অভিসন্ধি-বর্জিত আদর্শ কর্মযোগী। বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্য মহাপুরুষগণের সকলেরই কর্মপ্রয়োজক প্রবৃত্তির কারণ ছিল বাইরের অভিসন্ধি। এঁদের কেউ জগতে অবতীর্ণ ঈশ্বর, কেউ বা ঈশ্বরের পুত্র, আবার কেউ ঈশ্বরের প্রেরিত প্রতিনিধি। তাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেই স্বর্গলাভের অধিকারী হওয়া যায় ব'লে তাঁরা ঘোষণা করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব বললেন, তুমি নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, অন্য কেউ তোমাকে মুক্তি দিতে পারে না। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে সূক্ষ্ম বিচার করার প্রয়োজন কি? সত্য যা-ই হোক না কেন, কুশল কর্ম সম্পাদন করলে তা লাভ করা যায়। জগতের শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে বিবেকানন্দ বললেন:

তিনি সম্পূর্ণরূপে সর্বপ্রকার অভিসন্ধিবর্জিত ছিলেন; আর কোন্ মানুষ তাঁহা অপেক্ষা অধিক কার্য করিয়াছিলেন? ইতিহাসে এমন একটি চরিত্র দেখাও, যিনি সকলের উপরে এতদূর গিয়াছেন। সমুদয় মনুষ্যজাতি কেবল এইরূপ একটিমাত্র চরিত্র প্রসব করিয়াছে—এতদূর উন্নত দর্শন! এমন অদ্ভুত সহানুভূতি! এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর উপর পর্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ লোকের নিকট কোন দাবিদাওয়া নাই। বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী—তিনি সম্পূর্ণ অভিসন্ধিশূন্য হইয়া কার্য করিয়াছিলেন; আর মনুষ্যজাতির ইতিহাস দেখাইতেছে—যত লোক জগতে জন্মিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সহিত অন্য সকলের তুলনা হয় না।[৪]

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে বুদ্ধদেব মানবাত্মার মুক্তি ঘোষণা করলেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হ'ল জন্মে নয়, কর্মে ও সদাচরণে। সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য মানুষও এতদিনে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এটিও বুদ্ধদেবের প্রতি বিবেকানন্দের অনুরাগের অন্যতম প্রধান হেতু। অস্পৃশ্য অন্ত্যজের গৃহে বুদ্ধদেব সানন্দে অন্নগ্রহণ করেন, চণ্ডালকে আলিঙ্গন করতে দ্বিধা নেই, ক্ষৌরকার উপালিও বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্যের মর্যাদা পেয়েছেন—এ সমস্ত কাহিনী বিবেকানন্দ কতবার গভীর আবেগ সহকারে

৩ ভগিনী নিবেদিতা,—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা।

৪ কর্মযোগ (বিংশ সং), পৃ. ১৬৮

প্রকাশ করেছেন।[৫] বিবেকানন্দের জীবনেও দেখা যায়, মুসলমানের গৃহে তিনি নিঃসঙ্কোচে অন্নগ্রহণ করছেন, বৃন্দাবনের পথে মেথরের হাত থেকে কলকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠা নেই।[৬] ছুঁৎমার্গ, খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার, পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকি প্রভৃতির পুঞ্জীভূত গ্লানিতে বহুযুগ ধরে জাতির প্রাণশক্তির বিরাট অপচয় হয়েছে। তাই জাতির প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ ক'রে বিবেকানন্দ বলেছেন:

মহা দঁক সামনে—সাবধান, ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়। ঐ দঁক হচ্ছে যে, হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা, ব্যস্। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইয়োনা। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকবে না কি? যারা এক টুকরো রুটি গরিবদের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দেবে! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র করবে? ছুঁৎমার্গ is a form of mental disease (একপ্রকার মানসিক ব্যাধি), সাবধান! All expansion is life, all contraction is death.[৭]

আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গদের হোটেলে গিয়ে স্বদেশের ছুঁৎমার্গের আরেকটি রূপ তিনি দেখতে পান। সেখানেও কালা আদমির সঙ্গে খেলে শ্বেতাঙ্গদের জাত্যভিমানে আঘাত লাগে। এই অবস্থা দেখে বিবেকানন্দ এক জায়গায় শ্লেষ ক'রে বলেছেন, 'তখন মার্কিন মুলুককে অনেকটা দেশের মতো ভাল লাগতে লাগলো'।[৮]

বৌদ্ধযুগে ভারতের যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছিল এবং যেভাবে ভারতের বাণী পৃথিবীর দিগ্ দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, সে-কথা বিবেকানন্দ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। বৌদ্ধযুগে ভারতীয় সম্রাট্‌গণের গৌরবময় ঐতিহ্য বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সম্রাট্‌গণের ন্যায় ভারতের গৌরববৃদ্ধিকারী রাজগণ আর কখন ভারত-সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই।[৯]

এখানে বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে ভারতের ইতিহাসে বৌদ্ধযুগের স্থান-নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ উক্তিও স্মরণীয়:

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য-শক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল, এমন আর কোনকালে হয় নাই।[১০]

আবার এই বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভারতবর্ষীয় সমাজজীবন কতদূর উন্নত ও মহৎ হয়েছিল, সে-সম্বন্ধে স্বামীজী প্রসিদ্ধ শিকাগো-বক্তৃতায় বলেছেন:

সেই সমাজ-সংস্কারের জন্য আগ্রহ, সকলের প্রতি সেই অপূর্ব সহানুভূতি ও দয়া, সর্ব-সাধারণের ভিতর পার্থক্য-ভাব ঘুচাইয়া দিয়া বৌদ্ধধর্ম সকলের ভিতর যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল, যাহা ভারতবর্ষীয় সমাজকে এতদূর উন্নত ও মহান্ করিয়াছিল যে, কোন গ্রীসদেশীয় পুরাতত্ত্বলেখক তদানীন্তন

৫ দেববাণী (১৩৫৩ সং), পৃ. ১০৭
৬ বিবেকানন্দ-চরিত, পৃ ৯৪ —সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
৭ পত্রাবলী (১ম ভাগ), পৃ. ৪৫৮-৫৯
৮ পরিব্রাজক (৫ম সং), পৃ. ৩৩
৯ বর্তমান ভারত।
১০ যাত্রার পূর্বপত্র—পথের সঞ্চয়, পৃ. ১৪

ভারতবর্ষের অবস্থা-সম্বন্ধে লিখিবার সময় বলিয়াছেন, কোনও হিন্দু (ভারতবাসী) মিথ্যা কথা কহে না এবং কোনও হিন্দুরমণী অসতী নহেন, বৌদ্ধধর্মের তিরোধানে হিন্দুগণ এইগুলি হারাইলেন।[১১]

হিন্দুধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের বিচ্ছিন্নতাই ভারতের অবনতির মূল কারণ ব'লে তিনি উক্ত বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মিলনের মধ্যেই ভারতের উন্নতি নিহিত। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের মিলন তিনি একান্তভাবে কামনা করতেন। আমেরিকা থেকে জনৈক মাদ্রাজনিবাসী বন্ধুকে লিখিত পত্রেও বিবেকানন্দের এই মনোভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে :

সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও—আমার মনে হচ্ছে 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা হ'লে মন্দ হয় না। ঐ নামটা দিলে তাতে হিন্দুদের মনে কোন আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট করবে। 'প্রবুদ্ধ' শব্দটার ধ্বনিতেই ('প্র=সঙ্গে+বুদ্ধ') 'বুদ্ধের' অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের সঙ্গে—'ভারত' জুড়লে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে।[১২]

এখানে বিবেকানন্দের ধর্মীয় উদারতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

আজ সমগ্র দেশ জুড়ে পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের শতবার্ষিক উৎসব পালন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে যদি আমরা তাঁর আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারি, তা হলেই মহাপুরুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন সার্থক হবে। আজিকার এই দুঃখদৈন্য-নিপীড়িত ও ভ্রাতৃবিদ্বেষলাঞ্ছিত দেশে বিবেকানন্দের মহান্ আদর্শ ও বাণী আমাদের স্বদেশবাসীর অন্তরে নূতন প্রেরণা জোগাবে—সার্থক পথের সন্ধান দেবে।

১১ শিকাগো-বক্তৃতা, পৃ. ৪২

১২ পত্রাবলী, ১ম ভাগ, পৃ ২১৬

আমি যে ভক্ত নই

শ্রীশান্তশীল দাশ

আমি যে ভক্ত নই, ভক্তির জানি না কিছু,
সঙ্কোচে রই তোমাদের কাছে মাথাটি নীচু।
দীনতা আমার জানি আমি সব,
কোথা পাই সেই মহা বৈভব ;
যার কণা পেলে সার্থক হয় মর জীবন,
আমার যে নাই এতটুকু সেই দিব্যধন।

শুধু দূর হ'তে চেয়ে চেয়ে থাকি, যে-পথ দিয়ে
চলে ভক্তেরা, সে-পথের ধূলি মাথায় নিয়ে
থাকি এক পাশে, বলি মনে মনে,
এ তোমার কৃপা, দাও অকারণে
জনে জনে তুমি, অনন্ত কৃপা, কৃপার খনি,
কিছু না দিয়েও পেলাম কত না, ভাগ্য গণি।

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অশ্বিনীকুমার দত্ত

বরিশালের বিখ্যাত স্বদেশপ্রাণ নেতা, তথা বাংলার অগ্রণী দেশপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। কবি এবং সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন। রাজনীতিতে যোগদান করিয়াও সাত্ত্বিক জীবন যাপন করিতেন, সেই জন্য সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

১৮৯৭ খৃঃ গ্রীষ্মকালে স্বামীজী আলমোড়ায় সেভিয়ার-দম্পতির অতিথি হইয়া বাস করিতেছিলেন। অশ্বিনীবাবুও সেই সময় আলমোড়ায় ছিলেন। তাঁহার পাচকের নিকট শুনিতে পাইলেন, ইংরেজী কথা বলে, ঘোড়ায় চড়ে—এমন একটি অদ্ভুত বাঙালী সাধু আলমোড়ায় আসিয়াছেন। অশ্বিনীবাবু পূর্বেই পত্রিকা পড়িয়া জানিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ আলমোড়ায় আসিতেছেন। তাই তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এইই সেই বীরসন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। অশ্বিনীবাবু তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন।

'বিবেকানন্দে'র ঠিকানা কিন্তু কেহই বলিতে পারিল না। একজন পথিককে বাঙালী সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, 'ঘোড়ায় চড়া সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করছেন কি? ঐ দেখুন, তিনি ঘোড়ায় চড়ে আসছেন। ঐ তাঁর বাড়ি, মশায়।' অশ্বিনীবাবু দূর হইতে দেখিলেন, সেই গেরুয়া-পরিহিত সন্ন্যাসী একটি বাংলোর দরজায় পৌঁছিলে একজন ইংরেজ আসিয়া ঘোড়া ধরিয়া দরজা পর্যন্ত লইয়া গেল এবং সন্ন্যাসী অবতরণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

কতক্ষণ পরে উক্ত বাংলোর ভিতরে যাইয়া অশ্বিনীবাবু খোঁজ নিলেন, 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' আছেন কিনা। একজন যুবক সন্ন্যাসী বিরক্তি সহকারে উত্তর দিলেন, 'এখানে স্বামী বিবেকানন্দ থাকেন'; অশ্বিনীবাবু কিন্তু বলিলেন, তিনি 'শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন'কে চান, স্বামী বিবেকানন্দকে নয়। স্বামীজী ভিতর হইতে উভয়ের কথাবার্তা শুনিতে পাইয়া শিষ্যকে ডাকিয়া পাঠান এবং ব্যাপারটা জানিতে চাহেন। সকল কথা শুনিয়া স্বামীজী বলেন, 'করেছ কি? শীঘ্র ভদ্রলোককে ভিতরে নিয়ে এস।' স্বামীজী ইজিচেয়ারে বসিয়া ছিলেন, অশ্বিনীবাবু ভিতরে আসিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাইলেন।

অশ্বিনীবাবু বলেন, 'ঠাকুর আমাকে একবার তাঁর প্রিয় নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে বলেছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র সে-সময় আমার সঙ্গে বেশী কথা বলতে পারেননি। ১৪ বছর কেটে গেছে, আমি আবার নরেন্দ্রের দেখা পেয়েছি। তাঁর কথা ব্যর্থ হ'তে পারে না।' স্বামীজী তাঁহার সহিত প্রথমবার বেশী কথা বলিতে পারেন নাই, সেই জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন।

অশ্বিনীবাবু আশ্চর্য হইলেন, কারণ বহুপূর্বে সামান্য কয়েক মিনিটের আলাপে স্বামীজী তাঁহাকে স্মরণ রাখিবেন, ইহা তিনি আশা করিতে পারেন নাই। স্বামীজীর স্মৃতিশক্তি তাঁহাকে হতবুদ্ধি করে।

অশ্বিনীবাবু 'স্বামীজী' বলিয়া সম্বোধন করায় স্বামীজী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলেন, 'এ কি?

আমি আপনার নিকট কখন 'স্বামীজী' হলাম? আমি এখনও সেই 'নরেন'। যে নামে আমাকে গুরুদেব ডাকতেন, তা আমার নিকট অমূল্য সম্পদ্। আমাকে ঐ নামেই ডাকুন।'

অশ্বিনীবাবু। আপনি পৃথিবীময় ভ্রমণ করেছেন এবং লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা জাগিয়েছেন। কোন্ পথে ভারতের মুক্তি আসবে, আপনি আমাকে বলতে পারেন?

স্বামীজী। গুরুদেবের মুখে যা শুনেছেন, তার বেশী আমার বলার নেই—ধর্মই আমাদের জীবনের সার বস্তু এবং জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য হ'তে হ'লে সকল সংস্কারকেই অবশ্য ধর্মের মাধ্যমে আসতে হবে। অন্যরূপ চেষ্টা—গঙ্গাকে ঠেলে তার হিমালয়ের উৎপত্তি-স্থানে নিয়ে গিয়ে নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত করার ন্যায় অসম্ভব।

অ। কিন্তু কংগ্রেস যা করছে, তাতে আপনার আস্থা নেই?

স্বা। না, আমার আস্থা নেই। কিন্তু যা হোক, নেই-মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। ঘুমন্ত জাতিকে জাগাবার জন্যে সব দিক থেকে ধাক্কা দেওয়া ভাল। বলতে পারেন, জনসাধারণের জন্যে কংগ্রেস কি করছে? কয়েকটি প্রস্তাব পাস করলেই স্বাধীনতা আসবে মনে করেন? আমার ওতে কোন বিশ্বাস নেই। জনসাধারণকে প্রথম জাগাতে হবে। তাদের ভর পেট খেতে দিন, তারা নিজের মুক্তির পথ নিজেরাই খুঁজে নেবে। কংগ্রেস যদি তাদের জন্যে কিছু করে, আমার সহানুভূতি আছে। ইংরেজদের গুণও আমাদের মধ্যে প্রবেশ করাতে হবে।

অ। আপনি কি 'ধর্ম' বলতে বিশেষ কোন সম্প্রদায় বোঝেন?

স্বা। গুরুদেব কি কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক শিক্ষা দিতেন? তিনি ধর্ম-সমন্বয়ের ভাবেই বেদান্তের ব্যাখ্যা করতেন। আমিও তাই প্রচার করি। কিন্তু আমার ধর্মের প্রাণ হ'ল শক্তি। যে ধর্ম হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করে না, সে ধর্ম আমার মতে ধর্মই নয়, সে উপনিষদ্, গীতা বা ভাগবত যাই হোক। শক্তিই হচ্ছে ধর্ম, এবং শক্তির চেয়ে বড় কিছু নেই।

অ। আমার কি করা উচিত বলুন।

স্বা। আমি শুনেছি, আপনি শিক্ষাব্রতে নিযুক্ত আছেন। এই প্রকৃত কাজ। এক মহাশক্তি আপনার ভেতরে কাজ করছে। বিদ্যাদান অতি মহৎ। কিন্তু দেখবেন, জনসাধারণের মধ্যে মানুষ তৈরীর শিক্ষা প্রসার যাতে হয়। চাই চরিত্র-গঠন। আপনার ছাত্রদের চরিত্র বজ্রের ন্যায় দৃঢ় করুন। ভারতের পরাধীনতা-ধ্বংসকারী বজ্র তরুণদের অস্থি থেকেই নির্মিত হবে। আমাকে কয়েকজন ভাল ছেলে দিতে পারেন কি? আমি তাহলে পৃথিবীকে বেশ একটা ঝাঁকানি দিতে পারি। যেখানে রাধা-কৃষ্ণের গান শুনবেন, সেখানে ডাইনে বাঁয়ে বেত লাগাবেন। সমস্ত জাতি ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। যাদের আত্মসংযম নেই, ঐ গানে তাদের চিত্ত চঞ্চল হয়। অতি সামান্য অপবিত্রতাও ঐ উচ্চ আদর্শ ধারণা করার প্রতিবন্ধক। এ কি তামাসা? আমরা বহুকাল নাচ-গান করেছি, কিছু দিন বন্ধ থাকলে ক্ষতি নেই। ইতিমধ্যে দেশটাকে শক্তি অর্জন করতে দিন।

অস্পৃশ্য, মুচি, মেথর এবং ঐ রকম অন্য সকলকে গিয়ে বলুন, তোমরা জাতির প্রাণ। তোমাদের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি আছে, তা পৃথিবীতে বিপ্লব আনতে সক্ষম। উঠে দাঁড়াও, শৃঙ্খল খুলে ফেল, সমগ্র পৃথিবী আশ্চর্য হয়ে দেখবে তোমাদের। যান, ওদের ভেতর স্কুল করুন এবং ওদের উপবীত দিন।

স্বামীজীর প্রাতরাশের সময়, তাই অশ্বিনী-বাবু বিদায় লইলেন। যাইবার পূর্বে তিনি প্রশ্ন করেন, 'মাদ্রাজে ব্রাহ্মণরা যখন বলে, আপনি শূদ্র, তাই আপনার বেদ-প্রচারের অধিকার নেই, তখন আপনি বলেছিলেন, আমি শূদ্র হ'লে তোমরা—মাদ্রাজের ব্রাহ্মণরা পারিয়ারও অধম, এ কথা কি সত্য?'

স্বা। হাঁ।

অ। আপনার ন্যায় ধর্মপ্রচারক এবং একজন সংযমী লোকের পক্ষে ঐরূপ প্রত্যুত্তর দেওয়া সঙ্গত হয়েছে কি?

স্বা। আমি কখনও বলিনি, আমি ঠিক করেছি। ঐ লোকগুলির ঔদ্ধত্যে আমার রাগ হয় এবং ঐ কথাগুলি এসে পড়ে। আমি আর কী করতে পারতাম? কিন্তু আমি এ সমর্থন করি না।

ইহা শুনিয়া অশ্বিনীবাবু স্বামীজীকে আলিঙ্গন করেন এবং বলেন, 'আজ আপনি পূর্বাপেক্ষা আমার অনেক বেশী শ্রদ্ধাভাজন হলেন। এখন বুঝেছি, কেন আপনি বিশ্ব-বিজয়ী এবং কেন গুরুদেব আপনাকে অত ভালবাসতেন।'

পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর

পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর হিতবাদী-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৮।৯৯ খৃঃ কোন এক সময় যখন স্বামীজী কলিকাতায় ছিলেন, সেই সময় সখারাম দুইজন বন্ধুর সহিত স্বামীজীর সঙ্গে বলরাম-মন্দিরে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বন্ধু-দুইজনের মধ্যে একজন পঞ্জাব হইতে আসিয়াছিলেন। স্বামীজী সকলের পরিচয়-গ্রহণের পর পঞ্জাবের প্রয়োজন-সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই সময় পঞ্জাবে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছিল। কিরূপে এই খাদ্যাভাবের প্রতিকার সম্ভব, সেই বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আলাপ ক্রমে জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে সাংসারিক ও সামাজিক উন্নতি-বিধানের সুযোগ কিরূপে দেওয়া সম্ভব—এই বিষয়ে চলিয়া যায়। বিদায় লইবার পূর্বে পঞ্জাবী ভদ্রলোকটি শিষ্টতার সহিত দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আমরা অনেক আশা ক'রে এসেছিলাম আপনার কাছে, এই ভেবে যে, ধর্ম-সম্বন্ধে নানা উপদেশ শুনব, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের আলাপ সাধারণ বিষয়ে ঘুরে গেল।'

স্বামীজী ইহা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'মশায়, যতদিন আমার দেশের একটি কুকুরও অভুক্ত থাকবে, তাকে খাদ্য দেওয়া এবং তার যত্ন নেওয়াই আমার ধর্ম এবং অন্য যা কিছু—হয় অধর্ম, না হয় ভুল ধর্ম।' তিনজন আগন্তুকই স্বামীজীর কথায় নীরব হইলেন।

স্বামীজীর তিরোধানের বহু বৎসর পরে স্বামীজীর এক শিষ্যের নিকট এই ঘটনা বিবৃত করিয়া সখারাম বলেন, 'স্বামীজীর ঐ কথাগুলি আমার হৃদয়ে জলন্তভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়। প্রকৃত স্বদেশপ্রেম কাকে বলে, তা ঐ সময় যেরূপ অনুভব করেছিলাম, পূর্বে কখনও সেরূপ ভাবে অনুভব করিনি।'

কাকাজু ওকাকুরা

১৯০১ খৃঃ শেষ ভাগে জাপান হইতে

বৌদ্ধ বেলুড় মঠে আসেন। একজন ওকাকুরা, অন্যজন ওডা। ওকাকুরা স্বনামধন্য প্রাচ্য কলাবিদ্ ও সমালোচক। ওডা একজন বৌদ্ধ মঠাধ্যক্ষ। স্বামীজী বিশেষতঃ ওকাকুরাকে খুব পছন্দ করেন এবং বলেন, 'আমরা দুটি ভাই পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে এসে পুনর্মিলিত

হয়েছি।' স্বামীজী ওকাকুরাকে 'অক্রূর খুড়ো' আখ্যা দিয়াছিলেন।

জাপানে অদূর ভবিষ্যতে যে ধর্মসম্মেলন সংঘটনের পরিকল্পনা চলিতেছিল, স্বামীজী যাহাতে ঐ সম্মেলনে যোগদান করেন—এই উদ্দেশ্যেই উভয়ের আগমন। ওকাকুরা ও ওডা বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও স্বামীজী ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই।

তবে তিনি একটু সুস্থ বোধ করায় ওকাকুরার ভারতে নানা তীর্থস্থান দর্শনের বাসনা পরিতৃপ্ত করার মানসে তাঁহাকে লইয়া বুদ্ধগয়া ও কাশীতে যান ১৯০২ খৃঃ প্রথম ভাগে।

১৯০২ খৃঃ ১০ই ফেব্রুআরি বারাণসীর গোপাললাল ভিলা হইতে মিসেস ওলিবুলকে স্বামীজী যে পত্র লিখেন, তাহাতে জানা যায়, ওকাকুরা স্বামী নিরঞ্জনানন্দের সঙ্গে আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা, ইলোরা, চিতোর, উদয়পুর, জয়পুর এবং দিল্লী দেখিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইয়াছেন। ওকাকুরা ভারতের লুপ্তপ্রায় শিল্পের যে নিদর্শন পান, তাহাতে মুগ্ধ হন। ভৃত্যদের ব্যবহারের জন্য একটি সাধারণ টেরা-কোটা-নির্মিত জলের পাত্র দেখিতে পান। সেইটির আকৃতি ও খোদিত কারুকার্য দেখিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ। তিনি উহার নমুনা সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হন।

ভারতে যদিও বিধর্মী ও অন্য জাতিদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, তবু বৌদ্ধদিগের জন্য মন্দির-প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। এই জন্য ওকাকুরা মন্দির-প্রবেশের অনুমতি লাভ করিয়া সকল মন্দির দেখিতে সমর্থ হন।

১৯০১ খৃঃ ১৪ই জুন, ১৮ই জুন, ও পরে যে-সকল পত্র স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডকে লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, ১৪ই জুন ওকাকুরা ৩০০৲ সহ জাপানে যাইবার আমন্ত্রণ পাঠান। কিন্তু স্বামীজীর যাওয়া অসম্ভব হওয়ায় জো-কে (মিস ম্যাকলাউড) তিনি ঐ টাকা পরিশোধ করিতে বলেন এবং শীতকালে ভারতে আসিলে জো-কে টাকা ফিরাইয়া দিবেন জানান। এই সকল পত্রে ওকাকুরাকে মিস ম্যাকলাউডের জাপানী বন্ধু বলা হইয়াছে। ওকাকুরা স্বামী নিরঞ্জনানন্দের ব্যক্তিত্ব এবং সহজ সরল সতেজ ভঙ্গিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মিস এলিজাবেথ ডাচার

মিস ডাচার (১৮৩২—১৯২২) একজন গোঁড়া মেথডিষ্ট এবং বিবেকসম্পন্না মহিলা ছিলেন। নিউইয়র্কে স্বামীজীর ছাত্রীদের মধ্যে তিনি নিজেকে গণ্য করিতেন। ১৮৯৫ খৃঃ গ্রীষ্মকালে নিউইয়র্কের ক্লাস বন্ধ হইয়া যাইবে—এইরূপ অবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের স্বামীজীর জ্ঞানপূর্ণ কথা-মৃত-পানে অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিবারণ করিবার জন্য মিস ডাচার সেণ্ট লরেন্স নদীর উপরে সহস্র-দ্বীপোদ্যানে অবস্থিত তাঁহার গ্রীষ্মাবাসে স্বামীজীকে ক্লাস চালাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন।

এই স্থানে মেথডিস্টদের প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। এখনও ঐ স্থানে সুরাপান, জুয়াখেলা বা নাচ নিষিদ্ধ। যাঁহারা ধর্মপ্রাণ ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক, শুধু তাঁহারাই ঐ স্থানে যাইতেন। এইরূপ পরিবেশে স্বামীজী জুন মাস হইতে প্রায় সাত সপ্তাহ—৭ই অগস্ট ১৮৯৫ খৃঃ পর্যন্ত নির্বাচিত কয়েকজন শিষ্যকে বিশেষরূপে বেদান্ত শিক্ষা দেন। এখানে শিষ্যগণ মধ্যে নিম্ন কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য :

ডক্টর ওয়াইট, ল্যাণ্ডস্‌বার্গ (কৃপানন্দ), মিস ওয়াল্ডো, ডাচার, গ্রীনষ্টীডেল (ক্রিষ্টীন), রুথ এলিস, মিসেস্‌ ফাঙ্কি ও মেরী লুই (অভয়ানন্দ)। মোট দ্বাদশজন শিষ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত

হন, যদিও একত্রে দশজনের বেশী কখনও ছিলেন না।

স্বামীজীর বৈপ্লবিক শিক্ষাতে মেথডিস্ট প্রভাবে আজন্ম-বর্ধিতা মিস ডাচার মাঝে মাঝে বড়ই আঘাত পাইতেন। তাঁহার মনে হইত, যেন তাঁহার সকল আদর্শ, জীবনের মূল্য ও ধর্মের ধারণা সব বিপর্যস্ত। ফলে মানসিক ক্লেশে পীড়িত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি দু-তিন দিন অনুপস্থিত থাকিতেন। স্বামীজী এই সময় বলিতেন, 'এটা সাধারণ অসুস্থতা নয়। তার মনে যে দ্বন্দ্ব চলছে, শরীরের উপর এ তারই প্রতিক্রিয়া। মিস ডাচার এতটা সহ্য করতে পারছে না।'

সর্বাপেক্ষা বড় সংঘাত উপস্থিত হয় সেইদিন, যেদিন স্বামীজী বলেন, 'কর্তব্য-বুদ্ধি হচ্ছে আত্মার বন্ধন।' মিস ডাচার মৃদু প্রতিবাদ জানাইলেন। কিন্তু স্বামীজী একেবারে বারুদ-স্তূপের ন্যায় বিস্ফোরিত হইলেন, সদামুক্ত আত্মাকে কেহ কোন বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহে, তাহা যেন অসহ্য। ইহার পরে মিস ডাচার কয়েকদিন আত্মগোপন করেন। তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি যেন ধসিয়া পড়িয়াছে! পাশ্চাত্য মনের নিকট ভারতীয় ভাবধারা হৃদয়ঙ্গম করা যে কত দুরূহ, বিশেষতঃ অদ্বৈত বেদান্ত মতবাদ, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মিস ডাচার স্বামীজীর কথা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে এই সকল লেখা ও Song of the Sannyasin-এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে।

মিস ডাচার চিত্রকর ছিলেন; নিউইয়র্কে ঐ কার্য দ্বারাই তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন। তাঁহার দুইখানি চিত্র সহস্রদ্বীপোদ্যানে এখনও আছে। শেষ বয়সে মিস ডাচার মেথডিস্ট গীর্জা ত্যাগ করিয়া কৃশ্চান সায়েন্টিস্ট দলে যোগ দেন; তাঁহার কুটির নানাবিধ রুগ্নলোকের আরোগ্যগৃহ-রূপে ব্যবহৃত হইত। তিনি রোগীদের মানসিক চিকিৎসা করিতেন এবং তাহাদের জন্য রান্না করিয়া দিতেন।

১৯৪৭ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে মিস ডাচারের সহস্রদ্বীপোদ্যানের কুটিরটি নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধিকারে আসে। মৌলিক নক্সা বদল না করিয়া নানারূপ মেরামত করার পরে বর্তমানে উহাকে গ্রীষ্মকালীন বিশ্রাম-স্থানে পরিণত করা হইয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'বিবেকানন্দ কুটির' এবং যে ঘরে স্বামীজী ছিলেন, সেটি কুটিরবাসীদিগের উপাসনা-ঘররূপে পৃথক্ রাখা হইয়াছে।

স্বামী নির্ভয়ানন্দ

পূর্বাশ্রমে স্বামী নির্ভয়ানন্দের নাম ছিল কানাই সেন। তাঁহার পিতার নাম বনমালী সেন। তিনি পিতার তৃতীয় পুত্র। কলিকাতা আহিরীটোলায় তাঁহাদের বাড়ি ছিল। সেখান হইতেই ছাত্রজীবনে কানাই বরাহনগর মঠে যাতায়াত করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্যগণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই মঠে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং পরে যোগ দেন।

স্বামীজী প্রথম যে চারজনকে আলমবাজার মঠে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করেন, ইনি ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। কানাই বহু বার স্বামীজীর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং প্রায় অধিকাংশ সময়ই মঠে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

১৮৯৯ খৃঃ স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার বিদেশে রওনা হন, নির্ভয়ানন্দ সে সময় স্বামী রামকৃষ্ণা-নন্দের সহকারিরূপে মাদ্রাজে ছিলেন। জাহাজ মাদ্রাজে উপস্থিত হইলে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও

নির্ভয়ানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ থাকায় জাহাজে উঠা বা জাহাজ হইতে নামা নিষিদ্ধ ছিল; তাই হতাশ-হৃদয়ে উভয়ে নৌকাযোগে সমুদ্রবক্ষে জাহাজের অনতিদূরে বিচরণ করিতে থাকেন। স্বামীজী জাহাজ হইতে বহু প্রকারে বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইতে সমর্থ হন।

১৯০১ খৃঃ নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম সফর হইতে স্বামীজী প্রত্যাবর্তন করিলে বেলুড় মঠে স্বামী নির্ভয়ানন্দ ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। উত্তাপ ১০৭° পর্যন্ত উঠিতে দেখিয়া সকলেই চিন্তিত হন। চিন্তিত মনে কিছু সময় পদচারণা করিয়া স্বামীজী হঠাৎ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 'আত্মারামের কৌটা' ধুইয়া জল আনিয়া নির্ভয়ানন্দকে খাইতে দেন। ইহার পরে জ্বর ক্রমে আয়ত্তে আসে, শীঘ্রই জ্বর ছাড়িয়া যায় এবং রোগী আরোগ্য লাভ করেন।

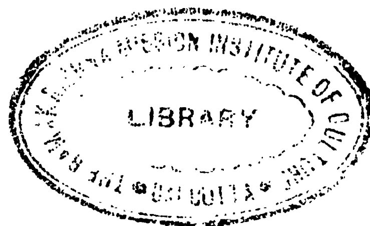
স্বামীজী একবার বরফ খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় নির্ভয়ানন্দ কলিকাতা যাইয়া কিছু বরফ কিনিলেন। পথ হাঁটিয়া আসিলে বরফ গলিয়া যাইবে এবং অত্যন্ত বিলম্ব হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া নৌকা ভাড়া করিয়া বেলুড় ঘাটে পৌছেন। সামান্য মূল্যের বরফ আনিতে মঠের তদানীন্তন অর্থকষ্টের দিনে অনেক পয়সা নৌকা-ভাড়ায় খরচ হওয়ায় মঠবাসীরা তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা না করিলেও স্বামীজী খুব খুশী হন এবং তাঁহার গুরুসেবার ঐকান্তিকতা ও দৃঢ়তার বিশেষ প্রশংসা করেন। স্বামীজী বলেন, কার্যের সফলতার জন্য অন্য সব বিবেচনা ত্যাগ করিয়া জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন' আমার শিষ্যদের আদর্শ হইবে—ইহাই আমি চাই।

স্বামীজী যখন ১৯০২ খৃঃ প্রথম ভাগে কাশী-ধামে যান, সেই সময় নির্ভয়ানন্দ তাঁহার সঙ্গে যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০২ খৃঃ ১২ই ফেব্রুআরি বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট, গোপাললাল ভিলা হইতে স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মা-নন্দকে পত্রে লিখেন, 'নির্ভয় মাধুকরী করে এবং ঘাটে জপ করে, শুধু রাত্রে এসে গৃহে শয়ন করে।'

১৯০২ খৃঃ ২১শে এপ্রিল মিস ম্যাক-লাউডকে লিখিত স্বামীজীর পত্র হইতে জানা যায় যে, নির্ভয়ানন্দ ঐ সময় স্বামী সদানন্দের সঙ্গে নেপালে ছিলেন।

স্বামী নির্ভয়ানন্দকে বেলুড় মঠে উৎসবাদিতে যাঁহাদের জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তার পরিচয় পাইতেন। যে-সব কলেজের ছাত্র উৎসবাদিতে স্বেচ্ছাসেবক হইত, তাহাদিগকে বলিতেন, 'কোন্ ইয়ার? ফার্স্ট ইয়ার, নো ফিয়ার।'

স্বামী নির্ভয়ানন্দের ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের সেই কঠিন পীড়া তখনকার মতো নিরাময় হইলেও পরে গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। ১৯২৮।২৯ খৃঃ তাঁহাকে কাশী সেবাশ্রমে পাঠানো হয় এবং সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন।



রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করে ইংরেজীতে অনূদিত গীতাঞ্জলির সাহায্যে নোবেল প্রাইজ পাবার পর। অথচ এ-কথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার আসল পরিচয় নিহিত রয়েছে তাঁর মাতৃভাষায় রচিত অসংখ্য গীতিকবিতায়। এ বিশ্ববিজয়ী কবিপ্রতিভার জাগরণের মূলে বহু শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সব চাইতে বড় যে শক্তি রবীন্দ্রনাথকে চিরযুগের কবিসভার একটি অগ্রগণ্য আসনের অধিকারী করেছে, সে হ'ল তাঁর লিরিক-প্রতিভা। কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতের অঙ্গাঙ্গী সংমিশ্রণে পাঠকের অন্তরে যে বিচিত্র রাগিণী বেজে ওঠে, সে ঐন্দ্রজালিক সুরের স্পর্শে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে ক'রে তুলেছেন সঙ্গীতধর্মী। অত্যাশ্চর্য সাঙ্গীতিক প্রতিভার অধিকারী কবি সঙ্গীতের সঙ্গে কবিতার ভেদরেখা প্রায় মুছে দিয়েছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা সঙ্গীতের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, আবার বহু সঙ্গীতও কাব্যধর্মী রূপ পেয়েছে। রবীন্দ্র-কাব্যের সঙ্গীতমুগ্ধ কোন কোন পাঠক তাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছেন—সাঙ্গীতিক ও কাব্য-প্রতিভার মধ্যে কবির কোন্ প্রতিভা বড়? কেউ কেউ কবির সাঙ্গীতিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করবার পক্ষপাতী। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, অসামান্য সাঙ্গীতিক প্রতিভার অধিকারী কবি দিগন্তবিস্তৃত কল্পনা, অতলান্ত সহানুভূতি এবং অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-চেতনাকে সাঙ্গীতিক উচ্ছ্বাসের সাহায্যে কাব্যে যে অব্যর্থ শিল্পরূপ দিয়েছেন, তা সুরপ্রবণ অনুভূতিশীল চিত্তকে এ অপরূপ কাব্যজগতের দিকে চিরকাল আকর্ষণ করবে।

শুধুমাত্র সুরমাধুরী নয়, পরম ঐশ্বর্যময় অপূর্ব চিত্রসম্পদ্ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ জাগরণের মূলে। সঙ্গীত যেমন হৃদয়কে আকর্ষণ করে অনির্বচনীয় ভাবজগতের দিকে, প্রকৃতিজগৎ ও মানবজীবনের বিচিত্র বর্ণালিম্পিত চিত্রও তেমনি পাঠকদৃষ্টির সামনে উন্মোচিত করে এক সৌন্দর্য-পরিপূর্ণ জগৎ। ভাব থেকে রূপে ও রূপ থেকে ভাবে অবিচ্ছিন্ন গতিই রবীন্দ্র-কাব্যের প্রাণ—এ-কথা কবি তাঁর কাব্যধর্ম-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বহুবার স্বীকার করেছেন। রূপ- ও রস-জগতের মধ্যে অবাধ সঞ্চরণ রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রবাহে শুধুমাত্র গতিসঞ্চার করেনি, সে কাব্যকে করেছে সতেজ সজীব—নিত্যনূতন রূপ ও ভাববৈচিত্র্যে পরম আস্বাদ্য। রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার অসামান্যতার মূলে রয়েছে এ গতিময় গীতোচ্ছ্বাস এবং স্থিতিশীল রূপোল্লাস। কাব্যসাহিত্যে চিত্র ও সঙ্গীতের পারস্পরিক স্থাননির্ণয়-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে বলেছেন:

> ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানতঃ ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র ও সঙ্গীত।
>
> কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে ছবি আঁকার সীমা নাই।……এ ছাড়া ছন্দে শব্দে বাক্যবিন্যাসে সাহিত্যকে সঙ্গীতের আশ্রয় তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোন মতে বলিবার জো নাই, এই সঙ্গীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য, এই সঙ্গীতের দ্বারাই

তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সঙ্গীতই সঞ্চারিত করিয়া দেয়।

অতএব চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে বিচিত্র অর্থে তাৎপর্যময় করেছে চিত্র ও সঙ্গীতের অপূর্ব গঙ্গা-যমুনা-সম্মেলন। রবীন্দ্র-কবি-জীবনের উষালগ্নে কবির নব্যপন্থার গীতোচ্ছ্বাসিত লিরিক কবিতা দেশব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেনি। সে অবস্থায় সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এ তরুণ কবির প্রতিভায় ভবিষ্যৎ বিশ্ববিজয়ী সার্থকতার সম্ভাবনা আবিষ্কার ক'রে কবির গলায় নিজের বিজয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন। এ গীতোচ্ছ্বাস ও চিত্রধর্মিতা বিভিন্ন রূপ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি-জীবনের প্রথম থেকে শেষ যুগ পর্যন্ত ছিল অব্যাহত।

চিত্রসম্পদ্ ও গীতিমাধুর্য কবির কাব্যকে পাঠকচিত্তের নিকট অতি দ্রুত আকর্ষণীয় করে সন্দেহ নেই, কিন্তু চিরকালীন পাঠকের নিকট কবিতা-মূল্য-সমৃদ্ধ বিবেচিত হয় কবির বহুবিস্তৃত কল্পনা ও সুন্দর প্রকাশের জন্যে। সাহিত্যের তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> কবির কল্পনা-সচেতন হৃদয় যতই বিশ্ব-ব্যাপী হয়, ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের তৃপ্তি বাড়ে। ততই মানব-বিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে। কিন্তু রচনাশক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্যে মহামূল্য। কারণ যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে শক্তি প্রকাশিত, তাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হইলেও এই শক্তিটি একেবারে নষ্ট হয় না। এই ক্ষমতাটি লাভের জন্য মানুষ চিরকাল ব্যাকুল।

সাহিত্যের সামগ্রী-সম্পর্কে মূল্যবান্ আলোচনায়ও রবীন্দ্রনাথ বিশেষ ক'রে জোর দিয়েছেন রচনার উৎকর্ষের উপর :

> এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা ভাবের দেহের মতো। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও গঠন অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়, ইহার শক্তি অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে।······ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। তাহা একজন যদি বাহির না করে তো কালক্রমে আর একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে, আর একজনের তেমন হইবে না। সেজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে ; ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।

রবীন্দ্র-কাব্যের অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তায় মূলেও এ কলাকৌশলপূর্ণ রচনাশক্তি। চিত্র ও সঙ্গীত, ধ্বনি ও ইঙ্গিতের সাহায্যে কাব্যরচনায় সৌন্দর্য-সৃষ্টির দিকে এত বেশী মনোযোগ এ যুগে খুব কমই দেখা গেছে।

কিন্তু অলংকরণ-সৌন্দর্য ও প্রসাধন-প্রিয়তাই রবীন্দ্রকাব্যের একমাত্র গৌরব—এ-কথা মনে করার মতো ভ্রান্তি আর কিছুই নেই। প্রসাধিত সৌন্দর্য কাব্যকে এক মুহূর্তেই পাঠকের নিকট প্রিয় করে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাবগভীরতা বিষয়বৈচিত্র্য এবং কল্পনার প্রসার যে কাব্যের আবেদনকে বহুকালের দূরবর্তী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়—এ-কথা অস্বীকার করা যাবে কি? বস্তুতপক্ষে ভবিষ্যৎ কাব্য-পাঠককে রবীন্দ্র-কাব্য যদি আকর্ষণ করে, সে আকর্ষণ হবে কল্পনার সুদূরপ্রসারী বিস্তার, ভাবের গভীরতা এবং

বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্যে। কাব্যের সংজ্ঞা-নির্ণয় প্রসঙ্গে শেলি বলেছেন: কাব্য হ'ল কবি-কল্পনারই বিকাশমাত্র, যে কল্পনা বিশ্বের গুহায়িত সৌন্দর্যের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেয়। রবীন্দ্রনাথও শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ-হিসেবে বিশ্বব্যাপী কল্পনার উপর সব চাইতে বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেছেন:

> কবির কল্পনা-সচেতন হৃদয় যতই বিশ্ব-ব্যাপী হয়, ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে ততই মানব-বিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে।
>
> (সাহিত্য—সাহিত্যের তাৎপর্য)

সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথের সীমাতিশায়ী কল্পনা নিকট ও সুদূর, স্বদেশ ও বিশ্ব, মানবহৃদয় ও অধ্যাত্মচেতনা, জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, আকাশ-বাতাস, জল-স্থল—সব কিছুকে নিয়েই অপরিসীম ব্যাপ্তি লাভ করেছে। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে কল্পনার সাহায্যে এক অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখবার এবং সৌন্দর্যচর্চিত রূপ দেবার এত অনন্যসাধারণ ক্ষমতা পৃথিবীর কম কবির প্রতিভাতেই দেখা গেছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার অনন্যতা হ'ল এখানে।

কবি-কল্পনারও রূপভেদ আছে। এক ধরনের কবি-কল্পনা শুধুমাত্র জগৎ- ও জীবন-রহস্যের প্রান্ত স্পর্শ করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে! এ ধরনের কল্পনাকে বলা যায় খেয়ালী কল্পনা—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় fancy. যে কবি-কল্পনা কাব্যজগতে স্থায়িত্বের দাবি রাখে, সে কল্পনা শুধুমাত্র খেয়ালী হ'লে চলে না। সে কল্পনা হবে সৃষ্টিধর্মী—creative. সৌন্দর্য-বিলাসী কবি কীট্স বলেছেন—invention বা আবিষ্কারই হ'ল কাব্যের ধ্রুবতারা, কল্পনা—ফ্যান্সি বা খেয়ালী কল্পনা কাব্যের পাক মাত্র। এ রূপকল্পের অনুসরণে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর *New essays in Criticism* গ্রন্থে বলেছেন, যে লিরিক-সমুদ্রে নব্য রোমান্টিক যুগের বাঙালী কবিরা কাব্যতরণী ভাসিয়েছিলেন, সে সমুদ্রে দিঙ্‌নির্ণয় করবার জন্য তাদের সামনে কোন ধ্রুবতারা বা তরণীর ভারসাম্য রক্ষার জন্যে কোন হাল ছিল না। শুধুমাত্র পালের উপর নির্ভর করেই তাঁরা সমুদ্রে তরণী ভাসিয়েছিলেন। ফলে নব্য রোমান্টিক বাংলা কবিতায় জীবনরহস্য সম্পর্কে নতুন আবিষ্কারের বিস্ময় নেই—নেই কোন সৃষ্টিধর্মী কল্পনার পরিচয়। যে সৃষ্টিধর্মী সমন্বয়ী কল্পনা কবিকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ জীবন-সমালোচনায় প্রণোদিত করে, প্রথম যুগের রোমান্টিক গীতিকবিতায় তার সূচনাও দেখা দেয়নি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের খেয়ালী-কল্পনা-প্রধান কাব্য-কবিতাও এ মন্তব্যের ব্যতিক্রম নয়। কবির পরবর্তী কাব্য-কবিতায় সৃষ্টিধর্মী ও সমন্বয়ী কবিকল্পনা প্রাধান্য লাভ করায় সে কাব্য গভীর জীবন-সমালোচনায় মূল্যসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় নব্য রোমান্টিক কবিদের সবল কবিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী কবিদের প্রথম যুগের কবি-কল্পনাকে বলেছেন ছায়াময় ভাববিলাস-মাত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের কবিতাও এ আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের সীমাতিক্রমী নয়। য়ুরোপের নব্য রোমান্টিক কবিশ্রেষ্ঠ গ্যয়টের লিরিক-প্রতিভার বিকাশধারা দেখাতে গিয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন: গ্যয়টে যখন লিরিক কবিতার শিক্ষানবিশী করছিলেন, তখন তাঁর কবিতা ছিল একান্তভাবে 'মন্ময়'। শিক্ষানবিশী পর্ব শেষ হবার পর গ্যয়টের হাতে কাব্য-কবিতা আশ্চর্যভাবে 'তন্ময়' হয়ে ওঠে। অতঃপর মন্ময়তার সঙ্গে তন্ময়তার অপরূপ সংমিশ্রণে য়ুরোপের বাস্তবজীবনকে স্পর্শ ক'রে সে-দেশের কাব্য-কবিতা প্রকৃত মূল্যসমৃদ্ধ

হয়ে ওঠে। বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক, নন্দনতাত্ত্বিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রশ্নাত্মক—এমন কোন বিষয় নেই বা য়ুরোপীয় নব্য রোমান্টিক কবিতার পরিধি ও ভাবগভীরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেনি।

ভারতীয় জীবনে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর একান্ত অভাব। এ-দেশীয় জীবনে পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার চাপের মতো এত চাপও বেশী অনুভূত হয় না। সেজন্যে বিরেঞ্জার, মুসেট্, সান্ত্ব্যভ্, থিয়োফিলে গোতিত্র, সুইবার্ণ, ক্লফ্ (Clough), বুকানন, দান্তে, গ্যাব্রিয়েল রসেটি প্রভৃতি নব্য-রোমান্টিক কবির কবিতায় পাশ্চাত্য সমাজের ঐশ্বর্যময় বহুমুখী ও বিচিত্র প্রবণতা যেভাবে নানা বর্ণানুরঞ্জিত রেখায় আত্মপ্রকাশ করেছে, বাংলা রোমান্টিক কবিতায় তা কখনও আশা করা যায় না। রোমান্টিক কবি শেলি ও কীটসের কাব্যে জীবনের পটভূমিকা খুব বৃহৎ ছিল বলা চলে না, তবু সমুচ্চ আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অথবা আত্মগত চেতনাপ্রসূত জীবন পুনর্গঠন প্রবৃত্তির সাহায্যে তাঁরা কাব্যে যে জটিল মননশীল কৌতূহল প্রদর্শন করেছেন, তা দেখে আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হই। শেলির মননশীল কৌতূহল জীবনের কোন-না-কোন সময়ে যে-সমস্ত বস্তু বা বিষয়কে অবলম্বন ক'রে অভিব্যক্তির পথ খুঁজছিল, তাদের মধ্যে মুখ্য হ'ল: মন্ময় এবং প্ল্যাটোনিক আদর্শবাদ, স্পিনোজীয় মতবাদ, (Spinozism), ভলতায়ারীয় ও নিহিলিষ্ট সংশয়বাদ, হেলেনীয় প্রবণতা এবং আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ, নৈরাশ্যবাদ ও সমাজবিদ্রোহ, ইতালীয় শিল্পানুরাগ ও রাসায়নিক সমীক্ষা, স্প্যানিশ রোমান্স ও সর্বেশ্বরবাদী দুর্জ্ঞেয়তা, দেহভিত্তিক ও পরীক্ষামূলক মনঃসমীক্ষা, বিষয়-বিবিক্ত-জীবননীতি, আইরিশ ও নব্য হেলেনিক রাজনীতি, জার্মান অধিবিদ্যা (metaphysics) গ্যয়টের বিশ্বমানবতাবাদ, এবং কান্টের জীবন-সমালোচনাও ছিল শেলির মানস-কৌতূহলের সামগ্রী, কীটসের মননশীলতা এবং মানসপরিধি শেলির মতো এত ব্যাপক ও কৌতূহলোদ্দীপক না হলেও নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে তা আশ্রয় খুঁজেছিল। মধ্যযুগীয় রোমান্স, হেলেনীয় পুরাণকথা, ইতালীয় কাব্য ও শিল্প, আধুনিক ইতিহাস ও জীবনী, বীরগাথা ও মহাকাব্য এবং সর্বশেষে বাস্তবজীবন ও আবেগসমন্বিত এলিজাবেথীয় নাটক।

নব্য রোমান্টিক বাংলা কাব্যে এ মননশীল কৌতূহলের ছিল একান্ত অভাব। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম পর্যায়ে কবির মননশীল কৌতূহল আত্মপ্রকাশ না করলেও 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্ম-নামে কবি কল্পনার সাহায্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা অবলম্বনে প্রাচীন সৌন্দর্য-জগতের পুনর্গঠনে যে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছিলেন, তা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় কীট্স-এর বিস্মৃত যুগের জীবন-স্বপ্নকে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ নব্য রোমান্টিক বাংলা রচনার প্রথম সার্থক নিদর্শন-হিসেবে উল্লেখ করেছেন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'কে। জীবনের স্বপ্নভঙ্গ ও নিরাসক্তি থেকে যে সংশয় ও নৈরাশ্য আসে, সেই ভাবানুভূতিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন গদ্যে লিখিত এ কাব্যোচ্ছ্বসিত রচনায়। গ্যয়টের প্রথম জীবনে লেখা 'রোমান্সে'ও সে অপ্রকৃতিস্থতা ও আত্মশায়ী প্রবণতা ছিল, কিন্তু 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' গ্যয়টের ভাবানুভূতির সর্বজনীনতা নেই। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে' লেখকের নৈরাশ্যের উৎসে ছিল অপরিতৃপ্ত ও ও চির অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা—গ্যয়টের অন্তর-বেদনার ব্যাপকতা এ গদ্য-রোমান্সে নেই। এজন্য আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করেন, বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের সূচনা মাত্রা-তিরিক্ত ভাবপ্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

য়ুরোপের রোমাণ্টিক আন্দোলনের সুপরিসর বিস্তৃতি সে আন্দোলনে ছিল না। উদ্বেল হৃদয়াবেগের প্রকাশে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যে 'দার্শনিক মুডে'র পরিচয় দিয়েছিলেন, তা তাঁর অসুস্থ মনেরই উচ্ছ্বসিত প্রকাশমাত্র। জগৎ-নীতি, ভগবান্, আত্মা, ব্যক্তিজীবনের অনশ্বরতা, স্বাধীন ইচ্ছা—সব কিছুকেই সংশয়ীর দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র লেখক। অবশ্য এ উচ্ছ্বসিত ভাবপ্রবণতার কেন্দ্রে ছিল লেখকের সুগভীর প্রেম-প্রবৃত্তি।

বাংলাকাব্য প্রথাবদ্ধ ধর্ম ও নীতির অনুশাসনে যখন গতানুগতিক প্রাণহীন ও জীর্ণ হয়ে উঠেছিল, সে অবস্থায় হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত হ'ল এ গদ্যকাব্য, ধর্মানুভূতির স্থানে প্রাধান্য পেল লেখকের অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতি—যে অনুভূতির উৎস মুখ্যতঃ মানবিক ও সামাজিক। এ-কারণে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র সুর তরল ভাবালুতার উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তা তৎক্ষণাৎ পাঠক-মনে যেন বিদ্যুতের চমক দিয়ে গেল। প্রেমজগতে মোহভঙ্গ নতুন কিছু সত্য নয়। সকল প্রেমই মোহভঙ্গের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'ও প্রেমের মোহভঙ্গটাই বড় কথা নয়। কিন্তু এ কাব্যে মন্ময় কামনাবাসনার সীমায় যে সীমাহীন আত্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে এবং যে আত্মবোধ সর্ব মনে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে, তাতে প্রকৃতি ও মানব-মন জীবন এবং সমাজের চিত্র যেন অলক্ষ্যে আমাদের দৃষ্টির সামনে উদ্‌ঘাটিত হ'ল।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বেও সে তরল ভাবালুতাপূর্ণ আত্মগত বেদনা ও নৈরাশ্য। সে বেদনা ও নৈরাশ্যবোধ অহংপরায়ণ, জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন—নব্য রোমাণ্টিকতার পন্থানুসারী। যে সুগভীর স্বদেশানুভূতি ও বিশ্বানুভূতি রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কাব্যধারাকে বিশ্বসমাজে জনপ্রিয় করেছিল, কবির প্রথম পর্যায়ের কাব্য-নাটকে তা ছিল একান্তভাবে অনুপস্থিত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার প্রথম পরিচায়ক কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল'কে অহেতুক ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছিলেন। আসলে গ্যয়টের সমালোচকের মতো রবীন্দ্রনাথের সমালোচকেরও ব্যঙ্গের লক্ষীভূত হওয়া উচিত ছিল প্রথম পর্যায়ের কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত কবির অকারণ বিষণ্ণতা। যে কবি-প্রতিভার খরদীপ্তি পরবর্তীকালে সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তরকে চকিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করেছিল, 'কবিকাহিনী', 'বনফুল', 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মতো বর্ণ-বৈচিত্র্য ও জীবন-বোধহীন কাব্য দিয়ে তার শুরু হ'ল কি ক'রে, তা ভাববার বিষয়।

জনৈক রবীন্দ্র-সমালোচক মন্তব্য করেছেন, অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত বেদনাবোধের প্রভাবে কবি কাব্য-রচনায় যে সত্যিকারের প্রেরণা অনুভব করেন, রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার উৎসে সে বেদনাবোধ নেই।* রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের অকারণ বিষণ্ণতা-সঞ্জাত তরল ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতাও সে শ্রেণীর। যে সমাজবোধও সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্র-নাথের কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ জাগরণের মূলে, তার কিঞ্চিৎ আভাসও দেখা যায় না প্রথম পর্যায়ের কাব্যে। তবে রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভার জাগরণের মূলে যে চিত্রধর্মিতা ও লিরিক উচ্ছ্বাস পূর্বাপর ক্রিয়াশীল ছিল, তা সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতে'। রোমাণ্টিক কাব্যজগতে এ অভিনব আবির্ভাবই যে সৃষ্টিপ্রতিভার রসিক বঙ্কিমের চিত্তকে আকৃষ্ট ক'রে থাকবে, এতে সন্দেহ নেই।

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-সরণী'তে (প্রথম প্রকাশ,

*দ্রষ্টব্য: J. C. Ghosh: Bengali Literature

১৩৬৯) বলেছেন, কবি-জীবনের কয়েকটি অসামান্ত অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার জাগরণকে সম্ভব ক'রে তুলেছিল। প্রথম অভিজ্ঞতা ঘটে কলকাতার সদর স্ট্রীটে একটি শুভ প্রভাতে। যে প্রভাতে সূর্যোদয়ের অনির্বচনীয় মহিমা কবিচিত্তকে বিষণ্ণতার বেদনা থেকে মুক্ত ক'রে যুক্ত করেছিল আনন্দময় বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের সঙ্গে। 'প্রভাত সঙ্গীত' থেকে 'বলাকা'-পূর্ব 'কাব্যসঙ্গীত' এ আনন্দময় চেতনার সুরস্পন্দিত। রবীন্দ্রজীবনে যে দ্বিতীয় সুমহৎ অভিজ্ঞতা কবির কাব্যপ্রতিভার জাগরণকে বিশ্বব্যাপী করেছিল, সে অভিজ্ঞতা ঘটে কাশ্মীরের ঝিলাম নদীর উপর। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র অভিজ্ঞতা কবির নীহারিকাশ্রয়ী কল্পনাকে একটি বিশিষ্ট গতি ও অভিপ্রায় দান করেছিল। সে গতি ও অভিপ্রায় মানব-সংসারাভিমুখী'। (রবীন্দ্র-সরণী—প্রমথনাথ বিশী) এখানে কবি-চিত্তের আকর্ষণ সীমা বা 'হেথা'র দিকে। আবার ঝিলাম নদীর অভিজ্ঞতা কবি-মনকে সীমার বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে অসীমের পথে উত্তীর্ণ ক'রে দিল। এখানে কবি-মনের 'হোথা' অর্থাৎ নিরুদ্দিষ্ট দুর্জ্ঞেয়তার দিকে। 'বলাকা'র গতিপ্রবাহের মধ্যে কবি যে বিশ্ব-জীবনের চলমানতা অনুভব করেছিলেন, সে জীবনের লক্ষ্য অনন্তের অভিমুখী। 'গীতাঞ্জলি' যুগে সীমা অসীমের সমন্বয়ে কবি যে সুন্দর জগতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, 'বলাকা'-যুগে কবি-চেতনা সমন্বয়-মুক্ত হয়ে অসীম অর্থাৎ বিশ্ব-চৈতন্যের সঙ্গে যোগযুক্ত হবার প্রয়াসী হয়েছে। অধ্যাপক বিশী বলেছেন, সীমা অসীমের সমন্বয়-হীন এ মহাসঙ্কটের পথে রবীন্দ্র-মন যুক্ত হয়েছে আধুনিক মনের সঙ্গে। 'বলাকা' থেকে 'প্রান্তিকে'র অন্তর্বর্তী কাবগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের সে বিশ্বানুভূতির আশ্রয়স্থল।

রবীন্দ্র-জীবনে শেষ উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা ঘটে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে। প্রাণ-সংশয়কর পীড়ার আঘাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, সে অভিজ্ঞতা কবিচিত্তকে উত্তীর্ণ ক'রে দিল নবতর চেতনার জগতে। 'লুপ্তিগুহা হ'তে' চৈতন্যের জগতে মুক্তিলাভ ক'রে কবি মানুষকে দেখলেন ভিন্ন মূর্তিতে। বিশ্বব্যাপী লোভী মানুষের হাতে দুর্বল মানুষের নিদারুণ লাঞ্ছনা কবির লেখনীতে এনে দিল ইস্পাতের ধার। নির্যাতিত মানুষের প্রতি কবির গভীরতম ও অকৃত্রিম সহানুভূতি এ-যুগে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে জাগ্রত ক'রল বাস্তবতার কঠিন জগতে। একদিকে জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে জীবন-সম্পর্কে কবির নিবিড়তম আত্মোপলব্ধি, আর একদিকে বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি মৃত্যুত্তীর্ণ কবি-হৃদয়ের অনন্ত বেদনা—'প্রান্তিক' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত 'গোধুলি' পর্যায়ের কাব্যধারায় মিলিতরূপ পেয়ে রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভার চরম পরিণতি ঘোষণা ক'রল। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন — অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট: কলিকাতা ১৩। মূল্য ৫৲; পৃষ্ঠা ২২০।

সমাজতন্ত্রবাদ আধুনিক জগতের বিবিধ আকর্ষণীয় মতবাদগুলির মধ্যে অন্যতম। বুদ্ধি-জীবীদের নিকট ইহার যুক্তিগত ভিত্তির আবেদন অনস্বীকার্য—জনগণের নিকট ইহার অর্থনৈতিক সাম্য আদর্শের আবেদন অত্যন্ত প্রবল। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই আপন ধ্বংসের বীজ নিহিত, সে বীজ কালে অঙ্কুরিত হইয়া বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করিয়া সমগ্র বিশ্বে আনিবে শোষিত শ্রমিক-শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামী সশস্ত্র বিপ্লব, যাহার স্রোতে শ্রেণীবিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবশ্যই বিলুপ্ত হইবে; তাহার পর শ্রমিক-শ্রেণীর একদলনায়কী কঠোর শাসনের মাধ্যমে আসিবে শ্রেণীহীন সমাজ, যেখানে চিরতরে শোষণের অবসান ঘটিবে, সাম্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং হিংসা দ্বেষ ও সংঘাত-বর্জিত কল্যাণপ্রসূ জীবনযাত্রার জয় সূচিত হইবে—ইহাই হইল সংক্ষেপে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের রূপ। ইহার স্রষ্টা ও জনক হইলেন কার্ল মার্ক্স। তাঁহার মতে সকল কিছুর পশ্চাতে রহিয়াছে অর্থনৈতিক নিয়মন, যাহার দ্বারা সমাজের, রাষ্ট্রের, গোষ্ঠীর ও ব্যক্তির জীবন নির্ধারিত, রূপায়িত ও পরিচালিত হয়। এই অর্থনৈতিক নিয়মন-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সের মতবাদ। সেখানে ধর্মের স্থান নাই—যদিও থাকে, তাহা হইল—শাসকশ্রেণীর শাসিতকে শোষণের যন্ত্রমাত্র।

এই মতবাদের যুক্তিগত ভিত্তি যতই দৃঢ় হউক না কেন, ইহার মধ্যে সক্রিয় মানবমনের চিরন্তন প্রশ্ন ও জীবন-জিজ্ঞাসার যথার্থ জবাব মেলে না। Eternal Consciousness-এর অংশ-হিসাবে মানবসত্তার যে সৃজন ও অবস্থান, তাহার উপর এই মতবাদ কোন গুরুত্ব আরোপ করে না। অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাপকাঠিতেই মানবমনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও মানবসত্তার চরম পরিপুষ্টি বিচার করা সম্ভব নয়, উচিত নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। অর্থনৈতিক নিয়মন-নীতির সহিত অসীমের অংশ-হিসাবে মানব-মনের সক্রিয় পরি-পুষ্টি ও পরিণতির সমন্বয় সাধন না করিতে পারিলে মতবাদের মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়।

সেই অপূর্ণতা দূরীকরণকল্পে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও নির্দেশ বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থকর্ত্রী 'বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন' গ্রন্থে স্বামীজীর সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহার পূর্বে স্বামীজীর সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দেখা যায় নাই। সেদিক হইতে গ্রন্থকর্ত্রী নিঃসন্দেহে সকল পাঠকসমাজের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিবেন। মার্ক্সের সমাজতন্ত্রবাদ ও বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা গ্রন্থকর্ত্রী সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। স্বামীজী তাঁর সমাজ-দর্শনে অদ্বৈতবেদান্তবাদের ভিত্তির সহিত বর্তমান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কিরূপ সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, তাহাও গ্রন্থকর্ত্রী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কিন্তু তাঁহার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল—স্বামীজীর সমাজতন্ত্রবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

বিশ্লেষণ ও প্রদর্শন। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মত যে, বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই—তাহা গ্রন্থকর্ত্রী খণ্ডন করার প্রয়াসী হইয়াছেন এবং বহুল পরিমাণে সক্ষমও হইয়াছেন। বিবেকানন্দের Spiritual Interpretation of History—ফলিত বেদান্ত-দর্শন—ধর্মভিত্তিক সমাজতন্ত্রবাদ—'Elimination of privileges'—'ধর্ম শোষণের অবসান ঘটায়'—ইতিহাসের গতিপথ সরল-রেখায় নয়, উন্নতি ও অবনতি, ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ ইত্যাদির মাধ্যমে—শ্রেণীসংগ্রামে গুরুত্ব আরোপ—রক্তাক্ত বিপ্লবের ইঙ্গিত—বিপ্লবের ভূমিকায় ধর্মের অবতরণ ও বিপ্লবের কার্যসাধন—'I am a socialist' উক্তি ইত্যাদির দ্বারা গ্রন্থকর্ত্রী ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ কল্পনাপ্রসূত আদর্শ অথবা বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ধর্মীয় বা নীতিগত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—ইহার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক; এবং বর্তমানে প্রচলিত ও স্বীকৃত যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ, তাহা অপেক্ষা ইহা পূর্ণাবয়ব ও কল্যাণকামী।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের মূল আকার আমরা দেখি মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদে। ইহার পূর্বের সমাজতন্ত্রবাদ সাধারণতঃ Utopian Socialism অর্থাৎ আদর্শগত অথবা আদর্শপ্রসূত সমাজতন্ত্রবাদ নামে অভিহিত ছিল; কারণ ইহাতে নূতন সমাজ আনয়নের কোন নির্দিষ্ট পন্থার উল্লেখ ছিল না। মার্ক্স সেই পন্থার উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মার্ক্সের সমাজতন্ত্রবাদ 'বৈজ্ঞানিক' আখ্যা অর্জন করিয়াছে। কিন্তু মার্ক্সের কথাই এ-বিষয়ে চরম ও শেষ কথা হইতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। যে সমাজতন্ত্রবাদ কার্যকারণ-সম্বন্ধে যুক্ত পন্থা ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই 'বৈজ্ঞানিক' আখ্যা দেওয়া যায় ও দেওয়া উচিত। গ্রন্থকর্ত্রী সেই কার্যকারণ-সম্বন্ধ আবিষ্কারের দ্বারা বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি-প্রদর্শনে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং বহুলাংশে সফলও হইয়াছেন। কিন্তু তবুও কতকগুলি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। নূতন সমাজ আনয়নের জন্য বিপ্লব কখন এবং কোথায় সংঘটিত হইবে, শিল্পপ্রধান না কৃষি-প্রধান দেশে—সে বিপ্লব কি রক্তাক্ত বিপ্লব, না ধর্মপ্লাবন, না দুয়ের সমন্বয়—সে বিপ্লবের কেন্দ্র কি কোন একটি রাষ্ট্রে, না বিভিন্ন রাষ্ট্রে একই সূত্রে আবদ্ধ থাকিবে—বিপ্লবের অব্যবহিত পরে রাষ্ট্র ও সমাজের কি রূপ হইবে—বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা আছে কি না—প্রবুদ্ধ জনগণের শ্রেণীবিহীন সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠার পর কি আবার ক্রমসঙ্কোচ শুরু হইবে, না এই সমাজ হইবে চরমভাবে স্থিতিশীল ও স্থায়ী—ইত্যাদি অনেকগুলি প্রশ্নের পরিপূর্ণ উত্তর মেলে না। এ-সম্বন্ধে আরও গবেষণা ও আলোচনার প্রয়োজন।

তবুও 'বিবেকানন্দের সমাজদর্শন' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এই পুস্তক অবশ্য-পাঠ্য। সমাজ-সংস্কারক, রাজনৈতিক দল ও ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সকলেই এই পুস্তকের মধ্যে স্বামীজীর বাণী ও নির্দেশ পাইবেন। সেই মহাবীর সন্ন্যাসীর সমাজদর্শনের মূলমন্ত্রগুলি ভারত ও বাংলার সমস্যাবহুল রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের দ্বারে পৌছাইয়া দিয়া গ্রন্থকর্ত্রী যে অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অধ্যাপক **শ্রীসুবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়,**
রীডার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

The Philosophy of Vivekananda and the future of Man –Dr. G. C. Dev, Vivekananda Centenary Publication, Ramakrishna Mission, Dacca, Pakistan, Pp 106 ; price Rs. 2/-

গ্রন্থকার ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব একজন প্রখ্যাত দার্শনিক। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও মনস্তত্ত্ববিভাগের অধিকর্তা। যুগ-প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের দার্শনিক চিন্তার স্রোতোধারায় অবগাহন ক'রে ডক্টর দেব গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন: স্বামীজীর অলৌকিক প্রজ্ঞা, দার্শনিক মতবাদ, দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সংখ্যাতীত প্রশ্নের সংশয়াতীত সমাধান ও দার্শনিক বিচার, শঙ্কর ও স্বামীজীর উপলব্ধ স্বজ্ঞার সাদৃশ্য, কাণ্ট, ব্র্যাডলে, হেগেল, স্পিনোজা প্রভৃতির চিন্তাধারার বিশদ আলোচনার মাধ্যমে স্বামীজীর দার্শনিক মতবাদের বৈশিষ্ট্য ও বস্তু-বিশ্বে সর্বক্ষেত্রে, এমনকি বিশ্ব-মানব-সমাজের সর্বপ্রকার কল্যাণের পথে বেদান্তের অবদান প্রভৃতি। এগুলি আমাদের অন্তর্লোকে বিশেষ আলোক সম্পাত করেছে। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগের সমন্বয়ে মানবিকতার ক্ষেত্রে অতিমানবতার শস্য-সম্পদ্ লাভ করবার উপায় স্বামীজী যেভাবে ব্যক্ত ক'রে গেছেন, তাও বিশদভাবে দেখানো হয়েছে।

স্বামীজীর জীব ব্রহ্ম বা 'মানব-দেব'বাদ বিশ্ব-সমাজের সত্যকার আত্মোপলব্ধি তথা ব্রহ্মোপলব্ধির পক্ষে কিরূপ সহায়ক, তাও গ্রন্থকার দার্শনিক যুক্তি ও বিচারের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভাবময়, মনোময় ও ধ্যানময় জীবনের কেন্দ্রে অদ্বৈত বেদান্তবাদের উৎকর্ষ, মায়াবাদ আর এর নূতন গাণিতিক সূত্রগুলির মাধ্যমে স্বামীজীর বাণীর আলোক গ্রন্থখানিতে বিধৃত হয়েছে। স্বামীজী পরস্পর-বিরোধী দার্শনিক তত্ত্ব চিন্তা মনন ও ধ্যান-ধারণার পদ্ধতিগুলিকে বিশ্লেষণ ক'রে একই মহান্ সত্যের দিকে অগ্রসর হবার সহজ সরল পথ রচনা ক'রে গেছেন। ইন্দ্রিয়ের সীমা ও যুক্তি-বিচারের সীমা অতিক্রম ক'রে আলোকের অতীত আলোকে বোধির অতল গভীরে সীমা-হীন অনন্ত সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁর নববেদান্ত-ঘোষণার এইটেই বিশেষ তাৎপর্য। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের, মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের, যুক্তি-বিচারের সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও অনু-প্রেরণার, দর্শনের সহিত মননের, ব্যাবহারিক জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জীবনের, ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে মানব-সেবার আর কর্ম জ্ঞান ভক্তি ও যোগের সমন্বয়ে দিব্য শক্তির আবির্ভাব সম্পর্কে কৌশল বা পন্থা, যা স্বামীজী পৃথিবীতে নবযুগ-ধর্ম-প্রচারের ভিতর দিয়ে মানুষকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়েছেন, সেই সব প্রসঙ্গ দর্শনের ভিত্তিতে তুলে ধরেছেন ডক্টর দেব, আর প্রমাণ করেছেন এগুলির সত্যতা দার্শনিক সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। গ্রন্থখানি অধ্যাত্ম-পথের যাত্রা-মঙ্গল-স্বরূপ।

স্বামীজীর দর্শনবাদ সম্পর্কে বিশদভাবে জানাবার জন্য যাঁরা উৎসুক, তাঁদের কাছে এটি অমূল্য সম্পদ্ হবে, এ-কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

—**অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

(1) The Story of Education for all
(2) Readings in Education for all

লেখক—শ্রীএস. সি. সরকার, এম. এ; প্রকাশক—মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২।

শিক্ষার রাজত্বে বর্তমানে একটা আলোড়ন এসেছে। শিক্ষা কি ও কেন, এবং শিক্ষার ব্যাপ্তিতে তা কতখানি শিশু-অনুগ (Paedo-

centric) হবে, এবং তা হলেও, তাকে কি ভাবে মূর্ত ক'রে তুললে তা সার্থক হবে—এ নিয়ে আজ বিচার-বিশ্লেষণের অভাব নেই। ফলে, শিক্ষার দিগন্ত আজ দেখি নব নব আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। শুধু তাই নয়, এ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচিত্র কাহিনীও বিস্ময় সৃষ্টি করে। প্রতিটি দেশই আজ নানা ভাবে বিষয়টিকে নিয়ে তাদের নিজ নিজ শিক্ষার আদর্শানুযায়ী, বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে এই শিক্ষা-পদ্ধতির পরিমাপ ও শিক্ষা-সংজ্ঞা-নিরূপণ নিয়ে ব্যস্ত। সর্বমানবের সমবেত প্রচেষ্টায় শিক্ষার এই নবতর স্বাস্থ্য লাভের ব্যাপারে ভারতও আজ পেছিয়ে নেই। তাই ভারতের আজ দরকার সর্বদেশের ও সর্বকালের শিক্ষা-ব্যাখ্যা ও শিক্ষা-সংজ্ঞার একটা সুষ্ঠু পরিচয়। এই পরিচয় লাভের জন্য আলোচ্য বই-দুটি যে বিশেষ সাহায্য করবে, তা একবাক্যে স্বীকার করছি। শিক্ষার সামগ্রিক চেতনা নিয়ে যাঁরা আজ উদ্বুদ্ধ, তাঁরা এই বই-দুটি থেকে সহজেই শিক্ষা-পরিবেশের নিয়ত-পরিবর্তনশীল, অতীত ও বর্তমান আবহাওয়ার একটা সার্থক বার্তা-চিত্র পাবেন। প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্‌কে তাই তাঁর পুস্তকাদির বহু-সংগ্রহের মধ্যে এই বই-দুইখানিকেও স্থান দিতে বলি। তবে, এই পুস্তকদ্বয়ে শিক্ষাবিদ্দের পরিচয়, তাঁদের আদর্শ, শিক্ষার সংজ্ঞা ও পদ্ধতির পাশে পাশে যদি বর্তমান শিক্ষা-কর্মশালার (Education-Workshop) আঙ্কিক (statistical) এবং রৈখিক (graphic) তথ্যচিত্র একটু বিশেষভাবে সংযোজিত থাকত, তাহলে তা প্রকৃত শিক্ষাবিদের আরও আদরণীয় হয়ে উঠত। আশা করি পুস্তকদ্বয়ের ভবিষ্যৎ সংস্করণে অভিজ্ঞ লেখক এ-বিষয়ে কথঞ্চিৎ লক্ষ্য রাখবেন।

স্বামী মহানন্দ

স্বামীজীর পদপ্রান্তে (স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের জীবনচরিত) —স্বামী অব্জজানন্দ। প্রকাশক: স্বামী বিমুক্তানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ। পৃষ্ঠা ৩২৭; মূল্য টাকা ৭·৫০।

বহু-প্রতীক্ষিত একখানি প্রকাশন। স্বামীজীর শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের শেষ প্রান্তে গ্রন্থখানির প্রকাশ যথাসময়েই হইয়াছে। লেখক তথ্য-সংগ্রহে বহুল পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট যে, এরূপ একখানি জীবনীসংগ্রহের সকল তথ্য একবারে সংগৃহীত হয় না, ধীরে ধীরে কালক্রমে হইয়া থাকে। বর্তমানে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই আমাদের মনপ্রাণ পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্রদ্ধা, ভক্তি, সহানুভূতি, সাহিত্যিক কল্পনা, ভাষার ব্যঞ্জনা কিছুরই অভাব নাই। একের পর এক জীবনগুলি তরঙ্গের মতো আসিয়া হৃদয়ে আঘাত করে। মহাসমুদ্রের এই তরঙ্গগুলি হইতে আমরা বুঝিতে পারি, বিবেকানন্দ-বারিধি কত মহান্, কত গভীর। লেখকের লেখনী ধারণ সার্থক হইয়াছে। তবে আমরা বলিব—অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু। পরবর্তী সংস্করণে আরও তথ্য-সংগ্রহ প্রয়োজন। আর একটি কথা—গ্রন্থখানি পড়িয়া স্বামীজীর অন্যান্য শিষ্য ও ভক্তদের কথা জানিবার ও গ্রন্থাকারে দেখিবার বাসনা বর্ধিত হইল। লেখক যদি ভক্তদের এই বাসনা পূর্ণ করিবার ভার গ্রহণ করেন, স্বামীজীর ভক্ত ও শিষ্যগণের জীবনীবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন তাঁহার জীবনসাধনার অঙ্গীভূত করিয়া লন, তবে বিবেকানন্দ-ভাব-ধারা ভক্ত-হৃদয় প্লাবিত করিবে, ইহা নিশ্চয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ-লিখিত ভূমিকা পুস্তকখানির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

আলোচ্য পুস্তকে স্বামীজীর ১৩ জন সন্ন্যাসি-শিষ্যের জীবনচরিত আলোচিত; প্রত্যেকেরই চিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় চরিত্রানুধ্যানে সহায়ক হইয়াছে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রয়োজন।

দেবতার ডাক—শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। প্রকাশক: শ্রীহয়গ্রীব রামানুজদাস, শ্রীবলরাম ধর্ম-সোপান, খড়দহ। ১৯৩ পৃষ্ঠা; মূল্য ৩৲। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

১৩টি ছোট অলৌকিক রহস্যজড়িত কাল্পনিক গল্প এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। লেখক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি ও বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত ও সমাদৃত। ভাষা ও বিষয়বস্তু-বিন্যাসে আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের নিপুণতার পরিচয় রহিয়াছে। বাংলা ভাষায় বর্তমানে যেরূপ একঘেয়ে ছোট গল্প লেখার প্রচলন হইয়াছে, 'দেবতার ডাকে' সেই ধারা সম্পূর্ণ বর্জন করা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি কথাসাহিত্যে যে এক নূতন পথের সন্ধান দিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে সার্থকতা অনস্বীকার্য।

কিন্তু এইরূপ অলীক ও অলৌকিক গল্প পাঠ করিয়া কিছু চিন্তা ও প্রেরণা আসা যদিও সম্ভব, তথাপি অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ও সুস্পষ্ট ধারণা যাহাদের অন্তরে গড়িয়া উঠে নাই, তাহারা সংশয়াচ্ছন্ন হইতে পারে।

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্যগণ ও তাঁহাদের উপদেশাবলী (প্রথম খণ্ড)—প্রকাশক: শ্রীবীরেশ্বর ভট্টাচার্য, 'কাঠিয়া বাবা কা স্থান', গুরুকুল রোড, পোঃ বৃন্দাবন, জেলা মথুরা। পৃষ্ঠা ৫৪+৮৬; মূল্য টাকা ২'৫০।

আলোচ্য পুস্তকে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মতবাদ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে: শ্রীহংস ভগবানের আবির্ভাব ও তত্ত্ব-জ্ঞান-উপদেশ, বর্ণাশ্রম ধর্ম, অর্থের প্রতি অত্যাসক্তির পরিণাম, জ্ঞানবিচার দ্বারা মনোজয়, সাধুসঙ্গের মহিমা, পরমার্থ-নির্ণয়, ভাগবত-ধর্ম।

যাঁহারা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক, পুস্তকটি তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে।

Swami Vivekananda Birth Centenary Souvenir—Published by the Secretary, Swami Vivekananda Centenary Committee, Madras, pp. 135; Price Rs. 3/-

মাদ্রাজ শতবর্ষ জয়ন্তী সমিতি কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিক ইংরেজী স্মারক গ্রন্থ ২০শে জানুআরি ১৯৬৪ খৃঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই উত্তম। প্রচ্ছদপটে স্বামীজীর পরিব্রাজক অবস্থার সুন্দর রঙীন ছবি এবং ভিতরে বহু চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বামীজীর জীবন আলেখ্য মোটামুটি এই সকল চিত্র হইতেই অনেকটা অনুমান করা যায়। প্রতি চিত্রের সহিত পরিচিতি থাকায় বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। চিত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য।

বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির বাণী সন্নিবেশিত হইয়াছে। বেলুড় মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের 'স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ জয়ন্তী উদ্বোধন বাণী' প্রবন্ধের পুরোভাগে স্থান পাইয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধও সুনির্বাচিত ও সুচিন্তিত। Vivekananda—The Prophet of Modern India. The Legacy of Swami Vivekananda to Humanity, Some Incidents of Swami Vivekananda's Childhood, The timeless voice of Swami Vivekananda, Vivekananda and his message, The making of Vivekananda, The Religious Philosophy of Swami Vivekananda প্রবন্ধগুলি পাঠে সকলেই উপকৃত

হইবেন। প্রসিদ্ধ লেখকগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন: স্বামী নিখিলানন্দ, এম. ভক্তবৎসলম্, সি. এস. ঝা, স্বামী কৈলাসানন্দ, স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ, পণ্ডিত মোহনলাল, পি. এন. সাপ্রু, রেণুকা রায়, সি. এস. নাইডু।

বিবেকানন্দ শতবর্ষজয়ন্তী স্মারক: বিদ্যামন্দির পত্রিকা (১৯৬৩)—প্রকাশক: অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। পৃঃ ২০৯+১২৬=৩৩৫। স্মারক পত্রিকাটি স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারা অবলম্বনে লিখিত বিবিধ সুচিন্তিত ও আলোক-সম্পাতকারী নিবন্ধ, শ্রদ্ধার্ঘ্য, প্রসঙ্গ ও পুণ্যস্মৃতি দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছে। প্রথম অংশ প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে, মননের আলোকে, বন্দনা-মন্ত্রে, মনীষি-সঙ্গমে প্রভৃতি পর্যায়ে বিষয়-বস্তুগুলি সাজানো হইয়াছে এবং শেষাংশে ইংরেজী messages, speeches, reminiscences, tributes, essays, contemporary American Press Reports প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী শুদ্ধানন্দ, স্বামী বিরজানন্দ, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও মহেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রাণস্পর্শী; সাহিত্যিক মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের প্রবন্ধে, কবি সজনীকান্ত দাস, জীবনানন্দ দাশ ও শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তীর বন্দনা-মন্ত্রে স্বামীজীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুভাষচন্দ্র বসু, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুধাবনযোগ্য।

পত্রিকার শেষাংশে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ, ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্; জওহরলাল নেহেরু, উ. থাণ্ট, রোঁমা রলাঁ, মহাত্মা গান্ধী, বালগঙ্গাধর তিলক, ভগিনী নিবেদিতা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিনোবা ভাবে, ভি. কে. রাও, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কৃষ্টোফার ঈশারউড, রাজগোপালাচারী প্রভৃতির ইংরেজী message and tributes-এ যুগাচার্য বিবেকানন্দের প্রতি মনীষীদের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা সুপরিস্ফুট। বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপক এবং ছাত্রগণও স্বামীজীর জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বাংলা ও ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

ভারতে ও বিদেশে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত স্বামীজীর কয়েকখানি মনোরম চিত্র পত্রিকার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর হইয়াছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই স্মারক পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া শিক্ষাব্রতী, বিদ্যার্থী ও জনসাধারণ সকলেই উপকৃত হইবেন।

ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশন:

বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ কর্তৃক ভাষান্তরিত। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যা।

বিবেকানন্দের বাণী ও বাণী রচনা—পূর্ণসেট মূল্য: রেক্সিন-বাঁধাই ৫০৲; বোর্ড-বাঁধাই ৪০৲।

বিবেকানন্দ-চরিত—সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার; মূল্য ৫৲।

স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ; মূল্য ১৲।

ছোটদের বিবেকানন্দ—স্বামী নিরাময়ানন্দ; মূল্য ৪০ নঃ পঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দেহত্যাগ-সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত মার্চ মাসে সঙ্ঘের তিন জন সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

স্বামী নিত্যস্থানন্দ

গত ১৭ই মার্চ সকাল ১০টা ১৮ মিনিটের সময় নাগপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কালাডি শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী নিত্যস্থানন্দ (কুঞ্জন) মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ৩রা মার্চ তিনি নাগপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম দর্শন করিতে যান ; ৫ই মার্চ উক্ত আশ্রমের দ্বিতল হইতে আকস্মিকভাবে পড়িয়া যান। ইহাতে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বের মাথার খুলি ও কণ্ঠাস্থি ভগ্ন হয়। ক্রমে উহা করোনারি থ্রম্বোসিসে পরিণত হয়। ইহাতেই তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯৫১ খৃঃ ত্রিচুরে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগ দেন এবং ১৯৬০ খৃঃ সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার ন্যায় একজন ভবিষ্যৎসম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ সন্ন্যাসীকে হারাইয়া সঙ্ঘের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

স্বামী শিবাত্মানন্দ

গত ২৮শে মার্চ রাত্রি ৩টা ১৭ মিনিটের সময় কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী শিবাত্মানন্দ (ঋষি) ৬১ বৎসর বয়সে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ক্যান্সার-জনিত আন্ত্রিক গোল-যোগই তাঁহার দেহত্যাগের কারণ। গত ৪ঠা ফেব্রুআরি তাঁহাকে অস্ত্রোপচার করা হয়। যথাসম্ভব চিকিৎসা ও শুশ্রূষা সত্ত্বেও তাঁহার অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটে। তাঁহার দেহ বেলুড় মঠে আনিয়া সৎকার করা হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২২ খৃঃ বৃন্দাবনে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ খৃঃ সন্ন্যাস লাভ করেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠেই ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নীরব ও নিরভিমান কর্মী এবং মধুরস্বভাবসম্পন্ন ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত সন্ন্যাসী।

স্বামী চিন্মাত্রানন্দ

গত ৩০শে মার্চ রাত্রি ১২টা ১৫ মিনিটের সময় মাদ্রাজ ত্যাগরায়নগর ছাত্রাবাসে ৭৫ বৎসর বয়সে স্বামী চিন্মাত্রানন্দ (প্রিয়নাথ) স্বধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি বহুমূত্র ও হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। ২৯শে মার্চ রাত্রে তিনি হৃদ্‌রোগে প্রবলভাবে আক্রান্ত হন, ইহাতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯২৫ খৃঃ দেওঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন এবং ১৯৩১ খৃঃ সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত হন। দেওঘর হইতে তিনি মাদ্রাজে প্রেরিত হন, মধ্যে এক বৎসর (১৯৩৮) তিনি দেওঘরে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মাদ্রাজেই ছিলেন। মাদ্রাজে মিশনের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতির সহিত তিনি যুক্ত ছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি ত্যাগরায়নগর ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

স্বামী চিন্মাত্রানন্দ ছিলেন একনিষ্ঠ কর্তব্য-

পরায়ণ ও কঠোর পরিশ্রমী, মধুর স্বভাব ও একান্ত অনাড়ম্বর অভ্যাসের জন্য তিনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগে মাদ্রাজ মিশনের একজন জনপ্রিয় সন্ন্যাসীর অভাব ঘটিল।

এই সন্ন্যাসিত্রয়ের দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

সেবাকার্য

গত ৫ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের গেদে নামক স্থানে পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। সেখানে পরিধেয় বস্ত্রাদি ও শুষ্ক খাদ্য—যথা চিড়া গুড় বিস্কুট ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে। ১১ই মার্চ হইতে পেট্রাপোল সীমান্তে রান্না করা খাদ্য—যথা ভাত ডাল তরকারি দেওয়া হইতেছে। উদ্বাস্ত-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গারো পাহাড়েও উদ্বাস্ত-সেবাকার্য আরম্ভ করা হইতেছে। রামকৃষ্ণ মিশনের আসানসোল, রহড়া এবং নরেন্দ্রপুর কেন্দ্র বেলুড় মঠ প্রধানকেন্দ্রের সহিত সেবাকার্যে সহায়তা করিতেছেন।

সিঙ্গাপুর বিবেকানন্দ প্রদর্শনী

গত ২২শে ফেব্রুআরি শনিবার ৫-৩০ মিনিটের সময় সিঙ্গাপুর বিবেকানন্দ শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন-প্রাঙ্গণে সিঙ্গাপুরের গভর্নর মাননীয় ইয়াঙ্গ ডি-পার্টুয়ান নেগারা তাঁহার ভাষণে বলেন:

অদ্য অপরাহ্ণে এখানে উপস্থিত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তক ছবি প্রভৃতি জিনিসের এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রদর্শনী উদ্বোধন করিতে আসিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্বামীজীর জন্ম-শতবর্ষ স্মরণার্থে আয়োজিত উৎসবের ইহা অন্য একটি অঙ্গ। আমি গত বৎসর এই শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব উদ্বোধন করিয়া কৃতার্থ হইবার সৌভাগ্য লাভ করি।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছেন ও সিঙ্গাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের উপর ইহার প্রতিষ্ঠাতার আদর্শ অনুযায়ী সমাজ-ও মানব-সেবার কর্তব্য ন্যস্ত আছে। আমি জানি যে, মিশনের উচ্চ আদর্শ শুধু জন-সেবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জাতিধর্মনির্বিশেষে ইহার সেবাকার্য উৎসর্গীকৃত। বর্তমানে এইদেশে এক নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বহু শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজকে এক জাতিতে পরিণত করিবার মহান্ ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি। এই সন্ধিক্ষণে স্বামীজীর ভাবধারা আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।

এই শতবর্ষ জয়ন্তী-উৎসব এরূপ একদল মানব কর্তৃক আয়োজিত হইয়াছে, যাঁহারা জাতিধর্মনির্বিশেষে সমাজসেবার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত, ইহাতে আমি খুবই প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই প্রদর্শনী মিশনের প্রতিষ্ঠাতার ভাব অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ শুধু জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করেন নাই, অধিকন্তু শিল্প ও কলায় উন্নতি করিয়া মানুষের প্রয়োজন মিটাইতে উৎসাহ দিয়াছেন এবং সর্বজনীন প্রেম ও ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস আনয়ন করিয়াছেন। আজ অপরাহ্ণে আমি এই ভাব লইয়াই এখানে আসিয়াছি এবং আমি এই সুন্দর পরিবেশে এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট। এখন আমি সানন্দে এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করিতেছি।

বিবিধ সংবাদ

বিবেকানন্দ-বক্তৃতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ৩রা মার্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় 'স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে গঠন-মূলক প্রভাব' সম্বন্ধে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিবেকানন্দ-বক্তৃতামালা'র প্রথম বক্তৃতা দেন। ছাত্র, শিক্ষক ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন। বক্তৃতার পরে ২০ মিনিট প্রশ্নোত্তর হয়। উদ্বোধন-ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ বক্তার পরিচয় প্রদান করেন এবং সানন্দে ঘোষণা করেন যে, বক্তৃতার জন্য প্রদত্ত ১,০০০৲ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সাহায্য-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

দ্বিতীয় বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হয় ৪ঠা মার্চ বুধবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিনিটে। বক্তৃতার বিষয় ছিল: 'পাশ্চাত্যে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী'। ৬৫ মিনিটের ভাষণ শ্রোতাগণ আগ্রহসহকারে শ্রবণ করেন। বক্তৃতার পর স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ২০মিঃ ধরিয়া শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

৫ই মার্চ বুধবার অপরাহ্ণে ৭০ মিনিট ধরিয়া 'স্বামী বিবেকানন্দ: ভারতবাসীর প্রতি বাণী' সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা হয়। ছাত্র শিক্ষক এবং নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে মার্চ 'বিশ্ববিদ্যালয় স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী বক্তৃতামালা'র তিনটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বিশ্বভারতীতে বক্তৃতার বিষয়গুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনুরূপ ছিল। বক্তৃতাগুলি চীনা-ভবনে প্রদত্ত হয়। বক্তৃতার জন্য প্রদত্ত অর্থ ৫০০৲ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসাহায্য-ভাণ্ডারে দান করেন।

স্বামী নিখিলানন্দ

নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ গত ৭ই মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিট্যুট অব কাল-চারের বিবেকানন্দ-হলে 'হিন্দুধর্ম ও বর্তমান সংশয়' সম্বন্ধে এক ঘণ্টা যাবৎ একটি বিশেষ বক্তৃতা দেন।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ শ্রোতৃবৃন্দের নিকট বক্তার পরিচয় দেন ও তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রায় ১,০০০।

স্বামী নিখিলানন্দ তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে বর্তমান জগতে শিল্প ও বিজ্ঞান মানব-সমাজকে কিভাবে সংশয়াচ্ছন্ন করিয়া আধ্যাত্মিকতা হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, তাহা বিবৃত করিয়া বলেন, সন্দেহবাদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় যুক্তি-সহকারে অধ্যাত্মবাদের অনুশীলন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা-ভবনে একদিন অপরাহ্ণে স্বামী নিখিলানন্দ 'বিবেকানন্দ ও বর্তমান জগৎ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীবিধু-ভূষণ মালিক এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।



কথাপ্রসঙ্গে

মানবিক অধিকারের প্রশ্ন

নৈরাশ্যের একখানা ঘনমেঘ ভারতের পূর্ব পশ্চিম ব্যাপ্ত করিয়া তীক্ষ্ণতম দৃষ্টিও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। মেঘের কিনারায় আলোর রেখা প্রমাণ করিতেছে—সূর্য এখনও আকাশে রহিয়াছে, মানুষের শুভ বুদ্ধি এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। প্রতিবেশীদের শত্রুতা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসহায়তা ভারতকে আজ বিপন্ন করিয়াছে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে আজ যে দৃঢ় সংকল্প ও পরস্পর সহানুভূতি ও সেবার ভাব ক্রমশঃ দেখা দিতেছে, তাহাই আশার আলো।

বর্তমানে পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল উদ্‌বাস্তু আসিতেছে, ভারতের প্রায় সকল প্রদেশই তাহাদের পুনর্বাসনের জন্য সক্রিয় চেষ্টা করিতেছে, ইহা এখন জাতীয় দায়িত্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। ভারতে আসার পর ইহারা স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে ভারতীয় নাগরিক বলিয়াই পরিগণিত হইতেছে ও হইবে।

উদ্‌বাস্তু-পুনর্বাসন ব্যাপারটি আজ আর রাজনীতিক নয়, ইহা এখন মানবিক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। নির্যাতিত মানুষ সর্বহারা হইয়া আসিতেছে সুখশান্তি স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সন্ধানে। ভারত চিরদিন নির্যাতিত উৎপীড়িতকে আশ্রয় দিয়াছে, নিজে উৎপীড়িত হইয়াও দিয়াছে, ইহুদী পার্শীকে আশ্রয়দান তো প্রাচীন ইতিহাসের কথা, সেদিনও তিব্বতীগণ ভারতেরই বিশাল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। ভারত—মহামানবের দেশ, মানবতার জননীস্বরূপা।

এবার যে উদ্‌বাস্তুগণ আসিতেছে, বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের পুনর্বাসনের যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে, তাহার মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এবার আর সকলকে কৃষিকার্যে লাগানো সম্ভব হইতেছে না, নূতন শিল্পপ্রসারের মাধ্যমে তাহাদিগের কর্মসংস্থান করিবার চেষ্টা হইতেছে।

উদ্‌বাস্তু শিবিরে দীর্ঘকাল অলসভাবে প্রতীক্ষা করা অপেক্ষা হাতের কাছে যে কাজ আসে, তাহাতে লাগিয়া যাওয়াই যে শ্রেয়—এ-কথা আজ আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হয় না। অন্ততঃ যুবকগণ, যাহারা কর্মজীবনে নূতন প্রবেশ করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই সময়ের পরিবর্তনের সহিত প্রয়োজনীয় মানসিক পরিবর্তন করিয়া লইতে পারিবে। যা কিছু কাজ তাহারা করিবে, মনে করিতে হইবে: দেশের কাজ করিতেছি, ভারতকে শক্ত সবল আত্মনির্ভর করার পথে আমার শক্তি নিয়োগ করিতেছি।

এ তো গেল যাহারা কোন প্রকারে ভারতে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের ব্যবস্থা; কিন্তু যাহারা এখনও আসিতে পারে নাই, এবং আসিবার চেষ্টা করিয়াও আসিতে পারিতেছে না—তাহাদের কি হইবে? এই চিন্তাই আজ হৃদয়বান্ মানুষের মন ব্যাকুল করিয়াছে।

দু-একজন বিকৃতমস্তিষ্ক মনে করেন, উঁহারা বিদেশী (foreigner)—পাকিস্তানের অধিবাসী, উঁহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা কেন? আমাদের নিজস্ব সমস্যাতেই আমরা জর্জরিত। সৌভাগ্যের বিষয় অধিকাংশ ভারতবাসীই মনে করেন, এই নিপীড়িত জনগণ আমাদেরই রক্ত, আমাদেরই ভাইবোন, ইহারা ভারতের স্বাধীনতার মূল্য দিতেছে, যে মূল্য তাড়াতাড়ি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমরা তখন দিতে পারি নাই।

সেদিনকার সেই জাতীয় সমস্যা আজ তাই আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করিয়াছে। এখন আন্তর্জাতিক ভাবেই এ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না। এক কোটি মানুষের কোন মানবিক অধিকার নাই, কোন দেশ নাই, কোন রাষ্ট্রীয় সত্তা নাই, ধন-প্রাণ মান-মর্যাদার কোন নিরাপত্তা নাই ; ইহা কখনও একটা সুস্থ অবস্থার পরিচয় নয়, ইহা বিংশ শতাব্দীর এক অবিশ্বাস্য কলঙ্ক।

স্যানফ্রান্সিস্কো মহাসম্মেলনের কথা আমরা এখনও ভুলি নাই। গত মহাযুদ্ধের বিভীষিকার ছায়া হইতে সদ্যোমুক্ত মানবসংহতি সেদিন নূতন ঊষার স্বপ্ন দেখিয়া অনেক কল্যাণমূলক আলোচনা করিয়াছিল, অনেক খসড়া রচনা করিয়াছিল। তাহা হইতেই জন্মলাভ করে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations' Organisation)—তাহারই স্মরণীয় ঘোষণা 'মানবিক অধিকার'। এখনও আমরা প্রতি বৎসর ১০ই ডিসেম্বর সেই ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) সাড়ম্বরে আবৃত্তি করি, বেতারে বিঘোষিত করি, ডাকটিকিট মারফৎ প্রচার করি। কিন্তু আজ নিপীড়িত মানুষ প্রশ্ন করিতেছে : উহা কাহার ঘোষণা? ঐ ঘোষণার পিছনে শক্তি কই? ইংলণ্ডের 'ম্যাগ্নাকার্টা'র পিছনে যে শক্তি ছিল, এই ঘোষণার পিছনে কি সেই শক্তি আছে? না ইহা সাধু ইচ্ছার এক ঘোষণা মাত্র? যদি ইহা কার্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব বা শক্তি কাহারও না থাকে, তবে এই শূন্য ঘোষণার মূল্য কতটুকু? যদি জাতিপুঞ্জের কোন সভ্য (Member State) তাহার এক তৃতীয়াংশ মানুষকে মৌলিক মানবিক অধিকার না দেয়,—রাষ্ট্রযন্ত্রের মাধ্যমে তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে, ধর্মান্তরিত করে, ক্রয়-বিক্রয় করে, ক্রীতদাসে পরিণত করে, তবু যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ইহার কোন বিহিত ব্যবস্থা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে—অনেক নিরাশাবাদী যাহা মনে করেন, তাহাই ঠিক, অর্থাৎ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO) লীগ অব নেশনস্-এরই দ্বিতীয় সংস্করণ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ইহুদী-পুনর্বাসনে এবং জার্মান-পুনর্বাসনে যাহা করিয়াছেন—মানবিকতার দিক্ দিয়া তাহা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়—ইহার রাজনীতিক তাৎপর্য যাহাই হউক। জাতিগত অত্যাচারে, ধর্মান্ধতা ও যুদ্ধের ফলে যাহারা নিপীড়িত হইতেছে, জন্মভূমি হইতে উৎখাত হইয়াছে, তাহাদের পুনর্বাসনের ভার আন্তর্জাতিক, আর যাহারা আজও নিপীড়নের কারাগারে বধ্যভূমির মূক প্রাণীর মতো দিন গনিতেছে, তাহাদের মুক্ত করিবার দায়িত্ব কি তাহাদের নয়, যাহারা সমস্বরে 'মানবিক অধিকারের ঘোষণা' পাঠ করিয়াছিল?

মানুষের শুভ বুদ্ধির নিকট এই আবেদন জানাইয়া, অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে সম্মিলিত মানব-জাতির সক্রিয় সহযোগিতা উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না। সর্বদা জানিয়া রাখিতে হইবে, প্রতিটি মানুষ নিজের মনেই দ্বিধাবিভক্ত, অতএব মনুষ্য-জাতিও নানা স্বার্থে বিভক্ত, সম্মিলিত কখনই নয়। অতএব যাহারা নিপীড়িত উৎপীড়িত, তাহাদিগকে নিজেদের সংগ্রাম নিজেদেরই করিতে হইবে। বাহির হইতে সামান্য শুভেচ্ছা ও সাহায্য আসিতে পারে। আধ্যাত্মিক জীবনে যাহাই হউক, জাগতিক জীবনে শুধু সহ্য করা কখনই মহত্ত্ব নয়, অন্যায় সহ্য করা তো নিশ্চয়ই নয়। জড়ের লক্ষণ নীরবে প্রকৃতির বিধান বা নিয়তি মানিয়া লওয়া, চেতনের লক্ষণ প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ'

[শ্রীরামকৃষ্ণ-উক্তির আলোকে বিচার]

'আনন্দ'

প্রস্তাবনা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও অন্যান্য গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'ব্রহ্ম ও শক্তি', 'জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী' সম্বন্ধে কথাগুলির তাৎপর্য বুঝিবার জন্য চেষ্টা করার সময় আসিয়াছে। নানা ব্যক্তি নানা ভাব হইতে মীমাংসা করিতেছেন। এখন যতদূর সম্ভব তাঁহার ঐ-বিষয়ক উক্তিগুলি একত্র করিয়া যদি চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় একটা সমীচীন মীমাংসা হইতে পারে। লোকোত্তর পুরুষের ভাব ও কথা বুঝা দুরূহ হইলেও মননের জন্য আলোচনা করিলে যথেষ্ট কল্যাণ হইবে বলিয়া মনে হয়।

যথা 'ব্রহ্ম ও শক্তি' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কেবল পাণ্ডিত্যের জন্য বলেন নাই, কিন্তু ঐ তত্ত্ব অনুভবের মধ্যে কিরূপ আসে অর্থাৎ তাঁহার কথাগুলি শুনিলে প্রতিপাদ্য বস্তু সম্বন্ধে শ্রোতার মনে কিরূপ ধারণা হয়, এবং সাধক নিজে কি ভাবে অনুষ্ঠান করিলে পূর্ণকাম হইবে, সে সম্বন্ধেও বিশেষভাবে জোর দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে মত-মতান্তর ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন। এখানে 'ব্রহ্ম ও শক্তি' সম্বন্ধে বলিতে গিয়া 'নিত্য ও লীলা', 'সগুণ ও নির্গুণ', 'জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী' সম্বন্ধে অনেক গভীর কথার উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিগূঢ় বিষয়গুলি সরল ভাষায় বলায় খুব সুগম মনে হয়, কিন্তু বিষয়গুলি পূর্বে যতটা সহজ মনে হয়, প্রণিধান করিলে সে রকম বোধ হয় না। মনে হয়, বিষয়গুলি এত গম্ভীর যে, বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। 'নিত্য ও লীলা' অনুভূতির বিষয়। অবতারাদির জীবনই নিত্য হইতে লীলায় ও লীলা হইতে নিত্যে বিচরণ। তাঁহারাই বিজ্ঞানী, শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বিজ্ঞানীর কথাই বলিতেছেন।

এস্থলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত হইল, যাহাতে তাঁহার কথার তাৎপর্য বুঝিবার সুবিধা হয়। যুক্তির সঙ্গে কথাগুলি সব একত্র করিয়া দিলে পাঠকের পক্ষে মনে মনে আলোচনা করিবার সুবিধা হইবে। আরও এক কথা—'কথামৃত' পড়িলেই পাঠকের মনে হয়: শ্রীরামকৃষ্ণ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী ছিলেন, অদ্বৈতের কথা থাকিলেও উহা তাঁহার মত নয়। ইহার কারণ পাঠকের নিজস্ব প্রকৃতি, আর দ্বিতীয় কারণ বিশেষ বিশেষ কথাগুলিকে একত্র চিন্তা না করা। এই ত্রুটি কতকটা নিবারণ করিবার জন্যই উক্তিগুলি একত্র সন্নিবেশিত করা হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি :

তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে? ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ ভক্তের আমি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য। 'আমি' যখন তিনি পুঁছে ফেলবেন—তখন যা আছে তাই, মুখে বলা যায় না।······নিত্য বল্লেই লীলা আছে বুঝায়—লীলা বল্লেই নিত্য আছে বুঝায়!······যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলি। যখন সৃষ্টি

করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন, তখন তাঁকে 'শক্তি' বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল। ···যে ইট, চুন, সুরকী থেকে ছাদ,—সেই ইট, চুণ, সুরকী থেকেই সিঁড়ি। যিনি ব্রহ্ম—তাঁর সত্তাতেই জীব, জগৎ।······

বিজ্ঞানীরা নিরাকার সাকার দুইই লয়, অরূপ রূপ দুইই গ্রহণ করে।

কালীই ব্রহ্ম—ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু। যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' ব'লে কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে 'কালী' বলি—'শক্তি' বলি। একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ।

জ্ঞানী 'নেতি নেতি' ক'রে, বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ ক'রে তবে ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী—যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি আরো কিছু দর্শন করেন। তিনি দেখেন—ছাদ যে জিনিসে তৈরী, সেই ইট-চুন-সুরকীতেই সিঁড়িও তৈরী। নেতি নেতি ক'রে যাঁকে ব্রহ্ম ব'লে বোধ হয়েছে, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে দর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন। সা রে গা মা পা ধা নি—নি-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না। তখন দেখে তিনিই 'আমি'—তিনিই জীব জগৎ সব—এরই নাম 'বিজ্ঞান'।

সাকার, নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর এই অবস্থা (বিজ্ঞানাবস্থা)। সাকার চিন্ময়রূপ, নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তিনিই সব হয়েছেন।

ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখেছেন সেই 'আমি'—ভক্তের 'আমি'—বিদ্যার 'আমি'। তা হ'তে অনন্ত লীলা আস্বাদন হয়।

যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, ততক্ষণ 'আমি প্রার্থনা কি ধ্যান করছি'—এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ তুমি ঈশ্বর, প্রার্থনা শুনছ—এ জ্ঞানও আছে। ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ আছে। ···তুমি পূর্ণ, আমি অংশ—এ বোধ থাকবে। এই ভেদ বোধ।···যতক্ষণ এই ভেদ বোধ, ততক্ষণ শক্তি মানতে হবে। ···তাই যতক্ষণ 'আমি' আছে, যতক্ষণ দেহবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার জো নেই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ পুরাণ তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি ব'লে গেছে।

বিজয়। —এই আদ্যাশক্তি দর্শন আর ওই ব্রহ্মজ্ঞান কি ক'রে হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর আর কাঁদো। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হয়ে যাবে; তখন নির্মল জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখতে পাবে। 'ভক্তের আমি'রূপ আর্শিতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আদ্যাশক্তি দর্শন করবে। কিন্তু আর্শি খুব পোঁছা চাই। ময়লা থাকলে ঠিক ঠিক প্রতিবিম্ব পড়বে না। যতক্ষণ আমি-জলে সূর্যকে দেখতে হয়, আর সূর্যকে দেখবার কোনরূপ উপায় হয় না, আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব-সূর্য বৈ সত্য সূর্যকে দেখবার উপায় নাই—ততক্ষণ প্রতিবিম্ব-সূর্যই ষোল আনা সত্য। যতক্ষণ 'আমি' সত্য, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব-সূর্যও সত্য—ষোল আনা সত্য, সেই প্রতিবিম্ব-সূর্যই **আদ্যাশক্তি**। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, সেই প্রতিবিম্বকে ধরো—সত্য সূর্যের দিকে যাও, সেই সগুণ ব্রহ্ম, যিনি প্রার্থনা শুনেন তাঁকেই বলো, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান দেবেন। কেননা যিনি সগুণ ব্রহ্ম তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম। যিনি শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ।

যারা জ্ঞান বিচার করে, তারা তিন অবস্থাই (জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি) উড়িয়ে দেয়। তারা বলে যে—ব্রহ্ম তিন অবস্থার পার। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন দেহের পার। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—তিন গুণের পার—সমস্তই মায়া। যেমন আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে; **প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয়—ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু** ব্রহ্মজ্ঞানীরা আরো বলে—দেহাত্মবুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়—প্রতিবিম্বটাও সত্য ব'লে বোধ হয়। এই বুদ্ধি চলে গেলে সোঽহং—আমি সেই ব্রহ্ম—এই অনুভূতি হয়।

সমাধির পর অবতারাদির আমি ফিরে আসে—বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি। এই বিদ্যার

আমি দিয়ে লোকশিক্ষা হয় জ্ঞানী কারো অনিষ্ট করতে পারে না, বালকের মতো হয়ে যায়। লোহার খড়্গে যদি পরশমণি ছোঁয়ানো হয়—খড়্গ সোনা হয়ে যায়। সোনায় হিংসার কাজ হয় না। বাইরে হয়তো দেখায় যে, রাগ আছে কি অহংকার আছে, কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানীর ওসব কিছু থাকে না। দূর থেকে পোড়া দড়ি, বোধ হয় ঠিক একগাছা দড়ি পড়ে আছে—কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়।

ক্রোধের আকার—অহংকারের আকার কেবল, কিন্তু সত্যকার ক্রোধ নয়—অহংকার নয়।

এই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ ক'রে রেখেছে। আবরণ গেলেই যা ছিলুম, তাই হলুম (আমিই তুমি, তুমিই আমি)।

এ মায়াটি কি ! যা কিছু দেখছ, শুনছ, চিন্তা করছ—সবই মায়া। এক কথায় কামিনী-কাঞ্চনই মায়ার আবরণ।

মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

এক বই আর কিছু নাই। সেই পরব্রহ্ম আমি যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে আদ্যাশক্তি রূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন।··· ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথম দুটো বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞান হ'লে আর দুটো থাকে না—অভেদ ; এক, যে একের দুই নাই, **অদ্বৈতম্**। ······আর আমি দেখছি, বাজীকর আর বাজীকরের খেলা। বাজীকরই সত্য, খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মতো। * * *

শ্রীরামকৃষ্ণ। ও সব লীলা। আমিও ভাবতুম ঐ কথা, তারপর দেখলুম সবই মায়া—তাঁর সৃষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া।

অন্তরে বাহিরে দুইই দেখছি—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ কেবল একটি খোল আশ্রয় ক'রে এই খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন এইটি দেখছি

নিত্য ও লীলা : ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি

এবার 'ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি বা কালী' সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি ও তাহার দাহিকা শক্তি, দুধ ও দুধের ধবলত্ব, মাখন ও ঘোল, মণি ও জ্যোতি, সাপ ও তার তির্যক্ গতি, জল ও তার হেলা-দোলা প্রভৃতি দৃষ্টান্তের দ্বারা একটি ভাবিলে অমনি অন্যটি ভাবিতে হয়, একটি ছাড়িয়া অপরটিকে ভাবা যায় না ; উহাদের মধ্যে যেমন অভেদ-সম্বন্ধ, তেমনি ব্রহ্ম ও শক্তি বা কালীর মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধ। যেমন "সাপ যখন স্থির হয়ে আছে বা জল যখন স্থির হয়ে আছে, তেমনি যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নাই, তখন 'ব্রহ্ম' বলি ; আর যখন সাপ চলছে, জল হেলচে দুলচে, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ক্রিয়া রয়েছে, তখন তাহাকে 'কালী' ব'লে কই। একই বস্তু কিন্তু নামরূপ উপাধি-ভেদ। তুমি যখন রাঁধছ তখন রাঁধুনি, যখন পূজা ক'রছ তখন পূজারী, আর যখন কোন কাজ ক'রছ না, তখন তুমি ব্যক্তিমাত্র।" সেইরূপ ব্রহ্ম যখন সৃষ্টি প্রভৃতি করেন, তখন তিনি কালী, আর যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম। একই জিনিস ভিন্ন নাম মাত্র। এই ব্রহ্মের জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। যখন সমাধি হয়, মনের লয় হয়, তখন এই জ্ঞান হয়। বোধে বোধ হয়, আত্মা আত্মাকে জানে। জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা বোধ থাকে না, কিন্তু এই অবস্থায় বরাবর থাকা যায় না। যাহারা এই অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া আবার জগতে আসেন, তাঁহারা ঈশ্বরকোটি বা ঈশ্বরের অংশ।

তাঁহাদের 'আমি' কোথা হইতে আসিয়া জোটে ? কেহ বলে, ঈশ্বরেচ্ছায় আমি-বোধ আসে—লোকশিক্ষা ও ভগবানের রসাস্বাদনের

জন্য। কেহ বলে, অজ্ঞানের আবরণশক্তি নাশ হলেও বিক্ষেপশক্তি বশতঃ এই 'আমি' আভাস রূপে থাকে। কিন্তু যতক্ষণ এই 'আমি'-জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ আদ্যাশক্তির অধীনে, ততক্ষণ ঈশ্বর সত্য, জীব জগৎ সত্য—মানিতে হইবে। জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ পরমাত্মা, কেবল অহংকার-রূপ মায়া থাকায় এই সংসার-বোধ। কিন্তু তপস্যাদি দ্বারা ঈশ্বরের কৃপায় যদি এই অহংকার সমাধিতে লয় হয় ও নাশ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মানুভূতি হয়। এই অনুভূতি কি, তাহা মুখে বলা যায় না। সে অবস্থায় এক বোধ হয়—'যে একের দুই নাই—অদ্বৈতম্'। সাধারণ জীব এই জ্ঞান লাভ করিলে মুক্ত হয় বটে, কিন্তু ফেরে না বা শরীরে বেশী দিন থাকে না। ঈশ্বরকোটি অবতার বা তাঁর অংশ (আধিকারিক পুরুষ) সমাধির পর ফিরিয়া আসেন ও 'বিদ্যার আমি' বা 'ভক্তের আমি' ঈশ্বর বা আদ্যাশক্তি রাখিয়া দেন লোক-কল্যাণের জন্য। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেও লেশ-অবিদ্যা বশতঃ আমিত্ব থাকে। এই 'আমি' জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় না। তাই ঠাকুর বলিতেছেন "এদের 'আমি' পাতলা 'আমি' বা নাম মাত্র 'আমি', রেখার মতো 'আমি' ইত্যাদি।" ইহাতে বাহিরে ও ভিতরে চৈতন্য দেখে। জীবের 'আমি' মোটা 'আমি—তাহাতে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞানে থাকে।

অভেদের অর্থ

এখন প্রশ্ন: **'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ'**—এ অভেদের অর্থ কি? ব্রহ্ম ও শক্তি একই বস্তু, কিন্তু নামের ভেদ। 'যখন সৃষ্টি স্থিতি লয় করছেন, তখন ব্রহ্মকে কালী বলে কই'। পরে বলিতেছেন, 'মন লয় হ'লে সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়, তখন কি আছে, মুখে বলা যায় না।' শুধু ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলিতে হইলে সৎ চৈতন্য বা আনন্দ বলা হয়, মুখে উহার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না। এক কথায় 'অদ্বৈতম্'—যার দুই নেই। 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ'—এই কথা হইতে এইটিই মনে আসে যে, যা শক্তি তাই ব্রহ্ম, যেটা ব্রহ্ম সেটাই শক্তি, যেমন যেখানে দাহিকাশক্তি সেখানেই অগ্নি, যেখানে অগ্নি সেখানেই দাহিকাশক্তি। ইহাদের আলাদা বা ভিন্ন করা যায় না; যেখানে ব্রহ্ম সেখানে শক্তি বা যেখানে শক্তি সেখানে ব্রহ্ম—এইরূপ অর্থই হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি বলেছেন, সমাধি (নির্বিকল্প) অবস্থায় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-ক্রিয়া থাকে না। ফলতঃ শক্তিও থাকে না, কিন্তু ব্রহ্ম সৎ-স্বরূপে থাকেন। সুতরাং ব্রহ্মই সৃষ্টির পূর্বে, সৃষ্টিকালে এবং সৃষ্টি-নাশকালেও থাকেন। যেটি তিন কালে থাকে, তাহাকেই 'সত্য' বলে, যা এককালে থাকে এবং এককালে থাকে না—তা সত্য নয়, তা অনিত্য বা ব্রহ্মবাদীরা বলেন, স্বপ্নবৎ মিথ্যা।

ব্রহ্ম ও শক্তি যদি দুইটি বস্তু হয়, তাহা হইলে তাহাদের দেশ- কাল- গুণ- ও বস্তু-গত পার্থক্য থাকিবেই, এই পার্থক্য না থাকিলে

বলা সম্ভব হয় না, যেমন ঘট ও পট দুইটি বস্তু, ইহারা দুইটি কেন, না ইহারা ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে বা পরস্পর বস্তু-হিসাবে ভিন্ন বলিয়া। ব্রহ্ম ও শক্তি যদি ঘট ও পটের মতো ভিন্ন হয়, তাহা হইলে অভিন্ন হইতে পারিবে না। ব্রহ্ম ও শক্তির ভেদ থাকা সত্ত্বেও অভিন্ন হইবে, তাহা সম্ভব নয়; কিন্তু উহাদের উপাধিগত ভেদ হইলে অভিন্ন হইতে পারিবে। যেমন—ঘটাকাশ ও মহাকাশ। ঘট-উপাধি বশতঃ ঘটের আকাশ মহাকাশ হইতে ভিন্ন, কিন্তু বস্তুতঃ এক। ঘটাকাশ ও মহাকাশ যদি দুইটি বস্তু হয়, তাহা হইলে তাহাদের দেশ- কাল- বা বস্তু-গত পার্থক্য থাকিবেই, তাহা না হইলে দুইটি বস্তু বলা সম্ভব হয় না। অভেদ হইলে এই পার্থক্য থাকিবে না। (ব্রহ্ম ও শক্তি) বস্তুতঃ দুইটি হইয়া

(সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া) সম্পূর্ণ অভিন্ন হইবে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে উক্ত পার্থক্য থাকিবে না), তাহা সম্ভব নয়। শক্তির যখন ব্রহ্ম ছাড়া নিজস্ব সত্তা (নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায়) থাকিল না এবং ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সৃষ্ট্যাদি কাজ কাজ নিষ্পন্ন হয়, তখন 'ব্রহ্ম শক্তি অভেদ' বলিতে দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা সহ অভেদ বুঝাইল না। যেমন রজ্জুর সত্তা লইয়া সর্প থাকে বলিয়া রজ্জু ও সর্পের অভেদ। যেটা রজ্জু, সেটাই সাপ; তেমনি ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত শক্তি থাকে না বলিয়াই ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদ-ভাব। অভেদ এখানে চৈতন্যাংশে। নির্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মচৈতন্য এবং শুদ্ধমায়ায় প্রতিফলিত চৈতন্য, যাহা আদ্যাশক্তি, তাঁহার সৃষ্ট্যাদি কার্যনাশ হইলে চৈতন্যদ্বয় অভিন্ন হন। শক্তি সৃষ্ট্যাদি উপাধি বশতঃ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, শক্তিগত চৈতন্য ও ব্রহ্ম চৈতন্য এক।

বিজ্ঞানীর জগৎ-বোধ যায়, সমাধির পর। ব্রহ্মজ্ঞানের পর 'ভক্তের আমি' বা 'বিদ্যার আমি' থাকে, তার যে আবার দুই বোধ হয়, অর্থাৎ জগৎ-বোধ হয়, সে-বোধে জগৎটা বাস্তব বলিয়া বোধ হয় না। কেবল জগতের আকার মাত্র বোধ হয়। জগৎ সত্য ও চৈতন্য সত্য—এরূপ বোধ হয় না। যেমন—ঠাকুর বলিতেছেন—"দূর থেকে পোড়া দড়ি বোধ হয়, ঠিক একগাছা দড়ি পড়ে আছে, কিন্তু কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উড়ে যায়, ক্রোধের আকার অহংকারের আকার কেবল, সত্যকার ক্রোধ নয়—অহংকার নয়" অর্থাৎ জগৎটাও পোড়া দড়ির মতো বোধ হয়, জগতের আকার মাত্র সত্যকার জগৎ নয়, অন্যস্থলে যেমন বলিয়াছেন, বাজীকরই সত্য—বাজী মিথ্যা, অর্থাৎ চৈতন্য সত্য—জগৎ মিথ্যা বোধ হয়।

অহংকারই মায়া। 'ভক্তের আমি,' 'বিদ্যার আমি' কি জীবের আমির মতো চৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে? না, অবতারাদি ঈশ্বরকোটির আমি 'মোটা আমি' নয় সংসারী লোকদের মতো। অহংকার, তাদের 'আমি যেন' চতুর্দিকে পাচিল, মাথার উপরে ছাদ—বাহিরে কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদির আমি 'পাতলা আমি,—**নাম মাত্র আমি, রেখামাত্র আমি, পোড়া দড়ির মতো আমি, বেল্লোর দাগ মাত্র আমি'**—এ আমির ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়। ঈশ্বরকোটি অবতারাদি মনে করিলেই মুক্ত হইতে পারেন। জীবকোটি তাহা পারে না, জীব কাম-কাঞ্চনে বদ্ধ। 'ঘরের দ্বার জানালা স্ক্রু দিয়ে আঁটা বেরুবে কেমন ক'রে?'

সমাধির পর 'ভক্তের আমি' 'বিদ্যার আমি' কাহাদের থাকে? জীবকোটি সাধনা ক'রে ঈশ্বর লাভ করিতে পারে, সমাধিস্থ হইয়া আর ফেরে না, ইহারাই জ্ঞানী। ঈশ্বরকোটি 'যেন রাজার বেটা—সাত-তালার চাবি তাদের হাতে, তারা সাত-তালায় উঠে যায় —আবার ইচ্ছামত নেমে আসতে পারে'। সমাধি হইতে যাঁহারা নামিয়া আসেন, তাঁহারা জীবের মতো জগৎকে বাস্তব দেখেন না। অন্য রকম দেখেন। "ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়। সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই। স্বপ্নবৎ বলে না। তবে বলে—তিনিই সব হয়েছেন। মোমের বাগানে সবই মোম—তবে নানা রূপ" অর্থাৎ মোমই সত্য বোধ হয়, নানা রূপে কেবলমাত্র আকাররূপ বোধ হয়, সত্যরূপে বোধ হয় না। সুতরাং সমাধি হইলে নিত্য সাক্ষাৎকার, আর ব্যুত্থিত হইলে সব চৈতন্যময় অনুভব। সেই ব্রহ্মচৈতন্যেরই বোধ কেবল 'আমি' থাকার জন্য বিশেষ

আকারের মধ্য দিয়া। কিন্তু বিশেষ আকার চৈতন্যের মতো সত্য নয়। কারণ সমাধিতে চৈতন্যের কোন লোপ হয় না—শুধু নানা রূপগুলির তখন লোপ হয়।

সুতরাং নিত্য যে ভাবে (অর্থাৎ পারমার্থিক ভাবে) সত্য, লীলা সে ভাবে সত্য নয়। নিত্যের সমরস দ্বৈতবিবর্জিতভাবে অনুভব—মুখে বলা যায় না। "সা রে গা মা পা ধা নি—'নি'তে বেশী থাকা যায় না।" "বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি তিনিই রেখেছেন"—লেশ অবিদ্যা-জনিত আভাস মাত্র আমি থাকে—লোকশিক্ষা বা আস্বাদনের জন্য। সেইখানে নিত্যও ঠিক থাকেন। কেবল নাম মাত্র, বহুর মধ্যে সেই নিত্যেরই আস্বাদন হয়। আবার (এই লীলা আস্বাদন) নিত্যকে লইয়া হয় বলিয়া বিজ্ঞানী কখন কখন নিত্যে থাকেন। ইহাই অনুলোম বিলোম। এখানে দেখা গেল 'দুই' স্বরূপতঃ সত্য নয়, ঠাকুর বলিতেছেন: পূর্ণ জ্ঞানে অভেদ, পূর্ণজ্ঞানে দুই-এর অস্তিত্ব নাই; কি থাকে বলা যায় না। বলিতে হইলে কেবলমাত্র সৎ, আনন্দ, চৈতন্য বলা যায়। শক্তি বলা যায় না, কারণ উপাধি নাই; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-রূপ উপাধি নাই। যখন উপাধি থাকে, অহংবোধ থাকে, তখন শক্তির অনুভব। "সমাধি থেকে অনেক নীচে এসে 'ওঁ ওঁ' অনুভব করি।" আবরণ- ও বিক্ষেপ-শক্তির কার্য যখন নাই, তখন শক্তিও নাই। আর আদ্যাশক্তিকে প্রতিবিম্ব-সত্যও বলা হইয়াছে। আর প্রতিবিম্ব-মাত্রই অনিত্য—এ-কথাও বলা হইয়াছে। সুতরাং নিত্য যেরূপ সত্য, লীলাও সেরূপ সত্য—এ-কথা বলা চলে না। কেননা 'লীলা মায়া' এ-কথা তিনি বলিয়াছেন, মায়া যে সৎকে অসৎ আর অসৎকে সৎরূপে দেখায়, মায়া যে অধ্যাস—এ-কথাও বলিয়াছেন। জড়ের ধর্ম চৈতন্য পায়, আর চৈতন্যের ধর্ম জড় পায়। অধ্যস্ত বস্তুর অন্যত্র সত্তা থাকে, তাহার আরোপ বলিব,—তাহা বলিতে পার না, যদি অধ্যস্ত বস্তু অন্যত্র থাকিত, তাহা হইলে সমাধিতে মনের নাশে সর্ব বস্তুর নাশ হইত না। কিন্তু যখন নাশ হয়, তখন সত্তা একদম থাকে না, তখন কেবল শুদ্ধ চৈতন্য থাকে। জড় সমাধির পর জাগ্রৎ অবস্থায় ঠাকুরের বিজ্ঞানী চৈতন্যই দেখেন—কেবল নাম-রূপের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া এখানে বিশিষ্টাদ্বৈত বা অচিন্ত্যভেদাভেদ বা সগুণ নির্গুণ উভয়, শাক্তাদ্বৈতবাদ, তাঁহার কথায় পাওয়া যায় না, কারণ জীব-জগৎ-বিশিষ্ট চৈতন্য বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যাঁহারা মানেন, তাঁহাদের মত ও অনুভূতি যথা—'চিন্ময় শ্যাম', 'চিন্ময় ধাম' প্রভৃতিরূপে, সেখানে চৈতন্যই প্রধান—'শ্যাম' আর 'ধাম' অপ্রধান এবং আমির যখন লোপ হয়, তখন উহারা থাকে না, একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মই থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, বিশিষ্টদ্বৈতবাদ, বিশেষণ বা জীবজগতের কোন কালে লোপ ও জীবব্রহ্মের তাদাত্ম্য, যথা—যে একের দুই নাই—অদ্বৈতম্—এ সকল স্বীকার করে না।

উপসংহারে এই দাঁড়ায় যে, অপর বস্তু হইতে যাহার অতিরিক্ত সত্তা থাকিবে, তাহাকে তদতিরিক্ত বা পৃথক্ বলা হইবে। এখানে যেহেতু একমাত্র ব্রহ্ম হইতে শক্তির অতিরিক্ত সত্তা নাই—ব্রহ্মের সত্তাই শক্তির সত্তা, সেই হেতু শক্তি ও ব্রহ্ম অভিন্ন।

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা

[পূর্বানুবৃত্তি—ষড়্‌বিধ সংজ্ঞা]

স্বামী ধীরেশানন্দ

দৃশ্যানুবিদ্ধ-শব্দানুবিদ্ধ-নির্বীজ-ভেদতঃ।
সমাধয়স্ত্রয়ো বাহ্যান্তরভেদেন ষড়্‌বিধাঃ॥
অরয়ঃ ষট্ সমাখ্যাতা ষড়্‌বিকারাশ্চ ভাবজাঃ॥ ৫১॥

দৃশ্যানুবিদ্ধ, শব্দানুবিদ্ধ ও নির্বীজ (অর্থাৎ নির্বিকল্প) ভেদে সমাধি তিন প্রকার। পুনরায় উহাদের প্রত্যেকটিই বাহ্য ও আন্তরভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় সমাধি[১] মোট ছয় প্রকার। রিপু[২] ও পদার্থবিকারসমূহও[৩] ষড়্‌বিধ কথিত হইয়া থাকে।

১. দৃশ্যানুবিদ্ধ, শব্দানুবিদ্ধ ও নির্বিকল্প সমাধি (নির্বীজ)—এই তিনটি সমাধিই বাহ্য ও আন্তরভেদে মোট ছয় প্রকার হইয়া থাকে। অর্থাৎ আন্তর সমাধি ত্রিবিধ ও বাহ্য সমাধি ত্রিবিধ। ('বাক্যসুধা' ২২-২৯ দ্রঃ)

আন্তর : 'দৃশ্য বস্তুসমূহের আমি দ্রষ্টা।' এইরূপে অবস্থিতির নাম **দৃশ্যানুবিদ্ধ-আন্তর-সবিকল্প সমাধি**। 'আমি অসঙ্গ' এইরূপ শব্দমাত্রাবলম্বনে অবস্থিতির নাম **শব্দানুবিদ্ধ-আন্তর-সবিকল্প সমাধি**। যে অবস্থায় পূর্বোক্ত দুইটিরই স্ফুরণ হয় না, এরূপ বস্তুমাত্ররূপে অবস্থানকে **আন্তর-নির্বিকল্প (নির্বীজ) সমাধি** বলে।

বাহ্য : 'বহির্দেশে সূর্যাদি যাবতীয় পদার্থের আমি দ্রষ্টা'—ইহা **দৃশ্যানুবিদ্ধ-বাহ্য-সবিকল্প সমাধি**। বাহ্য প্রতীতি সত্ত্বেও 'আমি অসঙ্গ'—এইরূপে স্থিতির নাম **শব্দানুবিদ্ধ-বাহ্য-সবিকল্প সমাধি**। উক্ত উভয়েরই অস্ফুরণ হইলে তাহাকে **বাহ্য-নির্বিকল্প সমাধি** বলে।

২. ষড়্‌রিপু : কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য।

৩. ষড়্‌ভাব-বিকার : জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ।

ষড়েব কৌশিকা দেহে জরাদ্যাশ্চ ষড়ূর্ময়ঃ।
লিঙ্গানি ষড়্‌বিধান্যত্র ষড়বস্থাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ ৫২॥

এই দেহে কৌশিক[১], জরা[২] আদি, ঊর্মি ও অবস্থা[৩] ছয়প্রকার। (শাস্ত্র-তাৎপর্য-নির্ণায়ক) লিঙ্গসমূহও[৪] ষড়্‌বিধ কথিত হইয়া থাকে।

১. ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা ও অস্থি—এই ছয়টি কৌশিক।

২. জরা, মরণ, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক ও মোহ—এইগুলিকে ষড়ূর্মি বলে। ইহাদের মধ্যে জরা, মরণ—শরীরের ধর্ম; ক্ষুধা, পিপাসা—প্রাণের ধর্ম এবং শোক, মোহ—অন্তঃকরণের ধর্ম-রূপে জ্ঞাত।

৩. শিশুত্ব, বাল্য, কৌমার, তারুণ্য, যৌবন ও বার্ধক্য—দেহের এই ছয়টি অবস্থা। দন্তোদ্‌গম হওয়া পর্যন্ত **শিশুত্ব,** পঞ্চবর্ষ পর্যন্ত **বাল্য,** দশবর্ষ পর্যন্ত **কৌমার,** পঞ্চদশবর্ষ পর্যন্ত তারুণ্য বা কৈশোর, ষোড়শবর্ষের পর **যৌবন** এবং ষষ্টিবর্ষের পর **বার্ধক্যাবস্থা**।

৪. উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—শাস্ত্রতাৎপর্য নির্ণয় করিবার এই ছয়টি লিঙ্গ।

গ্রন্থের আদি ও অন্তে প্রকরণ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের বর্ণনকে **উপক্রম-উপসংহার** লিঙ্গ বলে। ঐ প্রতিপাদ্য বিষয়টিরই গ্রন্থমধ্যে পুনঃপুনঃ কথনকে **অভ্যাস** বলা হয়। প্রতিপাদ্য বিষয়টির প্রমাণান্তর দ্বারা অপ্রতিপাদ্যতা (অগম্যতা) **অপূর্বতা** নামে খ্যাত। আনন্দপ্রাপ্তি প্রতিপাদনকে **ফল** বলা হয়। অথবা তত্তৎপ্রকরণে প্রতিপাদিত তত্তৎকর্ম, উপাসনা বা বিচারের অনুষ্ঠানোদ্ভূত প্রাপ্তব্য বিষয়কেই **ফল** বলা হয়। প্রকরণে স্তুতি বা নিন্দাপর বাক্য **অর্থবাদ** নামে কথিত। প্রতিপাদিত বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত যুক্তিসমূহ **উপপত্তি** নামে প্রসিদ্ধ।

ষট্‌শাস্ত্রানি চ সূত্রাণি ষট্‌ ষড়ঙ্গানি চৈব হি।
কর্মাণি ষট্‌ প্রমাণানি ষট্‌ শমাদি চ ষড়্‌বিধম্‌ ॥ ৫৩ ॥

শাস্ত্র[১], সূত্র[২], বেদাঙ্গ[৩], কর্ম[৪], প্রমাণ[৫] এবং শমাদি[৬]—এই সকলই ষড়্‌বিধ কথিত হইয়া থাকে।

১. পূর্বমীমাংসা (বেদের কর্মকাণ্ড বা কর্মমীমাংসা বা ধর্মমীমাংসা), উত্তরমীমাংসা (বেদের জ্ঞানকাণ্ড, ব্রহ্মমীমাংসা, শারীরকমীমাংসা, উপনিষদ্‌মীমাংসা বা বেদান্ত), ন্যায়, কাণাদ (বৈশেষিক), সাংখ্য এবং যোগ—এই ষট্‌শাস্ত্র। [জৈমিনির পূর্বমীমাংসা ও ব্যাসদেবের উত্তরমীমাংসা—এই মীমাংসাদ্বয়ে কর্ম উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসা অর্থাৎ বিচার আছে। বিধিবিহিত কর্মে প্রবৃত্তি এবং নিষিদ্ধকর্মে নিবৃত্তিই পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের ফল। কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, ক্রমে কর্মফলে অনিত্যতা-বোধ এবং জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ—এইরূপে পূর্বমীমাংসার চরম ফল মোক্ষ অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান ও তজ্জন্য মুক্তি। এমতে জীবাত্মা বহু, কর্মই ঈশ্বরস্থানীয় এবং কর্মবিষয়ক শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ।

মহর্ষি ব্যাসদেব-রচিত ব্রহ্মমীমাংসারই নাম 'বেদান্তদর্শন' বা ব্রহ্মসূত্র। এই বেদান্তদর্শনই সর্বশাস্ত্রের মধ্যে প্রধান। মুমুক্ষুগণের ইহা পরম উপাদেয় গ্রন্থ। ইহার বিচারে জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ-লাভ হয়। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা বুদ্ধি প্রখরতা লাভ করে। তখন পুরুষ মনন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব যুক্তিপ্রধান ন্যায়শাস্ত্রের মনন দ্বারাও ক্রমে বেদান্তজন্য জ্ঞানফল উৎপন্ন হয়। ন্যায়-মতে ষোলটি পদার্থের জ্ঞানদ্বারা নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি বলা হইয়াছে। বৈশেষিক-মতে দ্রব্য-গুণাদি সাতটি পদার্থের জ্ঞান ও তাহাদের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-জ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক—এই দুই শাস্ত্রেই পদার্থজ্ঞানদ্বারা আত্মজ্ঞানে মুক্তির পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানদ্বারা পুরুষের অসঙ্গতা-জ্ঞানই সাংখ্যশাস্ত্রের লক্ষ্য। ঐ অসঙ্গতা-জ্ঞান 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের লক্ষ্যার্থ অবগতিদ্বারা বেদান্তোক্ত মহাবাক্যজন্য জ্ঞানে উপযোগী হইয়া থাকে। অতএব মোক্ষই উহার ফল। পণ্ডিতগণ বলেন, প্রাচীন সাংখ্য-মতের সহিত বেদান্ত-মতের বিরোধ ছিল না। বিরোধ পরবর্তী কালে হইয়াছে। গীতা ও ভাগবতে বর্ণিত সাংখ্যমতের সহিত বেদান্তের কোন বিরোধ দেখা যায় না। পরবর্তী কালে অঙ্গীকৃত পুরুষের বহুত্ব, প্রকৃতির নিত্যত্ব এবং কর্তৃত্ব, কার্যবস্তুর নিত্যত্ব ইত্যাদি বিরোধী বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিলে সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

বিক্ষেপরূপ চিত্তমল দূর করিবার জন্যই মহর্ষি পতঞ্জলি 'যোগসূত্র' রচনা করিয়াছেন। যোগ-শাস্ত্রও জ্ঞানের সাধনভূত নিদিধ্যাসনের সম্পাদন দ্বারা মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে। ব্রহ্মসূত্রে যে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগমত খণ্ডিত হইয়াছে, সেখানে যেস্থলে উপনিষদের বিরুদ্ধ অর্থ কল্পনা করা হইয়াছে, সেই মতগুলিই খণ্ডিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাংখ্যাদিসূত্রের খণ্ডন করা হয় নাই। এইরূপে দেখা যায়, সকল শাস্ত্র-রচয়িতা ঋষিগণের মত অদ্বৈত-মতেরই অনুকূল।]

২. আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়ন, সত্যাষাঢ় ও বৈখানস—এই নামে ছয়টি সূত্র প্রসিদ্ধ। দর্শনশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র বা শব্দশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতার গ্রথিত সংক্ষিপ্ত বাক্য-বিশেষকে **সূত্র** বলে।

৩. শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ—এই ছয়টি বেদাঙ্গ। যাজ্ঞবল্ক্যাদিকৃত উচ্চারণাদি শিক্ষাবিষয়ক শাস্ত্রকে **শিক্ষা** বলে। কাত্যায়নাদি-প্রণীত যাগক্রিয়াসমূহের উপদেশ-বিষয়ক শাস্ত্র **কল্প**-নামে খ্যাত। বৈদিক শব্দের শুদ্ধতা-নিরূপক শাস্ত্রই **ব্যাকরণ**। পাণিনি ইহার প্রণেতা। বৈদিক মন্ত্রের অপ্রসিদ্ধ পদসমূহের ব্যাখ্যামূলক যাস্কাদি-প্রণীত ত্রয়োদশ অধ্যায়-বিশিষ্ট গ্রন্থ **নিরুক্ত**-নামে প্রসিদ্ধ। সূর্য, গর্গাদিকৃত গ্রহণাদিকাল-নিরূপক গ্রন্থকে **জ্যোতিষ** বলে। পিঙ্গল-আচার্যকৃত অষ্ট-অধ্যায়াত্মক ও বৈদিক গায়ত্রী-আদি ছন্দোবোধক শাস্ত্র **'ছন্দঃ'** নামে কথিত।

৪. ষট্‌কর্ম: স্নান, সন্ধ্যা, জপ, দেবতার্চনা, অতিথিসেবা ও বৈশ্বদেব।

৫. প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি বা (অন্যথা অনুপপত্তি) ও অনুপলব্ধি—ইহাই বেদান্ত-সম্মত ছয়টি প্রমাণ।

প্রত্যক্ষ: ইন্দ্রিয়দ্বারা ঘটাদি পদার্থের সহিত চিত্তের সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ ঘটিলে যে চিত্তবৃত্তি জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে প্রধানতঃ ব্যক্তির বিশিষ্টরূপ নির্ধারণ করে, তাহাকে **প্রত্যক্ষপ্রমাণ** বলে। **অনুমানপ্রমাণে** বস্তুটি দৃষ্ট না হইলেও উহার লিঙ্গ বা চিহ্ন দেখিয়া বস্তুর সত্তা নিরূপণ করা হয়। যেমন ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান করা হয়। অনুমানে—'যেখানে ধূম সেখানেই অগ্নি'—এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান আবশ্যক।

সাদৃশ্য জ্ঞান জন্য জ্ঞানের করণকে **উপমান প্রমাণ** বলে। 'গোসদৃশ এই পশুটি গবয়'—ইহা উপমিতি জ্ঞান।

আগম বা শব্দপ্রমাণ: বেদ, শাস্ত্র বা অভ্রান্ত ব্যক্তির বাক্য।

অর্থাপত্তি: দিবাভোজনত্যাগী পুরুষের স্থূলতা দর্শনে তাহার রাত্রিভোজন অনুমিত হইয়া থাকে। এখানে রাত্রিভোজন উপপাদক ও স্থূলতা উপপাদ্য। এইরূপে উপপাদক-কল্পনা-হেতুভূত উপপাদ্য জ্ঞানকেই **অর্থাপত্তি প্রমাণ** বলে।

অনুপলব্ধি প্রমাণ: পদার্থের যে অপ্রতীতি অভাব নিশ্চয়ের হেতু হইয়া থাকে, উহাই **অনুপলব্ধি প্রমাণ** নামে কথিত। যেমন ভূতলে ঘটের অপ্রতীতি-বশতই ঘটাভাব জ্ঞান হইয়া থাকে। অনুপলব্ধি প্রমাণ অভাব-জ্ঞানের জনক।

[চার্বাক-মতে কেবল প্রত্যক্ষমাত্রই প্রমাণ। কাণাদ ও বৌদ্ধ মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুইটি ; সাংখ্য-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ—এই তিনটি ; ন্যায়-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান

এবং শব্দ—এই চারিটি ; প্রাভাকর মীমাংসক-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপত্তি—এই পাঁচটি ; এবং ভট্টমীমাংসক ও বেদান্তমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি—এই ছয়টি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে :

'প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে ॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্যাহুঃ প্রাভাকরাঃ ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ ॥']

৬. শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান—**শমাদিষট্‌ক**।

জীব ঈশ বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশয়োর্ভিদা।
অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

বেদান্তমতে ছয়টি[১] বস্তু অনাদি। যথা—জীব, ঈশ্বর, বিশুদ্ধচৈতন্য, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, অবিদ্যা বা মায়া এবং অবিদ্যা ও শুদ্ধচৈতন্যের সংযোগ।

১. ছয়টির মধ্যে একমাত্র বিশুদ্ধ চিৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম অনাদি এবং অনন্ত। অবশিষ্ট পাঁচটি অনাদি কিন্তু অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে নাশবান্ বলিয়া সান্ত। এই ছয়টি বস্তু স্বরূপতঃ অনাদি। যে বস্তুর উৎপত্তি হয় না, অথচ তাহার সত্তা স্বীকার করা হয়, তাহাকে স্বরূপতঃ **অনাদি** বলে।

উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥ ৫৫ ॥

জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়, প্রাণীদিগের জন্ম ও পরলোকগতি, সংসার-বন্ধনকারী অবিদ্যা ও সংসারবন্ধন-বিনাশক বিদ্যা—এইগুলিই যিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন, তাঁহাকেই **ভগবান্** বলা হয়।

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
বৈরাগ্যস্যাথ জ্ঞানস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ ৫৬ ॥

পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য, পরিপূর্ণ ধর্ম, পরিপূর্ণ যশঃ, পরিপূর্ণ শ্রী, পরিপূর্ণ বৈরাগ্য এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান—এই ছয়টি[১] '**ভগ**' নামে কথিত হইয়া থাকে।

১. ঐশ্বর্যাদি ছয়টি 'ভগ' পরিপূর্ণরূপে যাঁহাতে বিদ্যমান, তিনিই ভগবান্ বলিয়া কথিত হন। শ্লোকস্থ 'সমগ্র' পদ সকল গুণগুলির সঙ্গেই যোজনা করিতে হইবে। এই শ্লোকটি অন্য আকারেও পাওয়া যায় :

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্ ॥

ভিক্ষবঃ ষড়জিহ্বাদ্যাঃ ষট্‌সংখ্যাকা বহির্মদাঃ।
ষড়্‌ভ্রমা রূপষট্‌কঞ্চ রসা ষড়্‌বৈ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৫৭ ॥

অজিহ্বাদি[১] ভিক্ষু সন্ন্যাসীরা, বহির্মদ[২], ভ্রম[৩], রূপ[৪], ও রস[৫]—এই সকলই ষড়্‌বিধ হইয়া থাকে।

১. ষড়্‌বিধ ভিক্ষু : অজিহ্ব, ষণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মুগ্ধ।

ইদমিষ্টমিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতে।
হিতং সত্যং মিতং বক্তি **তমজিহ্বং** প্রচক্ষতে॥ ১॥

অন্নাদি ভোজনকালে যে সন্ন্যাসী ইহা স্বাদু, ইহা অস্বাদু—এইরূপ মন্তব্য করেন না; যিনি সদা হিত-সত্য- ও পরিমিত-ভাষী, তিনি **অজিহ্ব** নামে কথিত হন।

অদ্যজাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবার্ষিকীম্।
শতবর্ষাং চ যো দৃষ্ট্বা নির্বিকারঃ স **ষণ্ডকঃ**॥ ২॥

সদ্যোজাতা বালিকা বা শতবর্ষা স্ত্রীদর্শনে যেরূপ কামবিকার উৎপন্ন হয় না, সেরূপ ষোড়শী নারী-দর্শনেও যাঁহার চিত্ত নির্বিকার থাকে, তিনি **ষণ্ডক** অর্থাৎ নপুংসক নামে অভিহিত হন।

ভিক্ষার্থমটনং যস্য বিন্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্ন পরং যাতি সর্বথা **পঙ্গু**রেব সঃ॥ ৩॥

যিনি ভিক্ষাদি গ্রহণ ও মলমূত্র পরিত্যাগ নিমিত্তই কেবল আসন পরিত্যাগকরত অন্যত্র গমন করেন, এবং যিনি কখনও এককালে এক যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করেন না, তিনি **পঙ্গু** নামে খ্যাত।

তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্ন দূরগম্।
চতুর্যুগাং ভুবং মুক্ত্বা পরিব্রাট্ সো**ঽন্ধ** উচ্যতে॥ ৪॥

কোথাও অবস্থানকালে বা ভ্রমণকালে যে সন্ন্যাসীর চক্ষুদ্বয় সম্মুখে ষোড়শহস্ত পরিমিত স্থান হইতে দূরে নিপতিত হয় না, তিনি **অন্ধ** নামে প্রসিদ্ধ।

হিতাহিতং মনোরামং বচঃ শোকাবহং চ যৎ।
শ্রুত্বাপি যো ন শৃণোতি **বধিরঃ** স প্রকীর্তিতঃ॥ ৫॥

যিনি হর্ষোৎপাদক অনুকূল বচন অথবা দুঃখজনক প্রতিকূল বচন শ্রবণ করিয়াও হর্ষবিষাদরূপ কোন বিকার প্রাপ্ত হন না, তিনি **বধির** নামে কথিত হইয়া থাকেন।

সান্নিধ্যে বিষয়াণাং চ সমর্থোঽবিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সুপ্তবদ্ বর্ততে নিত্যং স ভিক্ষু**র্মুগ্ধ** উচ্যতে॥ ৬॥

বিষয়ভোগোপযোগী সর্বেন্দ্রিয়সম্পন্ন হইয়াও যিনি বিষয়ের সান্নিধ্যে সুষুপ্ত পুরুষের ন্যায় নিত্য নির্বিকার থাকেন, সেই ভিক্ষু সন্ন্যাসীকে **মুগ্ধ** বলা হইয়া থাকে। (নারদ পরিঃ উপঃ ৩।৬৩—৬৮)।

২. বহির্মদ ছয়প্রকার : কুল-শীল-ধন, রূপ, যৌবন, বিদ্যা, রাজ্য ও তপঃ।

৩. কুল, গোত্র, জাতি, বর্ণ, আশ্রম ও নাম ভেদে ভ্রম ষড়্‌বিধ। মালব, কর্ণাটক, দ্রাবিড়াদি দেশভেদে অভিমানপূর্বক যে ব্যবহার, তাহাই **কুলভ্রম**। আমি বিশ্বামিত্রাদি গোত্রোৎপন্ন, এইরূপ ব্যবহারকে **গোত্রভ্রম** বলে। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদিতে অভিমান-পূর্বক ব্যবহার—**জাতিভ্রম** নামে খ্যাত। 'অষ্টাদশ বর্ণের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ'—এরূপ অভিমান-পূর্বক ব্যবহারকেই **বর্ণভ্রম** বলা হয়। অন্য অংশ স্পষ্ট।

৪. ছয় রূপ : শ্বেত, পীত, হরিত, রক্ত, কৃষ্ণ ও মাঞ্জিষ্ঠ (রাঙা বা রক্তাভ)।

৫. ষড়্‌রস : মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু, কষায় ও লবণ।

(ষড়্‌বিধ সংজ্ঞা সমাপ্ত)

স্বামীজীর জীবনে ও চিন্তাধারায় সুফী প্রভাব

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল

শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় নরেন্দ্র 'ধ্যানসিদ্ধ' ও নারায়ণের অংশরূপে অবতীর্ণ প্রাচীন 'নর 'ঋষি ; তিনি যে কোন একটি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন—এ-কথা বলা কোনরূপেই সমীচীন নয়। সমকালীন সকল ভাবই এই সকল যুগমানবের অন্তর থেকে আপনা হতেই উত্থিত হয়। তাহলেও মানুষ-জীবনে তাঁর যেমন গুরুদেব ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তেমনি ছিল তাঁর মাতাপিতা ও বংশ-গৌরব। আবার যেমন তিনি শিক্ষা করেছেন হিন্দুধর্মের বেদবেদান্ত, রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্য, তেমনি তাঁর ভাবকে সমৃদ্ধ করেছে অন্যান্য বিদেশী ধর্ম ও সাহিত্য, তথা প্রাচীন ইরানীয় ধর্ম ও কৃষ্টি, খৃষ্টান ধর্ম ও ইওরোপীয় সাহিত্য এবং ইসলাম ধর্ম ও এর সুফী চিন্তাধারা।

কলিকাতারই অধিবাসী রামমোহন দত্তের পুত্র (নরেন্দ্রনাথের পিতামহ) দুর্গাচরণ দত্ত ছিলেন সংস্কৃত ও ফারসী—এই উভয় ভাষাতেই একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাছাড়া তিনি আইনেও ছিলেন বিশেষজ্ঞ। তবু মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে পুত্র বিশ্বনাথের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংসারধর্ম ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পিতা বিশ্বনাথ ছিলেন ইংরেজী-শিক্ষিত, কলিকাতা হাইকোর্টের একজন আইনজ্ঞ এটর্নী। তাছাড়া তাঁর ফারসী ভাষায় ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। কথিত আছে, তিনি অনেক সময় তাঁর পরিবারবর্গকে ফারসী কবিতা বিশেষ ক'রে কবি হাফিজের গজল বা প্রেম-গীতিকা শুনিয়ে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করতেন। যেমন ছিল তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর, তেমনি সঙ্গীতে ছিল বিশেষ অনুরাগ। এবং তাঁরই আগ্রহে নরেন্দ্রনাথ হলেন সঙ্গীতানুরাগী ও তাঁর কলেজ-জীবনে সুকণ্ঠ আহমদ খানের কাছে হিন্দী, উর্দু ও ফারসী গান শিক্ষা করেন।

এই উন্নত-কৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্বনাথ স্বভাবতই উদারচেতা ও অতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। এই সহজ, সরল ও উদার ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অনেক সময়ই বিরূপ মন্তব্য করা হয়ে থাকে।

সাধারণ মানুষ অনেক সময় বাহ্য আচার-ব্যবহারকেই বড় ক'রে দেখে। যাঁর ভিতরে ফল্গুনদী প্রবাহিত, তিনি কি কখনও নির্দয় হ'তে পারেন? আমরা যেরূপেই গ্রহণ করি না কেন, গিরিশচন্দ্র ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পরম স্নেহাস্পদ ও স্বামী বিবেকানন্দের শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ জগাই-মাধাই লোক-চক্ষে মাতাল ও যবন-ভাবাপন্ন হলেও তাঁরা ছিলেন পরম ভক্ত ও প্রসিদ্ধ সুফী কবি জালালুদ্দীন রূমীর মসনবী-কাব্যের বিশেষ রসগ্রাহী। কিন্তু এই মসনবী-কাব্যের রসগ্রাহী বলেই এই পরমভক্ত দুজনকে মধ্যযুগের 'চৈতন্যমঙ্গল'-কার জয়ানন্দ বিশেষ নিন্দা করেছেন। এ নিন্দায় কি আসে যায়?—জহুরীই বস্তুতঃ জহর চেনে।

কথিত আছে, মাতালকে সাহায্য করায় বিরূপ মন্তব্য করলে বিশ্বনাথ নরেন্দ্রনাথকে বলে-ছিলেন, 'মানবজীবনের দুঃখ-ব্যথার মর্ম তুমি কি বুঝবে? মাদক-দ্রব্যের সহায়ে এই হতভাগারা কেবল ক্ষণিকের জন্যই তাদের এ দুঃখ ভুলে থাকতে চেষ্টা করে'; তা যখন বুঝতে পারবে,

তখন আপনা হতেই তাদের প্রতি তুমি সহানুভূতিশীল হবে।' দুঃখের বিষয় তাঁর পিতা দেখে যেতে না পারলেও এই পরোক্ষ আশীর্বাদ নরেন্দ্রনাথের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল।

তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীও ছিলেন পরম বুদ্ধিমতী ও কষ্টসহিষ্ণু। নরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার কাছ থেকে যেমন পেয়েছিলেন উদার মন, বিশ্বজনের প্রতি দরদ, দার্শনিকসুলভ স্বভাব ও সৌন্দর্যপ্রীতি, তেমনি তাঁর মাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন পরম নিষ্ঠা, দেবদ্বিজে ভক্তি ও ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা।

কঠোর সংযম-নিষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে প্রথম জীবনে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে না পারলেও, এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গানকে সব সময়ই হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলেও পরবর্তী জীবনে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি ছিলেন তিনি অসীম শ্রদ্ধাবান্। বস্তুতঃ সকল কামনা-বাসনার উর্ধ্বে উঠতে না পারলে কি ক'রে শ্রীমদ্ভাগবতের পবিত্র প্রেমের উপলব্ধি হ'তে পারে? স্বামীজীর শ্রীকৃষ্ণলীলা-গানের প্রতি বক্রোক্তি অনেকটা যুবক-সমাজকে সংযম-নিষ্ঠ করার কৌশলমাত্র। এই পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত প্রেমের আদর্শের সঙ্গে ফারসী সুফী আদর্শ তুলনীয়।

স্বামীজী যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের স্তুতি করেছেন, তেমনি ফারসী গজল তথা হাফিজের কবিতার প্রতিও তাঁর ছিল পরম প্রীতি। 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'র নবম খণ্ডে পাই, তাঁর হিমালয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে ১৮৯৭ খৃঃ মার্চ মাসে বেলুড় গঙ্গাতীরে একখানি ছোট বাড়িতে একটি বিশেষ জনসমাগমে পারসিক কবিতার বিস্তৃত আলোচনা হয়। কয়েকজন ইওরোপীয় সেখানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। স্বামীজী সেখানে ফারসী প্রেমগীতি-কার হাফিজের প্রসিদ্ধ সেই কবিতাটি আলোচনা করেছিলেন, যার অর্থ—'প্রিয়তমের মুখের একটি তিলের বদলে আমি সমরকন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য বিলাইয়া দিতে পারি।'

—এই পদটি আবৃত্তি করতে করতে সহসা তিনি সোৎসাহে ব'লে উঠলেন, 'দেখ, যে লোক একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝতে পারে না; তার জন্য আমি এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই।'

প্রেম-সঙ্গীতে আকৃষ্ট সৌন্দর্য-পিয়াসী পাঠকদের জ্ঞাতার্থে মাত্র প্রথম পদটির ফারসী-রূপ ও পূর্ণ গজলটির বাংলায় তরজমা দিচ্ছি।

অগর্ আঁ তুর্কে-শীরাজী বদস্‌ৎ আরদ্ দিলে-মারা;
বখালে-হিন্দুয়শ্ বখ্‌শম্ সমরকন্দ্ ও বুখারা রা।

—যদি শিরাজের সেই তুর্কি সুন্দরী আমার হৃদয় গ্রহণ করে, তবে তার কালো তিলের জন্য সমরকন্দ ও বোখারা বিলিয়ে দিতে রাজী আছি।

'হে সাকী, এই চিরস্থায়ী সুরা। আমাদের পান করতে দাও, কারণ বেহেস্তে এই স্রোতস্বিনী রুক্‌নাবাদের তীর ও মুসল্লার বাগান পাওয়া যাবে না। হায়, তুর্কীগণ যেমন লুণ্ঠিত দ্রব্য হরণ ক'রে নিয়ে যায়, সুপটু ও শহরময় চাঞ্চল্য-উৎপাদনকারী প্রেয়সীগণ তেমনি আমাদের হৃদয় হ'তে ধৈর্য কেড়ে নিয়েছে। বন্ধুর সৌন্দর্য আমাদের অসম্পূর্ণ প্রেমের কোন তোয়াক্কা করে না। সুন্দর মুখের আবার (বাইরের) আভা, বর্ণ, তিল বা গালের টোলের কি দরকার? আমি ইউসুফের সেই ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্য হ'তে জেনে নিয়েছিলাম যে, প্রেম নিশ্চয়ই জুলেখাকে সতীত্বের আবরণ হ'তে বাইরে টেনে নিয়ে আসবে। তুমি আমাকে তিরস্কার করেছ—

আমি এতেই সন্তুষ্ট,—ভগবান্ তোমায় ক্ষমা করুন; তুমি আমাকে ভালোর জন্যই বলেছ, চিনি-মিশ্রিত অধরের পক্ষে তিক্ত উত্তরই শোভা পায়। হে প্রাণপ্রিয়, আমার কথা শোন, কারণ ভাগ্যবান্ যুবকেরা এই জ্ঞানী বৃদ্ধের উপদেশ প্রাণাপেক্ষাও পছন্দ করেন। চারণকবি আর সুরার কাহিনীর কথা বলো ও পৃথিবীর গূঢ় রহস্য অল্পই জানতে চেষ্টা কর; কারণ জ্ঞানদ্বারা কেউই এ রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারেনি এবং (ভবিষ্যতেও) পারবে না। হে হাফিজ, তুমি এ প্রেম-গীতিকা গেয়ে মুক্তা ছড়িয়ে দিয়েছ। এস, সুললিত কণ্ঠে (আবার) এ গান কর; কারণ স্বর্গ থেকে তোমার গানের উপর পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছে।'[১]

অপূর্ব এর তত্ত্বকথা। আমাদের রাধাকৃষ্ণের সহিত ইউসুফ-জুলেখা চরিত্রের সাদৃশ্য তুলনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের রাধাকৃষ্ণ-চরিত্র বৈষ্ণবভক্তদের পরম আদরের জিনিস। তাঁরা একে দ্বৈতবাদ মতের শ্রেষ্ঠ বিষয়বস্তু মনে ক'রে থাকেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতকার ব্যাসদেব এই পরম পবিত্র গ্রন্থের সূচনাতেই ব'লে দিয়েছেন যে, ইহা বেদ তথা উপনিষদের ব্যাখ্যান মাত্র। সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর পরম রূপটি রূপকভাবে এখানে বিবৃত হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে ইউসুফ-জুলেখাকে অবলম্বন ক'রে ফারসী সুফী কবিদের অনেক প্রেম-গাথা বর্ণিত হয়েছে। সেই প্রেমের স্বাদ যাঁরা গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁদের লক্ষ্য করেই স্বামীজী বলেছেন, 'তার জন্য আমি এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই।'

মৌলানা জালালুদ্দীন রূমীর মসনবী, তথা 'মসনবীয়ে-মনবী' (বা আধ্যাত্মিক কাব্য) এরূপ একটি পবিত্র গ্রন্থ। এ-কে ফারসী কবিতায় কোরানের ব্যাখ্যা বলা হয়ে থাকে। এখানে কবি কোরানের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ঘাটন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন: আমি কোরানের মগজ বা আসল অর্থটি বেছে নিয়েছি, এর হাড়গুলি বা বাহ্য সাধারণ অর্থটি কুকুরদের জন্য। অর্থাৎ যাহা বাহ্যরূপে মুগ্ধ, তাদের ছুঁড়ে দিয়েছি।

'মন্ জে কোরান্ মঘ্‌জ্ রা বর্ দাশ্‌তম্;
উস্তখ্বান্ পেশে-সগান্ অন্দাখ্‌তম্।'

সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ফারসী সুফী কবি প্রিয়ার সুন্দর মুখের 'তিল' (খাল্)-এর ব্যাখ্যা কী সুন্দরভাবে করেছেন! ধ্যানে তাঁর অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা করা অসম্ভব; এই উভয় পৃথিবী তাঁর তিলের প্রতিবিম্ব মাত্র। যখন তাঁর তিলের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হই, তখন এরূপ ভাষার প্রয়োজন যা শরীরকে (অর্থাৎ দেহভাবকে) ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে পারে। সামান্য পিঁপড়ের ন্যায় এই সম্পদেই আমি সন্তুষ্ট, কারণ আমার তুলনায় ভারী বোঝাকে আমি বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।[২]

পিতার ন্যায় নরেন্দ্র যেমন ছিলেন হাফিজের গজলের প্রতি আকৃষ্ট, তেমনি মৌলানা রূমীর মস্‌নবী ও দেওয়ানে-শম্‌সে-তব্রীজের প্রতি ছিল তাঁর পরম শ্রদ্ধা। একাধিক স্থানে তিনি রূমীর কাব্য-কথা উল্লেখ করেছেন। আর ফারসী সুফী কবিদের ভাবধারার সহিত তাঁর চিন্তা-ধারার ঐক্য কেবল আমাদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সকল মহৎ ব্যক্তিই একই মহাভাবে উদ্বুদ্ধ।

মাদ্রাজের ট্রিপ্লিকেন সাহিত্য-সমিতিতে 'আমাদের উপস্থিত কর্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে

---

১ লেখকের 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাসে' এই কবিতাটির ফারসী অক্ষরান্তরীকরণসহ সংক্ষেপে হাফিজের জীবনী ও কাব্য-কথা বর্ণিত হয়েছে।

২ নিকল্‌সন্-সঙ্কলিত মস্‌নবী, ২য় খণ্ড, পঙ্‌ক্তি ১৯১-৩)

উপনিষদের সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর অপূর্ব রূপটি যে প্রেমের দ্বারাও সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায়, স্বামীজী কী সুন্দরভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন! তিনি 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্'। সেই অপূর্ব রূপ বাক্য বা মনের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। যখন জীবাত্মা সমুদয় বন্ধন হ'তে মুক্তিলাভ ক'রে বাক্য-মনের উর্ধ্বে ওঠে, তখনই 'তাঁর হৃদয়ে অদ্বৈতবাদের মূলতত্ত্ব—আমি ও সমগ্র জগৎ এক; আমি ও ব্রহ্ম এক—এ ভাবের উদয় হয়। আর এ ভাব যে কেবল শুদ্ধ জ্ঞান ও দর্শন দ্বারাই লব্ধ হ'তে পারে, তা নয়, প্রেমবলেও এর কতকটা আভাস পেতে পারি।' তার পরই শ্রীমদ্ভাগবত ও মসনবীর দুটি ছবি পাশাপাশি স্থাপন ক'রে স্বামীজী প্রেম-মাহাত্ম্যের ব্যাখ্যান করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই, গোপীগণের মধ্য হ'তে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হ'লে তাঁর বিরহে বিলাপ করতে করতে তাদের মনে তাঁর ভাবনা এরূপ প্রবল হয় যে, গোপীগণের প্রত্যেকেই নিজ দেহ বিস্মৃত হয়ে নিজেকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে তাঁরই মতো বেশভূষা ক'রে তাঁরই লীলা অনুকরণ করতে প্রবৃত্ত হ'ল। প্রেমের সাহায্যে যে সেই 'একে'র অনুভূতি হ'তে পারে, তা আমরা ফারসী সুফী কাব্যেও পাই। স্বামীজীও বলেছেন, প্রাচীন পারস্য-দেশীয় সুফী কবিতায়ও এরূপ একটি ভাবের কথা আছে: প্রেমাস্পদের নিকট গিয়ে দেখলাম গৃহদ্বার বন্ধ। দ্বারে আঘাত করায় ভিতর হ'তে প্রশ্ন হ'ল, 'কে?' উত্তর দিলাম, 'আমি'। দ্বার খুলল না। দ্বিতীয়বার এসে দ্বারে আঘাত করলাম। আবার সেই প্রশ্ন, 'কে?' —'আমি অমুক'। দ্বার খুলল না। তৃতীয়বার আসায় আবার সেই প্রশ্ন 'কে?' —'হে প্রিয়তম, আমিই তুমি, তুমিই আমি'। তখন দ্বার খুলল।'

মৌলানা রুমী মূল আখ্যানটি কাব্যময় ও আরও গূঢ় ইঙ্গিত সহকারে আমাদের সামনে উত্থাপন করেছেন:

সেই একজন তার বন্ধুর দ্বারে এসে আঘাত করে;
তার বন্ধু বলে, 'হে বিশ্বস্ত বন্ধু, তুই কে রে?'
উত্তর দেয়, 'আমি'। বন্ধু বলে, 'যা, হয়নি এখনো
—আমার এরূপ পরিবেষণ-আসর অপক্কের স্থান নয়।'
(বস্তুতঃ) অপক্ক-ব্যক্তি বিরহ ও বিচ্ছেদের আগুন ছাড়া
কেমনে হয় পক্ক—যদি না হয় কপটতা-হারা?
সেই হতভাগা যায় চলে—ও বৎসর খানেক ঘুরি ফিরি—
বন্ধুর বিরহের অগ্নি-শিখায় তাকে পুড়িয়ে দগ্ধ করি,
বিদগ্ধ হয়ে পক্ক—এইভাবে আবার সে ফিরে আসে;
আবার সেই গৃহের পরিবেশে অংশ নেয় যে সে।
শত ভয় ও ভদ্রতার সঙ্গে সে দ্বারের কড়া নাড়ে;
যেন কোন অভদ্র কথা তার মুখ হ'তে না বেরিয়ে পড়ে।
তার বন্ধু ব'লে ওঠে, 'কে আবার আমার দ্বারে?'
উত্তর দেয়, 'দ্বারে তুমিই, আমার মনোহারিণি; আরে।'
সে বলে, 'যখন তুমিই আমি, হে আমি, এসো ঘরে!
(কারণ) স্থান হয় না দুই 'আমি'-র এই একই ঘরে'।

মসনবী একটি বর্ণনামূলক আখ্যায়িকা কাব্য। এখানে শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় নানা আখ্যানের মাধ্যমে সেই অপরূপ প্রেমময় ভগবানের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। আর তাঁরই দেওয়ানে-শমসে-তব্রীজে জয়দেবের সংস্কৃত গীতগোবিন্দ অথবা আমাদের চণ্ডীদাস বা বিদ্যাপতির ন্যায় নানা গীতময় মধুর ছন্দে রুমী গজল বা প্রেম-কাব্য রচনা করেছেন। কী সুন্দরভাবে একই ভাবধারা তাঁর গজল-কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে!

এমনি চিন্তাধারায় প্রবুদ্ধ হয়েই স্বামীজী তাঁর 'Inspired Talks' বা 'দেববাণী'তে বলেছেন, 'সব জ্ঞানই প্রতিবিম্বিত জ্ঞান মাত্র, যেমন আয়নায় আমরা আমাদের মুখ দেখতে পাই। কেউ কখনও নিজের স্বরূপ বা ভগবান্‌কে জানতে পারে না। বস্তুতঃ আমরাই সেই আত্মা

বা ভগবান্।' ভগবান্ যে আমাদের প্রতিবিম্বিত রূপ মাত্র তা আর একজন প্রসিদ্ধ ফারসী সুফী কবি ফরীদুদ্দীন আত্তারের 'মুন্তিবুৎ-ত্বয়ের' (বা পাখিদের আলোচনা) নামক কাব্য-গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে

স্বামীজী তাঁর 'দেববাণী'র আর কয়েক পৃষ্ঠা পরেই কী সুন্দরভাবে প্রেমের স্বরূপটি ব্যাখ্যা করেছেন। 'ভগবান্‌কে ভালবাসতে গিয়ে আমরা নিজেদের দুভাগ ক'রে ফেলি—আমার স্বরূপের প্রতি প্রেমাকর্ষণ। ভগবান্ যেমন আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমিও সেরূপ তাঁকে সৃষ্টি করেছি। আমরা ভগবান্‌কে আমাদের অনুরূপ ক'রে সৃষ্টি করি। আমরাই তাঁকে আমাদের প্রভুরূপে সৃষ্টি করেছি—ভগবান্ আমাদের তাঁর দাসরূপে সৃষ্টি করেননি। যখন বুঝতে পারি যে আমরাও ভগবানের সহিত এক হয়ে আছি, তিনি এবং আমি (পরস্পর) বন্ধু—তখনই প্রকৃত সাম্যাবস্থা আসে ও আমরা মুক্তিলাভ করি। যতদিন তুমি নিজেকে সেই অশেষ ও অসীম হ'তে একচুল তফাৎ মনে করবে, ততদিন ভয় কখনো দূর হ'তে পারে না।' এখানে আমরা দেখতে পাই, স্বামীজী যেন চিনি খেতে চাচ্ছেন না, বরং চিনিতে রূপান্তর লাভ করাকেই অধিকতর পছন্দ করছেন।

স্বামীজী আরও বলেছেন: (ভগবান্‌কে ভালবেসে) জগতের কি কল্যাণ হবে—বোকার মতো এ প্রশ্ন কখনো ক'রো না। সমস্ত জগৎ নষ্ট হয়ে যাক—ভালবাসো এবং আর কিছুর প্রত্যাশা ক'রো না। চাই কেবল প্রেম—সকল বাদ-বিতণ্ডার নিপাত হোক। প্রেমপাত্র পান ক'রে পাগল হয়ে যাও। (কেবল) বলো, 'হে প্রভু, হে পরম প্রিয়, আমি চিরকাল তোমারই।' আর সব কিছু ভুলে তাঁর প্রেম-গভীরে ডুব দাও। ভগবান্‌ই যে প্রেমস্বরূপ! আর এজন্যই দেখতে পাই, ফারসী প্রসিদ্ধ কবি উমর খইয়াম বা হাফিজ কেবল সাকী, পানপাত্র ও সুরারই জয়গান তাঁদের রুবায়ী বা গজলে গেয়ে গিয়েছেন। খইয়াম নিজেই তাঁর একটি চতুষ্পদীতে এগুলির স্বরূপ ব্যাখ্যান করেছেন: মানুষ পানপাত্র, আর আত্মা অন্তঃস্থিত সুরা; শরীরটি বেণুমাত্র, আর তার প্রাণ দেহস্থিত শব্দ-ঝঙ্কার। হে খইয়াম, তুমি কি জানো, সেই মাটির মানুষটি কি?—ভাবের ফানুস মাত্র, আর মধ্যে রয়েছে আলোকবর্তিকা।

সুফী কবিদের ন্যায় স্বামীজীও জীবনকে একটি কাব্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর রূমীর প্রসিদ্ধ মসনবী কাব্যের প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই প্রাণকে বাঁশীর সহিত তুলনা ক'রে বলা হয়েছে:

'শোন, বাঁশী কি তার কাহিনী বর্ণনা করে;
সে যে তার বিরহ-ব্যথাতেই রোদন করে।'

আর যখন তাঁদের মধুর মিলন সংঘটিত হয়, তখনকার অবস্থা এরই শেষে বলা হয়েছে:

'ভগবান্‌ই সব কিছু, প্রেমিক তো তাঁর ছায়ামাত্র,
প্রেমিকাই জীবন্ত, প্রেমিক তো মৃত কায়ামাত্র।

জুম্‌লহ্ মাশুকস্‌ৎ ও আশিক্ পর্‌দ-ঈ;
জিন্দহ্ মাশুকস্‌ৎ ও আশিক্ মুর্‌দ-ঈ।'

লণ্ডনে প্রদত্ত 'সর্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন'[8] বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছেন, 'এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্রমাত্র। যখন সকল কামনা-বাসনা দূর হয়, তখনই মানুষ ঠিকমত জগৎকে উপভোগ করতে পারে। তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব—ভ্রমাত্মক অধিকার-বোধ থাকে না। ঋণদাতা নেই, ক্রেতা নেই, বিক্রেতাও নেই—তখনই জগৎ একখানি সুন্দর চিত্রের মতো। ভগবান্ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মতো

৩ লেখকের 'পারস্য সাহিত্যের ইতিহাস', পৃঃ ৬৪-৬৮

৪ God in Everything, C. W. Vol. II.

এমন সুন্দর ভাবধারা আর কোথাও পাইনি: তিনিই কেবলমাত্র অতি-মহৎ প্রাচীন কবি—সমগ্র জগৎই তাঁর কাব্য—অনন্ত প্রশান্তিতে পূর্ণ, নানা শ্লোকে, নানা ছন্দ ও তালে লিখিত। সকল কামনা-বাসনা ত্যাগ ক'রেই কেবল আমরা এ বিশ্ব-কবিতা-পাঠে আনন্দ পেতে পারি। তখন সব কিছুই ভগবৎ-রূপ ধারণ করে। সমস্ত আনাচে-কানাচে, সকল অলিগলি, যা পূর্বে অন্ধকার ও অপবিত্র মনে করেছিলাম, সবই তখন ব্রহ্মভাব ধারণ করে। তারা তাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে। তখন আমরা নিজেরাই আমাদের পূর্বের আচরণ মনে ক'রে হেসে উঠি। তখন আমরা মায়ের মতো ঐ খেলার পাশে দাঁড়িয়ে কেবল দেখেছি মাত্র।'

আর মৌলানা রূমী ভগবান্‌কে চিত্রকরের সঙ্গে তুলনা ক'রে কি সুন্দরভাবে বিশ্বরূপটি প্রকাশ করেছেন! এই সুফী কবি 'সুন্দরের স্রষ্টা চিত্রকর-আখ্যায়িকার মাধ্যমে প্রেমময় ভগবান্ যে সকল সুখ-দুঃখের উৎস হয়েও এতদুভয়ের উর্ধ্বে এবং সকল দুঃখ-ব্যথা সৃষ্টি করেও তিনি যে পরম মঙ্গলময় তাই প্রমাণ করেছেন:

এই দুঃখ দানও তাঁর পরিপূর্ণতারই পরিচয়;
এ বিষয়ে একটি আখ্যান বলি, হে মহাশয়।
এক চিত্রকর দুপ্রকারের চিত্র করেন সৃষ্ট:
পবিত্র চিত্র, আর চিত্র অপকৃষ্ট।
ইউসুফের চিত্র, আর সু-স্বভাব পরী-চিত্র;
কদাকার শয়তান, আর দেও-দানবের চিত্র।
এই চিত্র উভয়প্রকার তাঁর প্রভুত্বেরই প্রমাণ;
এ তাঁর অপূর্ণতার নয়, মহত্ত্বেরই প্রমাণ।
কদাকারকে যেমন দিয়েছেন তিনি পূর্ণ রূপ;
তেমনি কদাকৃতি এঁকেছেন তথায় প্রচুর।
যাতে প্রমাণ হয় তার জ্ঞানের পূর্ণতা;
আর তাঁর প্রভুত্ব অস্বীকারকারীর অজ্ঞতা।
হন যে অপূর্ণ না জানলে প্রকাশ কদাকারের;
সে জন্যই তিনি স্রষ্টা বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর।
এ কারণে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস তাঁরই সাক্ষ্য;
প্রণতিকালে তাঁর প্রভুত্বই যে তাদের লক্ষ্য।
কিন্তু জেনো, স্বেচ্ছায় জানায় প্রণতি বিশ্বাসী;
কারণ, তাঁরই অনুগ্রহ আর ভগবৎ-ইচ্ছার প্রয়াসী।
অবিশ্বাসীও তাঁকেই জানায় প্রণতি, তবে অনিচ্ছায়;
তার ইচ্ছায় যে রয়েছে নানা প্রকার অভিপ্রায়।
রাজ-দুর্গ সে-ও বটে করছে সুগঠিত;
কিন্তু তার দাবি যে করিতে নিজ অধিকৃত।
নিজ অধিকারের দাবিতে হয়েছে সে বিদ্রোহী;
অবশেষে কিন্তু সেই রাজাই হবে অধিকারী।
বিশ্বাসী রাজার জন্যই করছে কেবল দুর্গ;
তার প্রকাশে নাই নিজ শক্তি ও গর্ব।
কদাকার যে বলে, হে অসৎ-সৃষ্টিকারী রাজা;
তুমি শক্তিধর করিতে সৃষ্ট সদসৎ প্রজা।
সুন্দর যে বলে, হে মহৎ ও মঙ্গলের রাজা;
মুক্ত করেছ মোরে সকল দুঃখ-দুর্দশা হ'তে।[৫]

ভালমন্দের উপরে উঠে ঋষিদের ন্যায় কেবল সাক্ষিরূপে পৃথিবীটাকে ছবির মতো দেখবার উপদেশ দিতে গিয়ে স্বামীজী তাঁর 'দেববাণী'র অন্য একস্থানে বলেছেন, 'ভালমন্দ আমাদের দাসস্বরূপ, আমরা তাদের দাস নই। পশুর স্বভাব হ'ল, যে অবস্থায় আছে, তেমনি পড়ে থাকা। আর মানুষের স্বভাব হ'ল মন্দ ত্যাগ ক'রে ভালো হবার চেষ্টা করা। কিন্তু দেবতার স্বভাব হবে কোনটারই প্রত্যাশা না ক'রে সর্বাবস্থায় আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করা। আমাদেরও দেবতা হ'তে হবে। দিলকে দরিয়ায় রূপান্তর কর—পৃথিবীর সকল তুচ্ছতার উপরে উঠে যাও; এমনকি দুঃখেও আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠ। জগৎটাকে একটা ছবির মতো দেখ। কোন কিছুই তোমাকে বিচলিত করতে পারে না—এটাই সঠিক জেনে এই জগৎ-ছবির সৌন্দর্য উপভোগ কর।'

৫ মসনবী, ২য় খণ্ড; ২৫৩৬-৫০

স্বামীজী সুফীদের উল্লেখ ক'রে 'দেববাণী'তে (পৃঃ ৯৯-১০০) বলেছেন, 'তাঁরা জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন মনে করেন।' তাঁরা বলেন, 'আন্-অল্-হক্' অর্থাৎ আমিই সেই সত্যস্বরূপ। সুফীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ-বাণীর সার্থক উপলব্ধি করেছিলেন প্রসিদ্ধ সুফী সাধক মনসুর অল্-হল্লাজ। তাঁর এ-বাণীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জলালুদ্দীন রূমী তাঁর তত্ত্বালোচনামূলক ফারসী গদ্যগ্রন্থ 'ফীহি মা ফীহি'-তে বলেছেন, 'একটি মক্ষিকা মধুর মধ্যে পড়ে গেলে তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একই অবস্থায় রূপান্তর লাভ করে এবং কোন অংশই আর নড়তে পারে না। তেমনি 'ইস্তিগ্‌রাক্' বা সমাধির অবস্থা তখনই বলা যেতে পারে, যখন নিজের অস্তিত্বের কোন খেয়ালই মানুষের থাকে না। কোন কাজই তখন আর তার নিজের ব'লে মনে করতে পারে না। যদি সে তখনও সেই জীবন-সমুদ্রে সংগ্রামই করতে থাকে এবং ক্রন্দন ক'রে বলে, 'আমি জলমগ্ন হচ্ছি,' তাহলে সে আর 'ইস্তিগ্‌রাক্' অবস্থায় নয়। ইহাই 'অন্-অল্-হক্'-এর প্রকৃত অর্থ। সাধারণে এরূপ দাবিকে অহঙ্কারের চিহ্ন ব'লে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে 'অন্-অল্-অব্‌দ্' (অর্থাৎ আমি তাঁর দাস) ব'লে দাবি করে, সেই প্রকৃত অহঙ্কারী। 'অন্-অল্-হক্' অতি বিনয়ের একটি প্রকৃষ্ট প্রকাশ। যে 'আমি তাঁর বান্দা'—এই ব'লে দাবি করে, সে দুটি অস্তিত্বের স্বীকার করছে, তার নিজের ও ভগবানের। কিন্তু যে 'আমিই আল্লা' ব'লে দাবি করছে, সে এক ভগবানের অস্তিত্বেই কেবল স্থির বিশ্বাস করছে এবং তার নিজের অস্তিত্বকে একেবারে বিলোপ ক'রে দিয়েছে—'আমার কোন অস্তিত্বই নেই, কেবল এক তিনিই আছেন, আর তা ছাড়া কিছুই নেই।'—এ বিনয়ের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। দ্বৈতবাদীদের চিনি বা মধু আস্বাদের মধ্যে একটি মাধুর্য থাকতে পারে, কিন্তু অদ্বৈতবাদী ও সুফী সাধক এর মধ্যেও অহঙ্কারের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন।

উপনিষদের পরম পূজারী ও অদ্বৈতবাদের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক স্বামী বিবেকানন্দও 'সোঽহং' (আমিই সেই সত্যস্বরূপ)-এর বাণী প্রচারে কখনও বিরত হননি। তাঁর 'দেববাণী'-তে তিনি বলেছেন: মুক্তি ছাড়া আর সব ভাবনা দূর ক'রে দাও। গুরু ও তাঁর উপদেশে বিশ্বাস রাখো, এবং তেমনি তুমি যে নিশ্চিত মুক্ত হবে, এটি বিশ্বাস কর। যাই ঘটুক, কেবল বলো, 'সোঽহং, সোঽহং'। খেতে, বেড়াতে এবং নানা কষ্টের মধ্যেও এই কথা বলো। মনকে এটি মনে করিয়ে দাও যে, এই জগৎ-প্রপঞ্চ যা দেখছি, তার কোন অস্তিত্বই ছিল না, কেবল সেই (সত্যস্বরূপ) 'আমি' মাত্র আছি। দেখবে, দপ্ ক'রে একদিন সত্যের প্রকাশে মিথ্যা-স্বপ্ন ভেঙে যাবে। দিনরাত কেবল ভাবো জগৎ শূন্যমাত্র, কেবল ভগবান্‌ই আছেন।

এই পরম-সত্যের উপলব্ধি করতে হ'লে চাই আদর্শের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও অটল বিশ্বাস। এই ভাবোন্মাদ ও তৎসঙ্গে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কার্যকারিতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রূমী তাঁর 'মসনবী'তে বলেছেন, 'ভাব-সমৃদ্ধি দ্বারা মানুষ স্বস্থতা লাভ করে, যদি সে ভাব সেই সুন্দরতমের প্রতি হয়। আর যদি এই ভাবসমূহ কোন অস্বস্তি নিয়ে আসে, তবে আগুনে গলিত মোমের ন্যায় সে দগ্ধ হ'তে থাকে। সাপ ও বিছার মধ্যেও যদি সৎ-চিন্তাযুক্ত ভাব-সমন্বিত ভগবান্ তোমার আশ্রয় হয়, তবে সাপ-বিছাও তোমার সাহায্যকারী হবে। কারণ এই চিন্তাধারা কষ্টিপাথরের ন্যায় তামাকেও সোনায় রূপান্তরিত করতে পারে। এই সৎ-চিন্তাই মধুর ধৈর্যের

সৃষ্টি করে; ইহাই দুঃখ হ'তে মুক্তির আস্বাদ দেয়। হৃদয়ের একান্ত বিশ্বাস এই মুক্তি-স্বাদ বহন ক'রে নিয়ে আসে; আর দুর্বল বিশ্বাস হতাশা ও দুঃখ বহন করে। বিশ্বাস হ'তে যে ধৈর্য, তা অবশেষে মাথায় (গৌরব-) মুকুট পরিধান করে; আর যেখানে ধৈর্য নেই, সেখানে বিশ্বাসও নেই।'

Freedom of the will, অর্থাৎ যা বিশ্বাস করবে, তাই হবে। কিন্তু এই বিশ্বাস একনিষ্ঠ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। স্বামীজী তাঁর 'আমরা কি বিশ্বাস ক'রব?'[৬] বক্তৃতায় ইচ্ছা-শক্তির মূল্য নির্দেশ ক'রে আমরা কি কি বিশ্বাস ক'রব, তার একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, সকল ব্যক্তিই ভগবৎ-স্বরূপ। প্রত্যেকটি আত্মাই সূর্য—অজ্ঞান-মেঘে আচ্ছাদিত হয়ে আছে মাত্র। আত্মায় আত্মায় প্রভেদ এই মেঘাচ্ছাদনের গভীরতার রকমফের মাত্র।..... আত্মার বস্তুতঃ কোন লিঙ্গ নেই, কোন জাতিধর্ম নেই, বা কোন অপূর্ণতা নেই।'

অদ্বৈতবাদী বলেন, সৃষ্টিরহস্য মনের বিকার মাত্র। মনের বিকারই আমাদের মধ্যে ভেদাভেদের সৃষ্টি করেছে। নামরূপ তুলে নাও, তাহলে যে সত্যবস্তু থাকবে, তাই তিনি। তিনিই প্রত্যেক বস্তুর ভিতর সত্য-স্বরূপ। 'তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ—দণ্ড-হস্তে ভ্রমণ করছ, আবার জন্মগ্রহণ ক'রে তুমিই নানা রূপ ধারণ করেছ।'[৭] ঠিক তেমনি ভাবে সুফী কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে, 'আমি ও আমার ভেদ হ'তে তুমি মুক্ত; এই আত্মার প্রেম-লীলা চলে পুরুষ ও স্ত্রীর ভাবের মধ্যে। পুরুষ ও স্ত্রী যখন একাত্ম হয়, তখন সে তুমিই; যখন পৃথক্ পৃথক্ আত্মভাব বিলুপ্ত হয়, যা থাকে তা তুমিই। এই 'আমি ও আমরা' এজন্যই তুমি সৃষ্টি করেছ, যাতে নিজেই নিজের সঙ্গে খেলা করতে পারো। যাতে আমি-তুমি সকলে এক প্রাণ হ'তে পারে—তাই অবশেষে প্রিয়তমে মন সমর্পণ করে।'

"অয় রহীদয়-জানে-তু অজ্ মা ও মন্;
অয় লত্বীফয়-রূঃহ অন্দর্ মর্দ্ ও জন্।
মর্দ্ ও জন্ চূঁ য়ক্ শুবদ্ আঁ য়ক্ তুয়ি;
চূঁকি য়ক্‌হা মহ্ব শুদ্ আঁকি তুয়ি।
ইন্ মন ও মা বহরে-আঁ বর্ সাখ্‌তী;
তা তু বাখুদ নর্দে-খিদ্‌মৎ বাখ্‌তী।
তা মন্ ও তুহা হমহ য়ক্ জান্ শুবন্দ্;
আক্কবৎ মস্তিঘ্‌রক্কে—জানান্ শুবন্দ্।[৮]

বস্তুতঃ সেই পরমাত্মার কোন লিঙ্গ নেই, ধর্ম বা জাত নেই—তিনি স্বয়ং-সম্পূর্ণ। তাই সকল গুণের অতীত, নির্গুণব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ ব'লে উক্ত হয়েছেন। সেই গূঢ়-রহস্য অপ্রকাশ্য। তিনি কেবল শিব ও শক্তির মাধ্যমেই প্রকাশিত হ'তে পারেন। শিব পুরুষ বা পুংলিঙ্গ; তিনি static বা স্থবির হয়েও অনন্ত শক্তির ধারক। তিনি শান্ত ও সমাহিত—তাই গুণাতীত একক ব্রহ্মের পরিচয় রাখেন। তিনি জ্ঞানী—তাই অদ্বৈতবাদী। কিন্তু তিনি পঙ্গু—তাঁর স্ত্রীরূপিণী শক্তিকে অবলম্বন করেই তিনি পরিচিত বা প্রকাশিত। আর শক্তি স্ত্রীলিঙ্গ—তাই তিনি সৃজনশীল, বহু গুণের আধার। তিনি dynamic বা গতিশীল, চল-চঞ্চল। কিন্তু কেমন ক'রে চলতে হবে, তা জানেন না বলেই তাঁর একটি অবলম্বন (বা প্রেরণাদানকারী স্বামী) চাই—তাই তিনি ভক্ত। তিনি অন্ধ—তাই দ্বৈতবাদী।

শিব ও শক্তি বা জ্ঞান ও ভক্তির একান্ত সংমিশ্রণ হলেই সেই পরমের উপলব্ধি হয়; এবং

---

৬ What we believe in: Complete Works, Vol. IV, p. 302-6

৭ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪।৩

৮ মসনবী, ১ম খণ্ড, ১৭৮৫-৮

এই দুই গুণের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন নরেন্দ্রনাথকে শিবের অবতার বলেছেন, তেমনি জ্ঞানাতীত পরাভক্তির প্রতীক শুকদেবের সহিতও তাঁকে তুলনা করেছেন। আবার স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হয়েও তাঁর গুরুদেবের পরাভক্তিতে ভুলে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রিত হয়েছিলেন। গুরুদেবের সহিত নিজের ভাবের তুলনা করতে গিয়ে তাঁর এক শিষ্যকে স্বামীজী এই খাঁটি কথাটাই বলেছিলেন, 'He was all *Bhakti* without, but within he was all *Jnana*; I am all *Jnana* without but within my heart it is all *Bhakti*.' তাঁরা দু'জন যেন একই পরম-বস্তুর এপিঠ ওপিঠ মাত্র।

আমরা কিন্তু আগে 'সোঽহং' বা 'অন্-অল্-হক্'-মন্ত্রের দ্রষ্টা পুরুষ, জ্ঞানমার্গের একান্ত পথিক স্থফী সাধক মনসুর অল্ হল্লাজের উল্লেখ করেছি। এখানে ভক্তিমার্গের পরাকাষ্ঠা স্থফী সাধিকা রাবিয়া অল্ আদবিয়া-র উল্লেখ করছি। ভক্তির সঠিক মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে স্বামীজী আমাদের আর একজন ভক্তিমতী নারী মীরাবাঈ-এর সমতুল্যা রাবিয়ার উল্লেখ ক'রে 'দেববাণী'তে বলেছেন:[৯] জ্ঞানী বড় সূক্ষ্ম বিচার করতে ভালবাসে, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও একটা হৈচৈ বাধিয়ে দেয়; কিন্তু ভক্ত বলে, 'ঈশ্বর তাঁর যথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ করবেন',—তাই সে সব মানে। এবং একজন খাঁটি ভক্তের নিদর্শন-স্বরূপ বলেছেন, :

রাবিয়া রোগেতে হয়ে মুহ্যমান,
নিজ শয্যা 'পরে আছিলা শয়ান।
এহেন কালেতে নিকটে তাঁহার
আগমন হ'ল দুই মহাত্মার—
পবিত্র মালিক, জ্ঞানী সে হাসান,
পূজেন যাঁদের সব মুসলমান।
কহিলা হাসান সম্বোধিয়া তাঁরে,
'পবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে,
যে শাস্তি ঈশ্বর দিউন তাহারে,
সহিষ্ণুতা-বলে বহন সে করে।'
পবিত্র মালিক—গভীরাত্মা যিনি,
বলিলেন নিজ অনুভব-বাণী,
'প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই প্রিয় যার,
আনন্দ হইবে শাস্তিতে তাহার।'
রাবিয়া শুনিয়া দুঁহু সাধুবাণী,
স্বার্থগন্ধলেশ আছে তাহে গণি;
কহিলা, 'হে ঈশকৃপার ভাজন,
দুঁহু প্রতি এক করি নিবেদন—
যে জন দেখেছে প্রভুর বদন,
আনন্দ-পাথারে হইবে মগন।
প্রার্থনার কালে মনেতে তাহার
উঠিবে না কভু এমত বিচার—
শাস্তি পাইয়াছি আমি কোনকালে;
জানিবে না কভু শাস্তি কারে বলে।'

ফারসী স্থফী কবি ফরীদুদ্দীন আত্তার অষ্টম শতাব্দীর এই তিনজন ভক্ত সাধক বা সাধিকারই নাম তাঁর প্রসিদ্ধ 'তধ্‌কিরাতুল্-আউলিয়া' (বা সাধক-জীবনী) নামক গদ্যগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ও তাঁদের জীবনের বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। এই উপরি-লিখিত সুমধুর কাহিনীর কথাও এতে উক্ত হয়েছে।

হাসান বা হসনে-বস্‌রী (অর্থাৎ বস্‌রা-র অধিবাসী হসন), মালিক (মালিকে-দীনার) এবং রাবিয়া অল্ আদবিয়া—এই তিন জনই ছিলেন প্রসিদ্ধ বসরা শহরের অধিবাসী। আদী বংশের অন্তর্ভুক্ত ব'লে তিনি আদবিয়া, আবার পিতার চতুর্থা কন্যা ব'লে তিনি 'রাবিয়া' নামে পরিচিতা।

৯ The Life of Swami Vivekananda, by E. & W. disciples. p. 115.

এই তিনজনেরই অনেক অলৌকিক কাহিনী এই জীবনী-গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কথিত আছে, রাবিয়াকে প্রশ্ন করা হয়, প্রেম (মহব্বৎ) কি? তিনি বলেন, 'প্রেম অনাদি হ'তে এসে অনন্তে মিশে গেছে; এবং এই আঠার হাজার জগতের কাউকে এর এক পেয়ালা শরবৎ পান করাতে না পেরে, সত্য নিজেই প্রকাশিত হয়ে পড়লেন, তাতেই পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে যে, 'তিনি যেমন তাদের ভালবাসেন, তেমনি তারা তাঁকে ভালবাসে' (ইয়ুহিব্বুহুম্ ও ইয়ুহুব্বুনহু, কোরান, ৫; ৫৭)। বিশেষ ক'রে তাঁর নিম্নলিখিত প্রার্থনাটি উল্লেখযোগ্য: 'হে ভগবান্, পার্থিব সম্পদ যা আমার জন্য নির্দিষ্ট করেছ, তা শত্রুদের দিয়ে দাও; এবং পরবর্তী জীবনের যে সকল সম্পদ আমার জন্য রেখেছ, তা বন্ধুদের দাও—কারণ, আমার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট।'

ভক্ত বা প্রেমিক পার্থিব বা আধ্যাত্মিক কোন সম্পদেরই আকাঙ্ক্ষী নয়। তাঁর নিকট প্রেমময় ভগবান্—সেই পরম-স্বামী বা প্রেমিকাই (সুফীদের মাশুক্ অর্থাৎ যাঁকে ভালবাসা যায়) শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কিন্তু অদ্বৈতবাদী, জ্ঞানমার্গের পথিক সে আশ্রয় হতেও বঞ্চিত। তিনি বলেন, 'কার কাছে ভিক্ষা ক'রব? আমিই যথার্থ সত্তা, আর যা কিছু আমার স্বরূপ থেকে বিভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, তা স্বপ্নমাত্র। আমি সমগ্র সমুদ্র—তুমি নিজে ঐ সমুদ্রে যে একটি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি করেছ, তাকে 'আমি' ব'লো না। সেটা ঐ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় ব'লে জেনো। সত্যকাম শুনতে পেলেন—তাঁর হৃদয়াভ্যন্তরীণ বাণী তাঁকে বলছে, 'তুমি অনন্ত-স্বরূপ, সেই সর্বব্যাপী সত্তা তোমার ভিতরে রয়েছে। নিজেকে সংযত কর, আর তোমার যথার্থ আত্মার বাণী শোন।' (দেববাণী, পৃঃ ১৬৫) ঠিক তেমনি ভাবে সুফী সাধকগণও বলেছেন, আমাদের প্রভু 'উধ্কুরু-আল্লা' (অর্থাৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা)-র অনুমতি দিয়েছেন; আমাদের আগুনে পতিত দেখে আলোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যদিও আমি সকল গুণ ও প্রশংসার বাইরে এবং কোন প্রতীক আমার উপযুক্ত নয়, তথাপি এই সকল প্রতীক-ধারণা ও ভাবধারার বশবর্তী-গণ কোন উপমার মাধ্যম ছাড়া আমাকে বুঝতে পারে না। বাহ্য-প্রার্থনা নির্বোধের ভাব-সামগ্রী; কিন্তু ভগবৎ-প্রার্থনা এ সব হ'তে মুক্ত।'[১০]

---

১০ মসনবী, ২য় খণ্ড, ১৭১৫-৮

ভগবান্ তথাগত

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

তোমারে দেখেছি আমি এই মধু পূর্ণিমার সম
প্রশান্ত জ্যোতিতে ভরা শত শত শতাব্দীর আগে।
তব পুণ্য জন্মদিনে অন্তরের অর্ঘ্য লহ মম
সান্দ্রঘন নভস্তলে বন্দনার গাঢ় অনুরাগে।
মৃত্তিকার বক্ষ ভেদি ফুটে-ওঠা উদ্ভিদের মতো
বিশাল প্রান্তর-মাঝে, নিরালম্ব ধ্যানের আসনে
হে তপস্বী জিতেন্দ্রিয়, ছিলে তুমি সাধনায় রত—
কত দিন কত রাত্রি ধরি—জীব-দুঃখ-নির্বাপণে।

কত যুগ গেল চলে সংসারের নিত্য জেলে ধুনি,
তবুও ধ্বনিয়া ওঠে বিশ্বলোকে প্রাণীর ক্রন্দন।
রাজ্যধন দূরে রাখি মানুষের আর্তনাদ শুনি
দ্বার খুলে এলে তুমি ছিন্ন করি মায়ার বন্ধন
নিরঞ্জনা-তীরে। তোমার তপস্যা হ'তে জেগে ওঠে
নির্বাণের বাণী নব কামনারে সমাহিত করি ;
কমনীয় মনে তব অন্তরের পুষ্পদল ফোটে
স্পন্দমান করি হিয়া, সত্যধন সর্বদুঃখ হরি
দিলে জনে জনে তুমি প্রসন্ন করুণ নেত্রপাতে
প্রচারিলে নবধর্ম অহিংসার মহামন্ত্র সাথে।

তব নামে একদিন ধন্য হ'ল মোর জন্মভূমি
এশিয়ার ভাগ্যাকাশে সূর্যসম দিয়েছিলে দেখা।
রাজার দুলাল হ'য়ে পথে পথে কেঁদে কেঁদে তুমি
জীবের করেছ সেবা। ইতিহাসে আজো রহে লেখা
তব অবদান। রাজগৃহ সারনাথ শ্রাবস্তীর
পুণ্যকথা ভুলি নাই মোরা। উদ্ধারিলে অভাজনে
স্পর্শ দিয়া তব। অনন্তের পথ 'পরে অশ্রুনীর
রেখে গেছ যাহা, শুষ্ক কভু হবে না তা কোন ক্ষণে।

তবুও চলেছে হত্যা, প্রাণহীন যুগযাত্রী আজ,
দানবীয় রুদ্রলীলা দিকে দিকে করিছে বিরাজ।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা

[পূর্বানুবৃত্তি]

অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

রবীন্দ্র-কবিজীবনে অহেতুক দুঃখ-বিলাসিতা আছে, অতীন্দ্রিয় রহস্যবাদ আছে, দিব্য অভিজ্ঞতার প্রভাবে অন্তরের সুগভীর আলোড়ন আছে—এ সমস্ত তথ্যকে স্বীকৃতি দিলেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর কাব্যেতিহাসে এরূপ সচেতন প্রতিভার সাক্ষাৎ খুব কমই পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-কবিজীবনে গ্যয়টের মতো এত বহুমুখী কৌতূহল হয়তো ছিল না, কিন্তু আজীবন উদার সংস্কৃতির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনায় যে নানামুখী মানবকৌতূহলকে বেদনাসুন্দর রূপ দিয়েছিলেন, সে বিচিত্র রূপই রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের কবিসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতো এত সচেতন ও সর্বগ্রাসী মন পৃথিবীর খুব কম কবিরই দেখা গেছে।

উদার সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষণ হ'ল দেশ-কাল-বিধৃত সীমায়িত চেতনার জগৎ থেকে বৃহত্তর মানবচেতনার জগতে মুক্তি। এ সীমাতিক্রমী মুক্তিচেতনা শুধুমাত্র জীবনে নয়, সাহিত্য-শিল্পেও তার অম্লান চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনসাধনা সে সংস্কার-মুক্তিরই অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস। ধর্ম ও কর্ম, সাহিত্য ও রূপচর্চা, জাতীয়তাবোধ ও বিশ্ববোধ, রূপ ও অরূপের অনুভূতি—জীবনের সকল দিকেই গতানুগতিক সংস্কারকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বজীবন ও বিশ্বমনের সঙ্গে পরম আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে এত বড় উৎসাহ পৃথিবীর খুব কম কবির জীবনেই দেখা গেছে। ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে পিতার সংস্কার-মুক্তির সাধনা কৈশোর ও প্রথম যৌবনে রবীন্দ্র-চিত্তকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, রবীন্দ্র-মন আলোচনায় সে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যৌবনে রবীন্দ্র-মনকে সব চাইতে বেশী আকর্ষণ করেছিল রামমোহনের বিশ্বজনীন মানবধর্মের আদর্শ (universal human religion)। পরিণত যৌবনে প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে বুদ্ধ চৈতন্য ও খ্রীষ্টের দুর্নিবার মানব-প্রেম, মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত বৈষ্ণব ও আউল-বাউলদের সহজিয়া মানবপ্রীতি রবীন্দ্র-মনে সৃষ্টি করেছিল সর্বানুভূতির চেতনা। রবীন্দ্র-কাব্য-জীবনের প্রথম পর্যায়ে সে চেতনা আবেগময় রূপ নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। ১৯১২ খৃঃ ও তার পরে কয়েকবার ব্যাপক বিশ্বভ্রমণের ফলে সে চেতনা মননশীল রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, বস্তুতঃ রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটে বিশ্বজীবন ও বিশ্বসংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসে। 'বলাকা' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত কাব্যে বিশ্বজীবনের যে উত্তাল আবেগ-তরঙ্গ রবীন্দ্র-কাব্যকে বিচিত্র রূপে রসে ভাব ও ভাবনার বৈচিত্র্যময় প্রকাশে সবলসুন্দর রূপ দিয়েছে, তাতে এ পর্যায়ের বিশ্বসংস্কৃতি-সচেতন ভাবুক শিল্পী রবীন্দ্রনাথকে পূর্ব যুগের আর্টিস্ট শিল্পী রবীন্দ্রনাথ থেকে পৃথক্ ব্যক্তি বলেই মনে হয়।

বাস্তব জীবনে বিশ্বমানব-সংস্কৃতিকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করবার তাঁর যে মহৎ পরিকল্পনা, তারই প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বিশ্বজীবন-সচেতন কাব্যে ও সঙ্গীতে। বস্তুতপক্ষে ভবিষ্যৎ বিশ্ব-বাসীর নিকট রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় হবেন মুখ্যতঃ তাঁর আন্তর্জাতিক ভাবধারার জন্যে। পরিণত রবীন্দ্রকাব্যে বিশ্বমানবের উদ্দেশে যে আন্তরিক

প্রীতির অঞ্জলি আবেগময় ভাষায় সমর্পিত হয়েছে, বিশ্বের কাব্যেতিহাসে তা অতুলনীয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আশ্চর্য নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের উত্তর-কাব্য। বাংলাদেশের নিত্য পরিবর্তনশীল প্রকৃতি রবীন্দ্রকাব্যের বিরাট প্রেক্ষাপটে স্থান গ্রহণ ক'রে সে কাব্যকে বহুবর্ণালিম্পিত করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভার পরম বিকাশের মূলে যে তুঙ্গস্পর্শী বিশ্বসংস্কৃতি-চেতনা —এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। প্রাচ্য জীবনের শান্তিময় সৌন্দর্যচেতনার আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য জীবনের সচল সবল সংঘাতময় জীবনাদর্শের যখন সমন্বয় ঘ'টল, তখন রবীন্দ্রকাব্য যে বেগ ও বলিষ্ঠতা অর্জন ক'রল, তা ইতিপূর্বে ছিল একান্তভাবে অভাবিত।

এ মানবমুখী বিশ্বসংস্কৃতি-চেতনাকে কবি-প্রেরণার ভাবস্বর্গে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে সব চাইতে বড় অংশ গ্রহণ করেছিল কবি-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। আধুনিক পৃথিবীর রাজ-নৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব—শান্তি- ও মৈত্রীপ্রিয় রবীন্দ্রমনকে জীবন-সায়াহ্নে যে কত পীড়িত করেছিল, সে সংবাদ রবীন্দ্রজীবনী-পাঠকের অজানা নয়। এ বিষণ্ণ অভিজ্ঞতার ফলে মানব-জীবন-বেদনায় যন্ত্রণাজর্জর কবি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, এ বিরোধ-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করতে পারে একমাত্র সৃষ্টিধর্মী শিল্পী ও কবির সংস্কারমুক্ত বিশ্বদৃষ্টি। আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীর বহু দূরান্তবর্তী মানুষকে পরস্পর সন্নিহিত করবার আশ্চর্য কৌশল শিখলেও সহযোগিতা- ও প্রীতি-নির্ভর বিশ্বদৃষ্টি-দানে সমর্থ হয়নি। তার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান্ এ যুগের বিজ্ঞান দিয়েছে মানুষকে পারস্পরিক হিংসা দ্বেষ ঘৃণা ও জিগীষার প্রবৃত্তি। অথচ মানবেতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অতীতের মানুষ হিংসার বশবর্তী হয়ে পরস্পর যেমন যুদ্ধ করেছে, তেমনি পরস্পর সম্মিলিতও হয়েছে; মানব-মিলনের এ নৈতিক ভিত্তিই মানুষের সকল মহত্ত্বের মূলে। এ মিলনের শান্তিচ্ছায়ায় অতীতের মানুষ সৃষ্টি করেছিল মহৎ শিল্প সাহিত্য ধর্ম এবং মানুষের সৌন্দর্য-স্বপ্নকে রূপ দেবার জন্যে নানা প্রয়োগবিদ্যা।

মানবেতিহাসের এ নিবিড় অনুশীলন পরিণত রবীন্দ্র-মনে জাগিয়ে তুলল বিশ্বমানবতার স্বপ্ন। ভাবদর্শী রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহু স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু বিশ্বমানবতার স্বপ্নের মতো এত মহৎ স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য তাঁর জীবনেও বোধ হয় বেশী ঘটেনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এ স্বপ্ন যুক্তিবর্জিত অলীক—শুধু কবির স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে বাস্তব জীবনে রূপ দিতে গেলে জাতির স্বকীয়তা ব্যাহত হয়। জাপানী মনীষী কবি নোগুচিও একদা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু যুক্তি-শীল রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্বমানবতার উপলব্ধি জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার ক'রে নয়—জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার ক'রে সকল বৈষম্যের মধ্যে এক পরম ঐক্যের অনুভবই বিশ্বমানবতাবোধের চরম অন্বিষ্ট। বাস্তব জীবনে রবীন্দ্রনাথ এ মহান্ মানবাদর্শ লাভের জন্য সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল ব্যয় করেছেন তাঁর স্ব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর পরীক্ষাশালায়, আর ভাবজীবনে 'ভারততীর্থে'র মতো কবিতা রচনা ক'রে সর্বযুগের মানবসত্যকে মহিমান্বিত রূপ দিয়েছেন। জীবন-সায়াহ্নে পরম বেদনার সঙ্গে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞান পরস্পর-দ্বন্দ্বরত মানবের মধ্যে মিলনসাধনায় ব্যর্থ হয়েছে। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ মানব-মিলনের জন্য সৃষ্টিধর্মী শিল্পী ও কবির উপর এতটা নির্ভর করেছিলেন। আশা

করেছিলেন তিনি জাতীয় সংস্কৃতি থেকে প্রাণরস আহরণ ক'রে বিশ্বসংস্কৃতি ও বিশ্বজীবনের উদার আকাশে বিচরণ করবেন আধুনিক সৃষ্টিধর্মী শিল্পী ও কবি। দুর্নিবার প্রাণের প্রেরণায় সকল মানুষের মধ্যে মিলনসাধনাই হবে তাঁদের জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু। ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা কবির দৃষ্টিতে এঁরাই হলেন মহামানব। জীবনের শেষ জন্মতিথিতে কবি-মন যখন আধুনিক পৃথিবীর লোভ ও হিংসার আঘাতে বেদনায় বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, তখনও প্রবল আদর্শবাদের প্রেরণায় মহামানবের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি আনন্দময় সঙ্গীতের মাধ্যমে।

বস্তুতপক্ষে মহামানবের আবির্ভাব-কল্পনাই মননশীল কবির কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ জাগরণের স্বাক্ষর। কবির দৃষ্টিতে এই মহামানব ব্যক্তি ও বিশ্ব, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা করবেন। হোক তা মানবপ্রেমিক কবির স্বপ্ন-মাত্র, কিন্তু এই মহৎ স্বপ্নের মধ্যেই কবি রবীন্দ্র-নাথ বেঁচে থাকবেন ভবিষ্যৎ মানুষের মনে।

জগতের মহাকবিমাত্রই নিছক সৌন্দর্যসৃষ্টিকে তাঁদের কাব্যে প্রাধান্য দেননি। দুঃখ-তাপ-বেদনা-নিপীড়িত বিশ্ববাসীর জন্য কাব্যের আধারে বহন ক'রে এনেছেন তাঁরা মৃত্যুঞ্জয় জীবনের আশা ও আশ্বাসের বাণী। আধুনিক হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে খণ্ডিত মানুষের উজ্জীবন-স্বপ্নই রবীন্দ্রকাব্যের সে সুমহৎ বাণী। জীবনে যেমন তিনি কোন খণ্ডিত সত্যকে গ্রহণ করতে পারেননি, কাব্যেও তেমনি কোন বিশিষ্ট দেশকালবিধৃত খণ্ডসত্যকে স্বীকার করেননি। পূর্ণতার সাধনা রবীন্দ্র-জীবনের যেমন, রবীন্দ্র-কাব্যেরও তেমনি শ্রেষ্ঠ পরিচয়। জীবন-সায়াহ্নে মানবসত্যের চরম বিকৃতি দেখে পূর্ণ মানুষের আবির্ভাব-কল্পনার মধ্যেই কবি তাই শেষ আশ্রয় খুঁজেছিলেন। আশা- ও আদর্শব রবীন্দ্রনাথের এ মানব-প্রত্যয় খণ্ডসত্যের পূজারী একশ্রেণীর বাস্তববাদী ইওরোপীয় সমালোচকের তীব্র সমালোচনার সামগ্রী হয়েছিল। কবির কালজয়ী জীবনাদর্শকে বাস্তব-বিমুখ স্বপ্ন-বিলাসিতা ব'লে অভিহিত করতেও তাঁরা দ্বিধা করেননি। যে কাব্যধারায় এ মহান্ দ্রষ্টার আদর্শের ছায়াপাত ঘটেছে, সে কাব্যকেও তাঁরা বায়বীয়ভাবে পরিপূর্ণ ব'লে মনে করেছেন।

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের একশ্রেণীর খণ্ডসত্যের উপাসক বস্তুবাদী সমালোচকের কাছেও রবীন্দ্রনাথের প্রবল আদর্শবাদ নির্মম সমালোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ শ্রেণীর জনৈক সমালোচকের মতে গ্যয়টের কাব্যপ্রতিভা রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বড়, যেহেতু গ্যয়টের জীবনবোধ রবীন্দ্রনাথের জীবন-চেতনা থেকে অনেক বেশী সবল। রবীন্দ্রনাথের সত্যানুধ্যানও গ্যয়টের তুলনায় দুর্বল। কেননা 'অস্তিত্বের দুর্বহ জটিলতা এবং দুঃসমাধেয় বিরোধের মুখোমুখি হয়ে তিনি আড়াল খুঁজেছেন বিমূর্ত ভাবের সরল সমন্বয়ে।' উক্ত সমালোচকের মতে সত্যানু-ধ্যানের পথে রবীন্দ্রনাথ যখনই কোন দুরারোহ সংশয়ের সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই তিনি 'মানব-তন্ত্রের কঠিন নির্দেশ ভুলে প্রাক্তন প্রত্যয়ের শান্তিতে আশ্রয় নিয়েছেন।' গ্যয়টেও জীবনে সমন্বয়ের শান্তিপ্রত্যাশী ছিলেন, কিন্তু এ শান্তি-লাভের জন্যে তিনি কখনও সত্যের পথ থেকে দূরে সরে যাননি। আলোচ্য সমালোচক আরও মনে করেছেন: 'রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্র গ্যয়টের মানবতন্ত্রের তুলনায় অস্তিত্বনিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেকটা দুর্বল।'[১] ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন ও মানবজীবনকে

১ দ্রষ্টব্য: শিবনারায়ণ রায়। সাহিত্যচিন্তা। রবীন্দ্রনাথ ও গ্যয়টে

একটি আদর্শান্বিত দৃষ্টিতে দেখেছেন। গ্যয়টের মতো জীবনকে তিনি সমগ্রভাবে স্বীকার করতে পারেননি। এ-কারণে অসামান্য সৃষ্টি-ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি এমন কোন কাব্য-সাহিত্য রচনা ক'রে যেতে পারেননি, যা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমতুল্য।

আর একজন বস্তুবাদী সমালোচক রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেও বলেছেন—রবীন্দ্রনাথ একসময়ে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েও সে আন্দোলন থেকে পরে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন 'উপনিষদ্-প্রাপ্ত দীক্ষামন্ত্রের প্রভাবে।' বেদের শিক্ষায় তিনি পরস্পর-দ্বন্দ্বরত বিশ্বমানবকে শুভবুদ্ধির যোগে সংযুক্ত করার বাণী প্রচার করেছিলেন। তত্ত্ব হিসেবে সে বাণীর পরম মূল্য স্বীকার করেও উক্ত সমালোচক মনে করেন ব্যাবহারিক, কর্মপন্থা হিসেবে সে বাণী ব্যর্থ। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা ক'রে তিনি বলেছেন—যে সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাবে বর্তমান পৃথিবীতে লোভপ্রবৃত্তি অত্যন্ত উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সে ব্যবস্থা পরিবর্তিত না হ'লে মানুষের এ প্রবৃত্তি কখনও উৎসাদিত হ'তে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী-প্রসঙ্গে উক্ত লেখক বলেন: রবীন্দ্রনাথ লোভ জিনিসটাকে একটা পরম নির্বস্তুক মানসভঙ্গীরূপে দেখতেই অভ্যস্ত, এর যে একটা ব্যাবহারিক সঙ্কেত অথবা একটা বস্তুগত অস্তিত্ব থাকতে পারে, তা কখনও ভেবে দেখেননি। তাঁর পূর্ব-সাধকদের মতো তিনিও সমস্ত চরাচরে শুধু ভাবের খেলাই দেখেছেন, বস্তুকে দেখেননি। তাই ভাব দিয়ে বস্তুকে বদলাবার কার্যক্রম ব্যর্থ হয়ে গেল।[২] 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি', 'মা গৃধঃ' সত্ত্বেও সমস্ত মানুষ এক পরমসত্তার আকর্ষণে সংযুক্ত হ'ল না।

রবীন্দ্র-প্রতিভার তুলনায় গ্যয়টের কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব দেখবার প্রয়াসের ভিতর লেখকের চিন্তার সবলতা প্রকাশ পেলেও জীবন-দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আধুনিক বস্তুবাদী সমালোচক যতই বুদ্ধিচর্চা করুন না কেন, জীবনকে প্রত্যক্ষ বাস্তব সীমার বাইরে দেখতে তাঁরা অনভ্যস্ত। পরিপূর্ণ জীবনের পক্ষে বাস্তব দৃষ্টি যেমন সত্য, ভাবদৃষ্টিও তেমনি সমানভাবে সত্য, প্রত্যক্ষ জীবন-সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষের বাস্তব দৃষ্টি প্রখরতা লাভ করে—এটা অনস্বীকার্য, কিন্তু প্রত্যক্ষতার সীমাতিশায়ী দুর্জ্ঞেয় জীবন-রহস্যের সম্মুখীন হয়ে মানুষের সচেতন ভাবনা যখন কূল পায় না, তখন জীবনের তিমিরাভিসারে ভাবময় দৃষ্টিভঙ্গী আলোর রেখা বিকীর্ণ ক'রে মানবমনকে আকর্ষণ করে শ্রেয়োবোধের দিকে। এছাড়া দেশকালের প্রভাবেই বাস্তব বা ভাবদৃষ্টি মানুষের জীবনে প্রাধান্য লাভ করে। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের যে বহুমুখী প্রবণতা জীবনের বিচিত্র প্রদেশে আত্ম-প্রকাশ ক'রে সে-দেশের জীবনদৃষ্টিকে করেছিল বস্তুমুখী, সে দেশকালের প্রভাবেই গ্যয়টের কাব্যপ্রতিভা একটা ভাস্বর দীপ্তি লাভ করেছিল। বস্তুজগতে যে নিত্যনূতন উদ্ভাবনী শক্তি রেনেসাঁসে সত্যিকার প্রাণধর্ম, ভারতীয় রেনেসাঁস ছিল সে বৈশিষ্ট্যবর্জিত। শুধুমাত্র ধর্ম সমাজ এবং সাহিত্যের আধারে নবতর আদর্শ অনুসন্ধানেই ভারতীয় রেনেসাঁস স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছিল। সুতরাং ইওরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবজাত যে মানবতন্ত্রের সাধনা গ্যয়টের কাব্যপ্রতিভাকে প্রত্যক্ষ জীবনলোকে জাগ্রত করেছিল, সে একই বাস্তবাশ্রিত জীবনরূপ

২ দ্রষ্টব্য: অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্র-মানস: রবীন্দ্র-মানস সম্পর্কে কয়েকটি কথা।

রবীন্দ্রকাব্যে অনুপস্থিত দেখে গ্যয়টের কাব্যপ্রতিভার তুলনায় রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভা দুর্বল—এ ধরনের ধারণা অযৌক্তিক এবং অহেতুক। রবীন্দ্রনাথের নিকট বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ পরস্পর-বিরোধী নয়—একে অপরের পরিপূরক। বস্তুজগতের সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থান্ধ জীবন-সংঘাতে পীড়িত হয়ে রবীন্দ্র-মন যদি বিমূর্ত ভাবজগতে সমন্বয়ের পথ খুঁজে থাকে, তবে সে তাঁর প্রবল আদর্শবাদের জন্যে। নিজের জীবন ও মানবজীবনকে আদর্শায়িত রূপে দেখার প্রবৃত্তির মূলেও রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর জীবনদৃষ্টি। মানুষের মনে লোভ আছে, পাপ আছে, হিংসা আছে, ঈর্ষার হলাহল আছে—বাস্তব জীবনে মানুষের এ কলঙ্ককালিমাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেননি। তা সত্ত্বেও ভাবদর্শী রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় প্রত্যয় মানবাত্মার অবস্থান এ সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে—সে আত্মা শুভ্র নিরঞ্জন পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অংশ। বর্তমান যুগের নির্মোহ বাস্তববাদী পরস্পর-বিবদমান মানুষ ক্রমশঃ আত্মার অনুসন্ধানের পথেই একদিন মৈত্রীবন্ধনে মিলিত হবে—ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার এ পরম উপলব্ধিই রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ জাগরণের মূলে।

সংস্কারমুক্ত এ বোধের জগৎ রবীন্দ্রচিত্তকে সবলে আকর্ষণ করেছিল জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকে মানবতার উদার প্রাঙ্গণে। সচেতন বুদ্ধি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন আধুনিক রাজনীতি ও সমাজনীতির বাস্তব আদর্শ সর্বমানবের মধ্যে মৈত্রী-প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। খুব সম্ভব এই কারণেই রবীন্দ্র-মন অতীতচারী হয়ে মানবমৈত্রীর উপায় হিসেবে সবলে আঁকড়ে ধরেছিল উপনিষদের ভোগাসক্তি-বিমুক্ত জীবনদর্শন এবং বেদোক্ত শুভবুদ্ধির আদর্শকে। ব্যাবহারিক কর্মপন্থা হিসেবে বেদ ও উপনিষদের আদর্শ যে এ-যুগে চলছে না—সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে অনবহিত, তা বলা চলে না। তবুও রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক মানুষের সর্বগ্রাসী লোভ- ও হিংসা-প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎসাদিত করবার জন্যে সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করেননি, তার কারণ রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতা বা কঠোর নীতিবিদ্ নন—তিনি সর্বযুগের মানবজীবনের রহস্য-সন্ধানী সৌন্দর্যদ্রষ্টা শিল্পী এবং সৃজনধর্মী কবি। অখণ্ড মানবসত্যকে দ্রষ্টার ভাবদৃষ্টি দিয়েই যাচাই করেছেন তিনি, উপলব্ধি করেছিলেন—বাস্তবদৃষ্টি যে-মানবসত্যের সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় ঘটায়, সে সত্য খণ্ডিত, সুতরাং অপূর্ণ। যে-সত্য দেশকালের সীমা অতিক্রম ক'রে সর্বযুগের মানবমনকে শ্রেয়োবোধের জগতে উত্তীর্ণ করে না, সে একপেশে জীবন-সত্য রবীন্দ্র-মন কখনও গ্রহণ করেনি। এ অখণ্ড মানবসত্যবোধই রবীন্দ্র-মনকে জীবনের বিচিত্র রূপের দিকে পথ নির্দেশ করেছিল। কাব্যে তার পরিপূর্ণ প্রতিফলন কবির পক্ষে হয়তো সম্ভব হয়নি। প্রকাশের জগতে এ অপূর্ণতার জন্য কবির আক্ষেপেরও সীমা ছিল না।

রবীন্দ্র-জীবনে ভাববাদ প্রাধান্য পেয়েছিল ব'লে নিজের ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনকে তিনি একটি আদর্শায়িত দৃষ্টির সাহায্যে দেখেছিলেন, সন্দেহ নেই। তাই ব'লে বস্তুর বাস্তব রূপকে তিনি কখনও অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করেননি। রবীন্দ্র-কাব্যের শেষপর্যায়ের মনোযোগী পাঠক এ সত্য স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই, তবে রবীন্দ্র-মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করেও বস্তুদৃষ্টিকে জীবনে তিনি একান্ত ক'রে তোলেননি। রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ জীবনবোধ ভাববাদী ও বস্তুবাদী চেতনার সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাব্যে বিচিত্র পরিণতি লাভ করেছে। কবির অতি-তীক্ষ্ণ

সৌন্দর্যচেতনা ও সীমাতিশায়ী অরূপ ভাবনা যখনই মর্ত্যসীমা অতিক্রম ক'রে ভাব-জগতের অসীম আকাশে উড্ডীন হয়েছে, তখনই বাস্তব জীবনের বিবর্ণ বিশীর্ণ রূপ তাঁর কবি-কল্পনাকে আবার মানব-সমাজের দিকে আকর্ষণ করেছে। এ কারণেই রবীন্দ্রকাব্যে এত দিক্-পরিবর্তন, এত রূপ-পরিবর্তন। 'সোনার তরী' থেকে শুরু ক'রে 'জন্মদিন' পর্যন্ত কাব্যে কবির ভাবানুভূতি ও ভঙ্গীর ক্ষেত্রে কতবার যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, রবীন্দ্রকাব্য-পাঠকের তা অজানা নয়। আধুনিক ইংরেজী কাব্য-সমালোচক লরেন্স ডুরেল (Durrell) প্রকৃত কবির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'Poets must develop and grow, if they are real poets and not hacks.' রবীন্দ্র-কাব্যও কবির ভাব ও বস্তুদৃষ্টির আকর্ষণে ক্রমশঃ পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। সে পূর্ণতার দিকে যাত্রাপথে কবি কখনও মানবজীবন-এবং মানবপ্রেমবিমুগ্ধ হয়ে বহুবর্ণালিম্পিত ছবি এঁকেছেন, আবার কখনও বা এ ছলনাময় সৌন্দর্যজগতের মোহমুক্ত হয়ে মানবাদর্শের অস্পষ্ট ছায়াময় পথে ধাবিত হয়েছেন। কাব্যজীবনে ভাবের পথেই হোক, রূপের পথেই হোক—যে পথেই অগ্রসর হোক না কেন, সে পথের সৌন্দর্যকে কবি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গেই এঁকেছেন। কবির জীবনবোধ ও প্রকাশের জগতে কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। রবীন্দ্রকাব্যে অতি তীব্র ভাবাবেগের সঙ্গে আর্টের যে অপরূপ সমন্বয় ঘটেছে, তার তুলনা পৃথিবীর কাব্যেতিহাসে বিরল। খণ্ড দৃষ্টির সাহায্যে বিচার করতে গেলেই রবীন্দ্রকাব্যের সে বিরল-সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। ভাব- ও বস্তু-জগতের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যকে সর্বলোকাশ্রয়ী রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন, সে মাপকাঠিতে বিচার না ক'রে জীবনবোধের বিশিষ্ট কোন দিক্ থেকে রবীন্দ্র-কাব্যের অর্থ খুঁজতে গেলে তা অন্ধের হস্তি-দর্শনেই পর্যবসিত হবে সন্দেহ নেই।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রকাব্যে মানবতন্ত্র-বিচারের মাপকাঠি কবির স্বজীবনে উপলব্ধ বিশিষ্ট ধর্মবোধ। এ ধর্মবোধ বস্তুধর্মবিবর্জিত নয়, কিন্তু মুখ্যতঃ ভাবপ্রধান। 'বলাকা' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত কাব্যধারায় ধর্মবোধ প্রবল প্রত্যয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও, ইতিপূর্বেকার কাব্যপ্রবাহে তা ক্ষীণধারায় হলেও যে আত্ম-প্রকাশ করেনি, তা বলা চলে না। কাব্য-রচনার প্রথম যুগের নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যসম্ভোগের জগৎ থেকে বৃহত্তর মানবধর্মবোধের জগতে উত্তরণের সন্ধিক্ষণে রবীন্দ্র-মনে যে প্রবল ভাবসংঘাত উপস্থিত হয়েছিল, তার পরিচয় আছে 'কল্পনা' কাব্যে, যে কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ আখ্যায়িত করেছেন 'ঋতুপরিবর্তনের কাব্য' ব'লে। 'নৈবেদ্য', 'কথা ও কাহিনী'তে ধর্মবোধের প্রকাশ দ্বন্দ্বহীন ও গভীরতাধর্মী হলেও আবেগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশে স্পন্দমান। মানবতার আদর্শ-সন্ধানে এ সমস্ত কাব্যে কাব্যদৃষ্টিও অতীতচারী।

কিন্তু সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার প্রভাবে 'আধুনিক সভ্য'-নামধারী মানুষ দুর্জয় লোভ ও হিংসার উত্তেজনায় যে মানবতাবিরোধী কার্যে লিপ্ত হয়েছে, তার বাস্তবরূপ-দর্শনে বিশ্বসমস্যা-সচেতন কবির দেরি হয়নি। পাশ্চাত্যের সে দস্তুর সভ্যতার সর্বপ্রথম আবেগময় প্রকাশ 'নৈবেদ্য' কাব্যে।* অতঃপর তার মননশীল প্রকাশ ঘটে 'নবজাতকে'। 'নবজাতক'-কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'প্রৌঢ় ঋতুর মননজাত ফসল', আর রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমাকারী অমিয় চক্রবর্তী বলেছেন 'কবির প্রথম আধুনিক কাব্য'। এ

* দ্রষ্টব্য: শতাব্দীর সূর্য

কাব্যে এবং এর নিকটবর্তী কালে রচিত সমস্ত কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত সম্প্রদায়ের বেদনার বাণীকে যে সবল রূপ দিয়েছে, তাতে কবিকে কোনমতেই বস্তু-দৃষ্টিহীন ভাবরাজ্যে বিচরণশীল স্বপ্নচারী ব'লে আখ্যাত করা চলে না।

এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য মননশীল প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের উত্তর পর্যায়ের কাব্যে চরম দার্ঢ্য এনে দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মনন-শীলতাই রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভার চরম পরিচয় নয়। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভাকে পরম পরিণতি দান করেছে কবির বোধদৃষ্টি (intuition)। এ দৃষ্টির সাহায্যেই কবি উপলব্ধি করেছেন, বর্তমান পৃথিবীর লোভজর্জর মানুষ সাময়িকতার দ্বারা অভিভূত হলেও ক্রমবিবর্তনের ধারায় শুভবুদ্ধির জাগরণের ফলে আবার মানবমৈত্রীর উদার রাজ্যে উত্তীর্ণ হবে। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। মানবমাহাত্ম্যের প্রতি কবির শ্রদ্ধা এত অকুণ্ঠ ও দ্বিধাহীন ছিল যে, আধুনিক বস্তুবাদীদের মতো মানুষকে তিনি শুধু লোভী পশু ব'লে ভাবতে পারেননি। পূর্ণতার অভিমুখে যাত্রাপথে মোহ জীবনকে ধূলিকলঙ্কিত করে, অবিশ্বাস সন্দেহ এসে মানুষের লক্ষ্যাভিমুখী মনকে করে দ্বিধাকলঙ্কিত। তবু 'দুর্যোগের মায়ার আড়ালে' নিত্যের যে ভাস্বর জ্যোতি বর্তমান, সে অম্লান সত্যের জ্যোতিই মানুষকে যুগে যুগে আকর্ষণ করবে পূর্ণতার দিকে। এখানে অনুভূতিশীল কবি এসে মিলিত হয়েছেন প্রজ্ঞাবান্ অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানীর সঙ্গে। সাময়িকতার প্রভাবে আচ্ছন্ন বস্তুবাদী সমালোচকের খণ্ড দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের এ সুবিস্তৃত জীবন-চেতনার মর্ম-গ্রহণে অক্ষম। এ কারণেই তাঁরা রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভাকে পৃথিবীর বস্তুবাদী অপরাপর শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যপ্রতিভার তুলনায় খর্ব করবার আগ্রহে অত্যুৎসাহী, এতে তাদের অভিনব চিন্তার দম্ভ প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র পণ্ডিতম্মন্যতার সাহায্যে রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভার সম্যক্ উপলব্ধি সম্ভব হয় না। বস্তুতঃ বিশ্বের চিরকালীন কবিসমাজে রবীন্দ্রনাথের স্মরণযোগ্যতার অন্যতম দাবি হবে মানুষের শুভবুদ্ধির উপর কবির সীমাহীন বিশ্বাস এবং শান্তিস্বর্গচ্যুত মানুষের পুনর্জাগরণ-স্বপ্ন।

উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে রবীন্দ্র-নাথের ধর্মসচেতন ও মানবসচেতন কবিতার মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদরেখা টানা সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের মানবচেতনা গভীরতম ধর্মবোধের দ্বারা উদ্দীপ্ত, আবার নিবিড় ধর্মবোধও মানব-চেতনাবর্জিত নয়। বস্তুবিশ্ব, মানবসমাজ ও অধ্যাত্মজগৎ—এ তিনের অন্তঃস্পর্শী উপলব্ধিই রবীন্দ্রকাব্যের অতল গভীরতা ও সুবিশাল ব্যাপ্তির মূলে। তাঁর ধর্মোপলব্ধি বেদ ও উপনিষদের অদ্বৈতবাদকে স্বীকার ক'রে মুখ্যতঃ বিকাশলাভ করলেও বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ এবং বাউল ও মধ্যযুগের সন্তদের মরমীয়াবাদের প্রভাবে বিচিত্র রসপরিণতি লাভ করেছে—এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কবির ধর্মসচেতন কাব্য-সঙ্গীতে এ সমস্ত ধর্মমতবাদের কোন না কোনটির প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান। শেষ পর্যায়ে যে ধর্মবোধ রবীন্দ্রকাব্যকে বিশ্বের কাব্যজগতে বিশিষ্টতা দান করেছে, তা কোন শাস্ত্রোক্ত ধর্ম নয়—কবির স্বজীবনে অনুশীলিত জ্ঞান ও প্রেমের মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত সর্বসংস্কারমুক্ত মানবধর্ম। ধর্মানু-ভূতির জগতে এ সংস্কারমুক্তি কবির কাব্য-প্রকাশেও যে অনিবার্য পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, রবীন্দ্রকাব্যের মনোযোগী পাঠকমাত্রই তা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন। অলঙ্কারপ্রিয় কালিদাসাদি

ক্লাসিক কবি, প্রসাধনপ্রিয় বৈষ্ণব কবি ও মধ্যভিক্টোরীয় যুগের কবিদের ঐতিহ্যলালিত যে কবি-মন বহুকাল যাবৎ রূপ ও রসের জগৎ-সৃষ্টিতে নিমগ্ন ছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নিদারুণ সংঘাতে সে মনের আবেগময় সৌন্দর্য-স্বপ্ন অকস্মাৎ ভেঙে গেল। বীরের রক্তস্রোত, ভাগ্যহত মাতার মর্মভেদী ক্রন্দন রবীন্দ্র-চিত্তকে জাগিয়ে তুলল বাস্তবলাঞ্ছিত প্রীতিহীন জগতে। মনুষ্যজগতে বিরোধ বিক্ষোভ, স্বার্থোদ্ধত অবিচার এবং বিধ্বংসী আত্মনাশপ্রবণতা যতই জাগ্রত হয়ে উঠছে, কবি ততই আকৃষ্ট হয়েছেন এমন একটি প্রসারিত ধর্মবোধের প্রতি—যে ধর্মবোধ দেশকাল-জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানুষেরই গ্রহণযোগ্য। ‘কল্পনা’ কাব্যে যে ধর্মবোধের আভাস, ‘বলাকা’কাব্যে সে ধর্মবোধের সুস্পষ্ট প্রকাশ এবং তৎপরবর্তী শেষপর্যায়ের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি—মানবধর্মবোধের সর্বোত্তম বিকাশ। ‘বলাকা’ ও ‘নবজাতকে’র অন্তর্বর্তী ‘পূরবী’ ও ‘মহুয়া’-কাব্য কবির প্রেমানুভূতির শ্যামল দ্বীপ। জীবন-সংঘাত-পীড়িত কবি-মন বিশ্রামের অবকাশ খুঁজেছে এ-ছুটি প্রেমানুভূতিনির্ভর শিল্পসচেতন কাব্যে। কল্পনাসৃষ্ট রূপজগৎ থেকে বাস্তব-ধূসর মানব-জগতে উত্তরণই রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়।

দীর্ঘপথ-পরিক্রমার শেষে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্পর্কে একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসবার পরও রবীন্দ্রকাব্য-পাঠকের মনে একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায়—কল্পনাশ্রিত রূপজগৎ থেকে বাস্তবাশ্রিত মানবজগতে উত্তরণই কি রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভার চরম পরিচয়? এ প্রশ্ন পাঠক-মনে জাগ্রত হবার প্রধান কারণ বর্তমান বিশ্বের প্রবল ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়েও মৃত্যুর মাত্র এক বৎসর পূর্বে কবি আবার অনির্বাণ আকূতি অনুভব করেছেন রোমান্টিক রূপজগতের প্রতি[৪]। বাস্তবিক পক্ষে বাস্তব-জীবনের নির্মম সংঘাত রবীন্দ্র-কবিচিত্তে যত গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করুক না কেন, রূপ- ও রস-জগতের প্রতি সহজাত আকর্ষণকে জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কবি কখনও অতিক্রম করতে পারেননি। সুতরাং এ সত্য স্বীকার করতেই হয় যে, কবির বহুকাল অনুশীলিত বিশ্বানুভূতির সঙ্গে অপ্রতিরোধ্য রোমান্টিক সৌন্দর্যানুরাগ রবীন্দ্রকাব্যকে চিরকালের ভাবুক ও রসিক সমাজে প্রিয় ক'রে তুলবে।

৪ দ্রষ্টব্য: নবজাতক

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতকে বাংলার গগনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাঁহার হিন্দুয়ানি আচার ও নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য ও নিরভিমানতা গুণগুলি সকলেরই জানা আছে। সেই বিদেশী অনুকরণের যুগে এই মনীষী নিজের জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সকলেরই শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি যখন কাশীবাস করিতেছিলেন, সেই সময় ভবিষ্যতের 'স্বামী বিবেকানন্দ' মাত্র প্রস্তুতির পথে। ১৮৮৮ খৃঃ মধ্যভাগে বা তৃতীয়ার্ধে স্বামী প্রেমানন্দ ও ফকিরবাবুর সহিত স্বামীজী পশ্চিমাঞ্চলে তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হন। কাশীতে স্বামীজী দ্বারকা-দাসের আশ্রমে প্রায় এক সপ্তাহ বাস করেন, প্রমদাদাসবাবুর সহিত তখনও স্বামীজীর পরিচয় হয় নাই, কিন্তু ভূদেববাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের ফলে উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন হয়। ভূদেববাবু এত অল্পবয়স্ক একজন বাঙালী সাধুর এইরূপ গভীর জ্ঞান-দর্শনে চমৎকৃত হন। স্বামীজী বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে ভূদেববাবু বলিয়াছিলেন, 'আশ্চর্য! এত অল্প বয়সে এই বিরাট অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি! আমি নিঃসন্দেহ যে, ইনি একজন মহান্ ব্যক্তি হইবেন।'

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মাদ্রাজে সহকারী একাউন্ট্যান্ট-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মন্মথবাবু স্বামীজীর সহপাঠী এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিখ্যাত পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পুত্র। ১৮৯২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী পরিব্রাজকরূপে ত্রিবেন্দ্রামে পৌঁছিয়া অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের গৃহে অতিথি-রূপে ৯ দিন বাস করেন। এই সময়ে শ্রীআয়ার মন্মথবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং স্বামীজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। ঐ সময় হইতে স্বামীজী সকালটা মন্মথবাবুর সঙ্গে কাটাইতেন এবং মন্মথবাবুর গৃহেই আহার করিতেন। শ্রীআয়ার ইহাতে একদিন অনুযোগ করেন যে, স্বামীজী অধিকাংশ সময়ই মন্মথবাবুর সঙ্গে কাটাইতেছেন। তাহাতে স্বামীজী উত্তর দেন, 'আমাদের বাঙালীদের স্বজাতিপ্রীতি সুবিদিত। মন্মথবাবু আমার সহপাঠী, এই সূত্রেও তাঁহার বিশেষ দাবি আছে আমার উপরে।'

পুনরায় রামেশ্বরম্ হইতে দণ্ডকমণ্ডলু-হস্তে পদব্রজে প্রত্যাবর্তন-কালে পথে হঠাৎ মন্মথবাবুর সহিত দেখা হয়। স্বামীজী মাদ্রাজ যাইতে অভিলাষী জানিয়া মন্মথবাবু মাদ্রাজে তাঁহাকে তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। মাদ্রাজে পৌঁছিয়া স্বামীজী দেখেন, ১০।১২ জন উৎসাহী ও শিক্ষিত যুবক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। ইঁহাদের অনেকে ক্রমে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এ সময় কয়েক দিনের জন্য হায়দরাবাদে যাইবার বিশেষ আবেদন আসে। মন্মথবাবু তাঁহার বন্ধু হায়দরাবাদের নিজামের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়কে তারযোগে স্বামীজীর হায়দরাবাদ-গমনের সংবাদ দেন।

স্বামীজী পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে ১৮৯৮ খৃঃ নভেম্বরে মন্মথবাবু কলিকাতা আসিয়া মঠে তাঁহার সহিত দেখা করেন।

মিস স্যানবর্ন

স্বামীজী ধর্মমহাসভায় যোগদান-মানসে চিকাগো পৌঁছিয়া যখন জানিলেন, ধর্মমহাসভা আরম্ভ হইবে সেপ্টেম্বর মাসে এবং কোন ধর্মসংস্থার পরিচয়-পত্র না থাকিলে উক্ত সভায় প্রতিনিধিত্ব করিতে দেওয়া হইবে না, অধিকন্তু প্রতিনিধি-তালিকাভুক্ত হইবার কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি কিছুটা হতাশ হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ হাতে যে সামান্য অর্থ ছিল, তাহাতে তিন মাসের খরচ চলা অসম্ভব। চিকাগো অপেক্ষা বস্টন শহরে খরচ কম, এইরূপ শুনিয়া তিনি বস্টন রওনা হইলেন।

পথে ট্রেনে এক বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। ইনিই মিস ক্যাথারিন এবট স্যানবর্ন। এই নারী বাগ্মী ও লেখিকা ছিলেন, বস্টন শহরের নিকটে মেটকাফ গ্রামে 'ব্রিজি মেডোজ' নামক এক গোলাবাড়িতে বাস করিতেন। মিস কেট স্যানবর্ন নামেই ইনি পরিচিতা ছিলেন। মিস স্যানবর্ন স্বামীজীকে তাঁহার গৃহে আমন্ত্রণ করেন। স্বামীজীও সম্মত হন।

২০শে অগস্ট ১৮৯৩ খৃঃ আলাসিঙ্গাকে লিখিত পত্রে জানা যায়, স্বামীজী ব্রিজি মেডোজে থাকাতে তাঁহার প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে এবং মিস কেটের লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে ভারতাগত এক 'অদ্ভুত জীব' দেখাইতেছেন! কিন্তু এই গৃহে বাস করিবার সময়ই এই মহিলার মাধ্যমে ডাঃ জন হেনরী রাইটের সহিত স্বামীজীর পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের ফলেই স্বামীজী ধর্মমহাসভায় যোগদান করিবার সুযোগ লাভ করেন।

এইখানে থাকাকালে শেরবর্ন নারী-কারাগারের অধ্যক্ষা মিসেস জনসনের সহিত স্বামীজীর আলাপ হয় এবং স্বামীজী সংশোধনাগারটি দেখিয়া আসেন। পূর্বে উল্লিখিত পত্রে এই সংশোধনাগারের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাওয়া যায়।

মিস কেট স্যানবর্নের সম্পর্কিত এক ভাই ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্জামিন স্যানবর্ন স্বামীজীর সংবাদ পাইয়া প্রথমতঃ হিন্দু সাধুর প্রতি বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করেন। তথাপি 'ব্রিজি মেডোজে' আসিয়া স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু এই সাক্ষাতের ফলে তাঁহার মত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং তিনি স্বামীজীর সঙ্গ-লাভে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক মিঃ স্যানবর্ন জনহিতকর কার্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি ছিলেন আমেরিকার 'বোর্ড অব চ্যারিটি'র সেক্রেটারি। তিনি অলকট, ইমার্সন, থোরো ইত্যাদির বন্ধু ছিলেন ও তাঁহাদের জীবনী লিখিয়াছেন। তিনি নিউ ইয়র্ক সারাটোগা স্প্রিংসে আমেরিকান সোশ্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের সভায় পরবর্তী কালে স্বামীজীকে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করেন। ঐ সময় উহাই ছিল রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মিলনক্ষেত্র।

১৮৯৩ খৃঃ সেপ্টেম্বর প্রথম সপ্তাহে স্বামীজী সারাটোগাতে যান এবং তিনটি বক্তৃতা দেন। প্রথম বক্তৃতা 'ভারতে মুসলমান শাসন', দ্বিতীয়—'ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার'। তৃতীয় বক্তৃতার বিবরণ অজ্ঞাত। যাহা হউক ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি সারাটোগায় বক্তৃতা দেন, এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। এই স্থানে যে-সকল বক্তৃতা হইত, তাহা সম্পূর্ণ ধর্মবহির্ভূত বিষয়-

সংক্রান্ত, সেইকারণেই স্বামীজী ঐরূপ বিষয়-বস্তু স্থির করেন।

এই স্থানে ডক্টর হ্যামিল্টনের বৈঠকখানায় ভারতবর্ষের বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও দুইটি ভাষণ দিয়াছিলেন। সে-সময়ের পত্রিকার সংবাদ হইতে জানা যায় যে, এই সকল বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে স্বামীজী তাঁহার ভবিষ্যৎ বিজয়-গৌরবের সোপান প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

মিসেস কেট ট্যানাট উডস্

মিসেস কেট ট্যানাট উডস্ একজন বৃদ্ধা মহিলা। ১৮৯৩ খৃঃ অগস্ট মাসে তিনি স্বামীজীকে তাঁহার সালেম-স্থিত গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। এই মহিলা সালেমের ১৬৬নং নর্থ স্ট্রীটে বাস করিতেন এবং স্বামীজী সেখানে ২৮শে অগস্ট হইতে ৩রা সেপ্টেম্বর এক সপ্তাহ বাস করেন। ধর্মমহাসভার পরে আর একবার আসিয়া এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। এই সময় মিসেস উডসের বয়স প্রায় ৫৮ বৎসর, তথাপি তিনি ছিলেন উৎসাহী বক্তা ও লেখিকা। শিশুদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, শিশু-সাহিত্যও তিনি কিছু লিখিয়াছিলেন। এই মহিলার একমাত্র পুত্র মিঃ প্রিন্স উডস্ সেই সময় ডাক্তারি পড়িতেছিল। মিসেস উডস্ 'Thought and Work Club'-এ ২৮শে অগস্ট সোমবার স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই বক্তৃতা Wesley Chapel-এ অনুষ্ঠিত হয়। Thought and Work Club মিসেস্ কেট ট্যানাট উডস্ কর্তৃক ১৮৯১ খৃঃ স্থাপিত হয়। তিনি সালেমের ধর্মযাজকদিগকে স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আমন্ত্রণ করেন। এই বক্তৃতায় ধর্মযাজকগণ স্বামীজীর প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। মিসেস উডস্ এইরূপ মন্তব্য করেন যে, ধর্মযাজকগণ সঙ্কীর্ণ মনের পরিচয় দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের গৃহসংলগ্ন বাগানে স্থানীয় বালক-বালিকা ও তরুণতরুণীদিগের সভার ব্যবস্থা করিয়া মিসেস উডস্ স্বামীজীকে তাহাদের নিকট ভাষণ দিতে বলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর রবিবার স্বামীজী ঈস্টচার্চে বক্তৃতা দেন। এখানকার ধর্মযাজকগণ সহানুভূতিশীল ছিলেন। এই সকল সভায় বহু প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হইতে হইলেও স্বামীজী তাঁহার স্থৈর্য অণুমাত্রও হারান নাই, যদিও দুই-একজন ধর্মযাজক অসহিষ্ণুতার-ভাব প্রদর্শন করেন।

স্বামীজী সালেম ত্যাগ করিবার সময় এই গৃহে তাঁহার যষ্টি, ট্রাঙ্ক ও একটি কম্বল রাখিয়া যান। দ্বিতীয় বার যখন সালেমে বিদায় লইতে আসিয়া প্রায় এক সপ্তাহ থাকেন, তখন তিনি এই যষ্টিটি প্রিন্স উডস্‌কে এবং তাঁহার ট্রাঙ্ক ও কম্বল মিসেস উডস্‌কে দান করেন। তিনি বলেন, এই মহাদেশে যাঁহারা তাঁহাকে সাদরে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ও প্রিয় বস্তু তাঁহাদিগকে দেওয়া উচিত। উডস্-পরিবার ১৯৫০ খৃঃ পর্যন্ত সযত্নে এই দ্রব্যগুলি রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, এমনকি বহু টাকায় বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইয়াও বিক্রয় করেন নাই। ১৯৫০ খৃঃ প্রিন্স উডসের পত্নী এই দ্রব্যসকল বিক্রয় করিবার জন্য বিজ্ঞাপন দেন। এই বিজ্ঞাপন হইতেই সকল তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

মিসেস ট্যানাট উডস্‌কে লিখিত স্বামীজীর দুইখানি পত্র পাওয়া যায়। ১০ই অক্টোবর এবং ১৯শে নভেম্বর ১৮৯৩ খৃঃ দুইখানি পত্রই চিকাগো হইতে লিখিত এবং ধর্মমহাসভার পরবর্তী কালে লেখা।

রেভারেণ্ড সি. সি. এভারেট

১৮৯৬ খৃঃ প্রথম ভাগে মিঃ ফক্স হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের স্নাতকদিগের নিকটে স্বামীজীকে তাঁহার ভাবধারা এবং দর্শন পরিবেশন করিতে আমন্ত্রণ করেন। স্বামীজী এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ২৫শে মার্চ উক্ত স্নাতক ও অধ্যাপক-মণ্ডলীর সম্মুখে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার পরে নানা প্রশ্নোত্তর এবং সমালোচনা চলিতে থাকে। এই বক্তৃতা এতই উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল যে, স্বামীজীকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের আচার্যের (chair) পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি বলেন, 'আমি সন্ন্যাসী, সেই জন্য এই পদ গ্রহণ করিতে পারি না।' পরে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ও স্বামীজীকে অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন।

হার্ভার্ডে এই বিরাট সমালোচকমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা করা এক পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা অতি উৎকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার বেদান্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রেভারেণ্ড সি. সি. এভারেট স্বামীজীর উক্ত-ভাষণ, নানা প্রশ্নোত্তর এবং ঐ প্রতিষ্ঠানে যে-সকল সমালোচনা হয়, সেগুলি একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশকালে মুখবন্ধে লিখিয়াছেন : বিবেকানন্দ তাঁহার কার্যে ব্যক্তিগত জীবনের উপর বিশেষ পরিমাণে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করিয়াছেন। হিন্দু চিন্তাধারা অপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয় বিষয় খুব কম আছে। বেশীর ভাগ লোকের নিকট বেদান্ত-মতবাদ অচিন্তনীয় ও অলীক মনে হইলেও সুখের বিষয় এই মতবাদ এমন একজন জীবিত লোক দ্বারা পরিবেশিত হইয়াছে, যিনি নিজে একজন অতিশয় প্রতিভাবান্ ও দৃঢ়বিশ্বাসী। এই মতবাদ শুধুমাত্র কৌতূহল বা কাল্পনিক খেয়ালরূপে বিবেচনা করিলে চলিবে না। হেগেল বলিয়াছেন, সকল দর্শনেরই প্রারম্ভে স্পিনোজার মতবাদ। বেদান্ত-মতবাদের বিষয়ে ইহা আরও জোরের সহিত বলা চলে। আমরা পাশ্চাত্যবাসীরা 'বহু' লইয়া নিজদিগকে ব্যস্ত রাখি। যে 'একে'র মধ্যেই 'বহু'র অস্তিত্ব, সে-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকিলে আমাদের 'বহু'-সম্বন্ধেও কিছু বোধ হইতে পারে না। প্রাচ্য আমাদিগকে এই শিক্ষা ভালরূপই দিতে পারে যে, 'একে'র অস্তিত্বই খাঁটি সত্য। এবং আমাদিগকে কার্যকরী-রূপে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা বিবেকানন্দের নিকট কৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ।

হার্ভার্ডে দর্শনের ভাবী স্নাতকদের ক্লাসে তাঁহার প্রশ্নোত্তরসকল মর্মস্পর্শী, বুদ্ধিদীপ্ত, এবং নবীনত্ব- ও সজীবতাপূর্ণ ছিল।

মঁসিয়ে জুল বোয়া

জুল বোয়া ফরাসী দেশের একজন বিখ্যাত দার্শনিক, সাংবাদিক ও লেখক ছিলেন। তিনি তুলনামূলক ধর্মমতেরও ছাত্রহিসাবে গণ্য ছিলেন। ১৯০০ খৃঃ ১লা অগস্ট হইতে অভাবনীয় ভাবে ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে ভারত প্রত্যাগমনের পূর্ব পর্যন্ত স্বামীজী পারীতে বাস করেন। এখানে প্রথম কয়েকদিন তিনি লেগেট-দম্পতির অতিথি হইয়া ছিলেন। ধর্মেতিহাস-সভার পরে মিসেস ওলিবুলের ব্রিটানিস্থিত আবাসে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া বাকী সময় তিনি জুল বোয়ার গৃহে বাস করিতে থাকেন।

১লা সেপ্টেম্বর স্বামী তুরীয়ানন্দকে পারী হইতে পত্রে লিখেন, 'ফরাসী ভাষাটা কতক আয়ত্ত হয়েছে, কিন্তু দু-একমাস তাঁদের সঙ্গে বসবাস করলে বেশ কথাবার্তা কইতে অধিকার জন্মাবে।......কাল যাঁর (বোয়া) কাছে থাকব,

তাঁর বাড়ি দেখে এসেছি। তিনি গরিব মানুষ—পণ্ডিত। তাঁর ঘরে একঘর বই। তিনি ইংরেজী বলতে পারেন না, সেইজন্যেই আরও যাচ্ছি। কাজে কাজেই ফরাসী কইতে হবে আমায়।' সেপ্টেম্বর ১৯০০ খৃঃ আর এক পত্রে লিখেন, 'আমি শীঘ্রই এখান থেকে অন্যত্র যাব। বোধহয় কনস্তান্তিনোপল প্রভৃতি দেশ দেখে বেড়াব কিছুদিন।' অক্টোবর ১৯০০ খৃঃ এলবার্টা স্টার্জিসকে ফরাসী ভাষায় লিখিত পত্রে জানান, 'এখানে আমি খুব সুখী ও পরিতৃপ্ত আছি। মঁ বোয়ার সঙ্গে আমার এখানকার জীবনযাত্রা বেশ তৃপ্ত—রাশি রাশি বই, চারিদিকে শান্তি—আমাকে পীড়িত ক'রে এমন জিনিস এখানে নেই।' ১৪ই অক্টোবর সিস্টার ক্রিস্টিনকে লিখেন, 'আমি মঁ জুল বোয়ার অতিথি। লেখা থেকে জীবিকা অর্জন করতে হয় তাঁকে, তাই তিনি ধনী নন, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক উচ্চ উচ্চ চিন্তার ঐক্য আছে এবং আমরা পরস্পরের সাহচর্যে বেশ আনন্দে আছি।...

কয়েক বছর আগে তিনি আমাকে আবিষ্কার করেন, এবং আমার কয়েকটি পুস্তিকা ইতিমধ্যেই ফরাসীতে অনুবাদ ক'রে ফেলেছেন। এমন ভাবেই মাদাম কালভে, মিস ম্যাকলাউড ও মঁ জুল বোয়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। খ্যাতনামা গায়িকা মাদাম কালভের অতিথি হবো। কনস্তান্তিনোপল, নিকট প্রাচ্য, গ্রীস ও মিশরে যাব আমরা। ফেরার পথে ভিনিস দেখে আসব।' ২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যায় এই যাত্রা আরম্ভ হয়। মঁ বোয়া স্বামীজীকে মহাচিন্তাশীল ও দেব-মানব মনে করিতেন।

মঁ বোয়ার গৃহে থাকার ফলে ফরাসী ভাষায় স্বামীজীর এত দখল হয় যে, সংস্কৃতের জটিল দার্শনিক তত্ত্ব ফরাসী ভাষায় শ্রোতাদের বোধগম্য করিয়া বলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

মঁ বোয়া স্বামীজীর সহিত ২৪শে অক্টোবর ইওরোপ-ভ্রমণে বাহির হন। ১৪ই জুন ১৯০১ খৃঃ বেলুড় মঠ হইতে জোসেফিন ম্যাকলাউডকে লিখিত পত্র হইতে জানা যায়, জুল বোয়া মঠে আসিয়া স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং ভারতে লাহোর পর্যন্ত যাইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্বামীজী উক্ত পত্রে লিখেন, 'নেপাল-প্রবেশে বাধা পেয়ে জুল বোয়া লাহোর পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কাগজে দেখলাম, তিনি গরম সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন; তারপর জাহাজে নিরাপদ সমুদ্রযাত্রা।'

শ্রীভাটে

পরিব্রাজক অবস্থায় ভারত-ভ্রমণকালে ১৮৯২ খৃঃ স্বামীজী কোলাপুর হইয়া বেলগাঁও যান। হরিপদ মিত্রের দিনপঞ্জি হইতে জানা যায়, ইহা ১৮৯২ খৃঃ অক্টোবর মাসের মধ্যভাগের ঘটনা। স্বামীজী ভোর ৬ ঘটিকায় বেলগাঁও পৌছান। কোলাপুরের শ্রীগোলওয়লকার তাঁহার বিশেষ বন্ধু বেলগাঁও-এর উকীল শ্রীভাটে নামক একজন মারাঠী ভদ্রলোকের নিকট এক পরিচয়-পত্র দেন। স্বামীজী প্রথমে শ্রীভাটের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন।

শ্রীভাটের পুত্র শ্রী জি. এস. ভাটে স্মৃতি-কথায় লিখিয়াছেন:

স্বামীজীর চেহারা চিত্তাকর্ষক ছিল এবং প্রথম দর্শনেই মনে হইত, তিনি সাধারণ মানুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। কিন্তু আমার পিতা, পরিবারের অন্য কেহ অথবা আমাদের ছোট শহরের অন্য লোক—কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে, আমাদের অতিথি ঐরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন।

স্বামীজী কয়েকদিন এখানে ছিলেন। প্রথম দিন হইতেই ছোট ছোট ঘটনা দ্বারা আমরা

তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিবর্তন করিতে বাধ্য হই। যদিও তিনি গেরুয়া পোশাকই ব্যবহার করিতেন, তথাপি তিনি আমাদের পরিচিত সন্ন্যাসীদের মতো পোশাক পরিতেন না। সন্ন্যাসী ইংরেজীতে কথা বলিবে, খালি গায়ে না থাকিয়া জামা গায়ে দিবে এবং এমন বহুমুখী প্রতিভা ও বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা দেখাইবে, যাহা একজন অতি বিদ্বান্ সংসারী লোকের পক্ষেও গৌরবের, আমরা এরূপ দেখায় অভ্যস্ত ছিলাম না।

প্রথম দিন আহারের পরে স্বামীজী পান-সুপারি চাহিলেন। তার পর সেই দিনই হউক বা পরের দিন তিনি তামাক চান। সন্ন্যাসী, যিনি দৈহিক সমস্ত সুখভোগের বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার এই সব চাওয়া যে আমাদের কি ভয়ানক মনে হইল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি বলেন, তিনি সন্ন্যাসী হইলেও তাঁহার ব্রাহ্মণ-শরীর নয়; সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি গৃহীদের ন্যায় সকল দ্রব্য চাহিতেছেন, ইহা আমাদের প্রচলিত ধারণায় খুবই নিন্দনীয় হইলেও তিনি বুঝাইয়া দিলে আমরা এই অবস্থা মানিয়া লই এবং সন্ন্যাসী পান বা তামাক চাওয়ায় কোন দোষ নাই, বুঝিতে পারি। তিনি এই বিষয়ে যে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দেন, তাহাতেই আমরা নিরস্ত হই। যদিও ইহাতে আমাদের ধারণা সব ওলটপালট হইয়া যায়, তবু তিনি আমাদের মত বদলাইতে সক্ষম হন। তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় তিনি তাঁহার জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেন, কিন্তু ধর্ম-জীবনে এইরূপ অভ্যাসের কোন বিশেষ গুরুত্ব নাই বলিয়া ত্যাগ করেন নাই।

আমিষ বা নিরামিষ খাদ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী বলেন, তিনি পরমহংস-পর্যায়ের সন্ন্যাসী, সাধারণ সন্ন্যাসী নন, সে-কারণেই খাদ্য-সম্বন্ধে তাঁহার কোন পছন্দ অপছন্দ নাই। পরমহংসেরা যাহা পান, তাহাই আহার করিতে নিয়মানুসারে বাধ্য এবং ভিক্ষায় কিছু না জুটিলে উপবাস করিবেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের নিকটেই পরমহংসেরা ভিক্ষা করেন। তিনি বহুবার মুসলমানের দেওয়া খাদ্যও খাইয়াছেন।

অল্পকাল মধ্যেই পিতা স্বামীজীর অসামান্য প্রতিভা লক্ষ্য করেন এবং তারপর প্রত্যহ শহরের সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি আসিয়া জড় হইতে থাকেন।

বেলগাঁওয়ে সেই সময় একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র স্থানীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি খুব গোঁড়া হিন্দুর মতো আচরণ করিতেন, অন্তরে কিন্তু সন্দেহবাদী এবং তখনকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে—ধর্ম কেবল বহুকাল প্রচলিত কতকগুলি আচার ও অনুষ্ঠানে বিশ্বাস মাত্র। স্বামীজীর অসামান্য অভিজ্ঞতা, দর্শনে ও বিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকায় ঐ ইঞ্জিনিয়রকে তিনি তর্কে একেবারে পরাস্ত করেন। ইঞ্জিনিয়র তর্ককালে একাধিকবার চটিয়া উঠেন এবং অভদ্রতা দেখান, যদিও সরাসরিভাবে স্বামীজীর প্রতি অসভ্য ব্যবহার করেন নাই। আমার পিতা ইহাতে আপত্তি করায় স্বামীজী হাসিয়া বলেন, তিনি কিছু মনে করেন নাই। যখন অশ্বশাবককে বশীভূত করিতে হয়, তখন তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাই একমাত্র লক্ষ্য এবং একবার পৃষ্ঠে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইলে আসন রক্ষা করিবার চেষ্টাতেই সকল উদ্যম সীমাবদ্ধ থাকে। অশ্বশাবক আরোহীকে ভূপাতিত করিতে অশেষ চেষ্টা করে ও অযথা শক্তি অপচয় করিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়। যখন অশ্ব শেষ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হয়, তখনই আরম্ভ হয় শিক্ষকের প্রকৃত কাজ। সে

অশ্বকে বুঝাইয়া দেয় যে, সেই প্রভু এবং তখনই শুধু শিক্ষা আরম্ভ হয়। স্বামীজী বলেন, তর্কে ও আলোচনায় এই পদ্ধতি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

মনে হয়, তর্কে বা বিতণ্ডায় জয়লাভ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, দেশে এবং পৃথিবীময় প্রমাণ করিবার সময় উপস্থিত, হিন্দুধর্ম মৃত নয়। তিনি বলিতেন, বেদান্তের অমূল্য সত্য পৃথিবীতে প্রচার করিবার সময় আসিয়াছে।

স্বামীজী বলিতেন, দুর্বল লোকের পক্ষে বেদান্ত দুষ্পাচ্য। তাঁহার মতে অহিংসনীতি অবলম্বন করিলেও বাধা দানের সামর্থ্য ও ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। তিনি আরও বলিতেন, যদি একজন বেশী শক্তিধর লোক ইচ্ছা করিয়া একজন গোঁয়ার বা দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তাহার শক্তি ব্যবহার না করে, তবে সে উচিত-মত তাহার কাজের উচ্চতর উদ্দেশ্য দাবি করিতে পারে। অপর পক্ষে উপযুক্ত শক্তি যদি না থাকে বা বাস্তবিক বিপক্ষ যদি বেশী শক্তিশালী হয়, তখন শক্তি ব্যবহার না করা স্বাভাবিক কাপুরুষতা সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, ইহাই অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের সারমর্ম।

অমৃত-পিপাসা

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

পিপাসা আমার আছে—অমৃতের জন্যে সে-পিপাসা:
সত্য আর সুন্দরের যে শুভ্রতা, তাই নিতে প্রাণ
তৃষ্ণাতুর হয়ে আছে,—মধুবাতা ঋতায়তে গান
প্রস্তরিত অন্ধকারে টেনে আনে আলোর বিপাশা।
'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ব'লে যাঁরা ডেকে ভেঙেছে নিরাশা
বারংবার এ-আত্মার, অতীতের সে-অমর তান
পুষ্পের স্তবক হয়ে, শান্তির আবহে এনে প্রাণ
একান্তে জানিয়ে যায় অম্লান আত্মিক ভালোবাসা।

হে দেবতা, একবার দাও সেই উত্তরাধিকার,
দাও সেই আন্তরিক ক্ষয়হীন উপলব্ধ সুখ:
পিপাসার শক্তি নিয়ে ডেকে আনি আলোর উৎসার,
'আবিরাবির্ম এধি' মন্ত্রে সুকঠিন তমসা ঘুচুক!
সে—'পূর্ণাৎ পূর্ণতর' সেই জানি আলোর নির্ঝর
জীবনের সাথে তাঁর মিলনের আসুক প্রহর।

মা

আড়ানা—ত্রিতাল

কথা ও সুর—স্বামী চণ্ডিকানন্দ

স্বরলিপি—শ্রীভবতোষ দত্ত

কে তুমি মা বলনা আমায়, বল মা।
ভগবান পূজে কেন তব রাঙ্গা পায় ?
এ কী অপরূপ লীলা আজি এ ধরায় ॥
হরহৃদে রাখে পদ কালী করালিনী,
মহাদেব-শিরে থাকে হয়ে সুরধুনী।
সেই তুমি আজি কি মা সারদারূপিণী
শ্রীরামকৃষ্ণ তাই পূজিলা তোমায় ॥

"স্থায়ী"

[প](নি)	প	[ম]গ	ম	—	পপ	নি	নি	সা	—	—	সা	পনি	পনি	প	—
কে	তু	মি	মা	ঽ	বল	না	আ	মা	ঽ	ঽ	য়	বঽ	লঽ	মা	ঽ
০				৩				×				২			

ম	ম	প	প	পনি	পনি	ম	প	গ	গ	—	ম	রে	—	সা	সা
ভ	গ	বা	ন	পূঽ	জেঽ	কে	ন	ত	ব	ঽ	রা	ঙ্গা	ঽ	পা	য়
০				৩				×				২			

সা	রে	রে	রে	গ	গ	রে	সা	নি	সা	রে	সা	নি	—	ম	প
এ	কি	অ	প	রূ	প	লী	লা	আ	জি	এ	ধ	রা	ঽ	ঽ	য়
০				৩				×				২			

প	রে	রে	রে	গ	গ	রে	সা	নি	সা	রে	সা	পনি	পনি	পম	গম
এ	কি	অ	প	রূ	প	লী	লা	আ	জি	এ	ধ	রাঽ	ঽঽ	ঽঽ	ঽয়
০				৩				×				২			

"অন্তরা"

প	প							নি•		°	নি•		•	•	•
ম	ম	প	প	ধ্‌	ধ্‌	নি	নি	সা	—	সা	সা	—	সা	সা	সা
হ	র	হৃ	দে	রা	খে	প	দ	কা	S	লী	ক	S	রা	লি	নী
০				৩				×				২			

						গ্‌									
প	রে	রে	রে	রে	রে	সা	সা	নি	সা	রে	সা	প	নি্‌	প	—
ম	হা	দে	ব	শি	রে	থা	কে	হ	য়ে	সু	র	ধু	S	নী	S
০				৩				×				২			

			ম					ম			গ্‌				
প	রে	রে	গ্‌	গ্‌	গ্‌	গ্‌	গ্‌	গ্‌	গ্‌	গ্‌	ম	রে	—	সা	—
সে	ই	তু	মি	আ	জি	কি	মা	সা	র	দা	রূ	পি	S	নী	S
০				৩				×				২			

														নি্‌	
প	নি	প	নি	সা	সা	সা	সা	নি	সা	রে	সা	নি্‌	—	ম	প
শ্রী	রা	ম	কৃ	S	ষ্ণ	তা	ই	পূ	জি	লা	তো	মা	S	S	য়
০				৩				×				২			

সি	সা	নি	সা	সা	সা	সা	সা	নি	সা	রে	সা	পনি্‌	পনি	পম	গম
শ্রী	রা	ম	কৃ	S	ষ্ণ	তা	ই	পূ	জি	লা	তো	মাS	SS	SS	Sয়
০				৩				×				২			

শতাব্দীর সনেট

শ্রীহরিপ্রসাদ মেদ্দা

আকাশ ছেয়েছে মেঘে, অনিবার্য ঝঞ্ঝা হবে জানি,
প্লাবনে ভাসিছে ধরা, চমকিছে বিদ্যুতের কশা।
দুর্ভিক্ষ, মড়ক আর ভূকম্পের হয় রাহাজানি—
দোল খায় ক্রোধোন্মত্ত বাসুকির ফণা সর্বনাশা।
অবিচার-ব্যভিচার-অত্যাচারে গাঢ় হ'ল ঘৃণা,
লোভ, ক্ষোভ, ঈর্ষাদম্ভে স্বার্থ হ'ল কলহ-কুটিল,
সঞ্চয়ের প্রয়োজনে বেড়ে গেল জীবনের দেনা—
কলুষ কামনা ভোগে—কালি হ'ল অনন্তের নীল।

তবুও তো সূর্য ওঠে—গন্ধবহ মন্দ মন্দ বয়,
তবুও তো পুষ্পে পুষ্পে—শষ্পবীথি গীতিমধুভরা
তবুও তো কুঞ্জে কুঞ্জে—সুরভিত ধরেছে মুকুল
তবুও তো নারী-কর্ণে দুলিতেছে সুবর্ণের দুল,
তবুও তো বেঁচে আছে—রূপ, রস, গন্ধ মন-হরা
তবুও তো বেঁচে আছে—জীবনের নিগূঢ়-প্রত্যয়।

করুণা-কোমল ন্যায়বিধান

[মহাকবি-শেক্‌সপীয়র-বিরচিত 'মার্চেন্ট অব ভেনিস্' অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী কর্তৃক বিরচিত **'ভিনিস-বণিজম্'** নাটকের বিচারালয় দৃশ্যের কিয়দংশ।*]

পোর্শিয়া। শাইলক্! মহ্যং প্রতিজ্ঞাপত্রং দেহি। (নিপুণং বীক্ষ্য) (এন্টোনিও মহোদয়মুদ্দিশ্য) স্বাক্ষরঃ পত্রেঽস্মিন্ ভবত এব, নাত্র কশ্চন সন্দেহঃ ?

এন্টোনিও। নহি, নাস্তে তত্র সন্দেহঃ।

পোর্শিয়া। ততো দয়াপ্রদর্শনায় যহূদীমহাশয়ঃ বদ্ধপরিকরো বর্তেত।

শাইলক্। কিন্তু কা নাম সা বাধ্যবাধকতা, যদর্থমহং দয়াপ্রদর্শনায় সমুদ্‌যুক্তো ভবেয়ম্ ?

পোর্শিয়া। কিন্তু দয়াগুণো ন বাধকতাবাধিতঃ। কারুণ্যং প্রসরতি, যথা মৃদুলা বারিধারা আকাশাদ্ ভূতলবৃষ্টা। তচ্চোভয়তো মঙ্গলপ্রসারি। মাঙ্গল্যং বহতি তদ্ দাত্রে তথা চ গ্রহীত্রে সমানমেব। মহত্তমেষু মহত্তম-নামকমেতৎ। এতদ্ রাজ্ঞে শোভতে মহত্তরং, স্বীয়শিরঃমুকুটাদপি সমভ্যধিকম্। রাজ্ঞো রাজদণ্ডস্তস্য পার্থিবশক্তেঃ প্রতীকম্, রাজশক্তেঃ সম্ভ্রম-মর্যাদাদি-রক্ষণার্থং অস্য প্রয়োজনঞ্চ সুমহৎ। প্রজানাং রাজোদ্দিষ্ট-ভয়-সম্ভ্রমাদিকং সর্বং রাজদণ্ডহেতুকমেব।

কিন্তু কারুণ্যং নাম রাজদণ্ডজনিত-প্রভুত্বাতিশায়িনো রাজ্ঞো হৃদয়সিংহাসনাধিরোহণাদ্ বরণীয়তরম্। পুনঃ, কারুণ্যং নাম ভগবতোঽপি গুণবিশেষঃ। রাজ্ঞো ন্যায়বিচারেণ সহ দয়া-সংমিশ্রণাৎ পার্থিবরাজশক্তিঃ জগৎপতেঃ শক্তিং সর্বথাঽনুকরোতি। অতএব যহূদীপ্রবর! যদ্যপি ন্যায়বিচারায় এব ভবতঃ প্রার্থনা, তথাপি স্মর্যতাং কিল কেবলন্যায়বিচারপ্রার্থনক্রমেণ বয়ং সর্ব এব ভগবৎসকাশে চিরায় মুক্তিবিষয়ে নৈরাশ্যভাজো ভবিষ্যামঃ। ততঃ সর্বে বয়ং জগৎপতি-সকাশে দয়াপ্রার্থিনো ধ্রুবম্। অস্মাকং সর্বেষাম্ ঈদৃশী দয়াপ্রার্থনা জাগতিকাপদ্-বিষয়েষ্বপি দয়াপ্রদর্শনায় অস্মান্ উদ্‌বুদ্ধান্ করোতু নাম। ভবতাং কঠোরন্যায়বিচারপ্রার্থনাং কোমলীকর্তুম্ অহম্ ইত্থং ভাষে।

যদি ভবান্ কেবলন্যায়বিচারপ্রার্থী ভবেৎ, ভিনিসনগরস্থকঠোর-ন্যায়ালয়ঃ অস্মৈ বণিজে বিরুদ্ধং মতং দদ্যাদেবেতি ধ্রুবম্।

শাইলক্। অস্মৎকার্য-ফলাফলং ময়া শিরসৈব সংধারণীয়ম্। ন্যায়সম্মত-সংবিধানং ময়াঽনুসর্তব্যম্। প্রতিজ্ঞাপত্রলিখিতং মৎপ্রাপ্তব্যং সর্বমবশ্যমেব লপ্স্যে॥ * * *

* শেক্‌সপীয়রের চতুঃশত জন্মবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রাচ্যবাণী কর্তৃক এই নাটক বিশ্বরূপা-রঙ্গমঞ্চে ও মহাজাতি-সদনে অভিনীত হয়। 'দয়া' সম্বন্ধে শেক্‌সপীয়রের অভিমতসহ সংস্কৃত অনুবাদের একটু নিদর্শনএখানে উদ্ধৃত হইল।—উঃ সঃ

মানুষের সুখশান্তি বস্তুগত নহে

স্বামী সুন্দরানন্দ

মনের সুখশান্তি মানুষ-মাত্রেরই একান্ত কাম্য। সকল নরনারীর জীবনের সকল কার্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মুখ্যতঃ এই একই উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত। আধুনিক পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদ্ ও বিজ্ঞানবেত্তাগণের অধিকাংশের মতে ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়লাভই মানুষের পক্ষে সুখশান্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উপায়। পাশ্চাত্য হইতে সত্তআগত 'নবজীবন আন্দোলন' (New Life Movement) ভোগাতিরিক্ত সকল বিষয়কেই সাধারণ মানুষের পক্ষে অনাবশ্যক বলিয়া প্রচার করেন। সকল দেশেরই জনসাধারণের বদ্ধমূল ধারণা যে, মানুষ-মাত্রেরই সুখশান্তি তাহার নিজস্ব ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুগত। তাঁহারা মনে করেন যে, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়ভোগের উপকরণ যত পর্যাপ্ত, তাঁহাদের সুখশান্তি তত অধিক।

এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, সুখ-শান্তি এবং ইহাদের বিপরীত দুঃখ-অশান্তি মানসিক সচেতন অনুভূতি বা মনের একপ্রকার অনুভব। এই জন্য ইহাদের কোনটিই অচেতন জড়বস্তুগত হইতে পারে না। সামান্য বিচার করিলেই জানা যায় যে, কবিত্ব, সঙ্গীত, চিত্র, দৃশ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য প্রভৃতির সৌন্দর্যের ভাবমূলক নির্বস্তুক অনুভূতিতে এবং সত্য, ধর্ম, ন্যায়, নীতি, অহিংসা, দয়া, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতির বস্তুতত্ত্বহীন মহত্ত্ব দর্শন শ্রবণ স্মরণ মনন কল্পনা ও অনুধ্যানে মনে যে সুখের উদ্ভব হয়, উহাকে স্থূল-বস্তুগত বলা যায় না। এই সকল বিষয়ের সুখকর অনুভূতিকে সুখের একপ্রকার রসানুভব বলাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সাংস্কৃতিক রুচিজ্ঞানের (aesthetic sense) অনুপাতে এক এক মানুষে এই সকল বিষয় এক এক প্রকার সুখের অনুভূতি বা রস সৃষ্টি করে। কাজেই ইহা বস্তুগত হইতে পারে না। অচেতন জড়পদার্থের সুখশান্তিরূপ সচেতন অনুভূতির অবস্থানও যুক্তিপ্রমাণবিরুদ্ধ।

দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন জড়বস্তুই বালক যুবক বৃদ্ধ, স্বাস্থ্যবান্ রোগী, প্রবৃত্তিপন্থী ও নিবৃত্তিকামী—সকল নরনারীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সুখ- বা দুঃখ-জনক হয় না। ইহা দেশ কাল পাত্র ঋতু ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন, আরও দেখা যায় যে, একজনের নিকট যে বস্তু অত্যন্ত উপাদেয় সুখপ্রদ ভোগ্য, অপরের নিকট তাহাই অতিশয় অনুপাদেয় দুঃখজনক অভোগ্য। অতি দুর্লভ ভোগ্যবস্তু পাইলে ভোগী যেরূপ আনন্দিত হন, যথার্থ ত্যাগী সেরূপ আনন্দ বোধ করেন না। অন্ধকার পল্লীতে পুলিস দেখিলে গৃহস্থ অধিবাসী-মাত্রই নিরাপদ বোধ করেন, কিন্তু চোর আতঙ্কিত হয়। ব্যাঘ্রী-দর্শনে তাহার শাবকবৃন্দ আনন্দিত হয়, কিন্তু মানুষ ভয় পায়। সুতরাং একই বিষয় দুই জীবের মনে সমভাবে সমকালে সুখ দুঃখ—দুই ভাবই সৃষ্টি করে। আরও দেখা যায় যে, অতি উপাদেয় ভোগ্যবস্তু লাভ এবং অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তির দর্শনে প্রথমে মনে যে আনন্দ হয়, ক্রমে উহা হ্রাস পাইতে পাইতে কিছুকাল পরে আর একেবারেই অনুভূত হয় না। আনন্দ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইলে বস্তুর বিদ্যমানতা সত্ত্বেও আনন্দের অবসান সম্ভব হইত না। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়মাত্রই সুখ-শান্তি বা আনন্দগুণযুক্ত হইলে সুখ শান্তি আনন্দকে অচেতন জড়বস্তুর গুণ বা ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। দুর্লভ ভোগ্যবস্তু উপভোগে এবং অত্যন্ত প্রিয়জনের দর্শনে ও স্মরণে মনে যে আনন্দের অনুভব হয়,

তাহা বস্তুর ধর্ম বা গুণ নহে। কারণ, মনেই উহার উপলব্ধি হয়। ভোগ্যবস্তু ও প্রিয়জন এক জিনিস এবং মন আর এক জিনিস, উভয়েই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পরিবর্তনশীল ও অনিত্য; এরূপ অবস্থায় বস্তুর ধর্ম কিরূপে মনে উপলব্ধি হইবে? এক বস্তুর ধর্ম বা গুণ অপর বস্তুতে সর্বাংশে দেখাও যায় না

সকলেই দেখিতে পান যে, জলপানে পিপাসার নিবৃত্তি হইলে পুনরায় পানে প্রবৃত্তি হয় না। মধুর রস রসনার উপর উপস্থিত হইয়া প্রথমে যে আনন্দ সৃষ্টি করে, সে আনন্দ পরে থাকে না এবং শেষে বিরক্তি বোধ হয়। সুতরাং ভোগ্যবস্তুর সুখও সীমাবদ্ধ এবং অস্থায়ী, আর উহা বস্তুতে নিহিত নহে; কারণ সুখের অনুভূতি হয় মনে। আরও দেখা যায়, বস্তুর ভোগক্ষণে যে আনন্দবোধ হয়, ভোগ শেষ হইলেই উহার অবসান হইয়া যায়। অবশ্য ভোগ্যবস্তু বা প্রিয়জনের সান্নিধ্য ব্যতীত মনে সুখের অনুভব হয় না। কিন্তু এই সান্নিধ্য ও দর্শনাদি ইন্দ্রিয়—বিশেষ করিয়া মনের গ্রাহ্য বা উপলব্ধ হওয়া অপরিহার্য। কারণ ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচরে অবস্থিত অত্যন্ত নিকটস্থ ভোগ্যবস্তুও মনে সুখ উৎপাদন করিতে পারে না। এই কারণে মনে সুখ উৎপাদনের জন্য ভোগ্যবস্তুর সান্নিধ্য ইন্দ্রিয়ের—বিশেষ করিয়া মনের গোচরে থাকা একান্ত আবশ্যক। এইরূপ সান্নিধ্য কল্পনা দ্বারাও মন সৃষ্টি করিতে পারে। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ মানসিক। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কোন ভোগ্যবস্তুও মনের সাহায্য ভিন্ন সুখ সৃষ্টি করিতে পারে না। সামান্য পর্যালোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, অর্থ ভোগ-সুখের কারণ হইলেও উহা জড়বস্তু বিধায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখ-শান্তি সৃষ্টি করিতে অসমর্থ। কেননা, মন যখন বিচার করিয়া বুদ্ধি-সহায়ে নিশ্চয় করে যে, অর্থ দ্বারা ভোগ্যবস্তু সংগৃহীত হইতে পারে, তখনই অর্থকে সুখ-শান্তি লাভের কারণ বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এ-স্থলে অর্থরূপ ভোগ্যবস্তুকে সুখের কারণ মনে করায়ও ভোগ্যবস্তু অপেক্ষা মনেরই প্রাধান্য প্রমাণিত। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও দেখা যায়, মনের সাহায্য ব্যতীত অর্থরূপ ভোগ্যবস্তুও সাক্ষাৎভাবে সুখ সৃষ্টি করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ভোগ্য-বিষয়ক সুখের পরিকল্পনাও প্রথমে মনেই উদয় হয়; কোনটি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় এবং কোনটি কল্পনাতেই পর্যবসিত থাকে। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয়—কেবল ভোগ্য বিষয়ে মানুষের সুখ নিহিত নহে।

পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী ষোল আনা মন দিয়া যেরূপ ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করিতে সমর্থ, মানুষ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। কারণ উহাদের সমগ্র মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়েই সর্বদা নিয়োজিত। ইন্দ্রিয়-সুখ ভিন্ন অন্যপ্রকার সুখভোগ করিতে উহারা অসমর্থ। অত্যন্ত নিম্নস্তরের অতিশয় তমোভাবাপন্ন মানুষও প্রায় এইরূপ পশুতুল্য। ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ললিতকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের অনুভূতিজনিত সুখ হইতে এই শ্রেণীর মানুষ প্রায় ইতর প্রাণীর মতোই বঞ্চিত।

সুখ-শান্তি অর্জনে মানুষের মনের একচ্ছত্র প্রাধান্য সত্ত্বেও এতদুভয়কে মনের ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ মন জড়পদার্থ, এবং বিষয় উপলব্ধির যন্ত্রমাত্র। মনে সুখ-শান্তির বিপরীত দুঃখ-অশান্তিও সমভাবে অনুভূত হয়। ইন্দ্রিয় সহায়ে কার্যতঃ বা কল্পনায় ভোগ্য বিষয়ের সন্নিকর্ষ না হইলে মনে সুখ বা দুঃখের সঞ্চার হয় না। এই সকল কারণে সুখ-দুঃখ মনে অনুভূত ও একমাত্র মনের ক্রিয়া হইলেও মনের ধর্ম হইতে পারে না।

অনেকে সুখ-শান্তিকে উহাদের বিপরীত দুঃখ-অশান্তির অভাব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু দুঃখাভাব সুখ এবং সুখাভাব দুঃখ হইতে পারে না। বহু বস্তুতে সুখ বা দুঃখের অভাব দেখা গেলেও উহা অনুভূত হয় না, কিন্তু অতি সামান্য সুখ বা দুঃখও মনে অনুভূত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কোন বস্তুতে এক ধর্মের অভাব থাকিলেও উহাতে উহার বিপরীত ধর্মের বিদ্যমানতা সিদ্ধ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, কোন বস্তুতে মধুর রস না থাকিলেও উহাতে উহার বিপরীত গুণযুক্ত তিক্তরস না থাকিয়া অন্যপ্রকার রসও থাকিতে পারে। ন্যায়শাস্ত্র-মতে ভাববস্তু অভাববস্তুর এবং অভাববস্তু ভাববস্তুর কারণ হইতে পারে না।

এইরূপ বহু অখণ্ডনীয় যুক্তিবলে বেদান্ত উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করেন, নিত্যত্বজ্ঞান ও সুখ-শান্তি ভোগ্যবস্তু বা মনের ধর্ম বা গুণ নহে, ইহারা আত্মারও ধর্ম বা গুণ নহে, পরন্তু আত্মার স্বরূপ। এইজন্য বেদান্তে আত্মা সৎ (নিত্য), চিৎ (জ্ঞান) ও আনন্দ (সুখ) অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ নামে প্রসিদ্ধ। এই মহান্ দর্শন অনুসারে মানুষের সর্ববিধ জ্ঞান ও আনন্দ এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মার জ্ঞান ও আনন্দের অস্ফুট স্ফুরণমাত্র। মানসিক অনুভূতিরূপ বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়সমূহের সান্নিধ্য-বশতঃ স্বচ্ছসলিলে চন্দ্রমার প্রতিফলনের ন্যায় অন্তঃকরণে আত্মার জ্ঞান ও আনন্দ প্রতিফলিত হয়। আত্মার স্বরূপভূত জ্ঞান ও আনন্দই বিষয়ের সন্নিকর্ষে মানুষের চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুতে জ্ঞান ও আনন্দ থাকিতে পারে না। এই জন্য সর্ববিধ জ্ঞান ও আনন্দ আত্মার জ্ঞান ও আনন্দের প্রতিবিম্ব মাত্র। বৈদান্তিকগণ বলেন, উষ্ণতা যেরূপ অগ্নির স্বরূপ, অগ্নি হইতে পৃথক্ নয়, চৈতন্য জ্ঞান ও আনন্দ সেইরূপ আত্মার স্বরূপ, আত্মা হইতে পৃথক্ নয়। এই জ্ঞান নিত্য, ইহা উৎপন্ন হয় না। যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা বৃত্তিজ্ঞান। উৎপন্ন সকল বস্তুর ন্যায় ইহাও অনিত্য। চৈতন্য ও জ্ঞানস্বরূপ আত্মাই সকল অনুভবের কর্তা। মন ও ইন্দ্রিয়গুলির সহায়ে আত্মাদ্বারাই বিষয় প্রকাশিত হয়। এই জন্য আত্মা প্রকাশস্বরূপ। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলেন, 'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' আনন্দই ব্রহ্ম—সাধক এই জানিলেন। অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে আনন্দমাত্র বলিয়া জানিলেন। অন্যত্র—'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্'—ব্রহ্মরূপ আনন্দকে জানিয়া মানুষ চিরতরে দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান মতে সকল জ্ঞান ও আনন্দের অনুভূতির উৎস 'সাইকি' (psyche)। ইহারা বলেন, 'সাইকি' শব্দের অর্থ—মন। শ্রদ্ধেয় স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তদীয় 'প্রকৃত মনস্তত্ত্ব' (True Psychology) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইংরেজী 'psyche' শব্দের অর্থ 'আত্মা' (soul) হইতে পারে, কিন্তু 'মন' হইতেই পারে না। বেদান্তমতে আত্মাতেই জগতের সকল সত্তা বিধৃত আত্মা সকল জ্ঞান ও আনন্দের একমাত্র উৎস। মন এই দুইটির অনুভূতির দ্বারস্বরূপ।

বেদান্তে ব্যষ্টিরূপে জীবে জীবে অধিষ্ঠিত জীবাত্মা জীব এবং জীবাত্মার সমষ্টি পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই 'ভূমা' নামে অভিহিত। ভূমা অর্থ বৃহৎ বা মহৎ। যাহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ—মহৎ—অসীম তাহাই ভূমা। এই অর্থে পরব্রহ্মই ভূমা। শ্রুতিতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই ভূমা—আনন্দস্বরূপ—সুখস্বরূপ। ছান্দোগ্যোপনিষৎ বলেন, 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি', অন্যত্র—'ভূমৈব সুখম্'—যাহা ভূমা তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই,—ভূমাই সুখ।

যাহা দেশ-কাল-পাত্র-পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ, তাহার ধারণা দেশ-কাল-পাত্র-মুক্ত অপরিচ্ছিন্ন অসীম অনন্তের জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই দুইটির পর্যালোচনায় প্রতিপন্ন হয় যে, সীমাবদ্ধ সসীম বস্তুর প্রাপ্তি কখনও পরমানন্দজনক হইতে পারে না। কারণ সসীম বস্তু ও সসীম সুখ আপেক্ষিক। দেখা যায় যে, সসীম সুখদায়ক কিছু লাভ করিলে উহা অপেক্ষা অধিকতর সুখদায়ক বস্তুলাভ করিবার ইচ্ছা স্বতই মনে উদয় হইয়া থাকে এবং উহা লাভ করিলে উহা অপেক্ষাও অধিকতর সুখজনক বস্তু লাভের বাসনা জন্মে। সীমাবদ্ধ সসীম সুখ লাভ করিলে এইভাবে সুখের তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অসীম সুখে পর্যবসিত না হওয়া পর্যন্ত নিবৃত্ত হয় না। এই এই জন্যই উপনিষৎ প্রচার করেন যে, সুখস্বরূপ ভূমাকে লাভ করিলেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ পরিপূর্ণ সুখ লাভ হয়, অল্পে প্রকৃত সুখ নাই। কারণ, সকল সুখের আকর ভূমাকে প্রাপ্ত হইলে অন্তরের সকল সুখের তৃষ্ণা চিরতরে নিবৃত্ত হয়; সীমাবদ্ধ সসীম বস্তুদ্বারা ঐরূপ অসীম অনন্ত সুখ লাভ একেবারেই সম্ভব নহে। কঠোপনিষৎ বলেন, 'ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ'—অনিত্য বস্তু সমূহ দ্বারা নিত্য আনন্দ লাভ হয় না। পক্ষান্তরে সসীম বিষয়জনিত সুখের অনুভূতি-কালে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের ফলে মন স্বভাবতই মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত হয়, এজন্য বিষয়সুখ মাত্রই অবিচ্ছিন্নভাবে অনুভব করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সংযম-প্রভাবে মন সম্পূর্ণ বৃত্তিহীন হইয়া নিশ্চল আকার ধারণ করিলে কোন বিষয়সম্বন্ধ-ব্যতিরেকেই যে পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে, উহা সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদ ও আত্ম-কেন্দ্রিক। এই কারণে ইন্দ্রিয়-সংযম বা বৃত্তি-নিরোধ-জনিত আনন্দ সর্বদা প্রদীপ্ত অবিচ্ছেদ স্থির ও উৎকৃষ্ট। একমাত্র নির্বিকল্প সমাধিতে সুপ্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষগণই এই কল্পনাতীত অসীম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। কঠোপনিষৎ বলেন, 'স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা'—আনন্দের আকরস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মকে লাভ করিয়া মানুষ পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

ইহা না জানিয়া বা ইহাতে বিশ্বাস না করিয়া অজ্ঞানী মনে করেন, সুখ-শান্তি-আনন্দ এক বস্তু এবং ব্রহ্ম বা আত্মা অথবা ভূমা আর একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। এই মিথ্যাধারণার বশবর্তী হইয়া সাধারণ মানুষ আপাতদৃষ্টিতে সুখকর আনন্দদায়ক অস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু-সমূহে স্থায়ী সুখ-শান্তি-আনন্দের বৃথা সন্ধান করে। বেদান্ত-মতে ইহা স্বগৃহে গচ্ছিত ধনের সন্ধান না জানিয়া ভিক্ষায় বহির্গত হওয়ার তুল্য। ইহার একমাত্র কারণ, দেহের বাহ্য ও আভ্যন্তর ভোগ্য বিষয়ের মানসিক সান্নিধ্যে মানুষের বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্য নিশ্চল হইয়া বৃত্তিহীন শান্তাকার ধারণ করিলে স্বচ্ছ অন্তঃকরণে আত্মার স্বরূপভূত আনন্দ বা ভূমানন্দ প্রতি-বিম্বিত হয়, ইহার ফলে আনন্দকে মানুষ ভোগ্য-বিষয়জাত বলিয়া ভ্রম করিয়া মনে করে যে, ভোগ্যবিষয় হইতেই আনন্দলাভ হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ভোগ্যবিষয়ের বাস্তব বা কাল্পনিক মানসিক সান্নিধ্যে যে আনন্দ অনুভূত হয়, উহা ভূমানন্দেরই অস্ফুট অভিব্যক্তি মাত্র, অচেতন ভোগ্যবস্তুজাত নহে। সুষুপ্তিতে দুঃখময় স্থূল-ও সূক্ষ্মশরীর এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি উহাদের কারণ অজ্ঞানে লয় হইলে আনন্দস্বরূপ অদ্বয় আত্মা স্ব-স্বরূপে স্বতই অভিব্যক্ত হন। এই জন্য ঐকালে অনির্বাচ্য সুখ-শান্তি অনুভূত হইয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই সুখ-শান্তি অজ্ঞানজনিত বলিয়া ইহাতে কর্মবীজ বিদ্যমান থাকে; এ জন্য জাগ্রত হইলে ইহা থাকে না। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিকালে অজ্ঞাননাশে কর্মবীজ দগ্ধ হওয়ায় এইরূপ লব্ধ আনন্দ বিদ্যমান থাকে, তখন ভূমা সম্পূর্ণ আবরণ মুক্ত হইয়া তাঁহার আনন্দস্বরূপে অভিব্যক্ত হন। শ্রুতি-প্রমাণেও ভূমা ভিন্ন অন্য কিছুর শাশ্বত আনন্দ-স্বরূপত্ব উপপন্ন হয় না।

সমালোচনা

Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume—Editor: Dr. R. C. Majumdar, Published by Swami Sambuddhananda, General Secretary, Swami Vivekananda Centenary 163, Lower Circular Road, Calcutta. Pp. 617 + xliv (Crown size); Price: India Rs. 30/-, foreign 10 Dollars or £3. 10s.

স্বামী বিবেকানন্দের পৃথিবীব্যাপী শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বহু পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইলেও মূল শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত আলোচ্য স্মারক গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য নানা দিক হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

Buddhistic India (Speech in Shakespeare club, Pasadena, California, Feb 2, 1900) স্বামীজীর এই অপ্রকাশিত বক্তৃতাটি গ্রন্থের অলঙ্কার-স্বরূপ।

স্বামীজীর লোকোত্তর বহুমুখী প্রতিভা এবং তাঁহার সমাজ ধর্ম- ও শিক্ষা-চিন্তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করা হইয়াছে, সর্বোপরি আত্মজ্ঞানদীপ্ত, মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের অনুধ্যান পাঠকগণের অন্তর স্পর্শ করিবে।

প্রথিতযশা লেখকদের ২৯টি সুলিখিত রচনা গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। লেখকদের মধ্যে কয়েকজন প্রখ্যাত বিদেশী সাহিত্যিক, যথা: Christopher Isherwood, Vincent Sheean, Prof. Ainslie T. Embree (Columbia University), Dr. Y. Chelysev (Moscow), Dr. C. R. Pangborn (professor State University, New Burnswick), Prof. Oliver Lacombe (Sorbonne, Paris).

প্রবন্ধগুলি সুনির্বাচিত ও সুখপাঠ্য। সন্ন্যাসীদের মধ্যে লিখিয়াছেন: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ, সম্বুদ্ধানন্দ, নিখিলানন্দ, লোকেশ্বরানন্দ, হিরণ্ময়ানন্দ। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'Swami Vivekananda—A World Figure', ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ারের 'New type of monasticism by Swami Vivekananda', ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'India's influence on the thought and culture of the world through the ages' এবং ডক্টর এ. আর. ওয়াডিয়ার 'Swami Vivekananda's Philosophy of Religion' প্রবন্ধগুলি গ্রন্থটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

পুস্তকটির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন। চক্রবর্তী রাজগোপালাচারীর শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁহার হৃদয়ের গভীরতার পরিচায়ক। ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য, জ্যাকেটের ছবিখানি তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রন্থের শেষে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য-প্রণীত 'Bibliography of works on Swami Vivekananda', 'Glossary' এবং 'General Index to the Complete Works of Swami Vivekananda' যত্নকৃত ও অত্যন্ত মূল্যবান্। আগ্রহশীল পাঠকগণ স্বামীজী-সম্বন্ধে গবেষণা করিতে ইচ্ছা করিলে এইগুলি হইতে যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

সুন্দর কাগজে উৎকৃষ্ট মুদ্রণ এবং উচ্চাঙ্গের বাঁধাই, সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে এই অমূল্য বৃহৎ স্মারকগ্রন্থখানি প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের অলঙ্কাররূপে সমাদৃত হইবার যোগ্য।

Vivekananda Centenary Souvenir—1963 Published by Secretary, Vivekananda Centenary Central Committee, Trichur. Pp. 180.

ত্রিচুর স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিক স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রিকাটির প্রচ্ছদপটে 'বিবেকানন্দ রকে'র উপর উপবিষ্ট স্বামীজীর সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর। পত্রিকাটি ইংরেজী ও মালায়ালী ভাষায় প্রকাশিত। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের বিবেকানন্দ-শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ইংরেজী বাণী প্রবন্ধনিচয়ের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর 'স্বামী বিবেকানন্দ—বর্তমান ভারত-নির্মাতা' স্বামী রঙ্গনাথানন্দের 'স্বামী বিবেকানন্দ—তাঁহার জীবন ও উদ্দেশ্য' এই দুইটি ইংরেজী প্রবন্ধ পত্রিকাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। সুভাষচন্দ্র বসু, মিসেস ব্যাগলী, ভগিনী ক্রিষ্টীন স্বামীজী-সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই পত্রিকার সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছে। স্বামী বিমলানন্দ, ঈশ্বরানন্দ, নিত্যবোধানন্দ ও সখ্যানন্দ এবং শ্রীকে. এম. মুন্সী ও পি. শেষাদ্রি লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য।

২২ খানি চিত্র পত্রিকার কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছে। তন্মধ্যে ভারতে ও বাহিরে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলি মানচিত্রে দেখানো হইয়াছে। এই শিক্ষাপ্রদ পত্রিকাটি যথাস্থানে আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

Swami Vivekananda Centenary Souvenir—1963 Published by The Swami Vivekananda Society, Tirunelveli. Pp. 123.

তিরুনেলভেলী স্বামী বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক বিবেকানন্দ শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচ্ছদপদে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ চিত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পত্রিকাটির অধিকাংশ প্রবন্ধ ইংরেজীতে, কয়েকটি তামিল ভাষায়। বহু প্রসিদ্ধ লেখকের লেখায় স্বামীজীর নানারূপ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। কেরালার গবর্নর ভি. ভি. গিরি, ডাঃ জন. টি. রীড, স্বামী শিবানন্দ এবং বাল গঙ্গাধর তিলকের প্রবন্ধ পত্রিকাটির বিশেষ আকর্ষণ। আমরা এখানে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম—২০ পৃষ্ঠায় বিবেকানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম 'নরেন্দ্র সেন', ইহা অবশ্য অসতর্কতার নিদর্শন। যাহা হউক পত্রিকাটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

Prabuddhakeralam—1964. Pp 84 ; Price 1/-. (Trichur)

'প্রবুদ্ধকেরলম্' পত্রিকার বিবেকানন্দ শতবর্ষ সংখ্যা মালায়ালী ভাষায় মুদ্রিত। মুদ্রণ ও বাঁধাই মন্দ নয়। প্রচ্ছদপটে স্বামীজীর পরিব্রাজক অবস্থার ছবি আছে। ভিতরেও স্বামীজীর আমেরিকার চিত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের ছবি আছে। মালায়ালীভাষাভাষীদের পক্ষে এই পত্রিকা পাঠে স্বামীজী-সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হইবার সুযোগ ঘটিবে।

Vivekavani—1963 Published by Viveka Sadhana Sangha, Sri Ramakrishna Vidyarthi Mandiram, Gavipuram, Bangalore 19. Pp. 82.

'বিবেকবাণী' পত্রিকার প্রবন্ধগুলি ইংরেজী ও কান্নাড়া ভাষায় রচিত। বিভিন্ন প্রবন্ধে স্বামীজীর কর্ম ও জীবনের নানা দিক আলোচিত। মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, রাজেন্দ্র-প্রসাদ, রাজ গোপালাচারী, রোমঁ্যা রোলাঁ ও জওহরলাল নেহরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি পত্রিকাটির সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। বিদ্যার্থীদের প্রবন্ধগুলি মনোজ্ঞ এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

জগতের ধর্মগুরু (স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ)—সম্পাদক : ব্রহ্মচারী বিভুচৈতন্য ও প্রসূন পাল। প্রকাশক : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ নরেন্দ্রপুর, ২৪পরগনা। পৃষ্ঠা ১৬২ ; মূল্য ৩৲।

তরুণ বিদ্যার্থীদিগের চরিত্রগঠনে সহায়ক একখানি আদর্শ পুস্তকের অভাব ছিল, আলোচ্য পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ায় বহুদিনের অভাব দূর হইল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে-সব ধর্মাচার্য, অবতার বা প্রচারক জীবনে উচ্চ আদর্শ রূপায়িত করিয়া মানব-কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন এবং যাঁহাদের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে, এইরূপ ১৫টি লোকপাবন চরিত্র আলোচ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথা : শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, তীর্থঙ্কর মহাবীর, শ্রীবুদ্ধ, কনফুসিয়স, যীশুখৃষ্ট, জরথুশ্ত্র, হজরত মোহম্মদ, শঙ্করাচার্য, রামানুজ, নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ। পুস্তকের ভাষা সরল ও সুখপাঠ্য। ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পুস্তক পাঠ্য করা হইলে সুকুমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে।

ফ্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ—লেখক ও প্রকাশক : শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, ৬৩।৩এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৯২ ; মূল্য ২৲।

আলোচ্য পুস্তকখানি ফ্রয়েড ও তাঁহার মনস্তত্ত্ব-সম্পর্কীয় মনোজ্ঞ আলোচনা। পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীদের বিষয় এবং বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী অ্যাডলার ও ইয়ুং সম্বন্ধেও লেখক সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তক বেশী নাই। 'বিজ্ঞান হিসাবে মনোবিজ্ঞান' ও 'মানসিক রোগ-চিকিৎসা' বিষয়-দুইটি সুলিখিত। বইটি মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধে আগ্রহশীল পাঠকগণের ভাল লাগিবে।

প্রহ্লাদগীতা——ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। ৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩। সুদর্শন-কার্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬২, মূল্য ৫০ ন. প.।

ভক্তিমার্গের সাধকদিগের নিকট সদাসঙ্গিরূপে এই গীতা থাকা উচিত। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা-সহ ভক্তিতত্ত্বের সারবস্তু সরল বাংলায় বিশদ টীকা সহ বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত। সংস্কৃত মূল শ্লোকগুলিও সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকটির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রকৃত ভক্তিরস পরিবেশন দ্বারা 'প্রহ্লাদগীতা' প্রণয়নের সার্থকতা প্রমাণিত হউক।

Abhedananda Academy Annual—Vol. III, 1963. Published by Abhedananda Academy of Culture, 73, Ahiritola Street, Calcutta-5. Pp. 110 ; Price Rs. 5/-

অভেদানন্দ আকাডেমি বার্ষিকীর (তৃতীয় খণ্ড, ১৯৬৩) মধ্যে ইংরেজী ভাষায় লিখিত সাতটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপাদানগুলি নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা চিত্তগ্রাহী। ডক্টর কল্যাণকুমার বসুর 'In Quest of Energy' (তেজের সন্ধানে) আণবিক শক্তির উপর নূতন আলোক সম্পাত করেছে। জটিল সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে ডক্টর বসুর চিন্তাধারার সার্থক পরিচয় পাওয়া গেল। 'Laccadives' দ্বীপপুঞ্জের কথা শুনিয়েছেন শ্রী সি. কে. বালকৃষ্ণ নায়ার। মাদ্রাজ রাজ্যের শাসনভুক্ত এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের পরিচয় আর ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। অধিবাসীরা মুসলমান। কথিত আছে, হজরত মহম্মদের বংশধর উবাইদোল্লা

ইসলাম ধর্মে এদের দীক্ষিত করেছিলেন। ভারতে আর্য অভিবাসন (Aryan Immigration to India) সম্পাদকীয় আলোচনা। প্রচলিত মতগুলিকে খণ্ডন ক'রে দেখানো হয়েছে ভারতবর্ষই সভ্যতার জন্মভূমি। আর্যরা বহিরাগত নন। ভারত থেকেই পৃথিবীর চতুর্দিকে সভ্যতার আলোক বিকীর্ণ হয়েছিল। বৈদিক ও মহেঞ্জদাড়ো সভ্যতার আলোচনা-প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতব্য তত্ত্বও উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ডক্টর এল. এ. রবিবর্মার 'বাংলা ও মালাবারের সাদৃশ্য' (Similarity of Bengal and Malabar), স্বামী শঙ্করানন্দের তন্ত্রবাদের উৎপত্তি (Origin of Tantricism) ও ডক্টর কল্যাণকুমার গাঙ্গুলীর প্রাচীন ভারতে সূর্যোপাসনার কয়েকটি দিক্ (Some Aspects of the Sun Worship in Ancient India) আলোচ্য বার্ষিকীটির গৌরব বৃদ্ধি করেছে। মানসিক ভোজ্যের সুন্দর উপকরণ-বৈচিত্র্য লাভ ক'রে পরম তৃপ্তি পাওয়া গেল।

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

গরীয়সী গৌরী—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বাক্‌সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ২০৪ ; মূল্য টাকা ৪'৫০।

শ্রীশ্রীগৌরীমায়ের পুণ্যকাহিনী নব-কথকতার ভঙ্গীতে পরিবেশিত। দৃপ্তব্যক্তিত্বসমুজ্জ্বল এই শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-চরণাশ্রিতা সাধিকার চারিত্র-মহিমা জাতীয় জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। অন্য দিকে অধ্যাত্মসাধনার এক পরমবিস্ময়কর উদাহরণ গৌরীমায়ের জীবন। এই জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর ব্যক্তিত্বের নানা দিক্‌ও প্রতিভাত। স্বভাবতই এ জাতীয় রচনা জনসমাজে বহুল-আদৃত।

কিন্তু বিষয়নিষ্ঠ জীবনী-রচনার প্রয়োজন আজ সবচেয়ে বেশী। অলৌকিক পুরাণকাহিনীর যুগ বিগত। দেবতার মানবরূপ নয়, মানুষের দেবত্বেরই অনুসন্ধান আমাদের কাম্য। শ্রদ্ধেয় লেখকের কাছে সাহিত্যপাঠক হিসাবে আমরা আরও পূর্ণাঙ্গ জীবনী আশা করি। সেইসঙ্গে আশা করি তাঁর রচনাভঙ্গীর ক্লান্তিকর পুনরুক্তি-বাহুল্য-বর্জন। —**শুভ গুপ্ত**

গীতামাধুরী—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন রচিত। ৭ডি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা-৩ হইতে শ্রীজয়-নারায়ণ কাপুর কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১২৲।

বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বিভিন্ন সূত্র অবলম্বন করিয়া বর্তমান গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় যেন অষ্টাদশটি সোপান। নিম্নের সোপানে 'বিষাদ' আর সর্বোচ্চ সোপানে 'মোক্ষ'। জীবনের আরম্ভ বিষাদে। পরিণতি মুক্তিতে। বিষাদ জীবনের শেষ কথা নয়। জীবনে দুঃখ আছে, কিন্তু ইহা চরম বার্তা নয়। চরম সংবাদ দুঃখ-মুক্তিতে, সুখময়ের সান্নিধ্যে পরানন্দ-প্রাপ্তিতে। অর্জুন গীতার সোপান বাহিয়া ভূমির অশান্তি হইতে ভূমার প্রশান্তিতে পৌঁছিয়াছেন। গীতা জীবন্মুক্তিবাদী।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তাঁহার সাধক-জীবনের অনুভূতির দ্বারা এই অমৃতময় তত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন, যাহাতে মানুষ-মাত্রেই দুঃখময় সংসারে থাকিয়াও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবেন ও জীবনের আনন্দময় রস উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। গ্রন্থখানি তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে বিশেষ আদরণীয় হইবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বৃন্দাবন: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের উদ্যোগে শ্রীবৃন্দাবনধামে গত ৩রা ডিসেম্বর হইতে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আটদিনব্যাপী স্বামীজীর শতবার্ষিকী উৎসবে বিভিন্ন কার্যসূচীর মাধ্যমে বিশেষ পূজা, হোম, স্বামীজীর চিত্র হস্তিপৃষ্ঠে রাখিয়া শোভাযাত্রা করিয়া নগর-পরিক্রমা, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা ও স্বামী বিবেকানন্দ নাট্যাভিনয়, স্থানীয় ও বহিরাগত বিশিষ্ট শিল্পীদের উচ্চাঙ্গ ও ভক্তিমূলক সঙ্গীত-সম্মেলন এবং স্বামী কৈলাসানন্দজীর সভাপতিত্বে বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ দ্বারা বেদান্তসম্মেলনের অদ্বৈত-বাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদের আলোচনা প্রভৃতি বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল, যাহা স্থানীয় লোকের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ কর্তৃক স্বামীজীর জীবনী অবলম্বনে চিত্র-প্রদর্শনী সর্বসাধারণের মনে বিশেষ প্রেরণা জাগাইয়াছে। উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীদাউদয়াল খান্না, উক্ত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রীনৃসিংহবল্লভ গোস্বামী বেদান্ত-শাস্ত্রী ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বক্তৃতা দেন। 'মহারাসলীলা' এবং শ্রীনবদ্বীপদাস ও সম্প্রদায়কর্তৃক পদকীর্তন উক্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল। ৮ই ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস পারিতোষিক বিতরণ করেন এবং স্বামীজী-সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। ১০ই ডিসেম্বর প্রায় ১২ শত দরিদ্রনারায়ণের সেবা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অষ্টদিবসব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে ৮.১২.৬৩ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহর-লাল নেহরু কর্তৃক সেবাশ্রমের নবনির্মিত হাসপাতাল-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্রীনেহরু তাঁহার ভাষণে ভারত ও ভারতের বাহিরে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক নীরবে নানা আকারে মানবজাতির কল্যাণে ও সেবায় আত্মনিয়োগ করার বিষয় সর্ব-সাধারণের নিকট বিশেষ করিয়া বলেন। এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীবিশ্বনাথ দাস, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নায়ার, কেন্দ্রীয় উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন এবং বিশিষ্ট সন্ন্যাসিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম কর্তৃক গঠিত স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী মহোৎসব সমিতির (মথুরা-বৃন্দাবন) উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে দশদিনব্যাপী উৎসবের মধ্যে ১. ১২. ৬৩ তারিখে মথুরাপুরীতে বিশেষ ধুমধামের সঙ্গে স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া বাদ্য সহকারে নগর পরিক্রমা করার পর অপরাহ্ণে স্থানীয় কলেজে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে এক মহতী সভায় বিভিন্ন বক্তা স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ডাঃ সুশীলা নায়ার অতি সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। পরের দিন কবি-সম্মেলনে স্থানীয় ও বহিরাগত খ্যাতিসম্পন্ন কবিগণ অন্যান্য কবিতার সঙ্গে স্বামীজীর সম্বন্ধে স্বরচিত কবিতাও আবৃত্তি করেন। ইহা ছাড়া

কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ স্বামী বিবেকানন্দের 'জীবন-ঝাঁকী' শীর্ষক হিন্দী নাটক অভিনয় করেন, এই অভিনয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল

কাঁথি ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গত ২০শে হইতে ২২শে চৈত্র তিনদিবস শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৯তম জন্মোৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ২০শে চৈত্র পূর্বাহ্ণে বিশেষ পূজা, হোম এবং চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মেদিনীপুরের জেলাশাসক শ্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দার। সভায় কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীবনবিহারী মাইতি, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও বিবেকানন্দ-শতবর্ষ-জয়ন্তী উৎসবের সম্পাদক স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ভাষণ দেন। সভান্তে শ্রীযুগলকিশোর দাসের গ্রন্থনায়, শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুরে এবং শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র হাজরার সঙ্গতে শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়, বেতারশিল্পী শ্রীহরিপদ কর পল্লীগীতি পরিবেশন করেন, ২১শে চৈত্র ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ওঁকারানন্দ; বক্তৃতা দেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সভার পর শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি-আলেখ্য ও পল্লীগীতি পরিবেশিত হয়। ২২শে চৈত্র পূর্বাহ্ণে স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে বিভিন্ন গ্রাম হইতে সমাগত ১৪টি হরিসভা সম্প্রদায় হরিনামগানে আশ্রমপ্রাঙ্গণ আনন্দমুখর করিয়া তুলেন। ১২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত প্রায় ৫,৫০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পর ধর্মসভায় স্বামী ওঁকারানন্দ প্রায় দুইঘণ্টাকাল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন আলোচনা করেন, এইদিনও সভার শেষে পূর্বোক্ত শিল্পিগণ কর্তৃক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

উৎসব উপলক্ষে সুসজ্জিত আশ্রমপ্রাঙ্গণ সন্ধ্যায় আলোকমালায় ভূষিত করা হইয়াছিল। প্রতিদিন সভায় প্রায় দুই সহস্র শ্রোতা উপস্থিত থাকিতেন। বক্তাগণ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনালোকে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির বিষয় অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছিলেন উৎসবের তিনদিবসে সর্বসমেত প্রায় ৭,০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গড়বেতা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ ১২৯তম আবির্ভাব-তিথি-স্মরণে গত ১২ই হইতে ১৮ই এপ্রিল সপ্তাহব্যাপী বিবিধ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন স্বামী নিরাময়ানন্দ, হিরণ্ময়ানন্দ, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস অধিকারী ও সম্প্রদায়ের পালাকীর্তন এবং বেতার-কথক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কথকতা উৎসবের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। প্রায় চারি সহস্র নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। গড়বেতা কলেজে ছাত্রসভায় এবং স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ও শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত ভাষণ দেন।

মেদিনীপুর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৯ তম জন্মোৎসব উপলক্ষে রবিবার ৫ই এপ্রিল দিবসব্যাপী বিশেষ পূজা পাঠ, হোম আরতি, নরনারায়ণ-সেবা ও ধর্মসভার অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত জনের সমাবেশ হয়। প্রায় ৪,০০০ লোক বসিয়া প্রসাদ ধারণ করেন।

সন্ধ্যায় ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপরেশনাথ ঘোষ। স্বামী অমলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবনকথা আলোচনা করেন এবং স্বামীজীর 'মা আমায় মানুষ কর' প্রার্থনা-মন্ত্রের সাধনে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।

সভাশেষে বাঁকুড়ার শ্রীপঞ্চানন মহান্ত মহাশয়ের বাউল কীর্তন-গানে সকলে বিমল আনন্দ লাভ করেন।

কোয়ালপাড়া: শ্রীরামকৃষ্ণ যোগাশ্রমে গত ১৫ই ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণের তিথিপূজা উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ও ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে ফেব্রুআরি শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসবের আয়োজন করা হয়। মঙ্গলারতি, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভজন, বিশেষ ভোগরাগ, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। ২,৫০০ নরনারায়ণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২৪শে ফেব্রুআরি শ্রীপ্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় স্বামী গদাধরানন্দ ও বিশিষ্ট বক্তাগণ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ উৎসাহের সহিত সভায় যোগদান করে। সন্ধ্যারতির পর দুইদিনই রামায়ণ-গান হইয়াছিল।

ঢাকা: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে স্বামীজীর শতবর্ষ-জয়ন্তীর পরিসমাপ্তি উপলক্ষে গত ১০ই জানুআরি অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সভাপতি খান বাহাদুর আলহাজ্জ আবদুর রহমান খাঁ তাঁহার ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিশেষ ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলেন:

স্বামীজীর জীবনের প্রধান অবলম্বন বা একমাত্র অবলম্বন ছিল ঈশ্বরে বিশ্বাস—এই বিশ্বাস যে তিনি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহার-কর্তা, কারও কিছু করবার জো নেই তাঁর সাহায্য বিনা। তিনি যাকে দিয়ে যা ইচ্ছা করেন, তিনি তার ব্যবস্থা ক'রে দেন। এই বিশ্বাসে নির্ভর করেই স্বামীজী সমস্ত জীবন যাপন করেছেন।

তাঁর মত ছিল, 'যত মত তত পথ'—সব ধর্মই সত্য, যে-কোন ধর্মের যথাযথ অনুশীলন করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, শান্তি লাভ হয়। স্বামীজী বড় ছোট ধনিনির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে সমান ভালবাসতেন, প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি কপর্দকহীন অবস্থায় আসমুদ্র হিমাচল পরিভ্রমণ করেন।

চিকাগো ধর্মমহাসভার পরেই বিবেকানন্দের নাম ছড়িয়ে প'ড়ল সমস্ত দুনিয়ায়, আমেরিকা থেকে তাঁর ডাক প'ড়ল ইংলণ্ডে; সেখানে অনেক শিষ্য জুটল তাঁর, যাঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা অন্যতমা।

স্বামীজী বুঝতে পারলেন যথাযথভাবে সংগঠন করতে না পারলে—কোন বড় আদর্শই স্থায়ী হয় না, তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন রামকৃষ্ণ মিশন।

অধুনা পৃথিবী শতধা বিচ্ছিন্ন। কোন্ জাতি কোন্ জাতির উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, তারই চেষ্টা চলেছে সর্বত্র; ফলে শান্তি নেই জগতের কোথাও। তা না ক'রে যদি প্রত্যেক জাতি অপর জাতির সঙ্গে সহযোগিতা ক'রত, কারও কিছু অভাব হ'ত না; সংসারে শান্তি বিরাজ ক'রত। এই তো গেল বহির্জগতের কথা। স্বামীজীর নিজের দেশ পাক-ভারতের (ভারতবর্ষের) অবস্থাও আজ অতি শোচনীয়। যদি দেশবাসী তাঁর কথা শুনত, তবে এই সব দুর্ঘটনা কখনই ঘ'টত না। তবে কথা এই যে, সবই সময়সাপেক্ষ। কোন প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয় না।

আসুন আমরা সকলে মিলে করুণাময় বিধাতার দরবারে সানুনয় প্রার্থনা জানাই—সেদিন যেন যথাসম্ভব সত্বর আসে।

উদ্বাস্তু-সেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের গেদে, পেট্রাপোল, হিঙ্গলগঞ্জ নামক স্থানে এবং আসামের গারো পাহাড় অঞ্চলে গোয়ালপাড়া বিভাগের হাসিমারা নামক স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকার্য করিতেছেন।

১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে বিতরিত খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য :

গেদে : এই স্থানে সেবাকার্য আরম্ভ হয় গত ৫ই মার্চ। ৩১ মণ ৫ সের চিঁড়া, ১১ মণ ২০ সের গুড়, ১২ কে.জি. বিস্কুট, নূতন ধুতি, শাড়ি ও ফ্রক যথাক্রমে ৫৪৯, ৫৩৯ ও ৭৪। ছোটদের পুরাতন পোশাক ২৬০, এনামেলের বাসন ৬৪ এবং ২ খানি কম্বল বিতরণ করা হইয়াছে। মোট ১২,৮১৬ জনকে দেওয়া হইয়াছে।

পেট্রাপোল : ২৯,১৮৫ জনের জন্য রান্না করা খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। ধুতি ও শাড়ি ১১৩ খানি এবং ছোটদের পুরাতন পোশাক ৩৫২টি বিতরণ করা হয়। পেট্রাপোলে রিলিফ শুরু করা হয় ১৪ই মার্চ।

হিঙ্গলগঞ্জ : ৭,২৮০ জনের জন্য রান্না করা খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। এই স্থানে সেবাকার্য আরম্ভ হয় ৩০শে মার্চ।

হাসিমারা : নূতন ধুতি শাড়ি ও ছেলেমেয়েদের পোশাক বিতরণ করা হয় যথাক্রমে ৪০০, ২৭৩ ও ৪০৭। গত ১৪ই এপ্রিল হইতে হাসিমারায় সেবাকার্য আরম্ভ হইয়াছে।

স্বামী ঋতানন্দের দেহত্যাগ

আমরা অতি দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, স্বামী ঋতানন্দ (গগন মহারাজ) ৬৮ বৎসর বয়সে গত ২৫শে এপ্রিল বেলা ১১টা ২৫ মিনিটের সময় কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৩ই এপ্রিল তাঁহার পিত্তকোষে (gall bladder) অস্ত্রোপচার করা হয়। তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছিলেন, কিন্তু কয়েক দিন পরে অবস্থা খারাপ হয় এবং ইউরিমিয়া দেখা দেয়, ইহাতেই তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১৫ খৃঃ কোয়ালপাড়া আশ্রমে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগ দেন এবং ১৯২১ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। জয়রামবাটীর অতি সন্নিকটে থাকিতেন বলিয়া শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যদর্শনলাভের দুর্লভ সুযোগ তাঁহার প্রায়ই ঘটিত। কোয়ালপাড়া আশ্রম ত্যাগ করার পর তিনি বারাণসী সেবাশ্রমে কয়েক বৎসর কাজ করেন।

তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ ! শান্তিঃ !! শান্তিঃ !!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বাঁশবেড়িয়া (হুগলি) : উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত ২৫.১২.৬৩ চন্দননগর কৃষ্ণভামিনী নারী শিক্ষামন্দিরের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সভানেত্রীত্বে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

দাদপুর (২৪ পরগনা) : গ্রামে স্বামীজীর শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অধ্যাপক শ্রীপবিত্র গুপ্ত বক্তৃতা দেন। সভায় গীতার কর্মযোগ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়। বিভিন্ন গ্রামের ১,৫০০ নরনারী উৎসবে যোগদান করেন।

চুঁচুড়া ঃ হুগলি জেলা বিবেকানন্দ শততম জন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগে গত ২রা ও ৩রা ফেব্রুআরি স্বামীজীর উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। আয়োজিত সভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, ডক্টর রমা চৌধুরী প্রভৃতি ভাষণ দেন। প্রাচ্য-বাণী সম্প্রদায় কর্তৃক 'ভারত-বিবেকম্' সংস্কৃত নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

রাধাবল্লভচক (হলদিয়া) ঃ বাণীশ্রী সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৩শে ফেব্রুআরি স্বামীজীর জন্মশতাব্দী-সমাপ্তি-উৎসবে আয়োজিত সভায় অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী সভাপতি এবং স্বামী জীবানন্দ প্রধান অতিথিরূপে যোগদান করেন ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক্ অবলম্বনে ভাষণ দেন।

কোচবিহার ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে গত ৬ই ও ৭ই মার্চ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী জীবানন্দ 'বিবেকানন্দ-ভাবধারা' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-রহস্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। প্রথম দিন সভাপতি ছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক শ্রীতেজবাহাদুর সিং। বক্তৃতার পর বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন সভান্তে 'বিবেকানন্দ-লীলাগীতি' পরিবেশিত হয়।

পাণ্ডু (আসাম) ঃ বিবেকানন্দ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১০ই হইতে ১২ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবর্ষ-জয়ন্তী-সমাপ্তি-উৎসব বিভিন্ন কার্যসূচীর মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী মহানন্দ, যুক্তানন্দ, ভব্যানন্দ প্রভৃতি ভাষণ দেন।

রাজারহাট-বিষ্ণুপুর (২৪ পরগনা) ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে গত ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল দুইদিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের শততম জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল ও শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের ভাগবত জীবনের বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় দিন পূজার্চনা, ভজন, কীর্তন, শোভাযাত্রা, প্রসাদ-বিতরণাদির পর অপরাহ্নে ধর্মসভায় সভাপতি স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত বক্তৃতা দেন।

কলিকাতা শিল্পমেলা

টালা পার্ক ময়দানে গত মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কলিকাতা শিল্পমেলা শুধু আকর্ষণীয় নয়, বহু দিক্ দিয়া শিক্ষণীয়ও হইয়াছিল।

ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত এই শিল্পমেলায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় 'জাতির প্রস্তুতি'—স্থল, নৌ ও বিমান-সৈন্যবাহিনীর প্রতিরক্ষার অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক উপাদানের আয়োজন সহস্র সহস্র দর্শককে আকর্ষণ করিয়াছিল।

রেলওয়ে, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, 'ডাক ও তার' বিভাগ, বৃহত্তর কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা, দুর্গাপুর শিল্পনগরী প্রদর্শনী প্রভৃতিও দেখিবার জিনিস হইয়াছিল।

ঐতিহাসিক সংবাদ ও চিত্র পরিবেশনের ধারাবাহিক আলেখ্য, সাময়িক পত্রপত্রিকা-প্রদর্শনী দর্শকগণের কৌতূহল উদ্দীপিত করে।

বিবেকানন্দ-প্রদর্শনীতে স্বামীজীর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে বিশিষ্ট শিল্পী দ্বারা নির্মিত মৃন্ময় মূর্তির মাধ্যমে স্বামীজীর চিন্ময় রূপ উপস্থাপিত করা হয়। স্বামীজীর এই প্রদর্শনী শিল্পমেলার একটি বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র হইয়াছিল।

শেক্সপীয়র উৎসব

ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে শেক্সপীয়র চতুর্থ জন্মশতবর্ষ উৎসব প্রতিপালিত হয়। কলিকাতায় মহাজাতিসদনে ও অন্যত্র মহাকবির যে জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়। গত ২৫শে এপ্রিল হইতে ২৮শে এপ্রিল পর্যন্ত এই চারিদিন বক্তৃতা, সঙ্গীত, আবৃত্তি ও অভিনয়ের মাধ্যমে উৎসবটি বিশেষ প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বিশিষ্ট বক্তাগণ কবিবরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। 'দি মার্চেন্ট অব ভেনিস' (ইংরেজীতে), হ্যামলেট (বাংলায়), 'ভেনিসবণিজম্' (সংস্কৃতে) ও 'জুলিয়াস সীজারে'র (বাংলায়) অভিনয় নাট্যানুরাগিগণের চিত্তবিনোদন করে। এছাড়া শেক্সপীয়র-গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন অংশের আবৃত্তি ও সঙ্গীত বিশেষ মনোরম হইয়াছিল।

আশ্রয় ও নিরাশ্রয়

নিউ দিল্লী, ২২শে এপ্রিল: ১৯৬১ খৃঃ গৃহ ও প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তরের বিবরণী হইতে জানা যায়, ভারতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের মাথার উপরে ছাদ নাই

গৃহহীনদের শতকরা নব্বই জন শহরে থাকে। বৃহত্তর বোম্বাই-এ ঐরূপ ৭৬,০০০ লোক আছে। মহীশূর রাজ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গৃহহীন লোক বাস করে—শতকরা ১০·৬ জন, পরে মাদ্রাজে শতকরা ৩·৮ জন এবং মহারাষ্ট্রে শতকরা ২·৩ জন।

দেশের মোট গৃহসংখ্যা ১০·৭ কোটি এবং ৮·৩ কোটি পরিবার তাহাতে বাস করে। এক পরিবার একই রান্নাঘর ব্যবহার করে এবং গড়ে প্রতি পরিবারে ৫ জন লোক।

চার কোটি পরিবার—দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা মাত্র একখানা ঘরে থাকে, শতকরা ২৬·৪টি পরিবার দুটি ঘরে এবং শতকরা ২৩·৩টি পরিবার তিনটি বা বেশী ঘরে বাস করে।

উক্ত বিবরণী হইতে আরও জানা যায় যে, শতকরা ৫৬·৯টি পরিবার মাটির ঘরে বাস করে। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৪৫টি পরিবারের নিজস্ব বাড়ি এবং শতকরা ৫২টি পরিবারের ভাড়াটে বাড়ি।

মোট পাকা বাড়ির শতকরা ৭৩·৫ ভাগ বাসগৃহ, শতকরা ১০ ভাগ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, শতকরা ৪ ভাগ শিক্ষায়তন এবং কারখানা ইত্যাদি শতকরা ১ ভাগ। (U.N.I.)

ডাঃ মণিলাল দত্তের দেহত্যাগ

আমরা অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে জানাইতেছি যে, ধর্মপ্রাণ ভক্ত ডাঃ মণিলাল দত্ত গত ২রা এপ্রিল সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট সময়ে আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৬৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি আন্ত্রিক গোলযোগে ভুগিতেছিলেন, চিকিৎসার জন্য তিনি হাসপাতালে ভরতি হন।

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হইতে এম-বি পাস করিয়া তিনি কিছুকাল স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেন, তার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় War Service-এ যোগ দেন। সরকারী কর্ম ছাড়িয়া তিনি আর চিকিৎসা করিতেন না, সাধন-ভজন ও সেবা-কার্য লইয়াই থাকিতেন।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। উদ্বোধন কার্যালয়ের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গত ৫।৬ বৎসর যাবৎ তিনি প্রতিদিন উদ্বোধনে আসিয়া নিষ্ঠাপূর্বক শ্রীশ্রীমায়ের সেবাদি কার্যে লিপ্ত থাকিতেন। তাঁহার ভক্তি ও নিষ্ঠা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তি!!!



পরলোকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুজী আর আমাদের মধ্যে নাই; তাঁহার মৃত্যুসংবাদে দেশবাসী মর্মাহত। গত ২৭শে মে বুধবার বেলা ২টার সময় দিল্লীতে প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে মহাধমনী হইতে রক্তক্ষরণের ফলে তাঁহার জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। সকাল ৬টা ২০ মিনিটের সময় তিনি অকস্মাৎ গুরুতরভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং বেলা ১১টার পর তাঁহার অবস্থা বিশেষ উদ্বেগজনক হয়। চিকিৎসকগণের সর্ববিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। গত জানুআরি মাসে ভুবনেশ্বর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় তিনি মৃদু পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। ধীরে ধীরে প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া তিনি কার্যভার গ্রহণ করিতেছিলেন এবং কয়েকদিন পূর্বে বিশ্রামের জন্য দেরাদুনে গিয়াছিলেন, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পরদিনই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য দিল্লীর যমুনাতীরে রাজঘাটে অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ লক্ষ নরনারী রাজঘাট পর্যন্ত তাঁহার শবানুগমন করে।

ভারতের অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসের সহিত জওহরলাল নেহরুর জীবন জড়িত। কি জাতির জাগরণে, কি স্বাধীনতা-আন্দোলনে, কি স্বাধীনতা-সংরক্ষণে তাঁহার জীবন সর্বদা সংগ্রামমুখর ছিল। স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক মতিলাল নেহরুর তিনি উপযুক্ত সন্তান।

শৈশবে বিলাস ও ভোগের মধ্যে তিনি বর্ধিত হন, সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহার পিতা বাল্যকালেই তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠান, সেখানে প্রথমে তিনি হ্যারো স্কুলে পড়াশুনা করেন, কেম্ব্রিজে ডিগ্রি লাভ করিয়া পরে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন, ইহাতে তাঁহার জীবন আমূল পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং দেশের কাজে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এ জন্য তাঁহাকে বহুবার কারাবরণ করিতে হয়।

১৯২৯ খৃঃ তিনি প্রথমবার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। তারপর আরও পাঁচ বার তিনি এই গৌরবময় পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৪৭ খৃঃ ১৫ই অগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর স্বাধীন ভারতের তিনি প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া জনসাধারণের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে তাঁহার ভূমিকা ছিল সংগ্রামের—স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তাঁহার কাজ হইল সংগঠনের। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি তাঁহারই চিন্তা ও কর্মের নিদর্শন।

তাঁহার বৈদেশিক নীতি ছিল—সকল দেশের সহিত সমভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করা। তাঁহার মতে বিভিন্ন দেশের মত ও পথ ভিন্ন হইলেও সংঘর্ষের আবশ্যক নাই, পঞ্চশীল নীতি গ্রহণ করিয়া তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। নিরস্ত্রীকরণ ও সহাবস্থান নীতিতে তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল। এই আদর্শ লইয়া তিনি বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। এই ভ্রমণের ফলে তিনি সহস্র প্রকার মানুষের সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং সকলকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ সর্বদেশে সমভাবে গৃহীত না হইলেও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে; তাঁহার মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য বিভিন্ন দেশ হইতে রাষ্ট্রপ্রতিনিধিগণের আগমনই ইহার প্রমাণ।

জওহরলালের মহাপ্রয়াণে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কতদিনে পূর্ণ হইবে—কে বলিতে পারে? তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। অনেক সময় মতদ্বৈধ থাকিলেও দেখা যাইত—তাঁহার অনুসৃত নীতি পরিশেষে প্রায় সকলেই সমর্থন করিতেন এবং তাঁহাকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার কর্মনিষ্ঠা ও স্থৈর্য দেশবাসীর আদর্শ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাবধারার সহিত তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং দেশে ও বিদেশে মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রে গমন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। 'Discovery of India'-নামক গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া মিশনের বর্তমান কার্যপদ্ধতির প্রতিও তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। এই অক্লান্তকর্মা বীর যোদ্ধার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর বেতার-বাণী*

[পণ্ডিত নেহরুর দেহত্যাগ উপলক্ষে কলিকাতা আকাশ-বাণীর উদ্যোগে গত ২৮. ৫. ৬৪ রাত্রি ১০টার সময় (ইংরেজীতে) প্রচারিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক মহারাজের শ্রদ্ধাপূর্ণ বাণীর বঙ্গানুবাদ]

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন নব ভারতের নির্মাতা, জাতীয় উন্নতির সকল বিভাগে তিনি দেশবাসীর মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করেন। মানসিক, সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক দিক্ দিয়া তিনি ভারতকে উন্নত করিয়াছেন, এবং অন্যান্য জাতির চোখে ও বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির নিকট ভারতের মর্যাদা তিনি বর্ধিত করিয়াছেন। এই ক্ষতি অপূরণীয়, তবে তাঁহার ভাব চিরদিন থাকিবে এবং জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে উৎসাহিত করিবে, কারণ তিনি ছিলেন বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম প্রধান চরিত্র, এবং তাঁহার জীবন ছিল দেশবাসী ও মানবজাতির সেবায় নিবেদিত। তাঁহার মৃত্যুতে মানবজাতি আজ অভাব অনুভব করিতেছে, কারণ মানব-মুক্তির—শান্তি ও শুভেচ্ছার একজন সমর্থক চলিয়া গেলেন, তাঁহার কথা অন্যান্য দেশের লোক শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করিত। তাঁহার আত্মা শান্তিতে বিশ্রামলাভ করুক—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

* কলিকাতা আকাশ-বাণীর সৌজন্যে।

কথাপ্রসঙ্গে

নীতি ও নেতা

শক্তির প্রকাশ হয় ব্যক্তির মধ্য দিয়া, ব্যক্তিকে চালিত করে নীতি, নীতিচালিত শক্তিমান্ ব্যক্তিই রাষ্ট্রে, সমাজে বা ধর্মজগতে বহুমানবের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করেন এবং নেতারূপে সমাদৃত হন। পৃথিবীর 'ইতিহাস' অসংখ্য জনগণের ইতিহাস নয়, বরং এইরূপ মুষ্টিমেয় জননেতারই জীবনকাহিনী।

সর্বত্রই দেখা যায়—এই নেতাগণ একটি বিশেষ নীতিকে ধ্রুবতারা করিয়া চলিয়াছেন, ঐ নীতি বহুর কল্যাণকর হইলে বহু ব্যক্তি নেতার নেতৃত্বে ঐ নীতি অনুসরণ করে এবং ধীরে ধীরে দেখা যায়—দুর্বল জনসাধারণ নীতি অপেক্ষা নেতারই অনুসরণ করিতেছে; এই ভাবেই ক্রমশঃ ব্যক্তি-উপাসনা দেখা দিয়াছে কি রাষ্ট্রজীবনে, কি ধর্মজগতে। পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে, আরও বহুবার ঘটিবে। ব্যক্তি-উপাসনা সাময়িকভাবেই মানবের ক্রমবিকাশের পথে প্রয়োজন, কারণ ব্যক্তি অপেক্ষা নীতিই দীর্ঘকালস্থায়ী। ঋষি ও মহাপুরুষগণ চিরদিন থাকেন না, কিন্তু তাঁহাদের আচরিত নীতি ও আবিষ্কৃত সত্যগুলি চিরদিন মানুষের কল্যাণ করে।

নীতিবর্জিত ব্যক্তি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, ব্যক্তিরহিত নীতি অর্থাৎ যে নীতি কাহারও জীবনে কার্যে পরিণত হয় নাই, তাহা অনুসরণ করা যায় না—শুধু লেখায় বা কথায় থাকিলে নীতির মূল্য কতটুকু? জীবনে পরিণত দেখিলেই মানুষ নীতি অনুসরণ করিতে পারে। ব্যক্তি ও নীতির মিলন শতাব্দীতে এক-আধবারই ঘটিয়া থাকে, যাঁহার ভিতর যখন ঘটে, তাঁহাকে সেই যুগের মানুষ যুগমানব, যুগপ্রতিনিধি (Representative man) প্রভৃতি নানা আখ্যা দিয়া থাকে। একই যুগে এই প্রকার বহু মানবের আবির্ভাব কখন কখন দেখা দেয়। তাহাতে জাতীয় জীবন কিছুটা অগ্রসর হয় নিশ্চয়, কিন্তু কে যথার্থ যুগমানব বা যুগনেতা, ঠিক তখনই ধরা পড়ে না। আবেগ কিছুটা প্রশমিত হইলে কালের কষ্টিপাথরে পাওয়া যায় নিকষিত স্বর্ণের প্রকৃত পরিচয়।

কখন কখন আরও দেখা যায়, এক মহামানব একটি নীতি জীবনে পরিণত করিলেন, কিন্তু জনসমাজে উহা প্রচার বা রূপায়িত করিলেন আর একজন। এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগ-বক্তৃতামালায় যে-কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়: 'জগতের শ্রেষ্ঠ মানবগণ অজ্ঞাতভাবেই চলিয়া গিয়াছেন। যে-সকল মহাপুরুষ সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না, তাঁহাদের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত বুদ্ধ ও খ্রীষ্টগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিমাত্র।… শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ সত্য ও মহান্ ভাবরাশি নীরবে সংগ্রহ করেন, এবং বুদ্ধ-খ্রীষ্টগণ সেইসব ভাব স্থানে স্থানে প্রচার করেন ও তদুদ্দেশ্যে কাজ করেন।'

'করুণাধারায় এসো'

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

আজ বড়ো তপ্ত দিন। সকাল থেকে সূর্যের অগ্নিদৃষ্টি আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। নিশ্চল নিঃশব্দ প্রকৃতির বুক জুড়ে অসহ শূন্যতা। গ্রামের পথে লোকচলাচল নেই বললেই হয়। একটা ক্লান্ত কুকুর ধুঁকতে ধুঁকতে ছায়ার সন্ধানে চলে গেল। এক ঝলক হাওয়া দিল। উষ্ণ অভিশাপের মতো সর্বাঙ্গে আগুন বুলিয়ে ছুটে গেল মাঠের মাঝখানে। জানালা বন্ধ ক'রে চোখ বুজে পড়ে রইলুম।

জীবনে এক-একটা সময় আসে—এমনি গ্রীষ্মের অচল প্রহরের মতো। পৃথিবীতে কোথাও শ্যামলতা ছিল, মানুষের মধ্যে ছিল করুণা—ভালোবাসা, কর্তব্যের দাবদাহ শেষ ক'রে ছিল অবাধ ছুটির আনন্দ, সব প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝখানে ছিল ক্ষমা ও স্বীকৃতির স্নিগ্ধচ্ছায়া—সে-কথা ভুলে যেতে হয়।

প্রখর গ্রীষ্মের 'নির্বাক্ নীল নির্মম মহাকাশ' দিগন্ত থেকে দিগন্তে অদৃশ্য আগুন জেলে পঞ্চতপায় স্থিরনেত্র। ওই নিরুচ্চার ঔদাসীন্যে বিশ্বপ্রকৃতি যেন আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় স্তব্ধ—উৎকণ্ঠিত। আকাশকে সে প্রতিদিনের পরিচয়ে যতখানি জেনেছে, তার চেয়ে সে অনেক বড়ো। তাই পরিচয়ের নিবিড়তার সাথে মিশে আছে অপরিচয়ের শঙ্কা।

* * *

পূর্ণকে পাই বলেই শূন্যের সাধনা সত্য। ভগবান্‌কে ভালোবাসারই অপর নাম বৈরাগ্য। **কিন্তু যদি শুধু ছেড়ে আসাই সত্য হ'ত, যদি কেবল বিমুখতাই সাধনা হ'ত—তার** দারুণ নিষ্ফলতায় মানবজীবনের সব সার্থকতা মরীচিকার মতো মিলিয়ে যেত ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে। গ্রীষ্মের প্রকৃতি যেমন বাইরের দাবদাহে অন্তরকে ফলবান্ ক'রে তোলে, তেমন এক পরমসার্থকতা খোঁজে বলেই মানুষের সব দুঃখবরণ তপস্যার মহামূল্য লাভ করে।

হয়তো তাই ঠিক—পৃথিবীর কোন দাহ, কোন দুঃখই নিষ্ফল নয়। শুধু সেই সত্যফলকে বুঝতে পারি না বলেই আমাদের মন এই বৈশাখ-মধ্যাহ্নের তপ্তহাওয়ার মতো হাহাকার ক'রে ফেরে। দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনা, উৎসব-হাহাকার—এ সবই সত্য, এরা সেই সত্যতম জীবনরুদ্রের অনন্ত ছায়ারৌদ্রলীলার ক্ষণিক আভাস। কিন্তু যখন হতাশা, বেদনা, পরাজয় একের পর এক জীবনকে বিবর্ণ মরুভূমি ক'রে তোলে, দিনের সব আলো অন্ধকারকেই গভীরতর করে, রাত্রির মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ধ্রুবতারাকে অবলুপ্ত রাখে—সব আশা নৈরাশ্যের পারে নিষ্ফল দিনগত জীবনক্ষয়ের নিঃশব্দ ক্রন্দনে আকাশবাতাস আচ্ছন্ন হয়ে আসে—মানব-চৈতন্যের সেই বিপরীতপ্রান্তে এসে সব যুক্তি, বিচার, উৎসাহ, আশা এক নিমেষে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষ, মহাযুদ্ধ, মহামারী—মানব-ইতিহাসের সেই দুর্দিনের আভাসমাত্র। সৃষ্টির সৌন্দর্যে মুগ্ধচিত্ত আমরা, ধ্বংসের বন্দনা গাইতে পারি, তাকে স্বীকার ক'রে নিতে পারি ক-জন? 'সাহসে যে দুঃখদৈন্য চায়'—এমন বিবেকানন্দ ক-জন এ পৃথিবীতে?

স্রষ্টার অনন্ত লীলায় কোথাও ধ্বংসের মরুভূমি, কোথাও সৃষ্টির শ্যামলিমা। কে জানে মায়ের খেলা? তাঁর সন্তানদের কাকে তিনি কোন্ পথে ডাক দিয়েছেন, তা কি আমরা জানি! স্বামীজীর 'পানপাত্র' (The Cup) কবিতায় ভক্তের উদ্দেশে ভগবানের আহ্বান মনে পড়ে:

দুর্গম দুঃসহ পন্থা—এই তব পথ
প্রতি পদে অবিশ্রান্ত উপল-সঙ্ঘাত
সে আমারি দান। দিয়েছি বন্ধুরে তব
স্নিগ্ধ স্বচ্ছ পথখানি সানন্দ যাত্রার;
তোমারি মতন সেও পাবে বক্ষে মোর
পরম আশ্রয়। তোমারে চলিতে হবে
এই পথ ধ'রে; এ নির্মম নিরানন্দ
নিঃসঙ্গ সাধন—আর কারো তরে নয়
এ শুধু তোমার।

বিধাতার নিজের হাতে দেওয়া এই কাঁটার মুকুট, এই দুঃখদাহের পরম সম্মান যাঁরা মাথায় ক'রে নিয়েছেন, মানবজাতির ইতিহাস সেই মহাবীরদের চরণপাতে ধন্য। আবার যাঁরা পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে চান স্নেহে প্রেমে সৌন্দর্যে করুণায়—নানক, কবীর, সুরদাস, তুলসীদাস, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্যের মতো তাঁরাও ধন্য। রুদ্রমধুরা মহাজননীর সন্তানেরা নানাপথের সাধনায় অনন্ত ইচ্ছাময়ীর অপার লীলাসমুদ্রে এসে মিশেছেন।

* * *

প্রেমিক ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি শ্যামল কোমল হয়ে ধরা দেন, তাঁর অনন্ত মাধুর্যের পারাবারে অভিস্নাত ভক্তহৃদয় কী গভীর তন্ময়তায় ডুবে যায়, তার সুন্দরতম সাক্ষ্য রয়েছে কবি বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' কাব্যের অমর শ্লোকটিতে—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধিমৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

ওই মধুরে শ্যামলে মিশে অপরূপ লীলা-কাহিনী রচিত হয়েছিল দ্বাদশ শতকের বাংলা দেশে। সে কাব্যের অন্তরে বসন্ত, তবু সূচনায় বর্ষা। গীতগোবিন্দের সূচনা-শ্লোকটি মনে করুন, 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্'—মেঘমেদুর শ্যামলিমাই তো কৃষ্ণলীলারম্ভের সার্থক পটভূমি। মাধবেন্দ্র-পুরী তাই 'মেঘদরশন মাত্র হয় অচেতন।' শ্রীমতী সেই নবীন মেঘের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে দিশাহারা।

বৈশাখের দগ্ধদিগন্তের পারে একদিন শ্যামল মেঘের পুঞ্জ পুঞ্জ করুণার ছায়া নেমে আসে। সমস্ত তৃষ্ণা-মেটানো অজস্র বর্ষণের জলধারায় প্রকৃতি নিজেকে ফিরে পায়, জীব-জগৎ আত্মস্থ হয়, মানবসমাজ ফেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস।

উমার তপস্যা বর্ণনা করেছেন কালিদাস। বৈশাখের দাবদাহের পর প্রথম বর্ষণের জলবিন্দুটি যখন উমার দেহ স্পর্শ ক'রল—সেই পরমমুহূর্তটি কবি ভোলেননি।

ওই বৃষ্টির কণায় কণায় ভরে আছে এই তপ্ত পৃথিবীর উদ্দেশে আকাশের করুণা, ভালোবাসা, আশীর্বাদ। উপনিষদের কবি যে বলেছেন, 'আকাশ যদি আনন্দময় না হ'ত, কে চাইত জীবনধারণ করতে?'—তাঁরই অনুসরণে বলা যায়, যদি বৃষ্টি না নামত আকাশ থেকে, তাহলে কেমন ক'রে আমরা বেঁচে থাকতাম, কেমন ক'রে বুঝতাম জীবনের সহস্র সংগ্রামের অন্তরালে রয়েছে ঈশ্বরের চির-নির্ঝর করুণাধারা?

যিনি ছায়ারূপে অমৃত, বর্ষারূপে শান্তি, জলধারারূপে নবজীবন—তিনিই আকাশ জুড়ে

মহামেঘরূপে আবির্ভূত। এ যুগের মহাকবি তাঁরই উদ্দেশে প্রার্থনা করেছেন :

জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।

স্বার্থে লোভে দৈন্যে কুশ্রীতায় জীবনযাপনের অভ্যস্ত গতানুগতিকতায় আমাদের হৃদয়-মন কেবলি শুকিয়ে আসে। সে শুষ্কতার আক্রমণে সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজচেতনা—সর্বত্র পিপাসিত মানবাত্মার দীর্ঘশ্বাস আজ পৃথিবীকে বাসের অযোগ্য ক'রে তুলেছে। আজ কেবলি শুনতে হয় জীবনের যন্ত্রণার আর্তস্বর ; এ জীবন যে আনন্দের পরিপূর্ণতার—সে-কথা ভুলে গিয়ে বিশুষ্কপ্রায় পঙ্কিল পল্বলে কর্দমলিপ্ত মানুষের গ্লানিময় রূপটিই বড় হয়ে উঠছে। কোথায় আছে মানব-চৈতন্যের অন্তর্নিহিত সেই অজস্র আনন্দধারা—তপ্ত বৈশাখের দীর্ঘ দিবাবসানে সহসা নেমে আসা কালবৈশাখীর মতো পৃথিবীর বুকে নেমে আসুক। ধ্বংস ও সৃষ্টি, বেদনা ও আনন্দ, মৃত্যু ও জীবন—সেই কালবৈশাখীর তাণ্ডবনৃত্যে একাকার হয়ে যাক। উন্মথিত প্রলয়ঝড়ের অবসানে অজস্র ধারাবর্ষণে মাটির বুকে নেমে আসুক আকাশের করুণা। জীবনের পটভূমিতে আবার আমরা সহজ সুস্থ সমগ্র মনুষ্যত্বকে ফিরে পাই।

জানি ঝঞ্ঝার বেশে
দিবে দেখা তুমি এসে
একদা তাপিত প্রাণে রে।

কবির চোখে কেবল কালবৈশাখীর রুদ্র-রূপেই নয়, আষাঢ়ের পরিব্যাপ্ত পটভূমিতে ধীর মেঘমন্দ্রেও তাঁর আবির্ভাব :

এসো হে এসো সজল ঘন বাদল-বরিষণে
বিপুল তব শ্যামল স্নেহে এসো হে এ জীবনে ॥
এসো হে গিরিশিখর চুমি, ছায়ায় ঘিরি কাননভূমি
গগন ছেয়ে এসো হে তুমি গভীর গরজনে ॥
ব্যথিয়া উঠে নীপের বন পুলক-ভরা ফুলে,
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কূলে কূলে।
এসো হে এসো হৃদয়-ভরা, এসো হে এসো পিপাসাহরা,
এসো হে আঁখি-শীতল-করা, ঘনায়ে এসো মনে ॥

বর্ষা-আবির্ভাবের চিত্রকল্পে ভগবৎকরুণার ব্যঞ্জনা এ গানটিতে যেমন ক'রে ফুটেছে, বাংলা কবিতার ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। বাংলা দেশের শ্যামল প্রকৃতির বুকে বর্ষা-আবির্ভাবের স্নিগ্ধ প্রসন্নতার অনুভূতি-রূপায়ণের অনন্য উদাহরণ এ গানটি যখনই মনে পড়ে, তখনই যুগযুগান্তের কবি ও ভক্তহৃদয়ের সঙ্গে বর্ষার চিরসম্বন্ধটি হৃদয়ে জেগে ওঠে।

উপনিষদের কবি বলেছেন, তিনি যাকে গ্রহণ করেন, সেই তাঁকে পায়। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।' প্রেমরূপে ভক্তিরূপে তিনিই সাধকহৃদয়ে অরুণোদয়ের পূর্বরাগ হয়ে ফোটেন। তিনি যে ভালোবেসেছেন, ভক্তহৃদয়ের ভালোবাসাই তার প্রমাণ।

এই বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চেয়েও মনে হয়, এ-কথা একান্ত সত্য। শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা বসন্ত, শরৎ হেমন্তে নানারূপে বিশ্বেশ্বরের আবির্ভাব। কিন্তু বৈশাখ-মধ্যাহ্নের তপ্ত স্মৃতি মুছে দিয়ে আষাঢ়ের নূতন মেঘের মেদুর ছায়া যখন পৃথিবীর উপর নেমে আসে, যখন চিরন্তন নির্ঝরের অনন্ত করুণাধারা দেহের অন্তরের অন্তরাত্মার সব তৃষ্ণা মিটিয়ে দিয়ে—সব ক্লান্তি মুছিয়ে দিয়ে ঝরে পড়তে থাকে, তখনই কি সবচেয়ে বেশী ক'রে মনে পড়ে না—তিনি আছেন, তিনি আমাদের গ্রহণ করেছেন।

জানি—তুমি বজ্ররূপে দগ্ধ করো, বন্যারূপে ভাসিয়ে নাও, ঝঞ্ঝারূপে উড়িয়ে দাও, তবু হে আষাঢ়, হে শ্যামল, হে রুদ্রের দক্ষিণমূর্তি—আষাঢ়ের প্রথম পুণ্যদিনে তোমার করুণাঘন আবির্ভাবই সত্য হোক—করুণাধারায় এসো।

সে মহাকরুণায় সব পিপাসার পরিনির্বাণ, সব আকাঙ্ক্ষার শান্তি।

নিত্য ও লীলা

[শ্রীরামকৃষ্ণ-উক্তির আলোকে]

'আনন্দ'

ভেদ অভেদ পারমার্থিক, সগুণ ও নির্গুণ—একই বস্তু একই কালে বা একই বস্তু ভিন্ন কালে, এবং শিব ও শক্তি অভেদ হইয়াও ভিন্ন—এরূপ হইতে পারে না। কারণ 'ব্রহ্ম অদ্বৈত—এক, যে একের দুই নাই'—শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করিয়াছেন। যখন তিনি ভেদ স্বীকার করিয়াছেন, তখন ঐ ভেদের কারণ-রূপে সামান্য অহংকার—'ভক্তের আমি' বা 'বিদ্যার আমি' বলিয়াছেন—আর এ অহংকার সাময়িক; নির্বিকল্প সমাধিতে থাকে না। যদি বা পরে দেখা যায়, সে 'আমি' এত 'পাতলা' যে তাহার মধ্য দিয়া চৈতন্যের স্ফুরণ হয়; চৈতন্য ঢাকা পড়ে না। সেই স্ফুরণের সঙ্গে যে নানা বস্তুর জ্ঞান—ঐ নানা বস্তু বাস্তবরূপে বিষয় হয় না, কেবল নানা বস্তুর আকার-মাত্রের জ্ঞান হয়। ঐ-সব বস্তুর নিজের সত্তা থাকে না, চৈতন্যের সত্তাতেই তাহাদের সত্তা।

'এ সব তিনি আছেন ব'লে সব আছে। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না; একের পিঠে অনেক শূন্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়, এককে পুঁছে ফেললে শূন্যের কোন পদার্থ থাকে না।' 'যতক্ষণ আমি-জলে সূর্যকে দেখতে হয়, আর সূর্যকে দেখবার কোন উপায় হয় না, আর যতক্ষণ প্রতিবিম্ব-সূর্য বৈ সত্যসূর্যকে দেখবার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব সূর্য ষোল আনা সত্য। সেই প্রতিবিম্ব-সূর্যই আদ্যাশক্তি।' 'এ প্রতিবিম্ব কিন্তু বস্তু নয়—ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু।'

তাহা হইলে যে প্রতিবিম্ব-সূর্য আদ্যাশক্তি, তাহা পারমার্থিক বস্তু নয়—অবস্তু। ব্রহ্ম হইতে শক্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই—ব্রহ্মের সত্তাই শক্তির সত্তা। অতএব ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, পূর্ণ জ্ঞানের পর—ইহার অর্থ এখন পাওয়া গেল। নে দ্বৈত থাকে না। শক্তিও শক্তিরূপে থাকে না। শক্তি যাহাকে (ব্রহ্ম-চৈতন্যকে) লইয়া শক্তিমতী—চিন্ময়ী, সেই ব্রহ্ম-চৈতন্যই থাকে, এবং সেই শক্তি-উপলক্ষিত ব্রহ্ম-চৈতন্য ও শুদ্ধ ব্রহ্ম-চৈতন্য অভিন্ন। সৃষ্ট্যাদি-ক্রিয়াকর্ত্রীরূপে অভিন্ন নয়—পূর্ণজ্ঞানে তাহা থাকে না। এই সিদ্ধান্ত তাঁহার উক্তি হইতে যখন পাওয়া যায়, তখন ব্রহ্মও পারমার্থিকরূপে সত্য এবং শক্তিও (সগুণ ব্রহ্মও) পারমার্থিকরূপে সত্য—এ-কথা বলা চলে না।

'যতক্ষণ নিজের 'আমি' আছে, ততক্ষণ ঐগুলিও (ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ) আছে। জ্ঞান-অসি দ্বারা কাটলে পর আর কিছুই নাই।' অতএব ভেদাভেদবাদ, 'সগুণ নির্গুণ উভয়ই সমান'-মতবাদ, শক্ত্যদ্বৈতবাদ, ক্ষর-অক্ষরবাদ, হেগেলের 'Absolute unity in variety'-বাদ আর 'সগুণ Reality একটা phase আর নির্গুণ আর একটা phase' প্রভৃতি মত শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্য অনুযায়ী মানা চলে না। এ-বিষয়ে বিস্তৃতভাবে পরে বলা হইবে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এরূপ সিদ্ধান্ত অদ্বৈতপর, এ-মতে নিত্য ও লীলার সুমীমাংসা হইবে না। এ-মত আপাততঃ মানিলেও অন্যভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির সামঞ্জস্য করিতে হইবে। 'ব্রহ্ম সত্য' বলিলে এবং এই সত্যের লক্ষণ অন্যভাবে করিলে মীমাংসার সুবিধা হইতে পারে। আমরা জ্ঞান ও বিষয়ের সত্যতা কিভাবে অনুভব করি, তাহা বিশ্লেষণ করিলে স্থির বস্তুই একমাত্র সত্য—ইহা মানা চলে না। দেখা যায়, বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গেই বস্তুর সত্তার

অনুভব হয়, তাহা নহে ; যে বস্তু কোন ক্রিয়া উৎপাদন করে এবং ঐ ক্রিয়া আপাততঃ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে বা ভবিষ্যতে তাহাতে কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার যোগ্যতা থাকে, এরূপ অনুভব করিলেই—প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা ঐ বস্তুর সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। এই ব্যাপারটি ভ্রমস্থলেও প্রযোজ্য। রজ্জুতে যখন সর্প দেখি, তখন সত্য বলিয়া বোধ হয়, এবং সেই সর্পবোধ পলায়ন-রূপ ক্রিয়ার জনকও বটে। কিন্তু আলোক লইয়া ব্যবহার-কালে সর্পকে সর্পরূপে পাওয়া যায় না বলিয়া সর্প অসত্য। অন্ধকারে রজ্জুর স্বরূপ প্রকাশ না হওয়ায় ও কোন বিশেষ কারণে সর্প প্রতিভাত হওয়ায় পলায়ন-ক্রিয়া হইয়াছিল : এই ক্রিয়ার দ্বারা সমর্থিত বলিয়া উক্ত সর্প সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছিল। আলোকের দ্বারা অন্ধকার নষ্ট হওয়ায় রজ্জুর স্বরূপ-প্রকাশ—তৎসহ সর্পের বিলয় ও ভয়-কর্মাদির বিলোপ হওয়ায় রজ্জু সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। যে জ্ঞান ব্যবহারে বা ক্রিয়ায় বাস্তব বিষয়ের সঙ্গে মিলিবে, তাহাই সত্য ও তাহার বিষয়ও সত্য। যে জ্ঞান ও বিষয় সকল ক্রিয়া উৎপাদন করে, ঐ জ্ঞান ও বিষয় সত্য। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ, কোন ক্রিয়া তাহাতে নাই, সুতরাং এরূপ বিষয় সত্য নয় —'That which acts, exists'। আদি কারণ যদি শক্তি হয়, তবে ক্রিয়াশীল বলিয়া সত্য। কিন্তু শক্তি স্বীকার করিলেই শক্তির আশ্রয়রূপে কোন স্থির দ্রব্য, আকাশ বা দেশ (space) স্বীকার করিতে হইবেই। 'শুদ্ধ' শক্তি ধারণা করা যায় না। যাহা কিছু ধারণা করি, space (দেশ)-এ ধারণা করি বলিয়া ধর্মী বা কোন পটভূমিকা (background) ব্যতীত 'শুদ্ধ' শক্তির ধারণা করিতে পারি না। গতি কি দৈশিক বা কালিক (Spatial or Temporal)? মনকে জিজ্ঞাসা করিলে তখনই উত্তর আসে—না, গতি দেশ-কাল হইতে স্বতন্ত্র। দেশ বা কালের মাধ্যমে কোন কিছু বুঝি বটে, কিন্তু ঐ বোঝা দৈশিক বা কালিক নয়। বিজ্ঞানও বর্তমানকালে এত উৎকর্ষলাভ করিয়াছে যে, গতি বুঝিতে হইলেই দ্রব্যকে অবলম্বন করিয়া গতি বুঝিতে হইবে—এ-কথা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করে না, গতি একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। পূর্বে বলা হইয়াছে, ক্রিয়ার দ্বারাই সত্য নির্ণয় করা হয়, সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া চিন্ময়ী আদ্যাশক্তির সত্তা প্রমাণ করিয়া থাকে। এই আদ্যাশক্তির অনভিব্যক্তি-অবস্থাকে ব্রহ্ম বা নিত্য অবস্থা এবং অভিব্যক্ত সৃষ্ট্যাদি-অবস্থাকে শক্তি-অবস্থা—লীলা-অবস্থা বা সগুণ অবস্থা—বলা যাইতে পারে ; উভয়ই বাস্তব। এ-মতে সুবিধা এই যে, জীবের কর্ম উপাসনা মুক্তি প্রভৃতির ও জগতের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি জগৎ সৃষ্টি করেন, জীবের সমস্ত কর্মের ফল ও তাহার মুক্তি দান প্রভৃতি করিয়া থাকেন। অদ্বৈত-মতে—নিষ্ক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্ম, জগৎকারণ প্রভৃতি বলিতে হইলেই মায়া বা অজ্ঞান একটি শক্তি স্বীকার করিতে হয়। ঐ পদার্থ স্বীকার করিলেই শুদ্ধ চৈতন্যে অশুদ্ধ অজ্ঞান থাকিলেই ব্রহ্ম শুদ্ধ হইতে পারেন না। ব্রহ্ম ও মায়া অনাদি ও ব্যাপক হইলেই ব্রহ্ম মায়া-বিহীন অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না বলিয়া চিরকালই অশুদ্ধ থাকিবেন। জীবেরও মুক্তি কোনকালে হইবে না, কারণ শুদ্ধ ব্রহ্মের ও জীবের একত্ব-জ্ঞানে মোক্ষ হওয়ায়, মায়া ব্রহ্মেতে থাকায় ব্রহ্ম শুদ্ধ কোনকালে হইবেন না। অতএব জীবের মুক্তিও হইবে না। অদ্বৈতবাদের এইরূপ নানা দোষ থাকে বলিয়া এই মতে নিত্য ও লীলার সমীচীন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়ও পূর্বমত সমর্থিত হইতেছে—জল স্থির থাকলে জল

(নিত্যাবস্থা) এবং হেললে দুললেও জল (শক্তি-বা লীলা-অবস্থা) ; সেইরূপ সৃষ্টি প্রভৃতি যখন করেন, তখন আদ্যাশক্তি ; আর উহা না করিলে স্থির থাকিলে ব্রহ্ম—যাঁর নিত্য, তাঁরই লীলা। শক্তিরই ভিন্নাবস্থা নিত্য ও লীলা—এ-মতে বলা হইয়াছে। বিচারে এ-মত শ্রীরামকৃষ্ণানুমোদিত নহে, কারণ তিনি অদ্বৈত তত্ত্ব—'যে একের দুই নাই' স্বীকার করিয়াছেন। 'বাজিকরই সত্য ও বাজি মিথ্যা', 'পরে দেখলুম তাঁর সৃষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া' ; 'ঐ প্রতিবিম্ব-সূর্যই আদ্যাশক্তি' এই সমস্ত কথা হইতে প্রমাণ হইতেছে—শক্তির সত্তা আপেক্ষিক ও নিত্যের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করিতেছেন, phase-বাদীর উত্তরে এ-সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে।

কেহ কেহ সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের ব্যাখ্যা অন্যভাবে করিয়া থাকেন : সগুণ ও নির্গুণ একই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র (different phases)। কাহারও মতে অশেষকল্যাণগুণ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম সগুণ; নিত্য, হেয়গুণবর্জিত ব্রহ্ম নির্গুণ। অন্যমতে এই সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম পরস্পর ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। একই বস্তুতে ভেদ ও অভেদ—উভয়ের সমাবেশ, ইহা অচিন্ত্য। কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন, ঈশ্বর (Absolute) এক হইয়াও বহুত্বের সূক্ষ্মাকারে আধাররূপে নিত্য অর্থাৎ এ অবস্থায় বহুত্ব অভিব্যক্ত হয় নাই এবং উক্ত ঈশ্বরের আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক বিষয়সমূহের ভিতর দিয়া নিজ পূর্ণত্বের অভিব্যক্তিই—'লীলা' বলা চলে, কিন্তু প্রাচ্য দর্শনের লীলা ঠিক ঠিক বলা চলে না, কারণ এই লীলার মধ্যে খেলাই প্রধান, তর্কপ্রণালী (Dialectic) অনুসারে অভিব্যক্তি নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকের তর্কপ্রণালীই প্রধান।

এইসব মতবাদ অনুযায়ী যে নিত্য ও লীলার ব্যাখ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিসমূহ উহা সমর্থন করে কিনা, দেখিতে হইবে। এই আলোচনার সুবিধার জন্য নিত্য ও লীলা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ বিশেষ উক্তিগুলি উদ্ধৃত করা হইতেছে। ব্যাখ্যার মুখে উক্তিগুলি বলিলে কাহারও কাহারও মতে বুঝিবার সুবিধা হয়, কিন্তু আবার অসুবিধাও হয় ; কারণ ব্যাখ্যাতা উক্তি-গুলি নিজের সুবিধামত ব্যবহার করিবেন। ঐগুলি একসঙ্গে থাকিলে পাঠক নিজ ইচ্ছামত লইয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন। এই সুবিধার জন্য উক্তিগুলি একসঙ্গে দেওয়া হইল :

মানুষের স্বধাম হচ্ছে পরব্রহ্ম। ত্রিগুণাতীত না হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না।

এক বৈ আর কিছুই নাই, সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন।......ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি—প্রথম দুটো বোধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে আর দুটো থাকে না—অভেদ, এক—যে একের দুই নাই—অদ্বৈত।

আদ্যাশক্তি মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ ক'রে রেখেছে। আবরণ গেলেই যা ছিলুম, তাই হলুম। 'আমি'ই 'তুমি', 'তুমি'ই 'আমি'।

এক বৈ দুই কিছু নাই।

বাজিকর বাজি। বাজি দেখে সব অবাক্। কিন্তু সব মিথ্যা, বাজিকরই সত্য।

ভগবতী মূর্তি—পেটের ভেতর ছেলে।—তাকে বার ক'রে আবার গিলে ফেলছে। ভেতরে যতটা যাচ্ছে, ততটা শূন্য হয়ে। আমায় দেখালে যে, সব শূন্য। যেন বলছে, লাগ্ লাগ—লাগ্ ভেলকি লাগ্।

তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মতো।

(প্রশ্নকর্তা ভবনাথকে) শ্রীরামকৃষ্ণ : ও-সব লীলা—আমিও ভাবতুম ঐ কথা, তারপর দেখলুম—সবই মায়া। তাঁর সৃষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া।

এ মায়াটি কি ? যা দেখছ, শুনছ, চিন্তা ক'রছ—সবই মায়া। (শুদ্ধ আত্মাতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতর তিন গুণ আছে। যিনি শুদ্ধ আত্মা—তাঁতে তিন গুণ রয়েছে। অথচ নির্লিপ্ত।............এই শুদ্ধ আত্মাই আমাদের স্বরূপ।

মায়াতে 'সং'কে 'অসৎ' করে—অসৎ সৎ বোধ হয়। সৎ অর্থাৎ যিনি নিত্য পরব্রহ্ম ; অসৎ সংসার অনিত্য।

তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান। 'তৎ' মানে পরমাত্মা, 'ত্বং' মানে জীবাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মা একজ্ঞান হ'লে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন। অন্তরে তিনিই আছেন। তাই বেদে বলে 'তত্ত্বমসি'। আর বাহিরেও তিনি। মায়াতে দেখাচ্ছে নানা রূপ। কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন।

অন্তরে বাহিরে দুই দেখছি—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। সচ্চিদানন্দ একটা খোল আশ্রয় ক'রে এই খোলের অন্তরে বাহিরে রয়েছেন—এইটি দেখছি। সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে আদ্যাশক্তি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করছেন।

জীবের অহঙ্কারই মায়া। মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ ক'রে রেখেছে; আর তখন জীব সৃষ্ট্যাদি সব দেখে। যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতে জীব-জগৎ।

যতক্ষণ 'আমি' আছে, ততক্ষণ ওরাও (জীব-জগৎও) আছে। জ্ঞান-অসি দ্বারা কাটলে পর আর কিছুই নাই। তখন নিজের আমি পর্যন্ত বাজিকরের বাজি হয়ে পড়ে।

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্য হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম যেভাবে সত্য, ঈশ্বর জীব জগৎ সেভাবে সত্য নহে, অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য নহে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে যখন 'আমি'র নাশ হয়, তখন জীব-জগৎ সমস্ত লোপ পায়, তখন এক, যে একের দুই নাই—নিত্য ব্রহ্ম; আর যখন 'ভক্তের আমি' তিনি রেখে দেন, তখন সাধক দেখে চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম—ঈশ্বরই সব হয়েছেন। তাঁর লীলা-আস্বাদন—'সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর', 'পূর্ণ অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করবার পর।' তাঁর উক্তি হইতে প্রাপ্ত এই অদ্বৈত-মত যে-সব মতবাদে স্বীকৃত নয়, সেই সব মতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত নিত্য ও লীলা প্রভৃতি ব্যাখ্যা সমীচীন নয়। এই সব ভিন্ন ভিন্ন মত আশ্রয় করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত নিত্য ও লীলার ব্যাখ্যা এবং নিজ মত-অনুযায়ী তাহা স্থাপন করা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় : অদ্বৈত-মতে স্বীকৃত সত্যের লক্ষণ আমরা মানিব কেন? ইহা মানিয়া সুষ্ঠুভাবে লীলার ব্যাখ্যা করা যায় না। মানা না মানা কেহ জরুরি আইন (Ordinance) জারি করিয়াও করিতে পারে না। যাহার বুদ্ধিতে যাহা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়, সে তাহাই মানিয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন বিষয়ের জ্ঞান হইলে তখনই বোধ হয়, জ্ঞানটি প্রামাণিক বা সত্য। অসত্য—পরে, ব্যবহারে বা অন্য কারণে বোধ হয়। আর একটি জিনিস আমরা দেখি যে, বস্তুমাত্রই জ্ঞানের বিষয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সৎ' বলিয়া মনে হয়। ভ্রমস্থলে অন্য উপায়ে জানা যায় যে, বস্তুটি তাহা নয়, যাহা জ্ঞানে মনে হইয়াছিল। ঘট, বৃক্ষ, পট—এই বস্তুগুলির জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে —সন্ ঘটঃ, সন্ পটঃ, সন্ বৃক্ষঃ—জ্ঞানের এই রকম আকার বোধ হয়। অর্থাৎ 'ঘট এই রকম' জ্ঞান হইলেই ঘট যে সত্য ও ঘটের জ্ঞানও সত্য, এক সঙ্গেই হয়—উহাই সংস্কৃতে 'সন্ ঘটঃ' ইত্যাদি রূপে বলা হয়। এই রকম বোধে যে 'সন্' অর্থাৎ সত্তা রহিয়াছে, উহা কি? যেমন কোন বস্তুর বোধ হইতে হইলে বস্তুটি কি? দ্রব্য কিনা? উহার গুণ কি? উহা বৃক্ষ, না পক্ষী কোন্‌জাতীয়, উহার অঙ্গের সঙ্গে উহার কি সম্বন্ধ?—এই সব জানিতে হয়, সেইরূপ এই সত্তা সম্বন্ধেও জানিতে হইলে বলিতে হইবে, উহা কি গুণ বা জাতি বা সম্বন্ধ বা দ্রব্য? উহা গুণ নহে, কারণ গুণের উপরে গুণ থাকে না—যেমন রূপের উপরে রূপ থাকে না। উহা জাতি নহে, কারণ জাতির উপরে জাতি থাকে না—যেমন ঘটত্ব-জাতি, উহার উপর দ্রব্যত্ব-জাতি থাকে না। উহা সম্বন্ধ নহে, কারণ সম্বন্ধের উপর সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু সত্তা সমস্তের উপরে থাকে—সন্ গুণঃ, সতী জাতি, সন্ সম্বন্ধঃ, সন্ ঘটঃ—এইরূপ বোধ হয়। যদি সত্তাকে দ্রব্য বলা হয়, তাহা হইলে দ্রব্যরূপ পদার্থ দ্রব্যের জাতি দ্রব্যত্বে, দ্রব্যের গুণে (রূপে) বা দ্রব্যের সম্বন্ধে (সমবায়ে) থাকে না। যথা জাতি (দ্রব্যত্বে) দ্রব্যবতী জাতি, গুণঃ (রূপ) দ্রব্যবান্, সমবায়ঃ (সম্বন্ধঃ) দ্রব্যবান্—

এ রকম বোধ হয় না। কিন্তু সত্তাবৎ দ্রব্যম্ সত্তাবতী জাতি, সত্তাবান্ সম্বন্ধঃ—এইরূপ বোধ হয়। সুতরাং সত্তা—দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি হইতে একটি স্বতন্ত্র বস্তু স্বীকার করিতে হইবে। এ সত্তাটি পৃথিবীর যাবৎ পদার্থের উপরে আছে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে এমন জিনিস বলিতে পারা যায় না, যাহাতে সত্তা নাই। সুতরাং সত্তা ব্যাপক—ত্রিকালে বর্তমান। বাক্য-মনের অতীত নিগুর্ণ ব্রহ্ম, তাহাকে যদি শব্দদ্বারা কোনরূপে প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে 'অস্তি' এই শব্দ-মাত্র প্রয়োগ করিতে হয়। ব্রহ্মবোধক একমাত্র শব্দ এই 'অস্তি'। ব্রহ্ম যেমন উপাধি দ্বারা সীমিত নয়, এই সত্তাও সেইরূপ কোন বস্তুর দ্বারা সীমিত নয়। ঘট পট নষ্ট হইবে, কিন্তু সত্তা স্বরূপতঃ থাকিবেই এবং প্রত্যক্ষতঃ বিষয়ান্তরে তো আছেই। এখন আমরা কাল দ্বারা সীমিত বস্তুকে 'সৎ' বলি না, কারণ উহা সব কালে থাকে না। যাহা তিন কালে থাকে, কোন কালে বাধিত হয় না, তাহাই সত্য। এই সত্য বিষয়ে কোন মতবাদের 'লেবেল' নাই। তিনকালে থাকেন বলিয়া ব্রহ্মকে শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ সত্য বলিয়াছেন। প্রশ্ন: ব্রহ্ম না হয় এরূপ সত্য হলেন, কিন্তু লীলাও কি ঐ রকম সত্য? শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হইতে পাওয়া যায়—ব্রহ্ম যেভাবে সত্য, লীলা সেভাবে সত্য নয়। ব্রহ্ম-উপলব্ধিতে লীলা বা সৃষ্ট্যাদির অনুভব থাকে না। আর তাঁরই লীলা বোধ হয় ব্রহ্মানুভূতির পর, যে ভক্তের মধ্যে ঈশ্বর লোক-কল্যাণের জন্য 'ভক্তের আমি' বা বিদ্যার 'আমি' রাখিয়া দেন। সাধারণ জীবের অজ্ঞানে যেমন 'আমি' থাকে, এই 'আমি' ঐরূপ নয়, এ পাতলা 'আমি'—নামমাত্র 'আমি'—রেখা 'আমি', ইহার দরুন ঈশ্বরই জীব-জগৎ সব হয়েছেন বোধ হয়। তবে একটি কথা আছে—পূর্বে যে সত্যের কথা হয়েছে; যাহা কিছু কার্য করে, তাহাই সত্য—'That which acts, exists'—এটা খুব মোটা কথা। কোন ক্রিয়া করিবার পূর্বে বস্তুর জ্ঞানের সহিত উহার সত্যের উপলব্ধি হয়, পরে সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের বা বস্তু-বিষয়ের প্রমাণ অপ্রমাণ নির্ধারিত হয়। ক্রিয়ার দ্বারা সত্য-নির্ণয় যদি হয়, তাহা হইলে যে ক্রিয়ার দ্বারা সত্য নির্ণীত হয়, সেই ক্রিয়াটিরও সত্যতা-নির্ণয়ের জন্য পুনরায় আর একটি পরবর্তী ক্রিয়ার প্রয়োজন হইবে, এবং ঐরূপ পরবর্তী ক্রিয়াটির সত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য আর একটি পরবর্তী ক্রিয়ার প্রয়োজন হইবে—এইরূপ পরম্পরায় চলিলে 'অনবস্থা দোষ' হইবে, সুতরাং এই দোষ-নিবারণের জন্য বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানের ও বস্তুর সত্যতা স্ফুরণ হয়, মানিয়া লইতেই হইবে। অতএব ক্রিয়ার দ্বারা সত্য-নির্ণয়রূপ মতবাদ ত্যাগ করিয়া যে মত পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রসঙ্গতঃ সগুণ ও নিগুর্ণ—Different phases of the same Reality—এই মতবাদ পর্যালোচনা করা যাউক। ব্যষ্টি-বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি (Stand-point)—দৈশিক, কালিক প্রভৃতির দিক্ হইতে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু অনন্ত বস্তুর কোনও দেশ- বা কাল-গত ভেদ না থাকায় উহার ভিন্ন ভিন্ন stand-point হওয়া সম্ভব নয়। কারণ অনন্ত বস্তুর কোন সীমা হয় না—সীমা থাকিলে তিনি অনন্ত হইবেন না। আর এক উপায়ে Infinite-এ (অনন্তে) ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা (phase) হইতে পারে—সেটা মানসিক দিক্ হইতে। মানুষ নিজের মনের গঠন অনুযায়ী বাস্তব বস্তু (Reality)-কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণা করে। কিন্তু এখানে একটি কথা উঠে যে, মানসিক ধারণার অনুযায়ী

কি বাস্তব বস্তুর (Reality)-র স্বরূপ সত্তা নির্ভর করে?—কারণ দেখা যায়, মনের এক অবস্থায় একটি বস্তুকে এক রকম বোধ হইল, পরবর্তী অবস্থায় সেই বস্তুকে ভিন্ন ভাবে বোধ হইলে পূর্ববর্তী বস্তুসম্বন্ধীয় জ্ঞানটি ভুল বা সন্দিগ্ধ বলিয়া মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি আপত্তিও উঠে—মানসিক অবস্থার অনুযায়ী বাস্তব বস্তু (Reality) ভিন্ন যদি বলা যায়, তাহা হইলে বাস্তব বস্তু (Reality) সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান কোন ক্রমেই হইবে না—যেমন লাল কাঁচের বা নীল কাঁচের ভিতর দিয়া বস্তু দেখিলে বস্তু লাল বা নীল বোধ হয়, কাঁচের রঙ অনুযায়ী কিন্তু স্বরূপতঃ যখন বস্তুর বোধ হয়, তখন উভয় বোধ (লাল বা নীল) হইতে উহা ভিন্ন বলিয়াই শুধু বোধ হয় না, বরং উভয় বোধ ঠিক নয়, এরূপ হইয়া থাকে। আরও এক কথা এই যে, পূর্ব জ্ঞানে বস্তুকে সত্য বলিয়া ধারণার পর এই পূর্বকালীন বস্তু হইতে পরজ্ঞানে বস্তুকে ভিন্নরূপে সত্য বলিয়া দেখিলে—হয় সন্দেহ হইবে—না হয় উভয়ের মধ্যে একটি জ্ঞান বাধিত বা মিথ্যা হইবে বা কোনও জ্ঞানই সত্য বলিয়া নির্ধারিত হইবে না। অজ্ঞানাবস্থায় জগৎকে এক-রকম বোধ হয়, কিন্তু যখন বিজ্ঞান-শাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান হয়, তখন পূর্ববর্তী জাগতিক জ্ঞান পরবর্তী বিজ্ঞান-শাস্ত্রের জ্ঞানের মতো সত্য হয় না। Phase-বাদীকে এ-সব ত্রুটির সমাধান করিতে হইবে।

Reality-র ভিন্ন ভিন্ন phase-বাদী এ-কথাও বলিতে পারেন যে, ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধে রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী ভাব পোষণ করে। উহা পূর্বতন সিদ্ধ ভক্তের ভাব ও আচরণের দ্বারা পুষ্ট হইয়া যখন অনুরাগবশতঃ ঐ ভাব ঘনীভূত হয়, তখন সেই শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবযুক্ত অন্তঃকরণে—সেই ভাব অনুযায়ী শ্রীভগবানের ভাবঘন সাকার মূর্তির দর্শন হয়। এই প্রকারে একই ভগবান্ একই ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুযায়ী অথবা ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাব অনুযায়ী শ্রীভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে তাঁহাকে বা তাঁহাদিগকে দেখা দিয়া থাকেন। আবার কখনও ভক্ত ভগবানের ভাবাতীত অবস্থা জানিবার আকাঙ্ক্ষা করিলে সে আকাঙ্ক্ষাও ঈশ্বর পূরণ করিয়া থাকেন।

পূর্বপক্ষের এইরূপ সাকার নিরাকার অনুভূতির কথা স্বীকার করিয়া লইলেও ভক্তের অনুভূতি অনুযায়ী ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ-সম্বন্ধে আপত্তি থাকিয়াই গেল। যখন ভক্ত ভাবাতীত অবস্থাতে অখণ্ড চৈতন্যের সহিত নিজেকে অভিন্নরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, তখন কি ভগবানের সগুণ মূর্তিগুলিও (ভাবাতীতের মতো) সত্য বলিয়া অনুভব করেন? শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন, ‘ঈশ্বরীয় রূপটুপ সব লয় পায়’, ‘বেদান্ত-বিচারের কাছে রূপটুপ উড়ে যায়। সেই বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত—ব্রহ্ম সত্য আর নামরূপযুক্ত যাবৎ মিথ্যা।’ দ্বৈতের সমূলে বিলোপ। আবার যখন ভক্ত সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হন, তখন ভক্তের ‘আমি’ ঈশ্বর রাখিয়া দেন বলিয়া ভক্ত ‘চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম’ এইরূপ অনুভব করেন। ‘সাকার রূপ কি রকম জানো? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড়ভুড়ি ওঠে সেইরূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটি রূপ উঠছে দেখা যায়।’ ‘দেখিয়ে দিলেন যে—মা-ই সব হয়েছেন—দেখিয়ে দিলেন প্রতিমা চিন্ময়, বেদী চিন্ময়, কোশাকুশী চিন্ময়, চৌকাঠ চিন্ময়, মার্বেলের পাথর সব চিন্ময়। ঘরের ভেতর দেখি, সব যেন র’সে রয়েছে—সচ্চিদানন্দ রস।’ এইরূপ চিন্ময় শ্যাম অনুভবে চৈতন্য সত্তা প্রধানরূপে অনুভূত হন; মন্দির, কোশাকুশী অপ্রধানরূপে—কেবল আকার-মাত্ররূপে। ‘যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতেই

জীব-জগৎ।' 'লীলারূপ ভেঙে গেলেও নিত্য আছেই—জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল, হেলা-দোলা থেমে গেলেও (লীলা থেমে গেলেও) সেই জল।' 'যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতেই জীব-জগৎ। তবে যদি তিনি 'আমি' একবার মুছে দেন, তখন যে কি হয়, মুখে বলা না।' মন্দির, কোশাকুশী—সব চিন্ময়; এখানে মন্দির, কোশাকুশী আকারমাত্র—অপ্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ভাবের কথা নিজেই বলিতেছেন—'হরগৌরী-ভাবে কতদিন ছিলাম—আবার কতদিন রাধাকৃষ্ণের ভাবে—কখন সীতা-রামের ভাবে···তবেই লীলাই শেষ নয়। এই-সব ভাবের পর বললুম—মা এই-সবে বিচ্ছেদ আছে; যার বিচ্ছেদ নেই, এমন অবস্থা ক'রে দাও—তাই কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এইভাবে রইলুম—ঠাকুরদের ছবি ঘর থেকে বার ক'রে দিলুম—তাঁকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম।' এইখানে 'লীলাই শেষ নয়'—'এই সব লীলা! আমিও ভাবতুম ঐ কথা, তারপরে দেখলুম সবই মায়া। তাঁর সৃষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া'। 'বাজিকরই সত্য, বাজি মিথ্যা।' 'এ-সবে বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা ক'রে দাও। তাই কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—এইভাবে রইলুম।'

এই সমস্ত কথাগুলি আলোচনা করিলে বেশ বোঝা যায়, ভাবাবস্থায় বিচ্ছেদ আছে, ভেদ আছে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ অবস্থায় কোন ভেদ নাই, সুতরাং অভেদ যেভাবে সত্য, ভেদ সে-ভাবে সত্য নয়, অভেদকে অবলম্বন করিয়াই ভেদ, ভেদের নিজস্ব সত্তা নাই। কিন্তু ভেদকে অবলম্বন করিয়া অভেদ থাকে না। 'আমি যখন তিনি (ঈশ্বর) মুছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে—মুখে বলা যায় না।'—'তখন এই অখণ্ড অনুভূতি। যখন ভক্তের 'আমি' ঈশ্বর রেখে দেন, তখন ভাবময় মূর্তির অনুভব। যতক্ষণ আমি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে।' এইরূপ সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন-বাক্য ও ভাবঘনমূর্তির অনুভব-বাক্য হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, সগুণ এবং নির্গুণ সমানভাবে সত্য নহে। 'ভক্তি-হিমে সচ্চিদানন্দ সাগরে জমাটবাঁধা মূর্তি জ্ঞানসূর্য উঠলে সব গলে যায়'—এই কথা হইতেও সগুণ সাকার মূর্তির আপেক্ষিক সত্যতা বুঝা যাইতেছে। 'লীলারূপ ভেঙে গেলেও নিত্য আছেই। জল জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল, হেলা-দোলা থেমে গেলেও সেই জল।' যদি সগুণ অনুভূতিতে পূর্বানুভূত ব্রহ্মৈকাত্মজ্ঞান আপেক্ষিক হইত, তাহা হইলে সগুণ যেমন সত্য, নির্গুণও তেমনই সত্য বলা যাইতে পারিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যের (নির্গুণের) সম্বন্ধে বলিয়াছেন: 'এক—যে একের দুই নাই—অদ্বৈতম্। এক বৈ আর কিছু নাই। সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে, আদ্যাশক্তিরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন।'

'ব্রহ্মজ্ঞানে রূপটুপ উড়ে যায়' বলায় এবং সগুণ অনুভবের সময় ব্রহ্ম সত্তা লুপ্ত হয়—এ-ভাবের কথা না বলায় এবং সগুণ অনুভব চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম প্রভৃতিতে চৈতন্যসত্তা (নিত্য সত্তা) প্রকাশিত থাকে বলিয়া সগুণ ও নির্গুণ একই Reality'র ভিন্ন ভিন্ন phase মাত্র হইয়াও সমান সত্য—এই মতবাদ যে যুক্তিযুক্ত নয়, তাহা প্রমাণিত হইল।

পুনশ্চ, এইরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে—উক্ত phaseগুলি ব্রহ্মের স্বরূপ কিনা বা সাধকের মনের অবস্থা অনুযায়ী ব্রহ্মসম্বন্ধে নানা রকমের ধারণা হইতে এই phaseগুলির উদ্ভব কিনা? যদি এই phaseগুলি Reality'র বাস্তব স্বরূপ হয়,

তাহা হইলে এই phase বা অবস্থাগুলির নাশ হইবে কিনা? এই phaseগুলির নাশ যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে এই phaseগুলি যখন ঈশ্বরের স্বরূপ, তখন এই phaseগুলির নাশ স্বীকার করিলে ঈশ্বরের নাশ স্বীকার করা হইবে। পুনশ্চ, ভক্ত ঈশ্বর দর্শন করিলে ঈশ্বরের স্বরূপভূত সব phaseগুলির দর্শন করিবেই। যেমন অগ্নিকে দর্শন করিলে অগ্নির জ্যোতিঃ ও দাহিকা-শক্তির অনুভব করিবেই, কিন্তু phase-বাদীর মতে তা করে না। আর যদি ঈশ্বরের স্বরূপ-ভূত সবগুলি phaseএর অনুভব না হয়, তাহা হইলে সবগুলির অনুভব কিভাবে হইবে? একটি অনুভবের নাশের পর আরেকটি অনুভব হইবে? অথবা একটি অনুভবের পর আরেকটির অনুভব ক্রমিকভাবে স্বীকার করিতে হইবে? Phase-গুলির ক্রম স্বীকার তখনই করা যায়, যখন উহাদের দেশগত ও কালগত উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় স্বীকার করা হয়। নিত্য Phase বলা যায় না, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাতীত অবস্থায় সগুণ ভাবের লয় স্বীকার করিয়াছেন। দেশগত ও কালগত বস্তুমাত্রই অনিত্য। সুতরাং phase-গুলি ঐরূপে অনিত্য হইলে নিত্যের মতো সত্য নয়। এখন phase-বাদী এ-কথাও বলিতে পারেন যে, সগুণ ও নির্গুণ অবস্থা—ঈশ্বরের স্বরূপ—মানিলে যখন নানা রকম আপত্তি উঠিতেছে, তখন ভক্ত নিজ ভাব অনুযায়ী এই সগুণ ও ও নির্গুণ ভাব ঈশ্বরে আরোপ করিয়া থাকে—এই কথা বলিব। Phase-বাদী ঈশ্বরের সগুণ এবং নির্গুণ অবস্থা ভক্তের ভাবানুযায়ী ঈশ্বরে আরোপিত মানিলে উহারা আপেক্ষিক বা মায়িক হইয়া যাইবে। কারণ রজ্জুতে সর্প আরোপিত হইলে সর্প মায়িক হয়। ভক্ত নিজ ভাব অনুযায়ী ঈশ্বরে সগুণ ও নির্গুণ ভাব আরোপ করিলে উক্ত ভাবদ্বয় মায়িক হইবে। সুতরাং phase-বাদীকে ফলতঃ অদ্বৈতমত স্বীকার করিতে হইবে। আর phaseগুলি যেমন পূর্বে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাই যদি পুনরায় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—এই phase-গুলির নাশ হয় কিনা? যদি নাশ না হয়, তাহা হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি ও উপদেশের বিরোধী কথা বলা হইবে। যথা, 'প্রতিমা চিন্ময়, বেদী চিন্ময়······সব যেন র'সে রয়েছে—সচ্চিদানন্দ রসে।······তবে যদি তিনি 'আমি' একবারে মুছে দেন, তখন যে কি হয় মুখে বলা যায় না। সচ্চিদানন্দ-সাগর কিরূপ? যেন অনন্ত সাগর, উর্ধ্বে নীচে, ডাইনে বামে, জলে জল। কারণ সলিল। জল স্থির। কার্য হ'ল তরঙ্গ—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়।'

'ও সব লীলা—আমিও ভাবতুম ঐ কথা। তারপর দেখলুম সবই মায়া—তাঁর সৃষ্টিও মায়া, তাঁর সংহারও মায়া।' 'বাজিকরই সত্য, তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মতো।'

'সে দেখে যে, মায়া জীব জগৎ আছে, অথচ নেই······জ্ঞান-অসি দিয়ে কাটলে পর আর কিছুই নাই। তখন নিজের আমি পর্যন্ত বাজিকরের বাজি হয়ে যায়।'

আর যদি বলো—সগুণ ভাবের বা লীলার নাশ হয়, কেবল নিত্য বা নির্গুণ ভাবের নাশ হয় না, তাহা হইলে নিত্যে বা অদ্বৈতভূমিতে সগুণের বা লীলার অনুভব হয় না। লীলার অনুভব তাহা হইলে ব্রহ্ম-জ্ঞানের পর যাঁহাদের 'আমি' থাকে, তাঁহাদের হয় বলিতে হইবে—জ্ঞানের পর এই 'আমি'-রূপ উপাধিবশতঃ ভেদবুদ্ধি এবং এই ভেদবুদ্ধি থাকায় লীলা-দর্শন। জ্ঞানে উপাধির নাশ, **উপাধির নাশে ভেদ-বুদ্ধির নাশ,** ভেদবুদ্ধির নাশে লীলা-নাশ। সেই একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা।

লীলারূপ ভেঙে গেলেও নিত্য আছেই। জল স্থির (নিত্য) থাকলেও জল, হেললে দুললেও (লীলাতে) জল, হেলা-দোলা (লীলা) থেমে গেলেও সেই জল (নিত্য)।' এখন দেখা গেল : Phase নির্গুণ সত্য, Phase সগুণ ও উহার মত সত্য—শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হইতে প্রমাণ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নিত্যও সত্য, লীলাও সত্য বলিতেছেন, আমাদের দৃষ্টি তাঁহার একটি কথার উপর বিশেষভাবে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। পূর্ণজ্ঞানের পর ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ ও সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর এই লীলা-দর্শন। জীবাবস্থায় ব্যবহার-জগতে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ হয় না—অনুমানের দ্বারা বুঝা যায়—জীব-ব্রহ্মের একত্ব-বুদ্ধির পর মন ব্যুত্থিত হইলে ঐ চৈতন্য নানা বস্তুর মধ্যে সাক্ষাৎ অনুভব হয়; তখন জ্ঞানী দেখেন সব চিন্ময়, চৈতন্যরসে সব র'সে রয়েছে। তাহা হইলে সকল জ্ঞানীর এই অবস্থা হয় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন—না, জীবের জ্ঞান হয়; এই বিজ্ঞানীর অবস্থায় লীলা-দর্শন হয় না; একমাত্র ঈশ্বরাবতার বা তাঁহার অংশের হয়; তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বর 'ভক্তের আমি' বা 'বিদ্যার আমি' রাখিয়া দেন লোককল্যাণের জন্য বা রসাস্বাদনের জন্য। বিজ্ঞানী অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'পাতলা আমি'র সহায়ে লীলাস্বাদন করেন। যে মতে জীবজগৎবিশিষ্ট চৈতন্যই একমাত্র নিত্য বস্তুরূপে স্বীকৃত, জীব-ব্রহ্মের একত্ব অনুগত নয়, যাঁহাদের ভেদ-বিশিষ্ট অভেদ ব্যতীত তত্ত্ব নাই, তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্য ও লীলা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। সিঁড়ি ও ছাদের দৃষ্টান্ত উক্ত ভাবই প্রকাশ করে, অন্য ভাব নহে। জ্ঞানী যখন 'নেতি, নেতি' বিচার করেন, তখন সিঁড়ি ছাদ নয়—এই রকম বিচার করিতে করিতে ছাদে পৌঁছিয়া শেষে দেখেন, যে-ইট, চুন, সুরকিতে ছাদ, সেই ইট, চুন, সুরকিতে সিঁড়ি। যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতেই জীব-জগৎ। সেইরূপ জ্ঞানী পৃথিবীর বস্তুকে ত্যাগ করিতে করিতে যখন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, তখন দেখেন, যে-সব বস্তু ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মই সেই সব বস্তু—এই জীব-জগৎ সব হইয়াছেন;—জীব-জগৎ মায়ায় দেখেন, তাহার সত্তা নাই। 'অন্তরে তিনিই আছেন—তাই বেদে বলে 'তত্ত্বমসি' (সেই তুমি) আর বাহিরেও তিনি; **মায়াতে দেখাচ্ছে নানারূপ—কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন।**' বিজ্ঞানী মনের লয়ে সমাধিতে ব্রহ্মানুভব ও 'ভক্তের আমি' সাহায্যে ভগবানের লীলা আস্বাদন করিয়া থাকেন। কখনও সমাধিতে স্বরূপতঃ চৈতন্য প্রত্যক্ষ, আবার সামান্য আড়ালের ভিতর দিয়া তাঁহারই আর এক রকম আস্বাদন। বাহিরে কেবল চামড়া ঢাকা অখণ্ড। অন্তরে বাহিরে এক ব্রহ্মেরই অনুভব, কিছু খোয়াইতে হইল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতেছেন : মন্দিরে কোশাকুশী বেদী, প্রতিমা, মারবেল পাথর সব চিন্ময়—সব বস্তু যেন চৈতন্যরসে র'সে রয়েছে। যেমন বর্ষার বৃষ্টিতে সব বস্তু ভিজে থাকে; যেমন মোমের বাড়ি, গাছ, ফুল ইত্যাদি। সব মোম, কিন্তু আকার গাছ, ফুল, বাড়ি প্রভৃতি। তেমনি মন্দির, কোশাকুশী প্রভৃতি আকারমাত্র, চৈতন্যই একমাত্র রহিয়াছেন। 'আমি'-রূপ পর্দার মধ্য দিয়ে চৈতন্যকে নানা নামরূপে দেখিতেছেন। এই চৈতন্যকে ভক্তি-ভক্তের ভাবে রঞ্জিত, শুদ্ধ মনে শুদ্ধ রুচি অনুযায়ী, শুদ্ধ ভাবগুলি যথা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, সন্তান প্রভৃতির মধ্যে সংস্কারবশতঃ কোন একটি প্রবল হইলে সেই সাধককে, ঈশ্বর ভক্তের ভাব অনুযায়ী চিন্ময়রূপে তাঁহাকে দর্শন দেন এবং কখন কখন মানবরূপ

ধারণ করিয়া প্রেমিক ভক্তের সঙ্গে নানাভাবে হাস্য-পরিহাসাদি ক্রীড়া করিয়া থাকেন—সেজন্য ভক্ত কখন বিরহে ক্রন্দন, আনন্দে হাস্য ও নৃত্য করিয়া থাকেন—সর্ব অবস্থাতেই 'লোকবাহ্য'।

এইরূপে নির্গুণ ও সগুণ উভয়রূপে ঈশ্বর-কোটি সচ্চিদানন্দকে অনুভব করিয়া থাকেন। জীবের এরূপ হয় না; তাঁহাকে লইয়া খেলা হয় না। বিজ্ঞানীর নিত্য ও লীলা দুই-ই প্রত্যক্ষ হয়। ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া, আলিঙ্গন, আলাপ প্রভৃতি জাগতিক ব্যবহারের মতো প্রতীয়মান হইলেও উহা জাগতিক নয়; উহা দৈব, অমৃতময়। সেখানে আসক্তি নাই, দুঃখ নাই, মৃত্যু নাই—আছে মাত্র প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের অনন্ত প্রেমসাগরে অনাবিল লীলা। কখন চিৎসমুদ্রে নুনের পুতুলের মতো বিলয় হইয়া একত্বানুভূতি, কখন ভক্তি-ভক্তের ভাবে আনন্দ-সমুদ্র ঘনীভূত হইয়া অনির্বচনীয় মাধুর্য, লালিত্য, কারুণ্য, সৌন্দর্যময় আনন্দঘন মূর্তি-দর্শন—কখন সখ্য-ভাবে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন, কখনও সন্তানভাবে চিন্ময়ীর বক্ষ আশ্রয়—এইরূপ নব নব ভাবে প্রেমিক-প্রেমাস্পদের লীলা-আস্বাদন—ইহাকেই বলে 'নিত্য থেকে লীলা আবার লীলা থেকে নিত্যে অবস্থান'। কোন কিছু খোয়াইতে হইল না, ওজন কম পড়িল না,—অন্তর ও বাহিরে এক বস্তু লইয়া আস্বাদন। ইহাই অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তি-ভক্তের ভাব, সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর লীলা-আস্বাদন। ভাবঘন মূর্তি নব অবতারে নব লীলায় নব ভাব—অপূর্ব—কেবল চিন্ময় রসাস্বাদন—বিচার দূরে অন্তর্হিত, কেবল বিমল আনন্দ আস্বাদক ও আস্বাদ্য। রসাস্বাদন করিতে চাও তো এই অমিয়-সাগরে ডুব দাও!

তোমার করুণা

শ্রীশান্তশীল দাশ

কত করুণা যে পাই হে তোমার অকারণ অবারণ,
তবু সংশয় কেন জাগে মনে, কেন ভীত হয় মন!
তুমি যে সতত রয়েছ আমারে
জননীর মতো ঘিরে চারিধারে;
যখনি আঘাত আসে, সে-বেদনা—তুমি যে কর গ্রহণ।

আমার সকল আঁধার ঘুচায়ে তুলে ধরো তুমি আলো,
দূরে সরে যায় সকল বেদনা, মুছে যায় যত কালো।
আমার ভুবনে জাগে কত গান,—
সে তোমার দয়া, সে তোমার দান;
তুমি দাও, তুমি দিতে ভালবাসো,—ভ'রে ওঠে দু-নয়ন।

ধর্ম ও রাজনীতি *

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন

যে যুগে আমরা বর্তমানে রয়েছি, সে যুগে বিজ্ঞান ও অর্থনীতি-ই বড়ো কথা। বিশ্বাসে নয়, বিচার ক'রে আমরা জড়বাদের কাঠামোতে জীবনের সকল সমস্যা সমাধান করার প্রয়াস ক'রে চলেছি। এ-যুগে ধর্মকে টেনে আনা মানে ঐতিহ্যবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া—অতীতপ্রীতির আতিশয্যে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়া। এই যে প্রগতির পথে আমাদের জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, এই যে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে এবং রাষ্ট্রগতভাবে উত্তেজনাময় প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া, এর মাঝে আবার ঝাপসা বা ছেঁদো ধর্মের কথা কেন? বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ আজ অমিততেজা। যে দেশ যত বেশি বিজ্ঞানের অবিষ্কার কাজে লাগাতে পেরেছে, সে দেশ তত বেশি উন্নত হয়ে উঠেছে। বসুন্ধরা চিরদিনই বীরভোগ্যা, কিন্তু এ-যুগে বীরত্বের সংজ্ঞা বদলেছে, বীরত্বের চাবিকাঠি আজ আর বীর্যে বা চরিত্রে নয়, জড়বাদের অফুরন্ত শক্তির প্রয়োগ-কৌশলে আজ তা নিহিত।

এ-যুগে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রের নীতিতে বা কাঠামোতে তাই ধর্ম অবান্তর হয়ে পড়েছে। ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা বা ঔদাসীন্য আধুনিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, যদিও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে বা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম আজও রয়েছে। কিন্তু অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদে বা সাম্যবাদে ধর্ম সম্পূর্ণ লুপ্ত। কেননা অতীতে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে এবং শোষণাত্মক রাজনীতিতে ধর্মের দান বা দায়িত্ব কম ছিল না। ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে এ কথাটা প্রকট হয়ে পড়েছে।

শুধু তাই বা কেন, যদি আমরা মধ্যযুগের ইতিহাসের ধারা নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করি, তাহলে এ সত্য সাদাচোখেও ধরা পড়বে। মধ্যযুগে ইওরোপ ছিল ক্রিশ্চেন-ডম্ বা খৃষ্টান জগৎ। রোমের পোপ তখন শক্তি ও মর্যাদায় রাজার রাজা, সম্রাটের উপরে সম্রাট্। তৎকালীন ইওরোপীয় মানুষদের অন্ধ বিশ্বাস ও ধর্মভীরুতাকে অবলম্বন করেই খৃষ্টান জগতের প্রধান ধর্মগুরু পোপ এত শক্তিশালী হয়েছিলেন। কিন্তু এ বিশ্বাসে ফাটল ধরেছিল মধ্যযুগের শেষ ভাগে। ইওরোপ বিভক্ত হয়ে প'ড়ল রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট—এই দুই ধর্মমতে। কী হানাহানি, কত নিষ্ঠুর রক্তপাত শুরু হ'ল। নরমেধ-যজ্ঞের ধূমে ইওরোপের রাজনৈতিক আকাশ কালো হয়ে উঠল। এর পরিণতি ত্রিশবৎসরব্যাপী যুদ্ধে, সমগ্র জার্মানি হ'ল বিধ্বস্ত। এবং এ-সবই ধর্মকে কেন্দ্র ক'রে। তারপর এল ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধি। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি ক'রে ইওরোপ তখন জাতিতে জাতিতে বিভক্ত হচ্ছে, বিশ্বাসের বদলে এসেছে বিচার। খৃষ্টধর্ম রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেল। শুরু হ'ল এ-যুগের যাত্রা, যখন রাজনীতির প্রধান অঙ্গ কূটনীতি, যখন জাগতিক প্রয়োজন সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন।

আমাদের বর্তমান ভারতও এ-বিষয়ে পিছিয়ে নেই। ভারত আজ ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রবাদী দেশ। ইংরেজের হাত থেকে মুক্ত হ'তে গিয়ে যে-জাতীয় আন্দোলনে ও সংঘর্ষে ভারতবর্ষ সর্বস্ব পণ ক'রে ঝাপিয়ে পড়েছিল, তার স্তরে স্তরে

* বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলনে (৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩) প্রদত্ত ভাষণের মর্মানুবাদ।

রয়েছে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কলঙ্কিত কুৎসিত কাহিনী। এরই ফলে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হ'ল—ভারত ও পাকিস্তান। ভারতের রাষ্ট্র-নায়কগণ আজ শিল্পোন্নত জড়বাদী পশ্চিমের যাত্রাপথেই পথিক। ভারত আজ জাগতিক সমৃদ্ধি- ও শক্তি-লাভের সাধনায় নিমগ্ন। ধর্মকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে রাষ্ট্রনীতি থেকে। অপর দিকে পাকিস্তান বলছে, সে ইসলামকে কখনও ছাড়বে না রাজনীতির গতিবিধি-নিয়ন্ত্রণে, তার গণতন্ত্রের আদর্শ ইসলামের চৌহদ্দিকে কখনও ছাপিয়ে উঠবে না।

ধর্ম যদি হয় একটি বিশিষ্ট ধর্মমত মাত্র, ধর্ম যদি গোঁড়ামি বা ধর্মান্ধতায় পর্যবসিত হয়, ধর্ম যদি নিয়ে আসে সাম্প্রদায়িকতা, তবে নিঃসন্দেহে ব'লব আধুনিক উন্নত আলোকদীপ্ত রাষ্ট্রনীতিতে তার কোন স্থান থাকতে পারে না। ধর্মের নামে বা আড়ালে যদি আমরা দৈনন্দিন সমস্যা-গুলিকে এড়িয়ে যাই, যদি জীবনের দায়-দায়িত্বকে অস্বীকার করি ধর্মের বুলি আউড়িয়ে, ধর্ম যদি আমাদের পলায়নী মনোবৃত্তির বা কাপুরুষতার সহায়ক হয়, তবে নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা ক'রব, এমন ধর্মকে বাদ দিয়ে আধুনিক রাজনীতি সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু এ 'যদি'র জবাবে আর একটি জিজ্ঞাসা জাগে। সত্যিকার ধর্ম কি ওই 'যদি'র মধ্যেই আছে? এমন ধর্ম কি নেই, যা সকল ধর্মমতকে সকল সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন করতে পারে এবং সকল ভেদবিভেদের ঊর্ধ্বে থেকে সর্বজনীন মানবধর্মে পরিণত হ'তে পারে? এমন ধর্ম কি নেই, যার কাছে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা ধর্মহীনতার নামান্তর মাত্র? স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে বিখ্যাত ধর্ম-মহাসম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি আর তার আনুষঙ্গিক ধর্মান্ধতা এই মনোহর পৃথিবীকে বহুকাল রাহুগ্রস্ত ক'রে রেখেছে, নেমেছে আঁধার, চলেছে কত সংঘর্ষ, কত নিষ্ঠুর রক্তপাতে ধরণীর ধূলি সিক্ত হয়েছে, মানব-সভ্যতা ডুবে মরেছে সেই রক্তগঙ্গায়, হতাশায় ভরে গেছে মানব-জাতির চিত্ত।' সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপথের মহান্ পথিক, বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ কম্বুকণ্ঠে আহ্বান জানিয়েছেন অমৃতের সন্তান সমগ্র মানব-জাতিকে, শুনিয়েছেন জাগরণের বাণী, ধর্মের বাণী সবার কানে কানে: উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। এ কোন্ লক্ষ্য পথে চলবার আহ্বান জানাচ্ছেন স্বামীজী তথাকথিত ধর্ম বা সম্প্রদায়গত ধর্মান্ধতাকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে? যে ধর্ম অতীতের ইতিহাসকে করেছে কলঙ্কমলিন, তার ক্ষীণতম সমর্থনও তো পাওয়া যাবে না স্বামীজীর সমগ্র জীবনবেদে।

ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মশূন্য বর্তমান রাজনীতির দিকে এবার একটু তাকানো যাক, কূটনীতি বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-কৌশল এবং শক্তির আকাশ-ছোঁয়া সম্ভাবনাকে অবলম্বন ক'রে যে রাজনীতি আজ ধাপে ধাপে মানব-সভ্যতার এক অপূর্ব যুগের সূচনা করছে। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব সঙ্গে সঙ্গে আজ দুই বা ততোধিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তাল-ঠোকাঠুকিতে শান্তিপ্রিয় মনুষ্যজাতির অন্তরে বিভীষিকাও জাগিয়ে তুলছে। ন্যাটো, সিয়াটো, সেণ্টো, ওয়ার্স প্যাক্ট—আরও কত কি কূটনৈতিক ও সামরিক বন্ধনের নাগপাশে আজ সমগ্র বিশ্ব কেঁপে কেঁপে উঠছে। পশ্চিমের জাতিতে জাতিতে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং দলবৃদ্ধির ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ আজিকার রাজনীতিতে অবশ্য তার মর্যাদা হারিয়েছে, কিন্তু বিশ্বের শক্তিমান্ কয়েকটি

জাতি পৃথিবীজোড়া প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে পরস্পর রেষারেষির যে অধ্যায় রচনা ক'রে চলেছে, তা তো সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর মাত্র। বিজ্ঞান আজ পৃথিবীকে ছোট ক'রে ফেলেছে, সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য-দান আজ পৃথিবীর যে-কোন অঞ্চলে দ্রুত পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়। পূর্বাঞ্চলের পিছিয়ে-পড়া দেশগুলি—তা সে এশিয়াতেই হোক বা আফ্রিকাতেই হোক, অনিশ্চিতের বেড়াজালে আজও আবদ্ধ, তাদের সাহায্য করতে উন্নত পশ্চিম সদাই প্রস্তুত। কিন্তু এ সাহায্য-দানের পশ্চাতে সামগ্রিক কল্যাণ-কামনা যেটুকু রয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি রয়েছে প্রভুত্ব-স্থাপন বা শক্তিবৃদ্ধির কূটনৈতিক কর্মসূচি। এ যেন একটা প্রচণ্ড বুদ্ধির খেলা, বিশ্বজুড়ে দাবার ছক পেতে বসেছে সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র। কে কাকে মাৎ ক'রে দেবে সূক্ষ্ম ঘুঁটির চালে, তা নিয়ে চলেছে ভয়ঙ্কর আড়াআড়ি।

দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে এই বিংশ শতাব্দীতে। কত লক্ষ লক্ষ নির্দোষ নিরীহ নরনারী বালক-বৃদ্ধ তাতে বলি হয়েছে, কত জাগতিক ঐশ্বর্যের বিনাশ সাধিত হয়েছে! তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা থেকে থেকে আজ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, এই পারমাণবিক মারণাস্ত্রের যুগে যার ফল হবে সর্বাত্মক ধ্বংস। বিজ্ঞান সাজিয়েছে এই ধরণীকে কী মনোহর সাজে! কত বিলাস, কত আরাম, কত সমৃদ্ধি আজ বুদ্ধিমান্ ও কুশলী মানুষের। অথচ এত বড়ো আশীর্বাদের পশ্চাতেই লুকিয়ে আছে এক ভয়াবহ অভিশাপ! প্রকৃতির বুকে সযত্নে লুকানো অমিত শক্তির উৎস-মুখ আজ অবারিত হয়েছে পশ্চিমের বিজ্ঞানের চাবিকাঠি দ্বারা। রাজনীতি তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। এই শক্তি মানবের কল্যাণে নিয়োজিত হ'লে এই ধরণী স্বর্গরাজ্য হবে এবং এ শক্তির অপব্যবহারে পৃথিবী পরিণত হবে এক সর্বনাশা মহাশ্মশানে। পশ্চিমের ও পূর্বের কল্যাণকৃৎ মনীষিগণ আজ তাই ভবিষ্যতের সামগ্রিক পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ বিশ্ববিধ্বংসী রূপটি তুলে ধরে বার বার সাবধান-বাণী উচ্চারণ করছেন। তাঁদের সংখ্যা হয়তো অল্প নয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক বা আভ্যন্তরিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে তাঁদের প্রভাব রাষ্ট্রনায়ক ও রণনায়কদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

রাষ্ট্রনায়কগণও শান্তির বুলি কম আওড়াচ্ছেন না। এবং এ-কথাও স্বীকার ক'রব যে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মন ও মুখকে বোধহয় অভিন্নও করতে পেরেছেন। ঘন ঘন উচ্চ পর্যায়ের সভা বসে, নিরস্ত্রীকরণের কর্মসূচি বহু যুক্তিপূর্ণ কথা দিয়ে পেশ করা হয়। কিন্তু তবুও বিভীষিকা থেকে জগৎ মুক্ত হ'ল কই? শান্তির ললিতবাণীর পশ্চাতে যে রয়েছে শাণিত ছুরি, নিরস্ত্রীকরণের যুক্তির পশ্চাতে থাকে পারস্পরিক সন্দেহ, গাণিতিক হিসেবের নিখুঁত পরিবেষণের পট-ভূমিকায় থেকে যায় জাতীয় মর্যাদা- ও শক্তি-বৃদ্ধির উৎকণ্ঠা-জনিত তীব্র রেষারেষি। অনেক যুক্তির জালে অনেক কথার আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় সত্যিকার মানবকল্যাণ-প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ প্রেরণা। রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশন ঘন ঘন বসে, উদ্দেশ্য তার মহৎ, কার্যধারা তার প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রায় ২০ বছর আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অবসানের পর থেকে পৃথিবীর পশ্চাৎপদ অঞ্চল-সমূহে যে নবজাগরণের বাণী নূতন ইতিহাস রচনা ক'রে চলেছে, তার অগ্রগতির পথের কণ্টকসমূহ উৎপাটনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ আজ পর্যন্ত কি কোন স্থায়ী বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পেরেছে?

আসল কথা আজ আর সবই আছে, নেই সহৃদয়তা, নেই সেই আত্মিক বোধ, যা যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে থেকে মানবের সকল কার্যকে মহৎ ও কল্যাণময় ক'রে তোলে। মানব-

জীবনকে শুধু বিচার ও বুদ্ধির সমষ্টি মনে ক'রে আমরা তার অন্তরের অন্তরতমকে অস্বীকার ক'রে চলেছি, হৃদয়কে রেখেছি উপবাসী। তাই কথায় ও কাজে আসমান-জমিন ফারাক দেখতে পাচ্ছি। শুভবুদ্ধিকে ছাপিয়ে উঠছে কূটনৈতিক বুদ্ধি; আর রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার গোপন লোভ সামগ্রিক মানবকল্যাণের বাঙ্ময় ঘোষণাকে করছে অর্থহীন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক আর্নল্ড টয়েনবি তাই সঙ্গতভাবে কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন: 'সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ধর্মান্ধতার অভিশাপ কাটাতে যে তথাকথিত ধর্মসহিষ্ণুতাকে (বা ধর্মহীনতাকে) অবলম্বন ক'রে পাশ্চাত্য জগৎ তার রাজনীতির পথে যাত্রা শুরু করেছিল, তা কি শেষ পর্যন্ত কোন স্থায়ী শুভফল দান করতে পেরেছে? ধর্মকে বাদ দিয়ে পশ্চিমের জীবন কতটা সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে? আধ্যাত্মিক জীবনকে অস্বীকার করবার এই যে নিরলস চেষ্টা, তাতে সৃষ্ট হয়েছে এক বিরাট শূন্যতা। এই শূন্যতাকে পূর্ণ করতে পশ্চিম তার রাজনীতির সিংহ-দরজাটি অবারিত করেছে জাতীয়তাবাদ, ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদের বিভীষিকাময় প্রবেশ-পথে। জন্ম নিয়েছে পশ্চিমে এক অবিশ্বাস্য গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা, ধর্মের গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতার চেয়েও যা শতগুণ ভয়ঙ্কর। এ থেকে পশ্চিমকে রক্ষা করতে পারবে কি তথাকথিত সেক্যুলারিজ্‌ম্ বা ধর্মশূন্যতা?'

রাজনীতিকে আজ নানা মতবাদ এমনভাবে কণ্টকিত করেছে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের চমকপ্রদ প্রয়োগকৌশল বিভিন্ন মতবাদকে এতটা শক্তিশালী ক'রে তুলেছে যে, এ সুন্দর ধরণীর প্রাগ্রসর মানব-সভ্যতার আজ যেন নাভিশ্বাস উঠেছে। টয়েনবি আরও বলছেন, পশ্চিমের মানুষ তার পিতৃপুরুষের একমাত্র উপাস্য ঈশ্বরের পথকে হারিয়ে ফেলে আজ যেন রাজনীতির এক ভয়ঙ্কর মরুপ্রান্তরে দিশেহারা পথিক। সে যেন নেশার ঘোরে চলেছে সর্বাত্মক ধ্বংসের এক মহাশ্মশানের যাত্রী হয়ে।

টয়েনবির অপূর্ব বলিষ্ঠ ভাষায় (Study of History দ্রষ্টব্য) যে সাবধান-বাণী উচ্চারিত হয়েছে, আজ বাঁচবার তাগিদেই তাতে কান দিতে হবে। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনধারার দেনাপাওনা মেটাতে বহু দূরে চলে এসেছি প্রতিযোগিতার পথ বেয়ে, আমাদের ঐহিক জীবনের সুখ- ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে বিচার ও যুক্তির আশ্রয় নিয়ে আমরা জটিল থেকে জটিলতর জাল বুনেই চলেছি। এ প্রতিযোগিতার পথে, এ জালবোনার প্রয়াসে আমরা বাইরের জীবনকে একমাত্র উপজীব্য করেছি। অন্তরের মানুষটিকে —আত্মাকে হয় ভুলেছি, নয়তো যুক্তি দিয়ে তাকে অস্বীকার করছি। বর্তমান সভ্যতার এটাই মারাত্মক ব্যাধি, বর্তমান রাজনীতির এটাই সাঙ্ঘাতিক সমস্যা। ফলে হয়েছে অসম বণ্টন, শুধু ব্যাপক অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও। একদা ধর্মের নামে সাধারণ মানুষকে জাগতিক সুখ ও সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত ক'রে ওদেশের এবং এদেশের পুরোহিত-তন্ত্র যে অপরাধ করেছিল, তার চেয়েও বেশী অপরাধী বর্তমান রাষ্ট্রনায়কগণ এবং যুদ্ধবিলাসী নিপুণ সেনাপতিবৃন্দ, যাদের বিচারে ও নির্দেশে মানুষের সকল মর্যাদা ও সমৃদ্ধি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রবাদ, ফ্যাসিবাদ অথবা সাম্যবাদের গৌরব-রক্ষায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত। মানুষের চেয়েও মতবাদ আজ বড়ো হয়ে উঠেছে। তার কারণ—বোধহয় একমাত্র কারণ যে, মানুষের পরিচয় শুধু তার বাইরের সত্তায় আজ পর্যবসিত হয়েছে। সত্যিকার মানুষ—তার আত্মা আজ উপবাসী।

সকল মানুষ এক, সকলের সমান অধিকার এ জগতের ভোগ্যপণ্যে—এ-কথা বোঝাতে বা কাজে পরিণত করতে যুক্তি ও বিচারসিদ্ধ কার্যসূচির প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। কিন্তু সে ফলপ্রসূ কার্যসূচির প্রণয়ন কি হৃদয়কে বাদ দিয়ে শুধু মস্তিষ্কের দ্বারা সম্ভব? যদি এ বিশ্বাস না থাকে যে, একই বিশ্ববিধাতার সন্তান হয়ে মানুষ সমান অধিকার নিয়ে জন্মেছে, যদি মানুষকে মানুষরূপে ভালবাসার প্রেরণা বা উৎসস্বরূপ এই হৃদয়ের টুঁটি চেপে ধরি জীবনপথে চলতে গিয়ে, তবে ঐ কর্মসূচি থাকবে শুধু কাগজে কলমে, কর্মক্ষেত্রে আসবে ঠিক তার বিপরীত জিনিস। ভালবাসা বা সমবেদনা কি বিচারের পথ বেয়ে আসে? এ যে হৃদয়ের ফল্গুধারা। কর্মক্ষেত্রে যখন সে ধারা বয়ে চলে, তখন তা হয় দুকূলপ্লাবী। ভালবাসার দাবিতেই মানুষ তার ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে কত সহজে। দরদী হৃদয়বান্ মানুষ সমগ্র জাতির, সমগ্র বিশ্বের দুঃখ ও বঞ্চনাকে নিজের ক'রে নেয় অবলীলাক্রমে। এমন মানুষকেই তো আমরা বলি ধর্মনিষ্ঠ মহামানব।

এ ধর্মেরই আবাহন করার প্রয়োজন বর্তমান রাজনীতিতে। রাজনীতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এই মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চ জাগিয়ে যখন ধর্ম জাগবে, তখনই হবে বিজ্ঞানভিত্তিক এই জড় সভ্যতার কল্যাণী শক্তির বিকাশ। এ ধর্ম দেশ-কাল-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে শাশ্বত মানবধর্ম, বিভিন্ন ধর্মমত সেখানে এক হয়ে যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস, সর্বকল্যাণালয় শিবশক্তির চেতনা, মানুষের সীমিত জীবনে অসীমের অনুভূতি, জীবনের শাশ্বত মূল্যবোধের সেবা এবং জন্মমৃত্যুর অচ্ছেদ্য ডোরে বাঁধা অসহায় মানুষের খণ্ডিত জীবনে পূর্ণতার উপলব্ধি—সকল ধর্মমতের সারকথা এখানেই রয়েছে। মন্দির মসজিদ গির্জা, পূজা নমাজ প্রার্থনা, আচার অনুষ্ঠান নিয়ম—এদের প্রয়োজন আছে সামাজিক জীবনে, ধর্মীয় জীবনেও। কিন্তু মানবধর্ম এখানেই নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেয় না। তার সগৌরব ঘোষণা রয়েছে মানুষের সামগ্রিক জীবনচর্যায়, পোশাকী বা আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে নয়। মানুষের বাইরের দাবি ও অন্তরের দাবি—উভয়ের বলিষ্ঠ স্বীকৃতি রয়েছে এই ধর্মে। উভয়ের সামঞ্জস্য-বিধানেই মানুষের মনুষ্যত্ব। এ মনুষ্যত্ব দেবত্বের নামান্তর মাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, সকল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে যা বিকশিত করে, তাই তো ধর্ম।

ভারতবর্ষের উপনিষদ্ এ ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি', 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্' 'আত্মানং বিদ্ধি', 'চরৈবেতি, চরৈবেতি',—বিশ্বজনীন ধর্মের এরূপ মহতী বাণীর প্রচার ও রূপায়ণ দ্বারাই ভারতবর্ষ নিজেকে ধর্মগুরুর আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ, যেখানে সকল ধর্মমত সমশ্রদ্ধা লাভ করেছে। স্বামীজী শিকাগোতে তাই বলেছিলেন, 'এ আমার গর্ব যে, আমার ধর্মে শুধু পরধর্মসহিষ্ণুতা নেই, সকল ধর্মের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি রয়েছে। আমার ধর্ম বলে যে, সকল পথই সত্যপথ যুগে যুগে বিশ্বের যে-কোন নিগৃহীত মানবগোষ্ঠীকে, যে-কোন ধর্মমতকে ভারত নিরাপদ আশ্রয় দান করেছে, আপন ক'রে নিয়েছে। এই তো আমার পরম গৌরব।'

'ভারতের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে স্বামীজী ভারতের 'জিনিয়াস্' বা নিজস্ব প্রতিভা নিরূপণ করেছেন অপূর্বভাবে: 'যুগে যুগে ভারতেতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, রাজনৈতিক ঐক্যের পটভূমিকা নির্মাণ করেছে আধ্যাত্মিক পুনরভ্যুত্থান।' যাঁরা এদেশের ইতিহাসের

বিচিত্র ধারার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা নিঃসন্দেহে স্বামীজীর মন্তব্যে সায় দেবেন। ভারতবর্ষ সত্যই ধর্মের দেশ। ভারতের পতন ঘটেছে বার বার ধর্মের জন্য নয়, ধর্মের গ্লানি বা ধর্মহীনতার জন্য। ভারতের সকল শক্তির উৎস ওই ধর্মে। স্বামীজী বলেছেন, শুধু অতীত ইতিহাসে নয়, ভবিষ্যতেও এই ধর্মই ইতিহাসের গতি-নিয়ন্ত্রক হবে। উনবিংশ শতাব্দীর পুনর্জাগরণের পটভূমিকায় স্বামীজী তাই বেদান্ত-নির্ঘোষে বলেছিলেন—'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।'

ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব বলেছেন, 'Unity in diversity'; রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বহুর মধ্যে একের সাধনা', যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যত মত তত পথ'। ভারতের ইতিহাস-নিয়ন্তা যে ধর্ম, তার স্বরূপই এই। ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা বা বিশেষ কোন ধর্মমতের সর্বগ্রাসী প্রাধান্যকে ভারত ধর্ম বলে না। ভারতের দুর্দিনে ধর্মের নামে যখন এ-সব এসেছে, তখনই ভারত তার পথ ভুলে ঘুরে মরেছে বিপথে, মগ্ন হয়েছে পতনের পিচ্ছিল আবর্তে। ইতিহাসের অনেক নজির উদ্ধৃত করা যায় এ-কথা প্রমাণ করতে।

সর্বকালের সর্বদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোকের কথাই বলি। আজ থেকে বাইশ-শ বছর আগে আবির্ভূত পাটলিপুত্রের এই মৌর্যসম্রাট্ তাঁর আদর্শময় কর্মজীবনের কাহিনী নিজেই লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন পর্বতপ্রস্তরে, স্তম্ভে এবং গুহাগাত্রে। দ্বাদশ প্রস্তরলিপিতে স্বধর্মনিষ্ঠার এক আশ্চর্য সংজ্ঞা তিনি দান করেছেনঃ —'যদি কেউ নিজ ধর্ম পালন করতে গিয়ে অপর সম্প্রদায়ের ধর্মকে আঘাত করে বা হেয় জ্ঞান করে এই ভেবে যে, এর দ্বারা সে স্বধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করছে, তখন আসলে এবংবিধ কার্য দ্বারা সমূহ অনিষ্ট সাধিত হচ্ছে স্বধর্মেরই।' আমরা জানি যে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে গৌতমবুদ্ধের পরেই অশোকের স্থান। স্থানীয় আঞ্চলিক এই ভারতীয় ধর্মকে অশোকই দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের একটি প্রধান ধর্মে পরিণত করেন। সম্রাট্ ভিক্ষু অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচারকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ ব'লে মনে করেছিলেন। কিন্তু কী অভিনব, কী অনন্য পন্থা ছিল তাঁর এই ধর্ম-প্রচারের; সকল শ্রেণীর—সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তিনি সমশ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছিলেন এবং উৎকণ্ঠা ছিল তাঁর জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মানবের নৈতিক জীবনের দৃঢ়ভিত্তি নির্মাণ-কল্পে। সম্রাট্ অশোকের সকল লিপিই 'ধম্মলিপি'। রাজধর্মের সঙ্গে অপূর্বভাবে সমঞ্জসীভূত করেছেন তিনি ধর্মনীতিকে, কোন বিশেষ ধর্মমতকে নয়। এই হ'ল ভারতের ধর্মের আদর্শ। যুগযুগান্তের পতন ও অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ বেয়ে এসে ভারতের জাতীয় শক্তি ও গৌরবের এই মহামন্ত্র বর্তমান যুগে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনবেদে আবার নবজীবন লাভ করেছে। জগৎময় পরিক্রমা ক'রে স্বামীজী এই বেদান্তধর্ম বা ভারত-ধর্মকে নিজের মহৎ জীবনের পটভূমিকায় প্রচার করেছেন।

বর্তমান ভারতের—স্বাধীন ভারতের এই তো বলিষ্ঠ উত্তরাধিকার। এ পেছন ফেরার ডাক নয়, এগিয়ে চলার ডাক। সেক্যুলারিজমের দোহাই দিয়ে জাতীয় সমৃদ্ধির ও শক্তির মাপকাঠিরূপে পশ্চিমের অনুকরণে একমাত্র জড়বাদকে গ্রহণ ক'রে ভারত কি তার চিরন্তন সমন্বয়বাদী ধর্মাদর্শকে বিসর্জন দিতে বসেছে? আশঙ্কা হয়, ভারত আজও আত্মবিস্মৃত; নিজেকে আবিষ্কার করার জরুরি প্রয়োজন আজ আবার নূতন ক'রে দেখা দিয়েছে। রাজনীতির ভিত্তিস্বরূপ বলিষ্ঠ উদার মানবধর্মকে আবাহন করার মন্ত্রটি ভারতকে খুঁজে পেতে হবে ওই বেদান্তে আর মূর্তবেদান্ত স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে। বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিতে সব থেকেও যা নেই, তাই রয়েছে শাশ্বত ভারতে। মুক্তির সে বাণী—মানব-কল্যাণের সে মন্ত্র বর্তমান ভারতের উজ্জীবন-মন্ত্র। ধর্মের শক্তিতে ভারত যেদিন জাগবে, সেদিন শুধু ভারতের রাজনীতি নয়, সমগ্র বিশ্বের রাজনীতি বিভীষিকাময় অনিশ্চয়তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিশ্বময় শান্তি ও সমৃদ্ধির বৃহৎ পরিকল্পনা ধর্মকে ভিত্তি করেই সার্থক হয়ে উঠবে।

কবে আসবে সেদিন?

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি'

[পূর্বানুবৃত্তি]

তী সুধা সেন

কাঁদিতেই প্রভু এইবার আসিয়াছিলেন, জীবের দুঃখে দ্বারে দ্বারে গিয়া 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন অধমতারণ পতিতপাবন গৌর! কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুই নয়নের পুণ্য স্নিগ্ধ মন্দাকিনীধারায় ধৌত করিয়া দিলেন এই পৃথিবীর মলিনতা, কেবল যেখানে কঠিন অভ্রভেদী পাষাণচূড়া তাহাকেই বিদীর্ণ করিলেন বজ্রদহনে শুধু ফুল ফুটাইবার জন্য। কঠোরতা ছিল, কিন্তু নির্দয়তা নহে, সেই কঠোরতাই নির্দিষ্ট হইল ছোট হরিদাসের ভাগ্যে।

শ্রীমান্ হরিদাস কিশোর বালক, সুন্দর—সুকুমার, সুকণ্ঠ; প্রভুর কীর্তনিয়া। প্রভু তাহাকে স্নেহ করেন, ডাকেন 'ছোট হরিদাস' বলিয়া। প্রভুর স্নেহভাজন, তাই সকল ভক্তই তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন।

সেই হরিদাসকেই একদিন প্রভু বর্জন করিলেন। নীলাচলে প্রভুর চরণ-সান্নিধ্যে যে সমস্ত ভক্ত বাস করেন—শ্রী ভগবান্ আচার্য তাহাদের অন্যতম। পরম বৈষ্ণব এই আচার্যকে প্রভুও ভালবাসেন। আচার্য একদিন প্রভুকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন; প্রভু উপস্থিত হইয়া দেখেন আচার্য নানা উপচারে প্রভুসেবার আয়োজন করিয়াছেন; প্রসন্ন শ্রীমুখে প্রভু প্রসাদ-গ্রহণ করিতে বসিলেন—আচার্যের আয়োজনের প্রভূত প্রশংসা করিয়া প্রভু অন্নের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ তো অতি উত্তম অন্ন; আচার্য, তুমি তণ্ডুল সংগ্রহ করিলে কোথা হইতে?'

তাঁহার সামান্য সেবার আয়োজনে প্রভু প্রসন্ন হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দে আচার্যের অন্তর পূর্ণ হইল; বলিলেন, 'মাধবী দাসীর নিকট হইতে এই শালিধান্যের তণ্ডুল চাহিয়া আনিয়াছি।'

প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে গিয়া তণ্ডুল চাহিয়া আনিয়াছে?'

অকপট দ্বিধাহীন হৃদয়ে আচার্য বলিলেন, 'ছোট হরিদাসকে পাঠাইয়াছিলাম, সেই আনিয়াছে।'

প্রভু অন্নের প্রচুর প্রশংসা করিয়া প্রসাদ-গ্রহণান্তে আপন গম্ভীরায় ফিরিয়া আসিলেন; আসিয়াই স্বরূপ গোবিন্দকে ডাকিলেন এবং গম্ভীর কঠোরস্বরে একটি আদেশ দিলেন: ছোট হরিদাস যেন আমার সম্মুখে আর না আসে, আজ হইতে তাহার 'দ্বার মানা'। প্রভুর কণ্ঠস্বরে যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে অপরিসীম বিস্মিত হইলেও স্বরূপাদির প্রভুকে কারণ জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। কিন্তু তাহারা ভাবিয়াও পাইলেন না, কোন্ অপরাধে বালক হরিদাসের এই দণ্ডবিধান হইল।

হরিদাস এই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন, নিরপরাধ সরল কিশোর, তিনি তো জানেন না, তাঁহার কি অপরাধ। প্রভুর দ্বার দিয়া প্রবেশের আর অধিকার রহিল না, প্রভুকে আর তাঁহার কীর্তন শ্রবণ করাইবার সাধ্য রহিল না। হরিদাস দুঃখ ও বেদনায় মুহ্যমান হইয়া গেলেন। তিন-চার দিন কাটিয়া গেল, ধূলিশয্যায় পড়িয়া আছেন আহারনিদ্রাবিহীন হরিদাস,—দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে। হরিদাসের দুর্দশা-দর্শনে ভক্তগণের হৃদয়ও ভাঙিয়া পড়িতেছে—ভয়ে

ভয়ে তাঁহারা প্রভুর কাছে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রভুকে মিনতি করিয়া বলিলেন, 'প্রভু! হরিদাস শিশু, তোমার বালক, না জানিয়া যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে, তবে তাহার তো যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে, এইবার তাহাকে ক্ষমা কর। তাহাকে ডাকিয়া লও।'

প্রভু কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন :

বৈরাগী হ্ইয়া করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।
—তার মুখ কভু আমি না করি দর্শন।

সাধারণ, ক্ষুদ্র জীব; বৈরাগ্যের ভান করিয়া আসলে ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করিয়া বেড়ায়—

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।

ইহাদের জন্য তোমরা পুনরায় কোন অনুরোধ আমাকে করিও না।

বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে ভক্তগণ ভাবিতে লাগিলেন,—'প্রকৃতি-সম্ভাষণ, ইন্দ্রিয়-লালসার চরিতার্থতা!' কোথায় কবে হরিদাস এই হীন অপরাধে অপরাধী হইলেন?

কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে জানিতে পারিলেন—কেই বা সে 'প্রকৃতি' এবং কিরূপে বা কেন হরিদাস তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

শিখি মাহাতীর ভগ্নী মাধবী দাসী, বৃদ্ধা পরম ভক্তিমতী পরম বৈষ্ণবী! প্রভু তাঁহাকে শ্রীমতী রাধিকার পরিবারভুক্ত বলিয়াই জানেন— 'প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ'। প্রভুর লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে প্রভু মাত্র সাড়ে তিন-জনকেই 'পাত্র' অর্থাৎ রাগানুগা-ভজনের উচ্চাধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। শিখি মাহাতী, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর এবং এই মাধবী দাসী। স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাকে 'অর্ধ'জন ধরা হইত।

এই মহামান্যা বৃদ্ধা পরম বৈষ্ণবীর নিকটেই ভগবান্ আচার্য হরিদাসকে পাঠাইয়াছিলেন; হরিদাস উপযাচক হইয়া যান নাই। মাতৃতুল্যা এই নারীর প্রতি ভক্তি ছাড়া অপর কোন ভাবের উদয় হওয়া হরিদাসের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! তথাপি প্রভু তাঁহাকে যে দণ্ড দিলেন, স্বরূপ প্রভৃতির মনে হইল, তাহা অতিরিক্ত কঠোর হইয়াছে। সুকুমার এই কিশোরটিকে সকলেই প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। প্রভুর কঠোরতায় এই কুসুমটি ম্লান হইয়া যাইতেছে— ভক্তগণ পুনরায় প্রভুর কাছে উপস্থিত হইলেন। কণ্ঠে করুণ মিনতি—ভক্তগণ প্রভুকে বলিলেন, 'প্রভু, না জানিয়া হরিদাস অপরাধ করিয়াছে— তুমি দয়া কর—নতুবা এই কোমল প্রাণটি অচিরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।'

আবার বজ্রকঠোর হইল প্রভুর স্বর, বলিলেন, 'তোমরা যে যার নিজের কাজে যাও, পুনরায় যদি তাহার সম্বন্ধে একটি কথা বলো, তবে আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না।'

মহাভয় ও লজ্জায় কর্ণে হস্ত দিয়া ভক্তগণ নিজ নিজ কার্যে চলিয়া গেলেন।

দিন যায়, কিন্তু প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হয় না, হরিদাস ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। নিরুপায় ভক্তগণ অধীর চিত্তে ছুটিয়া গেলেন শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীর কাছে। পুরী গোস্বামী প্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর গুরুভ্রাতা, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর পরম প্রিয় শিষ্য। প্রভু এই সম্পর্কে পরমানন্দজীকে গুরু-বুদ্ধিতেই শ্রদ্ধা করেন। ভক্তগণ অবশেষে তাঁহাকেই প্রভুর কাছে পাঠাইলেন—হয়তো প্রভু পুরীজীর বাক্য অমান্য করিবেন না।

ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে পুরীজী মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত হইলেন। প্রভু বসিয়া আছেন একা, শুভ সুযোগ পাইয়া পুরীজী ভয়ে ভয়ে

হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রভুর কাছে আবেদন জানাইলেন। শুনিবামাত্রই প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন—যুক্তকরে পুরীজীকে বলিলেন, 'গোসাঞি! এই নীলাচলে ভক্তগণকে লইয়া আপনি বাস করুন। আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি আলালনাথে চলিয়া যাই। গোবিন্দকে মাত্র সঙ্গে লইয়া আমি সেখানে থাকিব।' —বলিয়াই পুরীজীকে দ্বিতীয় কথা বলিবার অবসর না দিয়াই গোবিন্দকে ডাকিয়া লইয়া পথের দিকে যাত্রা করিলেন, যাত্রাকালে পুরীজীকে দ্রুত নমস্কারও করিয়া গেলেন।

স্তম্ভিত পুরীজী সম্বিত লাভ করিয়া দ্রুত-চরণে প্রাণাধিক শিষ্যোপম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাছে ছুটিয়া গেলেন—ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া প্রভুর হস্ত ধারণ করিলেন। বহু অনুনয়ে কোনক্রমে প্রভুকে ঘরে আনিয়া পুরীজী বলিলেন, 'তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর—তুমি যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর, তোমার কথার উপরে কে কি বলিতে পারে?'

'লোক হিত লাগি তোমার সব ব্যবহার,
আমি-সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার।'

নিজ কুটিরে ফিরিয়া গেলেন—প্রতীক্ষমাণ ভক্তগণ নিরাশায়, ক্ষোভে অস্থির হইয়া উঠিলেন—'উপায় কি?'

অবশেষে স্বরূপ গোস্বামী বহু সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়া হরিদাসকে উঠাইলেন—বলিলেন, 'প্রভু ক্রোধ করিয়া আছেন—তাঁহার উপরে অভিমানে দুঃখে তুমিও যদি এইরূপ 'হঠ' কর, তাহা হইলে প্রভুর ক্রোধ আরও বাড়িয়া যাইবে।' ভক্তগণের অনুরোধে ও আদেশে হরিদাস উঠিয়া স্নান ভোজন করিলেন। অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতেছেন হরিদাস, কবে প্রভুর ক্ষমা, প্রভুর করুণা নামিয়া আসিবে তাঁহার জীবনে! কিন্তু কোথায় সেই নব জলধরের কৃপামৃত-বর্ষণ, ঊষর মরুভূমি যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে বৎসরও অতিক্রান্ত প্রায়—প্রাণারামের আহ্বান আসিল না। দূর হইতে তৃষিত নয়নে হরিদাস প্রভুর গমনপথের দিকে চাহিয়া থাকেন, দুই অশ্রুভরা নয়নের তৃষ্ণা না মিটিতেই দয়িত চলিয়া যান দূরে! হরিদাসের এই দণ্ড ভক্তগণ দেখিতেছেন আর ত্রাসে ভয়ে সকলের হৃৎকম্প হইতেছে।

'দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে।' চৈঃ চঃ

একজন উপলক্ষ্য, লক্ষ্য সকলে। সমস্ত বৈষ্ণব, ভক্ত, সাধক সকলেই সতর্ক হইয়া গেলেন—এমনকি গৃহী ভক্তগণও।

বৎসর পূর্ণ হইল, তথাপি যখন প্রভুর কৃপা হইল না, হরিদাসের জীবনে যখন অন্ধকারের পরিবর্তে আর আলো দেখা দিল না, তখন প্রভুর চরণে অলক্ষ্যে একটি প্রণাম রাখিয়া হরিদাস চলিয়া গেলেন কোন্ নিরুদ্দেশের পথে, কেহই তাহা জানিল না।

কিন্তু যাঁহার জানিবার কথা, যিনি সব জানেন, তিনিই জানিলেন—প্রয়াগে গিয়া হরিদাস প্রভুর চরণপ্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হরি-দাসের ইহা আত্মহত্যা নয়, আত্মাহুতি—প্রভুর চরণলাভ-মানসে। ভক্তগণ—এমনকি অন্তরঙ্গ-গণও জানিলেন না, শুনিতেও পাইলেন না সেই গন্ধর্বনিন্দিত স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর! গভীর নিশীথে সমস্ত বিশ্ব যখন স্তব্ধ, তখন হরিদাস দিব্যদেহে প্রভুর কাছে আসিতেন, কণ্ঠ হইতে ঝরিত সুধা-সঙ্গীত—দিব্যানন্দে পুলকিত প্রভু অমৃতরসে মগ্ন হইয়া যাইতেন।

প্রভুর চরণসান্নিধ্য হইতে আর কেহ বিদেহী হরিদাসকে দূরে সরাইতে পারিল না—

সেই শাশ্বত মিলনে আর কোন বাধা রহিল না।

এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলে সহসা যেন মনে পড়িল—প্রভু ভক্তদের বলিলেন—'হরিদাস কোথায়? তাহাকে আমার কাছে আনো'। বিষাদব্যথিত ভক্তগণ বলিলেন—'বর্ষপূর্ণ দিনে তিনি কোথায় গিয়াছেন, আমরা তাহা জানি না।'

প্রভু ঈষৎ হাসিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। অন্তরঙ্গগণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না—প্রভুর হাসিতে কিসের আভাস? প্রভু কি জানেন, হরিদাস কোথায়? একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে প্রভু সমুদ্রস্নানে গিয়াছেন—অকস্মাৎ যেন সকলের কানে হরিদাসের কণ্ঠসঙ্গীত ভাসিয়া আসিল—দূর হইতে সুরলহরী যেন ভাসিয়া আসিয়া সিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইতেছে। একি অদ্ভুত—তবে কি হরিদাস আত্মহত্যা করিয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন! ভক্তগণ বিহ্বল হইয়া গেলেন। তীব্র প্রতিবাদ করিয়া স্বরূপ বলিলেন, 'না, না, যিনি আজন্ম কৃষ্ণের নাম কীর্তন করিয়াছেন, যিনি প্রভুর সেবক—তাঁহার কখনও এইরূপ অধোগতি হইতে পারে না। প্রভু নিশ্চয়ই জানেন হরিদাস কোন্ গতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন—আমরাও পরে জানিব।'

এদিকে এক বৈষ্ণব প্রয়াগ হইতে নবদ্বীপে গিয়া প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে হরিদাসের দেহত্যাগের কথা জানাইলেন।

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ ইহার পরে নীলাচলে আসিলেন। ভক্ত শ্রীবাস প্রভুকে হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু একটি কথাই মাত্র বলিলেন—'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্' অর্থাৎ স্বকৃত কর্মফল ভোগ করিতেছেন হরিদাস। আত্মহত্যার পাপে হয়তো বা হরিদাস অসদ্গতি লাভ করিয়াছেন—প্রভুর উক্তির এইরূপ তাৎপর্য হইলেও ভক্তগণ বুঝিলেন—প্রভুর প্রিয় সেবক কৃষ্ণনাম-কীর্তনিয়া হরিদাস দেহান্তে দিব্যদেহ লাভ করিয়া প্রভুর চরণাশ্রয়েই রহিয়াছেন।

শ্রীবাস তখন প্রভুকে হরিদাসের প্রাণত্যাগের কথা জানাইলেন—প্রভু হাসিয়া বলিলেন, 'প্রকৃতি-দর্শনের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপই।'

'বজ্রাদপি কঠোরাণি' প্রভু, কিন্তু ভক্তগণ জানেন—তিনি 'মৃদূনি কুসুমাদপি', কোথায় যে বজ্রপাত হয়, কোথায়ই বা কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কেনই বা পড়ে, দুরধিগম্য প্রভুর চরিত্র হইতে কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারেন না।

শুধু মাত্র 'প্রকৃতি-সম্ভাষণ'-রূপ অপরাধে হরিদাসের প্রতি যে দণ্ড হইল, তাহা হইতে রায় রামানন্দের কত অধিক অপরাধের কথা যখন প্রভু জানিতে পারিলেন, কই তখন তো বজ্রাগ্নি জ্বলিয়া উঠে নাই এবং কঠোর রুদ্র দহনে রায় রামানন্দকে তাহা দগ্ধ করে নাই।

(ক্রমশঃ)

স্বামীজীর অধ্যাত্মবাদের পটভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন, আজীবন তপস্যা ও বহুমুখী কর্মধারার সম্যক্ পরিচয় পেতে হ'লে আমাদের একদিকে সমকালীন যুগের বিশ্লেষণ ও অপরদিকে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ধারা, মর্মবাণী, অধ্যাত্মবাদ উপলব্ধি করতে হবে। এই মহামানব যে মহৎ বীজ বপন ক'রে গেছেন, তার সার্থকতা ও বিপুল সম্ভাবনা সাময়িক প্রয়োজনের নিক্তিতে অথবা ব্যাবহারিক জীবনের মূল্যবোধে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হবে না। বিশ্বকেন্দ্রিক ও দূরপ্রসারী দৃষ্টি থেকে স্বামীজীর ভাবাদর্শ, জাতি- ও ব্যক্তি-জীবনের মূলনীতিগুলি আমাদের নিকট প্রতিভাত হবে।

ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক সত্তা নয়, তার অন্তরে একটি সাধনার ধারা নিত্য বয়ে চলেছে। যুগ-যুগান্তর ধরে বহু সাধু, সন্ত, কবি ও দার্শনিকের অপূর্ব জীবন ও তপস্যার ভিতর ভারতবর্ষের অন্তরাত্মার একটি শাশ্বত চিরন্তনবাণী বারংবার ঘোষিত হয়েছে। বহুশতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের মাটিতে বহুজাতির আবির্ভাব, সংঘাত ও পরিশেষে মিলনের ভিতর ধর্ম-সমন্বয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছে। 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'—এই যে প্রকাশমান জগতে—আর কিছু নয়, তাঁর মৃত্যুহীন আনন্দই রূপ ধারণ ক'রে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দেই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ। উপনিষদের এই অমোঘ বাণী ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছে, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায়, দুঃখ-শোক-বেদনার সংঘাতে মুক্তির বাণী হয়েছে উজ্জ্বল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনের ক্ষুদ্র প্রয়োজন ও সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে ভূমার আনন্দে উদ্বুদ্ধ হবার প্রেরণা কিছু পরিমাণে অনুরণিত হয়েছে। জৈবিক জীবনের নিছক প্রয়োজনের সীমাতে ভারতীয় অধিবাসী চিরকাল নিজেকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করেনি। নির্দিষ্ট প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে প্রাণশক্তির যাত্রা শুরু হয়েছে চেতনালোকে, পথ উন্মুক্ত প্রশস্ত হয়েছে, চৈতন্যের আলো বিপুল পৃথিবীকে নিজ সত্তার প্রকাশ ব'লে তার সঙ্গে যুক্ত একাত্ম হয়েছে। ভারত-পুরুষের অতন্দ্র চেতনা রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বস্তরে তার স্বকীয় সাধনার ধারাকে পরিস্ফুট করার আন্তরিক চেষ্টা করেছে।

যুগের পর যুগ ভেসে চলেছে অবিরাম কালস্রোতে। এই স্রোতের মুখে মধ্যে মধ্যে এক বিপুল তরঙ্গের সৃষ্টি অথবা বিরাট ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়, যাঁর জীবন ও ধ্যানালোক বহুযুগের অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও প্রাণপ্রবাহকে রূপায়িত করে। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য—আধুনিক যুগে রামমোহন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন বিরাট শক্তির আধার, যাঁদের কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন যুগে ভারতীয় মানসলোকের, আত্মার অভিব্যক্তি ঘটেছে, নতুন স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। ভারতবর্ষে একদিন ছায়াগম্ভীর নিবিড় শান্ত তপোবন থেকে 'চরৈবেতি, চরৈবেতি' বাণী ধ্বনিত হয়েছিল, জড়তা ও তামসিকতার বিরুদ্ধে উপনিষদ্ ও গীতার অগ্নিগর্ভ মন্ত্র জাতির অন্তরকে প্রজ্বলিত করেছে। 'চরৈবেতি'---প্রাণের এই উদাত্ত আহ্বান সর্বকালে সর্বদেশে আচার্যদের অনুপ্রাণিত করেছে। সামাজিক অথবা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা আধ্যাত্মিক জীবনে যেখানে তথাকথিত প্রতিষ্ঠান, লৌকিক অনুষ্ঠান ও সাময়িক নীতির

বন্ধনে বন্দী হয়েছি অথবা অচলায়তনের নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, সেখানে আমাদের যাত্রা থেমে গেছে; যেখানে আমরা চলতে ভুলেছি, সেখানে আমাদের দুর্বলতা, কুসংস্কার, অন্ধ-তামসিকতা গ্রাস করেছে। আত্মিক অথবা জাতীয় জাগরণে কর্ম-যজ্ঞে নিজেকে আহুতি দেবার ধর্মে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর ভাবে অনুপ্রাণিত সহস্র সহস্র কর্মী এই 'চরৈবেতি' বাণীকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করেছেন।

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে বিস্মৃত অতীতকে পুনরাবিষ্কার ও নব সৃষ্টির উৎসকে উন্মোচন করবার বিপুল প্রচেষ্টা ইওরোপে নবজাগরণ আন্দোলনে দেখতে পাই। ভারতবর্ষে নবজাগণের প্রকাশ হয়েছিল ঊনবিংশ শতকে। এই আন্দোলনের প্রধান পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সংস্কার-মুক্ত মননশীলতা, মানবতা তথা যুক্তিবাদের দীক্ষণাগার ছিল নবজাগরণের মূল উৎস। সমাজের প্রাণশক্তি তখনও নিরুদ্ধ, সংস্কৃতির ভাবধারা সুপ্তির গহ্বরে স্তিমিত। 'একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুদ্‌বেগে অগ্রসর হইতেছিল···' (রবীন্দ্রনাথ)। এই সঙ্কট-মুহূর্তে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ অটলমহত্ত্বে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। নবজাগরণের প্রমুক্ত আলোকচ্ছটায় হিন্দুধর্মকে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বজয়ের ভূমিকায় নিয়োজিত করলেন, সনাতন ধর্মকে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের রক্ষণশীল মনোভাব, একদর্শী সঙ্কীর্ণ-মতবাদের গণ্ডি থেকে মুক্ত ক'রে উদার সর্বজনীন ভিত্তিতে স্থাপন করলেন। মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব, ভাগবতভাবের পুনর্জাগরণ, জীবমাত্রে শিবজ্ঞানে সেবার আদর্শ প্রচার ক'রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মানবতাকে অধ্যাত্মবাদের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তথাকথিত রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উপনিষদের সারমর্ম, সর্বকালীন ও সর্বজনীন মহৎ সত্য সগৌরবে স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন:

'All narrow, limited, fighting ideas of religion must be given up......The religious ideals of the future must embrace all that exists in the world and is good and great, have infinite scope for future development... In my life, I have seen a great many spiritual men, a great many sensible persons, who did not believe in God at all, that is to say, not in our sense of the word. Perhaps they understood God better than we can ever do.'

ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের জোয়ার স্তরে স্তরে যে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে চলেছে, তাকে মর্মে মর্মে তিনি অনুভব করেছিলেন, মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন আগামী দিনের সমাজ-ব্যবস্থাকে। বজ্রকণ্ঠে তিনি আহ্বান করলেন নিদ্রিত জাতীয় সত্তাকে:

তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ ক'রে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হ'তে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখ ভোগ করেছে,—তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি চুপ ক'রে দিনরাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মানিকের আংটি—ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি—'ওয়াহ্‌ গুরুকী ফতে'।

যুগের পর যুগ সমাজের নীচের তলায় অন্ধকারে নীরবে যারা এতদিন নিষ্পেষিত হয়েছে, তারাই হবে ভবিষ্যৎ জগতের কর্ণধার, নতুন ইতিহাস রচিত হবে তাদের প্রাণশক্তি-স্পন্দনে। ভারতের নব অভ্যুদয়, নবজাগরণের সূচনা দিগন্তে ঘোষিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ —উপনিষদের ধারা জড়ের পূজা অথবা নির্বীর্য পলায়নবাদের নির্দেশ দেয়নি, পক্ষান্তরে জীবনকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে, মানুষকে দেবতার আসনে স্থাপনা ক'রে, সুখ ও দুঃখের নিরন্তর দোলাকে বীরের মতো অতিক্রম ক'রে চির আনন্দলোকের যাত্রী হবার জন্য আহ্বান করেছে :

'Be strong, my young friends; that is my advice to you. You will be nearer to heaven through football than through the study of the Gita. These are bold words, but I have to say them, for I love you.

'...You will understand the Gita better with your biceps, your muscles, a little stronger. You will understand the mighty genius and the mighty strength of Kṛṣṇa better with a little of strong blood in you. You will understand the Upaniṣad better and the glory of the Ātman, when your body stands firm upon your feet, and you feel yourselves as men.'

গীতায় বিঘোষিত পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের বীর্য-বাণীকে হৃদয়ঙ্গম করতে হ'লে আমাদের প্রয়োজন পেশীযুক্ত সবল দৃঢ় বাহু, উপনিষদে যে অজ নিত্য শাশ্বত আত্মার মহিমা বর্ণিত আছে, তাকে উপলব্ধি করতে হ'লে আমাদের উন্নতশিরে, নির্ভয় চিত্তে, মনুষ্যত্বের জয়তিলক ধারণ ক'রে দাঁড়াতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সান্নিধ্যে এসে একদিন নরেন্দ্রনাথের অন্তর্লোকের সকল দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করলেন, অদ্বৈতবাদের মূলসূত্র সর্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি অথবা জীব শিব অভেদাত্মা। তিনি বলতেন—জীবে দয়া নয়, প্রেম ও সেবা হবে ধর্মের মূলসূত্র। এই দিক থেকে বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার ভাবধারার সহিত শিবজ্ঞানে সেবা বা পূজার ভাব সংযুক্ত হয়েছে। নানা বন্ধনে বন্দী, ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন, সুপ্তচেতনাকে পুনর্জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে আচার্য শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তকে তিনি কর্মযোগে—দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাধ্যমে রূপায়িত করবার জন্য সমগ্র জাতিকে আহ্বান করলেন :

'The abstract Advaita must become living—poetic in everyday life; out of hopelessly intricate mythology must come concrete moral forms, and out of bewildering Yogi-ism must come the most scientific and practical psychology—and all this must be put in a form so that a child can grasp it.'

স্বামীজী বলেন, বেদবেদান্ত মন্থন ক'রে তিনি একটি অমৃতকুম্ভের সন্ধান পেয়েছেন—তা হ'ল 'অভীঃ' অর্থাৎ নির্ভীক হবার মন্ত্র। দুর্বলতা হচ্ছে মহাপাপ, বীর্যবান্ পুরুষই সেই আত্মাকে উপলব্ধি করতে সমর্থ। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' তিনি বলিলেন :

'What we want is muscles of iron and nerves of steel. We have wept long enough. No more weeping, but stand on your feet and be men. It is a man-making religion that we want. It is man-making education all round, that we want. ...These mysticisms, inspite of some grains of truth in them, are generally weakening...Give up these weakening mysticisms, and be strong...the truths of the Upanishads are before you. Take them up, live up to them, and salvation of India will be at hand.'

—দুর্বলের কান্না আমরা অনেক কেঁদেছি, আর কান্না নয়, এখন পায়ের উপর মানুষের মতো সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এখন চাই বজ্র ও ইস্পাতে তৈরী সবল মানুষ। যে ধর্ম, যে শিক্ষা আমাদের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে জাগরিত ও

আমাদের মানুষ করবার ভার নেবে, তাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ক'রব। তোমরা সকলে উপনিষদের শক্তি-সঞ্চারক আলোকপ্রদ দিব্য দর্শনশাস্ত্রগুলি আবার অবলম্বন কর, আর তার সঙ্গে এই সকল রহস্যময় দুর্বলতাজনক বিষয় পরিত্যাগ কর। উপনিষদের সত্যসমূহ কায়মনে অনুসরণ কর ও কার্যে পরিণত কর—ভারতবর্ষের মুক্তি অচিরে ঘটবে।

এই শক্তি কোন্ উৎস থেকে সঞ্চারিত হবে? এ কি আণবিক বিস্ফোরণ, জৈবিক জীবনের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস অথবা যে শক্তির জয়গাথা একদিন নীটসে গেয়েছেন, ও যার অবশ্য ফলানুযায়ী ইওরোপীয় সভ্যতার সৌধমালা বার বার ধূলিসাৎ হয়েছে, ইওরোপ শ্মশানে পরিণত হয়েছে? ভারতবর্ষ শক্তির উৎস পেয়েছে অন্তরের গভীরে, অধ্যাত্ম-জীবনে, দিব্য জীবনের চিরবহ্নিমান্ শিখায়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন: 'তোমরা দেখবে, আমি কোথাও উপনিষদ্ ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্র উদ্ধৃত করিনি এবং সকল উপনিষদ্ থেকে বাছাই ক'রে আমি একটি ভাবধারা অথবা মন্ত্রের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছি—সেটা অভীঃমন্ত্র। আমার আদর্শ হচ্ছে সেই তপস্বিশ্রেষ্ঠ বীর সৈনিক, যাকে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কতিপয় ইংরেজ সেপাই সঙিন বিদ্ধ ক'রে হত্যা করেছিল। এই তপস্বী প্রায় ১৫ বছর মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন, সঙিন দ্বারা বিদ্ধ হবার সময় তিনি মৌনব্রত ভঙ্গ ক'রে হত্যাকারীদের উদ্দেশ্যে একবার বললেন, 'তোমরাও ব্রহ্মস্বরূপ।'

'আমার সমরনীতি' বক্তৃতায় এই ভাবের অনুরণন ক'রে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদাত্ত কণ্ঠে বলছেন: শত শত শতাব্দী যাবৎ মানুষকে তার হীনত্ব-জ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো হয়েছে—তারা কিছুই নয়, অপদার্থ। সর্বত্র জনসাধারণকে চিরকাল বলা হয়েছে—তোমরা মানুষ নও। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাদের এইরূপে ভয় দেখানো হয়েছে—ক্রমশঃ তারা সত্য-সত্যই পশুস্তরে নেমে গেছে। তাদের কখনও আত্মতত্ত্ব শুনতে দেওয়া হয়নি। তারা এখন আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক—তারা জানুক যে, তাদের মধ্যে নিম্নতম ব্যক্তির হৃদয়েও আত্মা রয়েছেন; সেই আত্মার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই; তরবারি তাঁকে ছেদন করতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, বায়ু শুষ্ক করতে পারে না; তিনি অবিনাশী অনাদি অনন্ত শুদ্ধস্বরূপ সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী।

স্বামীজী ধর্মকে বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন: ' Religion is the manifestation of the Divinity that is already in man' আমাদের সবার ভিতর যে ভাগবত সত্তা ও অনন্ত শক্তি বিরাজ করছে, তাকে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যান ও অনুভবের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে হবে।

আমরা সাধারণ পথিকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্যস্থলে যাবার কথা ভুলে বিচিত্র পথে দিশেহারা হয়ে পড়ি অথবা মতবাদের চোরাকুঠিতে আত্মগোপন করি। কত ধূসর প্রান্তর, গিরি লঙ্ঘন ক'রে মহাপথিকরা অগ্রসর হন শৈল-শিখরে; তাঁদের জীবন-জিজ্ঞাসা, অবিচল সত্যাগ্রহ, কাল- ও যুগোপযোগী নতুন নতুন পথের আবিষ্কার আনন্দলোকের সন্ধান দেয়। তাঁরা হচ্ছেন জীবন্মুক্ত, পথ ও মত দ্বারা বন্দী নন, তাঁরা যেস্থানে বিচরণ করেন, অথবা নিজেদের সাধনালোকে প্রজ্বলিত যে সত্য উদ্ঘাটন করেন, তা হয় পথ ও পথের নিশানা। তাঁরা কখন সমাজের অচলায়তনের নিকট আত্মসমর্পণ অথবা নতি স্বীকার করেন না। তাঁদের জীবনালোকে পৃথিবীর নিরন্তর

ঘাত-প্রতিঘাত, বহু মতবাদের ঊর্ধ্বে—সত্য এক ও অবিনশ্বর আমরা উপলব্ধি করি। সর্বকালের ও সর্বদেশের আচার্যগণ বিশ্বচরাচর ও বহু ভাবধারার অন্তরালে যে মহান্ ঐক্য বিরাজ করছে, তা অনুভব করেছেন। আমরা তাঁদের অন্ধ অনুগামী ও মোহাচ্ছন্ন, সংস্কারের অসংখ্য প্রাচীর নির্মাণ ক'রে পথকে অবরুদ্ধ ও দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করেছি। ধর্ম অথবা অধ্যাত্ম-জীবনে বিভিন্ন নীতি ও মতবাদের ঊর্ধ্বে একটি বিশ্বজনীন উদার সার্বভৌম ধর্মসমন্বয়ের রূপ স্বামী বিবেকানন্দ একটি বিরাট আধারে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। একদিকে শঙ্করাচার্যের বিরাট মস্তিষ্ক, অপরদিকে পরমকারুণিক বুদ্ধের ও প্রেমাবতার চৈতন্যের বিশাল হৃদয় ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-সাধনার পথকে উজ্জ্বল করেছে।

'এখন এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের সময় হইয়াছিল, যাঁহার মধ্যে একাধারে এইরূপ হৃদয় ও মস্তিষ্ক থাকিবে। যিনি একাধারে শঙ্করের উজ্জ্বল মেধা ও চৈতন্যের বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হইবেন, যিনি দেখিবেন—সকল সম্প্রদায় এক মহৎ ভাবে, ঈশ্বরের ভাবে অনুপ্রাণিত। দেখিবেন—প্রত্যেক প্রাণীতে সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, যাঁহার হৃদয় ভারতে বা ভারতের বাহিরে দরিদ্র পতিত—সকলের জন্য কাঁদিবে, অথচ যাঁহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহৎ তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবে, যেগুলি ভারতে বা ভারতের বাহিরে বিরোধী সম্প্রদায়সমূহের সমন্বয় সাধন করিবে এবং এইরূপ বিস্ময়কর সমন্বয়ের দ্বারা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামঞ্জস্যপূর্ণ এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে। এইরূপ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি কয়েক বৎসর তাঁহার চরণতলে বসিয়া শিক্ষা পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।'

অদ্বৈতভূমিতে সত্য শিব ও সুন্দর অভেদাত্মক। অধ্যাত্ম-জীবন বলতে আমরা শুধুমাত্র সাধারণ অর্থে তথাকথিত শাস্ত্র-চিহ্নিত পূজা-অনুষ্ঠান বা ধ্যান-ধারণায় সীমাবদ্ধ ক'রব না। আধ্যাত্মিক জগৎ ব্যাবহারিক অথবা প্রয়োজনের নিয়মে শাসিত নয়। আমরা কিছুক্ষণ শাস্ত্রপাঠ অথবা পূজা-অনুষ্ঠান পালন ক'রে ধর্মজীবনের কর্তব্য যান্ত্রিকভাবে অনুসরণ করি। 'আমাদের ধর্ম ঢুকেছে রান্নাঘরে, ভাতের হাঁড়ি আমাদের দেবতা; আর মন্ত্র হচ্ছে—আমায় ছুঁয়ো না, আমি পবিত্র।' অধ্যাত্ম-জীবন সামাজিক তথাকথিত আচার আনুষ্ঠানিক নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ নয়। নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নিরঞ্জন আত্মা—তাঁকে আমরা স্বধর্ম অনুযায়ী বরণ ক'রব।

কর্মযোগী, শিল্পী, সুরকার, দার্শনিক-সবাই অধ্যাত্ম-জগতের অধিবাসী। কর্মযোগী নিষ্কাম কর্মসাধনার ভিতর ক্রমশঃ জীবনের ঊর্ধ্বায়তন (Sublimation) সাধন করেন। শিল্পী সুন্দরের সাধনের ভিতর ক্রমশঃ বিশ্বাত্মার সঙ্গে একাত্ম সাযুজ্য অনুভব অথবা রূপের ভিতর দিয়ে অরূপের দিকে অগ্রসর হন, দার্শনিক ভাবজগতে বিহার করেন। নিষ্কাম কর্ম, সুন্দরের সাধনা, দার্শনিকের ভাবাস্বাদন—চেতনার বিভিন্ন ধারা অধ্যাত্মলোকের আলোতে উদ্ভাসিত। গিরিগুহাতলে যোগী একান্ত সাধনার পথে সমাধির উচ্চভূমিতে আরোহণ করবার মানসে ধ্যানাবিষ্ট। শিশু গদাধর সবুজ প্রান্তরে এক ঝাঁক বলাকা দেখে সৌন্দর্যানুভূতিতে সহসা সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। যোগীর মন ও শিল্পীর চিত্ত একই ভাবাবেগ ও রসে স্নাত। একান্ত গভীর অনুভূতিতে 'ছোট আমি'র অহং-বোধ লোপ পায়; আমরা ক্রমশঃ সত্তার বিরাট সাগর-সঙ্গমে মিলিত হই। এই

অনুভূতি সৌন্দর্য, ঈশ্বরানুরাগ অথবা কোন মহৎ ভাবাবেগ দ্বারা সঞ্চালিত হোক না কেন, সবার মূলে রয়েছে অধ্যাত্মবাদের প্রসাদ অথবা তার আলো বিরাজ করছে। স্বামীজীর অধ্যাত্মবাদের পটভূমিকায় দিব্য ও লৌকিক জীবন, ভাবলোক ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা একসঙ্গে গ্রথিত হয়েছে। তিনি ভারতবর্ষের মননসাধনা, সামাজিক রাজনৈতিক কৃষ্টি অথবা সংস্কৃতির অন্তরালে এক গভীর অধ্যাত্ম-বাদের স্পর্শ অনুভব করেছেন এবং তাঁর নিকট অধ্যাত্মবাদ ভারতবর্ষের সমগ্র জীবন-বিকাশের মূলাধার ও ঐক্য স্থাপনা করছে। এখানে অন্তরের সাধনা ও বহির্জীবনের কর্মধারার সঙ্গে কোন বিরোধ নেই, দুই জগৎ একই অধ্যাত্মবাদ দ্বারা ছন্দিত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন— ব্যক্তি-জীবনের স্ফুরণ অথবা জাতীয় জীবনের যে ক্রমবিকাশ, তার মূলে রয়েছে আমাদের সুপ্ত ভাগবত জীবন অথবা অধ্যাত্মবাদের বীজ। আমরা অনন্ত শক্তির আধার, ব্রহ্মস্বরূপ। কর্মযোগে, ত্যাগে ও 'অভীঃ'মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আমাদের সুপ্ত চেতনার উদ্বোধন করতে হবে। প্রত্যেক জীবের ভিতর শিব, নরের অন্তরে নারায়ণ বিরাজ করছেন ; তাঁর সেবা, তাঁর মুক্তির আলোতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জগদ্ধিতায় আত্মোৎসর্গ করতে হবে। আজ সমাজের নীচের তলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্ধকারে পশুর মতো কাল হরণ করছে। এই হীন দুর্বল কাপুরুষ, অসহায় জাতির নিদ্রিত সত্তাকে জাগ্রত করবার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রভেরী বার বার আমাদের দুয়ারে আঘাত করেছে : ভুলিও না মনুষ্যত্বের অপার মহিমা, আমরা সেই সনাতন অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ, আমি সেই অসীম মহাসাগর। খৃষ্ট ও বুদ্ধ যার উপরিভাগের তরঙ্গমাত্র।

যে হোমশিখা একদিন স্বামীজী অযুত বীর সৈনিকের হৃদয়-কন্দরে প্রজ্বলিত করেছেন, তা আজও বহ্নিমান্। তাঁর নির্দিষ্ট পথে ত্যাগ ও প্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে 'জগদ্ধিতায়' ব্রতে ব্রতী হবার আহ্বান, তাঁর উদাত্ত বাণী আজও আকাশে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। 'বসন্তবল্লোক-হিত' করাই হোক আমাদের একমাত্র ধর্ম।

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

১৯০০ খৃঃ অগস্ট মাসে স্বামীজী ধর্মেতিহাসের মহাসভায় যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের পারী নগরীতে আসেন। এই সভা পারী 'একৃস্পোজিশন ইউনিভার্সেল'-এর অঙ্গ-বিশেষ ছিল। বিজ্ঞানীদের কংগ্রেসও ইহার অন্য আর এক শাখা।· আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এই কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারীতে আসেন। এই সূত্রে উভয়ে পারীতে সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়।

আচার্য বসু তাঁহার আশ্চর্য আবিষ্কার দ্বারা সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎ রোমাঞ্চিত করিয়াছিলেন। স্বামীজীর সহিত আচার্য বসুর মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইত। তিনি তাঁহার পরিচিত লোকদিগের নিকট এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের মহত্ত্ব কীর্তন করিতেন। স্বামীজীর ভাষায়—আচার্য বসু 'বাংলাদেশের গর্ব ও গৌরব'। এক সময় একটি বিশিষ্ট সভায় একজন বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের শিষ্যা যখন দাবি করেন, তাঁহার অধ্যাপক খর্বাকৃতি পদ্ম বর্ধিত করিবার জন্য গবেষণা করিতেছেন, স্বামীজী তখন কৌতুক করিয়া উত্তর দেন, 'ও কিছু নয়! যে পাত্রে পদ্ম জন্মে, বসু তাকেই কথা বলাবে!'

এই স্বল্প পরিচয় পরে আচার্য বসুর সহিত ভগিনী নিবেদিতার সৌহার্দ্য এবং ভগিনীর কাজে বসু দম্পতির সহানুভূতি ও সমর্থনে পরিণত হয়। বসু-দম্পতি মিসেস সেভিয়ার, মিসেস ওলি বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন। মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমেও তাঁহারা গিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা দার্জিলিঙে তাঁহাদের গৃহেই দেহত্যাগ করেন।

পেয়র হিয়াসান্থ

পেয়র হিয়াসান্থ একজন ফরাসী, তিনি প্রথম জীবনে 'কার্মেলাইট' সন্ন্যাসী ছিলেন। পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ বাগ্মিতা-গুণে এবং তপস্যার প্রভাবে তিনি ফরাসী দেশে ও সমগ্র ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে অতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৬৯ খৃঃ তাঁহাকে সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, কারণ তিনি খৃষ্টান ধর্মজগতে প্রচলিত দুর্নীতির প্রকাশ্য নিন্দা করিতে বদ্ধ-পরিকর ছিলেন। তিনি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া 'আবে লয়সন' নাম গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খৃঃ তিনি একজন আমেরিকান মহিলাকে বিবাহ করিয়া 'মঁ চার্লস্ লয়সন' নামে পরিচিত হন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী ঐ সময়ে ইওরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করে। রোমান ক্যাথলিকগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিত, কিন্তু প্রোটেস্টাণ্টগণের প্রসারিত বাহু তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিল।

ফরাসী দেশে ধর্মেতিহাস-সভায় যোগদান করিতে গিয়া স্বামীজী পেয়র হিয়াসান্থের সহিত পরিচিত হন। এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। বৃদ্ধ পেয়র খৃষ্টধর্মে প্রচলিত বিরুদ্ধ মতগুলির সামঞ্জস্যের জন্য এবং তুলনামূলক ধর্ম লইয়া কাল কাটাইতেছিলেন। স্বামীজীর নিজের কথায়, 'পেয়র বড়ই প্রেমিক ও শান্ত!' স্বামীজী তাঁহাকে তাঁহার সন্ন্যাস-জীবনের নামেই ডাকিতেন। অনেক সময় স্বামীজী এবং

পেয়র উভয়ে ধর্ম, আধ্যাত্মিক জীবন, সম্প্রদায় ও মতবাদ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করিতেন। এই আলোচনার সময় স্বামীজী ত্যাগ-বৈরাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তাহাতে সন্ন্যাস-জীবনের স্মৃতি পেয়রের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিত। পরে স্বামীজীর সঙ্গে পেয়র সস্ত্রীক কনস্তান্তিনোপল পর্যন্ত যান। পুনর্বার তাঁহারা স্কুটারিতে মিলিত হন। খৃষ্টান ও মুসলমান-দিগের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপনের জন্য জেরুজেলামের পথে পেয়র এশিয়া-মাইনরে স্কুটারিতে উপনীত হন।

স্বামীজী বলেন, 'মহাকবি ভিক্তর হুগো দু-জন লোকের ফরাসী ভাষার প্রশংসা করতেন, তার মধ্যে পেয়র হিয়াসান্থ একজন।'

ডাঃ নাঞ্জুণ্ডা রাও

ডাক্তার নাঞ্জুণ্ডা রাও, এম-ডি মাদ্রাজের বিখ্যাত ডাক্তার; আজও তাঁহার গৃহ তাঁহার নামের ফলক স্বীয় অঙ্গে বহন করিয়া দণ্ডায়মান। মাদ্রাজে যে কয়েকজন যুবক স্বামীজীকে প্রথম আমেরিকা যাইতে সাহায্য করিতে অগ্রবর্তী হন, নাঞ্জুণ্ডা রাও তন্মধ্যে অন্যতম। পরিব্রাজক অবস্থায় প্রথমবার মাদ্রাজে যখন স্বামীজী পৌছিয়াছিলেন, তখনই রাও স্বামীজীর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া ধন্য হন। তিনি স্বামীজীর মাদ্রাজী শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম। ইঁহাকে লিখিত স্বামীজীর পাঁচখানি পত্র পাওয়া যায়।

১৮৯৬ খৃঃ ১৪ই এপ্রিল স্বামীজী ডাক্তার রাওকে তাঁহাদের প্রস্তাবিত পত্রিকাটি প্রকাশ করার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেন এবং ইহা কিরূপ হইবে, সে-বিষয়েও উপদেশ দেন। এই ডাক্তার রাও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রথম পরিচালকগণের মধ্যে একজন। বি আর. রাজম রাও মৃত্যু পর্যন্ত ইহার সুযোগ্য সম্পাদক এবং 'কিডি' ইহার অবৈতনিক ম্যানেজার ছিলেন মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের পুরোভাগে পথপ্রদর্শকদের মধ্যে একজন এই ডাক্তার নাঞ্জুণ্ডা রাও।

খেতড়ি হইতে লিখিত ১৮৯৩ খৃঃ ২৭শে এপ্রিল স্বামীজীর পত্রে দেখা যায়, মুন্সী জগমোহন লালের সহিত ডাক্তার রাও-এর মাদ্রাজে আলাপ হয়। সম্ভবতঃ ডাক্তার রাও স্বামীজীকে মাদ্রাজ হইতেই জাহাজে উঠিতে অনুরোধ করেন।

১৮৯৪ খৃঃ ৩০শে নভেম্বর স্বামীজী-কর্তৃক লিখিত পত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ডাঃ রাও বৈরাগ্য-সঞ্চার-হেতু গৃহত্যাগের ইচ্ছা স্বামীজীকে জানান। স্বামীজী কিন্তু ডাঃ রাওকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ধর্মকর্মে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন। পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়—এই তিনটি, সর্বোপরি প্রেম সিদ্ধি-লাভের জন্য একান্ত আবশ্যক—ইহা লিখেন।

১৮৯৬ খৃঃ ১৪ই জুলাই 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার কতগুলি কপি পাইয়া নানারূপ মন্তব্য-সহ প্রশংসা করিয়া ডাঃ রাওকে লণ্ডন হইতে স্বামীজী পত্র লিখেন। ১৮৯৬ খৃঃ ২৬শে অগস্ট স্বামীজী সুইজারলণ্ড হইতে ডাঃ রাওকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে ব্যবসায়-বুদ্ধি ও যৌথ কারবারে ভারতীয়দের অসাফল্যের কারণ-সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত পাওয়া যায়। ডাঃ রাও সম্বন্ধে স্বামীজী অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, এই পত্রে তাহাও বুঝা যায়।

মিসেস এল্লা হুইলার উইলকক্স্

এই মহিলা আমেরিকায় 'নবচিন্তা আন্দোলনে'র একজন প্রতিষ্ঠাত্রী। তিনি স্বামীজীর উপদেশাবলী সম্বন্ধে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন।

তিনি এবং তাঁহার স্বামী কৌতূহলবশতঃ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে যান। কিন্তু বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা তাঁহারই কথায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

শ্রোতাদের মধ্যে মাত্র মিনিট-দশেক কাটাইবার পূর্বেই বোধ হইল, আমরা একটি অত্যন্ত স্বচ্ছ সজীব ও আশ্চর্য আবহাওয়ায় পৌঁছিয়াছি। বক্তৃতার শেষ পর্যন্ত আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকি। আমরা নূতন সাহস আশা বল ও বিশ্বাস পাইয়া দৈনন্দিন জীবনের উত্থান-পতনের সম্মুখীন হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।······ইহা সেই আর্থিক দুর্ঘটনার বিভীষিকাময় শীতকাল, যখন ব্যাঙ্ক ফেল পড়িতেছিল, শেয়ারের দাম ফুটা বেলুনের মতো চুপসাইতেছিল, ব্যবসায়ীরা হতাশার অন্ধকারে চলিতেছিল এবং সমস্ত পৃথিবী ওলট-পালট মনে হইতেছিল। কখন কখন উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া আমার স্বামী আমার সঙ্গে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। বক্তৃতা-শেষে তিনি শীতের নৈরাশ্যে রাস্তায় বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে স্মিতহাস্যে বলিতেন, 'সব ঠিক আছে, উদ্বেগের কোনও কারণ নাই।' আমিও উন্নত জ্ঞান ও প্রশস্ত দৃষ্টি লইয়া আনন্দের সহিত কাজে যোগ দিতাম। স্বামীজী বলিতেন, 'আমি তোমাদিগকে নূতন কোন বিশ্বাসে ধর্মান্তরিত করতে আসিনি, আমি চাই—তোমরা নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো; আমি মেথডিস্টকে আরও ভাল মেথডিস্ট, প্রেসবিটেরিয়ান্‌কে আরও ভাল প্রেসবিটেরিয়ান্‌, ইউনিটেরিয়ান্‌কে আরও ভাল ইউনিটেরিয়ানে পরিণত করতে চাই। আমি তোমাদিগকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবার এবং তোমাদের অন্তর্নিহিত আলোক প্রকাশ করার শিক্ষা দিতে চাই।' স্বামীজী যে বাণী দিয়াছিলেন, তাহা ব্যবসায়ীকে বলীয়ান্ করিয়াছিল, সমাজের চপলা নারীকে স্থির হইয়া চিন্তা করিতে বাধ্য করিয়াছিল, শিল্পীকে নূতন উচ্চতর আগ্রহ আনিয়া দিয়াছিল; স্ত্রী এবং মাতা, স্বামী এবং পিতাকে বৃহত্তর ও পবিত্রতর কর্তব্য-বোধে অনুপ্রাণিত করিত।

১৮৯৬ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে যখন স্বামীজী নিউইয়র্ক ম্যাডিসন স্কোয়ারে বক্তৃতা দিতেছিলেন, সেই সময় এই মহিলা ও তাঁহার স্বামী স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। মহিলা পরে স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

মিসেস হুইলার মিসেস ট্যানাট উডসের বন্ধু ছিলেন। মিসেস উডস্‌কে লিখিত পত্র হইতে স্বামীজীর উপর তাঁহার শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে আরও তথ্য জ্ঞাত হওয়া যায়।

অনারেবল মিস্টার মেরুইন-মেরি স্নেল

অনারেবল মিস্টার মেরুইন-মেরি স্নেল ধর্ম-মহাসভার বিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে চিকাগো ধর্মমহাসভায় বেদান্তধর্ম-প্রচারের সার্থকতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'ধর্মমহাসভার প্রধান সার্থকতার মধ্যে খৃষ্টান জগৎকে বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে বেদান্ত যে মহৎ শিক্ষা দিয়াছে, তাহা অন্যতম, যথা—অন্য বহু ধর্ম আছে, খৃষ্টধর্ম হইতে অধিকতর শ্রদ্ধেয়, যে-সকল ধর্ম দার্শনিক গভীরতায়, আধ্যাত্মিক দ্যুতিতে, স্বাধীন চিন্তা-প্রকাশে এবং উদারতা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহানুভূতিতে খৃষ্টধর্মকে অতিক্রম করে, এবং নৈতিক সৌন্দর্য ও কর্মক্ষমতায় বিন্দুপরিমাণ পশ্চাৎপদ নয়।'

স্বামীজী কয়েকবার বিজ্ঞান-বিভাগে বক্তৃতা দেন। স্বামীজীর সহিত মিঃ স্নেলের বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। মিঃ স্নেল বেদান্তধর্মের একজন

অত্যন্ত অনুরাগী এবং উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হন।

পরে মিঃ স্নেল লিখেন, 'হিন্দুধর্মের ন্যায় অন্য কোন ধর্মই মহাসভায় বা আমেরিকার জনগণের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।…এবং হিন্দুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রকৃতপক্ষে মহাসভার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাঁহাকেই বলা চলে। মহাসভায় বা বিজ্ঞান-বিভাগে যেখানে আমাকে সভাপতির সম্মান দেওয়া হয়, সেখানে স্বামীজী বক্তৃতা দিলে সকলের অপেক্ষা তাঁহাকেই বেশী উৎসাহের সহিত গ্রহণ করা হইত। তিনি যেখানেই যাইতেন, লোকেরা তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া থাকিত এবং তাঁহার প্রতিটি কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইত।……সর্বাপেক্ষা অনমনীয় গোঁড়া খৃষ্টান-গণও তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন, তিনি সত্যই মানুষের মধ্যে রাজার মতো।'

অনারেবল টমাস ডব্লু পামার

মিস্টার পামার ডেট্রয়েট শহরের একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। পরে রাজনীতিতে যোগদান করিয়া ১৮৮৩ খৃঃ তিনি সিনেটার হন এবং স্পেন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাজদূত নির্বাচিত হন। সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি চিকাগো World's Columbian Exposition-এ সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ধর্মমহা-সভায় স্বামীজীর সহিত পরিচিত হন।

স্বামীজী মিসেস ব্যাগলির অতিথি হইয়া ডেট্রয়েটে কয়েকদিন থাকার পর ডেট্রয়েট ত্যাগ করেন, কিন্তু পুনরায় ৯ই মার্চ (১৮৯৪) ফিরিয়া আসেন এবং মিঃ পামারের গৃহে অতিথিরূপে বাস করিতে থাকেন।

১২ই মার্চ স্বামীজী মেরী হেলকে পত্রে লিখেন, 'আমি এখন মিঃ পামারের অতিথি। ইনি বড় চমৎকার লোক। পরশু রাত্রে ভোজ দিলেন এঁর একদল প্রাচীন বন্ধুকে, তাঁদের প্রত্যেকেরই বয়স ষাটের উপর। দলটিকে ইনি বলেন—পুরানো বন্ধুদের আড্ডা। এক নাট্য-শালায় বক্তৃতা দিলাম আড়াই ঘণ্টা ; সকলেই খুব খুশী।'…

১৫ই মার্চ হেল-ভগিনীগণকে লিখিতেছেন, 'বুড়ো পামারের সঙ্গে আমার বেশ জমেছে। বৃদ্ধ সজ্জন ও সদানন্দ।… হ্যাঁ, আমার সম্বন্ধে সবচেয়ে মজার কথা লিখেছে এখানকার এক সংবাদপত্র : ঝঞ্ঝাসদৃশ হিন্দুটি এখানে মিঃ পামারের অতিথি, মিঃ পামার হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছেন, ভারতবর্ষে যাচ্ছেন ; তবে তাঁর জেদ, দুইটি বিষয়ে কিছু অদল-বদল চাই— জগন্নাথদেবের রথ টানবে তাঁর লগ্‌হাউস ফার্মের 'পারচেরন্' জাতীয় অশ্ব, আর তার 'জার্সি' গাভীগুলিকে হিন্দুর গোদেবী-সম্প্রদায়ভুক্ত ক'রে নিতে হবে। এইজাতীয় অশ্ব ও গাভী মিঃ পামারের লগ্-হাউস ফার্মে বহু আছে এবং এগুলি তাঁর খুব আদরের।'…

১৭ই মার্চ মিস ইসাবেল ম্যাকিণ্ডলিকে এক পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, 'মিঃ পামারের সঙ্গে বেশী সময় থাকার ব্যাপারে মিসেস ব্যাগলি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় আজ তাঁর বাড়িতে ফিরেছি পামারের বাড়িতে বেশ ভালোই কেটেছে। পামার সত্যি আমুদে দিলখোলা মজলিশী লোক, নিতান্ত নির্মল আর শিশুর মতো সরল। আমি চলে আসতে তিনি খুব দুঃখিত হলেন, কিন্তু আমার আর অন্য কিছু করবার ছিল না।'

ডেট্রয়েটে স্বামীজীর প্রথম অবস্থানের সময় পাদরী-মহলে যে ঝড় উঠে, তাহা শান্ত হইবার অবকাশ পাইবার পূর্বেই এই ঝঞ্ঝাসদৃশ হিন্দু

পুনর্বার ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে অতিথিরূপে রাখা এবং ১১ই মার্চ (১৮৯৪) 'অপেরা হাউসে' 'খৃষ্টান মিশন' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার পূর্বে সর্বসমক্ষে স্বামীজীকে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া মিঃ পামারের পক্ষে খুবই সাহসিকতা এবং উদার মনোবৃত্তির পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। ইহা স্বামীজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও আন্তরিক সৌহার্দ্যেরও পরিচায়ক।

রাবি লুই গ্রস্ম্যান

ইহুদী ধর্মযাজকগণকে 'রাবি' বলা হয়। রাবি লুই গ্রস্ম্যান ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার জ্ঞান ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মের নূতন ভাবধারায় আকৃষ্ট হন। ১৮৯৪ খৃঃ ডেট্রয়েটে ইউনিটেরিয়ান চার্চে ফেব্রুআরি মাসে বক্তৃতায় গ্রস্ম্যান শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

এই সকল বক্তৃতা শুনিয়া বেথ-এল মন্দিরে ধর্মোপদেশ দানকালে গ্রস্ম্যান তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তন করেন। গ্রস্ম্যান ডেট্রয়েট বেথ-এল মন্দিরের নেতা ছিলেন।

১৮৯৪ খৃঃ ১৮ই ফেব্রুআরি রবিবার গ্রস্ম্যান বেথ-এল মন্দিরে বক্তৃতা দেন, বিষয় ছিল, 'বিবেকানন্দ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিয়াছেন?'

'স্বামীজীর ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়: আমরা তাঁহার দেশের লোকের উপর যতটা পৌত্তলিকতার দোষারোপ করি, তদপেক্ষা বেশী পৌত্তলিকতা এদেশে আছে কিনা? তাঁহার ধর্ম মতবাদের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যায়। আমাদের মতবাদ অনেক সময় ধর্মের শালীনতার গণ্ডি অতিক্রম করে। বহু অর্থ এবং তাহা অপেক্ষা বেশী সদিচ্ছা—ধর্মান্তরিত করার কাজে ব্যবহৃত হয়; এদিকে আমাদের দেশের দরিদ্রেরা আমাদের দুয়ারে; যে দান এখানে এত প্রয়োজন, তাহা শুধু ধর্মের ভান দেখাইবার জন্য বহু দূরে ব্যবহৃত হইতেছে। দয়াবান্ লোকের সাহায্য বহু দুঃখীকে সুখ দিতে পারিত, বহু শ্রান্ত কর্মীকে সান্ত্বনা দিতে পারিত, বহু জীবনে সজীবতা আনিয়া দিতে পারিত, এবং বহু শিশুকে দারিদ্র্য-জনিত দুর্নীতির সংস্পর্শ ও সংক্রমণ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইত, কিন্তু মিশনরীদিগকে 'পৌত্তলিক' উদ্ধার করিতে যাইতেই হইবে। আমি বুঝি না, আমাদের এই দেশের সুস্থ ও বিবেচক নাগরিকদের এই বিভ্রান্তি—প্রবঞ্চনা বলিব না—কিভাবে মোহিত করিয়া রাখিতে পারে। 'কানন্দ' পৌত্তলিকদের সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া যথার্থ ভাষায় সরলভাবে অনেক কিছু বলিয়াছেন। চার্চ ও ধর্ম এত কাল যে সম্মান অন্যায়ভাবে কুড়াইয়াছে, 'কানন্দে'র ভাষণ সেই মিথ্যা দাবিকে লজ্জা দিয়াছে।

'ধর্ম—জীবন-দর্শন, কল্পনার বিষয় নয়। আমাদের বহু ভাব সুন্দর ও মার্জিত, কিন্তু সেগুলি শুধু শূন্যে ভাসিয়া বেড়ায়। আমাদের ধর্ম উচ্চ ভাব লইয়া কারবার করে, কিন্তু তাহা শুধু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ এখনও এত উন্নত বা এমন শিক্ষিত হয় নাই। আমরা ভ্রাতৃত্বের কথা বলি, কিন্তু প্রাচ্যবাসী এক ভ্রাতাকে অবাধে অপমান করি। আমাদের ধর্মতত্ত্বে অবিশ্বাসীকে নরকগামী বলা হয় এবং আমাদের ধর্মপ্রচারকগণ নিম্ন জগৎ লইয়া এতই ব্যস্ত যে, তাঁহাদের লক্ষ্যেই পড়ে না, তাঁহারা বহু লোকের জীবনে এই পৃথিবীর সৌন্দর্য ও স্বর্গীয় আকর্ষণ নষ্ট করিতেছেন।'

১৮৯৬ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে স্বামীজী গুডউইনকে সঙ্গে লইয়া একবার আমন্ত্রিত হইয়া ডেট্রয়েটে দুই সপ্তাহ কাটাইয়া আসেন। এই সময় রাবি গ্রস্ম্যানের অনুরোধে স্বামীজী ডেট্রয়েটে শেষ জনসভায় বক্তৃতা এই বেথ-এল

মন্দিরেই দেন। বিষয়বস্তু ছিল, 'পাশ্চাত্যে ভারতের বাণী' এবং 'একটি বিশ্বজনীন ধর্মের আদর্শ'। মিসেস ফাঙ্কি এই বক্তৃতা শুনিয়া লিখিয়াছেন :

'সেদিন রবিবার সন্ধ্যা—এত লোকের ভিড় হয় যে, আমরা শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়াছিলাম। রাস্তা পর্যন্ত লোকের ঠাসাঠাসি ভিড় এবং শত শত লোক ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। বিবেকানন্দ এই অসংখ্য শ্রোতাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা দীপ্ত ও নিপুণ ভাষণদানে তৃপ্ত করেন। আমি সে রাত্রে তাঁহাকে যেমন দেখিয়াছিলাম, পূর্বে কখনও ঐরূপ দেখি নাই। তাঁহার সৌন্দর্যে এমন কিছু ছিল, যাহা পার্থিব নয়। মনে হইতেছিল, যেন আত্মা দেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে এবং তখনই আমি শেষ দিনের পূর্বাভাস পাই। বহু বৎসরের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত এবং তখনই বুঝা যাইতেছিল, এই ধরাধামে তিনি বুঝি আর বেশী দিন নাই। এই দিক্‌টিতে আমি চোখ বুজিয়া থাকিতে চাই, কিন্তু অন্তরে আমি সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলাম ঠিকই। তাঁর বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তিনি অনুভব করিয়াছিলেন—কাজ করিয়া যাইতে হইবে।'

১৮৯৪ খৃঃ এই ডেট্রয়েটে স্বামীজী যে বিরোধিতার সম্মুখীন হন, তখন গ্রস্‌ম্যানের বক্তৃতা ও স্বামীজীর উপর তাঁহার এইরূপ শ্রদ্ধায় স্বতই প্রতীয়মান হয়, গ্রস্‌ম্যান স্বামীজীর ভাবধারায় কিরূপ অভিভূত ও আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

মীড-ভগিনীগণ

উইলিয়ম মীড লসএঞ্জেলেস সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যাঙ্ক-মালিক ছিলেন। তাঁহার তিন ভগিনী, যথাক্রমে মিসেস ক্যারী মীড ওয়াইকফ, মিসেস এলিস মীড হান্সবরো এবং মিস হেলেন মীড। ইঁহারা তিন ভগিনী দক্ষিণ পাসাডেনায় ৩০৯ নং মণ্টেরী রোডে এক বাড়িতে বাস করিতেন। এলিস হান্সবরো পরে তাঁহার বেদান্ত-সমিতির বন্ধুগণের নিকট 'শান্তি' নামেই পরিচিতা ছিলেন। ক্যারী মীড ওয়াইকফকে স্বামী ত্রিগুণাতীত 'ললিতা' নাম দেন এবং পরবর্তী জীবনে তিনি 'সিস্টার' নামেই পরিচিতা ছিলেন। আমরা এই দুই ভগিনীকে 'শান্তি' ও 'সিস্টার' নামেই অভিহিত করিব।

শান্তি স্বামীজীর 'রাজযোগ' পাঠ করিয়াছিলেন। তাই যখন স্বামীজীর বক্তৃতার কথা জানিতে পারিলেন, তখন তিন ভগিনী মিলিয়া তাহা শুনিতে যাওয়া স্থির করেন। পাসাডেনা সেক্সপীয়র ক্লাবের বক্তৃতার সময়ই তাঁহারা স্বামীজীর পরিচয় লাভ করেন। ইহা ১৯০০ খৃঃ জানুআরি মাসের ঘটনা। শান্তি পরে বলিতেন : স্বামীজীর বক্তৃতা প্রথম শুনিয়াই তাঁহার কাজে সাহায্য করিতে আমার মন উৎসুক হয় এবং সিস্টারও খুব প্রভাবান্বিত হন এবং বলিতেন, স্বামীজী তাঁহার শ্রোতাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া রাখিতেন এবং তাঁহার বক্তৃতার সময় একটি পিন-পতনের শব্দও শুনা যাইত।

সিস্টার ও হেলেন লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু বেশী সাহসী এবং উদ্যোগী শান্তি বক্তৃতার পরে জো-কে (মিস ম্যাকলাউড) জিজ্ঞাসা করেন, 'স্বামীজী পাসাডেনায় ক্লাস নেবেন কি?' জো শান্তিকে বলেন, 'স্বামীজীকেই জিজ্ঞাসা কর।' শান্তি জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী বলেন, 'তুমি আমার ক্লাসের ব্যবস্থা কর না কেন?' শান্তি স্বামীজীর সেক্রেটারি হন ও সকলের ছোট বোন হেলেন স্বামীজীর কয়েকটি বক্তৃতার বিবরণী রক্ষা করেন। 'আমার জীবন ও উদ্দেশ্য' বক্তৃতাটির লিপি হেলেনই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শান্তির কর্মক্ষমতা ও দ্বিধাশূন্য ভাব স্বামীজীর খুবই ভাল লাগে। শান্তি ও হেলেন উভয়কেই তিনি ভারতে যাইতে বলেন এবং তাঁহার জন্য কাজ করিতে বলেন। কিন্তু কেহই আসেন নাই। শান্তি তাঁহার কন্যা ডরোথিকে ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিতে পারেন নাই। স্বামীজী এই ভগিনীত্রয়কে 'থ্রি গ্রেসেস্' (The Three Graces) বলিতেন। তাঁহারা একটি ভাড়া বাড়িতে বাস করিতেন। তাঁহাদের খুব ইচ্ছা ছিল, স্বামীজী তাঁহাদের বাড়িতে অতিথি হন; কিন্তু স্বামীজী সঠিক কোনও ব্যবস্থা করেন নাই বা আতিথ্য-গ্রহণের কোন ভরসাও দেন নাই; একদিন আচম্বিতে সকালবেলা আসিয়া উপস্থিত হন।

এই গৃহে স্বামীজী প্রায় ছয় সপ্তাহ ছিলেন, সিস্টার স্বামী প্রভবানন্দকে পরে এইরূপ বলিয়াছেন। স্বামীজী যেহেতু পাসাডেনা ত্যাগ করিয়া ফেব্রুআরির শেষদিকে উত্তর ক্যালি-ফর্নিয়া যান, তাই মনে হয়—জানুআরি মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহেই মীড-ভগিনীদিগের গৃহে তিনি অতিথি হন।

স্বামীজী তাঁহাদের গৃহে থাকাকালে তাঁহারা বোধ করিতেন, যেন যীশু খৃষ্ট তাঁহাদের সঙ্গে আছেন। স্বামীজী যে শুধু সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক সত্য শিক্ষা দিতেন তাহাই নহে, তিনি নিজের জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিতেন। তিনি নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অতি সরলভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেন। শান্তির মনে আছে—স্বামীজী বলিতেন, ঈশ্বর-উপলব্ধির দুইটি ধাপ আছে : প্রথম—'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' এবং দ্বিতীয়—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' একবার তিনি সিস্টারকে বলেন, 'তুমি সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্ এবং সর্বজ্ঞ।' তিনি মনে করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, আত্মাই একমাত্র সত্য।

সিস্টার রান্নায় ব্যাপৃত থাকিতেন, স্বামীজীর ঘর পরিষ্কার করিতেন এবং অন্যান্য গৃহকর্ম করিতে ব্যস্ত থাকিতেন, ফলে স্বামীজী 'মার্থা'র সহিত তাঁহার তুলনা করিতেন। স্বামীজী মাঝে মাঝে সিস্টারকে রান্নাঘরে সাহায্য করিতেন। তিনি ঝাল খাইতে পছন্দ করিতেন এবং যখন সম্বরা দিতেন, তখন ভগিনীগণের চক্ষু জ্বালা করিত। তাই স্বামীজী সম্বরা দিবার পূর্বে বলিতেন, 'Here comes Grandpa ; ladies are invited to leave.' (ঠাকুরদা আসছেন, মহিলাগণকে চলে যেতে অনুরোধ করা হচ্ছে)।

একদিন ভগিনীগণের গৃহে এক বান্ধবী বেড়াইতে আসেন। মহিলাগণ প্রায় এক ঘণ্টা গল্প করেন এবং স্বামীজী বৈঠকখানা-ঘরে তাঁহাদের পাশে বসিয়া নীরবে ধূমপানই করিতে থাকেন। আগন্তুক মহিলা স্বামীজীকে চিনিতেন না এবং চলিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করেন, 'এই ভদ্রলোক কি ইংরেজী জানেন?' সকলেই ইহাতে কৌতুক বোধ করেন।

সিস্টারের গৃহের সম্মুখে স্বামীজীর দাঁড়ানো অবস্থার একটি ফটো আছে। শান্তি ও সিস্টার এবং অপর ভদ্রমহিলাগণের সঙ্গে স্বামীজী বন-ভোজনে বসিয়া আছেন, সেইরূপ ফটোও আছে। স্বামীজীর মাথায় পাগড়ি নাই, পরিবর্তে টুপি আছে, এই টুপিই সাধুদিগের জন্য তিনি পছন্দ করেন।

স্বামী তুরীয়ানন্দকে এক পত্রে স্বামীজী লিখেন, 'ইহারা অকৃত্রিম, পবিত্র এবং সম্পূর্ণ, স্বার্থশূন্য বান্ধবী।' তিনি ঐ গৃহ ত্যাগ করিবার পূর্বে বলেন, 'তোমরা তিন বোন আমার মনে চিরকাল স্থান পাবে।'

শান্তি স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ক্যালিফর্নিয়ায় গিয়া তাঁহার গৃহস্থালি দেখাশুনা করায় সহায়তা

করিতেন এবং সেক্রেটারির কাজ করিতেন। ১৯০০ খৃঃ ১৭ই মার্চ স্বামীজী মিসেস লেগেটকে এক পত্রে লিখেন, 'তিন বোনের মেজোটি মিসেস হ্যান্সবরো এখানে আছে। সে আমাকে সাহায্য করবার জন্যে অবিরাম কাজ ক'রে চলেছে। প্রভু তাদের হৃদয় আশীর্বাদে ভরিয়ে দিন। তিনটি বোন যেন তিনটি দেবী! আহা, তাই নয় কি? এখানে ওখানে এ-ধরনের আত্মার স্পর্শ পাওয়া যায় বলেই জীবনের সকল অর্থহীনতার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।'

শান্তি যদিও তাঁহার কন্যার জন্য খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন, তথাপি স্বামীজীর সঙ্গে 'ক্যাম্প টেলার'-এ চলিয়া যান। এই ক্যাম্পটি মারিন কাউন্টির রেড-উডসের মধ্যে ছিল। এখানে স্বামীজী শান্তিকে ধ্যান শিক্ষা দিবেন বলিয়াছিলেন। এখানে স্বামীজীর খুব জ্বর হয় এবং সে সময় ২৪ ঘণ্টা বৃষ্টি হইতেছিল। শান্তি প্রাণপণ স্বামীজীর শুশ্রূষা করেন। জো-কে পরে স্বামীজী বলেন, 'বিবাহিতা ভগ্নীটি আমাকে এত সহানুভূতির সহিত শুশ্রূষা করেন যে, তুমি ভাবতেই পার না।' জো ১৯০২ খৃঃ ৭ই সেপ্টেম্বর হেলেন মীডকে পত্রে ঐরূপ লিখেন। শান্তি রাত্রে বৃষ্টিতে ভিজিয়া সেই সময় স্বামীজীর তাঁবুর উপরে আরও একটি ক্যানভাস দিয়া ঢাকিয়া দেন, যাহাতে স্বামীজীর তাঁবুতে জল না পড়ে।

স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দকে পরে ক্যালিফর্নিয়ায় প্রচারকার্যে পাঠাইলে ভগিনীগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং অশেষ সাহায্য করেন। সিস্টার তুরীয়ানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শান্তিও স্বামী তুরীয়ানন্দের দীক্ষিতা এবং 'শান্তি' নাম তাঁহারই দেওয়া।

প্যাসাডেনার ৩০৯ নং মণ্টেরী রোডের এই গৃহ ১৯৫৫ খৃঃ দক্ষিণ ক্যালিফর্নিয়া বেদান্ত-সমিতির জন্য ক্রয় করা হয়। এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা এখন একটি তীর্থে পরিণত।

ত্রয়ী

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

উজ্জ্বল আনন্দ আর অভয়ের সুন্দর সজ্জায়
ধ্রুপদী প্রশান্তি নিয়ে নিত্য জ্যোতি এঁরা তিনজন;
বাংলার হৃদয় হ'তে বিশ্বের হৃদয়-পদ্মাসন
এক হ'য়ে মিশে গেছে এ-ত্রয়ীর গাঢ় মহিমায়!
অজস্র মুখের দেখি সমারোহ কালের চূড়ায়,
তার মাঝে সমুজ্জ্বল তিনটি মুখের শিল্পায়ন
প্রসন্ন প্রত্যয়ে জাগে: আলোকের প্রগাঢ় জীবন
প্রত্যাশী প্রাণের তৃষ্ণা তৃপ্ত করে প্রভাতে সন্ধ্যায়!

স্বচ্ছন্দ শরীরী যেন প্রার্থনার মৌনতার মাঝে,
অনেক নিঃসঙ্গ ঘরে পূর্ণতার প্রার্থিত প্রতীক;
যে-সত্যের কৃষ্ণচূড়া জ্বলে' ওঠে সময়ের কাজে,
সে-সত্যের স্বরূপের আত্মীয়তা বুঝায়েছে ঠিক!

ত্রয়ী হৃদয়ের কান্তি হে ঈশ্বর, তোমারি তো দান:
অন্তরে আস্বাদ্য হোক এ-কান্তির ঐশ্বর্য অম্লান।

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি*

[শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীর ডায়েরী হইতে]

(১)

যে সময়ের ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেছি, তাহা ইং ১৯১৭ খৃঃ গ্রীষ্মাবকাশ। সেইবার বি-এ পরীক্ষার পর আমার বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে ৺পুরীধামে গমন করি। আমার পক্ষে সেই প্রথম তীর্থদর্শন। কলেজে অধ্যয়ন করিবার কালেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রভৃতি গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অমৃতোপম উপদেশ জীবনে প্রতিফলিত করিবার বাসনা অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসহচরগণের পুণ্যদর্শন-লাভের জন্যও প্রাণে একটা তীব্র প্রেরণা অনুভব করিয়াছিলাম। প্রথম হইতেই কি জানি কেন, এক অজ্ঞাত প্রেরণায় ঐ-সকল গ্রন্থাদি পাঠ করিবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের 'মানসপুত্র' শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজের প্রতি স্বতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। মহারাজ-সম্বন্ধে ঠাকুর বলিয়াছেন: 'কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম, ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে।' 'আহা, আজকাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়চে। অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কি না, তাই ঠোঁট নড়ে। এ-সব ছোকরারা নিত্যসিদ্ধের থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। বেদেতে হোমা-পাখির কথা আছে; সে পাখি আকাশেই থাকে, মাটির উপর কখনও আসে না।... এ-সব ছোকরারা ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলাই সংসার দেখে ভয়। এক চিন্তা—কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বরলাভ হয়।' 'মাকে বলেছিলাম, মা! আমার তো আর সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে—একটি শুদ্ধ ভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে সর্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও। তাইতো রাখাল এল।'—এইরূপ অনেক কথা শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীমহারাজ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন।

মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণের ভিতরটা প্রায়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিত। এ পর্যন্ত সে আশা মিটাইবার অবসর বা সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। নিজের দুর্বলতার প্রতি যখনই দৃষ্টি পড়িত, তখনই অলক্ষিতে একটা অব্যক্ত সঙ্কোচ ও ভয় আসিয়া মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিত, মনে হইত—আমার মতো অকৃতী অধমকে কি তিনি কখনও চরণে স্থান দিবেন? হৃদয়ের আবিলতা লইয়াই বা তাঁহাদের মতো শুদ্ধ শান্ত অপাপবিদ্ধ ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণের সম্মুখে দাঁড়াইব কি করিয়া? আবার কখনও ভাবিতাম, যদি তাঁহাদের চরণাশ্রয় করিতে না পারি, তবে এই তরঙ্গাকুল ঘোর ভবার্ণবই বা কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইব? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন:

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়নম্।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্॥
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২৬।৩২)

—এই ঘোর সংসার-সাগরে পড়িয়া যাহারা হাবুডুবু খাইতেছে, কর্মের বিপাকে কখনও উচ্চ কখনও নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতেছে—ব্রহ্মবিদ্ শান্ত সাধুগণই তাহাদের উদ্ধারলাভের সুদৃঢ় নৌকাস্বরূপ।

যাহা হউক এইরূপ নানা বিরুদ্ধ চিন্তার মধ্যে পড়িয়া হৃদয়ে দারুণ ব্যথা অনুভব করিতাম। কোথায় শান্তি, কাহার নিকট যাইয়া প্রাণের সমস্ত দুঃখ নিবেদন করিয়া হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি দূর করিতে পারিব—এই সকল চিন্তা প্রতিনিয়ত প্রাণের দ্বারে সজোরে আঘাত করিত। পথভ্রান্ত পথিক উত্তপ্ত মরুভূমিতে যেমন সুশীতল ছায়া ও নির্ঝরের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের সমগ্র ভার কাহারও অভয় চরণ-প্রান্তে অর্পণ করিয়া শান্তির জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কেবলই ভাবিতাম, শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজকে যদি একবার দেখিতে পাইতাম, তবে বোধহয় প্রাণের সকল ব্যথা দূর হইয়া যাইত।

৺পুরীধামে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিলাম। ইতঃপূর্বে কখনও সমুদ্র-দর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই। সমুদ্রতীরে যাইয়া দেখিলাম, ফেনিল ঊর্মিমালা-সুশোভিত অনন্তবিস্তৃত নীলসিন্ধু ভৈরবগর্জনে সৈকতভূমিকে প্রতিনিয়ত প্রচণ্ডবেগে আঘাত করিতেছে। ঊর্ধ্বে মেঘমুক্ত নীলাকাশ, অম্বরতলে ঊর্মিমুখর নীলাম্বুরাশি, সাগরসৈকতে অগণিত ভক্তহৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দোচ্ছ্বাস; অদূরে অভ্রভেদী বিরাট দেবায়তন—এ সকলই আমার চক্ষুর সম্মুখে এক নূতন রাজ্যের বার্তা আনিয়া দিতেছিল; প্রাণের কত সুপ্ত সংস্কার জাগিয়া উঠিতেছিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই ৺পুরীধামের সমস্ত দেবমন্দির ও তীর্থস্থানাদি দর্শন করিয়া শেষ করিলাম। এ-স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, 'তীর্থ'নামে পরিচিত নীলশৈবালাবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্বলগুলিতে আমার ভক্তিমতী বৃদ্ধা পিতামহী তীর্থ-পাণ্ডার নির্দেশে অবগাহন করিয়া পুণ্য অর্জন করিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আমাকেও সেইসকল দুর্গন্ধ তীর্থসলিলে অবগাহন করিতে হইল! একদিন যেখানে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার অন্ত্যলীলার শেষাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সেই 'গম্ভীরা' নামক স্থান দর্শন করিতে যাই। আমরা ভক্তিভরে সেই পবিত্রস্থানে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই জনৈক স্থূলকায় বৃদ্ধ বৈষ্ণবসাধু অতি আদরের সহিত শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ব্যবহৃত কন্থা ও কাষ্ঠপাদুকা আমাদের মস্তকে স্পর্শ করাইলেন এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠ শ্রবণের জন্য সেখানে আসিতে বলিলেন। কিন্তু আমার মন কেবলই ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল মহারাজের পুণ্যদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত এবং কোন শিক্ষিত বাঙালীকে দেখিতে পাইলেই জিজ্ঞাসা করিতাম, 'রামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ ৺পুরীধামে আসিয়াছেন কিনা?'

হঠাৎ একদিন এক বাঙালী ভদ্রলোকের নিকট শুনিতে পাইলাম—শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ এখন এই পুরীধামেই রহিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম—তিনি 'শশী-নিকেতন' নামক একটি বাড়িতে অপরাপর সন্ন্যাসী সহ অবস্থান করিতেছেন। এই সংবাদ-শ্রবণে একদিকে যেমন প্রাণে অত্যধিক উল্লাসের সঞ্চার হইল, অপরদিকে নৈরাশ্য ও দৈন্য আসিয়া হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কেবলই এক চিন্তা—তাইতো তিনি যদি আমাকে গ্রহণ না করেন, যদি তিনি আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে না দেন, তাহা হইলে যে আমার বুক ভাঙিয়া যাইবে। এইরূপে সন্দেহ ও শঙ্কার দোলায় মন সর্বদা দুলিতে লাগিল। মনে করিলাম, তিনি যদি আমাকে গ্রহণ নাও করেন, অন্ততঃ তাঁহাকে একবার দর্শন করিয়া তো আসিতে পারিব। এইরূপ নানা চিন্তায় উদ্বিগ্ন মন লইয়া একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমুদ্র-

দর্শনান্তে সেই পূর্বকথিত 'শশী-নিকেতনে'র দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, উহা ভিতর হইতে বন্ধ। ভাবিলাম, আমার পক্ষে তো এত বড় বাড়িতে প্রবেশ করাও সম্ভব নয়। আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ, হাঁক ডাক করিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করাও নিতান্ত ধৃষ্টতা বৈ আর কিছুই নয়। ক্ষুণ্ণমনে ঐস্থানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি—এমন সময় একজন লোক ঐ রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহাশয়, এই বাড়িতে কি ক'রে যাওয়া যায় ?' তিনি বলিলেন, 'সেজন্য ভাববেন না। আমি এর ব্যবস্থা করছি।'—এই বলিয়া 'বরদাবাবু, বরদাবাবু' বলিয়া তিনি ডাক দিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ উৎকট চীৎকার শুনিয়া আমি অত্যন্ত ম্রিয়মাণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, ওরাই বা কি মনে করিবেন! এতটা হাঁক ডাক করিয়া মহারাজকে দর্শন করিতে যাওয়াও আমার পক্ষে নিতান্তই বেয়াদবি। যাহা হউক, ইত্যবসরে পলিতকেশ ও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট জনৈক ভদ্রলোক (ইনিই বরদাবাবু—উক্ত বাটীর তত্ত্বাবধায়ক) আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া আমাকে বিনীত ভাবে ও স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি মহারাজকে দর্শন করতে করতে এসেছেন ?' আমার পক্ষে তখন কেবল 'হ্যাঁ' এই উত্তর ভিন্ন অন্য কিছুই বলিবার সামর্থ্য ছিল না। প্রাণের ভিতর দুরু দুরু করিতে লাগিল—যেন যুদ্ধ চলিয়াছে। প্রাণবায়ু সজোরে বক্ষ-পঞ্জরে আঘাত করিতে লাগিল। মনে হইতেছিল, আমি এইভাবে একাকী এখানে আসিয়া ভাল করি নাই; সঙ্গে অপর কেহ থাকিলে ভাল হইত।

ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, বহির্বাটীর সুপ্রশস্ত বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসিয়া এক সৌম্যদর্শন গম্ভীরমূর্তি দিব্যপুরুষ নলসংযোগে ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয়ের চিত্তোন্মাদনকারী সুমিষ্ট সুরভি সান্ধ্য সমীরণ বহন করিয়া সেই স্থানটিকে মধুময় করিয়া তুলিয়াছে। মহারাজের সমুন্নত দেহ, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, তপস্যাপূত শান্ত গম্ভীর প্রেমোজ্জ্বল মূর্তি সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে বড়ই মধুর বলিয়া মনে হইতেছিল। অদূরে উক্ত বারান্দায় গৈরিকধারী কয়েকজন সন্ন্যাসীও উপবিষ্ট। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজের চরণযুগল মস্তকদ্বারা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। অনেকক্ষণ ঐ ভাবেই পড়িয়া রহিলাম। আজ প্রাণে কি আনন্দ! কত যে উদ্বেগ ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া দীর্ঘ কালের পর এই দেহখানি অমৃতসিন্ধুর শান্তিসৈকতে আজ বহন করিয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। যে চরণপ্রান্তে বিশ্রামলাভের জন্য নিদারুণ অশান্তি ও তীব্র বেদনা প্রাণের পরতে পরতে অনুভব করিয়াছি, আজ অহেতুক-কৃপাসিন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুর হাত ধরিয়া আমাকে সেই শান্তিধামে টানিয়া আনিয়াছেন! প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি অতি স্নেহভরে আমাকে বলিলেন, 'হ্যাঁরে, তোকে কোথায় দেখেছি, না ?' আমি তো এ প্রশ্ন শুনিয়া অবাক্! আমাকে তিনি কবে কোথায় দেখিলেন ? ভাবিলাম, হয়তো তিনি আমার মতো অন্য কাহাকেও দেখিয়া ভুলবশতঃ ঐরূপ বলিতেছেন। আমি বলিলাম, 'না, মহারাজ, আপনার সঙ্গে তো আমার এই প্রথম দেখা। আমি তো আপনাকে পূর্বে আর কোথাও দেখিনি।' তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোকে কোথায় দেখেছি। তা, তুই এতদিন আসিস্‌নি কেন ?'

আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। একে তো পূর্বে কখনও দেখা হয় নাই, তারপর আবার এতদিন আসি নাই কেন, তজ্জন্য অনুযোগ! তিনি এমনি স্নেহমাখা স্বরে এই কয়টি কথা আমাকে বলিলেন যে, আমার ভিতরের সমস্ত দুরু দুরু ভাব, অস্থিরতা, সঙ্কোচ, সন্দেহ এককালে কোথায় চলিয়া গেল। যেন কত দিনের পরিচিত; জন্মজন্মান্তর ধরিয়া যেন ইঁহার সঙ্গে আমার কি এক গভীর আত্মীয়তা চলিয়া আসিতেছে! কবি কালিদাস তাঁহার 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকে সত্যই লিখিয়াছেন:

'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরানি জননান্তর-সৌহৃদানি ॥'

—কোন রমণীয় দৃশ্য দর্শন করিয়া, কোন শ্রুতি-মধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখী ব্যক্তি যখন উন্মনা হইয়া উঠেন, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, তাহার চিত্ত-ফলকে দৃঢ়াঙ্কিত প্রিয়জনের মধুর স্মৃতি অজ্ঞাতসারে জাগ্রত হইয়াছে।

আমি আর সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ক্ষণপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই কোথায় উঠেছিস? খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে?' আমি বলিলাম, 'এক পাণ্ডার বাড়িতে উঠেছি। ৺জগন্নাথদেবের প্রসাদ নিত্য 'আনন্দবাজার' থেকে কিনে এনে ভোজন করি।' তিনি বলিলেন, 'সে তো ভালোই।'

মহারাজ। কতদিন এখানে থাকবি?

আমি। এই স্নানযাত্রা পর্যন্ত। আমার বৃদ্ধা ঠাকুর-মা আছেন। রথযাত্রার সময় অত্যধিক ভিড় হয় ব'লে স্নানযাত্রা দর্শন করেই তিনি চলে যাবেন। আমিও তখন ঐ সঙ্গে চলে যাব।

মহারাজ। আচ্ছা, একজন লালটুকটুকে সাধু দেখবি?

আমি। (ভাবিলাম—এই তো মহারাজকে দেখিতেছি। আবার নূতন কোন্ সাধুকে দেখব? যাহা হউক, মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম:) তিনি কখন আসবেন?

মহারাজ। তা বলা শক্ত। কখন আসবেন, তার ঠিক নেই। তুই যদি দুবেলা এখানে আসিস, তবে তিনি যখনই আসুন, এক সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তোরও তো আর কোন কাজ নেই।

আমি। আচ্ছা মহারাজ, আমি তাই ক'রব।

এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকিরণে সমস্ত ঘরবাড়ি উদ্ভাসিত। আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেছি, তিনি স্নেহভরে বলিলেন, 'এস'।

তারপর যে কয়দিন ৺পুরীধামে ছিলাম, প্রায় প্রত্যহই দুইবেলা শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট 'শশী-নিকেতনে' যাইতাম এবং সেই লালটুকটুকে সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। মহারাজ আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। একদিন সত্যসত্যই গৌরকান্তি একজন সন্ন্যাসীকে প্রাগুক্ত ঘরের প্রশস্ত বারান্দায় একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম, শ্রীশ্রীমহারাজ আমাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, 'যা, এঁকে প্রণাম কর্। ইনিই সেই সাধু?' আমি তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলাম। পরে জানিতে পারিলাম, ইনিই শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম শিষ্য ও লীলাসহচর শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ। তিনি অসুস্থ হওয়ায় স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্য সে-বার ৺পুরীধামে আসিয়াছিলেন। আমার ভাগ্যে মহাপুরুষদ্বয়ের দর্শন এই প্রথম। এই 'সাধুদর্শন' উপলক্ষ্য

করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ আমার ৺পুরীধামে অবস্থান-কালে কয়েকদিন কেমন করিয়া প্রত্যহ তাঁহার পূতসঙ্গদানে এ জীবনের ঊষর ক্ষেত্রে চির আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন, কেমন করিয়া স্নেহবারি-সিঞ্চনে অন্তর্নিহিত সুকুমার বৃত্তিসমূহ ধীরে ধীরে মুকুলিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয়-মন শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া ওঠে। এই অকৃতী অপরিচিত যুবককে যেরূপ অযাচিত স্নেহ- ও করুণা-দানে স্বল্প কয়েকদিনেই আপনার হইতে আপনার করিয়া তুলিয়াছিলেন, প্রথম দর্শনের দিন হইতেই যেরূপ চিরপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিয়া সমগ্র সঙ্কোচ ও দুর্বলতা একমুহূর্তে দূর করিয়াছিলেন এবং পরবর্তী জীবনের প্রেমসম্বন্ধ যেভাবে এই পুণ্য ভূমিতে এই মহাপুরুষের পূত চরণতীর্থে প্রথম প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা শুধু অন্তরের উপলব্ধির ও ধ্যানের বিষয়।

স্নানযাত্রার পরই ৺পুরীধাম হইতে দেশে ফিরিলাম। গৃহে আসিয়াও শান্তি নাই। কেবলই শ্রীশ্রীমহারাজের সেই স্নেহমাখা কথা-কয়টি হৃদয়ের কোণে সর্বদা জাগিতে লাগিল, এবং এক অব্যক্ত প্রেরণায় দিন দিন সমগ্র প্রাণ-মন দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কত আপনার, আপনার হইতেও আপনার! তিনি কেনই বা আমাকে এত পরিচিতের ন্যায় আদর-যত্ন করিলেন? কেনই বা এতদিন তাঁহার নিকট যাই নাই বলিয়া অনুযোগ করিলেন? কে এই রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করিবে? না জানি কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাঁহার স্নেহকোমল ক্রোড়ে এ দীন সন্তানকে তিনি আশ্রয় দিয়া আসিতেছেন! তাই পুরাতন স্মৃতি এবার প্রথম দর্শনেই নবীন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, পরমাত্মীয়ের সন্দর্শনে তাই বুঝি তাঁহার করুণ হৃদয় আনন্দে স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল।

মহারাজকে দর্শন করিবার পর কৈশোরের এক অস্ফুট স্মৃতি আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ জাগিয়া উঠিতেছিল। স্বপ্ন কখনও সত্য হয় কিনা, তাহা জানি না; কিন্তু কখন কখন এমন এক-একটি ঘটনা জীবনে ঘটিয়া থাকে, যাহাতে মনে হয়—স্বপ্ন একেবারে অমূলক বা অর্থহীন নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে একজন মহাপুরুষকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম, তাই আজ স্বতই মনে প্রশ্ন উঠিতেছিল—ইনিই কি তবে সেই সন্ন্যাসী? স্বপ্নের সেই মধুর স্মৃতি হৃদয়ে এক নূতন আনন্দের প্রস্রবণ খুলিয়া দিল। সেই বিস্মৃত ছায়াচিত্র আজ সজীব হইয়া সত্যই যেন অন্তরের গভীরতম প্রদেশে এক অজ্ঞাত রাজ্যের আভাস দিতে লাগিল। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, এখনও সেই স্বপ্নের কথা মনে হইলে হৃদয় মধুময় হইয়া উঠে।

স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম: একদিন সন্ধ্যায় গোধূলি-লগ্নে জনৈক বন্ধুসহ ভ্রমণ করিতে করিতে একটি সুবিস্তৃত গোচারণ-ভূমির প্রান্তদেশে জনহীন শ্মশানক্ষেত্রে আমরা উভয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তখনও পৃথিবীর বুকে আঁধার নামিয়া আসে নাই। অস্তাচল-শায়ী দিনমণির শেষ রশ্মির ক্ষীণালোকে প্রান্তর, বৃক্ষলতা, শ্মশানভূমি তখনও আলোকিত, প্রকৃতি নীরব, নিস্তব্ধ। কৃষককুল, রাখাল বালক—সকলেই দিবাবসানে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়াছে। সম্মুখে সেই মহাশ্মশান—যেখানে এই পার্থিব জীবনের অভিনয় শেষ করিয়া মানব সংসারমঞ্চ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া থাকে; এই সেই পুণ্যভূমি শ্মশান, যাহার পূতস্পর্শে ধনী নির্ধন, সম্রাট্ ভিখারী, বিদ্বান্ মূর্খ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সুন্দর কুৎসিত—সকলেই সমান হইয়া যায়। আত্মার অমরত্ব, দেহের

নশ্বরত্ব ঘোষণা করিয়া যে পুণ্যক্ষেত্র জাতিকুল-নির্বিশেষে সকলকেই তাহার অভয় অঙ্কে স্থান দিয়া জগতের ভেদবৈষম্যের নিরসন করিয়া চিরমিলন-ভূমিরূপে সর্বদা মানবকে ধর্মের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, আজ সেই শ্মশানক্ষেত্রে আমরা উপস্থিত। উভয়ে শ্মশানের একপ্রান্তে বসিয়া রহিলাম। দেখিলাম—দুই-একখানি ছিন্নকন্থা, কয়েকটি অর্ধদগ্ধ কাষ্ঠ ও ভগ্ন মৃত্তিকা-পাত্র সেইখানে ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে; হয়তো বা কিছুদিন পূর্বে কেহ পিতামাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া এই শেষ শয্যায় শয়ন করিয়াছে; তাহারই কিঞ্চিৎ চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। মনে কত কথাই উঠিতেছিল। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি Grey লিখিত শোক-গাথায় একদিন পড়িয়াছিলাম:

The boasts of heraldry, the pomp of power,
All that beauty, all that wealth ever gave
Await alike the inevitable hour,—
The paths of glory lead but to the grave.

—আভিজাত্যের অভিমান, ক্ষমতার দর্প, সৌন্দর্য, গৌরব, ঐশ্বর্যের উন্মাদনা—সকলই কি এক অবশ্যম্ভাবী কালের (ধ্বংসের) প্রতীক্ষা করিয়া থাকে! শ্মশান-ভূমিতেই সমগ্র পার্থিব গৌরবের পর্যবসান। সন্ধ্যার সেই মৌন সন্ধিক্ষণে দেখিলাম অদূরে মুণ্ডিতমস্তক গৈরিক বস্ত্র-পরিহিত দিব্যকান্তি এক সন্ন্যাসী বীর-পদসঞ্চারে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমরা সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তিনি নিকটে আসিয়া স্নেহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোরা এ শ্মশানে কি জন্য এসেছিস ?'

আমি। বেড়াতে বেড়াতে এখানে এসে পড়েছি।

সন্ন্যাসী। আচ্ছা, তোরা কখনও দেবদেবী দেখেছিস ?

আমি। আজ্ঞে হ্যাঁ, মন্দিরে তো অনেক রকম দেবদেবী দেখেছি, ছবিতেও দেখেছি।

তিনি একটু মৃদু হাস্য করিয়া পুনরায় স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, 'তোরা শিব-পার্বতী দেখবি ?'

আমি। এখানে তো কোন মন্দির নেই; কেমন ক'রে দেখব ?

সন্ন্যাসী। যদি দেখতে চাস্, তবে তোরা দু-জন এই অর্ধদগ্ধ কাঠ বুকে জড়িয়ে ধ'রে শ্মশানের মাঝে পড়ে থাক। দেখবি—শিব-পার্বতী তোদের সামনে দিয়ে চলে যাবেন। যা, শিগগির ঐখানে পড়ে থাক।

সন্ন্যাসী-ঠাকুরের কথার এমনি দুর্জয় সম্মোহনী শক্তি ছিল যে, আমরা কোন দ্বিধাবোধ না করিয়া সেই কাষ্ঠখণ্ড আলিঙ্গন করিয়া চিতাভূমিতে শয়ন করিয়া রহিলাম। অল্পক্ষণ পরেই দেখিলাম—সত্য সত্যই জটাজুটশোভিত ব্যাঘ্রাম্বরপরিহিত, রজতশুভ্রকান্তি দেবাদিদেব মহাদেব ত্রিশূলহস্তে ধীরগম্ভীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন; আর তাঁহার পশ্চাতে নিকষিত-হেম-কান্তি মা উমা শঙ্করী ললিতগতিতে চলিয়াছেন—বিশ্বের সমস্ত মাধুর্য যেন মায়ের মুখকমলে জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। করুণার প্রতিমূর্তি মায়ের সেই কমনীয় জীবন্ত বিগ্রহ দেখিয়া হৃদয়-মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইতেছিল, দৌড়াইয়া গিয়া মায়ের স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। কিন্তু পন্নগভূষণ উমানাথ শঙ্করের সেই গম্ভীরমূর্তি-সন্দর্শনে কেমন একটা অস্পষ্ট ভয় আসিয়া হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল, ক্ষণপরে সেই মূর্তি আর দেখিতে পাইলাম না।

আমরা সেইভাবেই কিছুক্ষণ পড়িয়া আছি, এমন সময় সেই সন্ন্যাসী নিকটে আসিয়া পুনঃ স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'তোরা গোপাল দেখবি ?' বাল্যকাল হইতেই গোপালমূর্তিকে বড় ভালবাসিয়াছি, তাই তাঁহার কথা শ্রবণ

করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া আবেগ ও ও উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলাম, 'গোপালকে এনে দিন, তাকে পেলে আর আমাদের আনন্দের সীমা থাকবে না। আমরা গোপালকে দেখব।'

তারপর যাহা দেখিলাম, তাহা ভাষায় দেখি, প্রকাশ করা সম্ভব নহে। সেই নবনীরদ-কান্তি যশোদা-দুলাল শ্যামসুন্দরকে বক্ষে ধারণ করিয়া জ্যোতির্ময় সেই সন্ন্যাসী আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। গোপাল মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আমি তোমাদের বাড়ি যাব।' আমিও সেই প্রেম-বিগ্রহটি বক্ষে ধারণ করিয়া আনন্দে আপন গৃহে ফিরিতে লাগিলাম।

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখনও সমস্ত শরীর পুলকে স্পন্দিত হইতেছিল। এক অভিনব আনন্দের স্রোত ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছিল। আমি তখন ঠিক কোথায় রহিয়াছি, তাহাও স্বপ্নের মধুর ঘোরে স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। ক্রমে যখন নিদ্রার জড়তা দূর হইল তখন বুঝিলাম, আমি এতক্ষণ স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলাম। সত্যই ইহা কি স্বপ্ন? না জাগ্রৎ? এমন সুস্পষ্ট অনুভূতি, এমন মধুর স্পর্শ, উজ্জ্বল দর্শন, এমন স্বর্গীয় আনন্দের প্রগাঢ় অনুভূতি—ইহা কি স্বপ্নে সম্ভব? এখনও যে শরীরের প্রতি রোমকূপ হইতে সেই দিব্যানন্দ শতধারে উৎসারিত হইতেছে; সেই শ্যামসুন্দরের মোহন-মূরতি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ইহা 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু?' বাস্তবিকই জাগ্রতের অনুভূতিকে আজ স্বপ্নের এই অপূর্ব দর্শন তুচ্ছাতিতুচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে; জাগ্রৎ ও স্বপ্নের ক্ষীণ ব্যবধান কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে!

শ্রীশ্রীমহারাজকে ৺ পুরীধামে দর্শন করিবার পর যখন দেশে ফিরিয়া আসি, তখন কৈশোরের স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের স্মৃতি প্রতিনিয়ত হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল। আর মনে হইতেছিল, যেন ইনিই সেই সন্ন্যাসী—যিনি স্বপ্নে আমাকে চিরবাঞ্ছিত মূর্তি দর্শন করাইয়া এ জীবন মধুময় করিয়া তুলিয়াছেন। যতই গভীর-ভাবে এ-বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই স্বপ্নদৃষ্ট সন্ন্যাসীর সৌম্য-গম্ভীর মূর্তি মানসচক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল; দেখিলাম—এই দুই মূর্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এতদিন স্বপ্নের সেই স্মৃতি হৃদয়ের কোন্ এক অজানা স্তরে সুপ্ত ছিল। বিভিন্ন চিন্তা ও সংস্কার-প্রভাবে উহা সজীব ও জাগ্রত হইয়া উঠিবার কোন অবকাশ এতদিন পায় নাই। আজ স্বগৃহে বসিয়া যতই ৺ পুরীধামের সেই মিলন-দৃশ্য চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই পূর্বের স্বপ্নস্মৃতি সজীব হইয়া নূতন ছন্দে মানসপটে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। সূর্যের প্রখর রশ্মি-সম্পাতে প্রভাতের নিবিড় কুয়াসা যেমন শূন্যে বিলীন হইয়া যায়, আজ সদ্যোজাগ্রত স্মৃতির সেই স্নিগ্ধালোকে হৃদয়ের সমস্ত সন্দেহ সংশয় চিরদিনের জন্য অপসারিত হইল। আজ শ্রীশ্রীমহারাজের সেই স্নেহপূর্ণ আহ্বান, আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার কত অর্থপূর্ণ হইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল! অন্ধ আমরা—এই গভীর আধ্যাত্মিক রহস্যের মর্ম কি করিয়া উদ্ঘাটিত করিব? অহেতুক-কৃপাসিন্ধু এই সকল মহাপুরুষ মোহাচ্ছন্ন জীবের উদ্ধারের জন্যই সতত সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। তাই 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে আচার্য শঙ্কর সত্যই লিখিয়াছেন:

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ ॥৩৭॥
অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎপর শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম্।
সুধাংশুরেষ স্বয়মর্ক-কর্কশ-প্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল॥৩৮॥

—বসন্তঋতু যেমন তাহার অপূর্ব সৌন্দর্য বিস্তার করিয়া প্রকৃতিকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করিয়া

সকলকে আনন্দ দান করিয়া থাকে, তেমনি অহেতুক-কৃপাসিন্ধু প্রশান্তচিত্ত মহাপুরুষগণও স্বয়ং এই দুস্তর বিপদ্‌সঙ্কুল সংসার-পারাবার উত্তীর্ণ হইয়া মোহান্ধজনকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিয়া চিরআনন্দের অধিকারী করিয়া থাকেন। পূর্ণচন্দ্র তাহার অমিয় কিরণধারায় প্রচণ্ড মার্তণ্ড-তাপক্লিষ্ট ধরিত্রীকে অভিসিঞ্চিত করিয়া থাকে; মহাত্মাগণও সেইরূপ মোহমুগ্ধজীবগণকে অসীম শান্তির অধিকারী করিয়া তাহাদের জীবন সার্থক করিয়া তোলেন—কারণ ইহাই তাঁহাদের স্বভাব।

(ক্রমশঃ)

ক্ষমা করো তুমি স্বদেশের অপরাধ

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

জীবের সেবায় ওগো সুন্দরতম,
সঁপিলে নিজেরে অলখ্ নিরঞ্জন!
তোমারে দেখেছি পার্থসারথি সম,
অভী-মন্ত্রের করেছ উদ্বোধন।
তোমার চরণ স্মরণের মালা গাঁথি
শুনিনিক মোরা তব ভাগবত-বাণী।
তাই প্রতিশোধ নিতে এলো কালরাতি
দেশের ললাটে তীব্র অশনি হানি।

ক্ষয়ক্ষতি আর অসহায় মন লয়ে,
মিছে বেঁচে থাকা যাতনার নিপীড়নে।
যান্ত্রিক যুগ দানবের মতো হয়ে
এসেছে স্বামীজী! প্রেতের নৃত্য-সনে।
বিষাদের বায়ু ঝড়ে হ'ল পরিণত,
হৃদয়-নদীর ভেঙে গেছে দুই তীর।
স্বগত কথনে দিন যায় অবিরত,
কাঁদে বিহগেরা পায় না খুঁজিয়া নীড়।

রাজপথ-মাঝে অরাজকতার ছবি,
মনের ভূগোলে মহাদুর্দিন আসে।
ক্ষুৎপিপাসায় ঘুমের শরণ লভি
হারায়েছি সব দিন-বদলের ত্রাসে।
জন-অরণ্যে অরাতির ছায়া দোলে,
চাপা কান্নার কম্পিত নানা সুর।
সোনালি সরল দিবসেরা গেল চলে
শূন্য প্রহর ব্যথায় মূর্ছাতুর।

মেঘের গায়েতে জ্বলে ওঠে বিদ্যুৎ,
আকাশ আজিকে নিকষের মতো কালো।
পথে প্রান্তরে মরণের শত দূত
কোথাও নাহিক আশা-ভরসার আলো।
ক্ষমা করো প্রভু! স্বদেশের অপরাধ,
এসো ফিরে আজ চিন্ময় লোক হ'তে।
ঘুচাও জাতির ক্লৈব্যের অপবাদ
সিনান করায়ে তব করুণার স্রোতে।

সমালোচনা

World Teachers on Education—Silver Jubilee Souvenir. Sri Ramakrishna Mission Vidyalaya, Coimbatore District. Pp. 187 ; Price Rs. 4/-

মাদ্রাজের কোয়ম্বাতুর জেলার অন্তর্গত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীঅবিনাশীলিঙ্গম্ ও স্বামীনাথনের সম্পাদনায় এই স্মারণিক গ্রন্থখানি আত্মপ্রকাশ করেছে।

আলোচ্য গ্রন্থে উপনিষদের মধ্যে কথিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী ও উপদেশাবলী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বুদ্ধ, তিরুক্কুরল, যীশুখৃষ্ট, পবিত্র কোরান, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীসারদাদেবী, স্বামী বিবেকানন্দ ও গান্ধীজীর অমূল্য বাণী ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে একত্র গ্রথিত হয়েছে। সম্পাদনা বিশেষ প্রশংসার্হ। সাম্প্রতিক কালে জড়ধর্মী মানবচিত্ত আদর্শচ্যুত আর বিভ্রান্ত যুক্তিবাদের বিকৃত প্রভাবে প্রভাবান্বিত; এজন্য সর্বত্র নৈতিক সমস্যা-সঙ্কট বিশ্বকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে তুলেছে। এই সঙ্কট-সময়ে মহাপুরুষগণের বাণী, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের উপদেশ ও উপাখ্যান প্রচারের দ্বারা বিশ্বকল্যাণ-ধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। সম্পাদকদ্বয় এই সব কথা ভেবেই বোধ হয় এরূপ যুগোপযোগী সুন্দর সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন। এর দ্বারা কেবলমাত্র তরুণ ছাত্রসমাজই উপকৃত হবে না, বিশ্বমানব-সমাজের অন্তর্লোকেও নব নব জনকল্যাণকর চিন্তার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করতে পারবে, যাতে সর্বত্র শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থখানির ভেতর আছে বহু অমূল্য সম্পদ্। এই সব মহাপুরুষের বাণী হোক আমাদের পরম পাথেয়। শিক্ষক-মহলে আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

—**অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

স্মৃতিচারণ [দ্বিতীয় খণ্ড]: দিলীপকুমার রায়: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭। পৃঃ ৩০৪ ; মূল্য ৬'৫০।

বাংলা সাহিত্যে দিলীপকুমার রায় আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল একটি নাম। পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক চরিত্র গড়ে উঠলেও তিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত এক বরণীয় কবি ও সাহিত্যিক। পৃথিবীতে তারুণ্যের মতো অচিরস্থায়ী খুব কম জিনিসই আছে। তবু দিলীপকুমারের মতো এক এক জন কবি বা মনীষীর মধ্যে হৃদয়ের চিরতারুণ্য বাসা বেঁধে থাকে। 'স্মৃতিচারণ' পড়তে পড়তে তাঁর আনত শ্রদ্ধাবোধের অপূর্ব ভঙ্গিমাটি বারংবার পাঠককে মুগ্ধ করে। অথচ এ শুধু ভঙ্গিমা নয়। রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'য় শ্রীমতী যেমন গেয়েছিল—'বন্দনা মোর সঙ্গীতে আর ভঙ্গীতে বিরাজে'—এও তেমনি বক্তব্য-নিবেদনে এবং বাণীভঙ্গিমায় লেখকের অন্তরের প্রণাম পৌঁছে দেওয়া।

মহতের সামনে প্রণত হওয়া যদি আপন মহত্ত্বের লক্ষণ হয়, তাহলে সেই মহৎ সাহিত্য-কর্মের অধিকারে দিলীপকুমার বাংলা সাহিত্যে এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'তীর্থংকর' বাংলা-সাহিত্যে স্মৃতিচারণার শুভ সূচনারূপে একদা অগণিত বঙ্গবাসীর হৃদয় জয় করেছিল। স্বল্পায়তনে সেই 'তীর্থংকর'-গ্রন্থটির সাহিত্যিক পরিপূর্ণতা আজও আমাদের বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

'স্মৃতিচারণ'-গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড অনেক বিস্তৃত আকারে দিলীপকুমারের তীর্থ-মধুপ সত্তাকে প্রকাশিত করেছে। 'তীর্থংকরে'র সংহতি এ-দুটি গ্রন্থে নেই, কিন্তু এই বিশ

শতকের বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মননশীল ও ভক্তহৃদয়ের মানসক্রমবিকাশের সাক্ষ্যরূপে এদের সার্থকতা অবশ্যস্বীকার্য।

'শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' দিলীপকুমারের আবাল্য প্রেরণা। এ প্রেরণার মূলসূত্র তাঁর অগ্রজপ্রতিম নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সাহচর্য। স্বভাবতই শ্রী'ম'র বাণীসংগ্রহে যে শ্রদ্ধাপ্লুত মননের পরিচয় আছে, দিলীপকুমারের স্মৃতিসংগ্রহগুলিও তার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু শ্রী'ম' যেমন নিজেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত ক'রে তাঁর আরাধ্য দেবতার ধ্যানে তন্ময়, দিলীপকুমার তাঁর স্মৃতিচারণে সে-রকম নেপথ্য-চারী নন। শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রোম্যাঁ রোলাঁ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, গোপীনাথ কবিরাজ, অতুলপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি যে-সব সাধক, কবি ও মনীষীদের বাণী তাঁর 'স্মৃতিচারণে'র দ্বিতীয় খণ্ডে বিধৃত, তাঁদের বাণীভঙ্গিমায় দিলীপ-কুমারের ছায়াপাত বারংবার ঘটেছে। বাণী-সংগ্রহ হিসাবে বিচার করলে বাক্‌ভঙ্গীর এই পরিবর্তন অবশ্যই ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু এ শুধু বাণী-সংগ্রহ নয়—বাণী অবলম্বনে চিন্তন। সুতরাং কথোপকথনের একটু হেরফের স্মৃতির দূরত্বের দরুন ঘটে থাকলেও মূল বক্তব্য থেকে লেখক কোথাও বিচ্যুত হননি।

কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার—এমনি নানা পরিচয়ের আড়ালে দিলীপকুমারের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর শ্রদ্ধানত চিরশিক্ষার্থিসত্তায়। মহামানবের তীর্থসঙ্গমে অভিস্নাত এই সাহিত্যসাধক বাংলা-সাহিত্যের দিগন্তকে বিশ্বচেতনার মহাকাশে বিস্তীর্ণ করেছেন, মহত্তম মননের সমুদ্রকল্লোল ধ্বনিত করেছেন তাঁর অগণিত পাঠকচিত্তে। তাই 'স্মৃতিচারণে'র অসমাপ্ত অংশটুকুর জন্য অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে আমরা প্রতীক্ষা ক'রব।

—**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

সন্দীপন ঃ বিবেকানন্দ শতবর্ষজয়ন্তী স্মারক (১৯৬৩)—প্রকাশক ঃ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দির, বেলুড় মঠ হাওড়া। পৃষ্ঠা ২৪৭+ ১২৬=৩৭৩।

পত্রিকার প্রথম অংশে বিষয়বস্তুগুলি—প্রশস্তি, অনুধ্যান, অর্ঘ্য, অঞ্জলি, নৈবেদ্য ও আহুতি এই কয়টি পর্যায়ে সাজানো হইয়াছে। প্রশস্তিতে স্বামীজীর উদ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য-গণের শ্রদ্ধা নিবেদিত হইয়াছে। অনুধ্যান-পর্যায়ে স্বামী শিবানন্দ-লিখিত 'পুণ্যস্মৃতি', শ্রীম-লিখিত 'সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ' এবং শ্রীগিরিশ ঘোষ-লিখিত 'বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ' পাঠকবর্গের সাগ্রহ মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। 'অঞ্জলি'তে বিবেকানন্দের প্রতি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ বসু, সরলা দেবী ও দিলীপ-কুমারের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হইয়াছে। কবিতা-গুলিতে স্বামীজীর সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক্ পরিস্ফুট। শিক্ষণ-মন্দিরের অধ্যাপক ও ছাত্রগণের প্রবন্ধগুলিও উল্লেখযোগ্য।

এই স্মারক-পত্রিকায় 'A Chronology of Swamiji's Life', 'The Ramakrishna Order at a Glance' এবং 'Vivekananda and the Contemporary Press' নামক তিনটি লেখা সহজেই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচ্ছদের ছবিখানি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট পত্রিকাখানি শিক্ষাপ্রদ হইবে। —**রমণীকুমার দত্তগুপ্ত**

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প (চতুর্দশ সংস্করণ) ঃ স্বামী প্রেমঘনানন্দ। প্রকাশক ঃ স্বামী পাবনানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর। পৃষ্ঠা ১৫৬ ; মূল্য ৩·২৫।

'বিবেকানন্দের কথা ও গল্প' ত্রয়োদশ সংস্করণ পর্যন্ত দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্তমানে দুইখণ্ড একত্র করিয়া স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে 'শোভন সংস্করণ' প্রকাশিত হইয়াছে। বিশিষ্ট শিল্পীর রঙীন ও রেখাচিত্র দ্বারা পুস্তকটি

সমলঙ্কৃত। প্রারম্ভে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত। আশা করি, এই শোভন সংস্করণও উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে।

কল্যাণ (হিন্দী)ঃ ৩৮ তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা—'শ্রীকৃষ্ণ-বচনামৃত-অঙ্ক'। সম্পাদক—শ্রীহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিম্মনলাল গোস্বামী। গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৭০০; মূল্য ৭'৫০।

'কল্যাণ' পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী পূর্ব পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও একখানি মূল্যবান্ বিশেষ অঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন। এই বর্ষের বিশেষ সংখ্যাটিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বহু বিষয় জানা যাইবে। হিন্দী-ভাষাভাষী জনসাধারণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণী উপস্থাপিত করিবার সার্থক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে অভিনন্দন-যোগ্য। লেখাগুলি সুচিন্তিত ও সুমুদ্রিত। অনেকগুলি সুন্দর ছবিও দেওয়া হইয়াছে। এই বৃহৎ গ্রন্থখানি উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

বীর বিবেকঃ শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ। প্রকাশকঃ প্রশান্ত ঘোষ, ৫২ হালদার পাড়া রোড, কলিকাতা-২৬। পৃষ্ঠা ১১২; মূল্য ৩৲।

স্বামীজীর বলিষ্ঠ জীবন ও বাণী কবিতার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার আন্তরিক প্রচেষ্টা আলোচ্য পুস্তকে দৃষ্ট হয়। স্বামীজীর আবির্ভাব হইতে তিরোভাব পর্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনা অবলম্বনে ৮৩টি কবিতা দেওয়া হইয়াছে। কবিতাগুলি সহজবোধ্য, অনেকগুলি সুললিত। বিদ্যার্থীরা এইগুলি কণ্ঠস্থ করিলে বিশেষভাবে লাভবান্ হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারকগ্রন্থ--১৯৬৩ (মেদিনীপুর কলেজ)ঃ প্রকাশকঃ শ্রীমনোমোহন দত্ত। পৃষ্ঠা ১৭৭+৬০; মূল্য ২৲।

স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এই স্মারকগ্রন্থটি সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে সমাদৃত হইবার যোগ্য। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সাহিত্যিক ও অধ্যাপকমণ্ডলীর সুচিন্তিত ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধসম্ভারে পত্রিকাখানি অলঙ্কৃত। কবিতাগুলিও উৎকৃষ্ট ধরনের।

Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume: Published by General Secretary, Swami Vivekananda Centenary, 163 Lower Circular Road, Calcutta. [গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার, ২৭১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সমালোচনার সহিত পঠিতব্য।]

এই স্মারক-গ্রন্থটিতে প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী তেজসানন্দ-লিখিত 'Swami Vivekananda and His Message' শীর্ষক ১৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী সুচিন্তিত সুলিখিত প্রবন্ধটি এই রচনাসংগ্রহের একটি বিশিষ্ট রচনা, এটি ছোট-খাট একটি গ্রন্থ-বিশেষ। প্রবন্ধটিতে স্বামীজীর আবির্ভাব হইতে মহাসমাধি পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ ও বিশ্লেষণ সুললিত ভাষায় সাহিত্যিক ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক-মনে স্বামীজীর জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।

আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনার প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিঃ ডক্টর রমা চৌধুরীর 'Sociological views of Swami Vivekananda—His Ideas of Social Reform—Uplift of Women and Masses' ৯২ পৃষ্ঠাব্যাপী এই দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখিকা ভারতের অধ্যাত্ম-চিন্তা, সমাজ, কর্মের বিধি, জাতিভেদ-প্রথা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া এই সকল বিষয়ে স্বামীজীর মত পাণ্ডিত্য-সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমাজ-সংস্কার এবং নারীজাতি ও জনসাধারণের উন্নয়ন সম্বন্ধে স্বামীজীর বিশেষ বাণী কি ছিল, তাহা তথ্য-সহায়ে উপস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উদ্বাস্তু-সেবাকার্য

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের গেদে ও পেট্রাপোল নামক স্থানে এবং আসামের গারো পাহাড় অঞ্চলে গোয়ালপাড়া বিভাগের হাসিমারা নামক স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত অসহায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে সেবাকার্য করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে উদ্বাস্তু-সমাগম কমিয়া যাওয়ায় হিঙ্গলগঞ্জ সাহায্য-কেন্দ্রটি গত ১৮ই মে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের নিকট ৩নং কুরুদ (Kurud) ক্যাম্পে ১৭ই মে রামকৃষ্ণ মিশন একটি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়াছেন; এই ক্যাম্পে ১০,০০০ নিঃসম্বল উদ্বাস্তু সমবেত হইয়াছে। ১লা জুন হইতে পশ্চিমবঙ্গের বানপুর সরকারী উদ্বাস্তু-ক্যাম্পে বিনামূল্যে রান্না-করা খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হইতেছে, সরকারী সাহায্যের অতিরিক্ত খরচ রামকৃষ্ণ মিশন নিজ তহবিল হইতে বহন করিবেন। বিভিন্ন সাহায্য-কেন্দ্রে বিতরিত খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য :

গেদে : গত ৫ই মার্চ হইতে ২১শে মে পর্যন্ত ১,০৯৬ ধুতি, ১,১৫৫ শাড়ি, ৬১৭ জামা ও অন্যান্য পোশাক, ৯০ মণ ২৫ সের চিড়া, ৩৪ মণ গুড়, ১২ কে-জি. বিস্কুট, ২৪ টিন (প্রায় ২৭½ কে-জি.) বাতাসা, ২৪৬ এনামেলের থালা, ২ খানি কম্বল এবং ১,৪৬৮ পুরাতন পোশাক বিতরণ করা হইয়াছে। মোট ৩৪,২১১ জনকে এই সব দ্রব্যাদি দেওয়া হইয়াছে।

পেট্রাপোল : গত ১৪ই মার্চ হইতে ২১শে মে পর্যন্ত ৪৭,৮৯৫ জনের জন্য রান্না-করা খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়। ৩৯২ ধুতি, ১৮৪ শাড়ি, ১৬৯ জামা ও অন্যান্য পোশাক—(সবই নূতন), পুরাতন পোশাক ১,৫৭২ এবং ২ মণ ৩ সের চিড়া ও ২১ সের গুড় বিতরণ করা হয়।

হিঙ্গলগঞ্জ : ৩০শে মার্চ হইতে ৭ই মে পর্যন্ত ৯,০০৮ জনের জন্য রান্না-করা খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়।

হাসিমারা : ১৪ই এপ্রিল হইতে ২৮শে মে পর্যন্ত ১,৫২৩ ধুতি, ১,১৯৬ শাড়ি, ৪,৮৪৫ জামা ও অন্যান্য পোশাক, ৩৪১ কে-জি. বিস্কুট, ২১১ কে-জি. বার্লি, ২৭ কে-জি. গুঁড়া দুধ, ১ কে-জি. বেবি-ফুড্, ১২৫টি ডেক্‌চি, ৫৬০ এনামেলের মগ, ১৭১টি টিনের পাত্র, ৩৬৫ হারিকেন লণ্ঠন বিতরণ করা হয়। মেডিক্যাল ইউনিটে ৫,৯৯৮ রোগীর চিকিৎসা করা হয়। ঔষধের মূল্য-বাবদ ব্যয় হয় ১০,৩০০৲ টাকা। এখানে একটি স্কুল পরিচালিত হইতেছে—ছাত্রসংখ্যা ৩২১। বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে ২৪ জন শিক্ষালাভ করিতেছে। ৪টি সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়।

কুরুদ (মধ্যপ্রদেশ) : এই স্থানে বার্লি, দুধ, বহুমুখী খাদ্যপ্রাণযুক্ত আহার্য (multi-purpose food), হরলিকস্ এবং ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হইতেছে।

উৎসব-সংবাদ

ময়মনসিংহ : গত ৬ই জানুআরি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে এক ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় শহরের বহু গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকের সমাবেশ হইয়া-

ছিল। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রবীণ উকিল শ্রীমণিভূষণ মজুমদার। প্রবন্ধ পাঠ ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক্ আলোচনা করা হয়। বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২১শে এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১২৯তম জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে এক ধর্মসভায় প্রবন্ধ পাঠ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনবেদ আলোচনার পর রাত্রে স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পিগণ কর্তৃক ভক্তিমূলক গান, ভজন ও কালীকীর্তনের অনুষ্ঠান করা হয়।

২৪শে এপ্রিল ব্রাহ্ম মুহূর্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের শুভারম্ভ হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডী, গীতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও কথামৃত পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, কীর্তন, ভজন, কালীকীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। প্রায় ২,৫০০ নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

জয়রামবাটী: গত ৩১শে বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির-প্রতিষ্ঠার ৪২তম বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উৎসবে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সাধু ও ভক্ত-নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি দ্বারা আরম্ভ করিয়া ঊষাকীর্তন, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, ভোগরাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ২,০০০ নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় স্বামী গোপেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যজীবন আলোচিত হয়। পরদিবস ধর্মমূলক যাত্রাভিনয়ের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

শতবার্ষিক উৎসব

আমেরিকার বস্টন ও প্রভিডেন্স বেদান্ত-কেন্দ্রে স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মশতবার্ষিক উৎসব পালিত হইয়াছে। দুই নগরেই গত ২৯শে ও ৩০শে এপ্রিল একটি ভোজের ব্যবস্থা করা হয় এবং বিশিষ্ট অতিথি, জননেতা এবং ভক্তগণ তাহাতে উপস্থিত থাকেন।

বস্টনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী পবিত্রানন্দ, সর্বগতানন্দ, বুধানন্দ এবং নিউইয়র্ক মহানগরীর ধর্মযাজক ও বেদান্তানুরাগী ডক্টর অ্যালেন ই. ক্লাস্টন। প্রভিডেন্সে এই তিনজন সন্ন্যাসী এবং ধর্মযাজক ডক্টর আর্থার ই. উইলসন বক্তৃতা দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের দুইজন প্রধান শিষ্যের প্রতি যখন বক্তাগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তখন উভয় উৎসবেই এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বস্টন ও প্রভিডেন্স উভয় কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখিলানন্দ জনগণের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভাবধারায় যে মহৎ কাজ করিয়াছেন, তাহার জন্য বক্তাগণ তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই দুইজন মহাপুরুষের সম্মানে উভয় স্থানে তাঁহাদের জীবনের ঘটনা, বাণী ও রচনার উদ্ধৃতি এবং তাঁহাদের গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সহ একটি পুস্তিকা বিতরণ করা হয়।

দেহত্যাগ-সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত মে মাসে সঙ্ঘ তিনজন সন্ন্যাসীকে হারাইয়াছেন :

স্বামী নিঃশঙ্কানন্দ : গত ৬ই মে ভোর ৩টা ২০ মিনিটের সময় স্বামী নিঃশঙ্কানন্দ (অমূল্য) মস্তিষ্ক হইতে রক্তক্ষরণের ফলে কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৫৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ২রা মে কলিকাতা গদাধর আশ্রম হইতে তাঁহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে লইয়া যাওয়ার সময় পথেই তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন, তাঁহার আর জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। কিছুকাল হইতে তিনি ডায়াবিটিসে ভুগিতেছিলেন।

১৯৩৪ খৃঃ তিনি পাটনা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯৪৬ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কয়েক বৎসর তিনি নারায়ণগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কিছুকাল পূর্বে তিনি গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ হন, জীবনের শেষ-দিন পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই অকপট ও কঠোর কর্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন।

স্বামী ধাত্রানন্দ : গত ৮ই মে বেলা ১১টার সময় কানপুর হইতে ৬ মাইল দূরে মাগারওয়ারা প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়ে (Magar-wara Nature Cure Clinic) স্বামী ধাত্রানন্দ (মথুরাদাস) ৪৯ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। বারাণসী সেবাশ্রমে এবং রাজকোট আশ্রমে তিনি কিছু-কাল কর্মী ছিলেন। ১৯৫২ খৃঃ তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। ১৯৫৭ খৃঃ তিনি উত্তরকাশীতে তপস্যা করিবার জন্য গমন করেন। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি উত্তরকাশী-হৃষীকেশে তপস্যা-রত ছিলেন। সেখান হইতে তিনি কানপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। গত দুইমাস পূর্বে নিম্ন রক্তচাপ ও অম্লরোগের জন্য তাঁহাকে উক্ত হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সেখানেই তাঁহার দেহান্ত হয়।

স্বামী যজ্ঞেশানন্দ : গত ১৩ই মে সকাল ৫টা ৩০ মিনিটের সময় খড়দহ বলরাম সেবাসদনে স্বামী যজ্ঞেশানন্দ (সুহৃদ্) প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১২ই মে রাত্রি ৯টা ৩০ মিনিটের সময় তিনি করোনারি থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হন এবং রাত্রি ১১টায় তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, সেখানেই তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। বেলুড়ে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই তিনি ইহার অন্যতম সংগঠনকারী ছিলেন। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই বিদ্যালয়টি ক্রমে গড়িয়া উঠে। পরবর্তীকালে তিনি খড়দহে নির্জন-বাস করিতে থাকেন।

এই অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্ঘের তিনজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ হওয়ায় সঙ্ঘ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহাদের দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

বেহালাঃ পর্ণশ্রী পল্লীতে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৩ই হইতে ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ও স্বামী বিবেকানন্দের শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ১৩ই মার্চ 'ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৫ই মার্চ পল্লীপরিক্রমা, পূজা ও হোমকৃত্যাদির পর প্রায় আটশত নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে স্বামী নিরাময়ানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় অধ্যাপক শ্রীঅনাদিনাথ সিংহ ও অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা দেন।

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা)ঃ ২১ নং বৃন্দাবন বোস লেনস্থিত সোসাইটি-ভবনে স্বামীজীর শতবর্ষ-জয়ন্তী অনুষ্ঠানসমূহের অঙ্গ-হিসাবে গত ২২শে ফেব্রুআরি হইতে আটদিন-ব্যাপী বক্তৃতা ও কীর্তনাদির ব্যবস্থা করা হয়। এই উৎসবে বিভিন্ন দিবসে স্বামী জীবানন্দ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত আলোচনা করেন যথাক্রমে 'জাতীয় জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ', 'শ্রীরামকৃষ্ণ-নরেন্দ্র-মিলন' ও 'স্বামীজীর কলম্বো হইতে আলমোড়া—বক্তৃতাবলী'। শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোড়ই ও সম্প্রদায়, সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সম্মিলনী, কল্পতরু মিলন-মন্দির, পটলডাঙ্গা শক্তিসঙ্ঘ ও বারাণসী কালীকীর্তন সম্মিলনী সঙ্গীত ও কথকতাদি পরিবেশন করেন।

তিনসুকিয়াঃ রামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ১৫ই ফেব্রুআরি পূজা, হোম, গীতা চণ্ডী ও 'কথামৃত' পাঠ, প্রার্থনাসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

২৯শে ফেব্রুআরি বৈকালে এক মহতী ধর্ম-সভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয় এবং উহার প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে আলোচনা এবং ১লা মার্চ নরনারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠিত হয়।

চাকদহ (নদীয়া)ঃ গত ১৫ই মার্চ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবকসঙ্ঘের পরিচালনায় সমস্তদিন-ব্যাপী আনন্দ ও উদ্দীপনার সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মর্মরমূর্তি-প্রতিষ্ঠা ও জন্মোৎসব পালিত হয়। এতদুপলক্ষে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে ধর্মসভায় স্বামী পুণ্যানন্দ ও রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের বালকবৃন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন পরিবেশন করেন।

চারিগ্রাম (২৪ পরগনা)ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে পূজাপাঠ, ভজনকীর্তন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর সপ্তাহব্যাপী উৎসব সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি নাট্যানুষ্ঠানের মধ্যে 'বিবেকানন্দ-মিলনতীর্থ' উল্লেখযোগ্য। ২২শে মার্চ শেষ দিনের অনুষ্ঠানে স্বামী জীবানন্দ 'যুগাচার্য বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

বেলাড়ি (হাওড়া)ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৯শে মার্চ বিবিধ অনুষ্ঠান-সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে প্রায় ৬,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। আয়োজিত ধর্মসভায় স্বামী সুশান্তানন্দ সভাপতিত্ব করেন।

খেপুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৩রা ফাল্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, কীর্তন, কথকতা উৎসবের অঙ্গ ছিল।

ভাঙামোড়া (হুগলি) : গত ২২শে মার্চ স্থানীয় সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রাতে চণ্ডীপাঠ, পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়! মধ্যাহ্নে প্রায় ৩,৫০০ নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে স্বামী আদীশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করেন।

নূতন পুকুর (২৪ পরগনা) : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৫ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব আনন্দ-সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। পূজা, ভজন-কীর্তন, প্রসাদ-বিতরণ, পল্লী-পরিক্রমা, ধর্মসভা প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। আয়োজিত সভায় স্বামী জীবানন্দ ও অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ভাষণ দেন।

চেতলা (কলিকাতা) : শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডপ-সমিতির উদ্যোগে গত ২৬শে মার্চ হইতে পাঁচদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসব উপলক্ষে পূজা, পাঠ, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রথম দিন অপরাহ্নে ধর্মসভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'ভক্ত বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং পরে 'স্বামীজী গীতি-আলেখ্য' লীলাকীর্তন হয়। দ্বিতীয় দিন 'কথামৃত'-পাঠ এবং 'নীলাচলে মহাপ্রভু' নাট্যাভিনয় হয়। তৃতীয় দিন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' ও শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যলীলা (পাঁচালি) কীর্তন হয়। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী নিরাময়ানন্দ, শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষ দিন সন্ধ্যায় শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী রামায়ণ গান করেন।

নাটশাল (মেদিনীপুর) : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে ২১শে মার্চ শোভাযাত্রা, পূজা, হোম, চণ্ডী গীতা ও 'কথামৃত' পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নে পাঁচ শতাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে ধর্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন স্বামী অন্নদানন্দ। রাত্রে বাউলগান হয়। ২২শে মার্চ স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, অজজানন্দ, মহিষাদল রাজ-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসুনীলকৃষ্ণ চক্রবর্তী ভাষণ দেন।

জামালপাড়া (২৪ পরগনা) : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে গত ১০ই মে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে পূজা হোম, চণ্ডীপাঠ, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা, 'শ্যামা মা' গীতি-আলেখ্য, প্রসাদ-বিতরণ, রামায়ণ-গান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত সভায় স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। এই উৎসবে গ্রামের তরুণ ছেলেদের বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

পরলোকে শ্রীআশু দে

গত ৯ই মে বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীআশু দে ৭৪ বৎসর বয়সে দক্ষিণ কলিকাতায় রজনী সেন রোডস্থিত তাঁহার বাসভবনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। পাটনায় শিক্ষালাভ করিয়া ভাগলপুরে তিনি কিছুকাল ওকালতি করেন, পরে ১৭ বৎসর নয়া-দিল্লীতে পূর্ব-ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি বহু বৎসর যাবৎ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় নিয়মিতভাবে 'Talkee-Talkee' ও 'Patter' নামীয় রচনাগুলি লিখিয়া বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

ভক্ত ও আলাপী আশুবাবু পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজের জন্মস্থান বারাসতস্থিত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের সম্পাদক ও অন্যতম ট্রাস্টি-রূপে উহার অগ্রগতি ও জনসেবার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ!



কথাপ্রসঙ্গে

স্বামীজীকে বোঝা ও ভুলবোঝা

শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বামীজীকে লইয়া নূতন করিয়া আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হইয়াছে; ইহা শুভলক্ষণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে স্বামীজীর ভাব ও ভাষা যেমন জাতিকে নবজীবনের আশায় স্পন্দিত করিয়াছিল—দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাবের রাজনীতিক আন্দোলনের উন্মাদনায় তাহা অনেকটা চাপা পড়িয়া যায়। সমাজে ও সাহিত্যে প্রবাহিত স্বামীজীর ভাবধারা কিন্তু ফল্গুধারার মতোই জাতীয় জীবনে সমভাবে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়া চলিয়াছে। দেশের প্রথম শ্রেণীর নেতা ও মনীষিগণ বরাবরই স্বামীজীর গ্রন্থাবলী হইতে ভাবসংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সাধ্যমত সেইগুলি রূপায়িত করিবার চেষ্টাও করিয়াছেন। তবে স্বামীজীর ভাব সবগুলি যে একই শতাব্দীতে রূপায়িত হইবে—এমন কথা স্বামীজীও বলেন নাই, বরং বলিয়াছেন ভাবগুলি জগতে প্রচারিত হইতেই কয়েক শতাব্দী লাগিবে; তারপর রূপায়িত হইতে আরও কত শতাব্দী লাগিবে, কে জানে! তাছাড়া সব ভাবগুলি যে ভারতেই রূপায়িত হইবে, তাহাও নয়। তাঁহার বেদান্তের ভাবধারা এ-যুগে প্রধানতঃ পাশ্চাত্যেই প্রচারিত হইয়াছে, কারণ বিজ্ঞান সে-দেশে প্রচলিত ধর্মের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছে, বেদান্ত-সহায়েই সে-দেশে বৈজ্ঞানিক মনের উপযোগী বিশ্বজনীন ধর্ম স্থাপিত হইবে; এবং ভারত তাহার যুগযুগান্তরের তামসিক নিশ্চেষ্টতা পরিত্যাগ করিয়া, জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি বজায় রাখিয়া বর্তমান বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করিবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মিলনমূলক ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিবে আগামী যুগের এক সর্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতা—ইহাই ছিল স্বামীজীর স্বপ্ন, কল্পনা বা ধ্যানলব্ধ ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি!

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন সভায় সম্মেলনে এই-সকল কথা প্রচারিত হইয়াছে, বহু পত্র-পত্রিকায় এই-সকল ভাব নূতন করিয়া সরল সহজ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাহারা কখনও স্বামীজীর কথা সেভাবে শোনে নাই, পড়ে নাই, শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাহারা স্বামীজীর কথা শুনিয়াছে—সুদূর পল্লীর প্রান্তরে, ভারতের কোণে কোণে, পৃথিবীর দেশে দেশে স্বামীজীর আলোক-ধারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তবে আলোর পাশে ছায়াও থাকে, তাহাকে আমরা উপেক্ষা ও অবহেলা করিতে পারি, কিন্তু অস্বীকার করিতে পারি না। আলোক ব্যাহত করিলেও ছায়া

আলোকের মহিমা অধিকতর প্রকাশ করে, এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না! ছায়া পড়ে কেন? কোন বস্তু যদি আলোর উৎসকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, তবে তাহার অনুরূপ একটি ছায়া পড়িবে, কিছুটা স্থান আলোক হইতে আংশিকভাবে বঞ্চিত হইবে, ছায়া ঐ ব্যবধান-কারী বস্তুরই স্বরূপ প্রকাশ করে, আলো-কে বাধা দিয়া। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। সকলেই যে স্বামীজীকে বুঝিবে, এমন আশা করা যায় না। যাহারা বুঝিবে, তাহাদের অবশ্যই কল্যাণ হইবে, নিজেদের জীবন উন্নত ও মধুময় হইবে, এবং আশপাশের জীবনও তাহাদের প্রভাবে পরিবর্তিত হইবে। যাহারা আজ বুঝিতেছে না, তাহারা হয়তো কাল বুঝিবে; কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে আর একটি তৃতীয় শ্রেণীকে লইয়া, যাহারা ভুল বুঝিয়াছে ও ভুল বুঝাইতেছে। ইহাদের লক্ষ্য করিয়াই একদিন যীশুখৃষ্টকে বলিতে হইয়াছিল—'পিতা, ইহাদের ক্ষমা কর, ইহারা জানে না—কি করিতেছে।' পিতা কি ক্ষমা করিয়াছিলেন? মনে তো হয় ভুল আজও ভ্রাম্যমাণ ইহুদীজাতি দেশে দেশে অবাঞ্ছিত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—সেই ভুল-বোঝার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। এই শ্রেণীর মানুষকে লক্ষ্য করিয়াই স্বামীজী বলিয়াছেন, 'The blind cannot see, the perverted will not see.' —অন্ধ যে, সে দেখিতে পায় না, বিকৃতমস্তিষ্ক দেখিবে না। চরম সত্য সহজ ও সরল, সূর্যালোকের মতো স্পষ্ট। অনির্বচনীয় মায়ার প্রভাবে মানুষের মন সত্যের মধ্যে মিথ্যা কল্পনা করে, আলোর মধ্যেও ছায়া রচনা করে।

'মায়া' বুঝাইতে গিয়া স্বামীজী বলিয়াছেন —এই জগতে ইহা স্বাভাবিক। ইহার জন্য দুঃখ নিষ্প্রয়োজন, প্রতিবাদ করিয়াও লাভ নাই। জগতের স্বাভাবিকতা, মায়ার নানাত্ব-রচনাশক্তি ও চমৎকারিতা বুঝিতে পারিলেই মায়ার অতীত সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। চিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের মহিমা কীর্তন করিয়াও তিনি বিদায়-অভিভাষণে সকলকে ধন্যবাদ দিয়া শেষে বলিতেছেন: বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ তাঁহাদের, যাঁহারা এই সভায় নানা বিপরীত বেসুরা কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের কথাগুলিই এই সভার প্রকৃত উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

স্বামীজীর মহৎ উদার ভাব যে সকলেই একেবারে বুঝিবে—এরূপ আশা করা অন্যায়। স্বামীজীর মতো অসাধারণ বহুমুখী ব্যক্তিত্ব চিরকাল এক বিস্ময়ের বস্তু! বাল্যে পিতামাতার, কৈশোরে আত্মীয়স্বজন ও পল্লীবাসীর, তারপর শিক্ষকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া নরেন্দ্রনাথ যখন শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন, তখনই অভিনীত হইল বর্তমান যুগনাটকের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর অঙ্কটি। এই অঙ্কের শেষে আমরা পাই বিবেকানন্দকে—যিনি প্রাচীন ভারতের বাণী বহন করিয়া লইয়া গেলেন নবীন জগতের জন্য। সকলেই যে তাহা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়া ফেলিবে, এমন দুরাশা তিনিও করেন নাই, তবে তিনি অনুভব করিয়াছিলেন, এই 'নবীভূত পুরাতন সুরা'—উপনিষদের আধুনিক ব্যাখ্যার এই অমৃতময়ী সুধা পান করিবার জন্য কাহারা যেন কোথায় প্রতীক্ষা করিতেছে।

ভারতে ধর্ম প্রচার না করিয়া কেন তিনি পাশ্চাত্যে গেলেন—এ প্রশ্ন অনেকেই করিয়া থাকেন। স্বামীজীর বিস্তৃত জীবনী রহিয়াছে—স্বামীজীর বাণী ও রচনা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে—তাঁহার জীবন ও বাণী দিবালোকের মতো উন্মুক্ত। সেখানে অন্বেষণ না করিয়া যদি কেহ নিজের স্বার্থদুষ্ট মনের অন্ধকার কোণে ইহার

উত্তর অনুসন্ধান করে, তবে সে তাহার ভাবানুযায়ী উত্তরই পাইবে, যাহার সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই।

স্বামীজী ভারতের ধর্ম প্রচার করিয়াছেন—এ-কথা সত্য, কিন্তু করিয়াছেন জগতের জন্য; ভারতে যে ধর্মগ্লানি নাই, তাহা নয়; তিনি দেখিয়াছিলেন, বাহিরে বেদান্তধর্ম প্রচারের দ্বারা ভারতেরই বহুবিধ উপকার হইবে, অন্যান্য দেশের কল্যাণ তো হইবেই। স্বামীজীর ধর্মপ্রচারের মর্ম যাহারা ধরিতে পারে নাই, তাহারাই তাঁহাকে বিশেষ কোন সাম্প্রদায়ের ধ্বজাধারী বলিতেও কুণ্ঠিত হয় না; কোন কোন বিকৃতমস্তিষ্ক সমালোচকের ধারণা, হিন্দু-ধর্মের জয়গান করিয়া স্বামীজী এদেশে আধুনিক সাম্প্রদায়িকতার জন্যও পরোক্ষভাবে দায়ী

যাহারা স্বামীজীর গ্রন্থাবলী সযত্নে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—তিনি সকল ধর্মেরই গুণগ্রাহী আবার সকল ধর্মের গোঁড়ামির কঠোর সমালোচক। বোধ হয় হিন্দুধর্মেরই তিনি কঠোরতম সমালোচক। তিনি জানিতেন, সকল ধর্মের গোঁড়ারাই তাঁহার নিন্দা করে, তাঁহাকে সহ্য করিতে পারে না; এবং প্রত্যেক ধর্মের উদার-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ—এমন কি বিভিন্ন চার্চের ধর্মযাজকগণ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন তাঁহাদের বেদী হইতে বেদান্তের উদার বাণী সকলকে শুনাইবার জন্য। এই বেদান্ত একাধারে ধর্ম ও দর্শন, এবং ইহাকে বর্তমান মানব-মনের উপযোগী করিয়া এক বিশ্বজনীন ধর্মের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিরূপেই স্বামীজী প্রচার করিয়াছেন। স্বামীজী বুঝাইয়াছেন, বিভিন্ন ধর্ম ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিবার চাবিকাঠি এই বেদান্ত। সেদিক দিয়া বেদান্ত বিশেষ কোন ধর্মমত নহে, পরন্তু সকল ধর্ম বুঝিবার একটি বৈজ্ঞানিক উপায়। যদি কেহ বেদান্তের মাধ্যমে খ্রীষ্টজীবন অধ্যয়ন করে, সে যথার্থ খ্রীষ্টান হইবে, গোঁড়া ধর্মান্ধ হইবে না; এইরূপ সকল ধর্ম সম্বন্ধেই। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের অর্থ সকল ধর্মের খিচুড়ি বা গোঁজামিল নয়, পরন্তু সকল ধর্মের মিলনের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হওয়া। অবশ্য যাহাদের ভিতরে গোঁজামিল আছে, তাহারা বাহিরেও তাহাই প্রতিফলিত দেখিবে, আর যাঁহাদের অন্তরে সমন্বয়ের সামঞ্জস্য বিরাজিত, তাঁহারা এই আপাত-প্রতীয়মান নানা বিপরীতের মধ্যে একত্ব দেখিতে পান। বেসুরার মধ্যেও মিলনের মূল-সুরটি শুনিতে পান এবং সেইটির উপরেই জোর দিয়া সঙ্গীতের আয়োজন সার্থক করেন। মানুষে মানুষে বিদ্বেষ-ভাব প্রশমিত করিয়া প্রীতি সেবা ও সহানুভূতির ভিত্তির উপর—কল্যাণের উপর মানব-মিলনের সৌধ রচনা করেন।

অতঃপর আসিতেছে আর একটি প্রশ্ন—স্বামীজীর সেবাধর্মের উৎস কোথায়, ইহার ভিত্তি কিসের উপর? অবশ্যই স্বামীজীর জীবনীতে বিখ্যাত হইয়া আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সেই উক্তি, 'জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা'—ইহাই নরেন্দ্রনাথকে নূতন আলোক দেখাইয়াছিল। এখানেও বেদান্তের আত্মতত্ত্বের উপরই তিনি সেবাধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইহা প্রচার বা অপপ্রচার নয়, ইহা এ-যুগের দুইটি জীবনের একটি ঘটনা। নরেন্দ্রনাথের নির্বাণ-মুখী—নির্বিকল্পমুখী মনকে শ্রীরামকৃষ্ণই টানিয়া আনিয়াছিলেন 'বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়'। স্বামীজী সেবাধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন—এ-কথার অর্থ এ নয় যে, পূর্বে এদেশে বা পৃথিবীতে কোথাও সেবাধর্ম ছিল না; এ-কথাও বলা চলে না যে, স্বামীজী অন্য কোন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের নিছক দয়ামূলক কাজকর্মের অনুবর্তন করিয়াছেন।

প্রতিমাপূজার রহস্য না বুঝিয়া যাঁহারা স্বামীজীকে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী মনে করেন, অবতারবাদে বিশ্বাসী বলিয়া তাঁহাকে অবৈজ্ঞানিক মনে করেন, তাঁহাদের নিকট নিবেদন, স্বামীজীর গ্রন্থাবলীর পাতায় পাতায় এগুলির যথাযথ যুক্তিপূর্ণ উত্তর বিকীর্ণ হইয়া আছে।

স্বামীজী এ-যুগের ভাব-ভগীরথ—হিমালয়ের বিভিন্ন উপত্যকাবাহিত জলধারা আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়া প্রবল প্রবাহে সমুদ্র অভিমুখে চলিয়াছে—ইহাই অতি সংক্ষেপে স্বামীজীর ভাবরূপ-বর্ণনা। বুদ্ধের ধ্যান ও হৃদয়বত্তা, শঙ্করের মেধা ও মনীষা তাঁহাতে মিলিত হইয়াছে। আবার খ্রীষ্টের মহান্ চরিত্র এবং ইসলামের আভ্যন্তরীণ উদারতার কথাও তিনি শতমুখে কীর্তন করিয়াছেন। অতীতের সকল ভাবই তাঁহার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত, এই জন্যই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত এত স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য।

যুগান্তকারী মহাপুরুষগণ আসেন শুধু মধুর শান্তির বাণী প্রচারিত করিতে নয়, নূতন জাতি ও নূতন ধর্মভাব গঠন করিতে যতটা সম্ভব পুরাতনের কাঠামো বজায় রাখিয়া; যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে তাঁহারা নির্মম। যীশুখৃষ্টকেও বলিতে হইয়াছিল 'না, আমি শান্তির জন্য আসি নাই, পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে, পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে স্থাপন করিতে আসিয়াছি।' যুগ-প্রবর্তকগণকে বাধ্য হইয়াই বর্তমানের কঠোর সমালোচক হইতে হয়—সে শুধু বর্তমানের গ্লানি দূর করিবার জন্য, তাঁহাদের মধ্যে কোন দলগত স্বার্থ বা ব্যক্তিগত উষ্মা থাকে না। দূর পরি-প্রেক্ষিতে তাঁহারা মানবজাতিকে দেখেন স্বীয় পীড়িত সন্তানের মতো, তাঁহাদের তিরস্কার ও সমালোচনা সর্বদা সেবা ও সহানুভূতির ভাবেই প্রণোদিত।

এই দৃষ্টি হইতেই স্বামীজীর তিরস্কারমূলক উক্তিগুলি দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। স্বামীজী আমেরিকায় তত্রত্য সমাজের দোষগুলির সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু ভারতে আসিয়া পাশ্চাত্যের গুণগুলির কথাই বেশি করিয়া বলিয়াছেন, ভারতীয় সমাজের শত দোষ দুর্বলতা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, সহস্রবার সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্যে ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও সর্ববিধ মহিমার কথাই কীর্তন করিয়াছেন।

স্বামীজীর মতো বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সমালোচনা করা অতি কঠিন কার্য। তাঁহার সমসাময়িক মহামনীষিগণ তাঁহার প্রতিভার আলোকে চমকিত, ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ, তাঁহার কীর্তির জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু আজকাল দেখা যাইতেছে—একশ্রেণীর পল্লবগ্রাহী লেখক পাঠক না হইয়াই সমালোচক হইতে চান। আংশিক উদ্ধৃতি দিয়া তাঁহারা বিকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন।

স্বামীজীকে বুঝিবার জন্য আলোচনার সহিত সমালোচনা অবশ্যই প্রয়োজন, বর্তমানের বিচারে অবশ্যই দেখিতে হইবে—তাঁহার জীবন ও বাণীর মূল্য কতটুকু। শতবার্ষিকীর পর মনে হয়, তাহাই হইয়াছে, অতএব বিবেকানন্দ-অনুরাগিগণ যেন ইহাতে বিচলিত না হন, বরং তাঁহারা সেই সমালোচনাগুলি—সেগুলি যতই অপক্ক ও অপূর্ণ হউক—পাঠ করুন এবং সেগুলির যথাযথ উত্তর স্বামীজীর গ্রন্থাবলী হইতে সংগ্রহ করুন, এবং যাহারা সঠিকভাবে স্বামীজীর ভাব বুঝিতে চায়, তাহাদের বুঝাইবার ব্যবস্থা করুন। পূর্বোক্ত সমালোচকগণের প্রতিও একটি নিবেদন, তাঁহারা স্বামীজীর মতবাদের সমালোচনা করুন, কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের সহিত জড়াইয়া তাঁহার বিচার করিবেন না, তাহা হইলে সমালোচকের নিজের ব্যক্তিগত বা দলগত বিকৃত

রূপটিই ধরা পড়িয়া যাইবে ; স্বামীজীকে বোঝা বা বোঝানো হইবে না। ইহা অপেক্ষা না বোঝাই ছিল ভাল। ভুল বোঝা চিরকালই ভুলের বোঝা! ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে সে বড় বিপজ্জনক! ভুলের বোঝা বহিয়াই ইহুদী আজ গৃহহারা—যুগাদর্শকে না বুঝিয়া বা ভুল বুঝিয়া আজিকার বিপর্যস্ত বিভ্রান্ত বাঙালী যেন সেই বিপজ্জনক পথে না পা বাড়ায়। ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করুন। সে যেন তাহার ঠিক পথটি খুঁজিয়া পায়—যে পথে মানুষের চরিত্র গঠিত হয়, যে পথে মানুষ 'মানুষ' হয়। যে পথের সন্ধান সৌভাগ্যবশতঃ সে পাইয়াছিল বিংশ-শতাব্দীর প্রথম প্রভাতে

আশুতোষ-জন্মশতবার্ষিকী

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে যে-সব ক্ষণজন্মা পুরুষ দুর্লভ ব্যক্তিত্ব লইয়া ভারত-মাতার ক্রোড় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা একের পর এক তাঁহাদেরই জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতির চারিত্রিক দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছি। এই বৎসর আশুতোষের শত-বার্ষিকী শিক্ষাজগতে আমাদিগকে নূতন প্রেরণা দিবে। আশুতোষের অগাধ পাণ্ডিত্য, বহুমুখী প্রতিভা, অসাধারণ কর্মক্ষমতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দেশপ্রেম, মাতৃভাষার মহিমাপ্রতিষ্ঠা, বঙ্গভাষার সহিত সকল ভারতীয় ভাষার সেবা, জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া রাজকীয় মর্যাদায় জীবনযাপন প্রভৃতি তদানীন্তন ভারতবাসীর গৌরবের বস্তু ছিল। বর্তমান জাতির দিকে চাহিলে মনে প্রশ্ন জাগে—পরাধীন জাতির মধ্যে কিরূপে ঐ দুর্লভ পুরুষ-সিংহের আবির্ভাব হইয়াছিল ?

আশুতোষের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্য তিনি নিজেকে একান্তভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আশুতোষকে ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়—চিন্তাই করা যায় না, বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সহিত তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তিনি স্বয়ংই যেন বিশ্ববিদ্যালয়। কেবলমাত্র পরীক্ষা-গ্রহণ ও পাঠ্যতালিকা-প্রণয়নের প্রতিষ্ঠান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রবর্তন ও পঠনপাঠন, বিবিধ বিদ্যার উচ্চতর গবেষণা, জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন তাঁহার অবিস্মরণীয় কীর্তি। আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নত গবেষণার ব্যবস্থা ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও বাংলা ভাষার পঠনপাঠন প্রবর্তন তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

দেশের যেখানেই সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাই সযত্নে সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-যুগের নবরত্নের মালা গ্রথিত করেন। রাজনীতিক আন্দোলনের প্লাবনে যেদিন সমগ্র শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেদিন যেভাবে দৃঢ়হস্তে তিনি শিক্ষাতরণীর হাল ধরিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গভীর দূরদৃষ্টি ও বিরাট পৌরুষেরই নিদর্শন। রাজনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া এবং জাতীয়তাবোধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নূতন আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

সরস্বতীর বরপুত্র মহাপ্রাণ কর্মবীর আশুতোষের উদ্দেশে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আশা করি দেশবাসী তাঁহার আরব্ধ কার্য নিষ্ঠাপূর্বক সুসম্পন্ন করিবে।

দণ্ডকারণ্যের চিঠি

স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ

Raipur, M.P.
29. 4. 64

শ্রীচরণেষু

মহারাজ, কাল যথাসময়ে এখানে মঙ্গলমত পৌঁছেছি।···

···কাল বিকেলে মানা Camp-এ গিয়াছিলাম। সেখানে···officer-দের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হ'ল। They want us here. কিন্তু আমি বুঝলাম—এটা একটা Transit Camp, এখানে থেকে আমাদের কাজ করবার মতো কিছু নেই, কিন্তু একটা কাজ আছে মহা important, যা আমাদের immediately আরম্ভ করা দরকার—সেটি হ'ল medical help. এখানে সবাই famished, ছেলেরা আর সহ্য করতে পারছে না। তারা সামান্য অসুখের ধাক্কাতেই মরে যাচ্ছে। দু-জন medical men ও কিছু ঔষধপত্র ও ছেলেমেয়েদের খাদ্য নিয়ে যদি কোন সাধু আসেন এবং এখনই কাজ আরম্ভ করতে পারেন, তবে বোধ হয় কতকগুলি প্রাণ রক্ষা হ'তে পারে। আর এটা কোন permanent কাজও নয়—৬ মাস বা ১ বছর করলেই চলবে। আমরা আজ সকালে আরও কাছাকাছি camp-গুলি দেখে বিকাল থেকে দণ্ডকারণ্য-সফরে কয়েকদিনের জন্য বেরুবো।

রায়পুর, এম. পি. ২৯. ৪. ৬৪

···আজ সকালে আপনাকে একখানি চিঠি দিয়াছি। তারপরে কুরুদ, নওয়াগড় প্রভৃতি ক্যাম্প দেখে এলাম। কুরুদে ৩১,০০০ ও নওয়াগড়ে ১৭,৫০০ লোক আছে। Dehydration হ'তে হ'তে ছেলেরা মরে যায়। Medical assistance, ছেলেদের খাবার, জামাকাপড় প্রভৃতি দরকার, তারপর এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারলে পরে education, মানে—প্রাইমারিই ভাল ক'রে চালানো, পরে Technical ইত্যাদি। মানুষের এ অবর্ণনীয় কষ্ট চোখে দেখা যায় না। Sealdah Station-এ লোককে থাকতে দেখেছেন? এখানেও সেই রকম। একেক তাঁবুর তলায় ৪টি ক'রে family, শিয়ালদহে তবু আচ্ছাদন ছিল—এখানে তো শুধু কাপড় আচ্ছাদন।

আমরা আজ বিকালে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করছি—৪।৫ দিন ঘুরতে হবে।······

Pakhan Jore, Bastar, M. P.
1. 5. 64

···আমরা পরশু বিকেলে রায়পুর থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যায় কাঁকের পৌঁছি। সেখানে এক বাঙালী ভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি।······

কাঁকের একটি ছোট্ট শহর, চারিপাশে ছোট ছোট পাহাড় ও ছোট বড় বন। কাল সকালে বেরিয়ে আমরা বোরগাঁও হয়ে কোণ্ডাগায়ে যাই। বোরগাঁতে মস্ত বড় Motor repairing arrangement রয়েছে দণ্ডকারণ্যের, আর আছে এখানে দণ্ডকারণ্যের Timber Depot ও Timber-এর অন্যান্য কাজকর্ম। এ-দুটি organisation-এই Refugeeরা কাজ করে। এখানে displaced persons বসেছে এমন গ্রাম দেখতে গিছলাম। তারা Complain করছিল—জলাভাব ও জলাভাবের দরুন চাষ ভাল হচ্ছে না, কিন্তু তাদের চেহারা দেখে তা মনে হ'ল না,

বেশ হৃষ্টপুষ্ট সব। কোণ্ডাগায়ে এদের বড় হাসপাতাল এবং Chief Medical Officer থাকেন। ফিরবার পথে Automobile Association দেখলাম। Refugee memberদের বেশ লাভজনক ব্যবসা। যেতে আসতে অনেকগুলি 50 families/60 families/100 families এরূপ বসেছে—তাদের গ্রাম দেখলাম। এদের খাদ্য না জন্মালে Govt. খেতে দেয়। কতক family আছে, যারা গুছিয়ে বসেছে; আর অনেকে রয়েছে কুঁড়ে, তারা কিছু করতে পারেনি, Govt. dole-এর দিকে তাকিয়ে আছে। আবার কাঁকের ও ভানুপ্রতাপপুর হয়ে কাল রাত পৌনে বারটায় এখানে এসে পৌঁছেছি। এটা একটা ডাক বাংলো--খুব উঁচু জায়গায় যেন কোন hill-station-এ এসেছি। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস, নীচে ঘরবাড়ি গাছগুলি ছবির মতন, refugeeরা চারপাশে কতকগুলি গ্রামে বসেছে, আমরা একটু পরেই তাদের দেখতে যাবো। গাড়িটি ৫ বার puncture হয়েছিল। এই দণ্ডকারণ্যের গাড়িতেই ঘুরছি।……

Umerkot, 2. 5. 64

…আমরা কাল সকালে পাখানজোড় থেকে ওদের জীপে ক'রে কয়েকটি গ্রামে গিছলাম। গ্রামের ভেতরে কয়েকটি বাড়ি দেখে ভারী খুশী হলাম। তারা বেশ দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের গরুবাছুরগুলিও ভাল দেখলাম। দেখে এসে খেয়েই আবার যাত্রা শুরু। কাল ১৭০ মাইল ঘুরেছি। রাতে এখানে এসেছি। এখানটা এখন দেখতে বেরুবো।…

কাল পাখানজোড়ের কাছে একটি medical centre দেখলাম, সেখানে কাঠের কাজ, smithy, weaving প্রভৃতি নানান রকম কাজ start করেছে এবং বেশ progress করছে।…

Jagdalpur, M. P.
3. 5. 64

…কাল সকালে উমেরকোটের কাছাকাছি কয়েকটি গ্রাম দেখলাম। D.P.রা সেখানে খুব ভালভাবে বসেছে—বলতে পারি না। যারা কাছাকাছি Industrial Centre পেয়েছে, তারা ওখানে কাজ ক'রে extra রোজগার করে, তাদের বেশ চলে যায়। এই রকম কয়েকটি Industrial Centre দেখলাম—কোথাও weaving, কোথাও বা carpentry চলছে। বিকেলে ওখান থেকে বেরিয়ে উড়িষ্যার কোরাপুটে পৌঁছলাম। কোরাপুটই এদের Headquarters, এখানে Chief Administrative Officer-এর সঙ্গে আলাপ করলাম। তিনি বললেন—আপনারা এসে যদি কিছু লোকের খোঁজখবর নিয়ে তাদের মৃত্যু ও অসুখের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন—খুব কাজ হয়। আমরাও ভাবছি—That is the only temporary work we can take up—at Mana giving food, medicines, diet etc to them ……

Dhantoli, Nagpur
5. 5. 64

..আমরা কাল জগদলপুর থেকে রাতে রায়পুরে ফিরে তখনই Train ধরে আজ সকালে নাগপুরে এসেছি। জগদলপুরে একটি Industrial Centre দেখলাম ও আমরা একটি Public meeting address করেছি। গাড়ি বিগড়ে আমরা ৫ ঘণ্টা ওখানে আটকে ছিলাম।…

'পাঞ্চজন্য ধর'*

'সংশপ্তক'

[মনোহরসাই—ত্রিতাল (তাল-ফেরতা গড়খেমটা)]

মথুরায় চল চল শ্যাম।
বৃন্দাবন ছাড়ি মথুরাতে চল হরি
ভবভয়হারী গুণধাম।
নটবর-বেশ ছাড়ি চল রণসাজ পরি
নাশ অরি কৃষ্ণ মুরারি।
মুরলী পরিহর পাঞ্চজন্য ধর
এস সুদর্শনধারী॥

ঐ হের দিশি দিশি অযুত কংস কেশী
অত্যাচারী শিশুপাল
হাসিয়া বিকট হাসি ফিরিছে ধরম নাশি
কলুষিয়া ভারত বিশাল॥
পিতামাতা পরিজন হারাইয়া কত জন
কাঁদিয়া ফিরিছে পথে হায়।
গৃহসম্পদ যত নিমেষেতে লুন্ঠিত
হতাশায় ডাকিছে তোমায়॥

রাখ বাঁশরী-বিলাস হয়েছে সর্বনাশ
তব লীলাভূমি আজ হয়েছে শ্মশান।
তোমারি ভারতমাতা নিপীড়িতা লাঞ্ছিতা
ধর ধর চক্র ধর, রাখ রাখ মান॥
—চক্র ধর হে—বংশী ছেড়ে আজি—
বংশী ছাড় বংশীধর—চক্রধর চক্র ধর।

বারেকের তরে হরি লীলার বিলাস ছাড়ি
চল চল কৌরব-নিধনে।
ওহে নিখিলের পতি তুমি হবে সেনাপতি
মোরা তব সেনা হব রণে॥
—প্রাণ দিব হে—তোমার রণে মোরা
মরে অমর হব মোরা—ধর্মসংস্থাপনে।

* কীর্তনের সুরে গেয়।

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

[জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীর ডায়েরী হইতে]

(পূর্বানুবৃত্তি)

বি-এ পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ায় পিতৃদেব আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়িবার জন্য ১৯১৭ খৃঃ মধ্যভাগে জনৈক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কলিকাতা পাঠাইলেন। কলেজস্ট্রীটস্থ স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাসে আসন পাতিলাম। অনেক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটিল। পড়াশুনা নিয়মিতভাবেই চলিতে লাগিল। এখন পর্যন্ত বেলুড়মঠ-দর্শনে যাওয়া হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিবার ইচ্ছা জাগিল। ভাবিলাম—এবার কোন পরিচিত বন্ধু-সমভিব্যাহারে মহারাজকে দর্শন করিতে যাইব। মহারাজ তখন বাগবাজারে ১নং মুখার্জী লেনের (বর্তমানে উদ্বোধন লেনের) এক দ্বিতল বাটীতে (যাহা 'শ্রীশ্রীমায়ের বাটী' বলিয়া সুবিদিত) ছিলেন। এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজের দর্শনাভিলাষে 'মায়ের বাটীতে' বিকাল বেলা উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম—শ্রীশ্রীরামনাম-সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সন্ন্যাসি- ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ উক্ত দ্বিতল বাটীর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত নিম্নস্থ এক স্বল্প-পরিসর গৃহে সঙ্কীর্তনের জন্য বাদ্যযন্ত্রসহ সমবেত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীমহারাজও একটি পৃথক্ আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এখনও সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইতে কিছু সময় বাকী আছে। মহারাজ আমাকে চিনিতে পারিবেন কিনা—এই সংশয় ও সন্দেহ লইয়া তাঁহাকে অতি সঙ্কোচের সহিত প্রণাম করিলাম। আশ্চর্যের বিষয়—তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'ভাল আছিস?' অনেক দিন পূর্বে তাঁহার সঙ্গে ৺পুরীধামে দেখা হইয়াছিল; তিনি যে আমার মতো একজন নগণ্য যুবককে এতদিন পরেও চিনিতে পারিয়াছেন, তাহাতে আমার হৃদয়-মন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অহো ভাগ্যম্! তাঁহার সেই স্নেহমাখা প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ, ভাল আছি।'

কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত পুণ্যতীর্থ 'বেলুড় মঠ' দর্শন করিয়া আসিলাম। সাগরাভিসারিণী সুরধুনীর পশ্চিমতটে বেলুড় গ্রামের এক সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর এই পবিত্র মঠ স্থাপিত। উচ্চকোটি সাধু-সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক চেতনায় এই স্থানটি উজ্জীবিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার আবহাওয়া এত নির্মল ও ভাবোদ্দীপক যে, এখানে আসিলেই মন পবিত্র ভগবচ্চিন্তায় ভরপুর হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে মঠস্থ অনেক প্রবীণ সাধুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটিল। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ (স্বামী শিবানন্দ) মহারাজও তখন মঠেই বাস করিতেন। তাঁহারও আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইলাম। বলা বাহুল্য, স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্য পূজনীয় (ব্রহ্মচারী) জ্ঞান মহারাজ তখনকার দিনে মঠযাত্রী যুবকবৃন্দের বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র ছিলেন। আমি মঠে গেলেই তাঁহার নিকট অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতাম এবং তিনিও তাঁহার প্রকল্পিত 'বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি' সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ কথা বলিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সনির্বন্ধ অনুরোধে আমাকে

মধ্যে মধ্যে ২।১ খানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র pamphlet'ও লিখিতে হইত। তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবাদর্শে আমি দিনের পর দিন যেরূপ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম, তাহা আমার ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনের পক্ষে যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

মঠে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম যে, শ্রীশ্রীমহারাজ তখন বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের দ্বিতলবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। ইতোমধ্যে শ্রীশ্রীমহারাজের কতিপয় যুবকভক্তের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়া গিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্থী এবং তাহাদের কেহ কেহ কলিকাতার বিভিন্ন ছাত্রাবাসে এবং কেহ কেহ স্ব-স্ব বাটীতে থাকিয়া কলেজে যাওয়া-আসা করে। এখন হইতে এই সব বন্ধুদের সহিত বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিতে যাই, মহারাজও আমাদের সহিত প্রথম হইতেই আনন্দের সহিত খোলাখুলিভাবেই মেলামেশা করেন। এইভাবে ঘন ঘন আসা-যাওয়া করিতে করিতে শ্রীশ্রীমহারাজের প্রতি এত তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম যে, কলেজ-ছুটির পর সপ্তাহে অন্ততঃ ২।৩ দিন বিকালবেলা সে-স্থানে না যাইয়া থাকিতে পারিতাম না।

বন্ধুদের নিকট হইতেই জানিতে পারিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়াছে। জনৈক বন্ধু (পরবর্তীকালে সন্ন্যাসলাভের পর তাহাকে আমেরিকায় পাঠানো হয়) আমাকেও দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া বলিল যে, যে-পর্যন্ত সদ্‌গুরুর আশ্রয় ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত না হওয়া যায়, সে-পর্যন্ত দেহমন শুদ্ধ হয় না। অধিকন্তু এই মন্ত্রদীক্ষার মাধ্যমেই শিষ্যের জীবন গুরুর সঙ্গে চিরদিনের জন্য মিলিত হয়। মনুষ্যজন্ম তখনই সার্থক হয়, যখন সদ্‌গুরুর কৃপালাভ হয়। 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থেও ঠিক অনুরূপ কথাই লিখিত রহিয়াছে:

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥৩॥

মনুষ্যজন্ম, মুক্তির ইচ্ছা ও সদ্‌গুরুর আশ্রয়,—একই জীবনে এই তিনটি বস্তুর একত্র সমাবেশ অত্যন্ত দুর্লভ এবং উহা একমাত্র দেবতার অনুগ্রহেই ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্র আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য যে ব্যক্তি সচেষ্ট না হয়, সে মূঢ়ধী—নির্বোধ। বন্ধুদের কথা শুনিয়া আমারও মনে দীক্ষা লইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। একজন আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইয়া দিল যে, মহারাজ সহজে কাহাকেও দীক্ষাদান করেন না। এই কথা শুনিয়া কেমন একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক আসিয়া আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। যতই দিন যায়, ততই সেই আশঙ্কা বাড়িতে লাগিল। মনে হইত—দীক্ষা প্রার্থনা করিলে মহারাজ যদি দীক্ষা না দেন, তবে তো আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। নানাপ্রকার সংশয় ও সঙ্কোচে হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল।

ছাত্রাবাসে আসিয়াও ঠিক ঐ দুশ্চিন্তা—যদি মহারাজ দীক্ষা না দেন, তবে কি হইবে? তিনি যদি আমাকে আপনার করিয়া না লন, তবে তো এ জীবন মরুভূমি-সদৃশ শুষ্ক ও নীরস হইয়া যাইবে! বলা বাহুল্য, একবার কোন চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিলে তাহার হাত হইতে সহজে আমার পক্ষে মুক্তিলাভ করাও সম্ভব ছিল না—এখন হইতে যখনই যেখানে যাই, কেবল সেই চিন্তাই সর্বদা মনে উঠিতে থাকে। শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিতে যাইয়াও ঐ চিন্তাতেই মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ক্রমে

এই চিন্তা এত তীব্র হইয়া উঠিল যে, আমার পক্ষে পড়াশুনায় বা অন্য কোন কাজে পূর্বের ন্যায় মনোনিবেশ করা সম্ভব হইল না।

দিনের পর দিন এইরূপ মানসিক অশান্তিতে কাটিতে লাগিল। এই সময় এক আকস্মিক ঘটনায় আমার পক্ষে শ্রীশ্রীমহারাজের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার অপূর্ব সুযোগ ঘটিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কলিকাতা মহানগরীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর প্রকোপ ঘটে। হাজার হাজার নরনারী সেই দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে লাগিল। অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া শিক্ষা-বিভাগের পরিচালকগণ স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় তিনমাসের জন্য বন্ধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সমস্ত ছাত্রাবাস হইতে বিদ্যার্থিগণকে স্ব-স্ব গ্রামে সত্বর চলিয়া যাইবার জন্য কড়া হুকুম জারি হইল। আমাদের ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও আমাদের সকলকে ছাত্রাবাসটি ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য আদেশ দিলেন। পাচক, চাকর প্রভৃতিও প্রাণভয়ে 'যঃ পলায়তে স জীবতি'—নীতি অনুসরণ করিয়া অচিরে স্ব-স্ব গ্রামে পলায়ন করিল। ছাত্রাবাসটি অনতিবিলম্বেই খালি হইয়া গেল। কেবল আমি ও আর একজন ছাত্র নিজেদের দায়িত্বে সেই ছাত্রাবাসে থাকিবার অনুমতি লইয়া সেইখানেই রহিয়া গেলাম। অধ্যক্ষও আত্মরক্ষাকল্পে যথাসত্বর অন্যত্র চলিয়া গেলেন; শুধু একজন দারোয়ান ছাত্রাবাসটি দেখাশুনা করিবার জন্য রহিয়া গেল।

আমরা ভাবিলাম—মৃত্যু যদি ললাটে লেখা থাকে, তবে তাহা কেহ খণ্ডাইতে পারিবে না; সুতরাং স্থানত্যাগ করিয়াও সেই অবধারিত মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হইবে না। অধিকন্তু এই দীর্ঘ তিনমাস ছাত্রাবাসে থাকিয়া কিছু কিছু পড়াশুনা করিতে পারিব এবং ঘন ঘন বেলুড়ে ও বলরাম-মন্দিরে যাইয়া মহারাজের সঙ্গ করিবারও সুযোগ পাইব। এখন হইতে প্রায়ই বলরাম-মন্দিরে মহারাজের নিকট যাইতে লাগিলাম। কিন্তু অন্তরে দীক্ষাগ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা সত্ত্বেও মনের কথা মনেই থাকিয়া যাইত, কখনও তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে সাহস হইত না, কেবলই আশঙ্কা হইত, যদি মহারাজ দীক্ষা দিতে রাজী না হন! একদিন বেলা ১০টা কি ১০॥টার সময় পার্শ্ববর্তী হোটেলে আহার করিতে বসিয়াছি। সহসা একজন বাউল একতারা-হস্তে সেই গলির পাশ দিয়া একটি মর্মস্পর্শী গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। গানটির তাৎপর্য এই যে, সদ্গুরুর কৃপা ব্যতীত এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। গানের পঙ্ক্তিগুলি বাউলটি এত আবেগভরে গাহিতেছিল যে, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অশ্রুজলে গণ্ডস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। অর্ধাহারেই সহসা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম এবং হোস্টেলে চলিয়া আসিলাম। ভাবিলাম—আমার জীবনের ভার যদি কেহ গ্রহণ না করেন, তবে তো অনির্দিষ্ট কালের জন্য এভাবেই জীবনযাত্রা চলিতে থাকিবে, ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে না; জীবন কেবল ভারাক্রান্তই হইবে।

হোস্টেলে পৌঁছিয়াই স্থির করিলাম, এখনই বলরাম-মন্দিরে যাইব এবং মহারাজকে দীক্ষার কথা জানাইব। সেই দ্বিপ্রহরে আহারান্তে সকলেই বিশ্রাম করিতেছেন। আমার মন এত উচাটন হইয়াছে যে, ঐ অসময়ে যে মহারাজকে দর্শন করিতে যাওয়া একান্তই অবিমৃশ্যকারিতা, তখন আমার সে-জ্ঞান ছিল না। আমি সেই

মুহূর্তেই মহারাজের নিকট যাইবার জন্য এমন আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম যে, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়াই বাগবাজারের দিকে ছুটিলাম। বলরাম-মন্দিরে পৌছিয়া ভিতরের দিকের সিঁড়ির শেষধাপে পা দিতেই মাথা তুলিয়া দেখি, শ্রীশ্রীমহারাজ সেখানে দণ্ডায়মান! আমি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্রই অঝোর ধারায় কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া স্নেহভরে পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, 'তুই এত কাঁদছিস্ কেন? কোন অমঙ্গল হয়নি তো?' তাঁহার পুণ্য স্পর্শে মন অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিল। তিনি আমাকে বারান্দায় বসিতে বলিয়া সহসা নিজের শয়নঘরে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বারান্দায় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল্ দেখি, তুই কি চাস্?' আমি শত চেষ্টা করিয়াও মনের কথাটি বলিতে পারিলাম না—কেবলই ভয়—যদি তিনি দীক্ষা দিতে সম্মত না হন। বারবার তিনবার তিনি বারান্দায় আসিয়া আমাকে সেই একই প্রশ্ন করিলেন। তাঁহারও আহারান্তে বিশ্রাম নাই—আমিও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না। তিনি অবশেষে বলিলেন, 'ছাখ্, প্রায় দুটো বাজতে চ'লল, ভক্তদের আসবার সময় হয়ে এল। তারা এসে পড়লে তোর আর কিছুই বলা সম্ভব হবে না। বল্, বল্ দেখি, কি বলতে এসেছিস্।' আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু একটিমাত্র শব্দ কোনপ্রকারে উচ্চারণ করিলাম—'দীক্ষা'। মহারাজ এই প্রার্থনা শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, 'এর জন্যে এত ভাবনা কেন? তোর দীক্ষা হয়ে যাবে।' এই বলিয়া তিনি একটু জোরে ডাকিতে লাগিলেন, 'ওরে—পাঁজিটা নিয়ে আয় দেখি। এর দীক্ষার একটা দিন দেখে দিই।' সেবক-সন্ন্যাসী মহারাজের ডাক শুনিয়া বিশ্রাম হইতে উঠিলেন এবং একখানা 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা' আনিয়া মহারাজের হাতে দিলেন। মহারাজ বারান্দাতেই একটি পৃথক্ আসনে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া পঞ্জিকাটির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন এবং শেষপর্যন্ত একটি পাতা দেখিলেন। আমার কিন্তু মনে হইতেছিল যে ২।৪ দিনের মধ্যেই আমার দীক্ষালাভ হইবে। যাহা হউক, তিনি কিছুক্ষণ পরে আমাকে জানাইলেন—'ছাখ্ তোর দীক্ষা হয়ে যাবে; তবে ভাল দিন খুঁজে পাচ্ছি না। দিন ঠিক ক'রে দীক্ষা দিব।' আমার মন নিশ্চিন্ততায় ভরিয়া গেল, ভাবিলাম—এতদিনে আমার মনের দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। তখনও বুঝিতে পারি নাই যে, এই দীক্ষালাভের জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন এবং আমাকে আরও দীর্ঘকাল নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে।

ইহার পর হইতে যখনই শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বেলুড় মঠ বা বলরাম-মন্দিরে যাইতাম, তখনই একবার মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিতাম, 'মহারাজ, আমার দীক্ষা কবে হবে?' তিনিও খুব সহজ সরল ভাবে বলিতেন, 'তার জন্য ভাবনা কি? সময়মত সব হয়ে যাবে।' ইতোমধ্যে আমার অপর এক বন্ধুও (পরবর্তী কালে সেও সন্ন্যাস গ্রহণ করে) মহারাজের নিকট দীক্ষা-প্রার্থী হইয়াছিল এবং মহারাজ তাহাকেও দীক্ষা দিতে রাজী হইয়াছিলেন। সুযোগ-সুবিধা পাইলেই আমরা উভয়ে মহারাজের নিকট যাইতাম এবং দীক্ষার কথা বলিতাম। তিনি যখন কিছুদিনের জন্য আলিপুরে কুচবিহার মহারাজের উদ্যানবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনও আমরা সেখানে হানা

দিতে ছাড়ি নাই। বলা বাহুল্য, মহারাজ তাহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং আমাদের আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে খুব সন্তুষ্টই হইতেন।

সময় সময় এমন এক-একটি ঘটনা ঘটে, যাহা জীবনের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়। আমি বাল্যকাল হইতেই গোপাল-মূর্তি ভালবাসিতাম। পূর্বেও এ-কথার উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ‘শ্রীশ্রীকথামৃতাদি’ গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রতি খুব আকৃষ্ট হই এবং তাঁহার শ্রীমূর্তিও অবসর-মত ধ্যান করিতে চেষ্টা করিতাম। শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইয়াও দোটানায় পড়ি এবং নিজেকে কপটাচারী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মনের এই গোপন কথাটি মহারাজের নিকট প্রকাশ করিতেও ভয়ানক সঙ্কোচবোধ করি। ভাবিলাম—এ-সব কথা জানিতে পারিলে তিনিই বা কি মনে করিবেন? যাহা হউক, স্থির করিলাম, এ-কথা আর চাপিয়া রাখা হইবে না —সুযোগ পাইলেই মহারাজকে অকপটে সব বলিব, তাহাতে যাহা হয়, তাহাই হইবে। কিন্তু সেই সুযোগই বা মিলিবে কিভাবে? মনের ভিতর ভয়ানক দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। মহারাজের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, কোন কোন দিন ভোরের দিকেও বলরাম-মন্দিরে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতাম। তিনি আমাকে মধ্যে মধ্যে এই অসময়ে আসিতে দেখিয়া প্রায়ই বলিতেন, ‘কিরে, তোর স্কুল নেই? তুই পড়াশুনা করিস্ না?” বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তিনি আমাকে একজন স্কুলের ছাত্র বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলেন—কারণ আমি কখনও প্রকাশ করি নাই যে, আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। যাহা হউক, একদিন বিকালবেলা বলরাম-মন্দিরে গিয়াছি, তখন মহারাজের শয়ন-ঘরে তিনি ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। তিনি একটি গড়গড়াতে নলের সাহায্যে ধূমপান করিতে-ছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিলাম। ক্ষণপরেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘হ্যাঁরে, বল্ দেখি তোর কোন্ মূর্তি ভাল লাগে?’ বহুদিনের ঈপ্সিত সুযোগ লাভ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম— ‘মহারাজ, আমার গোপাল-মূর্তি খুব ভাল লাগে।’ মহারাজ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘গোপালকে কিভাবে দেখতে ভাল লাগে?’ ‘গোপালকে বুকে ধরে রাখতে ইচ্ছা করে।’ এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ হঠাৎ অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ‘আহা! আহা!’ এবং গভীর ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। নিস্পন্দ দেহ; চক্ষুর প্রান্ত বাহিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কি অপূর্ব দৃশ্য! আমি ইতঃপূর্বে সমাধি-অবস্থা দেখি নাই। আজ মহারাজের এই গভীর তন্ময়তা দেখিয়া সমাধি সম্বন্ধে আমার সামান্য একটু ধারণা হইল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া আমাকে বলিলেন, ‘তা বেশ তো, তোর যখন গোপাল-মূর্তিই ভাল লাগে, তখন তুই তাকেই ধ্যান করবি।’

ইহার পর সেদিন আর বিশেষ কোন কথা হইল না। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ছাত্রাবাসে চলিয়া আসিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, এখন হইতে কেবল গোপাল-মূর্তিই ধ্যান করিব। সন্ধ্যার সময় আমি ছাত্রাবাসের ছাদে ধ্যান করিতে বসিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! যতই গোপাল-মূর্তি ধ্যান করিতে চেষ্টা করি, ততই ঠাকুরের শ্রীমূর্তিখানি আমার মানস-নয়নে স্পষ্টতর হইয়া ভাসিতে লাগিল। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও শ্রীশ্রীঠাকুরকে মন হইতে দূরে সরাইতে পারিলাম না। শুধু

ইহাই নহে—শ্রীশ্রীঠাকুরকে ত্যাগ করিতে প্রাণে দারুণ ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল—আমি তো মহারাজের নিকট মস্ত বড় একটা ভুল কথা বলিয়া আসিয়াছি। সারারাত্রি মানসিক অশান্তিতে সুনিদ্রা হইল না। স্থির করিলাম—আগামী কাল প্রভাতেই মহারাজের নিকট যাইয়া মনের কথা নিঃসঙ্কোচে বলিব। তদনুযায়ী পরদিন ভোরের দিকে একটু বেলা হইতেই বাগবাজার অভিমুখে রওনা হইয়া বেলা ৭টা-৭॥টার সময় মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলাম তিনি আমাকে এত সকালে দেখিয়াই বলিলেন, 'কিরে, হঠাৎ আবার এত সকালে এলি?' আমি তখন মনের কথা সব খুলিয়া বলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইলাম যে, আমি ঠাকুরকে ছাড়িয়া শুধু গোপালকে ধ্যান করিতে পারি না—ঠাকুরকে ত্যাগ করিতে মনে ভয়ানক যন্ত্রণা বোধ হয়। মহারাজ অতি স্নেহভরে বলিলেন, 'ঠাকুর আর গোপালে কোন ভেদ নেই জানবি। তুই ঠাকুরকেই গোপাল-জ্ঞানে ধ্যান করবি।' এক কথায় সব সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। আমিও মহারাজের নির্দেশমত ঠাকুরকেই যথাসাধ্য গোপাল-জ্ঞানে চিন্তা করিতে লাগিলাম। (ক্রমশঃ)

যুগনায়ক বিবেকানন্দ

শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সকল ভারতবাসীর কাছে সর্বকালের জন্য এক পরম পাথেয়। বর্তমানে তাঁকে স্মরণ ক'রে নতুন ক'রে তাঁর বীরব্রতে ও 'মাভৈঃ'-মন্ত্রে দীক্ষিত হবার প্রয়োজন এসেছে। পুণ্যশ্লোক বিবেকানন্দের পুণ্য নাম স্মরণ ক'রে এবং তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের সঙ্কল্প নিতে হবে মাতৃভূমিকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করার।

কর্মযোগী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাগুলির বিশদ আলোচনা অনেকেই করেছেন। বালক নরেন্দ্রনাথ ছিলেন একটি ডানপিটে ছেলে। কেমন ক'রে এই ডানপিটে ছেলে একজন কৃতী ছাত্র হয়ে উঠলেন এবং কিভাবে তাঁর অধ্যাত্ম-জীবন বিকশিত হ'ল সে-কথা সর্বজনবিদিত।

স্বামীজীর জীবনের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য। এর সর্বপ্রথম এবং হয়তো সর্বপ্রধান বর্ষ হচ্ছে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ এই বৎসর নভেম্বর মাসে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অপর ঘটনাগুলির সময়—১৮৮৬, ১৮৯৩ ও ১৮৯৭। ১৮৮৬ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তাঁর আরব্ধ কাজের গুরুভার পড়ে স্বামীজীর ওপর। ১৮৯৩ খৃঃ তিনি শিকাগোর ধর্ম-সম্মেলনে হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার ক'রে অবনত ভারতকে বিশ্বসমক্ষে পুনঃস্থাপিত করেন। সর্বশেষে ১৮৯৭ খৃঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

স্বামীজীর জীবনের স্বল্পস্থায়িত্ব জাতির এক চরম দুর্ভাগ্য বলা যেতে পারে। এ-বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ভারতের আর এক যুগন্ধর পুরুষের তুলনা করা যায়—তিনি হলেন শঙ্করাচার্য।

বিবেকানন্দের স্বল্পায়ত জীবনে তিনটি আদর্শের রূপায়ণ দেখতে পাই—ধর্মপ্রাণতা, মানবতাবোধ ও দেশপ্রেম

স্বামীজীর শ্রেষ্ঠ অবদান ভারতের সনাতন ধর্মের পুনরুজ্জীবন। প্রগাঢ় ধর্মপ্রাণতার প্রেরণাতেই তিনি এই মহৎ কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। শিকাগোর ধর্মসভায় তিনি বজ্রনির্ঘোষে বলেছিলেন: আমি এমন ধর্মের কথা বলতে চাই, বৌদ্ধধর্ম যার এক বিদ্রোহী সন্তান এবং খৃষ্টধর্ম যার দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি। তাঁর প্রচারিত ধর্ম—বেদবুদ্ধিতে উজ্জ্বল ও কুসংস্কারের আবর্জনামুক্ত হিন্দুধর্ম। বিদেশে হিন্দুধর্মের প্রচার ও ব্যাখ্যা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, তিনি ভারতের প্রতিটি তীর্থস্থান পর্যটন করেছিলেন। হিন্দুধর্মের এই একনিষ্ঠ পূজারী অন্যধর্মের প্রতিও প্রগাঢ় অনুরাগী ছিলেন। একবার তিনি বলেছিলেন, 'আমি যদি যীশু খৃষ্টের সময় প্যালেস্টাইনে থাকতাম তো চোখের জলে কেন, বুকের রক্ত দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতাম।' কাশ্মীরের একটি মুসলমান বালিকাকে কুমারীপূজা ক'রে তিনি এক সংস্কার-মুক্ত সাহসী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন।

তারপর তাঁর মানবতাবোধ। এই তরুণ তাপস নির্বিকল্প সমাধি থেকে ফিরে এসে প্রচার করেন, জনসেবাই প্রকৃত ধর্মাচরণ—'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' দেশের ও বিদেশের অবহেলিত ও নিপীড়িত মানুষ ছিল তাঁর বিশেষ প্রীতি ও ভালবাসার বস্তু।

বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের গভীরতা নির্ণয় করার চেষ্টা না করেও বলা যায়, তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে এরই প্রেরণা ছিল নিহিত। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রগাঢ় অনুরাগ ভারতের তদানীন্তন দুর্ভাগ্য ও দীনতার জন্য তীব্র বেদনাবোধ, স্বাধীনতার জন্য অধীর আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি ভারতের পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে বলিষ্ঠ বিশ্বাস—তাঁর কর্মে ও কথায় বারংবার ধ্বনিত হয়েছে। বিদেশ থেকে ফেরার মুখে তিনি একবার বলেছিলেন, 'বিদেশযাত্রার আগেও আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসতাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা, ভারতের আকাশ-বাতাস সবই আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়।'

অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে, বিবেকানন্দের দেশপ্রেমের সবচেয়ে বড় নিদর্শন হ'ত, যদি তিনি ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকতেন। এর উত্তরে বলতে পারা যায়, আমাদের দেশে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোনদিন স্পষ্ট সীমারেখা টানা হয়নি—গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজীর জীবনে ধর্ম ও রাজনীতির যুগপৎ অনুশীলন আমরা দেখেছি। দ্বিতীয়তঃ বিবেকানন্দের বেদান্ত-ধর্ম—আত্মার মুক্তি ও ব্যক্তির স্বাধীনতার ধর্ম। তাছাড়া তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও এর প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। ১৮৯৬ খৃঃ এক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমার কার্যক্ষেত্র অন্যবিভাগে, কিন্তু এই আন্দোলনের দ্বারা ভবিষ্যতে বিশেষ শুভফললাভের সম্ভাবনা আছে মনে করি।'

জনসেবার মাধ্যমে দেশসেবার যে আদর্শ বিবেকানন্দ সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন, ভারতের লুপ্তপ্রায় সম্ভ্রমবোধ যেভাবে তিনি পুনর্জাগরিত করেছিলেন, তাতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রায় অব্যবহিত পূর্বে দেহত্যাগ করলেও তিনিই ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রকৃত উদ্গাতা। অধ্যাপক বিনয় সরকার জোর গলায় বলেছিলেন, 'He paved way for the ideas of 1905.'—১৯০৫-এর পথ তিনিই প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন। কেউ কেউ (যেমন ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত) তাঁকে সমাজতন্ত্র-

বাদের জনক বলেও মনে করেন। তাঁর প্রিয়-শিষ্যা নিবেদিতা ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দেশ-প্রেমের প্রেরণা তিনিই জাগিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক, অথচ এই দুই ক্ষণজন্মা বাঙালীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না—এটা অনেকের কাছেই বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়। অথচ এই দু-জনের আদর্শ ও কর্ম-পন্থার মধ্যে অনেক মিল ছিল। উভয়েই বলিষ্ঠ ও গতিশীল জীবন ও ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক; দু-জনেরই রচনা ও ব্যক্তিসত্তা দেশপ্রেমের জ্যোতিতে ভাস্বর। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ দু-জনেই জাপানী মনীষী ওকাকুরার সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং এশিয়ার শাশ্বত আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন।

বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় নিশ্চয়ই ছিল। ১৮৮১ খৃঃ সন্ত বিলাত-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলার বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সভাতে যাঁরা তাঁর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন তরুণ গায়ক নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের প্রতিভা ও মহত্ত্ব স্বীকার করেননি—এ-কথাও ঠিক নয়। স্বামীজীর তিরোধানের প্রায় ছয় বৎসর পরে ১৩১৫ সালে 'পূর্ব ও পশ্চিমে' প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন:

'অল্পদিন পূর্বে বাংলা দেশে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দ পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সঙ্কীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সঙ্কুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভা তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।'

উপরি-উক্ত কথাগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম জীবনে স্বামীজী ব্রাহ্মসমাজ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে ও প্রভাবে আসার পর তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত পথে চলে যান। সম্পর্কের নিবিড়তা না থাকলেও রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর দীপ্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে এড়িয়ে যেতে পারেননি, তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ ১৩১৪-১৬ সালে রচিত তাঁর 'গোরা' উপন্যাস। রবীন্দ্র-জীবনীর রচয়িতা শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'গোরার চরিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাই।' বস্তুতঃ গোরার দেশাত্মবোধ, হিন্দুধর্মে অবিচলিত নিষ্ঠা ও তার মানবতাবোধ—সব কিছুরই উৎস যুগপ্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ।*

---

*প্রবন্ধটি গত ২৮. ১. ৬৩ হুগলি মহসীন কলেজে প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে লিখিত

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা

স্বামী ধীরেশানন্দ

[সপ্তবিধ-সংজ্ঞা]

সপ্তাবস্থাস্তথা জ্ঞেয়াশ্চৈতন্যানাং চ সপ্তকম্।
ভূরাদিসপ্তকং তদ্বৎ সর্বপাপবিনাশকম্॥ ৫৮ ॥

(চিদাভাসের) অবস্থা[১]সমূহ সপ্তবিধ জ্ঞাতব্য, তদ্রূপ চৈতন্য[২]সমূহ এবং সর্বপাপহারী ভূর্ভুবাদি[৩] ব্যাহৃতিসকলও সপ্তবিধ প্রসিদ্ধ।

১. অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, অনর্থনিবৃত্তি ও আনন্দপ্রাপ্তি বা নিরঙ্কুশা তৃপ্তি—চিদাভাস বা জীবের এই সাতটি অবস্থা। চিদাভাসাখ্য জীব স্ত্রীপুত্রধনাদি-সম্পাদনে আসক্তচিত্ত হইয়া বেদান্ত-বিচারের পূর্বে কখনও স্বীয় অবাধিত স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ নির্বিকার সাক্ষী প্রত্যাগাত্মাকে জানিতে পারে না—ইহাই **অজ্ঞান**। আবরণ দ্বিবিধ—অসত্তাপাদক আবরণ ও অভানাপাদক আবরণ। 'কূটস্থ নাই'—এইরূপ বোধের যাহা হেতু, তাহাকে অজ্ঞানের **অসত্তাপাদক আবরণ** বলে। 'কূটস্থ প্রকাশ পাইতেছেন না'—এইপ্রকার বোধের নিমিত্ত অজ্ঞানের **অভানাপাদক** আবরণ। ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অসত্তাপাদক আবরণ দূর হয় এবং অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা অভানাপাদক আবরণ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। তখন অহঙ্কার, জীব, জগদাদি **বিক্ষেপনিবৃত্তি** এবং তৎপশ্চাৎ **সর্বানর্থনিবৃত্তি** ও পরমানন্দপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। (পঞ্চদশী-তৃপ্তিদীপ, ২৮-৩৩ দ্রষ্টব্য)।

২. সপ্ত চৈতন্য: শুদ্ধচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতন্য, জীবচৈতন্য, প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাণচৈতন্য, প্রমেয়চৈতন্য এবং ফলচৈতন্য।

মায়োপাধিবির্নির্মুক্ত চৈতন্য **শুদ্ধচৈতন্য,** মায়োপাধিযুক্ত চৈতন্য **ঈশ্বরচৈতন্য** ও অবিদ্যাবশগ চৈতন্যকে **জীবচৈতন্য** বলে।

[অবিদ্যাবিশিষ্ট চৈতন্যই জীব ও অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য প্রমাতা—ইহা এক মত। অন্যমতে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যই জীব। সে-ক্ষেত্রে জীব ও প্রমাতা এক হইয়া পড়ে। এখানে পূর্বমতানুসারে জীব ও প্রমাতৃচৈতন্য ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে—এরূপ বোদ্ধব্য। অথবা জীবচৈতন্য বলিতে এখানে জীব-সাক্ষী অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য গ্রাহ্য এবং প্রমাতৃচৈতন্যই জীব বোদ্ধব্য।]

অন্তঃকরণ-সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত চৈতন্য **প্রমাতৃচৈতন্য,** অন্তঃকরণবৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য **প্রমাণচৈতন্য,** অজ্ঞাতচৈতন্য অর্থাৎ প্রমেয় বস্তুদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য **প্রমেয়চৈতন্য** এবং জ্ঞাত চৈতন্য **ফলচৈতন্য** নামে প্রসিদ্ধ। বৃত্তিদ্বারা আবরণভঙ্গের পর ঘটাদি-অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অর্থাৎ পূর্বে অজ্ঞাত বিষয়চৈতন্য বা প্রমেয় চৈতন্য অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হয়। এই প্রমেয় চৈতন্যের প্রকাশ হওয়াই ঘটাদির জ্ঞাততা। এই জ্ঞাততাবিশিষ্ট চৈতন্যই **ফলচৈতন্য**। অতএব বিষয়চৈতন্যই জ্ঞাত হইলে তাহাকে ফলচৈতন্য বলা হয়। ইহা অবচ্ছেদবাদীর মত।

(অন্যমতে) পুনঃ অন্তঃকরণ হইতে ঘট পর্যন্ত যে বৃত্তি, সেই বৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্যই **প্রমাণ-চৈতন্য**। ঘটসহ সম্বন্ধ হইয়া সেই বৃত্তি যখন ঘটাকারাকারিত হয় অর্থাৎ ঘটের অভিব্যক্তি যোগ্যত্বের সম্পাদক হয় এবং তাহা দ্বারা ঘটের আবরণ নাশ হয়, তখন সেই ঘটাকার-বৃত্তিতে বিষয়চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব বা আভাস উৎপন্ন হয়, তাহার নাম **ফলচৈতন্য**। এই চিদাভাসরূপ ফলের উৎপত্তিই ঘটের জ্ঞাততা। ইহাকেই প্রমাচৈতন্য বা প্রমিতিচৈতন্য বলা হইয়া থাকে। ইহা আভাসবাদী বিদ্যারণ্যস্বামীর মত। (পঞ্চদশী ৮।১০-১৩ দ্রষ্টব্য)। প্রমাণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসকেও স্থানান্তরে পঞ্চদশীকার 'ফল' বলিয়াছেন (পঞ্চদশী ৭।৯০ দ্রষ্টব্য)।

অথবা এরূপ বলা যাইতে পারে যে, অন্তঃকরণবৃত্তি ঘটাকারাকারিত হইলে প্রমাণচৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য অভেদ হইয়া যায়। তখন বৃত্তিতে ঐ একীভূত চৈতন্যের আর একটি নবীন আভাস উৎপন্ন হয়, উহাই **ফলচৈতন্য**।

৩. ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য—এই উর্ধ্ব সপ্ত ভুবন। বিশেষরূপে সর্বপাপের নাশক বলিয়া ইহাদিগকে ব্যাহৃতি বলা হয়।

সপ্তকং চাতলাদীনাং সপ্তৈব জ্ঞানভূমিকাঃ।
ধাতবঃ সপ্ত বিজ্ঞেয়াঃ সপ্তৈব ব্যসনানি বৈ ॥ ৫৯ ॥

(উর্ধ্ব সপ্ত লোকের ন্যায় অধোদেশেও) অতলাদি[১] ভুবন সাতটি এবং জ্ঞানভূমিকাও[২] সাতটিই কথিত হইয়া থাকে। সর্বদেহে ধাতু[৩] সপ্তবিধ জ্ঞাতব্য এবং ব্যসনসমূহও[৪] সপ্তবিধই প্রসিদ্ধ।

১. অধঃ সপ্তভুবন : অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল।

২. সপ্ত জ্ঞানভূমিকা : শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্তাপত্তি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবনী ও তুর্যগা। ভূমিকা বলিতে চিত্তের অবস্থা-বিশেষ বোদ্ধব্য।

নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া ফলপর্যবসায়িনী মোক্ষলাভের ইচ্ছাকে (১) **শুভেচ্ছা**-নামক প্রথম ভূমি বলে। তৎপর গুরূপসদনপূর্বক শ্রবণমননাত্মক বেদান্তবিচারই (২) **বিচারণা**-নামক দ্বিতীয় ভূমি। অতঃপর নিদিধ্যাসন অভ্যাসদ্বারা মন একাগ্র হইয়া সূক্ষ্মবস্তুগ্রহণসমর্থ হইলে সে অবস্থাকে (৩) **তনুমানসা** বলে। এই তিন অবস্থা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনরূপ। নিজ হইতে ভিন্নরূপে জগৎ এই তিন অবস্থায় প্রতীত হয় বলিয়া এই তিন অবস্থাকে 'জাগ্রৎ' বলা হয়। যে অবস্থায় বেদান্তবাক্য হইতে নির্বিকল্পক ব্রহ্মাত্মৈক্য-সাক্ষাৎকার জাত হয়, তাহাই (৪) **সত্তাপত্তি** নামক ফলরূপা চতুর্থ ভূমি। ইহাকে 'স্বপ্নাবস্থা' বলা হয়, কারণ এই অবস্থায় সর্ববস্তুর স্বপ্নতুল্য মিথ্যারূপে স্ফুরণ হইয়া থাকে। চতুর্থভূমিকারূঢ় সাধককে 'ব্রহ্মবিৎ' বলা হয়। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমভূমি জীবন্মুক্তির অবান্তর ভেদ-মাত্র। পঞ্চমভূমিকারূঢ় পুরুষ নির্বিকল্প অবস্থা হইতে স্বয়ং ব্যুত্থিত হন এবং তাঁহাকে 'ব্রহ্মবিদ্‌বর' বলা হয়। ইহা 'সুষুপ্তি' অবস্থাতুল্য। (৫) **অসংসক্তি** নামক এই পঞ্চমভূমি, সবিকল্প-সমাধি অভ্যাসবলে নিরুদ্ধ মনের নির্বিকল্প-সমাধি অবস্থা। এই নির্বিকল্পসমাধি অভ্যাস-পরিপাক-বশতঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তাহাকে (৬) **পদার্থাভাবনী** বা গাঢ়সুষুপ্তি-নামক ষষ্ঠভূমি বলে। ষষ্ঠভূমিকারূঢ় পুরুষ পার্শ্বস্থজনকর্তৃক

বোধিত হইয়া ব্যুত্থিত হন। এরূপ পুরুষবিশেষ 'ব্রহ্মবিদ্-বরীয়ান্' নামে খ্যাত। পূর্বোক্ত অবস্থা আরও গভীর হইলে সেই পুরুষ আর স্ব বা পর কোন প্রযত্নেই ব্যুত্থিত হন না, সদা নির্বিকল্প-সমাধিস্থ হইয়াই থাকেন। ইহাই (৭) **তুর্যগা** নামক সপ্তম ভূমি। এই অবস্থায় পরমেশ্বর প্রেরিত প্রাণবায়ুবশে তাঁহার দেহ স্থিতি হয় এবং অপরের দ্বারা তাঁহার দৈহিক ব্যবহার পরিনিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থাপন্ন পুরুষকে **'ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ'** বলে। এইরূপ পরমভাগ্যবান্ মহাপুরুষ স্বয়ং পরিপূর্ণ পরমানন্দঘন ব্রহ্মস্বরূপেই সদা অবস্থান করেন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান। (গীতা ৩।১৮ মধুঃ টীকা দ্রষ্টব্য)। এই অবস্থায় শরীর বেশীদিন থাকে না। উহা বৃক্ষচ্যুত শুষ্ক পত্রখণ্ডের ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

[বিদ্যার অধিকারী দ্বিবিধ—কৃতোপাস্তি ও অকৃতোপাস্তি। কৃতোপাস্তি অর্থাৎ যাঁহারা উপাস্য সাক্ষাৎকার পর্যন্ত উপাসনাকরত তৎপশ্চাৎ তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় দৃঢ়রূপে পূর্বেই সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানের অনন্তরই অর্থাৎ চতুর্থভূমি-লাভের পরই জীবন্মুক্তির অবস্থা অর্থাৎ পঞ্চম্যাদি ভূমি স্বতই সিদ্ধ হইয়া থাকে। চিত্তসমাধানের আনন্দ অর্থাৎ জীবন্মুক্তি-সুখ তাঁহারা ভোগ করিয়া থাকেন। দৃষ্ট দুঃখ অর্থাৎ বাসনাতাড়িত চিত্তবিক্ষেপজনিত দুঃখ তাঁহাদের অনুভব করিতে হয় না। অকৃতোপাস্তি অর্থাৎ যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে যথেষ্ট উপাসনা করেন নাই এবং ঔৎসুক্যবশতঃ সহসা বিদ্যালাভের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা চিদ্-জড়-বিবেকাভ্যাস দ্বারা তাৎকালিক মনোনাশ-বাসনা-ক্ষয়করত শম-দমাদি অনুষ্ঠান-সহায়ে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে নিরত হন। দৃঢ়াভ্যস্ত শ্রবণাদিদ্বারা, তাঁহাদের ভববন্ধনবিচ্ছেদী তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। তাঁহাদের আর জন্ম হয় না। ভাবিদেহাভাবরূপ বিদেহমুক্তি তাঁহাদের জ্ঞান-সমকালেই হইয়া থাকে। তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞানে কোন শিথিলতা আসে না বা আসিতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় দৃঢ়রূপে পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই বলিয়া পুনঃ প্রবল ভোগপ্রদ প্রারব্ধ কর্মদ্বারা চালিত তাঁহাদের চিত্ত বাসনা-তাড়িত হইয়া দুঃখানুভব করিয়া থাকে (পঞ্চদশী ৬।২৮৪), চিত্তসমাধানের আনন্দ তাঁহারা পান না। যদিও প্রাক্‌সিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য আর তাঁহাদের প্রযত্নাপেক্ষা নাই, কিন্তু মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের জন্য প্রযত্নের প্রয়োজন আছে। শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপযুক্ত সাধনাবলম্বনে বাসনাদি নিঃশেষ হইলে তখন পঞ্চম্যাদিভূমিকারূঢ় হইয়া তিনি চিত্ত-সমাধানের আনন্দ লাভ করেন। ইহাই জীবন্মুক্তির সুখ। দৃষ্ট দুঃখ তাঁহাকে আর অনুভব করিতে হয় না।—বিদ্যারণ্যস্বামীর 'জীবন্মুক্তিবিবেক' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বিদ্যারণ্যস্বামীই প্রধানতঃ এই মতের প্রচারক। (৬৭ শ্লোক দ্রঃ)

গীতা ৬।৩২ মধুঃ টীকা দ্রষ্টব্য। এই বিষয়ে মধুসূদনস্বামী আচার্য বিদ্যারণ্যেরই মতানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য কিন্তু বলিয়াছেন যে, অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানীর কোন কর্তব্যই থাকে না, তিনি জ্ঞান-সমকালেই জীবন্মুক্ত এবং পরমানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে তিনি সদা অবস্থান করেন। ভাষ্যকারের মতের সহিত স্বামী বিদ্যারণ্যের আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ উভয় মতে কোন বিরোধ নাই, কারণ ভাষ্যকার কৃতোপাসন অপরোক্ষ জ্ঞানীর কথা বলিয়াছেন এবং স্বামী বিদ্যারণ্য অকৃতোপাসন অপরোক্ষ জ্ঞানীর জন্যই জীবন্মুক্তি-সুখলাভার্থ মনোনাশাদির কর্তব্যতা বিধান করিয়াছেন।

এইস্থলে রহস্য এই যে, জ্ঞানীর বাহ্য প্রবৃত্তি জীবন্মুক্তির বিরোধী নহে। পরন্তু উহা জীবন্মুক্তির 'বিলক্ষণসুখের' বিরোধী। জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই অবিদ্যাকৃত বন্ধভ্রম নষ্ট হয় ও উহার আর পুনরুদয় হয় না। শরীরধারী ব্যক্তির বন্ধভ্রমের অভাবই জীবন্মুক্তি। প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে জ্ঞানীর আত্মাতে বন্ধভ্রম হয় না। অতএব বাহ্য প্রবৃত্তি হইলেও জীবন্মুক্তি অবস্থা নষ্ট হয় না। কিন্তু বাহ্য প্রবৃত্তিতে জীবন্মুক্তির 'বিলক্ষণসুখ' অনুভূত হয় না। একাগ্রতারূপ অন্তঃকরণের পরিণামদ্বারা সুখ হয়। বাহ্য প্রবৃত্তিতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে বলিয়া সে অবস্থায় সেই বিশেষ নিরুপাধিক সুখ হইতে পারে না। সেইজন্যই জীবন্মুক্তির বিশেষ সুখলাভার্থ মনোনাশাদির অভ্যাস প্রয়োজন।

সকল জ্ঞানীরই জ্ঞান এক এবং জ্ঞানফল মোক্ষ সমান। প্রারব্ধবশতই জ্ঞানিগণের ব্যবহারে ভেদ হইয়া থাকে। ব্যবহার অর্থাৎ বাহ্য প্রবৃত্তির অল্পতা হইলে জীবন্মুক্তি-সুখের আধিক্য এবং ব্যবহারের আধিক্য হইলে জীবন্মুক্তি-সুখের অল্পতা হইয়া থাকে। একটি সাম্প্রদায়িক শ্লোক প্রচলিত আছে ঃ

'কৃষ্ণো ভোগী শুকস্ত্যাগী নৃপৌ জনকরাঘবৌ।
বসিষ্ঠঃ কর্মকর্তা চ ত এতে জ্ঞানিনঃ সমাঃ॥'

—প্রারব্ধই জ্ঞানীর ব্যবহারের নিয়ামক। তথাপি ব্যবহারে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর বৈলক্ষণ্য আছে। জ্ঞানীর 'আমি ব্রহ্ম' জ্ঞান দৃঢ় নিশ্চিত থাকে, অজ্ঞানীর সে জ্ঞান থাকে না। অজ্ঞানীর 'জগৎ সত্য' এই বোধ ও আসক্তি থাকে। কিন্তু জ্ঞানীর তাহা থাকে না। জ্ঞানীর যে প্রারব্ধ অধিক প্রবৃত্তির জনক তাহা মন্দ প্রারব্ধ, কারণ অধিক প্রবৃত্তিতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় ও সেই চিত্তে নিরুপাধিক আনন্দ অর্থাৎ জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ সুখাবির্ভাব হয় না। জ্ঞানীর বাহ্য ব্যবহারও বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান-সহকারেই হইয়া থাকে, ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়া মিথ্যা জানিয়াও লোকে তদ্দর্শনে যেরূপ প্রবৃত্ত হয়—সেইরূপ। জ্ঞানীর ব্যবহারে বিষয়ের বা কর্তৃত্বের সত্যতা সংস্কার জন্মে না, অজ্ঞানীর তাহা জন্মে। ঐ কারণেই জ্ঞানী নানা ব্যবহার করিয়াও সদা মুক্ত ও অজ্ঞানী বদ্ধ।

জ্ঞানীর দেহত্যাগেরও কোন বিশেষ আসন বা দেশকালাদির অপেক্ষা নাই।

দেহঃ পততু বা কাশ্যাং শ্বপচস্য গৃহেঽথবা।
জ্ঞানসম্প্রাপ্তিসময়ে সর্বথা মুক্ত এব সঃ॥

জ্ঞানীর রোগযন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া বা মূর্ছাবস্থায় মৃত্যু হইলেও তাঁহার জ্ঞানের অভাব বা মুক্তির বাধা হয় না। কারণ তৎকালেও তাঁহার 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানটি সুপ্তরূপে অর্থাৎ সংস্কার-রূপে থাকে। এই জন্য তিনি তখনও মুক্ত।]

৩. রস, রুধির, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও রেতঃ—এইগুলিই সর্বদেহসমাশ্রিত সপ্ত ধাতু।

৪. সপ্ত ব্যসন ঃ তনুব্যসন, মনোব্যসন, ধনব্যসন, রাজ্যব্যসন, বিশ্বব্যসন, উৎসাহব্যসন ও সেবকব্যসন। **তনুব্যসন**-বশে জীব শরীর কৃশতা প্রাপ্ত হইলে খিন্ন বোধ করে। **মনোব্যসন**-প্রভাবে জীবের চৌর্যাদি ভীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। **বিশ্বব্যসন** উৎপন্ন হইলে পুরুষ গৃহ-ক্ষেত্রাদি সম্পাদনে যত্নশীল হয়। **উৎসাহব্যসন**যুক্ত পুরুষ পুত্রকলত্রাদি ইচ্ছা করিয়া থাকে। **সেবকব্যসন**-সমাকুল পুরুষ পররাষ্ট্রগমন ও সর্বধর্মপোষণরত হইয়া থাকে। **ধনব্যসন** ও রাজ্য-ব্যসনের অর্থ স্পষ্ট।

মৌনং যোগাসনং যোগস্তিতিক্ষৈকান্তশীলতা।

নিঃস্পৃহত্বং সমত্বং চ ইতি মৌনাদিসপ্তকম্ ॥ ৬০ ॥

মৌন[১], যোগাসন[২], যোগাভ্যাস[৩], তিতিক্ষা[৪], নির্জনবাস[৫], নিঃস্পৃহা[৬] ও সমতা[৭]—এই সাতটিকে মৌনাদি সপ্তক বলা হয়।

১. কাষ্ঠমৌন ও আকারমৌন ভেদে মৌন দ্বিবিধ। কোন ঈঙ্গিত দ্বারাও স্বাভিপ্রায় প্রকাশ না করা **কাষ্ঠমৌন** এবং অবচনমাত্র অর্থাৎ কোন শব্দ উচ্চারণ না করা **আকারমৌন** নামে খ্যাত। (যোগবাশিষ্ঠ নির্বাণ প্রঃ পূর্বার্ধ ৬৮ সর্গে চতুর্বিধ মৌন কথিত হইয়াছে। বলপূর্বক বাক্যনিরোধ **বাক্যমৌন**, ইন্দ্রিয়নিরোধ **অক্ষমৌন**, সর্বচেষ্টা-পরিত্যাগ **কাষ্ঠমৌন** ও জীবন্মুক্ত-লক্ষণ অবস্থাকে **সুষুপ্তমৌন** বলে।)

২. যোগাভ্যাসের উপযুক্ত স্থিরতা ও সুখপূর্বক উপবেশনযোগ্য পদ্মাসন, সিদ্ধাসন প্রভৃতিই **যোগাসন।**

৩. যোগাভ্যাস: চিত্তবৃত্তি-নিরোধের অভ্যাস অথবা পরমাত্মাসহ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবের সংযোগের অভ্যাসকেই **যোগাভ্যাস** বলে। যোগশাস্ত্রে বলা হইয়াছে প্রাণের নিরোধ ব্যতীত মনের নিরোধ হয় না। প্রাণ চঞ্চল হইলে মন চঞ্চল হয় এবং প্রাণের নিরোধে মনের নিরোধ হয়। এইজন্য মনের নিরোধরূপ যে 'রাজযোগ', তাহার জন্য যাহার ইচ্ছা হইবে, তিনি প্রাণনিরোধরূপ 'হঠযোগ' অনুষ্ঠান করিবেন।

৪. তিতিক্ষা: খেদরহিত হইয়া ও অপ্রতিকারপূর্বক শীতোষ্ণাদি যাবতীয় দ্বন্দ্বসহন **তিতিক্ষা** নামে কথিত।

৫. নির্জনবাস: বিষয়ী ও স্ত্রীজনসম্পর্করহিত স্থানে নিবাস।

৬. নিঃস্পৃহা: দোষদর্শনপূর্বক সর্বদৃষ্টাদৃষ্টবস্তুবিষয়ক তৃষ্ণারাহিত্য।

৭. সমতা: বিষমদৃষ্টি হইতে জাত রাগদ্বেষাদিরহিত হইয়া চিত্তের শান্তাবস্থা।

[অষ্টবিধ-সংজ্ঞা]

পুর্যষ্টকং সমাখ্যাতমষ্টৌ প্রকৃতয়স্তথা।

অঙ্গান্যষ্টৌ সমাধেশ্চ তথাষ্টৌ মৈথুনস্য চ ॥

অষ্টমূর্তিমদাঃ খ্যাতাঃ পাশাশ্চাষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥৬১॥

শাস্ত্রে অষ্টপুরী[১] (পুর্যষ্টক) এবং অষ্টবিধা প্রকৃতি[২] কথিত হইয়া থাকে। সমাধির[৩] আটটি অঙ্গ। মৈথুনেরও[৪] অঙ্গ আটটি। মূর্তিমদ[৫] এবং পাশসমূহও[৬] অষ্টবিধ স্বীকার করা হয়।

১. পুর্যষ্টক: (ক) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, (খ) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, (গ) পঞ্চপ্রাণ, (ঘ) পঞ্চভূততন্মাত্রা, (ঙ) মনআদি অন্তঃকরণচতুষ্টয়, (চ) অবিদ্যা (ছ) কাম এবং (জ) কর্ম—এতৎসমষ্টিকেই **পুর্যষ্টক** বলা হয়। পুর্যষ্টক অর্থাৎ জীবের ভোগসম্পাদক আটটি পুরী। ইহা সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গশরীর নামেও বেদান্তে প্রসিদ্ধ।

২. অষ্ট প্রকৃতি: ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটি

(আট ভাগে বিভক্ত) প্রকৃতি। ইহাকে অপরা প্রকৃতি বলে। গীতা ৭।৪-৫ দ্রষ্টব্য। [অষ্ট প্রকৃতি = পঞ্চভূততন্মাত্রা + মন (অর্থাৎ অহংতত্ত্ব) + বুদ্ধি (অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্ব) + অহঙ্কার (অর্থাৎ সর্ববাসনাত্মক অবিদ্যা বা অব্যক্ত)]।

৩. নির্বিকল্প সমাধির আটটি অঙ্গ, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও (সবিকল্প) সমাধি। **যম, নিয়ম** (৪৪নং শ্লোক দ্রষ্টব্য), **আসন** (৬০নং শ্লোক দ্রষ্টব্য), **প্রাণায়াম** (২০নং শ্লোক দ্রষ্টব্য)। স্ব-স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে ফিরাইয়া আনার **নাম প্রত্যাহার।** অদ্বিতীয় বস্তুতে মন ধারণ করাকে **ধারণা** বলে। লক্ষ্যবস্তুতে বিচ্ছিন্নভাবে চিত্তবৃত্তি-প্রবাহ **ধ্যান** নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিপুটি-ভানসহ অবিচ্ছেদে প্রত্যয়াবৃত্তি অঙ্গঘটক (সবিকল্প) সমাধি নামে কথিত হইয়া থাকে। [শ্লোক সংখ্যাগুলি বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকার]।

৪. অষ্টাঙ্গ মৈথুন : দর্শন, স্পর্শন, কেলি, কীর্তন, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানির্বৃত্তি।

'দর্শনং স্পর্শনং কেলিঃ কীর্তনং গুহ্যভাষণম্।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বৃত্তিরেব চ ॥'

এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন সম্পূর্ণরূপে বর্জনই ব্রহ্মচর্য নামে কথিত হইয়া থাকে। কেবল এই অষ্ট অঙ্গের অসমাচরণমাত্রই ব্রহ্মচর্য-শব্দের অর্থ বলিয়া বুঝিলে ভুল হইবে। কারণ তাহাতে ব্রহ্মচর্য-নামের বিশেষ সার্থকতা থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের চর্যারূপে এইগুলি পালন করিলেই ইহার যথার্থ ব্রহ্মচর্য-নাম সার্থক হয়। অতএব মনের দিকই প্রধান, কেবল কতকগুলি শারীরিক নিয়ম-পালনই ব্রহ্মচর্য নহে।

৫. পৃথিবী, সলিল, পাবক, শশী, পবন, আকাশ, রবি ও আত্মা—এই অষ্ট মূর্তিমদ। **পৃথিবীমদ** আবির্ভাবে জীব তমোগুণ-পরিপূর্ণ হইয়া বস্ত্রাদি ইচ্ছাবান্ হইয়া থাকে। **সলিলমদ**-পূরিত জীব 'ইহা আমার আবশ্যক' এরূপ চিন্তাযুক্ত হয়। **পাবকমদ**-পূর্ণ হইলে কামপ্রেরিত হইয়া জীব স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছায় তদনুকূলব্যাপারবান্ হইয়া থাকে। **চন্দ্রমদ**-প্রভাবে চিন্তাযুক্ত পুরুষ 'ক্রিয়মাণ কার্যটি সুসম্পন্ন হইবে কিনা, উহা করা হইলেও কোন বিপরীত ফল প্রসূত হইবে কিনা' ইত্যাদি সংশয়বশতঃ ক্ষণমাত্র তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। **পবনমদ**-ব্যাকুল জীব পরদেশগমনেচ্ছু হইয়া থাকে। **আকাশমদ**যোগে পুরুষ বাহনসংগ্রহাকুল হইয়া গজ-অশ্বাদি লাভেচ্ছু হয়। **সূর্যমদা**কুল হইলে জীব ক্রোধাগ্নি পরিপূর্ণ হইয়া 'ইহা বিনাশ করা কর্তব্য'—এইরূপ ইচ্ছাবান্ হয়। **আত্মমদা**ন্বিত জীব অহঙ্কারপ্রেরিত হইয়া 'বিদ্যাদি সহায়ে আমার তুল্য আর কে ?'—এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে।

৬. অষ্ট পাশ : ঘৃণা (দয়া), শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা (নিন্দা), কুল, শীল এবং বিত্ত।

ধনিনী স্থিতিনী চৈব কৃতিনী বর্তিনী তথা।
ক্রোধিনী মোহিনী চাতিচারিণী বাহিনী তথা ॥
অন্তরঙ্গমদাশ্চাষ্টাবেতে সুপরিকীর্তিতা ॥৬২॥

ধনিনী[১], স্থিতিনী[২], কৃতিনী[৩], বর্তিনী[৪], ক্রোধিনী[৫], মোহিনী[৬], অতিচারিণী[৭] ও বাহিনী[৮]—এই আটটি অন্তরঙ্গ মদ সুপ্রসিদ্ধ। ৬২

১-৮. পুরুষের অষ্টবিধ অন্তরঙ্গ মদঃ ধনিনী (ধনবান্), স্থিতিনী (একস্থানে অবস্থানকারী), কৃতিনী (পণ্ডিত), বর্তিনী (চক্রবর্তী রাজা), ক্রোধিনী, মোহিনী (মায়াবান্), অতিচারিণী (অত্যন্ত বিচরণকারী) এবং বাহিনী (হস্তি-আদি বাহনবান্)। একই পুরুষের এককালে বহু মদ থাকিতে পারে।

অণিমা মহিমা চৈব গরিমা লঘিমা তথা।
প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং চাষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥৬৩॥

অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব এবং বশিত্ব—এই আটটি সিদ্ধি অর্থাৎ যোগবিভূতি[১] নামে প্রসিদ্ধ।

১. অষ্ট যোগবিভূতি বা সিদ্ধিঃ

স্বেচ্ছায় সূক্ষ্ম আকার ধারণ—**অণিমা,** স্বীয় শরীরকে স্থূলতর করিবার ক্ষমতা—**মহিমা,** ইচ্ছামত ভারী হইবার ক্ষমতা—**গরিমা,** ইচ্ছামত লঘু বা হাল্কা হইবার ক্ষমতা—**লঘিমা,** সর্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা—**প্রাপ্তি,** স্বচ্ছন্দানুবর্তিতা অর্থাৎ ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা—**প্রাকাম্য,** স্বামিত্বরূপ ঐশ্বর্য—**ঈশিত্ব** এবং সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা—বশিত্ব নামে প্রসিদ্ধ।

এই আটটিকেই অষ্ট সিদ্ধি বা অষ্ট যোগবিভূতি বা অষ্ট যোগৈশ্বর্য বলা হইয়া থাকে। ঈশিত্বরূপ ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বরে বিদ্যমান বলিয়াই স্থাবর জঙ্গম সর্বভূত ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ।

পূর্বোক্ত সর্ববিভূতিসম্পন্ন সিদ্ধযোগীরও 'জগৎ মিথ্যা' ও 'আমি ব্রহ্ম' এই জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না। সিদ্ধযোগীরও বেদান্তের শ্রবণ ও মননাদি আবশ্যক। এই সকল বিভূতি ব্রহ্মজ্ঞানের ফল নহে। যদি কোন তত্ত্বজ্ঞানীর এই সকল সিদ্ধি আছে দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তিনি পৃথক্ ভাবে যোগাভ্যাসদ্বারা উহা অর্জন করিয়াছেন। মুমুক্ষু ও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এইগুলি একান্ত তুচ্ছ ও হেয়।　　(অষ্টবিধ সংজ্ঞা সমাপ্ত)

দরিদ্র-নারায়ণ

শ্রীকালীপদ সর্খেল

রুক্ষ কেশে দীন বেশে
পথপার্শ্বে আছ বসে—
　　শীর্ণকায় জীর্ণ চিরধারী,
অনশনে ক্লিষ্ট হিয়া
ছিন্ন বাস অঙ্গে দিয়া
　　একি রূপ ধরেছ শ্রীহরি !

সকরুণ চক্ষে চাহি
ডাকিতেছ রহি রহি
　　—'দাও দাও দাও, কিছু দাও',
হোক যত তুচ্ছ দান
নাহি ক্ষোভ অভিমান
　　মহানন্দে হাত পেতে নাও।

পথিক চলিয়া যায়—
কেহ বা ফিরিয়া চায়
　　শ্রদ্ধাভরে দিয়ে যায় কিছু,
কেহ ফিরে নাহি চায়
নিজ কর্মে চলে যায়,
　　হাত পেতে তুমি ডাকো পিছু।

যে তোমারে দান ক'রে
দাতা বলি গর্ব করে
　　অহঙ্কারী সেই মূর্খজন,
যে তোমারে ভক্তি ক'রে
কিছু দেয় শ্রদ্ধাভরে
　　ধর্মমতি সেই মহাজন !

সম্মুখে রয়েছ তুমি
হেথা সেথা খুঁজি আমি—
　　ব্যর্থ শ্রম পাষাণ পূজিয়া,
এতদিনে হ'ল জ্ঞান
ভকতের ভগবান্—
　　আজি দেব পেয়েছি খুঁজিয়া।

মন্দির ছাড়িয়া এসে
তরুতলে আছ বসে—
　　সে তত্ত্ব জানে বা কত জন,
জীবন্ত দেবতা তুমি
তোমার চরণে নমি—
　　হে দেব দরিদ্র-নারায়ণ।

'শ্রীম'-সমীপে

ভক্ত রমেশচন্দ্র সরকার

স্কুলবাড়িঃ ২রা ফেব্রুআরি, ১৯১৯ (১৯শে মাঘ, ১৩২৫) রবিবার বৈকাল ৫॥টা। আমি ও বন্ধু বনবিহারী দোতলায় উঠিয়া 'শ্রীম'-র শোবার ঘরের সম্মুখে গিয়া বাহির হইতে শিকল নাড়িলাম। শ্রীম ভিতর হইতে বলিলেন 'কে?' উত্তর—'আজ্ঞে আমরা।' আবার উভয়ে নীরব। আবার আওয়াজ করিলাম। আবার উত্তর —'কে?' আবার প্রত্যুত্তর—'আজ্ঞে আমরা।' তারপর ভিতর হইতে এক ব্যক্তি ছিটকিনি খুলিয়া দিলে আমরা ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিলাম, শ্রীম মশারির আড়ালে দাঁড়াইয়া। ঐ অবস্থায় আমাদের মুখ না দেখিয়াই বলিলেন, 'কে আপনারা? বসুন, ওখানে বসুন।' কথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াইল। কি প্রীতি-মাধুর্যভরা কথা! তাঁর নির্দেশমত খাটের পশ্চিমে পাতা মাদুরে বসিয়া তাঁর চোখে চোখ পড়িবামাত্র মনে হইল, যেন স্নেহমাখা কত পরিচিত আত্মীয়ের মুখ! বেশ হাসিখুশি ভাব—ভাল লাগিল। এইবার খাটের উপর নিজ শয্যায় আসিয়া বসিলেন। তাকিয়ায় হেলান দিয়া মাথার নীচে হাতদুটি আঙুলের ভিতর আঙুল দিয়া রাখিয়া চিত হইয়া প্রায় অর্ধশায়িত হইলেন ও মধ্যে মধ্যে গুনগুনস্বরে গভীর-ভাবদ্যোতক গান গাহিতে লাগিলেন।

শ্রীম পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কর?'

আমি। পড়া ছেড়ে দিতে চাই।

শ্রীম। কেন?

আমি। নানা অসুবিধা, অশান্তি।

শ্রীম। অশান্তি হবে না? শরীর ধারণ করলেই অশান্তি।

আমি। আপনার আশীর্বাদ চাই।

শ্রীম। তাঁর নিকট প্রাণভরে প্রার্থনা কর, তিনি শুনবেন

পরে তাঁর দক্ষিণে যে টেবিলটি ছিল, তাহার উপর হইতে এক পুঁটলি তাল-মিছরি হাতে লইয়া খুলিতে খুলিতে বলিলেন, 'তুমি তালের মিছরি খেয়েছ?' খেয়েছি বলা সত্ত্বেও একখণ্ড মিছরি তিনি আমায় দিলেন। আমি প্রসাদ-জ্ঞানে সাদরে উহা গ্রহণ করিলাম। উপস্থিত সকলকেই কিছু কিছু দিলেন। আবার দুই টুকরা আমায় দিয়া বলিলেন, 'এটির রং লাল, খাও।' পুঁটলিটি যথাস্থানে রাখিয়া সর্বশেষে নিজে দুই-এক টুকরা গ্রহণ করিলেন।

পূর্বদিন শ্রীম প্রাতে ট্রামে করিয়া বাগবাজারে গিয়াছিলেন, আজ ঐ প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন।

শ্রীম। কাল হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ট্রামে চেপে পড়লাম। বাগবাজারে গেলাম। বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম—একটা বাড়িতে দিনের বেলায় থাকব আর গঙ্গা দর্শন ক'রব, রাত্রিতে তালাচাবি দিয়ে রাখব; কিন্তু বাড়িটি বড় damp (স্যাঁৎসেঁতে) দেখলাম।

ল-বাবু। তবে তো খুব সাহসের কাজ করেছেন। আবার সুস্থ হ'তে দুই সপ্তাহ। এখন খুব rest (বিশ্রাম) দরকার।

শ্রীম। হ্যাঁ, ঠিক। বেশ শিক্ষা হ'ল। এমন কর্ম আর হবে না।

শ্রীম (বিছানায় শুইয়াই) বলিতেছেন, কেন suffering (দুঃখকষ্ট)? জগৎটা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হবে ব'লে। আবার মনের মধ্যে

কাম ক্রোধ প্রভৃতি suffering (যন্ত্রণা) দিয়েছেন, মহাপুরুষ তৈরী হবে ব'লে। যে তরঙ্গাদি কেটে ওঠে, সে পাকা মাঝি। তরঙ্গ হয়েছে মাঝি তৈরী হবার জন্য। দু-একজন মাঝির ঢেউ-তুফানে আনন্দ হয়। তার মনে হয়, 'দেখ, আমি কি ক'রে তরঙ্গ ভেঙে উঠি।' যারা দুর্বল, তারা নৌকার ভিতর থেকে চেঁচামেচি করতে থাকে। Stormy Petrel ব'লে এক-রকম পাখি আছে। যখন সমুদ্রে ঝড় ওঠে, তখন সমুদ্রতীরের জীবজন্তু ভয়ে বনে-জঙ্গলে লুকোয়, তখন ঐ পাখি পাহাড় থেকে বেরোয়, (শ্রীম দু-হাত বিস্তার করিয়া দেখাইতেছেন) আর আনন্দে পক্ষ বিস্তার ক'রে আকাশে ঝড়ের ভিতর ওড়ে। সেইরূপ ঝড়-বাতাস কেটে আমাদেরও উঠতে হবে সাহস চাই, পুরুষকার চাই।

'উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ,
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।'

পুরুষকার তো সেই অনন্ত শক্তিরই এক কণা। কমতি হ'লে Head Office-এ apply কর। (এই বলিয়া হাত জোড় করিয়া প্রার্থনার ভাবটি দেখাইলেন, মাঝির কথায় আবার বলিলেন) আমি একবার বেলুড়ে গিয়েছি, তখন মা-ঠাকুরানী (শ্রীশ্রীমা) ওখানে থাকেন। ফিরতে রাত হ'ল। গঙ্গা পার হবার জন্য মাঝির বাড়ি গেলাম; যে মাঝি আমাকে একবার ঝড়-তুফানের মাঝে পার ক'রে দিয়েছিল, তাকে পেলাম না। অন্য একজন ব'লল, 'আমি পার ক'রে দেবো।' তাকে তত বিশ্বাস হ'ল না। সেদিন ফিরে গেলাম।... তিনি সাপ হয়ে কামড়াচ্ছেন, আবার ওঝা হয়ে ঝাড়ছেন। মায়া দিচ্ছেন, আবার গুরুরূপে চৈতন্য করছেন। তাঁর লীলা বোঝা যায় না।

অবশেষে অন্য কথা উঠিল।

শ্রীম। ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে বিবেকানন্দ-সোসাইটির lecture (ভাষণ) হবে। সেখানে যাও, একটু শোনগে। আর প্রসাদ-বিতরণ হবে। প্রসাদ চেয়ে নিও।

তখন আমরা 'শ্রীম'র নিকট বিদায় লইয়া ইনস্টিটিউটে গিয়া বক্তৃতা শুনিলাম।

৩রা ফেব্রুআরি, শ্রীম-র স্কুল বাড়ি, বেলা ৪টা, দোতলায় উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিলাম। দরজা খুলিল না। দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময় সোয়েটার লইয়া এক ভদ্রলোক আসিলেন ও দ্বারের শিকল নাড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলিল। ঐ ভদ্রলোক ভিতরে গেলেন, আমাকে বাহিরে উত্তরের বারান্দায় বসিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার দরজা খুলিলে তিনি বিদায় লইলেন। আমি ভিতরে গেলাম। শ্রীম শতরঞ্চির উপর বসিতে বলিলেন এবং একখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি পড়িতে দিয়া মুখ ধুইতে গেলেন। উহা পড়িতে লাগিলাম, এমন সময় বনবিহারী আসিল।

শ্রীম। গতকাল সভায় গিয়েছিলে?

আমি। হ্যাঁ,

শ্রীম। কলিকাতায় এলে এ-সব সভায় যেতে হয়, দেখতে শুনতে হয়।

শ্রীম বনবিহারীকে গান করিতে বলিয়া আগে নিজে গুনগুন করিয়া একটি ভজন গাহিলেন, 'দীনশরণ তুমি' ইত্যাদি। বনবিহারী গাহিল : 'রামকৃষ্ণ-চরণসরোজে
মজ রে মন-মধুপ মোর।'

শ্রীম। (গান শুনিয়া) বেশ, বেশ! ভজনের দ্বারা ভগবানে মন যায়। যোগীরা সর্বদা তাঁর দিকে মন দিয়ে থাকেন। তাঁর প্রতি ভালবাসা, তাঁর প্রেমের এক কণা হ'লে কত আনন্দ! যোগীরা তাই অন্যদিকে মন দিতে

পারেন না। তাঁর দিকে মন দাও, তাঁকে ভালবাসবার চেষ্টা কর; সংসারের লোকদের দিকে মন দিলে, এদের ভালবাসলে কি হবে? এ-সব মরে যাবে। এর বিয়োগ আছে, দুঃখ আছে।

আমি। তা (ভগবানে মন) হয় কই?

শ্রীম কথার উত্তর দিলেন না। আবার বলিতে লাগিলেন।

শ্রীম। আমার এক বন্ধু তের বছর নর্মদার তীরে ঘর বেঁধে রামনাম করছেন—ভগবানে ভালবাসা হবে বলে, তাঁকে লাভ হবে বলে।

এই বলিয়া গাহিতে লাগিলেন:

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিতপাবন সীতারাম।
রাম রাম জয় রাজা রাম
রাম রাম জয় সীতারাম॥

সন্ধ্যার সময় বুড়ো দারোয়ানটি হারিকেন পরিষ্কার করিয়া আলো জ্বালিতে গেলে বলিলেন, 'এখন না, দেরি আছে।'

এমন সময় এক ব্রহ্মচারী আসিলেন। এঁকে আমাদের ওদিকে গত বৎসর চাঁদা আদায় করিতে দেখিয়াছিলাম। আমি শতরঞ্চির উপর পুঁথিখানি রাখিয়া জানালা বন্ধ করিতে গেলে শ্রীম দেখিয়া বলিলেন, 'পায়ের জায়গায় এই সব বই রাখতে নেই। এ-সব ভক্তির অঙ্গ।'

তারপর গঙ্গাজলের শিশি হইতে জল লইয়া নিজে মাথায় দিলেন ও সকলকে দিলেন। এখন ভালরূপ সন্ধ্যা হইয়াছে কিনা দেখিলেন—হাতের লোম দেখা যায় কিনা, বলিলেন, 'এবার আলো জ্বালো।'

ব্রহ্মচারীজী আজ ঠন্‌ঠনের কালীবাড়িতে (সিদ্ধেশ্বরী মাতাজীর) প্রসাদ পাইয়াছেন। ঐ দেবস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়াছিলেন।

শ্রীম। (ব্রহ্মচারীকে) তুমি যে দেবালয়ে আজ প্রসাদ পেলে, প্রাত্যহিক ধ্যানের সময় ঐ স্থানের কথা ভাববে ও মনে মনে প্রণাম করবে। তাতে ঠাকুরেরও ধ্যান হয়ে যাবে। তিনি একবার যেখানে গেছেন, তা তীর্থ হয়ে গেছে, তীর্থ মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে! তিনি যে অবতার—অখিল-ব্রহ্মাণ্ডপতি।

এইবার তিনি কাপড়ে হাত ঢাকিয়া জপ করিতে লাগিলেন। ইষ্টনাম জপিতে জপিতে একেবারে ভাবে বিভোর হইলেন। তারপর কত ঠাকুর-দেবতার নাম করিয়া জয়ধ্বনি দিলেন—কত তীর্থের, কত শাস্ত্রের। সেই বজ্রদৃঢ় ও প্রেম-কোমল ভাবময় নামসংকীর্তন-শ্রবণে মনে হইল, মঙ্গল ও সত্যের রক্ষার জন্য এইসব অবতার-পার্ষদদের জন্ম, জগতের কল্যাণার্থে এঁরা জীবন সমর্পণ করছেন। বিদায় লইবার সময় পদধূলি লইতে দিলেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কাল কি আবার দেখা হবে?

শ্রীম। কেন হবে না? তুমি যেন কোথায় থাক?

আমি। বেলেঘাটায়।

শ্রীম। অনেক দূর।

গঙ্গাতীরে বাস করিবার শ্রীম-র খুব আগ্রহ দেখিলাম। গঙ্গাদর্শনের সুবিধার জন্য বাগবাজারে গঙ্গার ধারে একটি ঘর ভাড়ারও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইতে তাঁর মুখে গঙ্গার মাহাত্ম্য-শ্রবণে আমার গঙ্গাস্নানের সাময়িক ঝোঁক যেন স্থায়ী গঙ্গাভক্তিতে পরিণত হইতেছিল। বাস্তবিক গঙ্গাতীরেই ভারতের যত ধর্মকেন্দ্র অবস্থিত। কত মহাপুরুষ ঐ স্থানে তপস্যা করিয়াছেন। সাধুরা বছর ধরে সমগ্র গঙ্গা পরিক্রমা করেন।

৪ঠা ফেব্রুআরি বেলা প্রায় ৪টার সময়

স্কুলবাড়ির নীচে গিয়া দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শ্রীম কোথায় এখন?' সে বলিল, 'উপরে আছেন, যান।' উপরে গিয়া ব্রহ্মচারীকে এক কামরায় বসিয়া কেশব সেনের জীবনচরিত পড়িতে দেখিলাম। আমিও একটু পড়িলাম।

শ্রীম-র ঘরে তখন স্কুলের সুপার-ইন্‌টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি চলিয়া গেলে আমি শ্রীম-কে প্রণামান্তে শতরঞ্চির উপর তাঁহার সম্মুখে বসিলাম। শ্রীম আমাকে একখানি 'উদ্বোধন' পত্রিকা পড়িতে দিলেন। উহাতে 'স্বামী প্রেমানন্দের পত্র'টি পড়িতেছিলাম। এমন সময় শ্রীম সামনে আসিয়া বসিলেন এবং আমাকে আনন্দ দিবার জন্য রহস্যের কথা সব বলিতে লাগিলেন।

শ্রীম। (সহাস্যে) একজন পূর্ববঙ্গের লোক ঘিয়ে ভাজা লুচিকে 'রুটি' বলেন। 'বর বিবাহ করিতে যায়'—না বলিয়া বলেন, 'কন্যা বিবাহ করিতে যায়।'

আমি গতকল্যের 'Stormy Petrel' পাখির কথা তুলিলাম। বলিলাম, এই পাখির কথা মনে পড়িলে আমার সাহস হয়।

শ্রীম। ও-কথাটি আপনার বুঝি ভাল লেগেছে? (ব্রহ্মচারীকেও হাত নাড়িয়া) Stormy Petrel-এর মতো আনন্দ করা চাই দুঃখের মধ্যেও। ঝড়-তুফানে কামক্রোধ ও দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও সাহসী থাকা চাই। Every one is a pilot in a calm sea, যে হাল ঠিক রাখে, সেই প্রকৃত মাঝি। অর্থাৎ কামক্রোধ এলে ভাবতে হবে, শরীরধারণ করলেই ও-সব আছে।

আমি। আপনাদের ও-সব নাই।

শ্রীম। ও-সব বাহাদুরি দেখিয়ে কি হবে—শরীর যখন হয়েছে। আমায় সেদিন কাঁকড়া-বিছে কামড়ালে, যন্ত্রণায় আমি কাঁপতে লাগলাম। তারপর ঠাকুরের সেই গলার Cancer-এর কথা মনে প'ড়ল। মনে হ'ল, তাঁকে কত কষ্ট সহ্য করতে দেখেছি। আর এই সামান্য বেদনায় আমি অমন করছি। লজ্জা হ'ল। শেষে আর ওরূপ করলুম না।

আমি। ঠাকুর তো কখনও দুঃখ করেননি।

শ্রীম। তিনিও করেছেন। কত কেঁদেছেন! লাগলে কাঁদবেন না?

পরদিন ব্রহ্মচারী কোথায় ভিক্ষা করিবেন, সেই-সব কথার পর 'শ্রীম' ঔষধ খাইলেন। স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বালাইয়া জল গরম করা হইল। ঔষধ খাওয়ার পর শ্রীম ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন।

শ্রীম। দেখ, পদ্ম পঙ্ক ভেদ ক'রে জলের উপর কেমন উঠে থাকে, কি সুন্দর দেখায়! সে কেবল পদ্মই, অন্য কোন ফুল নয়। মহাপুরুষ কাম, ক্রোধ, লোভ, পাপতাপের মধ্যে থেকেও ফুটে ওঠেন।

বনবিহারী আসিয়া উপবেশন করিল। তাকেও ঐ কথা বলিয়া সাহস দিলেন। এই সময় শ্রীম কাশিতে লাগিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার যে খুব কাশি হয়েছে, দেখছি।'

শ্রীম। হবে না? এখন বয়স হয়েছে। রোগ হবে, সময় হ'লে মৃত্যু হবে। এতে আশ্চর্য কি? বৃদ্ধ হ'লে বুঝি ভাববো—একি হ'ল? কাঁচা ফল ঝড়েও প'ড়ল না, যখন পেকেছে, তখন বাতাস না, কিছু না, অমনি টুপ ক'রে পড়ে গেল। যৌবন এলে কাম-ক্রোধ দেখে হতাশ হয়ে পড়লাম, ভাবলাম—আমার কি হবে? আমার আর ধর্মকর্ম করা হ'ল না। না, তা ভাববে কেন? ভাববে—ঢেউ কাটিয়ে উঠতে হবে, তবে তো? অনেকে মনে করে—আমার কাম-ক্রোধ আসছে, আমি মহাপাপী, আমার কি হবে? ওতে দোষ নেই। রক্তের ভিতর ও-সব থাকে, সময় হ'লে ও-সব আসে। যৌবনে ও-সব

এলে Stormy Petrel-এর মতো যুদ্ধ করতে হবে। এই জন্যই তো ব্রহ্মচর্য-শিক্ষা ; prepared (প্রস্তুত) হয়ে থাকতে হয়। সংসারে নানা প্রতিবন্ধক, তাই প্রস্তুত থাকতে হয়। তিনি ও-সব প্রতিবন্ধক যেমন করেছেন, আবার গুরুরূপে উদ্ধারও করেন, উপায় ব'লে দেন। সাপ হয়ে কামড়ান, আবার ওঝা হয়ে ঝাড়েন। সাধুসঙ্গ হবে ব'লে আবার মহাপুরুষ সৃষ্টি করেছেন। নানা তীর্থও ঐ জন্য।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে কেমন জিজ্ঞাসা করলেন ? 'স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, কিমাসীত, ব্রজেত কিম্ ?' তাঁদের চলন, বলন, হাসি—সবই সুন্দর ! 'কথামৃতে' পড়নি—ঠাকুর কেমন হাসছেন, ঈশ্বরকে নিয়ে সব, স্টীমারে যাবার সময় কত উচ্চ তত্ত্বকথা, আবার হাসি আনন্দ ! এদেশে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন, ঈশ্বর দর্শন করেছেন। কত তীর্থ গঙ্গাতীরে, হিমালয়ে। এমন দেশে জন্মগ্রহণে জীবন ধন্য হয়। দেখ না, পাশ্চাত্যে ওরা যুদ্ধ ক'রে, মারামারি কাটাকাটি ক'রে দেখলে সব ফাঁকি। এদেশের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের আবার bread-question (খাদ্যসমস্যা) উঠেছে। এখন ওরা বলছে, 'হ্যাঁ, ঈশ্বরই সার।' ওরা এখন ঠাকুরের ভাব পেতে পারে।

আমি। কালে জগৎ এ ভাব পাবে।

শ্রীম। পাবে না ? ভগবানের ভাব সকলেই পাবে। ঠাকুর কি এতটুকু গা ! ঠাকুর ভগবান্। তিনি সবাইকে সমান দেখেন। কেবল বাঙালী জাতিকে নয়, ফিজি-দ্বীপের লোককেও তিনি ভালবাসেন। তবে আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি আমাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছেন।

আমি। আজকালকার অভিভাবকরা ধর্মে কর্মে বাধা দেন।

শ্রীম। তাঁদের দোষ নেই। তাঁরা ভয় পান, পাছে ছেলে মূর্খ হয়ে যায়। স্বামীজী প্রায় ৬ বৎসর ঠাকুরের কাছে আনাগোনা করলেন, কিন্তু পড়াশুনা ছাড়েননি। ঠাকুরও পড়াশুনা ছাড়তে বলেননি।

আমি। স্বামীজীর সঙ্গে কি তুলনা হয় ?

শ্রীম। তবে আর কি, পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া যাক। বৈরাগ্য হয়েছে ! বৈরাগ্য কিনা —বৈ-এর উপর 'রাগ' হয়েছে। লেখাপড়া করতে হ'লে কষ্ট ক'রে যে পরীক্ষা দিতে হয়। এরূপ কাঁচা বৈরাগ্য ভাল নয়।

কাম-ক্রোধ জয় করবার জন্য higher man (মনোবল) চাই, পাকা মাঝি। ঠাকুর হচ্ছেন পাকা মাঝি। আমাদের তাই ভয় নেই। একজন জিজ্ঞাসা ক'রল, উপায় কি ? ঠাকুর বলেছিলেন, উপায়—'গুরুবাক্যে বিশ্বাস'। দশ হাজার বৎসর পূর্বেও ঋষিদের কাম-ক্রোধ হ'ত। সারাদিন তাঁরা জপতপ করলেন, সন্ধ্যায় কোন দিন কাম-ক্রোধ এল ; তখন তাঁরা কাতর হয়ে ভগবানকে প্রার্থনা জানালেন, কাঁদলেন। আন্তরিক প্রার্থনা ও ক্রন্দন চাই, তবে তো মন বশে আসবে !

স্বাগত-ভাষণ

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

[স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে আহূত ২২শে হইতে ২৪শে নভেম্বর, ১৯৬৩, তিনদিবসব্যাপী সর্বভারতীয় সাধু-সম্মেলনে শতবার্ষিকীর সাধারণ সম্পাদকের হিন্দী স্বাগত-ভাষণের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক: শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত]

শ্রদ্ধেয় সাধু-সন্তবৃন্দ,

পুণ্যশ্লোক স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মশতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার সুযোগ পাইয়া আমি অনির্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছি। এক মহান্ পুরুষের স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিবার জন্য মাতৃভূমি ভারতের সনাতন ধর্মের পতাকাতলে আমরা সমবেত হইয়াছি। প্রাচ্যের মুনি-ঋষিগণ এবং পাশ্চাত্যের মনীষিবৃন্দ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সনাতন ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম। সনাতন ধর্ম এত প্রাচীন যে, সেই সুদূর অতীতের গভীর অন্ধকার ভেদ করিতে ঐতিহ্য সাহস পায় না, ইতিহাসও কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে পারে নাই। সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব স্বয়ং প্রকৃতির—শুধু তাহাই নয়, স্বয়ং ব্রহ্মের সমকালীন; এজন্য সনাতন ধর্ম যাহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, সেই বেদের তারিখ-নির্ধারণ মানববুদ্ধির অগম্য।

অবশ্য বৈদিক ধর্মতত্ত্ব কৃষ্টি ও সভ্যতার তারিখ-নির্ধারণের নিরলস প্রচেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু অনুসন্ধানের কোন সূত্র পাওয়া যায় নাই। লোকমান্য তিলক তাঁহার 'বেদের আবাস-ভূমি উত্তরমেরু' (Arctic Home of the Vedas) নামক গ্রন্থে বৈদিক সভ্যতার তারিখ খ্রীষ্টের জন্মের আট হাজার বৎসর পূর্বে নির্ধারিত করিয়াছেন। আর প্রত্নতাত্ত্বিক ও ভূতাত্ত্বিক গবেষণার শেষ সিদ্ধান্ত অনুসারে ইহার তারিখ নির্দিষ্ট হইয়াছে আরও কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে।

যদিও আমরা সনাতনধর্মিগণ উপর্যুক্ত মত অনুসারে ভারতীয় ধর্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বহুল পরিমাণে নিশ্চয়, তথাপি আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা অধিকতর দৃঢ়বিশ্বাসী যে, সনাতন ধর্ম অনাদি ও অনন্ত।

আমাদের ধর্মের ইতিহাসে আমরা একটি যুগান্তরকারী ঘটনা লক্ষ্য করি: বিভিন্ন যুগে ধর্মের উত্থান ও পতন, এবং ধর্মের গ্লানিহেতু আধ্যাত্মিক নবজাগরণ। এই নবজাগরণের ফলে বিভিন্ন যুগে পবিত্র ভারতভূমিতে নরদেহ ধারণ করিয়া ভগবান্ অবতীর্ণ হন—সাধু-ভক্তদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদের বিনাশ ও ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য। দুই-একবার নয়, পুনঃ পুনঃ—যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হইয়াছে, তখনই এক প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তির—স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে। এইরূপে আমরা পাইয়াছি শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে। বেশী দিনের কথা নয়—একশত উনত্রিশ বৎসর পূর্বে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছি। যে পাশ্চাত্য জড়বাদসর্বস্ব সভ্যতা ও ভাবধারা পবিত্র ভারতভূমিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল, জাতির সেই মহাদুর্দিনে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইলেন 'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায়'। পাশ্চাত্য জড়বাদের বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করিয়া ভারতের নিজস্ব অধ্যাত্মবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিবেকানন্দের মতো একজন উপযুক্ত শক্তিধর মহাপুরুষকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান ছিল সুগভীর—তিনি যে শুধু প্রাচ্যদেশীয় শাস্ত্রাদিতেই সম্যক্ পারদর্শী ছিলেন, তাহা নয়; পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। যে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা কার্যে রূপদান করিবার প্রকৃষ্ট যন্ত্র ছিলেন বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার যুগের এক অতি বিস্ময়কর পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মহৎ জীবনের বিচিত্র কাহিনীগুলি বর্ণনা করা প্রায় অসম্ভব, কারণ যদিও তিনি স্থূল শরীরে মাত্র উনচল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন, তাঁহার জীবন ছিল অনন্ত—এ-কথা বলা যাইতে পারে। সুতরাং লেখনী কিংবা বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকাশ করা—অনন্তকে সান্তভাবে ব্যক্ত করার শুধু প্রচেষ্টা মাত্র। এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ অনির্বাচ্য ও অবর্ণনীয়। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, যখনই কেহ মহান্ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ করে, তখনই তাহার মনে দুইটি প্রশ্ন উদিত হয়: বিবেকানন্দ কে ছিলেন? তিনি কী ছিলেন? যথাসাধ্য বর্ণনা ও আলোচনা দ্বারা এই দুইটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর কখনও দেওয়া যায় না। কিন্তু শুধু দুইটি বিপরীত প্রশ্নের দ্বারাই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে: তিনি কে না ছিলেন? তিনি কী না ছিলেন?

প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ভগবদ্দত্ত ক্ষমতাবলে একাধারে কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, ঐতিহাসিক, মনীষী, ঋষি, শক্তিধর লেখক ও প্রাণস্পর্শী বাগ্মী ছিলেন। নিরলস কর্মযোগী, মহান্ সাধক এবং প্রশান্ত সিদ্ধপুরুষও ছিলেন তিনি। প্রকৃত বিবেকানন্দের বর্ণনায় ভাষা স্তব্ধ হয়।

এই মহাপুরুষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বে আমরা দেখিতে পাই—বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের মস্তিষ্ক, শ্রীচৈতন্যের প্রেম, গুরু নানকের আধ্যাত্মিক শৌর্য, খ্রীষ্টের কমনীয়তা ও সন্ত পলের শিষ্যোচিত বাগ্‌বিভূতির উপযুক্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাবেশ!

দেশ, জাতি ও সমগ্র বিশ্বে বিবেকানন্দের অবদান অপরিমেয়। তিনিই সনাতন ধর্মের কালপ্রভাবে শুষ্ক ও নির্জীব দেহে নূতন শক্তি—নব জীবন সঞ্চার করিয়াছেন; তিনিই বিশ্বের মানচিত্রে ভারতকে যথার্থ স্থান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছেন; এবং তিনিই আদর্শভ্রষ্ট জগদ্-বাসিগণের নিকট সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগকে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য—আত্ম-জ্ঞানলাভের দিকে অবহিত হইতে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

বেদ ঘোষণা করিয়াছেন: সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই ব্রহ্মের প্রকাশ। পরিদৃশ্যমান জগতের নানাত্ব ও ভেদ নিরসনের জন্য বেদ বলিতেছেন: একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি—সত্য এক, কিন্তু ঋষিগণ ইহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। বেদ আরও বলিতেছেন: একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি—সত্তা এক, কিন্তু বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক বিভিন্নরূপে কল্পিত হইয়াছে। বেদ আবার বলিতেছেন: একং জ্যোতির্বহুধা বিভাতি—জ্যোতিঃ এক, কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়।

সুতরাং আমরা সত্তার একত্বে, ঈশ্বরের একত্বে এবং মানবজাতির একত্বে বিশ্বাসী। এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব

রহিয়াছে। একত্বই একমাত্র সত্য, আর বহুত্ব বা নানাত্ব কল্পনা-বিলাস। বিবেকানন্দ-জীবনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সত্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধেয় স্বামিপাদগণ, এরূপ একজন অত্যদ্ভুত ধর্মবীর যতিরাজের উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবার নিমিত্ত আমরা আজ এখানে সমবেত হইয়াছি। অস্মদ্দেশীয় সাধু-সন্ত ও পাশ্চাত্য মনীষীদের উপর তাঁহার আশীর্বাদ বর্ষিত হউক; এই জগতের ধর্মপিপাসু কোটি কোটি নরনারীর নিকট তাঁহার দিব্য জীবন আলোক-বর্তিকাস্বরূপ হউক এবং পৃথিবীকে সমূহ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করুক।

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিরন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি-
রাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ।
বিশ্বে দেবাঃ শান্তিঃ ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি॥

—স্বর্গে আকাশে ও পৃথিবীতে শান্তি হউক। জলে ওষধিতে ও বনস্পতিতে শান্তি হউক। দেবতা, ব্রহ্ম ও সর্বলোকে শান্তি বিরাজ করুক। সেই শান্তি আমাতেও বিরাজ করুক। ওঁ শান্তিঃ।

প্রণিপাত লহ

শ্রীমতী প্রভা দেবী

দিকে দিকে ধ্বনিতেছে
কার আশীর্বাদ?
আনন্দের অমৃতের
জ্যোতির দুয়ার
খুলিয়া কে দাঁড়ায়েছে
বিশ্বের হৃদয়
আশ্বাসের আনন্দের
আলোক-সভায়?
কোথা সে সপ্তর্ষিলোক
উর্ধ্বপানে চাহি
ধ্যানমগ্ন নরনারায়ণ!
তব জয়গান গাহি

কোটি কোটি রবির আলোকে
উদ্ভাসিয়া ওঠে ওই প্রদীপ্ত ভাস্কর
মূর্তিমান্ বেদান্তের নব-কলেবর
হে বেদান্ত-কেশরী
তব পদে নমস্কার করি।
আজি এই শতবর্ষ পরে
আধ্যাত্মিক আলোকের শিখা—
জ্বলিয়া উঠিছে দিকে দিকে,
নিখিলের বুকে,
হে বিবেকানন্দ
তুমি অভিনব!
নমিলাম আজি পদে তব।

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁহার মনীষার জন্য সর্বত্র পরিচিত। ১৮৮১ খৃঃ শীল-মহাশয় জেনারেল এসেম্বলি কলেজে (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) অধ্যয়ন করিতেন। সেই সময় স্বামীজীও ঐ কলেজে তাঁহার এক ক্লাস নীচে পড়িতেন। 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত' নামেই তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সহিত পরিচিত হন। এক বন্ধুর মাধ্যমে দুই জনের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হন। শীল-মহাশয় ১৯০৭ খৃঃ 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় যে স্মৃতিকথা লিখেন, তাহা হইতে জানা যায়, উভয়ের মধ্যে দার্শনিক ও ধর্মবিষয়ক বহু আলোচনা হইত; অন্তরের নানা সমস্যাও নরেন্দ্রনাথ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিতেন।

শীল-মহাশয়ের লেখা হইতে স্বামীজীর ছাত্র-জীবনের মানসিক দ্বন্দ্ব, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি এবং তাঁহার স্বভাবের বিশেষত্ব জানা যায়।

ব্রজেন্দ্রনাথের মতেঃ নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত তরুণ, মিশুক, স্বাধীন-চেতা এবং আচরণে প্রচলিত প্রথার বিরোধী; বাহিরে শৃঙ্খলাহীন মনে হইলেও সংযত ও প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন। তিনি ছিলেন একজন সুগায়ক, সামাজিক-বৃত্তের মধ্যমণি ও অতীব বাক্‌পটু। পার্থিব ছল ও ছদ্মবেশ নরেন্দ্রনাথ তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির তীব্র ও শ্লেষাত্মক বাণে বিদ্ধ করিতেন। বাহিরে যদিও অবজ্ঞা প্রকাশ পাইত, কিন্তু এই বিদ্রূপাত্মক উক্তির অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিত একটি অতি কোমল হৃদয়। তিনি ছিলেন প্রভুত্বব্যঞ্জক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কথা বলার সময় কর্তৃত্বভাব ব্যক্ত হইত। চক্ষে এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যাহাতে শ্রোতারা অভিভূত হইয়া যাইত।

তিনি ছিলেন স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ। সুতরাং পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের বাঁধা-ধরা নানারূপ যুক্তি ও সমস্যা-সমাধানের সাধারণ বুদ্ধির বিচার তাঁহার মনঃপূত হইত না। ফলে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইতে ব্যগ্র হন। পুস্তকে বা অন্যত্র কোন সদুত্তর না পাওয়ায় তাঁহার অন্তরে প্রচণ্ড ঝড় বহিতে থাকে। এই সময় তাঁহার অন্তরের আন্দোলন বাহিরের সাধারণ উদাসীনতা, শ্লেষ ও ঘৃণার ভাব দ্বারা লুকাইয়া রাখিতেন। সঙ্গীত কিন্তু তাঁহার প্রাণে খুবই সাড়া জাগাইত।

প্রত্যক্ষ কথোপকথন ও স্বকীয় অভিজ্ঞতা হইতে হৃদয়ঙ্গম করার তাঁহার যতটা শক্তি ছিল, পুস্তকপাঠে ততটা ছিল না। তাঁহার ভাব ছিল একটি জীবন অন্য জীবনকে উদ্দীপিত করিবে—এক চিন্তা অন্য চিন্তা প্রজ্বলিত করিবে।

সঙ্গীত-চর্চায় তিনি এমন সব লোকের সংস্পর্শে আসিতেন, যাহাদিগের আচরণ ও চরিত্র সম্বন্ধে তিনি তীব্র ও স্পষ্ট ঘৃণা বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার মিশুক স্বভাবের জন্য তিনি তাহাদিগের সঙ্গ বর্জন করিতে পারিতেন না। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় গানের আসরে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গী হইলে তিনি স্বস্তি লাভ করিতেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁহার মধ্যে এক মহৎ উদ্দীপনাময় ও নিষ্কলুষ চরিত্রের পরিচয় পান। নরেন্দ্রনাথ শুষ্ক শুদ্ধাচারী বা স্বভাবতঃ বিষণ্ণ

ভাবের মানুষ ছিলেন না। তিনি কখন কখন অভিধান-বহির্ভূত রূঢ় ভাষা ব্যবহার করিতেও দ্বিধা করিতেন না; মনে হইত যেন তিনি প্রচলিত প্রথাকে আঘাত করিয়া এবং তথাকথিত ভদ্রতাকে বিদ্রূপ করিয়া অস্বাভাবিক আনন্দ লাভ করিতেছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ব্যতীত অন্যের নিকট এই সকল রঙ্গকৌতুক-কালে, তিনি যাহা নহেন তাঁহাকে সেরূপ খেয়ালী ও গোলমেলে মনে হইত। অন্তরে তিনি বাসনা এবং কল্পনার সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন যে, দেহের ও মনের পবিত্রতা নষ্ট করা মূর্খতা ও নিজের জীবনকে ব্যর্থ করা ছাড়া আর কিছু নয়।

তিনি সর্বদা এমন এক শক্তি অন্বেষণ করিতেছিলেন, যাহা তাঁহাকে বন্ধন ও এই বৃথা দ্বন্দ্ব হইতে উদ্ধার করিতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথ অবশ্য অন্যভাবে ভাবিত ছিলেন। তাই উভয়ের সমস্যা একরূপ ছিল না এবং তাহার সমাধানও একরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না। নরেন্দ্র চাহিতেছিলেন এমন একজন রক্তমাংসের মানুষ, যিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন এবং শক্তি দ্বারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারেন ও তাঁহার প্রাণে শান্তি দিতে পারেন।

এই সময় নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক উপদেশাদিতে আর সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া বহু ধর্ম-নেতার নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন, এইরূপেই সংশয়ান্বিত মনে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস-দেবের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু পরমহংসদেব এমন প্রত্যক্ষানুভূতির কথা বলেন, যাহা আর কেহ কখনও বলেন নাই এবং তাঁহার শক্তি দ্বারা নরেন্দ্রনাথের প্রাণে শান্তি আনিয়া দেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের বিদ্রোহী বুদ্ধি সহজে বিশ্বাস করে নাই; বহু পরীক্ষার পর ক্রমে ক্রমে তিনি পরমহংসদেবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া তাঁহার স্থির বিশ্বাস হয়।

নরেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন স্বাধীন চিন্তাশীল যুবকের এই পরিবর্তন ব্রজেন্দ্রনাথকে বিচলিত ও আশ্চর্যান্বিত করে। তিনি মনে করেন—নরেন্দ্র-নাথের এ কি অধোগতি! যিনি সকলকে বশীভূত করিবেন, তাঁহাকেই বশ্যতা স্বীকার করিতে হইল! তবু নরেন্দ্রনাথের ভালবাসার আকর্ষণে ব্রজেন্দ্রনাথ ঘরকুনো হইয়াও দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবকে দেখিতে যান এবং এক গ্রীষ্মের প্রায় সারা দিনই সেখানে কাটান।

আসিবার সময় ঘনঘটা করিয়া প্রবল ঝঞ্ঝা ও বারিপাত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বহিঃপ্রকৃতির ন্যায় অন্তরেও ঝঞ্ঝা ও বিহ্বলতা লইয়া ফিরিলেন। একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি অবশ্য মনে উঁকি মারিতে থাকে যে, যাহা আপাততঃ বিশৃঙ্খল ও অসামঞ্জস্য-পূর্ণ, তাহাও নিয়মের অধীন এবং আপাত-প্রতীয়মান আত্মবিলুপ্তির মধ্যেও আত্মনির্ভরতা সম্ভব, ভ্রান্তিপূর্ণ বুদ্ধি ও প্রাথমিক বিচার এবং এক ত্রাণকর্তায় বিশ্বাস শুধু মূলতঃ আত্মবিশ্বাসের ক্ষীণ প্রতিবিম্ব। স্বামী বিবেকানন্দের পরবর্তী জীবনে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি তাঁহার গুরুদেবের ত্রাণকারী কৃপা ও শক্তিতে যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহা নিশ্চিতভাবে প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বজনীন মানবতার ধর্ম ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রচার করিতে থাকেন।

সর্দার হরি সিং

পরিব্রাজক-জীবনে ১৮৯১ খৃঃ মার্চ মাসের মধ্যভাগে স্বামীজী আলোয়ার পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডুপোলে পৌঁছান। বহু ভক্ত তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা ১৬ মাইল হাঁটিয়া নারায়ণী পর্যন্ত স্বামীজীর সঙ্গে যান। এখানে স্বামীজী তাঁহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ১৬ মাইল

পদব্রজে যাইয়া জয়পুরের গাড়ি ধরেন। আলোয়ারে স্বামীজীর পরিচিত এক ভক্ত জয়পুরে যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি বান্দিকুই স্টেশনে গাড়ি ধরিয়া জয়পুর পর্যন্ত বাকী পথ স্বামীজীর সঙ্গে যান। জয়পুরে পৌঁছিয়া এই ব্যক্তি বহু সাধ্য-সাধনা করিয়া স্বামীজীর একখানি ফটো তোলেন। স্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনের ইহাই প্রথম ফটো।

জয়পুরে স্বামীজী প্রায় দুই সপ্তাহ ছিলেন। স্বামীজী ১৪ই এপ্রিল (১৮৯১) আজমীর হইতে লালা গোবিন্দ সহায়কে আলোয়ারে পত্র লিখেন, ইহার কিছু পূর্বেই তিনি জয়পুরে পৌঁছিয়াছিলেন। এখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নিকট তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন। তিন দিনে শিক্ষা সামান্যও অগ্রসর হয় না। পণ্ডিতজী বলেন, 'স্বামীজী! আমার মনে হয়, আপনি আমার কাছে পাঠ নিয়ে উপকৃত হচ্ছেন না, কারণ আমি তিন দিনে একটি সূত্রই আপনাকে বুঝাতে পারলাম না।' স্বামীজী নিজে নিজে সব সূত্র আয়ত্ত করিয়া পর দিবস পণ্ডিতজীকে পাঠ দিলে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হন। পরে স্বামীজী এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেন, 'মনের প্রবল ইচ্ছা হ'লে সব কিছুই করা সম্ভব—পর্বতও চূর্ণ ক'রে অণুতে পরিণত করা যায়।'

জয়পুর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি সর্দার হরি সিং-এর সহিত স্বামীজীর খুব অন্তরঙ্গতা হয়। তিনি হরি সিং-এর গৃহে বহু চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ আধ্যাত্মিক ও শাস্ত্রীয় বিষয় আলোচনা করিয়া কাটান। একদিনের বিষয়বস্তু ছিল—'মূর্তিপূজার উপকারিতা'। হরি সিং বেদান্ত-মতবাদে পরম বিশ্বাসী ছিলেন এবং মূর্তিপূজায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। বহু ঘণ্টা আলোচনার পরেও সর্দারজীর মতের পরিবর্তন হইল না বা বিশ্বাস উৎপন্ন হইল না। সন্ধ্যায় তাঁহারা ভ্রমণে বাহির হন। তাঁহারা হাঁটাপথে চলিতে চলিতে কয়েকজন ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বহন করিয়া ভজন গান করিয়া যাইতে দেখেন। স্বামীজী ও সর্দার কিছুক্ষণ শোভাযাত্রা দেখিতে থাকেন। হঠাৎ স্বামীজী হরি সিংকে স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠেন, 'ঐ দেখুন জীবন্ত ঈশ্বর!' সর্দারের দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের উপর নিপতিত হইল, অমনি তাঁহার চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে থাকিল এবং তিনি স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। যখন স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সর্দারজী বলিয়া উঠিলেন, 'স্বামীজী, আজ আমার দিব্য দর্শন হ'ল! যা আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনায় হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি, আপনার স্পর্শে তা সহজেই বোধগম্য হ'ল। সত্যই আমি শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে ঈশ্বর দর্শন করেছি।'

অন্য একদিন স্বামীজী তাঁহার অনুগত লোকদিগকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময় রাজসভার পণ্ডিত সূরযনারায়ণ আসিয়া উপস্থিত। পাণ্ডিত্যের জন্য সমস্ত জয়পুর রাজ্যে তিনি সম্মান পাইতেন। কথার সূত্র ধরিয়া তিনি বলিলেন, 'স্বামীজী! আমি বৈদান্তিক, হিন্দুপুরাণের অবতারবাদে বিশ্বাস করি না। আমরা সকলেই ব্রহ্ম। আমার ও অবতারের মধ্যে পার্থক্য কি?' স্বামীজী উত্তরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক। হিন্দুরা মৎস্য, কূর্ম ও বরাহকে অবতার মধ্যে গণ্য করে। আপনি বলছেন, আপনিও অবতার; কিন্তু আপনি এদের মধ্যে কোন্‌টি হ'তে চান?' ইহাতে হাসির রোল উঠিল এবং পণ্ডিত নিস্তব্ধ হইলেন। এখান হইতে স্বামীজী আজমীরে চলিয়া যান।

রেভারেণ্ড ডাঃ বেঞ্জামিন মিলস্

দ্বিতীয় বার আমেরিকা গিয়া স্বামীজী ১৯০০ খৃঃ প্রথম ভাগে লস্-এঞ্জেলেস হইতে ডাঃ মিলসের ওকল্যাণ্ড-স্থিত ভবনে উপনীত হন। ডাঃ ফে মিলস্ ইউনিটেরিয়ান গীর্জার পাদরী ছিলেন। এই গীর্জায় স্বামীজী আটটি বক্তৃতা দেন। শ্রোতার সংখ্যা মাঝে মাঝে প্রায় দুই সহস্র হইত। এই সময় এই গীর্জায় এক আঞ্চলিক ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছিল। এই উপলক্ষেই স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। অতএব এই ব্যবস্থায় স্বামীজীর সহিত ক্যালিফর্নিয়ার শত শত পাদরীর পরিচয় ঘটে ও ভাব-বিনিময় হয়। পাদরীরা বহু ক্ষেত্রে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিবার সুযোগ লাভ করেন। ডাঃ মিলস্ 'হিন্দু-মতে মুক্তির পথ' সম্বন্ধে বক্তৃতা-কালে সমবেত শ্রোতাদিগের নিকটে স্বামীজীকে পরিচিত করিয়া দিয়া তাঁহার উচ্চ প্রশংসা করেন। স্বামীজীকে অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তি বলিয়া তিনি বর্ণনা করেন। ডাঃ মিলস্ বলেন, 'বাস্তবিক তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর সঙ্গে তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ শিশু।'

এখানে স্বামীজী অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া ঐ প্রদেশের নেতৃস্থানীয় মনীষীদের মধ্যে একটি বৃহৎ আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

মিস্টার ও মিসেস লায়ন

১৮৯৩ খৃঃ ধর্মমহাসভা আরম্ভ হইবার পূর্বে চিকাগোর বহু ব্যক্তি তাঁহাদের গৃহে ধর্মসভার প্রতিনিধিদিগকে স্থান দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। মিসেস লায়নও একজন প্রতিনিধিকে নিজ গৃহে রাখিতে সম্মত হন। কিন্তু প্রতিনিধিটি উদারহৃদয় হওয়া চাই, কারণ মিস্টার জন বি. লায়ন দর্শন আলোচনা করিয়া আনন্দ পাইতেন এবং সঙ্কীর্ণতা পছন্দ করিতেন না। এই সময় লায়ন-দম্পতির দৌহিত্রী মিস কর্নেলিয়া কঙ্গার মাত্র ছয় বৎসরের বালিকা। তাঁহার বিধবা মাতা লায়ন-দম্পতির গৃহেই বাস করিতেছিলেন। ১৯৫৬ খৃঃ 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত তাঁহার স্মৃতিকথা হইতেই এ-সময়ের ঘটনাবলী উদ্ধৃত করা হইল :

আমাদের তখন ২৬২নং মিচিগান এভেনিউ-এ বাড়ি ছিল। চিকাগোর প্রদর্শনী দেখিতে আমাদের বহু আত্মীয় আসিয়া পড়ায় বাড়ি একেবারে লোকে ভরতি হইয়া গিয়াছিল। যখন খবর আসিল—রাত্রে আমাদের বাড়িতে একজন প্রতিনিধিকে পাঠানো হইবে, তখন আমার বড় মামাকে এক বন্ধুর বাড়িতে রাত্রি যাপন করিতে পাঠানো হয় এবং তাঁহার ঘর ধর্মসভার ঐ প্রতিনিধির জন্য রাখা হয়। কে যে সেই প্রতিনিধি, তাহা আমরা পূর্বে জানিতাম না। শুধু এই জানা ছিল, আমাদের গীর্জার এক পাদরীর সঙ্গে তিনি রাত্রি ১২ টার পরে আসিবেন। সকলে শয্যাগ্রহণ করিলেও আমার দিদিমা জাগিয়া থাকিয়া তাঁহাদের আসিবার অপেক্ষায় ছিলেন। দিদিমা জীবনে কখনও ভারতবাসী দেখেন নাই, তাই যখন প্রথম স্বামীজীকে দেখিলেন, তখন কিছুটা অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন। যাহা হউক, স্বাভাবিক সৌজন্য সহকারে এবং সহৃদয়তার সহিত তাঁহাকে তাঁহার ঘর দেখাইয়া দেওয়া হয়।

আমাদের আত্মীয়বর্গ সকলেই প্রায় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্তের লোক এবং আমাদের দাদা-মহাশয়ের সম্পত্তিও দক্ষিণ দিকেই ছিল। যদিও আমাদের কাহারও সেরূপ বর্ণবিদ্বেষ ছিল না, তথাপি অন্য আত্মীয়েরা কালো রঙের মানুষকে তাঁহাদের ক্রীতদাস নিগ্রোগণের সমগোষ্ঠী মনে করিয়া ঘৃণা করিতেন। এই জন্য দুশ্চিন্তায় দিদিমার রাত্রে সুনিদ্রা হয় নাই। প্রাতঃকালে

দিদিমা তাঁহার দুশ্চিন্তার কথা দাদামহাশয়কে প্রকাশ করিয়া বলেন এবং তাঁহাদের অতিথিরূপে স্বামীজীকে নিকটবর্তী 'নিউ অডিটোরিয়ম্' হোটেলে রাখিবেন কিনা বিবেচনা করিতে বলেন।

প্রাতরাশের প্রায় অর্ধঘণ্টা পূর্বে দাদামহাশয় পোশাক বদল করিয়া পাঠকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, স্বামীজী পূর্বেই সেখানে উপস্থিত। উভয়ে কয়েক মিনিট আলাপ হয়, ফলে দাদা-মহাশয় আসিয়া দিদিমাকে প্রাতরাশের পূর্বেই জানাইয়া যান, 'যদি আমাদের সকল অতিথি চলে যায়, তাতে আমি একটুও বিচলিত হব না। আমাদের গৃহে এ পর্যন্ত যত লোক এসেছেন, তাঁদের মধ্যে এই ভারতবাসীটি সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান্ ও চিত্তাকর্ষক। যতদিন তিনি এখানে থাকতে ইচ্ছা করেন, ততদিন থাকবেন।'

এইভাবে স্বামীজীর সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হয়। স্বামীজী এক সময় চিকাগো ক্লাবে আমার দাদুর বন্ধুদের নিকট বলিয়াছিলেন, 'আমি যত লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, আমার বিশ্বাস যাঁহারা খৃষ্টের ভাবে অনুপ্রাণিত, মিষ্টার লায়ন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।' স্বামীজী আমার দিদিমাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন, কারণ দিদিমাকে দেখিলে তাঁহার মায়ের কথা মনে হইত। দিদিমা ও আমার মা ধর্মমহাসভার প্রায় প্রত্যেকটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বামীজীর অন্য বক্তৃতাও শুনিতে যাইতেন। আমার মাকে স্বামীজী অনেকভাবে সান্ত্বনা দিতেন। মা স্বামীজীর বক্তৃতা ও বাণী পাঠে মনোনিবেশ করেন এবং জীবনে তাঁহার শিক্ষা রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন। স্বামীজী আমাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু গল্প ও দৃশ্যাবলীর কথা বলিতেন। আমার শিশুমনে উহা পরী-রাজ্যের গল্প বলিয়া মনে হইত। তাঁহার কোলেও বহুবার উঠিয়াছি।

আমাদের খাদ্যে ভারতীয় খাদ্য অপেক্ষা অনেক কম মসলা থাকাতে স্বামীজীর হয়তো অসুবিধা হইবে মনে করিয়া দিদিমা তাঁহাকে মসলার একটি শিশি দিতেন এবং স্বামীজী খুব আনন্দের সহিত খাদ্যে উহার প্রচুর সদ্ব্যবহার করিতেন, যদিও আমাদের পক্ষে তাহা অত্যন্ত ঝাল লাগিত।

এই সময়ের প্রায় এক বৎসর পরে তিনি চিকাগো আসিয়া অল্পসময় আমাদের বাড়িতে থাকেন। বহু মহিলা স্বামীজীকে খুশী করার জন্য নানারূপ চাটুকারিতা করিত। ইহাতে দিদিমা স্বামীজীকে সাবধান করিয়া দিলে তিনি বলেন, 'প্রিয় মিসেস্ লায়ন—আমার আমেরিকার স্নেহময়ী জননী, আমার জন্য ভয় করবেন না। যদিও আমি ভিক্ষাপাত্র-হাতে গাছের নীচে শয়নে অভ্যস্ত, তথাপি আমি রাজা-মহারাজার প্রাসাদে তাঁহাদের অতিথিরূপেও পরিচর্যা পেয়েছি। তাই প্রলোভন আমার কিছুই করতে পারবে না, আমার জন্য ভয় করবেন না।'

২রা অক্টোবর (১৮৯৩) অধ্যাপক রাইটকে স্বামীজী এক পত্রে লিখেন, 'যদিও আমি চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছি, তবু চিকাগো এলেই লায়ন-পরিবারের সহিত দেখা করি এবং লায়ন-পরিবারের ঠিকানাতেই সকলকে পত্রোত্তর দিতে লিখি।'

মিসেস ব্লজেট

মিসেস এস. কে. ব্লজেট লস্-এঞ্জেলেসে বাস করিতেন। তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতা সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করিয়াছেন :

আমি ১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত ছিলাম। যখন যুবক হিন্দুসন্ন্যাসী

উঠিয়া 'আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন প্রায় সাত হাজার নরনারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে তাঁহারা জানিতেন না। এই চাঞ্চল্য যখন শেষ হইল, বহু তরুণীকে তাঁহার সান্নিধ্যে পৌছানোর জন্য বেঞ্চির উপর দিয়া লাফাইয়া যাইতে দেখিয়া আমি মনে মনে বলিলাম, 'ওহে বাছা, এই আক্রমণ থেকে যদি তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারো, তবে সত্যই তুমি ঈশ্বর।'

১৮৯৯ খৃঃ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গিয়া রিজলি-ম্যানরে মিস্টার লেগেটের গৃহে থাকাকালে সংবাদ আসে—মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস লেগেটের একমাত্র ভ্রাতা মিঃ টেলর লস্‌-এঞ্জেলেসে অপরিচিতা মিসেস ব্লজেটের গৃহে গুরুতররূপে পীড়িত। মিস ম্যাকলাউড খবর পাওয়ামাত্র লস্‌-এঞ্জেলেসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হন। যাওয়ার সময় স্বামীজী তাঁহাকে বিদায় জানাইতে আসিলে জো (মিস ম্যাকলাউড) স্বামীজীকে লস্‌-এঞ্জেলেসে যাইতে বলেন। স্বামীজী বলেন, যদি ক্লাসের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে যাইব।

লস্‌-এঞ্জেলেসে পৌছিয়া জো মিসেস ব্লজেটের গৃহ খুঁজিয়া বাহির করেন এবং তাঁহার ভ্রাতাকে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দেখেন। এই অবস্থায় ভ্রাতাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব বুঝিয়া তিনি গৃহস্বামিনীর অনুমতি প্রার্থনা করেন, যাহাতে এই গৃহেই তাঁহার ভ্রাতাকে রাখিতে পারেন। জো তাঁহার ভ্রাতার শয্যার উপরে স্বামীজীর একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি দেখিয়া আশ্চর্য হন। ভ্রাতা আর বেশী দিন ধরাধামে ছিলেন না।

এই ছবি সম্বন্ধে ব্লজেটকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্বে উদ্ধৃত কথা-কয়টি বলেন এবং ইহাও বলেন যে, যদি ধরাধামে ঈশ্বর নরদেহে বিচরণ করেন, তবে ঐ ব্যক্তিই সেই। জো বলেন, স্বামীজী রিজলি-ম্যানরে আছেন এবং তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিলে তিনি আসিতে পারেন।

২২শে নভেম্বর (১৮৯৯) স্বামীজী রিজলি-ম্যানর ত্যাগ করিয়া লস্‌-এঞ্জেলেসে উপস্থিত হন। ইহার প্রায় ৬ সপ্তাহ পূর্বেই জো তাঁহার ভ্রাতাকে হারাইয়াছেন। এই সময় ব্লজেটের গৃহেই জো বাস করিতেছিলেন এবং স্বামীজীও এই গৃহেই অতিথি হন। এই সূত্রেই ক্যালিফর্নিয়ায় নিয়মিতভাবে বেদান্ত-প্রচার আরম্ভ হয়

মেরি হেলের নিকট পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, 'মিসেস ব্লজেট স্থূলকায়া বৃদ্ধা, সুরসিকা এবং খুবই স্নেহময়ী।' স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের পর মিসেস ব্লজেট জো-কে যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে এই মহিলার জীবনে স্বামীজীর প্রভাব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তিনি লিখেন, 'আমি সর্বদা ঐ অবিস্মরণীয় শীতকালের ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল দিনগুলি স্মরণ করি। ঐ দিনগুলি কি সহজ ও সরল আনন্দে কাটে! আমাদের পক্ষে আনন্দ ও সত্যের পথ ব্যতীত অন্য পথে যাওয়া সম্ভব ছিল না।···আমি স্বামী বিবেকানন্দকে বেশী দিন ব্যক্তিগতভাবে জানিবার সৌভাগ্য না পাইলেও তাঁহার চরিত্রের বালকসুলভ ভাব আমার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাঁহার এই ভাবটিই সৎস্বভাবসম্পন্ন সকল নারীর মাতৃত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গৃহের প্রাচীন রন্ধনশালায় তুমি ও আমি স্বামীজীকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ অবস্থায় দেখার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি!'

এই মহিলার সহিত স্বামীজী যেন নাতির মতো ব্যবহার করিতেন। ঠাট্টা-তামাসা এবং নানারূপ গল্প-গুজবে এই বৃদ্ধা ও হিন্দু যুবক

সন্ন্যাসী রান্নাঘরে বা খাবার ঘরে সময় কাটাইতেন। জো সর্বদাই স্বামীজীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, যাহাতে তিনি সময়মত ক্লাসে বা বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হইতে পারেন। এই বৃদ্ধা কিন্তু সকল বিষয়ে স্বামীজীকে দিদিমার ন্যায় প্রশ্রয় দিতেন। একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না।

স্বামীজী একদিন বক্তৃতায় যাইতে বিলম্ব করিতেছেন মনে করিয়া জো তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে ঘন ঘন তাগিদ দিতেছিলেন, কিন্তু এই বৃদ্ধা বলেন, 'তাড়াতাড়ি নেই; আপনি না যাওয়া পর্যন্ত মজা শুরু হবে না।' এই বলিয়া নিম্নলিখিত গল্পটি বলেন:

একজন ফাঁসির আসামীকে বাজারে ফাঁসি দেওয়া হবে ব'লে গাড়ি ক'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ফাঁসি দেখবার জন্যে লোকে রাস্তায় ভিড় ক'রে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। রাস্তায় সবাই ঠেলাঠেলি করছে দেখে আসামী বলে, 'কেন ঠেলাঠেলি ক'রছ? আমি না পৌঁছলে তামাসা আরম্ভ হবে না!'

এই গল্পে স্বামীজী খুবই আনন্দ পান এবং যখনই জো তাড়াতাড়ি করিতে বলিতেন, তিনি উত্তর দিতেন, 'আমি না গেলে তো তামাসা শুরু হবে না।'

জন ডি রকফেলার

আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত ধনকুবের রকফেলার এক সময় পৃথিবীর ধনী লোকদিগের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি যেমন ধনী, তেমনই দানবীর। সর্বজনবিদিত 'রকফেলার ফাউণ্ডেশন' তাঁহারই কীর্তি।

১৮৯৪ খৃঃ প্রথম ভাগে সম্ভবতঃ মার্চমাসে চিকাগো শহরে কোন লোকের গৃহে স্বামীজী যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন রকফেলারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মাদাম কালভে তাঁহার বন্ধু পারী ও স্যানফ্রান্সিস্কোর মাদাম পল ভার্দিয়ারকে যে ঘটনাটি বলেন, তাহা মাদাম ভার্দিয়ার (Verdier) লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই লিখিত বিবরণী হইতেই ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে।

যে গৃহে স্বামীজী অবস্থান করিতেছিলেন, সেই গৃহস্বামী ব্যবসায়সূত্রে রকফেলারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রকফেলার তাঁহার নিকট বহুবার শুনিয়াছিলেন, এক অসাধারণ ও অত্যাশ্চর্য ভারতীয় সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে বাস করিতেছেন। ভারতীয় সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত হইবার জন্য রকফেলারকে বহুবার আমন্ত্রণও করা হইয়াছিল, কিন্তু যে-কোন কারণে হউক দেখা করিতে আসিবার কোন উৎসাহই রকফেলারের দেখা যায় নাই, এ-বিষয়ে তিনি বরং অস্বীকৃতই ছিলেন।

এই সময়ে রকফেলারের ভাগ্যগগন মধ্যাহ্ন-রবিকরোজ্জ্বল না হইলেও ইতিমধ্যেই তিনি বিশেষ প্রতাপশালী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উপদেশ দেওয়া দুরূহ ছিল। ব্যবসায়ী-মহলে তখনই তাঁহার ভবিষ্যৎ সাফল্য-গৌরব সূচিত হইয়াছিল।

স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একদিন হঠাৎ কি খেয়ালে স্বেচ্ছায় সোজা বন্ধুর গৃহে আসিয়া রকফেলার উপস্থিত হন। গৃহের পরিচারক দ্বার খুলিয়া দেওয়া-মাত্র তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীকে দেখিতে চান। পরিচারক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্বামীজীর কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র আগমন-সংবাদ না দিয়াই দরজা ঠেলিয়া তিনি স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করেন।

স্বামীজী টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া নিবিষ্ট মনে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। কে ঘরে

প্রবেশ করিল, তাহা তিনি লক্ষ্যই করিলেন না। রকফেলার ইহাতে খুবই বিস্মিত হইলেন।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে স্বামীজী মুখ তুলিয়া রকফেলারের সহিত কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জীবনের এমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন, যাহা তিনি ভিন্ন অন্য কোন লোকের জানা অসম্ভব ছিল। স্বামীজী এই কথাও বলিলেন, 'যে অর্থ আপনি সঞ্চয় করেছেন, তাতে আপনার কোন অধিকার নেই। আপনি নিমিত্তমাত্র, এই অর্থ জগতের উপকারে ব্যয় করাই আপনার কর্তব্য। ঈশ্বর আপনাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তা জনসাধারণকে সেবা করবার জন্যই।'

কেহ রকফেলারের সহিত ঐরূপভাবে কথা বলিতে এখনও পর্যন্ত সাহস করেন নাই, বা কি করা উচিত সে-বিষয়ে তাঁহাকে কেহ উপদেশ দিবেন—ইহাও তাঁহার অসহ্য, সেই কারণে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। শুধু তাহাই নয়, উত্তেজিত হইয়া সামান্য ভদ্রতাসূচক বিদায়-সম্ভাষণ পর্যন্ত না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে রকফেলার পুনরায় আসিয়া সংবাদ না দিয়াই স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং পাঠরত স্বামীজীর সম্মুখে টেবিলের উপর একখানা কাগজ ছুঁড়িয়া দিলেন। স্বামীজী পূর্ববৎ মৌন ও অচঞ্চল। কাগজটিতে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থদানের পরিকল্পনা ছিল।

রকফেলারই প্রথম কথা বলিলেন, 'এখন অবশ্যই আপনি খুশী হবেন, আর এইজন্য আমাকে ধন্যবাদ দেবেন নিশ্চয়।' এ পর্যন্ত স্ব া চক্ষু পর্যন্ত তোলেন নাই—নিস্তব্ধ। তারপর কাগজখানা তুলিয়া নীরবে পড়িয়া বলিলেন, 'আপনারই তো উচিত আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া।' জনকল্যাণে এইটিই রকফেলারের প্রথম উল্লেখযোগ্য বড় দান।

উইঙ্কিলম্যান-লিখিত রকফেলারের জীবনীতে এমন কোন আভাস নাই, যাহাতে প্রমাণিত হয় যে, স্বামীজীর অনুপ্রেরণাই রকফেলারের দানের পশ্চাতে কার্যকরী হইয়াছিল। অবশ্য এই ঘটনা এত ব্যক্তিগত যে, ইহা এক ক্রোড়পতির জীবনীতে উদ্ধৃত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। জীবনীতে দেখা যায়, তিনি আপনভাবে ধর্মে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার মানব-হিতৈষণামূলক কার্যের পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য বর্তমান, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বামীজীর উক্তিরই প্রায় প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলেন, 'অর্থসঞ্চয় করাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। অর্থ গচ্ছিত ধনের মতো। অর্থের অসদ্ব্যবহার মহাপাপ। পরপারের জন্য প্রস্তুতির সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা পরের জন্য জীবন-ধারণ আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিতেছি।'

বিবেকানন্দ ও বুদ্ধিবাদ

শ্রীসুমণি মিত্র

স্বামীজী তখন নরেন বা বিলে—বয়স বছর ছয়-সাত হবে। পাড়ার এক বাড়িতে একটি চাঁপাফুলের গাছ ছিল। প্রায় সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে সেই গাছে উঠে বিলে উদ্দামবেগে দোল খেত—মগডালে পা আটকে মাটির দিকে মাথা ঝুলিয়ে। এক বন্ধুর ঠাকুরদা নরেনকে একদিন এইভাবে দোল খেতে দেখে বিশেষ উদ্বিগ্ন হলেন। নরেনের জন্যে যতটা না হোক, গাছটার পরমায়ুর কথা চিন্তা ক'রে তিনি গর্জে উঠলেন—'খবরদার ও-গাছে আর উঠ না।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন—'কেন উঠব না? উঠলে কি হয়?'

প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেন, তারপর এক অব্যর্থ মহৌষধের শরণ নিলেন—'কি হয় শুনবে? ও-গাছে এক ব্রহ্মদৈত্য থাকে, বিটকেল চেহারা, নিশুতি রাতে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আর তার কাজ হচ্ছে, যারা ও-গাছে চড়ে, তাদের ঘাড় মটকানো—বুঝেছ?'

বন্ধুটি সত্যি-সত্যি ভয় পেয়েছে দেখে নরেন প্রথমে খুব খানিকটা হেসে নিলে, তারপর বিবেকানন্দের ঢঙে গম্ভীর গলায় বললে—'তুই ছোঁড়া তো আচ্ছা আহাম্মক! একজন একটা কথা ব'লে গেলেই কি সেটা বিশ্বাস করতে হবে? যদি ঐ বুড়োর কথা সত্যি হ'ত, তাহলে অনেকদিন আগেই আমার ঘাড় মটকে দিত।'

ঘটনাটা জমকালো কিছু নয়, কিন্তু তাৎপর্যে তীক্ষ্ণ, সুতরাং বিশ্লেষণযোগ্য। যে-বুদ্ধিবাদী ব্যক্তিত্ব বিগত শতাব্দীর বুকে উল্কার মতো আবির্ভূত হয়েছিল, শৈশবের এই উক্তির মধ্যে সেই অনাগত উল্কার উত্তাপ পাওয়া যায়। বুদ্ধির সুদৃঢ় বর্মে আচ্ছাদিত হয়ে এই সাইক্লোনিক্ সন্ন্যাসী ধর্মজগতের যাবতীয় অযুক্তি এবং অন্ধতার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন, এই উক্তিটির মধ্যে সেই যুদ্ধেরই দুন্দুভিনাদ—একটু কান পাতলেই শোনা যায়।

ঠিকই তো, সে আজই প্রথম ও-গাছে উঠছে না; যদি বুড়োর কথা সত্যি হ'ত, তাহলে অনেককাল আগেই তার ঘাড় মটকে যাওয়ার কথা। তা যখন হয়নি, তখন বুড়োর কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্বামীজীর শৈশবের এই উক্তিতে যে বিরাট যুক্তিটা উঁকি মারছে, সেটা হ'ল এই যে, বিশ্বাসও প্রমাণসাপেক্ষ, প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসাধ্য একটা মনোভাব। যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, সেখানে যুক্তি-প্রমাণ থাকা চাই; নইলে কারুর কথায় বিশ্বাস করা বিপজ্জনক। বিপজ্জনক এই জন্যে যে, এই অপ্রমাণিত বিশ্বাসই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'ব্রহ্মদৈত্য' হয়ে আমাদের ঘাড় মটকায়।

'একজন একটা কথা ব'লে গেলেই কি সেটা বিশ্বাস করতে হবে?'—এই হচ্ছে স্বামীজীর চিরকেলে মনোভাব। নির্বিচারে তিনি এক পাও এগোতে রাজী নন, এমনকি শাস্ত্রবাক্যবিশ্বাসের পাকাপোক্ত রাজপথেও নয়—

শাস্ত্রই বা বিশ্বাস করি কেমন ক'রে! মহানির্বাণতন্ত্রে একবার বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান না হ'লে নরক হবে! আবার বলে—পার্বতীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নেই! মনুসংহিতায় মনু লিখছেন এক কথা, বাইবেলে

মুশা (Moses) লিখছেন আর এক কথা, আবার বেদ মানতে হয়; বেদ নিত্য। কেউ বলছেন বেদ অভ্রান্ত, বুদ্ধ করছেন বেদের নিন্দা।

বিবেকানন্দ বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি বেদ ততটা মানি, যতটা যুক্তির সঙ্গে মেলে।'

বুদ্ধের মতো সংস্কারমুক্ত সত্যানুসন্ধানী মন নিয়েই স্বামীজী জন্মেছিলেন, এটা তাঁর প্রকৃতিরই একটা বৈশিষ্ট্য। কেউ কেউ মনে করেন, বিবেকানন্দের যুক্তিপ্রিয়তা নিছক পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদের প্রভাব। তিনি পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদের দ্বারা আদৌ প্রভাবিত হননি তা বলছি না, তবে তাঁর বাল্যজীবনে এই বুদ্ধিবাদী ব্যক্তিত্বের বীজ যখন সাদাচোখেই দেখা যাচ্ছে, তখন তাকে সম্পূর্ণ বহিরাগত মনে করাটাও যুক্তিসঙ্গত নয়। এটা তাঁর প্রকৃতিতেই ছিল, পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদের প্রভাব একটা উপলক্ষ্য, তাঁর চারিত্রিক বিশিষ্টতার একটা পরিচয়-বিশেষ। তাই তিনি যখন 'ব্রাহ্মসমাজ' থেকে সরে এসে পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদের দরিয়ায় সংশয়বাদের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছেন, তখনও দেখি তাঁর সজীব বিবেকী বুদ্ধি সেই বন্ধ্যাবুদ্ধিবাদে বিচলিত হয়ে নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে বসে নরেন ও গিরিশের মধ্যে ঈশ্বরাবতার নিয়ে তর্ক হচ্ছে। গিরিশের বিশ্বাস, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে। নরেন গর্জে ওঠে—'প্রমাণ (proof) না হ'লে কেমন ক'রে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।' গিরিশ উত্তর দেয়—'বিশ্বাসই sufficient proof (যথেষ্ট প্রমাণ)।'

কিন্তু বিশ্বাস নিজেই কি প্রমাণসাপেক্ষ নয়? বিশ্বাস কি ভুলেও যুক্তি-বিচারের পাড়া মাড়ায় না? বিশ্বাস মানেই বা কি?

বিশ্বাস মানে, কোনকিছুর ব্যাপারে নিশ্চয়-জ্ঞান। যুক্তি-তর্ক বিশ্বাসের প্রতিপক্ষ নয়, বিশ্বাসের প্রতিপক্ষ হচ্ছে অবিশ্বাস। সংশয় অবিশ্বাস নয়, অর্ধবিশ্বাস; হ'তে পারে, নাও হ'তে পারে—এইরকম অনিশ্চিত একটা মনোভাব। এখন দেখা যাক, নিশ্চয়-জ্ঞান হয় কিসে? প্রমাণের দ্বারাই হয়। প্রত্যক্ষ ও যুক্তি—এই দুটো মৌলিক প্রমাণ ছাড়া আমাদের নিশ্চয়-জ্ঞান হয় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবার দু-রকমের, বহির্জগতে—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎকার, আর অন্তর্জগতে—সাক্ষাৎ অনুভূতি! আংশিক প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান যুক্তির দ্বারাই হয়।

অতএব বিশ্বাসও প্রমাণসাপেক্ষ এবং বিশ্বাসের পেছনেও যুক্তি থাকে। তাই স্বামীজী যখন বলছেন, 'প্রমাণ না হ'লে কেমন ক'রে বিশ্বাস করি', তখন তিনি অবিশ্বাসের প্রশ্ন তুলছেন না, বিশ্বাসের জন্য যুক্তির দ্বারস্থ হচ্ছেন।

বিশ্বের যে-কোন বিষয়ে বিশ্বাসী হবার আগে মানুষ চিরকালই তার বিচার-বুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছে। নেবেও; কেননা যতক্ষণ মন ব'লে একটা পদার্থ রয়েছে, ততক্ষণ জগৎটা মিথ্যে নয় এবং যতক্ষণ জগৎটা সত্য ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে, ততক্ষণ বিচার-বুদ্ধিও অনিত্য নয়। এই মনোমুকুরটি—যার ভেতর দিয়ে এই বিক্ষিপ্ত জগৎ-সংসার প্রতিফলিত লীলায়িত হচ্ছে, সেটা বিচূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত বিচার-বুদ্ধিই আমাদের একমাত্র সারথি। আপেক্ষিকতার বিধান অনুযায়ী আমরা সব কিছুই মেনে নেব, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের বিচারবুদ্ধির বিরোধী না হচ্ছে। মোট কথা, আমাদের গন্তব্যস্থান বিচারবুদ্ধির বাইরে হলেও তার রাস্তাটা বিচারবুদ্ধির ভেতর দিয়েই।

অনেকের বিশ্বাস, তাঁরা যুক্তি-বিচারের দ্বারা পরিচালিত হন না, বলেন—'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।' কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও একটা অস্পষ্ট যুক্তি থাকে। যুক্তিটা এই—তত্ত্বদর্শীরা বলছেন, শাস্ত্রবাক্যে আস্থাবান্ হ'তে। তাঁদের এমন কোন স্বার্থ-বুদ্ধি নেই যে প্রতারণা করবেন, অতএব আমি বিশ্বাস করি। এটাও এক শ্রেণীর প্রমাণ, তবে অসম্যক্ প্রমাণ। এই জাতীয় প্রমাণের প্রতি একদল লোকের অত্যধিক প্রবণতা দেখা যায়। তাদের প্রমাণের অসম্পূর্ণতা প্রমাণিত হ'লেও তাদের বিশ্বাস তাতে শিথিল হয় না। অসম্যক্ প্রমাণে এই অটল নিশ্চয়-জ্ঞানকে আমরা অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কার ব'লে থাকি।

কিন্তু এটা মনে করাও একটা কুসংস্কার যে, অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ধর্মার্থীরাই কেবল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। যাঁরা পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত, বিজ্ঞানের বড়াই ক'রে ধর্মকে কটাক্ষ করেন এবং প্রতিপদে শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ চান, তাঁরাই আবার বিনাপ্রমাণে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অম্লানবদনে হজম করেন, হাক্সলি-টিণ্ডাল (Huxley-Tyndal)-এর নাম শুনলেই চুপ হয়ে যান। লণ্ডনে 'জ্ঞানযোগের' বক্তৃতায় স্বামীজী এই আধুনিক অন্ধতাকে 'scientific superstition' ব'লে উপহাস করেছেন।

যাই হোক, অন্ধবিশ্বাস বা কুসংস্কারের প্রতি বিবেকানন্দের তীব্র বিতৃষ্ণা, তা সে ধর্মেরই হোক, আর বিজ্ঞানেরই হোক—

'Avoid everyone however great and good he may be, who asks you to blindly believe···beware of eyerything that takes away your freedom.'[১]

'For it is better that mankind should become atheist by following reason than blindly believe in two hundred millions of gods on the authority of anybody.'

কিন্তু কেন? কেন স্বামীজী অন্ধবিশ্বাসের সনাতন রাজপথ থেকে আমাদের বিপথগামী করতে চাইছেন?

তার কারণ, যে-বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ-পত্র নেই কিংবা সম্যক্ যুক্তির প্রাধান্য নেই—সে-বিশ্বাসে সত্য ও মিথ্যা দুই-ই থাকতে পারে। অন্ধবিশ্বাস সম্যক্ প্রমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত নয় বলেই সে সব সময় অভ্রান্ত নয়, ফলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের বিভ্রান্ত করে। নির্বিচারে শাস্ত্র মানার ফলে কোন কোন সমাজে একদিকে যেমন ভ্রাতৃ-ভাবের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি পরধর্মবিদ্বেষের ভয়াবহ বিষবৃক্ষটাও অমৃত-জ্ঞানে বিবর্ধিত হয়েছে। ধর্মের নামে এই মত্ততা—এ-সব অন্ধবিশ্বাসের বিষময় ফল। শাস্ত্রবাক্য যুক্তির দ্বারা যাচাই ক'রে না নিলে বিধর্মীকে হত্যা করার মর্মান্তিক পাপকেও আমরা অম্লান-বদনে পুণ্য ব'লে মনে করি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে আমরা এমন অনেক কিছু করি, যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে-সব মহাপুরুষ এইসব বিধান দিয়েছেন, তাঁরা কেমন সিদ্ধপুরুষ? সেখানেও কতকটা ঐ একই যুক্তি প্রযুক্ত হ'তে পারে। ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, ধর্ম-জীবনে যাঁরা বিচার-বুদ্ধিকে নির্বাসিত ক'রে নিছক ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, তাঁরাই সত্যকে আংশিকভাবে উপলব্ধি করার ফলে আংশিকভাবেই জগতের হিত করেন। সত্য যুক্তি-তর্কের অতীত হ'লেও যাঁরা যুক্তি-তর্ককে অস্বীকার ক'রে সত্যে যেতে চান, তাঁরা এমন সব প্রত্যাদেশ পান ব'লে মনে করেন, যা

১ যদি কোন লোক তোমায় তাঁর কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে বলেন, তিনি যত বড় লোক বা যত বড় সাধুই হোন না কেন, তাঁকে এড়িয়ে চলবে।···তোমার স্বাধীনতা নষ্ট হয়—এমন প্রভাব থেকে নিজেকে সাবধান রাখবে।' —রাজযোগ

যুক্তিবিরোধী এবং যুক্তিবিরোধী বলেই তা সত্য নয়, শিব নয়। এই দুঃখেই স্বামীজী আমাদের 'আহাম্মক আস্তিক' হওয়ার চেয়ে বরং 'যুক্তি-পরায়ণ নাস্তিক' হ'তে বলেছেন।

জীবাত্মার চরম লক্ষ্য হচ্ছে মুক্তি। জড়বস্তু ও চিত্তবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়াটাই মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য। বাহ্য- ও অন্তঃ-প্রকৃতিকে জয় ক'রে তাদের ওপর প্রভুত্ব করতে হবে—এই হচ্ছে ধর্মের মর্মবাণী। তাই যদি হয়, তাহলে যারা অপরের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে নির্বিচারে তাঁদের উপদেশ পালন করে, তারা মুক্ত হওয়া দূরে থাক, নিজেদের আরও বেশি শৃঙ্খলিত করে এবং অচিরেই ধর্মজীবনে দেউলিয়া হয়ে যায়। যাঁরা এইভাবে নিজেদের ইচ্ছাশক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চালন করেন, তাঁরা —জানুন বা না জানুন—মানুষের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিকে বিনষ্ট ক'রে তার স্বাভাবিক ধর্ম-বৃত্তিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করেন। তাই স্বামীজীর সতর্কবাণী:

'I would rather see everyone of you rank atheists than superstitious fools, for the atheist is alive, and you can make something out of him. But if superstition enters, the brain is gone, the brain is softening, degradation has seized upon the life'

আর পাশ্চাত্য জগতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধও এইজন্যে। ধর্ম কিছুতেই বিচার-বিশ্লেষণ বরদাস্ত করতে পারে না। বিগত শতাব্দী থেকে বিজ্ঞান যে যুক্তি-বিচারের হাতিয়ার নিয়ে ধর্মকে ধরাশায়ী করতে চাইছে, তার মূল হচ্ছে ধর্মের এই নিদারুণ অনুদারতা। ধর্মের ওপর পাশ্চাত্য জগতের অশ্রদ্ধার আরও একটা কারণ হচ্ছে, রেনেসাঁসের যুগে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানকে ধর্মবিশ্বাসের হাতে রীতিমত লাঞ্ছিত এবং নির্যাতিত হ'তে হয়েছে, কোপার্নিকাসের পুঁথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, গ্যালিলিওকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং ব্রুনোকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। ধর্মযাজকদের এই বৈজ্ঞানিক-পীড়ন ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধটাকে তীব্র বিদ্বেষে বিষাক্ত ক'রে দিয়েছে। ফলে মানুষের এই ধারণা দাঁড়িয়েছে —বিজ্ঞান ও ধর্ম যেন পরস্পর-বিরোধী তত্ত্ব, বিজ্ঞান যেন 'নাস্তিকতা'র প্রতিশব্দ। অথচ একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, দুয়েরই লক্ষ্য এক। বিজ্ঞান ধর্মের মতোই একত্বের সন্ধানী এবং ধর্ম বিজ্ঞানের মতোই প্রকৃতিকে জয় করার হাতিয়ার। একই সত্যকে ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন মন নিয়ে অনুসন্ধানের ফলে বিজ্ঞান ও ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে। সুতরাং এ-বিরোধ অহেতুক। এখন ধর্ম যদি বিজ্ঞানের যাবতীয় জিজ্ঞাসাকে অভ্যর্থনা জানায়, তার বিশ্লেষণের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে, তবেই এ অহেতুক আক্রোশের অবসান ঘটে, তাহলে আর মানুষকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হ'তে হয় না। কেননা—

'Wherever religion was not broad enough to include all these minds the result was, that the brightest minds in society were always outside of religion; and never was this so marked as at the present time, especially in Europe.'

ধর্মতত্ত্বের সত্যাসত্য নির্ণয়ের কষ্টিপাথর হ'ল যুক্তি-বিচার, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, যাতে উত্তীর্ণ হ'লে ধর্মের অতীন্দ্রিয় সত্য সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ বিশ্বাস আসে। তাই ধর্ম যেখানে যুক্তি-বিমুখ, সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ সেখানে ধর্ম-বিমুখ, ফলে দেহাত্মবাদী। ধর্ম সে-ক্ষেত্রে মানুষকে দেবতা করা দূরে থাক, তাকে পশুত্বের দিকে ঠেলে দেয়; নাস্তিককে আস্তিক করা দূরে

থাক, বরং আস্তিককেই নাস্তিক করে এবং এক-পাল বিচারবুদ্ধিরহিত আধমরা মানুষ নিয়ে অপদার্থ আস্তিকের সৃষ্টি করে। বিগত যুগে খৃষ্টধর্ম এই রকম দুটো দলেরই সৃষ্টি করেছিল, এবং বিজ্ঞানের কোন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি বলেই—

'...the West was divided into two parties—the believers who accepted the Bible as a whole, who did not question, did not dare to question and the liberal who just as wholeheartedly rejected the Scriptures as a mass of nonsense. There was no middle way, not a single point of conciliation or of sympathy.... And so the West became more and more materialistic.[২]

—এ একজন পাশ্চাত্য ধর্মার্থীরই আক্ষেপ!

এই ইওরোপীয় জড়বাদ এবং নাস্তিকতার পঙ্গপাল একদিন আমাদের দেশে উড়ে এসে কি নিদারুণভাবে আমাদের শুভ-বুদ্ধির শস্য-সবুজ ক্ষেতটাকে তছনছ ক'রে দিয়েছিল, ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই তা জানেন। পাশ্চাত্যের জড়-বিজ্ঞান খৃষ্টধর্মের তত্ত্বকে খণ্ডন করছে দেখে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী—বিশেষতঃ বাঙালী অমনি চোখ বুঁজে স্থির ক'রে ফেললে, বাইবেলের মতো আমাদের বেদ-বেদান্তও খণ্ডনীয় এবং অগ্রাহ্য। এইখানেই প্রলাপের ইতি নয়, অবিশ্বাসের শিক্ষা-বিষে অচৈতন্য হয়ে শেষ পর্যন্ত এই মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত ক'রে বসলে—আমাদের ধর্ম-শাস্ত্র, ধর্মাচার্য এবং ধর্মস্থানগুলিকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

সে-যুগে মিল্ ও স্পেন্সারের ওপরেই ঈশ্বরের থাকা বা না-থাকাটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছিল। স্বামীজীর শ্লেষোক্ত ভাষায়:

...the test of truth became, 'what does the West say? The priests must go, the Vedas must be burned, because the West has said so.'

মূর্খেরাই কেবল অন্ধবিশ্বাসের দাস আর শিক্ষিতেরা নন—এ-বিশ্বাসটাও নিঃসংশয়ে অন্ধ। সত্যানুসন্ধান-বর্জিত নিশ্চয়-জ্ঞানকে যদি অন্ধ বিশ্বাস বলতে হয়, তাহলে 'পাশ্চাত্য যা বলে তাই সত্য'—এ-বিশ্বাসটাও নিশ্চয়ই চক্ষুষ্মান্ নয়।

একদিকে পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদের দোহাই দিয়ে প্রগতিপন্থীদের অন্ধ যুক্তি এবং উদারতা, অন্য দিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে অতিনৈতিকদের বিরক্তিকর অযুক্তি এবং কূপমণ্ডূকতা।

'দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র'—এই অপূর্ব ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে সে-যুগের ব্রাহ্মণকুল 'আত্মবৎ সর্ব-ভূতেষু'কে পুঁথির পাতায় আবদ্ধ রেখে 'দূরমপসর রে চণ্ডাল' ব'লে মুহুর্মুহুঃ চিৎকার পাড়ছেন! অবিশ্যি 'ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতির স্পর্শে দোষ নাই—ভোগ সাঙ্গ হইলেই স্নান, কেননা ব্রাহ্মণেতর জাতি অপবিত্র।' কেবল 'দেহি দেহি, চুরি বদমাসি--এরা আবার ধর্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে আবার বলে ছুঁয়ো না ছুয়ো না—আর কাজ তো ভারি—আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?' '১৪ বার হাতে মাটি না করলে ১৪ পুরুষ নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ?' —এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ ২ হাজার বৎসর ধরে।

২ পাশ্চাত্য জগৎ দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল—যাঁরা ধর্মবিশ্বাসী তাঁরা বাইবেলকে বিনা বাক্যব্যয়ে পুরোপুরি গ্রহণ করলেন, কোন রকম প্রশ্ন তুলতে সাহস করেননি, আর যাঁরা উদারপন্থী, তাঁরা শাস্ত্রকে পাগলের প্রলাপ মনে ক'রে ততটাই মনে-প্রাণে তাকে বর্জন করলেন। মধ্যপথ ব'লে কিছু রইল না; এ দু-দলের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সহানুভূতির লেশমাত্র ছিল না।...সেইজন্যেই পাশ্চাত্য দেশ উত্তরোত্তর জড়বাদী হ'য়ে উঠতে লাগল।—With the Swamis in America by a western disciple. 1st Ed., 1938 Page: 136.

ওদিকে প্রগতিপন্থীদের প্রগল্‌ভ পাশ্চাত্য-প্রিয়তা, এদিকে প্রাচীনপন্থীদের অপূর্ব ধর্মান্ধতা! একদিকে অতিরিক্ত আত্মবিস্মৃতি, আর এক দিকে অতিরিক্ত আত্মগৌরব। একদিকে অন্ধ-যুক্তি, আর এক দিকে অন্ধবিশ্বাস! একদিকে উৎকট উদারতা, আর একদিকে সর্বনেশে সঙ্কীর্ণতা! একদিকে অসহ্য অনুকরণপ্রিয়তা, আর একদিকে বিরক্তিকর বিতাড়ন-বুদ্ধি!

এই বিপরীত আদর্শের বিরুদ্ধ স্রোতে যখন বাঙালী-সমাজ উদ্দামবেগে আবর্তিত হচ্ছে, সেই সময় একদল মহাপ্রাণ এবং বিচক্ষণ বাঙালী সমাজের ভয়াবহ অবস্থায় বিচলিত হয়ে ধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা তাঁদের সুশাণিত বুদ্ধি দিয়ে এই দুই বিরুদ্ধ আদর্শকে কেটে-ছেঁটে সাময়িক কাজ চালানোর মতো একটা সমন্বয়ী ধর্ম খাড়া করলেন বটে, কিন্তু সমস্ত ধর্মের প্রসূতিকে বোঝাবার জন্যে যে প্রচেষ্টা ও প্রত্যক্ষানুভূতির প্রয়োজন—সেই তপস্যা ও প্রজ্ঞার অভাবে অসংখ্য সম্প্রদায়-সমাচ্ছন্ন হিন্দুধর্মের আপাত-বিরোধী বহুবিচিত্র মতবাদের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও অধিকারিভেদে এই বৈচিত্র্যের উপযোগিতা উপলব্ধি করতে না পেরে শাস্ত্রকে প্রায় বিসর্জন দিয়ে সবাইকে একই পথে পরিচালিত করতে উদ্যত হলেন।

চতুর্দিকে যখন এই প্রচণ্ড হট্টগোল, যখন ধর্মের ব্যাপারে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে কোন্‌টা ত্যাজ্য কোন্‌টা গ্রাহ্য, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না, সেই সঙ্কট-মুহূর্তে বিবেকানন্দের আবির্ভাব।

আর অন্ধ-সংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা একই কথা। সুতরাং যে-সব যুক্তিবাদী ব্রাহ্ম-নেতা সমাজ-সংস্কারে ব্রতী, তাঁদের প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসের উপর আজন্মবিদ্রোহী নরেন্দ্রনাথের আকর্ষণ অনিবার্য। আর সেই কারণে এই আকর্ষণকে নিছক প্রভাব বলাও চলে না—অবিশ্যি প্রভাব মানে যদি কোন বহিঃশক্তি দ্বারা পরিচালিত হওয়া বোঝায়। সে হিসেবে স্বামীজীর তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ কিংবা পাশ্চাত্য-বুদ্ধিবাদের প্রতি আকর্ষণকে প্রভাব না ব'লে, তাঁর স্বভাবের ক্রমবিকাশ-পথে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলাই উচিত, যেহেতু কুসংস্কার-মুক্তির প্রাক্তন পিপাসাই তাঁকে সজ্ঞানে 'ব্রাহ্মসমাজ' বা পাশ্চাত্যদর্শনে এনে উপস্থিত করেছিল।

কিন্তু তাঁর প্রবল সত্যানুরাগ এবং সর্ববন্ধন-অসহিষ্ণুতা তাঁকে 'সমাজে' বেশিদিন টিকতে দেয়নি। যুক্তিপন্থী হলেও যে আত্মনিষ্ঠ, তার পক্ষে সংস্কার-প্রচেষ্টার নেতিপথে বেশিদিন বিচরণ করা সম্ভব নয়; কিংবা সম্ভব নয় অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বর-বিশ্বাসে ইতি টেনে মুখ বুজে পড়ে থাকা। অথচ তিনি 'সমাজে' এমন কোন আচার্যের সন্ধান পেলেন না, যিনি বলতে পারেন, 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্‌—আমি তাঁকে জেনেছি।' তাই কিছুদিনের জন্য নিরুপায় হয়ে সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হলেও স্বামীজীর বিবেকী বুদ্ধির স্বচ্ছন্দ প্রবাহ 'সমাজের প্রণালী-বদ্ধ উপাসনার শৈবাল-শৃঙ্খলকে বরদাস্ত করতে পারেনি। জীবন্ত আদর্শের পিপাসায় এই সময়ে তিনি কত জায়গায় গিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝলেন, জলের সন্ধানে তিনি মরীচিকার পেছনে ছুটেছেন। দেখলেন, ধর্ম সর্বত্র ওষ্ঠাগত, জীবনগত নয়। শুধু উপদেশের বিরস বালি চোখা-চোখা আপ্ত-বাক্যের আলোয় যতই ঝিকমিক করুক না কেন, বুঝলেন তৃষ্ণানিবারণের পানীয় সেখানে নেই, তাদের বাঁধাবুলির বদ্ধ বায়ুতে বিবেকানন্দের মন রীতিমত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তিনি বুঝতে পারলেন না, কোন্‌ অধিকারে তাঁরা ঈশ্বর-প্রসঙ্গ করেন এবং তাঁদের

কথায় বিশ্বাস করতে বলেন! বিশ্বাসের প্রমাণ যখন সাক্ষাৎকার—শাস্ত্রবাক্য বা আপ্তবাক্য-আবৃত্তিতে নয়, তখন তাঁদের নিজেদের বিশ্বাসটাই তো অবৈধ। তাই যাঁরা ঈশ্বর দর্শন না ক'রে তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং করাতে চান, তাঁরাও বিশ্বাসযোগ্য নন; প্রত্যক্ষ প্রমাণ-বর্জিত তাঁদের এ অবৈজ্ঞানিক উপদেশ বিবেকানন্দের বৈজ্ঞানিকসুলভ মনের কাছে আলুনি লাগবেই। মোট কথা, পরোক্ষ আপ্তবাক্যে আশ্বস্ত হয়ে নিজের ধর্মজীবনকে গঠন করবার পাত্র বিবেকানন্দ নন। আপ্তবাক্য অসত্য নয়, কিন্তু রামের উপলব্ধি শ্যামের কাছে সত্য কি?

এ-ক্ষেত্রে যীশু-মুশা কিংবা ধ্রুব-প্রহ্লাদের দোহাই দিলে চলবে না, কেননা তাঁরা ঈশ্বর দর্শন করেছেন তার প্রমাণ কি?

'How can we understand that Moses saw God unless we too see Him?···I cannot take belief as a basis, that is atheism and blasphemy. If God spake to a man in the deserts of Arabia two thousand years ago, He can also speak to me today, else how can I know that He has not died?'[৩]

যাই হোক, তিনি 'ব্রাহ্মসমাজে'র প্রতি আস্থা হারালেন, অথচ তখনও পর্যন্ত এমন কোন বিজ্ঞানীর সন্ধান পেলেন না, যিনি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন—'আমি ঈশ্বরকে দেখেছি এবং তোমাকেও দেখিয়ে দিতে পারি।' স্বামীজীর কথা—হাইড্রোজেন-অক্সিজেনে জল হয় ব'লে চিৎকার পাড়লেই শুনব না, ও-দুটোকে সংযুক্ত ক'রে জলে পরিণত ক'রে দেখিয়ে দাও, তবেই আমি বিচার-বুদ্ধির ফণা নত ক'রব। যতদিন পর্যন্ত কেউ তাঁকে যুক্তি-বিচারের অতীত কোন অস্তিত্বকে দেখিয়ে দিতে না পারছেন, ততদিন যুক্তি-বিচারই তাঁর একমাত্র গুরু। যুক্তি-তর্কে ঈশ্বরের হদিস পাওয়া না গেলেও তিনি জানতেন জীবনের অনেক প্রলাপ এবং প্রহেলিকার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের শরণ নিলেন। এর আগেই তিনি জেভন্‌স্, মিল প্রমুখ বিশিষ্ট তর্কবাদীদের মতবাদ আয়ত্ত করেছিলেন; এখন ডেকার্টের 'অহংবাদ', হিউম ও বেনের 'নাস্তিকতা', স্পাইনোজার 'অদ্বৈত-চিদ্বস্তুবাদ', কোঁতে ও স্পেন্সারের 'অজ্ঞেয়বাদ' এবং 'আদর্শ-সমাজের অভিব্যক্তি,' কাণ্টের 'অজ্ঞানবাদ', ফিকটের 'ব্রহ্মবাদ' প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদের গহন অরণ্যে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে ছিল সুদৃঢ় আস্তিক্যবুদ্ধি এবং দুর্দমনীয় সত্যানুসন্ধিৎসার সংস্কার—তাই পথ হারাননি। এ-সময়ে হার্বার্ট স্পেন্সারের 'The science of the first principle' সংশয়ের তরঙ্গ তুলে তাঁর মর্মগত ধর্মবোধকে বেশ খানিকটা দোলা দিয়েছিল বটে, কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসায় ফুটো ছিল না ব'লে ভরাডুবি করতে পারেনি। হেগেল শোপেনহাওয়ার মিল্ প্রভৃতি দার্শনিকদের তুলনায় স্পেন্সারকে তিনি কম ভ্রান্ত ব'লে মনে করতেন—এই পর্যন্ত, অভ্রান্তবোধে উদরস্থ করেননি। তার প্রমাণ, তিনি ঐ বালকবয়সেই বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিককে তাঁর বিখ্যাত এবং দুর্বোধ্য মতবাদের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রে এক পত্রাঘাত করেছিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক বালকের সেই দুঃসাহসিক সমালোচনা পড়ে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন

৩ 'যদি আমরাও তাঁকে না দেখতে পাই, আমরা কি ক'রে বুঝব যে, মোজেস্ ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন?...আমি বিশ্বাসকে ধর্মের ভিত্তি ব'লে গ্রহণ করতে পারি না—সেটা নাস্তিকতা, ঈশ্বরের অবমাননা! যদি ভগবান্ দু-হাজার বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোন লোকের সঙ্গে কথা কয়ে থাকেন, তিনি আজও আমার সঙ্গে কথা কইতে পারেন; নইলে কি ক'রে জানব, ইতিমধ্যে তিনি মারা যাননি?'
—Inspired Talks, 3rd Ed., Pp.: 198-99

—'Spencer was astonished···by his daring criticisms, and admired the precociousness of his philosophic intellect.' বালকের মধ্যে দার্শনিক বুদ্ধি-বৃত্তির এই অকালবিকাশে অভিভূত হয়ে তিনি একটা উৎসাহোদ্দীপক উত্তরও দিয়েছিলেন। তাতে এমনও নাকি কথা ছিল, গ্রন্থের পররর্তী সংস্করণে তার সমালোচনা অনুযায়ী তিনি নিজের মতবাদের কিছু কিছু পরিবর্তন করবেন। মোটকথা তাঁর সদাজাগ্রত ধর্ম-বুদ্ধি তৎকালীন বুদ্ধি-ধর্মের অন্ধ আনুগত্য স্বীকার করেনি।

আসলে পাশ্চাত্য 'অজ্ঞেয়বাদ', যা 'ব্রহ্মাণ্ডের কেউ স্রষ্টা নেই বা থাকলেও তাঁকে জানা যায় না'—এই মতবাদ প্রচার করে, তার প্রথমাংশ বিবেকানন্দের আস্তিক্য-বুদ্ধির অনির্বচনীয় আকৃতির কাছে এবং শেষাংশ তাঁর জলন্ত পৌরুষের কাছে উপাদেয় হ'তে পারেনি। 'থাকলেও তাঁকে জানা যায় না'—এই অযুক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে স্বামীজীর মতো পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব নিজের অন্তহীন শক্তিমত্তায় অনাস্থাপর হয়ে বসে থাকতে পারে না; থাকেওনি। এ-সময়ে বন্ধুমহলে যতই তিনি নিজেকে 'অজ্ঞেয়বাদী' ব'লে প্রচার করুন, পাশ্চাত্য-বুদ্ধিবাদের এই প্রচ্ছন্ন দুর্বলতাকে তিনি তাঁর অন্তরায়তনে প্রবেশ করতে দেননি। যদি দিতেন, তাহলে 'যাঁকে জানা যায় না', তাঁকে জানবার বৃথা চেষ্টা না ক'রে অচিরেই অজ্ঞেয়-বাদীদের ঐন্দ্রিয়িক আদর্শে আকৃষ্ট হতেন; 'We must enjoy life as it is'—প্রবৃত্তি-ধর্মের এই মহামন্ত্র থেকে কিছুতেই বিচ্যুত হতেন না। কিন্তু এ-সময়ে তাঁর মানসিক ইতিহাসে যত বড় সঙ্কটই উপস্থিত হোক না কেন, একদিনের জন্যও তিনি নিবৃত্তি-মার্গ থেকে, ধ্যান-ধারণা ও অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনের আদর্শ থেকে ভুলেও স্খলিত হননি। অর্থাৎ তিনি যদি সত্যিই পাশ্চাত্য-দর্শনের অনুবর্তী হতেন, তাহলে ইন্দ্রিয়ানুগত আদর্শকে ভুল মনে করতেন না, সংযতেন্দ্রিয় হবার প্রয়োজনটাকেই অবান্তর মনে করতেন; মিলের কথায় দাগা বুলিয়ে 'মানুষের Absolute Truth বোঝবার শক্তি নেই' ব'লে জীবন-সমুদ্রের উপকূলে বসে সূক্ষ্মচিন্তার রুক্ষ বালি দিয়ে একরাশ অন্ধ অনুমানের প্রাসাদ গাঁথতেন, অপরাজেয় পৌরুষের গর্বিত বিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে সেই উত্তাল সমুদ্রের নির্মম তরঙ্গাঘাতে আবর্তিত হ'তে হ'তে তার রহস্যাবৃত গভীরে যাবার দুঃসাহস রাখতেন না।

যাই হোক, এখনও তিনি জলে নামেননি, পাশ্চাত্য-দর্শনের সংশয়পূর্ণ জীবন-জিজ্ঞাসার বিস্তীর্ণ বালুতটে বিষণ্ণমনে পায়চারি করছেন। রত্নানুসন্ধানে বেরিয়েছেন বলেই যুক্তি-সিদ্ধান্তের বেলাভূমি তাঁর শেষ সীমা নয়। বিষণ্ণতা সেইজন্যেই। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর: মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। কন্টেম্পোরারি পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা। পরিবেশক: ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ভূমিকা ৯ পৃষ্ঠা + ১৪৮ পৃষ্ঠা। দাম ৪.৫০।

সাম্প্রতিককালে যে-সব পুরানো লেখকের রচনাবলীর নবসম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে সশ্রদ্ধ মনোনিবেশের যোগ্য লেখক। বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত তাঁর 'The Svami Vivekananda—A Study' গ্রন্থটিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিবেকানন্দ-জীবন-জিজ্ঞাসার কয়েকটি মূলসূত্র সার্থকভাবে আলোচিত। মতভেদের অবকাশ থাকলেও তাঁর মননশীলতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হতেই হয়।

শ্রদ্ধেয় লেখকের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মানস-ইতিহাসের কয়েকটি অমূল্য উপকরণ আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত। সেদিক থেকে উনিশ শতকের কোন সামগ্রিক পরিচয় না থাকায় 'বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর' নামকরণটি পাঠকচিত্তের প্রত্যাশা সম্পূর্ণ করে না। কিন্তু তথ্যনিষ্ঠ আলোচনায়, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং অনলঙ্কৃত ঋজু বাক্‌ভঙ্গীতে ঊনবিংশ শতাব্দী সম্বন্ধে নূতন আলোকপাতের জন্য এ গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশক বাঙালী সংস্কৃতির অনুরাগী-মাত্রেরই সাধুবাদ লাভ করবেন।

সেকালের জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ)-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাফ সাহেবের প্রগতিশীল ভূমিকা এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এদেশের শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে মিশনারীদের দান সম্পর্কে (১) ইংরেজী শিক্ষার সূচনা (২) বীটন সোসাইটি, (৩) ডাফ ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (৪) গ্রামাঞ্চলে মিশনারী শিক্ষার বিস্তার, (৫) মিশনারী শিক্ষার মূল্যায়ন—প্রবন্ধ-কয়টি সাম্প্রতিক কালে উনিশ শতক-সম্বন্ধীয় আলোচনায় অনেক দিক থেকেই সহায়ক হবে।

'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' এবং 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ ও ডাঃ রাজেন্দ্র দত্ত' প্রবন্ধ-দুটিতে বিদ্যাচর্চার প্রতি নব্যবঙ্গের নবজাগ্রত উৎসাহের উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপিত।

মিশনারীদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সাধুবাদ-দানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগঙ্গোপাধ্যায় এঁদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও জাতীয়তাবিরোধী চিন্তাধারা সম্বন্ধেও সদাসতর্ক। 'ইউরোপীয়-ভারতীয় বৈষম্য' নিবন্ধটিতে এ সম্বন্ধে সে-যুগের ঘটনাবলী থেকে নির্মম বিশ্লেষণ লেখকের গুণগ্রাহী অথচ সমদর্শী মননের পরিচয় বহন করে।

'সেকালের পাঠ্যপুস্তক'-সম্বন্ধে আলোচনায় যে গ্রন্থপরিচয় আছে, আমাদের শিক্ষার ইতিহাসে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপকরণ। 'সেকালের ইংরেজী কবিতা' নিবন্ধে বাঙালী কবিদের লেখা ইংরেজী কবিতার রসজ্ঞ আলোচনাটি মনোমোহনের সাহিত্যিক সত্তার সুন্দরতম সাক্ষ্য।

'সেকালের আইন আদালত' নিবন্ধটি এদেশীয় বিচারবিভাগের ধারাবাহিক ইতিহাস-রচনার নানা তথ্যে পরিপূর্ণ।

আপাতদৃষ্টিতে একটু বিচ্ছিন্ন মনে হলেও সব কয়টি প্রবন্ধের মধ্যেই বাংলার নবজাগরণের স্বাক্ষর সত্যসত্যই ফুটে উঠেছে। অথচ লেখক কোন ক্ষেত্রেই বাংলার অহেতুক স্তুতিগৌরবে মুখর হননি। যে বিচারশীল অনুচ্ছ্বসিত প্রজ্ঞার প্রয়োজন এ-জাতীয় রচনায় সবচেয়ে বেশী, শ্রদ্ধেয় লেখক তার সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। নারায়ণ চৌধুরীর ভূমিকাটি সুলিখিত। ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদ—সবদিক থেকে উন্নত রুচির পরিচয় মেলে।

—**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ : শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত। সাহিত্য সদন, এ ১২৫ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১০৫ ; মূল্য ৩৲।

গ্রন্থকার 'ঋষি-বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহ-শালা'র অধ্যক্ষ। বঙ্কিম-প্রতিভা ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সব আলোচনা করেছেন, সেগুলি আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কিশোর-বয়সে বঙ্কিম-রচনার সঙ্গে প্রথম বিশেষরূপে পরিচিত হয়ে ক্রমে তাঁর সান্নিধ্য লাভ ক'রে কিভাবে তাঁর স্নেহধন্য ও আশীর্বাদপূত হয়েছিলেন, সে-সব প্রসঙ্গ আমাদের সামনে তুলে ধরে গ্রন্থকার নিজস্ব চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'...বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন, কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে; তিনিই বাংলা সাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের রাজপথকে প্রতিভা-বলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলন-তত্ত্ব বাংলা সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে...।'

গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থখানি আলোক সম্পাত করেছে। যাঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অধ্যায়গুলি নিয়ে অন্তর্মুখী, তাঁদের কাছে এর সমাদর হবে। আমরা গ্রন্থখানি পড়ে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করেছি, পাঠক-সমাজে আদৃত হবে বলেই মনে হয়।

—**অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

স্বামী বিবেকানন্দ : শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত। প্রকাশিকা—শ্রীমতী বিজয়া দাশগুপ্ত, ২ গবর্নমেণ্ট হাউসিং স্টেট, এণ্টালি, কলিকাতা ১৪। পৃষ্ঠা ৫৯৭, মূল্য ১০৲।

স্বামীজীর জন্মশতবর্ষজয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার অমূল্য জীবন অবলম্বনে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আলোচ্য পুস্তকখানি আয়তন ও ঘটনা-সংস্থান—এই দুইটি দিক হইতে বৈশিষ্ট্য দাবি করিতে পারে। প্রথম স্তরে শৈশব ও কৈশোর জীবন, দ্বিতীয় স্তরে গুরু-শিষ্য-প্রসঙ্গ এবং তৃতীয় স্তরে বরাহনগর মঠ, ভারত-পরিক্রমা, আমেরিকা ও ইওরোপের ঘটনাবলী, ভারতে কর্মবিস্তার প্রভৃতি সুবিন্যস্ত।

পলাশীর যুদ্ধ হইতে এক শতাব্দীকাল ভারতের অধ্যাত্ম-জীবন কিরূপ ছিল, 'পটভূমি'তে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ দ্বারা তাহা দেখানো হইয়াছে। 'বংশপরিচয়ে'র তথ্য-সন্নিবেশে নূতনত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাষার স্বচ্ছতা সর্বত্র বর্তমান। পুস্তকটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

স্বরূপ-সিদ্ধি : শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী বিরচিত। দার্জিলিং যোগচক্র, যোগনিবাস হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬০ ; মূল্য ২·৫০।

স্বরূপতঃ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত হইলেও অতি-অল্পসংখ্যক মানুষেরই স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে। কিভাবে স্বরূপ-সিদ্ধি হইতে পারে, আলোচ্য গ্রন্থে বেদান্ত-মতানুযায়ী তাহা গুরুশিষ্য-প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। তত্ত্বান্বেষীদের নিকট গ্রন্থটি সমাদর লাভ করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

সাদিখাঁর দিয়াড় বিদ্যানিকেতন পত্রিকা ঃ বিবেকানন্দ সংখ্যা (১৯৬৩)। প্রকাশক ঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, পোঃ সাদিখাঁর দিয়াড়, জেলা মুর্শিদাবাদ।

আলোচ্য পত্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 'রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ' সম্পর্ক নির্ধারণ-প্রচেষ্টা। পত্রিকার পরিচালকবৃন্দ এই বিষয়ে বর্তমান বাংলার চিন্তাশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিমত প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পত্রিকাটি সংরক্ষণযোগ্য।

শ্রীগদাধর (স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক সংস্করণ): প্রকাশক: ইছাপুর শ্রীগদাধর উচ্চ বিদ্যালয়, বহরকুলি, বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৫৫।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি লেখা দৃষ্টি আকর্ষণ করে: 'নরেন্দ্রনাথের বুদ্ধি', 'বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব', 'ত্যাগী বিবেকানন্দ', 'যাদুকর বিবেকানন্দ', 'স্বদেশ-প্রেমিক বিবেকানন্দ', 'স্বামীজীর মানবধর্ম', 'পাশ্চাত্যে স্বামীজী', 'বিবেক-দর্শন'।

সরল পঞ্চদশী ঃ সম্পাদক ও প্রকাশক —শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়, ১৪।৩ সি, বলরাম বসু ঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ২৫৪ ; মূল্য ২·৫০।

সংস্কৃত ভাষায় 'পঞ্চদশী' অদ্বৈত বেদান্তের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তত্ত্ববিবেক, ভূতবিবেক, পঞ্চকোষবিবেক, দ্বৈতবিবেক, মহাবাক্যবিবেক, চিত্রদীপ, তৃপ্তিদীপ প্রভৃতি মূল গ্রন্থের বিষয়-বস্তুগুলি আলোচ্য পুস্তকে ১৫টি অধ্যায়ে সরল বাংলায় আলোচিত হইয়াছে, প্রয়োজন অনুসারে সহজ টীকাও দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে বেদান্তশাস্ত্র-প্রবেশের জন্য ইহা বিশেষ সহায়ক হইবে। মূল গ্রন্থের প্রধান শ্লোকগুলি সন্নিবেশিত হইলে পুস্তকটির সৌষ্ঠব বর্ধিত হইত।

উপনিষদের মণিমুক্তা ঃ শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস। প্রকাশক ঃ বিচিত্রা প্রকাশন, ১৮ রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১০২ ; মূল্য ১·৩৫।

উপনিষদ্ জ্ঞানের ভাণ্ডার। আলোচ্য পুস্তকে ছোটদের জন্য এই জ্ঞানভাণ্ডার হইতে গল্পের মাধ্যমে কিছু বিতরণ করিবার প্রয়াস করা হইয়াছে। 'যেমন শিষ্য, তেমন শিক্ষা', 'কে বড় ?', 'দেব-দর্পনাশ', 'নচিকেতার বরলাভ', 'ভৃগুর সিদ্ধিলাভ', 'মৈত্রেয়ীর সম্পদ্', 'জাবাল সত্যকাম', 'তত্ত্বমসি', 'অতিদম্ভের পরিণাম'—সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কাহিনীগুলি তরুণমনে রেখাপাত করিবে।

পাতঞ্জল দর্শন ঃ ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। ৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩, সুদর্শন কার্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পকেট সাইজ, পৃষ্ঠা ৯০ ; মূল্য ৫০ প.।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-শাস্ত্রসমূহের মধ্যমণিতুল্য পাতঞ্জল-যোগদর্শন সাধকমাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় গ্রন্থ। ব্যাসভাষ্য অবলম্বনে সংস্কৃত মূল সূত্রগুলির বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য হইয়াছে। যোগ-সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা-দূরীকরণে সমর্থ হইলে গ্রন্থকারের সাধু উদ্দেশ্য সফল হইবে।

ধর্মের আলো শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ-মজুমদার সম্পাদিত। প্রকাশক ঃ রঘুনাথ লাইব্রেরি, ১৯৫।১এ, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ২১৬ ; মূল্য ৫৲।

যাঁহারা সংস্কৃতে মূলগ্রন্থ-পাঠে অক্ষম, তাঁহারা শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এই গ্রন্থ-পাঠেই সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাতে গীতার সারমর্ম এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জটিল বিষয় সংক্ষেপে ও সরলভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উদ্বাস্তু-সেবা

রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান উদ্বাস্তু-সেবাকার্য পশ্চিমবঙ্গে গেদে এবং পেট্রাপোলে, আসামে গোয়ালপাড়া জেলায় হরিমুরাতে (Harimura) এবং দণ্ডকারণ্যে তিন নম্বর কুরুদ ক্যাম্পে সমভাবে চালাইয়া যাওয়া হইতেছে। ১লা জুন হইতে মিশন বানপুর সীমান্ত-কেন্দ্রে নূতন উদ্বাস্তুদিগকে আহার জোগাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আসামে বোকোতেও (Boko) একটি সেবাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

৪ঠা জুন পর্যন্ত মিশন উদ্বাস্তুদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্য বিতরণ করিয়াছেন:

চিড়া ১২১ মণ ১২ সের, গুড় ৪৬ মণ ১১ সের, তিন টিন বাতাসা, ৩০০ কে.জি. বিস্কুট ও ঐ-জাতীয় দ্রব্য, ৩,০৬২ খানা ধুতি, ২,৬৭৯ খানা শাড়ি, ৪,২৩৪টি জামা, ৬টি কম্বল, ৭২৫টি এলুমিনিয়ম ডেকচি, ৩৭৭ এনামেল থালা, ৫৬০টি এনামেল মগ, ৩৬৫টি হ্যারিকেন লণ্ঠন, এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক পুরাতন জামা-কাপড়। উপরন্তু পেট্রাপোল ও হিঙ্গলগঞ্জে রান্না-করা খাদ্য বিতরণ করা হইত। আলোচ্য সময়মধ্যে ঐ দুই কেন্দ্রে ৭০,০৩০ জনকে খাওয়ানো হইয়াছিল। হরিমুরাতে ৪,৬৭৩ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এই বাবদে ঔষধের জন্য ব্যয়িত হয় ৮,১৫০৲। কুরুদ ক্যাম্পে প্রধানতঃ হর্লিক্স, গুঁড়া দুধ, বার্লি, 'মাল্টি-পার্পাস' খাদ্য-পুরিয়া এবং 'মাল্টি-ভিটামিন' বড়ি বিতরণ করা হয়। জামা-কাপড়ও দেওয়া হইতেছে।

বানপুর কেন্দ্রে ১. ৬. ৬৪ হইতে ৭. ৬. ৬৪ পর্যন্ত ৬ মণ চিড়া, ২॥ মণ গুড় এবং ১৪ প্যাকেট বিস্কুট বিতরণ করা হইয়াছে এবং নূতন উদ্বাস্তুদিগের ৫,২০০ জনকে রান্না-করা খাদ্য দেওয়া হয়।

দেশের সহৃদয় ব্যক্তিদের নিকটে এই সেবা-কার্যে অর্থসাহায্য-দানের জন্য আবেদন করা হইয়াছে। দান, যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, 'সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড়, (হাওড়া)' এই ঠিকানায় পাঠাইলে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করা হইবে।

কার্যবিবরণী

কোয়েম্বাতুর: পেরিয়ানাইকেনপলয়ম্ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৬২-৬৩ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। বি. টি. কলেজের ৭১ জন পরীক্ষা দেয়, ৫১ জন পাস করে। নাগরিক জীবন শিক্ষার জন্য দশ দিন ক্যাম্প করা হয়। এম. এড পাঠ করিবার ৮জন ছাত্র ছিল। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে নানারূপ আলোচনা ইত্যাদিতে বাহিরের শিক্ষকগণও অংশ গ্রহণ করেন। একটি বিজ্ঞান-মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়, ইহাতে ৫০টি স্কুল হইতে ৭৫০টি দ্রষ্টব্য দ্রব্য আসে।

৪৮টি স্কুলে পুস্তক দান করা হয় এবং ১৬টি স্কুলে পুরাতন পুস্তকের পরিবর্তে নূতন পুস্তক দেওয়া হয়। কোয়েম্বাতুর, সালেম এবং নীলগিরি জেলায় কতিপয় স্কুল পরিদর্শন করা হয়, উদ্দেশ্য এই সকল স্কুলের প্রয়োজন ও উন্নতির উপায় নির্ধারণ করা।

আবাসিক বহুমুখী বিদ্যালয়ে কারিগরী এবং কৃষিবিজ্ঞান পড়িবার ব্যবস্থা আছে। স্কুলে ১৮৬ জন ছাত্রের মধ্যে ৩০ জন অবৈতনিক। ছাত্রদিগকে শিক্ষামূলক ভ্রমণে লইয়া যাওয়া হয়।

বেসিক ট্রেনিং বিদ্যালয়ে প্রথম বাৎসরিক শ্রেণীতে ৪০ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৩৯ জন শিক্ষার্থী ছিল। ৩৯ জন পরীক্ষা দেয় এবং সকলেই উত্তীর্ণ হয়।

উচ্চ বেসিক স্কুলে ১৯ জন শিক্ষক এবং ২০৭ বালিকা সহ ৫৮০ জন শিক্ষার্থী ছিল। ৫০টি দরিদ্র পরিবারের শিশুকে দ্বিপ্রহরে খাদ্য দেওয়া হয় এবং ১০০ বালক ও ৪৫ বালিকাকে পোশাক দেওয়া হয়। একটি শিশু-শিক্ষালয় (Nursery school) খোলা হইয়াছে, ইহাতে ৩ হইতে ৪॥ বৎসর-বয়স্ক ২৬টি শিশু আছে।

স্বামী শিবানন্দ উচ্চ বিদ্যালয় দুই বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। ৫৬ বালক ও ১৬ বালিকা এখানে পড়ে, তন্মধ্যে ৪৭টি বালক এবং ৮ বালিকা অবৈতনিক ছিল। যাহারা গৃহে পড়াশুনা করার সুযোগ পায় না, তাহারা স্কুলের পূর্বে ও পরে শিক্ষকদের তদারকে এখানে পাঠ করার সুযোগ পায়।

'কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশনে' শিক্ষকদিগকে শারীর শিক্ষা দেওয়া হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে তিনটি এইরূপ কলেজের মধ্যে ইহা একটি।

এতদ্‌ব্যতীত রুর‍্যাল ইন্‌স্টিট্যুট, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, কৃষিবিদ্যালয় ও রুর‍্যাল হায়ার এডুকেশন কলেজ পরিচালিত হইতেছে।

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবা-প্রতিষ্ঠান: সেবাপ্রতিষ্ঠানের ১৯৬২ খৃঃ এপ্রিল হইতে ১৯৬৩ মার্চ পর্যন্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্বনাম ছিল 'শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান'। ১৯৫৭ খৃঃ ইহাকে নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য একটি সাধারণ হাসপাতালে পরিণত করা হয়। বর্তমানে প্রায় ৩৫০ জন রোগী থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে, তন্মধ্যে একতৃতীয়াংশ রোগী বিনা-খরচে রাখা হয়।

এই হাসপাতালে সর্বপ্রকার আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আছে। নার্সের কাজ ও ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে উক্ত বিভাগ দুটিতে ১০৫ জন শিক্ষার্থিনী ছিল।

বাহিরের সকল রোগী এবং হাসপাতালের শতকরা ৫৫ জন বিনা-পয়সায় চিকিৎসিত হয়। এখানে একটি গণস্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। চারিদিকে এক মাইলের মধ্যে নার্স পাঠাইয়া মায়েদের উপদেশাদি দেওয়া হয়। গ্রাম্য-গণস্বাস্থ্যকার্যসূচী অনুযায়ী কলিকাতার দক্ষিণে ৭ মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম হাতে লওয়া হইয়াছে।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে স্নাতকোত্তর গবেষণা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে নানা গবেষণা সফলতার সহিত চালানো হইয়াছে এবং হইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলেজ অব মেডিসিন' ১৯৬৩ খৃঃ ফেব্রুআরি হইতে এই প্রতিষ্ঠানকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য মনোনীত করিয়াছে। এই অংশটিকে 'বিবেকানন্দ ইন্‌স্টিট্যুট' নাম দেওয়া হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কেন্দ্র। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। 'ভগবদ্‌গীতা' এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' ক্লাস যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

সেপ্টেম্বর ১৯৬৩: পথ কি? বেদান্ত—মুক্তির ধর্ম; সর্বভূতে ঈশ্বর-দর্শন, ত্রাণকারী নিঃস্পৃহতা অভ্যাস।

অক্টোবর: ঈশ্বরকে মাতা-জ্ঞানে আরাধনা; ধর্মীয় সংঘর্ষ: হিন্দু মতবাদ;

আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আনন্দ; ভগবদ্গীতার বাণী।

নভেম্বর: মনসংযমের উপায়; মৃত্যুই কি শেষ? যোগ ও ধ্যান অভ্যাস; ধর্ম ও সামাজিক মূল্য: হিন্দু মতবাদ।

ডিসেম্বর: মনসংযমের উপায়; শ্রীশ্রীমা কি শিক্ষা দিয়াছিলেন? আধ্যাত্মিক বিকাশ; কর্মজীবনে বেদান্ত; যীশুখৃষ্ট কি শিক্ষা দিয়াছিলেন? শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের উপায়।

উৎসব-সংবাদ

মালদহ: শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ৪ঠা হইতে ৭ই জুন পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মবার্ষিকী ও আশ্রমের বার্ষিক উৎসব সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হয়। পশ্চিম দিনাজপুর ও গ্রামাঞ্চল হইতে বহু ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন।

প্রথম দিবস স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক শ্রীচৈতন্য-দেবের লীলা-গীতি অনুষ্ঠিত হয়। পরের তিন দিন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব জীবন ও বাণী সম্বন্ধে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা করেন।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মতিলাল তিন দিনই রাত্রিতে প্রাঞ্জল ভাষায় সঙ্গীতের সুরে মহাভারতের বিভিন্ন উপাখ্যান আলোচনা দ্বারা সহস্র সহস্র নরনারীকে আনন্দ দান করেন। সমাপ্তিদিবসে বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ, হোম এবং অপরাহ্নে শ্রীকানাইলাল হালদার কর্তৃক রামায়ণ গীত হয়।

বালিয়াটী (ঢাকা): শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ৮ই হইতে ১০ই জ্যৈষ্ঠ তিনদিনব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রথম দিন শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও ভজনসঙ্গীত, দ্বিতীয় দিন 'কথামৃত'-পাঠ ও নগর-কীর্তন, শেষ দিন রবিবার ষোড়শোপচারে পূজা, গীতা ও চণ্ডীপাঠ এবং দরিদ্রনারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠিত হয়। ২,০০০ নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে আয়োজিত সভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী সুন্দরভাবে আলোচিত হয় এবং অবৈতনিক বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়।

বক্তৃতা-সফর

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত ২৩শে ফেব্রুআরি হইতে ২৭শে এপ্রিল পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার উপলদা বিদ্যালয়, আবদুল্লাপুর, বাঘাস্তি বিদ্যালয়, দশগ্রাম বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপাড়ী বিদ্যালয়, নারায়ণবাড়, তিলন্তপাড়া; উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি ও কার্সিয়াং বেদান্ত আশ্রম, ভরত-নগর, নিউজলপাইগুড়ি, দেশবন্ধুপাড়া, মহানন্দা-পাড়া, মেখলীগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চৌধুরীহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ফালাকাটা, কুচবিহার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম; আসামে ধুবড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইত্যাদি অঞ্চলে 'জাতীয় জাগরণে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও আচার্য বিবেকানন্দ', 'শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ', 'বিশ্বসভ্যতায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান', 'বিশ্বধর্মচিন্তায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দান' ইত্যাদি বিষয়ে মোট ৪১টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৩২টি ছায়াচিত্রযোগে প্রদত্ত হইয়াছে।

দেহত্যাগ-সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত জুন মাসেও সঙ্ঘের তিনজন সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করিয়াছেন:

স্বামী অবধূতানন্দ: গত ২০শে জুন সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটের সময় স্বামী অবধূতানন্দ (বলাই মহারাজ) ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে বারাণসী সেবাশ্রমে ৭৩ বৎসর

বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯০৮ খৃঃ বারাণসীতে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯২১ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। সারা জীবন তিনি বারাণসী সেবাশ্রমেই ছিলেন।

স্বামী অনুভবানন্দঃ গত ২২শে জুন রাত্রি ১টা ৫৫ মিনিটের সময় স্বামী অনুভবানন্দ (রোহিণী মহারাজ) বার্লোগঞ্জ আশ্রমে ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৩ই জুন সকালে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িলে চিকিৎসকগণ হৃদ্‌রোগ বলিয়া অনুমান করিয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন, ২১শে পুনরায় আক্রান্ত হইয়া সজ্ঞানেই তিনি শেষ গঙ্গাজল গ্রহণ করেন।

১৯১৬ খৃঃ ঢাকা আশ্রমে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯২০ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। তিনি খুব কঠোরতাপরায়ণ সন্ন্যাসী ছিলেন এবং বহু বৎসর হিমালয়ে অতিবাহিত করেন। বার্লোগঞ্জ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি ইহার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

স্বামী পদ্মনাভানন্দঃ গত ২৩শে জুন রাত্রি ১টা ৩০ মিনিটের সময় স্বামী পদ্মনাভানন্দ ৫৯ বৎসর বয়সে কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় চার মাস পূর্বে ডায়াবিটিস-জনিত নানা ব্যাধির জন্য তাঁহাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। ২০শে জুন তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়।

তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২৮ খৃঃ ত্রিচুর আশ্রমে তিনি যোগ দেন এবং ১৯৩৮ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট সন্ন্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। অক্লান্তকর্মা এই সন্ন্যাসী ১৯৪৪ খৃঃ হইতে বেলুড় সারদাপীঠের কর্মী ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

এক মাসের মধ্যে তিনজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ হওয়ায় সঙ্ঘ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাঁহাদের দেহনিমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে চিরশান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-সংবাদ

কল্যাচক (মেদিনীপুর)ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে ২৬শে হইতে ২৮শে মে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিন সকালে পূজার্চনা, ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা, সূচিশিল্প-প্রদর্শনী, প্রসাদ-বিতরণ, ধর্মসভা, আবৃত্তি ও কবিতাপাঠ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। শেষের দুই দিন রামায়ণগানের ব্যবস্থা ছিল।

ছোটসরসা-পাইকাড়া (হুগলি)ঃ প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ৩১শে মে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, সাধারণ সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গ্রামবাসিগণ উৎসাহ-সহকারে যোগদান করেন। অপরাহ্ণে স্বামী জীবানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচিত হয়।

কালীঘাটঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের উদ্যোগে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত বিবিধ অনুষ্ঠান-সহায়ে তিনদিনব্যাপী উৎসব আয়োজিত হয়। ২৩শে মে শনিবার মহতী জনসভায় স্বামী জীবানন্দ 'যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

পরলোকে

যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী-নিবাসী প্রবীণ শিক্ষাব্রতী যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (৯ই জুন) কলিকাতা সুখলাল কারনানি হাসপাতালে পাকস্থলীর ক্ষতরোগে ৬৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন-পরিচালিত বিদ্যাভবনের কার্যভার গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ বৎসরের সাধনায় তিনি উহাকে আদর্শ বহুমুখী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করেন। তাঁহার মধুর স্বভাব ও ধর্মপরায়ণ জীবনের জন্য ছাত্র ও অভিভাবকগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি মী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

সুরমা রায়ঃ গত ১৩ই মে শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা সুরমা রায়, ৭২ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তিনি পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ-নিবাসী শ্রীকালীপদ রায়ের সহধর্মিণী ছিলেন। জয়রামবাটী ও উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট কিছুকাল থাকিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল। এখন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের চরণকমলে চিরতরে মিলিতা হইলেন।

ললিতচন্দ্র সান্যালঃ গত ৩০শে জুন রাত্রি ১০টা ৫৫ মিনিটের সময় বিশিষ্ট ভক্ত ললিতচন্দ্র সান্যাল ৭৪ বৎসর বয়সে উত্তর কলিকাতার ভূপেন্দ্র বসু এভেন্যু-স্থিত ভবনে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বার্ধক্যজনিত ব্যাধিতে তিনি কিছুদিন যাবৎ ভুগিতেছিলেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। কর্মজীবনে রাজনীতি ও সমাজসেবামূলক কার্যে ব্রতী থাকিয়াও তিনি সাধনভজনে ব্যাপৃত থাকিতেন। পূর্ববঙ্গে তাঁহাদের বাড়ি শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ প্রমুখ অনেকের পদধূলিতে ধন্য। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল।

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্যঃ গত ২৯শে জুন প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের হৃদ্‌রোগে পরলোকগমনে আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি। তিনি উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক।

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীঃ গত ১০ই জুলাই রাত্রি ১১টার সময় বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার ৩নং ফেডারেশন স্ট্রীটস্থ বাসভবনে ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার প্রচারকল্পে তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টা চিরস্মরণীয়। তিনি বহু সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'প্রাচ্য-বাণী'র মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করাইয়া পণ্ডিতমণ্ডলী ও সর্বসাধারণের বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন। তিনি ১২০ খানি সংস্কৃত-বিষয়ক গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। উদ্বোধন-পত্রিকায় তাঁহার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট সুপরিচিত। ডক্টর চৌধুরী বিনয়ী ও উদারভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের তথা ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে স্থান শূন্য হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নয়। তাঁহার আত্মা শাশ্বত শান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তিঃ!! ওঁ শান্তিঃ!!!



কথাপ্রসঙ্গে

‘জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্’

জন্মহীনের কি করিয়া জন্ম সম্ভব? অনাদি অনন্ত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম বা ভগবান্ কি করিয়া সান্ত সাকার হইয়া মনুষ্য-শরীরে জন্মগ্রহণ করেন, কি করিয়াই বা আপাতদৃষ্টিতে মানুষের মতো জীবন যাপন করেন? এই প্রশ্ন আধুনিক তথাকথিত যুক্তিবাদী মানব-মনে অহরহ উঠিতেছে, এবং সন্তোষজনক উত্তরের অভাবে অধিকাংশ মানবই অবতারবাদে বিশ্বাস করিতে চান না বা পারেন না।

অবতারবাদে যে বিশ্বাস করিতেই হইবে, অবতারবাদ যে ধর্মজীবন বা আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্য অঙ্গ তাহা নয়, সমগ্র উপনিষদে অবতারবাদের কোন প্রসঙ্গ কোথাও নাই, কিন্তু উপনিষদের সারভূত শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ধ্বনিত হইয়াছে:

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥

বিভিন্ন টীকাকার ভাষ্যকার ইহার নানা প্রকার টীকা-ভাষ্য করিয়াছেন। আধুনিক গবেষকগণ হয়তো এই-জাতীয় সকল শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। তথাপি যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই দেখা যায়—লোকোত্তর এক মহামানবের আবির্ভাব, যাঁহার জন্ম জীবন ও কর্ম আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়া মাপা যায় না, আমাদের যুক্তি দিয়া বোঝা যায় না, অথচ তাঁহার জীবন নিজস্ব সরল গতিতে বহিয়া যায়; মানবজাতির একাংশ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সীমা হইতে অসীমের পথে যাত্রা শুরু করে।

সকলেই যে তাঁহাকে ধরিতে বা বুঝিতে পারিবে, তাহা সম্ভব নয়। মনুষ্য-শরীরে যখন তিনি অবতীর্ণ হন, অহঙ্কারে মূঢ় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ধরিতে বুঝিতে পারে না, সরল পবিত্রহৃদয় ব্যক্তিগণই যুক্তির অতীত এক বিশ্বাসের আলোকে তাঁহার আভাসমাত্র পান। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যুক্তি কি সরল, দৃষ্টান্ত কী হৃদয়গ্রাহী!

‘ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান্ হন, তবে তিনি সাকার হ'তে পারবেন না কেন? তিনি তাঁর সারবস্তুটুকু নিয়ে ভক্তি-ভক্ত আস্বাদন করতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। সবাই তাঁকে ধরতে পারে না,—এও তাঁরই ইচ্ছা।’ ‘অবতার গাভীর বাঁট’—বাঁট দিয়াই গাভীর সারবস্তু দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, অবতারের মাধ্যমে ঈশ্বরের সারবস্তু—ভাব ভক্তি প্রেম আনন্দ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

শ্রীভগবানের এই নরলীলা যুগে যুগে চলিয়াছে, এই আবির্ভাব ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়—তবে সমধিক। যে-সব দেশে পবিত্রহৃদয় নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে, সেখানেই শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে—ইহা অতীতের কোন কাহিনী নয়, ইহা চিরন্তনের আশ্বাসবাণী। ‘ভগবান্ কয়েকদিন ধরিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়া তারপর হইতে আজ পর্যন্ত নিদ্রা যাইতেছেন—ইহা গুহামানবের ধারণা। শ্রীভগবান্ অতন্দ্র দৃষ্টিতে এই জগৎ পালন করিতেছেন, এবং প্রয়োজনবোধে দেহধারণ করিতেছেন। তবে তাঁহার জন্ম কর্ম সাধারণ মানুষের মতো নয়—তাঁহার জন্ম কর্ম দিব্যভাবাপন্ন। নিঃস্বার্থভাব-সহায়ে হৃদয় পবিত্র না হইলে আমরা কখনও এই দিব্যভাব বুঝিবার আশা করিতে পারি না। শান্ত পবিত্র হৃদয়েই—ঈশ্বরভাব ধরা পড়ে, ভগবৎ শক্তি স্ফুরিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাবের পটভূমি

স্বামী অজজানন্দ

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকগণের মধ্যে নানা মতভেদ দেখা যায়। কাল-নির্ণয়ের বিভিন্নতা থাকিলেও যুগ-প্রয়োজন কিন্তু কেহই অস্বীকার করেন নাই। ভারত-ইতিহাসের, তথা সমগ্র মানব-সভ্যতার অতীব সঙ্কটাকুল এক বিবর্তন-প্রবাহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যে অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ, এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণ সকলেই একমত। গাণিতিক বিচারে কৃষ্ণাবির্ভাবের কালকে কিঞ্চিৎ কুহেলিকাচ্ছন্ন বোধ হইলেও ঐতিহ্যের গৌরবে এবং সাংস্কৃতিক মহিমায় অতীত সেই কালের দীপ্তি সত্যই অতুলনীয়। ইতিহাস কখনই গণিতের হিসাব নহে, আবার উহা জ্যোতিষশাস্ত্রও নহে। ইতিহাস সংস্কৃতির স্বাক্ষর। ইতিহাস শুধুমাত্র অতীতের পরিসংখ্যান নহে, ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক ও প্রেরক। তাই দেখি—যে-জাতির সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে নাই, তাহার ইতিহাস বলিয়াও কিছু নাই। আর ইতিহাস যেখানে বিলুপ্ত, ঐতিহ্যও সেখানে অবরুদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাবের সন-তারিখের হিসাব লইয়া সময়-ক্ষেপণ অপেক্ষা তাঁহার অত্যাশ্চর্য জীবনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা অধিকতর উপকৃত হইব। ঐতিহাসিক সেই যুগ-প্রয়োজনই তাঁহার জীবনালেখ্যের যথার্থ পটভূমিকা। আচার্য বিবেকানন্দের উক্তিবিশেষ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণ-জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর কথা লইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না; তদীয় জীবনের মুখ্য অংশ যাহা, তাহাই অবলম্বন কর।…মানবভাষায় এরূপ আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই।'

কোন দেশ বা জাতি, সমাজ বা সভ্যতা কখনও একদিনে কিংবা একযুগে গড়িয়া উঠে না। নানা উত্থান-পতন ও বিপ্লব-বিবর্তনের মধ্য দিয়াই উহার গতিপথ। দিন ও রাত্রির সমন্বয়ে পরিপূর্ণ একটি দিবস; উত্থান ও পতনের পারম্পর্যে পূর্ণ একটি সভ্যতা বা সংস্কৃতি। দিনান্তে আকাশে যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসে, আবার ধীরে ধীরে উহা যখন গভীর রাত্রির রূপ ধরে, উহাতে কি তখন শুধু অন্ধকারের ঘোরই থাকে? রাত্রির তপস্যান্তে দৃপ্ত অরুণোদয়ের প্রতিশ্রুতিও থাকে উহাতে। সমাজ ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও এই একই সত্য। যখনই বিপ্লব ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করে, তখনই শান্তি এবং সামঞ্জস্যের নব নব আলোকপথও মানুষের নিকট উদ্‌ঘাটিত হয়। প্রকৃতির ইহাই নিয়ম।

সনাতন ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ। এক-এক জাতির প্রাণকেন্দ্র এক-একটি বস্তুতে বা ভাবে। ভারতের প্রাণকেন্দ্র ধর্মে। ধর্মকেন্দ্রিক এই জাতির জীবনধারা যখনই কোন কারণে বিপর্যস্ত বা সংক্ষুব্ধ হইয়াছে, তখনই সকল তরঙ্গ-ক্ষোভের ঊর্ধ্বে কোন দিব্যপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাঁহার এক হস্তে দুষ্টের জন্য শাসন-দণ্ড অপর হস্তে থাকে জীব-কল্যাণের অমৃতভাণ্ড। কখনও বা আবার আসিয়াছেন উভয় হস্তেই আপামর সকলের জন্য মঙ্গল-আশ্বাস ও অভয়-আশিস্ লইয়া। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য,

শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রমুখ দেব-মানবের চরণ-স্পর্শে এই ভাবেই যুগে যুগে ভারতের মাটি পবিত্র হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের অতি ঘোর এক তমসাচ্ছন্ন যুগের ভয়াল চিত্র স্মরণ করিয়া আজও আমরা শঙ্কিত হই। অরাজকতা, দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা তখন সমাজের সর্বস্তরে। রাজারা সেদিন রাজধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সমাজ-শিক্ষকেরা মোহাচ্ছন্ন হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। নারীর মর্যাদা লইয়া ভোগীর তামাসা চলিতেছে, কুৎসিত লোকাচার ধর্মের স্থান দখল করিয়া তাণ্ডবলীলা করিতেছিল। শাস্ত্র-ন্যায়-নীতি দেশ হইতে তখন অন্তর্হিত। গুণী ও মানীর সম্ভ্রমকে অর্বাচীনের দল হাসিয়া উড়াইতেছে। অসহায় নিপীড়িতের আর্তক্রন্দন আকাশে-বাতাসে। কোথায় ধর্ম! কোথায় ঈশ্বর!! স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পদপেষণে প্রজাসাধারণ সেদিন সর্বপ্রকারে পরাধীন। সমাজে, পরিবারে, বর্ণে, আচারে, ধর্মে মানুষ সর্বাবস্থায় শৃঙ্খলিত। প্রজাপীড়ন, দিগ্বিজয় আর কাম-কাঞ্চন-বিলাসই হইয়া উঠিয়াছিল নৃপতিগণের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য!

বিশেষ—ক্ষাত্রশক্তির এ-হেন অধঃপতন সম্ভবতঃ অন্য কোন যুগে আর দেখা যায় নাই। অহঙ্কারী ক্ষত্রিয় মনে করিত, 'নাস্তি লোকে পুমানন্যঃ'—জগতে আমি ভিন্ন আর কেহ পুরুষ নাই। শক্তিমদে উন্মত্ত নৃপকুল সমগ্র মেদিনীকে নির্মমভাবে যেন চষিয়া ফেলিতেছিলেন। নরহত্যা তখন 'রাজধর্ম'। আর এই বিকট রাজধর্মের পুণ্যবল লইয়াই মগধাধীশ জরাসন্ধের ন্যায় প্রবলপরাক্রম নৃপতি শঙ্কর-উপাসনায় ব্রতী ছিলেন। ধর্ম ও রাজনীতির নামে তিনি করদ-মিত্র রাজন্যবর্গকে বিনা-অপরাধে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। অভিপ্রায় ছিল, দেবতার পূজায় নরবলি দিবেন জরাসন্ধের অত্যাচার ভাষায় অবর্ণনীয়। অভিনব ধর্মাচরণ এই জরাসন্ধের! দেবপ্রীতির জন্য নরবলি!

অহঙ্কার ও অত্যাচারের প্রতিমূর্তি চেদিরাজ শিশুপালের জীবনব্রত ছিল ভগবদ্-বিদ্বেষ প্রচার করা, সর্বজনমান্যকে লাঞ্ছিত করা, আর অধর্মের প্ররোচনা দেওয়া।

বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিরাতের অপদার্থ রাজা পৌণ্ড্রকের স্বৈরাচার এবং ভগবানের প্রতি ব্যঙ্গ-ব্যবহার সমাজের কলঙ্কস্বরূপ।

অধঃপতিত রাজশক্তির অকর্মণ্যতার ফলে তদানীন্তন ভারতের রাষ্ট্রনীতিক আকাশকে অতিশয় মেঘাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ভারতের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে রাজশক্তি ক্রমশঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ঐক্যবদ্ধ রাজশক্তির মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত পড়িতে থাকায় বৈদেশিক শত্রুর অনুপ্রবেশের পথও তখন বেশ সুগম হইয়া উঠিতেছিল।

রাজন্যবর্গ অতিশয় ক্রূর ও দুশ্চরিত্র হইয়া পরস্পরের প্রতি তখন অতি ঘৃণ্য আচরণ করিতেছিলেন। মহাভারতের ভাষায় সেই অবস্থার বর্ণনা সত্যই রোমাঞ্চকর:

'সিংহ নিদ্রিত হইলে যেমন কুকুরের দল মিলিত হইয়া ডাকিতে থাকে, এই রাজারাও আজ তাহাই করিতেছেন। দেশব্যাপী কোলাহলে প্রসুপ্ত ভারত-সিংহ কবে জাগিবে, ইহা ভাবিয়া শান্তিকামী সাধারণ মানুষ সেদিন ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিল।'[১]

সেদিনের বিপ্লব শুধু রাষ্ট্রিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্মে, নীতিতে, বুদ্ধিতে—সর্বত্রই বিধ্বংসী বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। ভারতের আকাশ সেদিন দুর্যোগ-সমাচ্ছন্ন—চারিদিকেই ঘনঘটা। মথুরাধিপতি দর্পী কংস আপন

১ মহাভারত, সভাপর্ব—৩৯।৭

পিতাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। 'পিতৃ-দেবো ভব' যে-জাতির উপনিষদ্-মন্ত্র, সেই জাতির একজন পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্তী ছিলেন কংস! স্বার্থান্ধ দুর্যোধন ক্ষমতা গর্বে স্পর্ধিত হইয়া পাণ্ডবভ্রাতাদের নিঃস্ব ভিক্ষুক করিয়াছিলেন। প্রজাপালন রাজধর্ম, প্রজানুরঞ্জন রাজব্রত—ইহাই ছিল একদা এ-দেশের রাজনীতি! তখন কোথায় সে রাজনীতি? আর সমাজধর্মই বা কী? প্রগল্‌ভ পুত্র দুর্যোধনও বৃদ্ধ পিতাকে ধর্মোপদেশ দিতে প্রয়াসী, ইহাও কী নিদারুণ পরিহাস! কপটপুত্র অন্ধ পিতার নিকট ভ্রাতৃবিরোধের জন্য সদম্ভে ধর্মের দোহাই দিতেছেন:

'পিতা, যাহার প্রখর বুদ্ধি নাই, অথচ কেবল বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, সে শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম বুঝিতে পারে না। সুরক্ষিত খাদ্যের মধ্যে হাতা ডুবিয়া থাকিয়াও আহারের রস বুঝিতে সক্ষম নহে।'[২] দুর্যোধন উপযুক্ত ধর্মোপদেষ্টাই বটে! কী অপূর্ব ধর্ম-অভিনয়!

ধন-জন ও শক্তিমদে প্রমত্ত এবং স্বীয় সৈন্য-দলদ্বারা বার বার ধরিত্রীকে নিপীড়নকারী উৎপথগামী এই রাজকুলকে বিধাতা কতদিন আর ক্ষমা করিবেন! কপটাচার, ভীরুতা, অন্যায় ও দুর্নীতির যে ভীষণ প্লাবন চলিতেছিল, তাহা হইতে অতি অল্প লোকই রক্ষা পাইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পরম ধার্মিকও দ্যূত-ক্রীড়ায় নিজের ভ্রাতা ও সহধর্মিণীকে অর্থের ন্যায় পণ রাখিতে পশ্চাৎপদ হন নাই এবং সমাগত সজ্জনমণ্ডলীর ধিক্কার-বর্ষণেও তাঁহার বক্ষ অকম্পিত ছিল। সভামধ্যে নারীর বস্ত্রাকর্ষণ করিয়া অবমাননা সুসভ্য সমাজের পক্ষে কতখানি কলঙ্কের তাহা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নহে। লক্ষ্য করিবার বিষয়—সেই সভাতে রাজ্যের জ্ঞানী গুণী ও সম্ভ্রান্ত পুরুষ—সকলেই উপস্থিত! ততোধিক লজ্জাকর বিষয়, প্রকাশ্য সভায় এই কুকীর্তি-সম্পাদনের আদেশ প্রদান করেন স্বয়ং বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ! বিশ্বের বীর-সমাজের মস্তক এ-কথা স্মরণ করিয়া চিরদিনই লজ্জায় অবনত হইবে। ভীষ্মদ্রোণ-প্রমুখ বীর-পুরুষগণ ইতিহাসের এই কলঙ্কিত দৃশ্যে নির্বাক্ দর্শকমাত্র ছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত বীরমণ্ডলীর দুর্জয় পৌরুষ সেদিন কোথায় লীন হইয়াছিল—কে জানে! অতিশয় মহিমান্বিত বিরাট যদুবংশও নিছক মদ-মোহে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল।

এইসব ভীষণ ঘটনাবলী কল্পনা করিতেও আজ আমরা শিহরিয়া উঠি। অভূতপূর্ব এই সমাজ-বিপ্লবের তমিস্রার মধ্যে ধর্মপ্রাণ মানুষের বুক হাহাকারে ফাটিয়া যাইতেছিল: এ-দুঃখ-নিশার অবসান কি তবে হইবে না? ধরিত্রী-জননী আর বুঝি এ পাপভার বহিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার করুণ ক্রন্দন-ধ্বনিতে গগন পবন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। শ্রীশুকদেব মর্মস্পর্শী ভাষায় মহারাজ পরীক্ষিৎকে এই কথাই বর্ণনা করিয়াছেন:

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না রুদন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং স্বমবোচত॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।১।১৭-১৮)

—গর্বিত রাজরূপী দানবের অসংখ্য অনুচরদের পদভারে অভিভূতা ধরিত্রী ব্রহ্মার শরণাপন্না হইলেন। দুঃখকাতরা পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে অশ্রু-প্লাবিত গণ্ডে স্বয়ং বিভুর নিকট আর্তি জানাইতে লাগিলেন।

উৎপীড়নকারী রাজশক্তিকে আয়ত্তে আনিতে সক্ষম এবং কক্ষচ্যুত সমাজ-গতিকে পুনরায়

২ ঐ সভাপর্ব—৫৩।১

স্বকক্ষে নিয়ন্ত্রিত করিতে সুদক্ষ কোন ব্যক্তি বা শক্তি তখন ভারতবর্ষে ছিল না। অধর্মকে দৃঢ়-হস্তে দমন করিয়া ধর্ম-সংস্থাপন করিবার মতো ঐশী পুরুষ তখন কোথায়? মানুষের অন্তরাত্মা রুদ্ধ ক্রন্দনে সেদিন বার বার ভাঙিয়া পড়িতে-ছিল। শ্রীমদ্ভগবতে ইহাই ধরিত্রীর রোদন এবং অত্যাচারী রাজাদিগকে দৈত্যরূপে ও রাজ-সৈন্যবাহিনীকে ধরার ভাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

আর্ত অবনীর অশ্রুপাতে জগদীশ্বরের আসন অবশেষে টলিয়া উঠিল। অন্ধ রাত্রির অবসান এতদিনে বুঝি আসন্ন। ব্যথাহত মানুষ যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে। 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' তাঁহার আবির্ভাবের কাল কি তবে পূর্ণ হইতে চলিল? এতবড় ধর্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব, রাষ্ট্র-বিপ্লব, নীতি-বিপ্লব, যুদ্ধ-বিপ্লব জগতের ইতিহাসে আর কদাপি হইয়াছে বলিয়া মানুষ জানে না। বিপথগামী দুষ্টকে শাসন, আর জীবসাধারণকে মঙ্গল-কর্মে প্রেরণ করিতেই তো যুগে যুগে দেবমানবদের আবির্ভাব হয় পৃথিবীতে। ঈশ্বরেচ্ছায় এবং নৈসর্গিক কারণেই এইরূপ আবির্ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি বার বার।

'জন্মরহিত ভগবান উৎপথগামী দুষ্টগণের দমনের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং কর্মরহিত তিনি জীবগণকে সৎকর্মে রুচিপ্রদানের জন্যই নানা কর্মের অবতারণা করিয়া থাকেন। সনাতন ধর্মে ইহাই তো অবতার-তত্ত্ব।'[৩]

বিপর্যস্ত ও বিক্ষুব্ধ যে-কালের কথা আমরা বলিতেছি, উহা এতই দুঃসহ ছিল যে, ঐ সময়ে সর্বগুণান্বিত অনন্ত শক্তিধর কোন পুরুষসিংহের আবির্ভাব না হইলে এতদিনে ধরাপৃষ্ঠ হইতে সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাইয়া যাইত। সেকালের সেই যুগপ্রয়োজন তাই অন্যান্য যুগের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। যাহা হউক, ভারত-ইতিহাসের দুর্যোগ-ঝঞ্ঝাময় এই কালরাত্রির অবসান হইল বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে।

শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ধর্মের প্রাণপুরুষ। তাঁহার ন্যায় কাণ্ডারী না পাইলে জাতীয় ধর্ম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অতিকায় তরণী সেই ঐতিহাসিক ঘূর্ণিবাত্যায় নিঃশেষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত।—সনাতন ধর্মের ইতিহাস এতদিনে বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যাইত, সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণ অধ্যাত্ম-ভারতের বরিষ্ঠ মন্ত্রগুরু—জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়াদর্শ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবকে—সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে সেদিন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুধা-কলঙ্কিত সেই যুগ আজ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তমসাচ্ছন্ন ভারতের ভাগ্যাকাশে কুহকান্তক যে অপূর্ব অরুণরাগ সেদিন দেখা দিয়াছিল, তাহারই প্রোজ্জ্বল রশ্মিতে যুগ যুগ ধরিয়া মনুষ্যসমাজ অভিস্নাত হইতেছে ও হইতে থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ-সূর্যের উদয়ে মরণোন্মুখ ভারত-শরীরে পুনরায় প্রাণ ফিরিয়া আসিয়াছে। মানব-গুরু শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যাবির্ভাব স্মরণ করিয়া তাই আজ বার বার উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয়ঃ

'সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ?'

হে মহান্ লোকনায়ক, হে আচার্যবরিষ্ঠ, তোমাকে শতকোটী প্রণাম।

৩ ঐ ৩।১।৪৪

ধর্মের উদ্দেশ্য

স্বামী আদিনাথানন্দ

বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীষী লিখিয়াছেন, 'সুখী বরাহ অপেক্ষা অসুখী দার্শনিক ভাল।' (It is better to be a Socrates dissatisfied than a pig satisfied). খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বে ইহাকেই 'আধ্যাত্মিক অশান্তি' (divine discontent) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মানব মন শুধু জৈব প্রয়োজন মিটিলেই বেশী দিন শান্ত থাকিতে পারে না। তাহার অন্তস্তলে 'সুদূরপিয়াসী' ভাব লুক্কায়িত আছে। যখনই প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাতে চোখের রঙিন পর্দা খসিয়া যায়, তখনই অন্তরের সুপ্ত 'মানবধর্ম' তাহাকে এই বাণী শুনায়, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন খানে।' এই চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা আসিলেই বুঝিতে হইবে—মানব-মন ধর্মের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতেছে।

আবার ইহাও দেখা যায়, সমাজ-বিবর্তনের আদিস্তরে—শ্রীঅরবিন্দ যাহাকে 'Infra-rational stage' (অবযুক্তি-স্তর) আখ্যা দিয়াছেন—মনুষ্য-সমাজ ধর্মের অনুশাসনে পরিচালিত হইয়াছে। সমাজস্থিতির মূলসূত্র কতকগুলি ধর্মমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বর্তমান বুদ্ধিজীবীদিগের নিকট উহা অন্ধবিশ্বাস-প্রসূত এবং অযৌক্তিক মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রাচীন সমাজ-বন্ধন ও সমাজ-সংস্থিতি এই ধর্মানুশাসনের জন্যই সম্ভব হইয়াছিল।

আরও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মমতগুলি প্রকৃতির বহির্ভূত কোন বস্তুলাভে মানব-মনের সহজাত প্রেরণা। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ এই জন্যই বলিয়াছিলেন, 'নিম্নতম কাঠপাথর-উপাসনা হইতে অদ্বৈত বেদান্ত পর্যন্ত সবই সত্য—ঈশ্বরোপলব্ধির প্রচেষ্টা মাত্র।' বস্তুতঃ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া সেই প্রভাবে মানবমনে একটি চরম রহস্যবোধ জাগ্রত হয় এবং নানাভাবে প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃতির তাত্ত্বিক রূপ জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহ উৎপন্ন হয়। এই স্বতঃস্ফূর্ত আস্পৃহা হইতেই জন্মগ্রহণ করে ধর্ম, দর্শন, চারুকলা ও বিজ্ঞান।

এই দৃষ্টিতে দেখিলে ধর্ম একটি অপরিহার্য বিষয়—মানবমনের ক্ষুধা-নিবৃত্তির একটি পরম উপাদান বলা যাইতে পারে। মনে হয় এই কারণেই ধর্মের বিনাশ-সাধন অসম্ভব।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে চতুর্দিক হইতে ধর্মের উপর আক্রমণ চলিয়াছে। আমাদের দেশে বহু লোক স্থিরনিশ্চয় করিয়াছে যে, ইতিহাসে মধ্যযুগ বলিয়া সুবিদিত 'ধর্মের যুগ' চলিয়া গিয়াছে; বর্তমানে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তি-বিচারের যুগ। অন্ধবিশ্বাসের (faith) যুগ শেষ হইয়াছে। অনেকে আবার অবাধে এইরূপ মতও প্রকাশ করে যে, ধর্ম প্রগতির প্রতিবন্ধক এবং মানুষের মধ্যে সমাজ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে। এই কারণে রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষায় ধর্মের স্থান থাকিবে না এবং রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব না থাকা আরও প্রয়োজন। ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি শিক্ষা-কমিশনের রিপোর্টে লিখিয়াছেন: 'আমাদের সংবিধানের মূলনীতিতে আধ্যাত্মিক শিক্ষা স্বীকৃত হইয়াছে। রাষ্ট্রের কোন ধর্ম নাই। রাষ্ট্র কোন বিশেষ

ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবে না। সব ধর্মকেই সমান অধিকার দেওয়া হইবে,… প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী অব্যক্তের দিকে অগ্রসর হইবার অধিকার দেওয়া হইবে। ইহাই যদি আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ হয়, তবে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার অর্থ—ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা নয়; ইহার অর্থ—গভীরভাবে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হওয়া এবং ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করা।

সর্বপ্রকার মানসিক অজ্ঞতা ও ভেদবুদ্ধির অবসান করিয়া মিলন সাধন করে যে ধর্মজ্ঞান, অজ্ঞতাবশতঃ সেই ধর্মকে সমাজ-বিরোধী অপবাদ দেওয়া হইয়াছে! প্রশ্ন হইতে পারে, ধর্ম কি মানুষের নীচতা ও দারিদ্র্যের উপশম করিতে পারে? যদি না পারে, তবে ধর্মের পক্ষ-সমর্থনের কোন কারণ নাই। শিশু যদি বলে, আইনস্টাইনের মতবাদ আমাকে চুষিকাঠি চুষিতে সহায়তা করিবে কি?—উপরের প্রশ্নও তদ্রূপ। তবু ধর্ম যে জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে পারে, তাহাও যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

লোকে যথেচ্ছ কার্য করিয়া তাহাই ধর্ম বলিয়া প্রচার করে। ঈশ্বরের নামে মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করিয়া মানুষ সাম্রাজ্য গঠন করে। খ্রীষ্টান জগতের ধর্মগুরু—মুসোলিনীর শাসনকালে একটি মানববিধ্বংসী বোমাকে আশীর্বাদ করেন, আবার সাম্রাজ্য-লোলুপ মুসোলিনীর যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ঈশ্বরের সহায়তা ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। মানুষ জীবনের সমস্যা সমাধান করিতে পরাঙ্মুখ, তাহার স্বার্থপূর্ণ কার্যকে ধর্মের দোহাই দিয়া সমর্থন করিতে অভ্যস্ত। এই সকল কারণেই বহু লোকের দৃষ্টিতে ধর্মের মর্যাদা হ্রাস পাইয়াছে!

ধর্ম কি তবে অলীক কল্পনা? ইহা কি সত্যই মানবস্বার্থ-পরিপন্থী বলিয়া বর্জনীয়? জীবনে ইহার প্রভাব হইতে কি মুক্ত হওয়া যায় না? বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যক্তি- বা সমাজ-জীবনে বহু সমস্যা-সমাধানে ধর্মের ভূমিকা বিদ্যমান। আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে ইহা স্বীকৃত যে, যথার্থ ধর্মবোধেই জগদ্ব্যাপী মানব-মৈত্রী স্থাপন সম্ভব। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তধর্ম-প্রচার লক্ষ্য করিবার বিষয়। অধিকন্তু মানুষের অন্তরে ঈশ্বরান্বেষণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান। প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা সময় আসে, যখন বাঁচিবার জন্য বাতাস যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, তেমনই প্রয়োজন হয় ধর্মভাবের।

প্রকৃতির ক্রমোন্নতি-প্রক্রিয়ায় ইহাই প্রতীয়-মান হয় যে, মানুষকে উচ্চতর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ভূমিতে উন্নীত ও ক্রমবিকশিত হইতে হইবে। দৈহিক উন্নতি নয়, বিকাশ ঘটিবে মনোরাজ্যে এবং মনের অতীত আত্মার স্তরে। কাজেই ধর্মকে শুধু মতবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা মনে না করিয়া উহার মৌলিক আধ্যাত্মিক ভাবাদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। মানব-প্রকৃতির ক্রমবিকাশের চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞানের ব্যাপৃতি, ইহাই ধর্মানুভূতির চরম স্তর। ইহা যদি মানিয়া হয়, তবে প্রশ্ন জাগে—এই পূর্ণতা কি উপায়ে লাভ করা সম্ভব? এই সত্যোপলব্ধির অনুকূল পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা একমাত্র ধর্মই দিতে সক্ষম। প্রথমতঃ ব্যষ্টিক্ষেত্রে ইহা সংঘটিত হইবে। তাহার চিরন্তন আস্পৃহা-বশতঃ সমষ্টি-চেতনায়ও উহা প্রবিষ্ট হইবে।

প্রকৃত ধর্ম কি? ধর্ম আচার-অনুষ্ঠানের আহ্বান নয়। ইহা আমাদের জীবনের আমূল পরিবর্তনের আহ্বান। আমাদের বর্তমান সত্তাকে এক ভিন্ন ছাঁচে রূপান্তরিত করা, এক

উচ্চতর আত্মজ্ঞানের স্তরে উত্থান—আমাদিগকে কেন্দ্র করিয়া যাহাতে চতুর্দিকে শান্তি, প্রেম ও আনন্দ বিকীর্ণ হইতে থাকে।

মানুষের কষ্ট লাঘব করিতে এবং দূরত্ব লোপ করিতে বিজ্ঞানের অবদান অশেষ, কিন্তু হিংসা দ্বেষ লোভ প্রভৃতি মানুষের আদিম প্রবৃত্তি জয় করিতে বিজ্ঞান সফল হয় নাই। কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন, 'আমরা যে অনুপাতে আণবিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছি, সেই অনুপাতে আমাদের নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে,' সুতরাং বিজ্ঞানের অভিনব জয়যাত্রায় সমষ্টি-জীবন আনন্দময় বা শান্তিপূর্ণ হয় নাই।

'আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কোথা চলে যাব?'—মানুষের অন্তরের এই জিজ্ঞাসা চিরন্তন। বিজ্ঞান এ জিজ্ঞাসার সদুত্তর দানে অক্ষম। এই প্রশ্নের সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত আমরা শান্তি লাভ করি না—তাই উপনিষদে 'পরাবিদ্যা' স্থান পাইয়াছিল। একমাত্র ধর্মানুশীলন দ্বারাই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব। মানবজীবন ও মানবসত্তার সমস্যা সম্বন্ধে ধর্ম যে সমাধান দেয়, তাহা জানিবার জন্য মানুষের আগ্রহ দুর্দমনীয়। 'পরাবিদ্যা' মানুষকে অমৃতত্ব দান করে এবং তখনই সে কৃতকৃত্য বোধ করিয়া পরম শান্তির অধিকারী হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, ধর্মবিষয়ক সত্য-নির্ণয়ের পন্থা কি? অগণিত মহাপুরুষ, সত্যদ্রষ্টা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মরমিয়াগণের জীবন-ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষের জীবনে এক শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হয়, যখন সে এক অতীন্দ্রিয় স্তরে উন্নীত হইতে পারে। ঐ অবস্থায় সে তাহার ব্যক্তিত্বের মূলে পৌঁছায় এবং উহা যে অজ্ঞান এবং পরিণামশীল অবস্থার অতীত ও সাক্ষী-স্বরূপ, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করে। গীতায় আছে:

'উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥'

এই প্রকার এক চরম ভয়শূন্য অবস্থা লাভ করিয়া সাধক সীমিত দৃষ্টি হইতে মুক্ত হয়। এই উপলব্ধির পর সে প্রচার করে: আমি সেই, 'সোঽহম্',—আমি ও আমার পিতা এক!

এই স্তরে বিশ্বসংসারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় এবং মানুষের জ্ঞান বিস্তার লাভ করে। সাধক তখন জগতে ঈশ্বরের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পবিত্রতা, আনন্দ, প্রেম ও শান্তির উৎসে পরিণত হয়।

এইরূপ ব্যক্তিই জগৎত্রাতা। অ্যালডুস হাক্সলি বলিয়াছেন, 'অতীন্দ্রিয়মানব শূন্য পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে।' কারণ অতীন্দ্রিয় মানবগণই সত্যোপলব্ধির পর মহা-জাগতিক কর্মে অংশ গ্রহণ করেন। তখন তাঁহারা জগৎকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিবার চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম মানুষকে সংসার হইতে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেয় না বরং তাহার চিন্তাধারা নূতন ছাঁচে গড়িতে, আত্মার মহিমা প্রকাশ করিতে এবং মানব-কল্যাণে অবিরাম কার্য করিতে শিক্ষা দেয়।

অধিকন্তু বর্তমান কালের নৈতিক সঙ্কটের যুগে সকল ঐতিহাসিক ধর্মের মূলতত্ত্ব দৃঢ়ভাবে প্রচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। মিঃ চার্চিলের উদ্ধৃতি হইতে ইহা সমর্থিত হইবে: 'মানব-সন্তানের নিরাপত্তার জন্য আর কখনও অমরত্বের আশ্বাস এবং জাগতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে বিতৃষ্ণা বেশী প্রয়োজন হয় নাই—এবং দয়া, ভক্তি, প্রেম ও শান্তি সমভাবে বৃদ্ধি না পাইলে যাহা কিছু মানবজীবনকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে, বিজ্ঞান হয়তো তাহাই ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।'*

---

*মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা

স্বামী ধীরেশানন্দ

নববিধ ও দশবিধ-সংজ্ঞা

বর্ণা নবৈব বিখ্যাতাঃ সংসারো নবধোচ্যতে।
নাড়িকাদশকং নাড়ীদেবতা দশ কীর্তিতাঃ॥ ৬৪॥

বর্ণসমূহ[১] নয়প্রকার বিখ্যাত এবং সংসারও[২] নয়প্রকার। নাড়ীসমূহ[৩] এবং নাড়ীদেবতাগণও[৪] দশবিধ প্রসিদ্ধ।

১. প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর ও নাগকূর্মাদি পঞ্চউপবায়ুর বর্ণ এইরূপ :

পঞ্চবায়ুর বর্ণ			পঞ্চ উপবায়ুর বর্ণ		
প্রাণ	—	ইন্দ্রনীল বর্ণ	নাগ	—	পীত বর্ণ
অপান	—	হরিৎ বর্ণ	কূর্ম	—	শ্বেত বর্ণ
ব্যান	—	কপিল বর্ণ	কৃকর	—	অঞ্জন বর্ণ
উদান	—	তড়িৎ বর্ণ	দেবদত্ত	—	স্ফটিক বর্ণ
সমান	—	নীল বর্ণ	ধনঞ্জয়	—	ইন্দ্রনীল বর্ণ

প্রাণ ও ধনঞ্জয়ের একই বর্ণ বিধায় সর্বসমেত নয়টি বর্ণ হইল।

২. জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়; ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ; কর্তা, করণ, ক্রিয়া—এই নবধা সংসার। ইহা এক পক্ষের মত। অপর কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—পঞ্চমহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ, কর্মেন্দ্রিয়সমূহ, পঞ্চপ্রাণ, অন্তঃকরণচতুষ্টয়, স্থূল-শরীর, ত্রিবিধ কর্ম, অবস্থাত্রয় এবং এই সকলের কারণীভূত অজ্ঞান—এই সমস্তই সংসারের নববিধ রূপ।

৩. দশবিধ নাড়ীসমূহ—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, পয়স্বিনী, লকুহা, অলম্বুসা ও শঙ্খিনী। এতন্মধ্যে ইড়া চন্দ্রনাড়ী, পিঙ্গলা সূর্যনাড়ী, সুষুম্না মধ্যনাড়ী, গান্ধারী দক্ষিণনেত্রিকা, হস্তিজিহ্বা বামনেত্রিকা, পূষা দক্ষিণকর্ণিকা, পয়স্বিনী বামকর্ণিকা, লকুহা গুহ্যদেশনাড়ী, অলম্বুসা মেঢ্রনাড়ী এবং শঙ্খিনী নাভিনাড়ী—এইরূপ জ্ঞাতব্য।

[ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না বিষয়ে শ্লোক :

'ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা।
তয়োর্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্না চ সমাহিতা॥
ব্রহ্মস্থানং সমাপন্না সোমসূর্যাগ্নিরূপিণী॥']

৪. হরি, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, ঈশ, পদ্মোদ্ভবা (লক্ষ্মী), পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র—ইঁহারাই ক্রমশঃ নাড়ীসমূহের দশ দেবতা।

একাদশবিধ-সংজ্ঞা

বিবেকঃ প্রথমো জ্ঞেয়ো বৈরাগ্যং চ দ্বিতীয়কম্।
ষট্‌সম্পত্তিস্তৃতীয়া স্যাচ্চতুর্থী চ মুমুক্ষুতা॥ ৬৫॥

গুরূপসত্তিরপ্যেষা পঞ্চমী তু ততঃ পরম্ ।
শ্রবণং মননং চৈব নিদিধ্যাসনমেব চ ॥ ৬৬ ॥
তত্ত্বজ্ঞানস্য চাভ্যাসো মনোনাশস্তথৈব চ ।
বাসনাক্ষয় ইত্যেতে জ্ঞানৈকাদশহেতবঃ ॥ ৬৭ ॥

বিবেক[১], বৈরাগ্য, শমাদি ষট্‌সম্পত্তি, মুমুক্ষুতা, গুরূপসত্তি[২], শ্রবণ[৩], মনন, নিদিধ্যাসন, তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস[৪], মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়—এই সকল দৃঢ়-তত্ত্বজ্ঞানের একাদশ হেতু বা সাধন কথিত হইয়া থাকে।

১. বিবেক হইতে মুমুক্ষুতা—এই চারিটির ব্যাখ্যা ৩৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

২. গুরূপসত্তি: নিষ্কামকর্মদ্বারা শুদ্ধচিত্ত সাধকের বিবেকযোগ্যতা উৎপন্ন হয়। অনন্তর নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক দৃঢ় হইলে ক্রমশঃ তাহার বশীকার-সংজ্ঞক বৈরাগ্যের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। তখন শমাদি ষট্‌সাধন-সহায়ে তিনি সর্বকর্মসন্ন্যাসের যোগ্য হন এবং তাঁহার চিত্তে দৃঢ় মুমুক্ষুত্ব জাগ্রত হয়। অতঃপর সাধক জ্ঞানলাভের জন্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে তত্ত্বোপদেশ লাভ করেন। উপদেশ-লাভার্থ বিধিবৎ গুরুর সমীপে উপস্থিতি ও তাঁহার সেবাদিই শাস্ত্রে গুরূপসদন বা **গুরূপসত্তি** নামে কথিত হইয়া থাকে। নিজে নিজে শাস্ত্র আলোচনায় যে জ্ঞান হয়, তাহা ফলবৎ জ্ঞান হয় না। তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ অনেক থাকিয়া যায়। এইজন্য গুরুসঙ্গ এবং সৎসঙ্গ একান্ত আবশ্যক। ইহাতে জ্ঞান ফলবৎ হয়। [এখানে বলা যাইতে পারে যে, শাঙ্কর সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়েরই 'বেদান্তদর্শন'-প্রণেতা ব্যাসদেবের সঙ্গে গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নাই। ব্যাসের সহিত শাঙ্কর সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আচার্য শঙ্করের গুরু পরম্পরার মধ্যে ব্যাস একজন। যথা: ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুক, গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ ও শঙ্করাচার্য। এই হেতু শঙ্করমতের প্রামাণ্যই অধিক।] ব্রহ্মবিদ্-আচার্য-পরিচর্যা ঈশ্বরসেবা হইতেও অধিক ফলপ্রদ। ঈশ্বরসেবা অদৃষ্ট ফলপ্রদ, কিন্তু আচার্যসেবা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট—উভয়বিধ ফলপ্রদ। গুরুর উপর নির্ভর না করিলে জ্ঞান পরিপক্ব হয় না। ঈশ্বরসেবা পুণ্যোৎপত্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ অদৃষ্ট ফল দান করে। আচার্যসেবা ঐ অদৃষ্ট ফলও প্রদান করে এবং আচার্যের প্রসন্নতা সম্পাদনকরত উপদেশরূপ দৃষ্টফলও প্রদান করিয়া থাকে। পুনঃ ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ। তিনি কর্মানুসারে জীবকে বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ আচার্যের কৃপা শিষ্যের কর্মবন্ধন ছিন্ন করত মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে আচার্য-সেবা ঈশ্বরসেবা হইতেও শ্রেষ্ঠ, সুতরাং মুমুক্ষুর সর্বতোভাবে তত্ত্বজ্ঞ আচার্যের পরিচর্যা করা একান্ত বিধেয়। বস্তুতঃ ভগবান্‌ই গুরুরূপে শিষ্যকে উপদেশাদি দেন। ভগবানেরই এক রূপ গুরুমূর্তি। শিষ্যের বিচারবুদ্ধিপরায়ণ ও দশবিধ-দোষরহিত হওয়া কর্তব্য। দশবিধ দোষ, যথা: শারীরিক দোষ—চৌর্য, অতিনিদ্রা, ব্যভিচার ও হিংসা; বাচিক দোষ—মিথ্যা, কঠোরতা ও বাচালতা; এবং মানসিক দোষ—তৃষ্ণা, চিন্তা ও বুদ্ধিমান্দ্য।

৩. শ্রবণাদিত্রয়ের ব্যাখ্যা ১৯ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৪. তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়—এই তিনটির যুগপৎ অনুষ্ঠান দ্বারা

দৃষ্টদুঃখনিবৃত্তিপূর্বক জীবন্মুক্তিসুখপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান সর্ব দ্বৈতপ্রপঞ্চ অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে মায়াবশতঃ কল্পিত বলিয়া মিথ্যা, আত্মাই একমাত্র পরমার্থ সত্য বস্তু। সেই অদ্বয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই আমি—এইরূপ জ্ঞানের নামই তত্ত্বজ্ঞান। পুনঃ পুনঃ ঐ তত্ত্বানুস্মরণের নামই **তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস**।

বৃত্তিরূপে পরিণমমান মননাত্মক অন্তঃকরণদ্রব্যই মন নামে কথিত হয়। বৃত্তিপরিণাম অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্তি পরিত্যাগ করত সর্ববৃত্তি নিরোধ করাকেই **মনোনাশ** বলে।

চিত্তগত বাসনাই পূর্বাপর বিবেচনা ব্যতীত সহসা উৎপদ্যমান ক্রোধাদি বৃত্তিবিশেষের হেতু। ঐ বাসনা বা সংস্কার পূর্ব পূর্ব অভ্যাসবশতঃ চিত্তে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে। বিবেকপ্রসূত চিত্তপ্রশমনরূপ বাসনা দৃঢ় হইলে বাহ্যবিক্ষেপক নিমিত্ত বিদ্যমান থাকিলেও (ক্রোধাদি বৃত্তি আর উৎপন্ন হয় না। ইহারই নাম **বাসনাক্ষয়**।

এই তিনটিরই যুগপৎ অনুষ্ঠান কর্তব্য। দৃঢ় তত্ত্বজ্ঞান হইলে নর-বিষাণাদিতুল্য অবাস্তব মিথ্যাভূত জগদ্‌বিষয়ে আর বৃত্তির উদয় হয় না, এবং আত্মা সদা অপরোক্ষ অনুভূত হন বলিয়া তদ্বিষয়ে আর পুনরায় বৃত্তির উপযোগও থাকে না। তখন নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় মন স্বভাবতই উপশান্ত হইয়া যায়। এইরূপে মনোনাশ হইলে সংস্কারোদ্বোধক বাহ্যনিমিত্ত প্রতীত হয় না বলিয়া বাসনাও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়।

পুনঃ বাসনা ক্ষীণ হইলে নিমিত্তাভাববশতঃ ক্রোধাদিবৃত্তির অনুদয়ে মনোনাশ হয়। মনোনাশ হইলে শমদমাদিপ্রাপ্তিবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে রাগদ্বেষরূপ বাসনাক্ষয় হয়। বাসনাক্ষয় হইলে প্রতিবন্ধাভাববশতঃ তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয়—এইরূপে ইহাদের পরস্পর কার্যকারণ-ভাব বোদ্ধব্য।

তত্ত্বজ্ঞানের সাধন শ্রবণাদিত্রয়, মনোনাশের সাধন সমাধি আদির অভ্যাস অর্থাৎ যোগাভ্যাস, এবং বাসনাক্ষয়ের সাধন তৎপ্রতিকূল তত্ত্বজ্ঞানলাভ—বাসনার উৎসাদন।

শুদ্ধ ও মলিনভেদে বাসনা দ্বিবিধ। দৈবী সম্পৎ শুদ্ধবাসনা নামে খ্যাত। (১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শাস্ত্রীয় সংস্কারের প্রবলতাবশতঃ উহা তত্ত্বজ্ঞানের সাধন। মলিনবাসনা, বাহ্য—লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা (১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এবং আভ্যন্তর—কামক্রোধাদি সর্বানর্থমূল আসুরী সম্পৎ। (১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শুদ্ধবাসনা অর্থাৎ দৈবী সম্পদের অভ্যাস দ্বারা ঐ বাহ্য এবং আভ্যন্তর মলিনবাসনা ক্ষয় করা কর্তব্য।

এই তিনটি উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলে তত্ত্ববিৎ সর্ববিক্ষেপরহিত হইয়া পঞ্চম্যাদি ভূমিকারূঢ় হন এবং জীবন্মুক্তির অনুপম সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। (১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

(এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ গীতা ৬।৩২ মধুঃ টীকা অথবা 'জীবন্মুক্তিবিবেক' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)

পঞ্চদশবিধ-সংজ্ঞা

অস্থ্যাদ্যা দশপঞ্চৈব দেবতা দশপঞ্চ চ ॥ ৬৮ ॥

অস্থি[১] আদি পঞ্চদশবিধ এবং দেবগণের[২] সংখ্যাও পঞ্চদশ।

১ অস্থি, চর্ম, স্নায়ু, মজ্জা, মাংস, শুক্র, শোণিত, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দূষিকা (চোখের পিচুটি), মল, মূত্র, কফ, বাত ও পিত্ত—এই পঞ্চদশ বস্তুর সমষ্টিই স্থূলশরীর জ্ঞাতব্য।

২. পঞ্চদশ অধিষ্ঠাতৃদেবতা—দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু, প্রজাপতি, চন্দ্র, চতুর্বক্ত্র ব্রহ্মা, রুদ্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বর।

ষোড়শাদি বহুবিধ সংজ্ঞা

রাগদ্বেষমদাসূয়াঃ কামক্রোধৌ চ মৎসরঃ।
লোভমোহৌ চ দম্ভের্ষ্যে দর্পাহঙ্কারভক্তয়ঃ ॥ ৬৯ ॥
ইচ্ছাশ্রদ্ধেতি বিজ্ঞেয়া রাগাদ্যাঃ ষোড়শৈব হি।
মনোবৃত্তিবিশেষাস্তে সাক্ষী তেভ্যো বিলক্ষণঃ ॥ ৭০ ॥

রাগ, দ্বেষ, মদ, অসূয়া, কাম, ক্রোধ, মৎসর, লোভ, মোহ, দম্ভ, ঈর্ষা, দর্প, অহঙ্কার, ভক্তি, ইচ্ছা ও শ্রদ্ধা—এইরূপে প্রসিদ্ধ রাগাদি ষোড়শ প্রকারই জ্ঞাতব্য। এইসকল মনের বৃত্তিবিশেষ মাত্র। সাক্ষী প্রত্যগাত্মা ঐ বৃত্তিসকল হইতে পৃথক্।

১. **রাগ**: অভীষ্ট অনুকূল বস্তুতে রতি; অভিলষিত বিষয় লাভ হইলেও 'উহা নষ্ট না হউক এবং আরও অধিক লাভ হউক'—এইরূপ রঞ্জনাত্মক তামস চিত্তবৃত্তিবিশেষ।

দ্বেষ: দুঃখ এবং তৎসাধন অর্থাৎ সর্বপ্রতিকূল বস্তুর প্রতি 'ইহা আমার না হউক' —এইরূপ বুদ্ধি।

মদ: অশাস্ত্রীয় বিষয়সেবার জন্য উন্মুখ চিত্তবৃত্তি।

অসূয়া: গুণে দোষারোপ করিবার স্বভাব।

কাম: প্রাপ্তির কারণ বিদ্যমান না থাকিলেও বিষয়ের গুণানুসন্ধান অভ্যাসবশতঃ 'ঐ অপ্রাপ্ত বস্তুটি আমার হউক'—এইরূপ রত্যাত্মক রাজস চিত্তবৃত্তিবিশেষ।

ক্রোধ: দৃশ্যমান, শ্রূয়মাণ বা স্মর্যমাণ প্রতিকূল বিষয়ের দোষানুসন্ধান অভ্যাসজনিত চিত্তের প্রজ্বলনাত্মক বৃত্তি। কামই প্রতিবদ্ধ হইলে ক্রোধাকারে পরিণত হয়।

মৎসর: পরোৎকর্ষ অসহনপূর্বক নিজের উৎকর্ষের ইচ্ছা।

লোভ: ধনাদি বিষয়-প্রাপ্তি হইলেও অনুক্ষণ অধিক প্রাপ্তির অভিলাষ।

মোহ: অজ্ঞানবশতঃ অনাত্মাতে আত্মত্ববুদ্ধি, অবিবেক বা মিথ্যা অভিনিবেশ। বস্তুতত্ত্ব-অনবধারিণী চিত্তবৃত্তি।

দম্ভ: বেশ, ভাষা বা ক্রিয়াচাতুর্য সহায়ে স্বমহত্ত্বপ্রকটন। ধর্ম-ধ্বজিত্ব।

ঈর্ষা: পরশ্রীকাতরতা।

দর্প: বিদ্যা, ধন ও স্বজনাদিনিমিত্ত অভিমানের হেতু গর্ববিশেষ।

অহঙ্কার: অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, দেহেন্দ্রিয়াদি অনাত্মবস্তুতে আত্মত্বাভিমান।

ভক্তি: পূজ্যের প্রতি অনুরাগ।

ইচ্ছা: অনুকূল বস্তুতে প্রীতি। ইষ্টসাধন জ্ঞানজন্য অভিলাষ। (কাম, রাগ ও ইচ্ছা—এইগুলি প্রায় তুল্যার্থবোধক)।

শ্রদ্ধা: প্রত্যক্ষ অনুভব না হইলেও গুরু এবং শাস্ত্রদ্বারা উপদিষ্ট বিষয়ে 'ইহা অবশ্য এইরূপই'—এবম্বিধ দৃঢ় বিশ্বাস। (ভক্তি শ্রদ্ধা মুক্তির হেতু। ইচ্ছা ও অহঙ্কার বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই হেতু। অপর সকলগুলিই বন্ধন-হেতু জ্ঞাতব্য)।

লিঙ্গং ষোড়শকং কেচিৎ তথা সপ্তদশাত্মকম্।
কেচিদ্ বদন্তি তল্লিঙ্গং নবাধিকদশাত্মকম্ ॥ ৭১ ॥

লিঙ্গশরীর ষোড়শ[১] অঙ্গবিশিষ্ট। কেহ কেহ লিঙ্গশরীরকে সপ্তদশ[২] অবয়ব-বিশিষ্টও বলিয়া থাকেন। পুনঃ কেহ কেহ বলেন যে, লিঙ্গশরীরের ঊনবিংশ[৩] অঙ্গ।

১. পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও অন্তঃকরণ।

২. পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি।

৩. পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার।

চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি ষট্‌ত্রিংশৎসংখ্যকান্যপি।
আষণ্ণবতিতত্ত্বানি প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৭২ ॥

পণ্ডিতগণ তত্ত্বসমূহের সংখ্যা চব্বিশ[১], ছত্রিশ[২] অথবা ছিয়ানব্বই, পর্যন্ত বলিয়া থাকেন।

১. জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চক, প্রাণাদি-পঞ্চক, শব্দাদিপঞ্চক, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। ইহা কোন পক্ষ-বিশেষের মত। সাংখ্যমতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এইরূপ :

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ (সাংখ্যকারিকা)

মূল প্রকৃতি বা **প্রধান একটি :** ইহা অবিকৃতি অর্থাৎ কাহারও বিকার নহে। ইহা নিত্য ও ত্রিগুণাত্মিকা।

মহদাদি প্রকৃতি-বিকৃতি সাতটি : মহৎতত্ত্ব বা সমষ্টি-বুদ্ধি, সমষ্টি-অহঙ্কার এবং শব্দাদি পঞ্চ-তন্মাত্রা। এই সাতটি হইতে ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা প্রকৃতি বা কারণ, পুনরায় ইহারা মূল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিকৃতি বা কার্যরূপ। অতএব এই সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতি।

ষোড়শ বিকার : পঞ্চস্থূল মহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন। এই সকল কেবল বিকৃতি, বিকার অর্থাৎ কার্যরূপ। এইরূপে সাংখ্যমতে সর্বসমেত চব্বিশটি তত্ত্ব।

পুরুষ সাংখ্যমতে প্রকৃতি বা বিকৃতি কোনরূপই নহেন। তিনি অসঙ্গ, নির্লিপ্ত, চেতনস্বভাব, বিভু। সাংখ্যমতে পুরুষ বহু স্বীকৃত হইয়া থাকে। এ-মতে নিত্য প্রকৃতি হইতে চেতন পুরুষ ভিন্ন—এই বিবেকজ্ঞানই মুক্তি। (বেদান্তমতে পুরুষ স্বকল্পিত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব মিথ্যাজ্ঞানে পরিত্যাগকরত 'আমিই সর্বাধার সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম' এই জ্ঞানে মুক্ত হইয়া থাকেন)।

২. পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতিতত্ত্বসহ পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক, শরীরত্রয়, অবস্থাত্রয় এবং অজ্ঞান যুক্ত হইলে ছত্রিশতত্ত্ব হইয়া থাকে।

৩. ষড়্‌ভাববিকার (৫১ শ্লোক), ষড়ূর্মি (৫২ শ্লোক), ষট্‌ কৌশিক (৫২ শ্লোক) ষট্‌ অরি (৫১ শ্লোক), জগৎত্রয় (১৮ শ্লোক), গুণত্রয় (১৮ শ্লোক), কর্মত্রয় (১৫ শ্লোক), বচনাদি-পঞ্চক (৪৩ শ্লোক) সঙ্কল্পাদি-চতুষ্টয় (৩৪ শ্লোক), মৈত্র্যাদিচতুষ্টয়

(৩৬ শ্লোক), অজ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবতা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দিক্ আদি চতুর্দশ অধিষ্ঠাতৃদেবতা (৬৮ শ্লোক) এবং পূর্বোক্ত ছত্রিশ প্রকার তত্ত্বসমূহ—এই সকল মিলিত হইয়া ছিয়ানব্বই তত্ত্ব হইয়া থাকে।

বেদান্তস্য পদার্থানামেবং সংজ্ঞাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

অনেন প্রীয়তাং শ্রীমদ্ দক্ষিণামূর্তিরীশ্বরঃ॥ ৭৩॥

এইরূপে এই গ্রন্থে বেদান্তশাস্ত্রোক্ত পদার্থসমূহের সংজ্ঞাসকল অতি উত্তমরূপে কথিত হইল (গ্রথিত হইল) এই শুভ কর্ম দ্বারা গুরুরূপী শ্রীমদ্ দক্ষিণামূর্তি ভগবান্ সর্বজীবের প্রতি প্রসন্ন[১] হউন।

১. কল্যাণঘনমূর্তি শ্রীভগবান্ কৃপাবশে শ্রীসদ্গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া সর্বজীবের স্ব-স্বরূপজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অজ্ঞানাদি মল নিরন্বয় বিনাশপূর্বক তাহাদিগকে মোক্ষরূপ স্বারাজ্যে অধিষ্ঠিত করুন—এই প্রার্থনা শ্রীভগবৎসমীপে করা হইল।

অন্তে প্রার্থনা বা আশীর্বাদরূপ মঙ্গলাচরণকরত বেদান্ত-সংজ্ঞাসমূহের সঙ্কলন-গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইল।

বস্তুতঃ নামরূপাদিবিহীন এক শুদ্ধ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে অধ্যাস বা অধ্যারোপ বশতই বিবিধ সংজ্ঞাদি কল্পিত। শ্রীগুরু- ও ঈশ্বর-কৃপায় লব্ধ তত্ত্বজ্ঞান-সহায়ে সমূল অধ্যাস বিনষ্ট হইলে পুনঃ সচ্চিদানন্দঘনমূর্তি পরমাত্মাই অবশেষ থাকেন। ইহাই অপবাদ। অতঃপর অপবাদ প্রক্রিয়া কথিত হইবে।

অথ অপবাদ-লক্ষণম্।

অধুনা **'অপবাদ'**-লক্ষণ কথিত হইতেছে।

অধিষ্ঠানমাত্রপর্যবশেষণমপবাদঃ।

(শ্রীগুরু, পরমেশ্বর ও শাস্ত্রকৃপায় অপরোক্ষ ব্রহ্মাত্মৈক্য-সাক্ষাৎকার-প্রভাবে, আরোপিত যাবতীয় অনাত্মবস্তু মিথ্যাবোধে[১] বাধিত হইলে, পরমার্থ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপ—) অধিষ্ঠানই একমাত্র অবশেষ থাকেন। ইহাই **অপবাদ**। (শ্লোক ২, ৩ দ্রঃ)

১. **বাধঃ** ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানে জীবজগৎ যাবতীয় কল্পিত দ্বৈতের বাধরূপা নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বাধবিষয়ে আচার্যগন মতভেদে তিনপ্রকার লক্ষণ বলেন।

আচার্য বিদ্যারণ্যের মতে অধিষ্ঠান-জ্ঞানদ্বারা কল্পিত দ্বৈতবস্তুর **মিথ্যাত্বনিশ্চয়ের নামই বাধ।** যথা—

'জীবভাবজগদ্ভাববাধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে॥

নাপ্রতীতিস্তয়োর্বাধঃ কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ॥' —(পঞ্চদশী ৬।১২, ১৩)

পুনঃ 'বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী'কারের মতে অধিষ্ঠানের জ্ঞানে কল্পিতদ্বৈতবস্তুর অব্যভিচরিত-রূপে **অভাবনিশ্চয়ের নাম বাধ।** যথা—

'সাক্ষাৎকৃতে ত্বধিষ্ঠানে সমনন্তরনিশ্চিতিঃ।

অধ্যস্যমানং নাস্তীতি বাধ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥' (বিবরণকারেরও এইমত)।

বার্ত্তিককার বলেন যে, অধিষ্ঠান-জ্ঞানদ্বারা কল্পিতের নিবৃত্তি হইলে বস্তুতঃ একমাত্র অধিষ্ঠানই অবশেষ থাকিয়া যান। ইহাই **অধিষ্ঠানাবশেষরূপ বাধ**। যথা—

'অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিতবস্তুনঃ ॥'

সূতসংহিতাতেও (৪।২।৮) এই শ্লোকটি আছে।

আকাশের নীলিমাদিক সোপাধিক ভ্রমস্থলে অধিষ্ঠান আকাশাদির জ্ঞানদ্বারা কল্পিত নীলিমাদির **মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধ** হইয়া থাকে, বলা যায়। কারণ, অধিষ্ঠান-জ্ঞানের পরও নীলিমাদি প্রতীতি হইয়া থাকে। কিন্তু উহা মিথ্যা. উহার কোন সত্তা নাই, কেবল প্রতীতিমাত্র। ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমও এইরূপ সোপাধিক ভ্রম, ইহা বোদ্ধব্য।

রজ্জুসর্পাদিক নিরুপাধিক ভ্রমস্থলে অধিষ্ঠান রজ্জুআদির জ্ঞানদ্বারা, কল্পিত সর্পাদির অব্যভিচরিতভাবে **অভাবনিশ্চয়রূপ বাধ** হয়, বলা যেতে পারে। কারণ. এই স্থলে অধিষ্ঠান-জ্ঞানের পর আর কল্পিতের কিছুমাত্র প্রতীতিও অবশেস থাকে না।

প্রত্যুত অভাবনিশ্চয়রূপ বাধে এবং মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধও যেখানে অভাবনিশ্চয়রূপ অর্থ বোধন করে (যেমন স্বপ্নদৃষ্টান্তে), সেখানে কার্যতঃ এক অধিষ্ঠানমাত্রই অবশেষ থাকেন বলিয়া বার্ত্তিককার বলিয়াছেন যে, কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপই হইয়া থাকে। উহাই **অধিষ্ঠানাবশেষরূপ বাধ।**

তথা চ সর্বপ্রপঞ্চরহিতব্রহ্মাহমস্মীতি প্রত্যগভিন্নব্রহ্মজ্ঞানান্মুক্তিরিতি সিদ্ধম্ ॥

এইরূপে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণভেদে ত্রিধাভিন্নরূপে প্রতীত সর্ব প্রপঞ্চ—এই মায়াময় সংসারবিরহিত শুদ্ধ ব্রহ্মই আমি—ঈদৃশ প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞাননাশপূর্বক স্ব স্বরূপাবস্থান-রূপ মোক্ষলাভ হয়—ইহাই সিদ্ধ হইল।　　(বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা সমাপ্ত)

হে ধরণি

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

অনেক প্রাচীনা তুমি হে ধরণি, তাই জানতে চাই
কি তোমার অভিজ্ঞতা? কি পেয়েছ তোমার সৃষ্টিতে?
'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ' মন্ত্রধ্বনি দিবসে রাত্রিতে
শুনেছি অনেক দিন,—নিত্য প্রাণ জেগে ওঠে তাই:
তোমার বুকেতে শুয়ে জেগে উঠি ক্লান্তির হাওয়ায়
অনেক প্রশ্নের মাঝে আরও প্রশ্ন যোগ ক'রে দিতে;
অভিজ্ঞ সূর্যের কাছে মহাদ্যুতি মন্ত্রখানি নিতে
কৃতার্থ সম্পুট ভ'রে প্রতিদিন এ-হৃদয় চায়।

'আনন্দরূপমমৃতম্' তোমারি বুকের নামাবলী,
ঋষিকণ্ঠে শুনেছি যে মধুমান্ হবে বনস্পতি;
'মধুনক্তমুতোষসো' দেয় প্রাণে অভীষ্ট কাকলি
অনেক দুঃখের মাঝে,—তাই করি তোমার আরতি।

মধু কিছু দিতে পার, দিতে পার আনন্দ-নির্ঝর?
সুন্দর পৃথিবী আজ একবার দেখাও ঈশ্বর!

দিগন্তে

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

পৃথিবী এখন সংঘাতভরা দুর্দম দুর্বার,
কর্ণ বধির অস্থিরতার দুঃসহ কোলাহলে।
নিষ্ঠুরতার বিকৃত আকৃতি আঁকা হয় পলে পলে—
নিভৃত মানস-আঁধার-কাননে, –অসহ বেদনাভার।

নবারুণতলে আদিম পৃথিবী জান্তব ধারা বহে,
জগৎ-যাত্রা-বিজয়ের পথে চলে সদা উদাসীন।
ক্ষুদ্র আপন গণ্ডির মাঝে বিদেহে বদ্ধ রহে,
অর্থ-বিত্ত-সম্প্রদায়েতে চিত্ত হয়েছে লীন।

ক্লান্ত পৃথিবী শ্রান্ত দৃষ্টি মেলে রয় অসহায়,
নির্বাক্ দুই নয়নের কোণ অশ্রুতে টলমল,
ক্ষুব্ধ বক্ষ দীর্ঘশ্বাসেতে ভেঙে ভেঙে বুঝি যায়
দিগন্তে ওই সর্বকালধ্বংসী অরুণানল!

বিবেকানন্দ ও বুদ্ধিবাদ

শ্রীসুমণি মিত্র

(পূর্বানুবৃত্তি)

আত্মনিষ্ঠের শুভবুদ্ধি এইভাবে যখন যুক্তির অতীতে যাবার জন্যে কাতর, সেই সময়ে একজন বিশিষ্ট পাশ্চাত্য দার্শনিক তাঁর এই আধ্যাত্মিক আকুলতা বর্ধিত করেছিলেন। তিনি হ'লেন হ্যামিলটন। হ্যামিলটনের সিদ্ধান্ত যুক্তি-সীমায় আবৃত হলেও সে-যুক্তি নিরভিমান—নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে ক'রে তা তত্ত্বান্বেষীর অগ্রগতির পথে বাধাসৃষ্টি করে না; বরং নিজের অক্ষমতা স্বীকার ক'রে তাকে যুক্তি-তর্কের অতীতে যাবার মন্ত্রণা দেয়। সে নিঃসঙ্কোচে বলে—'যেখানে দর্শনের ইতি, সেইখানেই আধ্যাত্মিকতার সূত্রপাত।'

মোটামুটি পাশ্চাত্যের যুক্তি-কণ্টকিত দর্শন প'ড়ে স্বামীজী এইটেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের আক্ষেপ মানুষের মনে নানারকম বিকার এনে তাতে সুখ-দুঃখ-জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত করছে; কিন্তু যে বহির্জগৎ এই আক্ষেপ বা উত্তেজনার আমদানি করছে, তার যথার্থ স্বরূপ দেশ-কালের বাইরে থাকায় মানুষের কাছে তা অজ্ঞেয়ই থেকে যাচ্ছে; অন্তর্জগতের স্বরূপটাও সে জানতে পারছে না ঐ একই কারণে। অতএব বিশ্ব-রহস্য উদ্ঘাটন করতে হ'লে সর্বপ্রথম দেশ-কালের ঐ দুর্ভেদ্য বাধাটাকে সরাতে হবে। যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ বিশ্ব-রহস্য বুঝতে চায়, তারা নিজেরাই নির্ভুল নয়, অতএব নির্ভরযোগ্যও নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের বন্ধ্যা আধ্যাত্মিকতায় বিবেকানন্দ রীতিমত বিচলিত হয়েছিলেন। দেখলেন, ওদের দর্শনে 'দর্শনে'র নামগন্ধ নেই, শুধু অদর্শনের দৌরাত্ম্য; কোন প্রত্যক্ষানুভূতির সরস ব্যাখ্যা নেই, আছে শুধু একরাশ নীরস অপ্রত্যক্ষ অনুমান। তাতে মন ভরে না, চরিত্র গড়ে না, চিত্তের প্রশান্তিও আসে না।

অবশ্য এ-সময়ে স্বামীজীর পাশ্চাত্য দর্শন পড়বার প্রয়োজন ছিল অন্ততঃ এইটুকু হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যেই যে, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মীমাংসা গ্রহণযোগ্য নয়; এবং ইন্দ্রিয়, যার মারফত মানব-মন সংবেদন গ্রহণ করে, তার থেকে দেশ-কালের ঐ মানসিক আবরণটাকে কেউ সরিয়ে না দিলে বিশ্বরহস্য উদ্ঘাটনের দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

সংক্ষেপে, তিনি এক বিজ্ঞানী গুরুর অভাব বোধ করছিলেন, কোন এক দিব্য জীবনের পুণ্য স্পর্শের। এই অকপট অভাববোধই তাঁকে একদিন পঞ্চবটীর বিজ্ঞান-মন্দিরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

গিয়েই সেই গুরুতর প্রশ্ন—'আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক উত্তর—'হ্যাগো, এই যেমন তোমায় দেখছি।'

নরেন্দ্র প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেলেন। এমন অশ্রুতপূর্ব জবাবের জন্যে তিনি ঠিক তৈরী ছিলেন না। কথায় কোন গায়ের জোর নেই, অথচ কি অপ্রতিহত—সজোরে একেবারে মর্মে গিয়ে বেঁধে। কিন্তু এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ যদি দাঁড়ি টানতেন, তাহলে নরেন্দ্র কতদিন তাঁর কাছে ধরনা দিতেন, বলা শক্ত। ও-কথার জের টেনে ঠাকুর যখন অপূর্ব ভঙ্গিতে বললেন—'তুই দেখতে চাস—তুইও দেখতে পাবি,' তখনই

স্বামীজী তাঁর কথার অন্তর্নিহিত যুক্তিতে আশ্বস্ত হলেন।

বিজ্ঞান বলে—আমি দেখেছি, তুমিও দেখে নাও, তারপর বিশ্বাস কর। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানেই বা কেন এই রীতি খাটবে না? প্রত্যক্ষ করাটাই যদি বিশ্বাসের প্রমাণ হয়, তাহলে তোমার ঈশ্বর-দর্শনটা আমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রমাণ হবে কি ক'রে? তবে একজন যদি দর্শন পেয়ে থাকে, আর পাঁচজনেও পেতে পারে; কিন্তু না-পাওয়া পর্যন্ত তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিশ্বাস মানেই হচ্ছে সেই চরমতত্ত্ব ধারণা করা—পরের মুখে ঝাল খাওয়া নয়

নরেন্দ্রনাথ আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু নির্বিতর্ক হলেন না! শ্রীরামকৃষ্ণের কথা যুক্তিপূর্ণ ব'লে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন, কিন্তু নিঃসংশয় হলেন না। তাঁকে অবজ্ঞা করতে পারলেন না, অথচ গুরু ব'লে গ্রহণ করবার মতো অনিবার্য কোন যুক্তি তখনও পর্যন্ত পাননি। এবার তারই সন্ধানে বেরুলেন। শুরু হ'ল নির্ভীক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, যার বীজমন্ত্র হ'ল—যতক্ষণ বিশ্বাস করবার মতো অনিবার্য কোন যুক্তি না পাচ্ছি, তোমার সব কথাই মিথ্যে।

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কৃতাঞ্জলি হয়ে নরেন্দ্রকে বললেন—'আমি জানি, তুমি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি—নররূপী নারায়ণ; জীবের কল্যাণ-কামনায় দেহধারণ করেছ', তখন এই লোভনীয় স্তুতিতে আত্মহারা হওয়া দূরে থাক, নরেন্দ্র রীতিমত বিরক্ত হয়েছিলেন, এবং সেইদিন থেকেই তিনি তাঁকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন। বিশ্বনাথ দত্তের ছেলেকে যে 'সপ্তর্ষিমণ্ডলে' দেখতে পায়, তার চিকিৎসা দরকার। পাগলের প্রলাপে অভিভূত হবার পাত্র নরেন দত্ত নয়। না, লোকে যে বলে, দক্ষিণেশ্বরে একটা পাগলা বামুন থাকে—ঠিকই বলে।

কিন্তু পাগল তারই বা প্রমাণ কি? পাগল তো এমন প্রেমিক, সর্বত্যাগী বা নিষ্কাম হয় না। পাগল কি এমন নিরভিমান হয়? এত আনন্দ —এত আকর্ষণী শক্তি থাকে কি পাগলের? উন্মাদ কি ঈশ্বরের জন্যে কাঁদে? নরেন্দ্র চিন্তিত হলেন! বিনা প্রমাণে কোন সিদ্ধান্তই যখন তিনি করবেন না, তখন তাঁকে পাগল ব'লে উড়িয়ে দেবার কিংবা এড়িয়ে যাবার আগে প্রমাণ করতে হবে, তিনি পাগল। প্রমাণ খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্ত হলেন। চোখের সামনে উনিশ শতকের রথী-মহারথীদের প্রতিভাদীপ্ত মুখগুলো ভেসে উঠতে লাগলো। বুঝলেন—কেশব সেন, বিজয় গোস্বামীর মতো ধর্মবীর মনীষীরা যাঁর প্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছেন, তাঁকে পাগল মনে করাটা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক নয়। তাছাড়া, তাঁর চাল-চলনে কিংবা অন্যের সঙ্গে আচরণে তো কোনরকম পাগলামি নেই। আর পাগল কি এমন অন্তর্মুখী হয়ে সমাধির গভীরে ডুবে যেতে পারে? অথচ তাঁকে দেখে ঠাকুর যে-রকম আচরণ করেন, তার সঙ্গে এ-সবের সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে নরেন্দ্র নাজেহাল হলেন। শেষপর্যন্ত স্থির করলেন, ঠিক পাগল নয়—আধ-পাগল, monomaniac. তা যাই হন, তাঁকে দেখলেই কিন্তু শ্রদ্ধা হয়; একটা অপার্থিব আকর্ষণে বিচার-শক্তিটা যেন ঝিমিয়ে পড়ে।

এইখানেই স্বামীজীর ভয়। কারও মহত্ত্বে মানুষ যখন মুগ্ধ হয়, তখন তার বিচার-শক্তিটা নিস্তেজ হয়ে আসে, ফলে নিজের স্বাধীন চিন্তা থেকে বিচ্যুত হয়ে সে তখন নির্বিচারে তাঁর ইচ্ছাস্রোতে গা ভাসাতে চায়। নরেন্দ্রনাথ সতর্ক হলেন। বিচারবুদ্ধির তলোয়ার তুলে সদম্ভে

রুখে দাঁড়ালেন। মনে দুর্যোধনের প্রতিজ্ঞা—'বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'।

দীর্ঘ পাঁচবছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল, তারপর তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন; কিন্তু বিনাযুদ্ধে তিনি সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমি সমর্পণ করেননি। দু-এক দিনের বর্ণনা দিলেই এই অপূর্ব যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যাবে:

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলাম, কেশব যে-রকম একটি শক্তির বিশেষ উৎকর্ষে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে, নরেন্দ্রের ভেতর ঐ-রকম আঠারোটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান! আবার দেখলাম, কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার মতো জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল; পরে নরেনের দিকে চেয়ে দেখি, তার ভেতরে জ্ঞানসূর্য উদিত হয়ে মায়া-মোহের লেশ পর্যন্ত সেখান থেকে দূরীভূত করেছে।

নরেন—মশাই করেন কি? লোকে আপনার ঐ রকম কথা শুনে আপনাকে নিশ্চয়ই উন্মাদ ব'লে মনে করবে। কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব ও মহামনা বিজয় আর কোথায় আমি—একটা নগণ্য স্কুলের ছোঁড়া! আপনি তাঁদের সঙ্গে আমার তুলনা ক'রে আর কখনও ও-রকম কথা বলবেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি ক'রব রে, তুই কি ভাবিস আমি ও-রকম বলেছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) আমাকে ঐ রকম দেখালেন, তাই বলেছি; মা আমাকে সত্য ভিন্ন কখনও মিথ্যা দেখাননি, তাই বলেছি।

নরেন—মা দেখিয়ে থাকেন, কি আপনার মাথার খেয়ালে ও-সব উপস্থিত হয়, তা কে বলতে পারে? আমার ও-রকম হ'লে আমি নিশ্চয়ই বুঝতাম, আমার মাথার খেয়ালেই ঐ-রকম দেখতে পাচ্ছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন এ-কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেছে যে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় অনেক স্থলে আমাদের প্রতারিত করে। তার ওপর বিষয়-বিশেষ দর্শনের বাসনা যদি আমাদের মনে সর্বদা জাগরিত থাকে, তাহলে তো কথাই নেই, তারা আমাদের পদে-পদে প্রতারিত করে। আপনি আমাকে স্নেহ করেন এবং সর্ব বিষয়ে আমাকে বড় দেখতে ইচ্ছা করেন—সেই জন্যেই হয়তো আপনার ঐ-রকম সব দর্শন এসে উপস্থিত হয়।

*

নরেন—(শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরোধে অষ্টাবক্র-সংহিতাদি পাঠ ক'রে) এতে আর নাস্তিকতাতে প্রভেদ কি? সৃষ্টজীব নিজেকে স্রষ্টা ব'লে ভাববে? এর চেয়ে অধিক পাপ আর কি হ'তে পারে? আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্ম-মরণশীল যাবতীয় পদার্থ সবই ঈশ্বর—এর চেয়ে অযুক্তিকর কথা আর কি হ'তে পারে? গ্রন্থকর্তা ঋষিমুনিদের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নতুবা এমন সব কথা লিখবেন কি ক'রে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা তুই ও-কথা এখন নাইবা নিলি, তা ব'লে মুনি-ঋষিদের নিন্দা ও ঈশ্বরীয় স্বরূপের ইতি করিস কেন?

নরেন—(সে-কথায় কর্ণপাত না ক'রে বারান্দায় হাজরা মশায়ের কাছে উঠে গিয়ে) তা কখনও হ'তে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা কিছু দেখছি এবং আমরা সকলেই ঈশ্বর?

*

সাধারণ ভক্তেরা নরেন্দ্রের এই যুক্তি-প্রবণতাকে কেউ সুনজরে দেখেননি—দম্ভ এবং ঔদ্ধত্য মনে ক'রে বিরক্তই হতেন; কিন্তু ঠাকুর বুঝেছিলেন, ওটা দম্ভ নয়, ওটা ওর অসাধারণ মানসিক শক্তির ফলস্বরূপ বিপুল আত্মবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ, যা তাপদগ্ধ সংসারের সংঘর্ষে এসে একদিন অসীম করুণায় রূপান্তরিত হবে। ওটা ওর অহংকার নয়—তেজ, উদ্ধত

ব্যক্তিস্বাভিমান নয়—আত্মার অত্যুগ্র স্বাতন্ত্র্য-বোধ, যা আত্ম-অবিশ্বাসীদের উষর মনে বিশ্বাস ও বীর্যের সবুজ ফসল ফলাবে। তিনি বুঝেছিলেন, এই আত্মপ্রত্যয়ী সত্যপ্রাণ যুবকের ভাবের ঘরে কিছুমাত্র চুরি নেই; সে যা মিথ্যে ব'লে মনে করছে—সেটা সব সময় সত্য না হলেও, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার প্রবৃত্তিটা তার সত্যনিষ্ঠারই প্রমাণ। যুক্তির দ্বারা যার প্রতিষ্ঠা হয় না, তার কাছে যখন সেটা মিথ্যে, তখন তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সংস্কারটায় তার সত্যনিষ্ঠাই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। স্বামীজীর যুক্তি-নিষ্ঠায় এই সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পেয়েই ঠাকুর তাঁর এই দুর্ধর্ষ তার্কিক শিষ্যটির প্রতি কখনও অপ্রসন্ন হননি। তা ছাড়া তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, যখন তাকে তার যুক্তি-সিদ্ধান্তের অযোগ্যতা দেখিয়ে দেওয়া হবে, তখন সে কাপুরুষের মতো পালাবে না, বীরের মতো আত্মসমর্পণ ক'রে আত্মাহুতি দেবে। তাই বোধ হয় নরেন্দ্র সংশয় তুলে তর্ক করলে ঠাকুর খুব খুশী হতেন। তিনি বার বার বুঝিয়ে দিতেন—কখনও বিরক্ত হতেন না।

স্বামীজীর একজন বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা ব্রহ্মানন্দ-স্বামী ঐ একই প্রকার এজাহার দিচ্ছেন: স্বামীজী প্রথম প্রথম বড় শুষ্ক তর্ক করতেন। নিরাকারবাদী ছিলেন। এমনকি ঠাকুরকেও বলতেন, 'আপনি যে-সব দর্শন করেন, তা সব মনের ভুল।' কেউ দেবদেবীর মন্দিরে প্রণাম করতে গেলে তাকে তিরস্কার করতেন। তাতে অনেকেই তাঁর উপর বিরক্ত হ'ত। ঠাকুর কিন্তু মোটেই বিরক্ত হতেন না। তিনি বলতেন, 'নরেনের মতো আধার আজকালকার দিনে দেখতে পাওয়া যায় না।'

এ-ব্যাপারে শরৎ মহারাজও (স্বামী সারদানন্দ) একমত—'...নরেন্দ্র যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, জিজ্ঞাসিত হইলে তাহা ঠাকুরের নিকটে সর্বদা নির্ভয় অন্তরে প্রকাশ করিতেন। ঠাকুরও উহাতে সর্বদা প্রসন্ন ভিন্ন কখনও রুষ্ট হইতেন না।'

কেন হবেন? বোধির প্রান্তে এসে তিনি যে বুঝেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বুদ্ধি-বিগ্রহটির প্রতি রুষ্ট হ'লে, তাকে অবজ্ঞা করলে কিংবা পাশ কাটিয়ে গেলে তাঁর নিজেরই কাজ পণ্ড হবে; বরং তাকে ঠেলে-ঠুলে পরম প্রজ্ঞায় পৌঁছে দিতে পারলে বিশ্বাত্মীয়করণের যে সুমহান্ সঙ্কল্প নিয়ে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন, তার একটা ব্যবস্থা হবে। ভবিষ্যতে তর্কমুখর পাশ্চাত্ত্যের বাক্য রোধ ক'রে যে তাঁর এই সঙ্কল্পকে সার্থক করবে, তার তর্ক তাঁর কাছে কখনও নিরর্থক হ'তে পারে? তাই ঠাকুর তার 'শুষ্ক তর্কে'ও 'প্রসন্ন ভিন্ন কখনও রুষ্ট হইতেন না,' কখনও অনাদর করতেন না তার অনমনীয় যুক্তিবৃত্তিকে। তিনি একান্ত ধৈর্যে অপেক্ষা করতে জানতেন।

স্বামীজীও তাঁর আচার্য-জীবনে যুক্তিকে কোনদিন অবজ্ঞা করেননি, কোনদিন বলেননি, যুক্তিকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হও; বরং তিনি সাবধান ক'রে দিয়েছেন এই ব'লে—ভাবপ্রবণতা শতকরা ৮০ জনকে নীতিহীন করেছে এবং শতকরা ১৫ জন পাগল সৃষ্টি করেছে। তিনি নিজের পূর্বজীবনে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপ-আমেরিকায় পদার্পণ ক'রে বুঝেছিলেন, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষকে যদি 'অতিপ্রশ্নান্ মা প্রাক্ষীঃ' ব'লে ধমক দেওয়া হয়, তাহলে তাকে নাস্তিকতার পথে ঠেলে দিয়ে পশুস্তরে ফেলে দেওয়া হবে। মোটকথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত এই যুক্তিবাদকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে কেবল ধর্মের ব্যাপারে তাকে

অবান্তর মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ তিনি খুঁজে পাননি। আর তিনি নিজে যদি তাঁর বুদ্ধিবাদী ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন না দিয়েই 'বিবেকানন্দত্ব' অর্জন ক'রে থাকেন, তাহলে তিনিই বা আচার্য হয়ে আমাদের যুক্তির শ্বাসরোধ করবেন কোন্ যুক্তিতে?

আরও একটা কথা আছে। আচার্য চক্ষুষ্মান্ হ'লে শিষ্য তার বিচার-বুদ্ধি থেকে চাক্ষুষ লাভবান্ হয় না বটে, কিন্তু আচার্য অন্ধ হ'লে শিষ্যের বিচার-বুদ্ধিই তাকে নিশ্চিত-খানায়-পড়া থেকে রক্ষে করে। ধর্মজীবনে এই খানায় না-পড়াটাই একটা মস্ত লাভ। ধর্মের বেলায়ও তাই। কোন ধর্মে যদি সার পদার্থ কিছু থাকে, তাহলে বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণে তার ঔজ্জ্বল্য বাড়বে বই কমবে না; কিন্তু সে-ধর্ম যদি অসার হয়, তাহলে বিচার-বিশ্লেষণের আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে অসত্যের কবল থেকে আমাদের রক্ষে করবে। সেই কারণেই স্বামীজী যুক্তি-বিদ্বেষী ধর্মাচার্যকে এবং বিচারবর্জিত ধর্মালোচনাকে চিরদিন সন্দেহের চোখে দেখেছেন; যে-ধর্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বরদাস্ত করতে চায় না, তাকে দুনিয়া থেকে অবিলম্বে সরে পড়তে বলেছেন এই জন্যেই। স্বামীজীর বেদান্ত-প্রীতির একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, বেদান্ত যে-কোন বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে।

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। অসত্যের কবল থেকে উদ্ধার করা ছাড়া বিচার-বুদ্ধির কি কোন প্রত্যক্ষ অবদান নেই? তার কাছ থেকে আমরা নগদ কি কিছুই পাব না?

প্রজ্ঞার প্রান্তে এসে সাধক হৃদয়ঙ্গম করেন, আমাদের সহজাতবোধ (instinct), বিচার-বুদ্ধি (reason) এবং অপরোক্ষজ্ঞান (intuition) তিনটে বিভিন্ন জিনিস নয়—একই বুদ্ধির তিনটে বিভিন্ন স্তর। বিচার-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত অবস্থাই হচ্ছে অপরোক্ষ-অনুভূতি। অতএব প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির সঙ্গে যুক্তি-তর্কের কোন বিরোধ থাকতে পারে না, যেমন থাকতে পারে না বার্ধক্যের সঙ্গে শৈশবের কোনরকম আড়াআড়ি। মানুষের মধ্যে তিনটে মন নেই, একই মন উত্তরোত্তর পরিমার্জিত হয়ে তিনটে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হচ্ছে এইমাত্র। সহজাতবোধ মার্জিত হয়ে বুদ্ধিতে পরিণত হচ্ছে এবং বুদ্ধি পরিমার্জিত হয়ে পরিসমাপ্ত হচ্ছে বোধিতে। সহজাতবোধ যদি বরফ হয়, বুদ্ধি বা যুক্তি তাহলে জল, আর বোধি বা অপরোক্ষ-জ্ঞান—বাষ্প, বরফেরই সূক্ষ্মতম প্রকাশ। সূক্ষ্ম স্থূলকে নিরাস করে না, পরিপূর্ণ করে। তাই বুদ্ধি সহজাতবোধের পরিপূরক আর বোধি বা প্রাতিভজ্ঞান বুদ্ধির পরিপূরক। এখানে সত্য ও জ্ঞাতার মধ্যে আন্তর বা বাহ্যজগতের আর কোনরকম আড়াল থাকে না, ঠাকুর যাকে 'বোধে বোধ' বলতেন। বুদ্ধি এইখানে এলে তবে পূর্ণতা লাভ করে।

তাই উপলব্ধিমান্ আচার্য কখনও জিজ্ঞাসুর যুক্তিপ্রবণতাকে অশ্রদ্ধা করে না; কেননা বোধের প্রান্তে এসে তিনি দেখতে পান, উপলব্ধির সঙ্গে যুক্তির, বোধের সঙ্গে বুদ্ধির স্বরূপতঃ কোন বিভেদ নেই। তাই শিষ্যের বুদ্ধিবৃত্তিকে জবাই না ক'রে তিনি তাকে প্রয়োজনমত আমলই দেন। শুধু আমল নয়, আদেশ—'Stick to your reason until you reach something higher, and you will know it to be higher because it will not jar with reason.'

হয়তো এইজন্যেই 'স্বামীজী সংশয় তুলে তর্ক করলে ঠাকুর খুব খুশী হতেন।' না করলে রুষ্ট হতেন—সে নজীরও আছে। একসময়ে স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্ক ঠাকুরের দৃঢ়

বিশ্বাসের কাছে নতিস্বীকার করেছিল। সে সময়ে "বিবেকানন্দ গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন,—'না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস কর। আমি বলিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস করিও না।' "

যে-ধর্ম বা যে-আচার্য জিজ্ঞাসুর বিচার-শক্তিকে রুদ্ধশ্বাস করতে চান, সে-ধর্ম বা ধর্মাচার্য জলকে বাষ্পে বিকশিত করা দূরে থাক, বরফে পরিণত করেন, মানুষকে দেবত্বে টেনে তোলা দূরে থাক, তাকে পশুত্বে ঠেলে দেন। তাই স্বামীজী বারবার আমাদের বরং যুক্তিপরায়ণ নাস্তিক হ'তে বলেছেন, কিন্তু একবারও যুক্তি-বিমুখ আস্তিক হ'তে বলেননি। শিষ্য শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী একবার তাঁর কোন একটা কথায় 'আজ্ঞে হ্যাঁ' ব'লে সায় দেওয়ায় দস্তুরমত ফাঁপরে পড়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধমক :

'আজ্ঞে হ্যাঁ নয়! যা বলি সব কথাগুলি বুঝে নিবি—মূর্খের মতো সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও—বিশ্বাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর সব কথা সর্বদা বুঝে নিতে বলতেন। সদ্যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে, এইসব নিয়ে পথ চলবি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে যাবে, তবে তাইতে ব্রহ্ম reflected (প্রতিফলিত) হবেন। বুঝলি?'

স্বামীজীর দৃষ্টিতে নারীজাতির আদর্শ

শ্রীমতী সুচরিতা সেনগুপ্তা

স্বামী বিবেকানন্দের মতে 'নারীজাতির আদর্শ' নামক সংজ্ঞাটি নিগূঢ় অর্থব্যঞ্জক, তথ্য-বহুল এবং বহুব্যাপক। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সম্মিলিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমগ্র নারীকুলের চরিত্রে অত্যাবশ্যকীয় গুণরাশির প্রকাশ ও বিকাশকেই তিনি বুঝিয়েছেন। 'ভারতীয় নারী' নামক সংকলনগ্রন্থে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নারী-চরিত্র, আদর্শ, সমাজের মর্যাদা, অধিকার, শিক্ষা ও রীতিনীতির অকপট আর বলিষ্ঠ বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা আলোচনা করেছেন। সুযুক্তি ও দৃঢ়তা সহকারে নানাসমস্যা-সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন।

দেশ, কাল ও যুগের গতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ও বিভিন্নতা বিবেকানন্দ অস্বীকার করেননি। তবু যা চিরসত্য, নিত্যশুদ্ধ ও স্থিতিশীল, তার সাধনা করেছেন একাগ্রচিত্তে। জগৎকে সে-পথের নিশানা দেখিয়েছেন। তাঁর এই বিশ্বজনীন বোধের সফলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহিমময়ী ভগিনী নিবেদিতা। এই মহীয়সী নারীর চরিত্রে পশ্চিমী শিক্ষার আলোর সঙ্গে প্রাচ্যের ত্যাগ, সংযম, গভীর ভগবৎপ্রেম ও নিষ্ঠার অপূর্ব মণিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটেছিল। নিবেদিতার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—স্বামীজীর প্রেরণা ও আশীর্বাদে অধিকতর উজ্জ্বল, পবিত্র ও মহনীয় হয়ে উঠেছিল, এ সত্য সর্বজনস্বীকৃত।

পাশ্চাত্যদেশীয় নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা, উদার চিত্তবৃত্তি ও নিরলস কর্মক্ষমতার উচ্চ-প্রশংসায় স্বামীজী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন—'ইহারা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।...ডায়না-দেবীর ললাটস্থ তুষার-কণিকার ন্যায় নির্মল, বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং...উন্নতিসম্পন্না।' কিন্তু স্বামীজী তাদের ভোগবিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতাকে

সমর্থন করেননি। 'সম্মুখে বিচিত্র যান, বিচিত্র পান, সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লজ্জাহীনা বিদুষী নারীকুলের নূতন ভাবভঙ্গী'কে কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন। আবার 'প্রেম, পাতিব্রত্য, দয়া মায়া, তুষ্টি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি ভারতীয় নারীচরিত্রের প্রতীক সীতা' তাঁর কাছে পরম শ্রদ্ধেয়া, শ্রেষ্ঠ আদর্শস্থানীয়া। তাই দেশবাসীর মনুষ্যত্ববোধের উদ্বোধন করতে গিয়ে যেমন 'উমানাথ ও সর্বত্যাগী শঙ্করের' শরণ নিয়েছেন, তেমনি ভারতীয় নারীর আদর্শ-বোধকে উদ্দীপ্ত করেছেন সীতা সাবিত্রী, দময়ন্তীর নাম মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠে ঘোষণা দ্বারা; সহর্ষে বলেছেন, 'সেই সাধ্বী সদা বিশুদ্ধস্বভাবা সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে বর্তমান থাকিবেন।' দেশবাসীর কাছে দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন, 'মীরা, লীলাবতী, অহল্যাবাঈ…ইহাদের জীবনচরিত মেয়েদের বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের জীবন ঐরূপ ভাবে গঠিত করিতে হইবে

'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ'—মনুর এই উক্তি স্বামীজী তুলে ধরেছেন বিশ্বের সমগ্র নারীকুলের কল্যাণ-কামনায়। পাশ্চাত্যে মেয়েদের পুরুষের সম মর্যাদা ও সম্পদে অধিষ্ঠিত দেখে তিনি আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে বলেছেন, 'সে-দেশ মেয়েদের পূজা করে, তাই সেখানকার পুরুষ ও পরিবার সুখী, বিদ্বান্, স্বাধীন ও উদ্যোগী।' স্বদেশে এর ব্যতিক্রম এবং মেয়েদের অশিক্ষা দুর্গতি ও লাঞ্ছনা তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করে-ছিল। দৃপ্তকণ্ঠে দেশবাসীকে শাস্ত্রোপদেশ স্মরণ করিয়েছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া-তিযত্নতঃ'; বলেছেন, 'শিক্ষাই সকল দুর্দশা-ও দুর্গতি-বিমুক্তির উপায় ও পথ।' বিদুষী মহীয়সী গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা, উভয়ভারতী, খনা, মীরা প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নারীজগতের সামনে উপস্থাপিত ক'রে বলেছেন, 'তাঁদের শিক্ষা শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নয়।…শুধু পুঁথিগত বিদ্যায় প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না, সেই সঙ্গে চাই দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, তেজ ও শৌর্যের সম্মিলিত দৃঢ় সংযোজন। শিক্ষা বলিতে এমন ভাবে চরিত্র সুগঠিত করা যাহাতে মন সদ্বিষয়ে ধাবিত হয়।' বাগবাজারের নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয় সেই বিরাট সম্ভাবনাময় জয়যাত্রার পথে প্রথম পদক্ষেপ।

স্বামীজী-নির্দেশিত স্ত্রীশিক্ষা-পরিকল্পনায় মেয়েদের ধর্ম, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক অঙ্গ। আমেরিকার মেয়েদের নানাপ্রকার খেলাধুলায় অংশগ্রহণ, সর্ববিধ বীরত্বের ভাব ও দৃঢ়তাকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। স্বদেশের মেয়েদেরও সেইরূপ শিক্ষা দেওয়ার তিনি ছিলেন একান্ত-ভাবেই পক্ষপাতী।

নারীর সতীত্বের উপর বিবেকানন্দ সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, 'সতীত্বই জাতির জীবনীশক্তি।' শুধু স্বদেশেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের নারী-সম্পর্কেই তাঁর ঐ দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণাকে সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন বারবার। অকাট্য যুক্তিসহায়ে তার সত্যতা প্রমাণ করেছেন দৃষ্টান্ত-সহকারে—'তোমরা কি দেখ নাই, নারীর সতীত্বহীনতার জন্যই বড় বড় দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে? জাতির অবলুপ্তি ঘটেছে?…জগতে এমন পাশবতা কি আছে, পবিত্রতা ও সতীত্ব যাহা জয় করিতে না পারে?' আবার 'বলপূর্বক সতীদাহে যে সতীত্বের বিকাশ, কুসংস্কার শিখাইয়া যে পুণ্য অর্জন' তাকে তিনি তীক্ষ্ণ সমালোচনায় জর্জরিত করেছেন। বলিষ্ঠ চরিত্র গঠন ও নীতি-পরায়ণতা সর্বকালে সর্বদেশে জাতি ও জগতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা কল্যাণকর ও মহত্তম আদর্শ—এ সত্যপ্রকাশে

স্বামীজী সদা আগ্রহশীল ছিলেন। বাল্যবিবাহ-প্রথায় তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল—'কি মহাপাপ! দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দেয়!' বহুবিবাহ বা বিধবাবিবাহে তাঁর সমর্থন ছিল না। এ-সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: 'আধুনিক সংস্কারকগণ··· বিধবাবিবাহ লইয়া ব্যস্ত।··· কিন্তু আমাদের এখন প্রধান কাজ হইতেছে সমাজের সকলকে বিশেষতঃ মেয়েদের শিক্ষিত করা।···এমন একটিও সমস্যা নাই, শিক্ষার দ্বারা যাহার সমাধান হয় না।' মেয়েদের সমস্যা শিক্ষিতা মেয়েরাই সমাধান করবে।

ভারতীয় নারীর মাতৃত্বের আদর্শকে বিবেকানন্দ অন্তরের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন, 'নারীর বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে মাতার আদর্শই শ্রেষ্ঠ। ভারতে মাতাই স্ত্রী-চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ।···পাশ্চাত্যে নারী স্ত্রী,—নারীত্বের ধারণা সেখানে স্ত্রীশক্তিতেই কেন্দ্রীভূত। আর ভারতে নারীশক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত।' গভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'অপূর্ব স্বার্থলেশহীনা সর্বংসহা ক্ষমাস্বরূপিণী মা-ই আমাদের আদর্শ।' পাশ্চাত্যদেশীয় নারীর জীবনে মাতৃপদ শ্রেষ্ঠ নয়, তারই সমালোচনা ক'রে তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'মা হওয়ার জন্য কি আপনারা ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞ? সেজন্য কি আপনারা নিজেদের পবিত্র মনে করেন? যদি না করেন, তবে আপনাদের বিবাহ প্রবঞ্চনা, আপনাদের নারীত্ব ব্যর্থ এবং শিক্ষা কুসংস্কার।'

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বিবাহ-রীতি ও সমস্যা সম্পর্কে স্বামীজী বলিষ্ঠ মত ও যুক্তি দ্বারা আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন—এ-দেশের বাল্য-বিবাহ-প্রথার পরিণামে অকালে সন্তানজন্ম ও স্বাস্থ্যভঙ্গ, মৃত্যু, বিধবার সংখ্যা-গরিষ্ঠতা, তেমনি ও-দেশের স্বেচ্ছাচারী বিবাহের পরিণাম যে সর্বদা শুভ হয় না, সেই সত্যও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। যথেচ্ছা বিবাহ বা বিবাহে অবাধ স্বাধীনতার কুফল সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেছেন।

বেদান্তের একনিষ্ঠ উপাসক বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সকলের আত্মায় শক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যে মাতৃরূপ, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণতি জানিয়ে গভীর কণ্ঠে নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'ভদ্রে, বিশ্বের সকল নারীই আমার মা।' স্নেহ, দয়া, ক্ষমা ও করুণার প্রতিমূর্তি যে মাতৃপদ, সীতার মতো পতিব্রতা সতী যে সহধর্মিণী রূপ, স্বামী বিবেকানন্দের মতে তাহাই নারীজাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

[জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীর ডায়েরী হইতে]

(পূর্বানুবৃত্তি)

ভালই হউক বা মন্দই হউক, যখনই কোন একটা সদিচ্ছা আমার মনে উদিত হয়, তাহা যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ না হয় ততদিন পর্যন্ত মনে শান্তি লাভ করিতে পারি না। মহারাজ আমাকে এতটা স্নেহ করা সত্ত্বেও কিছুদিন যাবৎ কেবলই মনে হইতেছিল, মহারাজ যদি একবার আমাকে বলিতেন যে, 'তোরা সব আমার'—তাহা হইলে মনের সমস্ত খেদ মিটিয়া যাইবে; কারণ তখন আমি চিরদিনের জন্য যে তাঁহারই হইয়া যাইব। এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা হৃদয়মন জুড়িয়া বসিল। অথচ মনে মনে বিচার করিতাম, 'তোরা সব আমার'—এইরূপ কথাটি কেহ কখনও কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলে কি? কিন্তু শুষ্ক তর্কবিচারে প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষা কখনও মিটে কি? এই ভাবে তীব্র চিন্তার জন্য একদিন নিদ্রাকালে দেখিলাম—মহারাজ যেন আমার নিকট বসিয়া বলিতেছেন, 'আরে তোরা যে সব আমার; তা কি আর মুখে বলতে হয়?' জাগ্রত হইয়া মনে মনে বলিলাম; এরূপ স্বপ্ন চিন্তারই ফলমাত্র। মহারাজ যদি নিজমুখে ঐ-কথা জাগ্রত অবস্থায় আমাকে বলেন, তবে এই স্বপ্ন বিশ্বাস করিব ও মনে শান্তি পাইব। যখনই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাই, তখনই কেবল ঐ এক চিন্তা 'মহারাজ যদি একবার ঐ কথা আমাকে বলিতেন।' এইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। কিছুদিন পর এমন একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমার এই মনোবাঞ্ছা আশ্চর্যরূপে পূর্ণ হইয়া গেল। ঘটনাটি এই:

পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষ-নিবারণকল্পে প্রথম মহুলা গ্রামে ও পরে সারগাছিতে গমন করেন এবং ক্রমে সারগাছিতে একটি ছোটখাট আশ্রম গড়িয়া তোলেন। সেই আশ্রমে ধীরে ধীরে আতুর, বোবা ও দীনদুঃখী ছেলেদের থাকার, আহারের ও শিক্ষার সুব্যবস্থা করেন। যাহা হউক, আমি যখন পূর্ববঙ্গের এক সরকারী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখন বড়দিনের বন্ধের সময় ৩।৪ জন সহাধ্যায়ী সহ মুর্শিদাবাদ শহর ও তৎসংলগ্ন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিতে যাই। দর্শনাদি শেষ করিতে অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গেল! সেই দিনই ট্রেন-যোগে প্রত্যাবর্তন করিব স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইল। বহরমপুর পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম যে, সারগাছিতে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি আশ্রম আছে এবং উহার অধ্যক্ষ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য; সেখানে গেলে আশ্রয় মিলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেইদিকে ছুটিলাম, আশ্রমে পৌঁছিয়া জানিলাম, তিনি বহরমপুর গিয়াছেন—সন্ধ্যার সময় ফিরিবেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমরা সেখানেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বে দেখিতে পাইলাম, একজন উষ্ণীষধারী গৈরিক আলখাল্লা-পরিহিত সন্ন্যাসী দীর্ঘদণ্ডহস্তে আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহার সৌম্য মধুরমূর্তি দর্শনেই আমরা আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। তিনি আসন গ্রহণ করিলে আমরা আমাদের বিপদের

কথা নিবেদন করিলাম এবং তিনি অতি যত্ন-সহকারে তাঁহারই থাকিবার খড়ের ঘরের পূর্ব বারান্দায় আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, নৈশ আহারেরও সুব্যবস্থা হইল। আহারান্তে তিনি আমাদের নিকট তাঁহার রোমাঞ্চকর তিব্বত-ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বিপৎসঙ্কুল গিরি উল্লঙ্ঘন ও নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শুনিতে লাগিলাম। শুনিতে শুনিতে রাত্রি অধিক হওয়ায় আমরা তাঁহার আদেশমত নির্দিষ্ট স্থানে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিবস তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম। ১৯১৫ খৃঃ বড়দিনের সময় (ডিসেম্বর মাসে) এই ঘটনাটি ঘটে। তারপর আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। ইতোমধ্যে আমরা কলিকাতায় আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা বলিতে যাইয়া অন্য ঘটনার অবতারণা কেন করিতে হইল, তাহা এখন বলিতেছি।

পূজ্যপাদ গঙ্গাধর মঃ (অখণ্ডানন্দজী) খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন ; গ্রহণী (উদরাময়) রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সেই বলিষ্ঠ দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমহারাজ সেই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলরাম-মন্দিরে আনাইয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। আমি ও অপর একজন বন্ধু (বর্তমানে সন্ন্যাসী) একদিন বলরাম-মন্দিরের সেই সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত হলঘরে বসিয়া পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের পদসেবা করিতেছি। তাঁহাকে আমাদের সেই সারগাছি আশ্রমে যাওয়ার ও রাত্রিবাসের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেই তিনি আনন্দে বালকের ন্যায় নানা কথা বলিতে লাগিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমহারাজ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য-জনক অভিজ্ঞতার কথাও বলিলেন। ঘটনাটি এই : তিনি যখন সারগাছিতে ভুগিতেছিলেন, তখন তিনি একবার দেহত্যাগের সংকল্প করিয়াছিলেন। আশ্রমে তখন বাবুরাম মহারাজের তিরোধান উপলক্ষে ভজনকীর্তন ও দরিদ্র-নারায়ণের সেবাদি চলিতেছে। তিনি স্বীয় শয়নকক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সেই ধ্যান-যোগে দেখিতে পাইলেন—এক মাতৃমূর্তি নিকটে আসিয়া বলিতেছেন, 'তুই যাবি ? দাদা-(বাবুরামদা)-র কাছে যাবি ? তবে আমার সঙ্গে আয়।' গঙ্গাধর মহারাজ যেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূরে আসিয়াই দেখিলেন একটি প্রশস্ত নদী—তাহা অতিক্রম করিবার জন্য একটি সেতু রহিয়াছে। তিনি সেই সেতুর উপর দিয়া নদীর মধ্যস্থলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখিলেন—শ্রীশ্রীমহারাজ দুইহস্ত প্রসারিত করিয়া অপর দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন 'গঙ্গাধর, তুমি এখনই কোথায় যাবে ? তোমাকে এখনও অনেক কাজ করতে হবে। তোমার যাওয়া হবে না।' ধ্যানযোগে শ্রীশ্রীমহারাজের এই আদেশ পাওয়ামাত্র তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল এবং তিনিও শরীর ত্যাগ করিবার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ তাঁহার এই রোমাঞ্চ-কর অভিজ্ঞতার কথা যখন আমাদের নিকট আনুপূর্বিক বলিতেছিলেন, তখন শ্রীশ্রীমহারাজ বলরামবাটীর দ্বিতলগৃহের দক্ষিণদিকের সেই প্রশস্ত হলঘরের ভিতর দিয়া এবং কখনও বাহিরের বারান্দায় পদচারণা করিতেছিলেন এবং গঙ্গাধর মহারাজের গল্পটাও শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে মহারাজ একবার বলিয়া

উঠিলেন, 'গঙ্গাধর, চিনলে না তো হে, চিনলে না।' গঙ্গাধর মহারাজও প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন, 'মহারাজ, এখন চিনেছি। আর ফাঁকি দেওয়া চলবে না।' দুইজনের মধ্যে এইরূপ রঙ্গরস চলিতেছে। হঠাৎ মহারাজ গঙ্গাধর মহারাজকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওর সঙ্গে তোমার এতটা পরিচয় হ'ল কি ক'রে?' তিনিও রহস্যভরে বলিলেন, 'ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ও তো আমারই হয়েছে।' আমার মনে কিন্তু সর্বক্ষণ সেই একই চিন্তা রহিয়াছে, মহারাজ যদি একবার বলিতেন 'তোরা সব আমার', তাহা হইলে চিরদিনের জন্য তাঁহারই হইয়া যাইতাম। মহারাজ একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একটি ছোট বালককে দিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি ভাবিলাম, বোধ হয় মহারাজের তামাক সেবন করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; তাই তামাক সাজিবার জন্য হয়তো আমাকে ডাকিয়াছেন। আমি ত্রস্তপদে সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম। তিনি আমাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিলেন, 'হ্যাঁরে, তুই এত কি ভাবছিস? তোরা যখন যেখানে থাকিস, তোরা সব আমার। বুঝলি, তোরা সব আমার।' বহুদিন-পোষিত আমার প্রাণের ঐকান্তিক ইচ্ছাটি মহারাজ আজ অপ্রত্যাশিত-রূপে পূরণ করিয়া আমাকে যে কি আনন্দ ও তৃপ্তি প্রদান করিলেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। আনন্দে আত্মহারা হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মহারাজের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম। অন্তর্যামী ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বরকোটি সন্ন্যাসীর পক্ষেই অপরের মনের অন্তরালে যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব—অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে।

আমরা যে-কালে বলরাম-মন্দিরে যাতায়াত করিতেছি, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে সেই কালের কয়েকটি ঘটনা নিম্নে বিবৃত করিলাম, যাহার সাহায্যে মহারাজের সরলতা, রঙ্গপ্রিয়তা প্রভৃতি দিকগুলির কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি বলরাম-মন্দিরের হলঘরে বসিয়া আছি। এমন সময় দেখিলাম শ্রীযুক্ত ললিত চট্টোপাধ্যায় (যিনি তাঁহার বিরাট গোঁফের জন্য সচরাচর 'কাইজার'-নামে অভিহিত) তদানীন্তন কলিকাতা রঙ্গমঞ্চের প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীঅপরেশ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া বলরাম-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজকে ভূমিষ্ঠ প্রণামান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত অপরেশবাবুর ঘাড়টি ডানদিকে একটু বাঁকা ছিল। কিয়ৎকাল মহারাজের সঙ্গে কথাবার্তার পর 'কাইজার' তাঁহার স্বভাবসুলভ সরলতাসহ মহারাজকে বলিয়া উঠিলেন—'মহারাজ! আপনি ইচ্ছা করলে তো সবই করতে পারেন। এই অপরেশের ঘাড়টি একটু বাঁকা; থিয়েটার করতে বড় অসুবিধা হয়। তার ঘাড়টা সোজা ক'রে দিতে পারেন?' মহারাজ সেইকথায় মৃদু হাস্য করিয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। বলা বাহুল্য, এই ব্রহ্মবিদ্ আনন্দময় পুরুষের সান্নিধ্যে সকলেই কিরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিত, ঘটনাটি তাহারই একটি নিদর্শন।

সদানন্দময় মহারাজের স্বভাবটি ছিল শিশুর মতোই সরল। ছোট ছোট বালকদের সহিত এমনই রঙ্গরস করিতেন যে, তাহা দেখিয়া মনে হইত যেন সেইকালে তিনি তাহাদেরই একজন হইয়া গিয়াছেন।

এইরূপ একদিন বলরাম-মন্দিরে গিয়াছি। সেদিন মহারাজ মহানন্দে ছোটদের সঙ্গে খেলায় রত। তিনি হলঘর এবং বারান্দার মধ্যে লুকোচুরি খেলিতেছেন এবং ছেলের দল মহারাজের পিছু লইয়াছে। হঠাৎ মহারাজ তাঁহার নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ছেলের দল কোলাহল করিতে লাগিল। এদিকে মহারাজ ঘরে ঢুকিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন। ছেলেদের ভয় দেখাইবার জন্য তাঁহার শয়নঘরে একটি বিকটাকৃতি মুখোশ ছিল। তিনি সেটি পরিয়া আপাদমস্তক কালো কম্বলে আবৃত করিলেন এবং হঠাৎ দরজাটি খুলিয়া বিরাট এক 'হুম্' শব্দ করিয়া হলের মধ্যে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন! ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিকট মূর্তি দেখিয়া ছেলের দল চিৎকার করিয়া উঠিল। হঠাৎ ঐরূপ দেখিয়া আমরাও ভয়ে অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলাম। পরে যখন সেই বিকট আবরণ দূরে ফেলিয়া মহারাজ আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন চারিদিকে হাসির তুফান ছুটিতে লাগিল। ঘটনাটি সেদিন যাহাদের প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, বালকস্বভাব মহারাজের বালকভাবটি তাহাদের অন্তরে চিরকালের জন্য সঞ্চিত হইয়া থাকিবে।

এইভাবে নির্দিষ্ট দিনগুলি অলক্ষিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। মহারাজের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, মহারাজকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। ইহাতে পড়াশুনার যে বিষম ক্ষতি হইতে লাগিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। মধ্যে মধ্যে আমার পিতৃদেব পড়াশুনা কিরূপ হইতেছে তৎসম্বন্ধে জানিবার জন্য পত্রাদি লিখিতেন। কলিকাতার মতো ব্যয়সাধ্য স্থানে রাখিয়া আমাকে পড়ানো যে তাঁহার পক্ষে খুবই কষ্টকর, তাহাও আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু মনের এই অবস্থায় মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অভিনিবেশ সহকারে পড়াশুনা করাও প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। একদিন মনে খুব অশান্তিবোধ করায় বলরাম-মন্দিরে যাইয়া মহারাজকে অকপটে বলিয়াই ফেলিলাম, 'মহারাজ, আমার কি একটা যেন হয়েছে। সর্বদা আপনার কাছে এসে বসে থাকতে ইচ্ছা হয়। সেজন্য পড়াশুনা করতে পারি না।' তিনি আমার কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'সে কি রে, পড়াশুনা করবি না তো কি মূর্খ হয়ে থাকবি? এখন থেকে বেশ ক'রে পড়াশুনা করবি।' আমি তাঁহার আশীর্বাদ লইয়া ছাত্রাবাসে ফিরিলাম। আশ্চর্যের বিষয় তখন হইতেই মন অনেকটা হালকা হইয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে পাঠ্যপুস্তকও মনোযোগ সহকারে পড়িতে লাগিলাম। এই ঘটনার পর অনেকদিন আর মহারাজকে দর্শন করিতে যাই নাই—পরীক্ষাও অতি সন্নিকট। মহারাজের কথামত আমি পড়াশুনা লইয়া খুবই ব্যস্ত রহিয়াছি। তাই মহারাজকে অনেকদিন দর্শন করিতে আসিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে একদিন শিবরাত্রির প্রায় দুইদিন পর মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মঠের ঠাকুরঘরে (পুরাতন ঠাকুরঘর) শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরঘরের সম্মুখে ধ্যান করিতেছি। ঠাকুরঘরে তখন কেহই ছিলেন না। আমি ধ্যান করিতেছি, এমন সময় মনে হইল, ঠাকুরঘরের ভিতর হইতে সহসা যেন কেহ আমার সম্মুখে ভারী পদক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এইরূপ মনে হওয়ায় আমি চোখ খুলিয়া তাকাইবামাত্রই দেখিলাম, আমার সম্মুখে পূজ্যপাদ মহারাজ স্বয়ং দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীমন্দিরে পরম পূজ্যপাদ মহারাজকে এইভাবে সম্মুখে দেখিয়া আমি এককালে বিস্ময়ে ও

আনন্দে নির্বাক্ হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলাম। মহারাজ আমাকে বলিলেন, 'থাক্, মন্দিরে প্রণাম করতে নেই।' তৎপরে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মহারাজকে প্রণাম করিবার পর তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'কি রে, তুই এতদিন আসিস্‌নি! Long absence! এত রোগা হয়ে গিয়েছিস কেন?'—বলিয়াই বলিলেন, 'যা, যা, নিচে রামলাল-দাদা আছেন। তাঁকে প্রণাম করগে যা।' মহারাজের অপার স্নেহে আনন্দে আমার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল! আমি কোথাকার কোন্ সামান্যতম যুবক মাত্র। তাহার জন্য যুগাবতারের মানসপুত্র, শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীশ্রীমহারাজের এত স্নেহ, এত করুণা ও এত অভাববোধ। ব্রহ্মদর্শী পুরুষের সেই করুণা, সেই স্নেহ, সেই অনুকম্পাই আমার উত্থান-পতনে আন্দোলিত দীর্ঘজীবনের একমাত্র পাথেয় হইয়া রহিয়াছে। জীবনসায়াহ্নে অক্ষয় স্মৃতির সেই পৃষ্ঠাগুলিকে উলটাইয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার প্রয়াস করিতেছি মাত্র।

এম-এ পরীক্ষা বেশ ভালোভাবেই হইয়া গেল—পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইবে বলিয়াই ধারণা হইল। পরীক্ষা শেষ হইবার পরই পিতৃদেব অমোকে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিতে লাগিলেন এবং বিনাকারণে কলিকাতায় বসিয়া থাকা যে কোনকারণেই সঙ্গত নহে, তাহাও চিঠিতে সম্যক্ বুঝাইয়া দিতেন। ইহার যৌক্তিকতা বুঝিতে আমারও কোনরূপ অসুবিধা হইত না। কিন্তু এখন পর্যন্ত মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করা হয় নাই এবং কলিকাতা হইতে পূর্ববঙ্গে চলিয়া গেলে দীক্ষাগ্রহণ যে সুদূরপরাহত হইবে, তাহা মনে করিয়া দারুণ অশান্তি বোধ করিতে লাগিলাম। পরীক্ষার চিন্তায় দীক্ষার কথাটি এতদিন প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছিল—এখন মনের বোঝাটি সরিয়া যাওয়ায় দীক্ষা লইবার আকাঙ্ক্ষা পুনঃ প্রবলবেগে জাগিয়া উঠিল। এই সময় মহারাজ রামকৃষ্ণপুরের শ্রীনবগোপাল ঘোষ মহোদয়ের গৃহে কিছু-দিনের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। আমি ঘোষ-মহাশয়ের পুত্র নীরদের (পরে স্বামী অম্বিকানন্দ) সঙ্গে উক্ত ঘোষ-মহাশয়ের বাড়িতে গমন করি। এই সময় আমরা মেছুয়াবাজারে একটি ছাত্রাবাসে থাকিতাম। সেই ছাত্রাবাসের একটি সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যেই বন্ধুটি মহারাজের নিকট আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। অনেক আলোচনার পর যখন ফিরিবার সময় হইল, তখন আমি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মহারাজ, আমার দীক্ষা কবে হবে?' মহারাজ একটু যেন বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'তুই কোথায় থাকিস! তোকে আজকাল দেখতেই পাই না। এর মধ্যে কতজনের দীক্ষা হয়ে গেল।' ইহা শুনিয়া আমার মনটা কাঁদিয়া উঠিল। ভাবিলাম—আমার কি দুর্ভাগ্য! এত লোকের দীক্ষা হইয়া গেল—অথচ আমার দীক্ষা হইল না। মহারাজও তো ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে, আমি আর পূর্বের ন্যায় ঘন ঘন তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করি না। মনটি আত্মগ্লানিতে ভরিয়া গেল। রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা আবার নূতন হইয়া তীব্র বেগে জাগিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম, দেশে ফিরিবার পূর্বেই মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষা লইতে হইবে। কিন্তু আমার ইচ্ছাতেই যে সহসা দীক্ষা হইয়া যাইবে, তাহা তো নয়। তিনি যদি কৃপা করিয়া দীক্ষা দেন, তবেই উহা সম্ভব হইবে।

মহারাজ এখন বেলুড় মঠে রহিয়াছেন। দীক্ষা হইতেছে না বলিয়া মনে ভয়ানক অশান্তি

হইতেছে। সত্বর পিতৃ-আদেশে দেশেও ফিরিতে হইবে। নিরুপায় হইয়া একদিন বেলুড় মঠের পুরাতন দ্বিতলবাটীর সম্মুখে অবস্থিত গঙ্গায় স্নান করিবার পাকা ঘাটের সিঁড়ির একপ্রান্তে বসিয়া মনের দুঃখে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলাম। আর মনে মনে গঙ্গা-সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম—মহারাজ ভিন্ন অপর কাহারও নিকট হইতে এ-জীবনে দীক্ষা গ্রহণ করিব না, ইহাতে যদি জীবনে কখনও দীক্ষা নাও হয় তাহাতেও দুঃখ নাই, তিনিই আমার জীবনের একমাত্র গুরু। ভাবিলাম—আজ শেষবার মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিব। মহারাজ তখন মঠের দ্বিতলগৃহের বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট গিয়া সাশ্রুনয়নে দীক্ষার কথা জানাইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন—'পরশু তোর দীক্ষা হয়ে যাবে, দেখিস এ-কথা আর কাউকেও যেন বলিসনি।' আমি আনন্দে আট-খানা হইয়া হোস্টেলে ফিরিলাম, কিন্তু মহারাজের নিষেধাজ্ঞায় কি মহাবিপদে পড়িলাম! কেমন করিয়া দীক্ষাদির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিব, তাহা এক সমস্যা হইয়া উঠিল।

পূর্বে উল্লিখিত আমার সেই বন্ধুটিকে না জানাইয়া কেমন করিয়াই বা স্বার্থপরের ন্যায় একাকী দীক্ষা লইব? নানাপ্রকার দুর্ভাবনায় মন ভয়ানক ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। যাহা হউক, আমি দীক্ষার কথা না বলিয়া নীরদকে কয়েকটি জিনিস আমার জন্য ক্রয় করিয়া দিবার জন্য বলিলাম। সে তো জিনিসের তালিকা দেখিয়াই বুঝিয়া ফেলিল যে, আমার দীক্ষা হইবে, সে তখনই আমার অপর বন্ধুটিকে সব বলিয়া দিল এবং তাহারও দীক্ষার সামগ্রীর সব ব্যবস্থা হইয়া গেল, নির্দিষ্ট দিনে উভয়ে মঠে উপস্থিত হইলাম, সেদিন আমাদের তিনজনেরই দীক্ষা হইবে। পূর্বের সেই ঠাকুর-মন্দিরের পশ্চিমস্থ পশ্চাৎ দিকের ঘরে দীক্ষার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা তিনজনে পূর্বদিকের বারান্দায় ফল-পুষ্প-বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত স্ব-স্ব পাত্র সম্মুখে লইয়া বসিয়া রহিলাম। একে একে দু-জনের ডাক পড়িল। তাহাদের দীক্ষা-সমাপনান্তে আমার ডাক পড়িল, আমি ত্রস্তপদে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া নির্দিষ্ট আসনে শ্রীশ্রীমহারাজের সম্মুখে আসিয়া বসিলাম। সর্বপ্রথমে জনৈকা মহিলা ভক্তের দীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্যে একটি হোমের ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই হোমাগ্নিতে প্রদত্ত হবি ও বিল্বপত্রের সুগন্ধে ঘরটি তখনও ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, মহারাজকে প্রণাম করিয়া মন কতকটা স্থির করিয়া দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলাম, এবং আমার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার রাতুল চরণে ঢালিয়া দিবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। যথারীতি দীক্ষাদি হইয়া গেল, তিনি আমাকে গুরুদক্ষিণা দিবার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন—আমি মনে মনে নিজেকেই দক্ষিণা-হিসাবে দিয়াছি বলিয়া চিন্তা করিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'না রে, কিছু ফলাদিও দক্ষিণা-হিসাবে দিতে হয়।' তিনি আমার মনের কথা জানিতে পারিলেন, তাহা ভাবিয়াই আকুল। যাহা হউক, আমি পাত্র হইতে একটি ফল লইয়া মহারাজের হাতে দিলাম। তিনিও আমার শীর্ষদেশ স্পর্শ করিয়া স্বীয় মন্ত্র জপ করিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। আজ পবিত্র সুরধুনীতীরে ত্রিকালদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের কৃপার অধিকারী হইয়া মনে আনন্দের অবধি রহিল না। আমার মতো অকিঞ্চন একজন যুবককে তিনি চিরকালের জন্য আপনার করিয়া লইলেন—ইহার চেয়ে অধিক সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? বেলুড় মঠের সেই স্মরণীয় দিনের পুণ্যস্মৃতি জীবনে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। আজ আমার জীবনেও আচার্য শঙ্করের—সেই মহাবাণী 'দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥'— সফল হইল; ইহা শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণলীলার কালানুক্রম-সমস্যা

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যত লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সবগুলি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে ঘটিয়াছিল। কেবলমাত্র প্রথম ও একাদশ স্কন্ধে অতি সংক্ষেপে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তনের ও মুষলপর্বের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ সময়ে বা কত বয়সে কি কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিলে তাঁহার লীলা অনুধাবন করা সহজ হয়। অথচ দুই-চারিটি উল্লেখ ছাড়া মহাভারত ও ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বয়সের কথা বড় একটা দেখা যায় না। অস্পষ্ট ও অপ্রত্যক্ষভাবে বয়সের কথা যেখানে বলা হইয়াছে, তাহার সহিত অন্যত্র যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সামঞ্জস্য করা সহজ নহে। মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও পদ্মপুরাণে প্রসঙ্গক্রমে বয়স-সংক্রান্ত যে-সকল উক্তি ও বর্ণনা দেখা যায়, সেগুলির মধ্যে কতটা সমন্বয় সাধন করা যায়, তাহাই বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমে মহাভারতের সাক্ষ্যই আলোচনা করা যাক। মহাভারতকে প্রবহমান নদীর সহিত তুলনা করা হয়। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ছাপ উহার উপর পড়িয়াছে। বহুযুগ ধরিয়া বিভিন্ন প্রদেশের সুধীবৃন্দ এই গ্রন্থ আবৃত্তি করিয়াছেন, ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও বিভিন্ন হরফে সেইজন্য বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্ন রকমের পাঠ দেখা যায়। অনেক শ্লোক এমনকি কোন কোন বর্ণনা ও আখ্যান এক এক প্রদেশের পুঁথিতে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তামিল, তেলুগু, মালায়ালম্, কন্নড়, দেবনাগরী, ওড়িয়া, নেওয়ারী, বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন অক্ষরে লিখিত বহু পুঁথির পাঠ বিচার করিয়া পুনার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট মহাভারতের এক অপূর্ব প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শেষের ছয়টি ছোট পর্ব ছাড়া আর সকল পর্বের প্রমাণ আমরা ঐ সংস্করণ হইতে দিব। যেখানে অন্যান্য সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে উহা স্বতন্ত্রভাবে নাম ধরিয়া উল্লেখ করিব।

মহাভারতের বর্ণনা পড়িলে মনে হয়—কৃষ্ণ ও অর্জুন সমবয়স্ক সখা। উভয়ে একত্রে শয়ন, ভোজন, বনভ্রমণ প্রভৃতি করেন। পাণ্ডবদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের দেখা-সাক্ষাতের কথা যেখানে যেখানে বর্ণিত হইয়াছে, সেইখানেই দেখা যায় যে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও ভীমকে অভিবাদন করেন এবং তাঁহারাও দুইজন গুরুজনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্বাদ জানান (৩।২৩। ৮৩)। নকুল ও সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করেন আর অর্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। মহাভারতের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের পুঁথিগুলিতে আছে যে, কৃষ্ণ অর্জুন অপেক্ষা তিন মাসের বড় আবার বলরাম কৃষ্ণের অপেক্ষা তিন মাসের বড়।[১]

১ শ্রীজীবের মতে বলরাম শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কয়েকদিনের বড়। (গোপালচম্পূ ৩।৬২-৭০) গর্গসংহিতার (গোলোক খণ্ড ১০।২৭-২৮) মতে শ্রীকৃষ্ণের ১৬ দিন পূর্বে বলরামের জন্ম হয়। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড (২৪ অঃ) অনুসারে ভাদ্র মাসে বলরামের জন্ম ও তাহার পরবৎসর শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণের জন্ম—সুতরাং বলরাম কৃষ্ণ অপেক্ষা এক বৎসরের বড়।

কিন্তু মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষক ডাঃ সুখথঙ্কর ঐ-সব উক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্জন করিয়াছেন। যাহা হউক অর্জুনের বয়সের হিসাব হইতেও কৃষ্ণের বয়স অনুমান করা যাইতে পারে।

ডাঃ সুখথঙ্কর আদিপর্বের সম্পাদনাকালে দেখিতে পান যে, কাশ্মীরের সারদা-অক্ষরে লেখা পুঁথিখানিতে, তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল গ্রন্থাগারের ১,১২৬ সংখ্যক পুঁথিতে ও ১,৮০২ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিপি-করা লাহোর ডি. এ. ভি. কলেজের ৪৪ সংখ্যক পুঁথিতে পাণ্ডবদের বয়সসূচক কয়েকটি শ্লোক আছে। প্রথমোক্ত পুঁথিখানি সাধারণতঃ খুব মূল্যবান্ হইলেও ঐ শ্লোকগুলি অন্যান্য পুঁথিতে পাওয়া যায় না বলিয়া ও স্পষ্টতঃ উহাতে একটা গোঁজামিল দিবার চেষ্টা দেখা যায় বলিয়া তিনি উহা বর্জন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সংস্করণের পরিশিষ্টে (পৃঃ ৯১৩) উহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ঐ শ্লোকগুলি বঙ্গবাসী সংস্করণেও নাই, তবে 'নির্ণয় সাগর প্রেস' সংস্করণ ও হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সংস্করণে অকৃত্রিম রূপে গৃহীত হইয়াছে। শেষোক্ত সংস্করণে (১।১১৭।৮-১৫) ও পুনার আদিপর্বের পরিশিষ্টে প্রদত্ত শ্লোকগুলির ভাবার্থ এই যে, যখন যুধিষ্ঠিরের বয়স ১৬, ভীমের ১৫, অর্জুনের ১৪ ও নকুল-সহদেবের ১৩ তখন তাঁহারা হাস্তিনগরে যান। সেখানে ধৃতরাষ্ট্রের অভিভাবকতায় তাঁহারা দুর্যোধনাদির সহিত ১৩ বছর বাস করেন। তারপর ছয়মাস কাল বারণাবতে থাকিয়া জতুগৃহ হইতে নির্গত হন। তারপর ছয়মাস কাল একচক্রাপুরীতে ও এক বৎসর দ্রুপদ-গৃহে বাস করেন। তারপর হাস্তিনপুরে ফিরিয়া আসিয়া তথায় ৫ বৎসর ও ইন্দ্রপ্রস্থে ২৩ বৎসর বাস করেন। যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠিরের বয়স প্রায় উনষাট বৎসর ও অর্জুনের ৫৭ বৎসর হয়। তারপর দ্যূতক্রীড়ায় বনবাস ১২ বৎসর, অজ্ঞাত বাস ১ বৎসর ও তৎপরে ৩৬ বৎসর ধরিয়া যুধিষ্ঠির রাজ্য করেন ও মহাপ্রস্থানের পথে ছয়মাস কাটাইয়া ১০৮ বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন। এই হিসাব অনুসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জুনের তথা শ্রীকৃষ্ণের বয়স হয় ৭০ বৎসর।

এই হিসাবের মধ্যে অনেকগুলি গলদ আছে। প্রথমতঃ বিরাট-গৃহে যখন বৃহন্নলাবেশী অর্জুন উত্তরাকে নাচগান শিখাইতেন, তখন তাঁহাকে যুবক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্যোগকালে সঞ্জয় কৃষ্ণ ও অর্জুনকে তরুণ ও শ্যামকলেবর বলিয়াছেন (৫।৫৮।১০), দ্রোণ-পর্বেও অনুরূপ উক্তি আছে। সত্তরবৎসরবয়স্ক ব্যক্তির সহিত বিরাটরাজা উত্তরার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন—এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ জতুগৃহে পাণ্ডবেরা ছয়মাস নহে, 'পরিসংবৎসর' ছিলেন বলিয়া আদিপর্বে বর্ণিত হইয়াছে (১।১৪৮।১১)। তৃতীয়তঃ দ্যূতক্রীড়ার ১৩ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল বলা হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া হাস্তিনগরে যাইয়া কুন্তীর সহিত দেখা করেন, তখন কুন্তী আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, তিনি চৌদ্দ বৎসর দ্রৌপদীকে দেখেন নাই (৫।৮৮।৮৬)। ইহাতে মনে হয় যে, বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের পর সন্ধির প্রস্তাব তোলার সময় প্রায় এক বৎসর অতীত হইয়াছিল। চতুর্থতঃ ঐ হিসাব-মতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ২৯ বৎসর পরে দ্যূতক্রীড়া হয়। বিবাহ-সময়ে দ্রৌপদী পূর্ণ যুবতী—তাঁহাকে দেখিয়া সমাগত রাজারা ও পঞ্চপাণ্ডব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যদি ধরা যায় যে, তখন তাঁহার বয়স ১৬, তাহা হইলে দ্যূতক্রীড়ার সময় তাঁহার বয়স ৪৫ এবং ১২ বৎসর বনবাসের পর

বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসের সময় দ্রৌপদীর বয়স হয় ৫৭। ঐ বয়সের নারীকে দেখিয়া কীচক মুগ্ধ হইবেন অথবা বিরাটের মহিষী দ্রৌপদীকে স্বামীর চোখের আড়ালে রাখিবার চেষ্টা করিবেন, ইহা সম্ভব মনে হয় না। এত কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও ডাঃ সুখথঙ্কর ঐ শ্লোকগুলি সম্বন্ধে বিদ্রূপসহকারে লিখিয়াছেন: Almost all these useful details are lacking in the northern recension, and I doubt whether they can even be reconstructed from the meagre data of this recension on these points.[২]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণকে যেমন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ বলা যায় না, তেমনি আবার তাঁহাকে ৪২ বৎসরের যুবক বলিয়াও ধরা যায় না। ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় বলেন যে, যুদ্ধের সময় অভিমন্যুর বয়স ষোলর কম হইতে পারে না এবং অর্জুনের ২৫ বছর বয়সের আগে অভিমন্যুর জন্ম হয় নাই—সুতরাং 'ঠিক ৪২ বৎসর বয়সেই কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন' (পুরাণ-প্রবেশ, পৃঃ ৯২)। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অন্ততঃ ১৪ বৎসর পূর্বে রাজসূয় যজ্ঞ হইয়াছিল। গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের মত মানিতে হইলে রাজসূয় যজ্ঞের সময় কৃষ্ণের বয়স হয় আঠাশ। অথচ ঐ যজ্ঞসভায় কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধও আসিয়াছিলেন দেখা যায় (২।৩১।১৫)। আঠাশ বছর বয়সের ব্যক্তির পৌত্রের দূরদেশে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আসা অসম্ভব।

মহাভারতে অভিমন্যুর বিবরণ যেভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত তাঁহার বয়সের বর্ণনার সামঞ্জস্য করা যায় না। ডাঃ সুখথঙ্কর বলেন যে, অভিমন্যুর ষোল বছর বয়সে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইবে—এই কথা মাত্র ৪।৫ খানি পুঁথিতে পাওয়া যায়, তাই তিনি উহাকে প্রক্ষিপ্ত ধরিয়া পরিশিষ্টে (পৃঃ ৮৯৭ আদিপর্ব) স্থান দিয়াছেন। বাংলাদেশে প্রচলিত মহাভারতে অবশ্য ঐ শ্লোক আছে (বঙ্গবাসী সং আদি ৬৭।১১৭, সিদ্ধান্তবাগীশ সং আদি ৬২।১১৮)। যাহা হউক, সকল সংস্করণের মহাভারতেই আছে যে, রাজসূয় যজ্ঞ শেষ হইবার পর সুভদ্রার পুত্রের সহিত দ্রৌপদীর পুত্রেরা পার্বতীয় রাজাদিগকে প্রত্যুদ্‌গমন করিয়াছিলেন (২।৪২।৪৩)। অভিমন্যু যদি ঐ সময়ে দশ বছর বয়সের হন, তাহা হইলে তখন দ্রৌপদীর কনিষ্ঠ পুত্রটির বয়স ৩।৪ বছরের বেশি হইতে পারে না। দ্রৌপদীর পাঁচটি ছেলে এক এক বছরের ছোট এবং তাঁহারা সকলেই অভিমন্যুর অপেক্ষা বয়সে ছোট। দ্রৌপদী নিজেই বলিয়াছেন যে, অভিমন্যুকে সামনে রাখিয়া তাঁহার ছেলেরা কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করিবে (৫।৮০।৬৭-৬৮)। অভিমন্যু বড় ছেলে না হইলে অর্জুন তাঁহার সঙ্গেই উত্তরার বিবাহ দিতেন না। দ্যূতক্রীড়ার সময়ে দ্রৌপদী তাঁহার পুত্র প্রতিবিন্ধ্যকে মনস্বী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২।৬৮।২৯)। সুতরাং সেই সময়ে তাহার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হইয়াছে, সে নেহাৎ শিশু নহে। বনপর্বে দেখি দ্রৌপদী গর্বের সহিত কৃষ্ণকে বলিতেছেন যে, তাঁহার পঞ্চপুত্র প্রদ্যুম্নের মতোই ধনুর্বেদবিশারদ ও যুদ্ধে শত্রুদের অজেয়, সুতরাং তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের অত্যাচার সহ্য করিবে কেন? (৩।১৩।৬৪-৬৭)। উদ্যোগপর্বে দেখি যে, যখন কৌরবদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল, তখন দ্রৌপদী প্রবল আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিলেন যে, সন্ধি নহে, যুদ্ধই চাই—কেহ যদি যুদ্ধ না করে, তবে আমার বৃদ্ধপিতা ও আমার মহারথ পুত্রেরা অভিমন্যুর নেতৃত্বে কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে (৫।৮০।৬৭-৬৮)।

২ আদিপর্বের Prolegomena P. XXXV

ইহা কেবল মায়ের হৃদয়ের পুত্র-গৌরবব্যঞ্জক উক্তি নহে। সাত্যকিও উভয়পক্ষের বলাবল তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে, পাণ্ডবপক্ষে অন্যান্যের মধ্যে সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ও পাণ্ডবদের মতোই বীর্যশালী দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আছেন (৫।৩।১৭)। উদ্যোগপর্বের শেষে ও পাণ্ডবপক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরদের মধ্যে অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের নাম উল্লিখিত আছে (৫।১৯৭।৬ ও ১২)। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাঁহারা কেহই ষোল বছরের কম ছিলেন না। দ্রৌপদীর ছোট ছেলের চেয়ে অভিমন্যু অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন। অভিমন্যুর বয়স ষোল হইলে ঐ ছেলেটির বয়স হয় এগার। এগার বারো তের বছরের ছেলেদের বীরত্বের ভরসা করিয়া নিশ্চয়ই পাণ্ডবেরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই। অবশ্য এ-কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, মহাভারতের আদিপর্বে আছে, মৃত্যুকালে অভিমন্যু অপ্রাপ্তযৌবন ছিলেন (১।২।১৬২)। ইহার সহিত উপরে প্রদত্ত যুক্তির সামঞ্জস্য করা যায় না। অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের বয়সের আলোকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের বয়স-নির্ণয়ের সূত্র পাওয়া যাইতে পারে।

উদ্যোগপর্বে আছে—ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিতেছেন যে, ফাল্গুনি 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমাহূয় খাণ্ডবে অগ্নিমতর্পয়ৎ' (৫।৫১।৯)। নীলকণ্ঠের পূর্ববর্তী টীকাকার অর্জুনমিশ্র ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমা বর্ষাণি যস্য স তথা', অর্থাৎ যখন খাণ্ডবদহন করিয়া অর্জুন অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল তেত্রিশ। কিন্তু নীলকণ্ঠ বলেন, 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমা বর্ষাণি অতীতা ইত্যর্থঃ।' তাঁহার মতে উদ্যোগপর্বের তেত্রিশ বৎসর পূর্বে খাণ্ডবদহন হইয়াছিল। কিন্তু খাণ্ডবদহনের পূর্বে অভিমন্যুর জন্ম বর্ণিত হইয়াছে। নীলকণ্ঠের অর্থ ঠিক হইলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অভিমন্যুর বয়স তেত্রিশ বছরের বেশি হয়, সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায় না। মহাভারতের নবীনতম টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমাহূয়' শব্দের অর্থ করিয়াছেন: দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, ধাতা ও ইন্দ্র—এই তেত্রিশজন দেবতাকে ডাকিয়া অর্জুন অগ্নিকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। শুধু 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ' অর্থে তেত্রিশ দেবতা বুঝাইবে—এমন প্রয়োগ মহাভারতের অন্য কোন স্থলে পাওয়া যায় না। সকল প্রাচীন টীকাকারই ঐ শ্লোক কালবাচক ধরিয়াছেন বলিয়া উদ্যোগপর্বের পুনা-সংস্করণের সম্পাদক ডাঃ সুশীলকুমার দে মন্তব্য করিয়াছেন।

নীলকণ্ঠ বিরাট পর্বের একটি কালবাচক শ্লোক (৪।৩৮।৪১) ব্যাখ্যা করিবার সময় বলেন যে, খাণ্ডবদহনের পর দিগ্বিজয়, রাজসূয় যজ্ঞ প্রভৃতিতে সাড়ে সাত বৎসর কাটিয়াছিল। ইহার সহিত আরও দুই আড়াই বৎসর যোগ করিতে হইবে; কেননা খাণ্ডবদহনে রক্ষা পাইয়া অর্জুনের প্রতি কৃতজ্ঞ ময়দানব যুধিষ্ঠিরের সভা নির্মাণ করিবার জন্য স্ফটিকাদি উপাদান আহরণার্থ কৈলাস-পর্বতস্থিত বিন্দু সরোবরে গিয়াছিলেন এবং ঐ সব জিনিস লইয়া আসার পর তাঁহার সভা নির্মাণ করিতে চৌদ্দমাস সময় লাগিয়াছিল (২।৩।৩৭)। ঐ সভার চমৎকারিত্ব দেখিয়াই নারদ পাণ্ডবদের মনে রাজসূয়-যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা জাগাইয়া দেন। খাণ্ডবদাহের সময় অর্জুন গাণ্ডীব ধনু লাভ করেন। উহার প্রায় দশ বৎসর পরে যদি দ্যূতক্রীড়া হয় এবং তাহার চৌদ্দ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটে, তাহা হইলে খাণ্ডবদাহের ২৪ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিতে হয়। গাণ্ডীব-লাভের পরই যে রাজসূয় যজ্ঞ হইয়াছিল, তাহা নহে। সভা-নির্মাণের পর

যুধিষ্ঠির নিজের প্রজাদের মধ্যে জনপ্রিয়তালাভের চেষ্টা করেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্বারকায় দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার পরামর্শ চান। শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া রাজসূয় যজ্ঞের বাধাবিপত্তির কথা বুঝাইয়া বলেন। জরাসন্ধের অপ্রতিহত শক্তিই ছিল প্রবলতম অন্তরায়। অনেক যুক্তিপরামর্শের পর স্থির হয় যে, জরাসন্ধকে বধ করিতে হইবে। ভীম ও অর্জুনকে লইয়া কৃষ্ণ রাজগৃহে যান। তথায় জরাসন্ধকে বধ করা হয়। জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়। ইহার পর রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সংকল্প দৃঢ়তর হয়। ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব চারিদিকে পৃথক্ ভাবে দিগ্বিজয়ে বাহির হন। এক এক দিকে বহুসংখ্যক রাজাকে জয় করিতে হইয়াছিল। ইহাতেও দুই বছরের কম সময় লাগে নাই।

মহারাষ্ট্রবাসী নীলকণ্ঠ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাশীতে বসিয়া মহাভারতের টীকা লেখেন। তাঁহার একশত বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১,৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীজীব গোস্বামী 'গোপালচম্পূ'র উত্তর চম্পূতে বলেন—

'ভারতরীত্যা ভারতযুদ্ধানন্তরং যুধিষ্ঠিরস্য প্রাজ্যং রাজ্যং তস্য ষষ্টিবর্ষত এব জনিতা' (উত্তরচম্পূ ২৯।৩০, পৃঃ ১,৩৮৩); অর্থাৎ মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে, ষাটবছর বয়সের সময় যুধিষ্ঠির পুরাপুরি রাজ্যলাভ করেন। শ্রীজীব ঐ স্থানে আরও বলিয়াছেন যে, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ সমবয়স্ক এবং তাঁহারা যুধিষ্ঠির অপেক্ষা তিন বছরের ছোট ছিলেন; সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাঁহাদের বয়স ছিল সাতান্ন বৎসর (শ্রীবিষ্টরশ্রবাশ্চার্জুন সমবয়স্কতা-বিশিষ্টতয়া যুধিষ্ঠিরস্য বর্ষত্রয়কনিষ্ঠস্তদানীং সপ্তপঞ্চাশদ্বর্ষতামাপ্স্যতীতি লক্ষ্যতে)। শ্রীজীব তাঁহার সিদ্ধান্তের পোষক কোন যুক্তি বা প্রমাণ দেখান নাই। তিনি কোথাও হয়তো ঐরূপ উক্তি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আধুনিক যুগের দুইজন বাঙালী মনীষী —যাঁহাদের সঙ্গে 'গোপালচম্পূ'র পরিচয় থাকার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে—স্বাধীন যুক্তি প্রমাণ উত্থাপন করিয়া শ্রীজীবের অনুরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম হইতেছেন—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। তিনি একটি প্রবন্ধে জ্যোতিষিক ও অন্যান্য যুক্তিপ্রমাণ দিয়া স্থির করেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ৫৬।৫৭ বৎসর এবং শ্রীকৃষ্ণ ১,৫০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১,৪৫৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। (ভারতবর্ষ, ২১ বর্ষ, ২য় খণ্ড ১৬৪ পৃষ্ঠা)[৩]

দ্বিতীয় পণ্ডিত হইতেছেন—ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত। তিনি বলেন, সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জুন পরস্পরের সহিত এক এক বৎসরের ছোট ও উহার প্রমাণস্বরূপ মহাভারতের 'অনুসংবৎসরং জাতা অপি তে কুরুসত্তমাঃ' (১।১১৫।২) দেখানো হয়; কিন্তু ডাঃ দত্তের মতে ঐ ব্যাখ্যা ভুল, কেননা উহার পরের চরণেই আছে 'পাণ্ডুপুত্রাঃ ব্যরাজন্ত পঞ্চ সংবৎসরা ইব'; উহার অর্থ হইতেছে এক এক বছর বয়সের সময় পাণ্ডবদিগকে পাঁচ পাঁচ বছরের মতন দেখাইত। ডাঃ দত্তের চোখ এড়াইয়া গিয়াছে যে, এই দ্বিতীয় চরণটি পুনা-সংস্করণে প্রক্ষিপ্তবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাহা হইলেও আভ্যন্তরীণ প্রমাণ-বলে তিনি দেখাইয়াছেনঃ ভীম যুধিষ্ঠির হইতে বৎসরাধিক ছোট। ভীমের জন্মের পর পাণ্ডুর

৩ আর্যভট্ট বরাহমিহির ভাস্করাচার্যের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩,১০১ অব্দে কলিযুগের প্রারম্ভ এবং ভাগবতের মতে (১২।২।৩০) যতদিন শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ছিলেন, ততদিন কলি পৃথিবীকে অভিভূত করিতে পারে নাই।

আদেশে কুন্তী একবৎসরব্যাপী এক মাঙ্গলিক ব্রত অনুষ্ঠান করেন। পাণ্ডু নিজেও কঠোর তপস্যা করেন। দীর্ঘকাল পরে তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র যথাভিলষিত সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র বর দেন।···সুতরাং উহার এক বৎসর পরে অর্জুনের জন্ম হয়। এইরূপে দেখা যায়, অর্জুন ভীম অপেক্ষা অন্ততঃ দুই বৎসরের ছোট।' (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪৪।১৮৯ পৃঃ।)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ ও অর্জুনের বয়স যে ৫৭ ছিল, শ্রীজীবের এই সিদ্ধান্ত আমরা নিম্নলিখিত যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে পারি। কৃষ্ণ যখন রুক্মিণীকে বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বয়স অন্ততঃ ১৫ বৎসর। শ্রীকৃষ্ণের ১৬ বছর বয়সে যদি প্রদ্যুম্নের জন্ম হয় এবং প্রদ্যুম্নের ১৬ বছর বয়সে যদি অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের ৩২ বৎসর বয়সে পৌত্র অনিরুদ্ধ জন্মেন। প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ অল্প বয়সেই যৌবনলাভ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে (শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ ১৭৪, পৃঃ ৪৭৮)। 'হরিবংশ' অনুসারে প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব একই মাসে জন্মেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় শ্রীকৃষ্ণের এই দুই পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত উপস্থিত ছিলেন (মহাভারত ১।১৭৭।১৬)। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় অনিরুদ্ধের উপস্থিতির কথাও আছে—কিন্তু প্রামাণিক সংস্করণে ঐরূপ কোন উক্তি নাই। মহাভারতের প্রামাণিক সকল সংস্করণেই রাজসূয় যজ্ঞের সময় কিন্তু অনিরুদ্ধের উপস্থিতি দেখা যায় (২।৩১।১৫)। তিনি বলরাম প্রদ্যুম্ন ও শাম্বের সহিত আসিয়াছিলেন। ঐসময়ে তাঁহার বয়স দশ-এগার বৎসরের কম হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। সেইজন্য রাজসূয় যজ্ঞকালে শ্রীকৃষ্ণের বয়স হয় ৪৩। দ্যূতক্রীড়া, বনবাস, অজ্ঞাতবাস ও যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব-ব্যাপারে আরও ১৪ বছর অতীত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর হয়।

আবার অর্জুনের জীবনের ঘটনা বিশ্লেষণ করিয়াও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-কালে অর্জুনের বয়স ১৯।২০ ছিল। বছরখানেক পাঁচ ভাই দ্রৌপদীর সহিত বসবাস করিবার পর অর্জুনকে নিয়মভঙ্গ করার জন্য দ্বাদশবর্ষব্যাপী বনবাস করিতে হয়। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি উলূপী ও চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করেন। ঐ বারো বছরের শেষের দিকে তিনি দ্বারকায় যাইয়া সুভদ্রাকে বিবাহ করেন ও তারপর এক বৎসর দ্বারকায় ও ঐ-কালের অবশিষ্ট সময় পুষ্করে (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে পুষ্করে এগার বৎসর বাসের কথা আছে—উহা ভুল) বাস করেন। তিনি ৩২ বৎসর বয়সে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসেন। তখনও সুভদ্রা নববধূ। লাল চেলী পরিয়া তিনি কুন্তীকে প্রণাম করেন। তারপর অভিমন্যুর জন্ম। অর্জুনের ৩৩ বৎসর বয়সে খাণ্ডবদহন, এবং উহার দশ বৎসর পরে রাজসূয় যজ্ঞ হয়, তাহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। রাজসূয়ের চৌদ্দ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ হয়। তখন অর্জুনেরও বয়স ৫৭ বৎসর। (ক্রমশঃ)

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার

১৮৯২ খৃঃ মহীশূর রাজ্য ত্যাগ করিয়া স্বামীজী কয়েকদিন ত্রিচুরে থাকিয়া মালাবারে চলিয়া যান। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী ত্রিবান্দ্রামে পৌঁছিয়া ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। শ্রীআয়ার যুবরাজ মার্তণ্ড বর্মার গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারের অনুরোধে সাময়িকভাবে যুবরাজের শিক্ষকতার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিলেন।

স্বামীজী এই গৃহে নয়দিন বাস করেন এবং অধ্যাপক এই নয়দিনকে প্রথম 'নবরাত্রি' আখ্যা দিয়াছেন।

শ্রীআয়ারের স্মৃতিকথায় নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায়ঃ

স্বামীজী যখন প্রথমবার আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে একজন মুসলমান পথপ্রদর্শক ছিল। আমার ১২ বৎসরবয়স্ক দ্বিতীয় পুত্র তাঁহাকেও মুসলমান মনে করে এবং আমাকে সেইভাবে খবর দেয়; কারণ তাঁহার পরিচ্ছদ দাক্ষিণাত্যের সন্ন্যাসীদিগের মতো ছিল না।

তাঁহার পরিচয় পাইয়া ঘরে আনিয়া বসাইলে তিনি প্রথমেই মুসলমান অনুচরটির আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। সে কোচিন রাজ্যের একজন পিয়ন এবং সেখানকার দেওয়ানের সেক্রেটারি বিশাখাপত্তনম্ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীরামাইয়া স্বামীজীকে পৌঁছাইয়া দিতে তাহাকে সঙ্গে পাঠাইয়াছেন।

পরে জানিলাম—স্বামীজী দুইদিন সামান্য দুধ ভিন্ন অন্য কোন খাদ্য গ্রহণ করেন নাই, তবু পিয়নটি আহার করিয়া বিদায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিজের আহারের প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

সামান্য কয়েক মিনিট আলাপেই বুঝিলাম, তিনি একজন মহাশক্তিশালী পুরুষ। আমি জানিতে চাহিলাম—তিনি কিরূপ খাদ্যে অভ্যস্ত। তিনি বলিলেন, 'আপনার যা অভিরুচি। আমি সন্ন্যাসী; সন্ন্যাসীর খাদ্য সম্বন্ধে রুচি বা বিচার রাখতে নেই।'

স্বামীজী বাঙালী জানিয়া আমি বলিলাম, বাংলায় অনেক মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে; তন্মধ্যে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারক কেশবচন্দ্র সেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তখন স্বামীজী তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করেন এবং সংক্ষেপে তাঁহার অতুলনীয় আধ্যাত্মিক শক্তির বর্ণনা দেন। তিনি যখন বলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনায় কেশব শিশুতুল্য, আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। শুধু কেশবই নন, পূর্বেকার বহু খ্যাতনামা বাঙালীই এই মহাপুরুষ দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন—তাহাও জানিলাম। কেশবও পরবর্তী জীবনে পরমহংসদেবের প্রভাবে তাঁহার ধর্মমতের বহুল পরিবর্তন করিয়াছিলেন। ইওরোপীয়গণও শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত আলাপ করিতে ব্যগ্র হইতেন এবং তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। বাংলার শিক্ষাবিভাগের পরিচালক মিঃ টনির (C. H. Tawny) ন্যায় ব্যক্তিও পরমহংসদেবের চরিত্র, প্রতিভা, উদারতা এবং দৈবশক্তির উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

স্বামীজীর আকৃতি, কণ্ঠস্বর, চক্ষের দিব্যজ্যোতি, উচ্চভাব ও বচনবিন্যাস আমাকে মুগ্ধ করে; আমি আর সেদিন পড়াইতে গেলাম

না। আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর স্বামীজীকে লইয়া আমি সন্ধ্যায় ত্রিবান্দ্রাম কলেজের রসায়নের অধ্যাপক মাদ্রাজের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত শ্রীরঙ্গচারীর গৃহে যাই। অধ্যাপক গৃহে ছিলেন না। তখন যমরা ত্রিবান্দ্রাম ক্লাবে যাই। সেখানে অধ্যাপক সুন্দররাম পিলাই ও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দিই। শ্রীরঙ্গচারীও কিছু পরেই আসিয়া উপস্থিত হন। বেশ মনে আছে, আমার বন্ধু নারায়ণ মেনন ও এক ব্রাহ্মণ পেস্কার উপস্থিত ছিলেন। একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় স্বামীজীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ খায়।

নারায়ণ মেনন বিদায়গ্রহণের সময় ব্রাহ্মণ পেস্কারকে প্রণাম করেন। তখন প্রচলিত রীতি অনুসারে পেস্কার তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা বাম হস্ত কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া অভিবাদন গ্রহণ করেন। আমরা যখন বিদায় গ্রহণ করিব, পেস্কার তখন স্বামীজীকে প্রণাম করেন এবং স্বামীজী হিন্দু সন্ন্যাসীর রীতি অনুসারে শুধু 'নারায়ণ' উচ্চারণ করেন। ইহাতে পেস্কার ক্রুদ্ধ হন। স্বামীজী তাহাতে বলেন, 'যদি মেননকে আপনি আপনার প্রথা অনুসারে প্রত্যভিবাদন করিতে পারেন, তবে সন্ন্যাসীর রীতি অনুযায়ী প্রত্যভিবাদন করায় আপনার ক্রুদ্ধ হওয়া কি সঙ্গত?' এই উত্তরে আশানুরূপ ফল ফলিল। পরের দিন পেস্কারের ভাই আসিয়া পূর্ব রাত্রির ঘটনার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিলেন।

স্বামীজী যদিও অল্পসময়ই ক্লাবে ছিলেন, তবু তাঁহার ব্যক্তিত্ব সকলের মনেই প্রভাব বিস্তার করে।

যুবরাজ স্বামীজীর সংবাদ জানিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক হন। আমার সঙ্গে স্বামীজী তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। স্বামীজী বহু দেশীয় রাজ্যের রাজার সহিত পরিচিত জানিয়া যুবরাজ তাঁহাদের বিশদ বিবরণ জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। স্বামীজী বলেন যে-সকল দেশীয় রাজার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে বরোদার গাইকোয়াড়ের কর্মদক্ষতা, স্বদেশপ্রীতি, তেজস্বিতা ও দূরদর্শিতা প্রশংসনীয়। ক্ষুদ্র রাজ্য খেতড়ির রাজপুত রাজারও তিনি খুব প্রশংসা করেন। যুবরাজ স্বামীজীর আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং নিজ-হাতে তাঁহার ফটো তোলেন।

আমি গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। মনে হয়, সেই জন্যই স্বামীজী আমার মতানুযায়ী কথাই বেশী বলিতেন, অবশ্য কখনও শুধু দেশাচার মানিয়া চলার প্রকাশ্য নিন্দাও করিতেন।

স্বামীজী বিজ্ঞানের অন্যায় দাবির নিন্দা করিয়া বলেন, গোঁড়ামি যদি ধর্মের থাকে, তবে বিজ্ঞানেরও আছে। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বলবিজ্ঞান (mechanics) ও বিবর্তনবাদের (Theory of Evolution) সিদ্ধান্ত সন্তোষজনক নয় এবং ইহা অসম্পূর্ণ। তবু বহু বৈজ্ঞানিকই বলিয়া থাকেন, জগতের সমুদয় রহস্যই তাঁহারা ভেদ করিয়াছেন। অজ্ঞেয়বাদও বহু লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় যোগবিজ্ঞানের নিয়ম ও সত্য অস্বীকার করায় শুধু অজ্ঞতা ও স্পর্ধাই প্রকাশ পাইয়াছে। অন্তঃপ্রকৃতির অতীন্দ্রিয় অনুভূতি পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান মীমাংসা করিতে অসমর্থ। যেখানে ইওরোপীয় বিজ্ঞান স্তব্ধ ও নিরস্ত, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সেখানে অপূর্ব আলোক দিয়াছে। ইহাও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঐ-সকল উচ্চ অবস্থা ও অনুভূতি অনুশীলন দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারা যায়। মানুষ স্থূল সূক্ষ্ম উভয়বিধ বন্ধনের মধ্যে বাস

করে। এই উভয়কে অতিক্রম না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভ বা মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক হয় না। একমাত্র ধর্ম—বিশেষতঃ ভারতীয় মহাপুরুষ-প্রদর্শিত ধর্মই—ইহা লাভ করিবার পথপ্রদর্শক হইতে পারে।

জাতিভেদ সম্বন্ধে স্বামীজী বলেন, যতদিন ব্রাহ্মণগণ নিঃস্বার্থ কর্ম করিবে এবং প্রতিদানের আশা না রাখিয়া সকলকে জ্ঞান ও অন্যান্য সব কিছু বিতরণ করিবে, ততদিন তাহাদের বিনাশ নাই। স্বামীজীর কথা এখনও যেন আমার কানে বাজিতেছে, 'ব্রাহ্মণগণ অতীতে ভারতের জন্য মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছে, ভবিষ্যতে আরও অধিক মহৎ কার্য করবে।'

স্বামীজী নারীর অবস্থা ও বিবাহে শাস্ত্রীয় বিধি-নির্দেশ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ অনুমোদন করিতেন না; বলিতেন, নারী ও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করা আবশ্যক; বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষা ও প্রাচীন কৃষ্টি উপলব্ধি করিলে এবং ঋষিদের আধ্যাত্মিক আদর্শ অভ্যাস করিয়া আয়ত্ত করিলে তাহারা নিজেরাই তাহাদের সকল সমস্যা প্রয়োজনমত সমাধান করিতে পারিবে।

আমার বন্ধু রামারাও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ব্যাখ্যা করিতে বলিলে স্বামীজী 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' রচয়িতা বিখ্যাত কবি লীলাশুকের উপাখ্যানের অনুরূপ একটি গল্পের অবতারণা করেন। শেষে বিল্বমঙ্গল কিভাবে তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে জীবন অতিবাহিত করেন, সেই কথা এমন মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণনা করেন যে, ২১ বৎসর পরে আজও যেন অবিকল সেইভাবে শুনিতেছি। স্বামীজী উপসংহারে বলিলেন, অসংযত ও বহির্মুখী ইন্দ্রিয় জয় করিয়া ঈশ্বরে মন সমর্পণের জন্য প্রয়োজন হইলে চক্ষু উৎপাটন করাও আবশ্যক।

খাদ্য সম্বন্ধে স্বামীজী তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন: প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণগণও আমিষাহারী ছিলেন। বৌদ্ধযুগে ক্রমে আমিষ-আহার বন্ধ হয়। হিন্দু শাস্ত্রেও নিরামিষ-আহারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানো হইয়াছে। আমিষ-আহার ত্যাগ করিয়াই ভারতবাসী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে এবং স্বাধীনতা হারাইয়াছে। যদি অন্য জাতির সমকক্ষ হইতে হয়, তবে ভারতবাসীকে আমিষ আহার করিতে হইবে।

রাজসরকারের সহকারী পেস্কার পিরাভি-পেরুমল পিলাই স্বামীজীকে পরীক্ষা করিতে আসেন। তিনি অদ্বৈত-বেদান্তমত সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। শীঘ্রই পিলাই স্বামীজীর জ্ঞানের গভীরতা বুঝিতে পারেন। এই সময় আমি বুঝিতে পারি যে, স্বামীজী মুহূর্তে লোকের মনের দৌড় বুঝিয়া লইতে পারেন, এই বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা; জিজ্ঞাসুর অজ্ঞাতসারে তিনি তাহাকে উপযুক্তক্ষেত্রে আনিয়া তাহার বুদ্ধি ও বিচার অনুযায়ী উপদেশ ও প্রেরণা দিতেন। স্বামীজী 'ললিতবিস্তর' হইতে বুদ্ধের বৈরাগ্য সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক এমন সুললিত সুরে আবৃত্তি করেন যে, পিলাই-এর হৃদয় দ্রবীভূত হয়। স্বামীজী কৌশলে বুদ্ধের মহান্ ত্যাগ, অবিচলিত সত্যানুসন্ধান এবং সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর অক্লান্তভাবে প্রচার বিষয়ে একটি মনোরম হৃদয়-গ্রাহী চিত্র অঙ্কিত করেন। প্রায় একঘণ্টা আলোচনা হয়। বিদায় লইবার পূর্বে পিলাই বারবার স্বামীজীর পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিয়া বলেন, 'আপনার ন্যায় অদ্বিতীয় পুরুষ আর দেখি নাই এবং জীবনে কখনও আপনার কথা ভুলিব না।'

মহারাজার সহিতও স্বামীজীর সাক্ষাৎ ঘটে। দেওয়ান শ্রীশঙ্কর সুব্বিয়ারকে মহারাজা নির্দেশ দেন—স্বামীজী যতদিন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে থাকিবেন,

ততদিন তাঁহার জন্য যেন সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়।

নয় দিনের অবস্থানে আমাদের পরিবারের সকলকে নিতান্ত আপনার করিয়া ১৮৯২ খৃঃ ২২শে ডিসেম্বর স্বামীজী বিদায় লইলেন। বিদায়ের প্রাক্কালে পণ্ডিত বাঞ্ছীশ্বর শাস্ত্রী তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হন, অসুস্থতার জন্য তিনি পূর্বে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার কাতর প্রার্থনা নিবেদিত হইলে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ পণ্ডিতের সহিত সংস্কৃতে ৭।৮ মিনিট আলাপ করেন। পরে জানিলাম যে, এই সময় ব্যাকরণের বহু জটিল তথ্য আলোচিত হয়। স্বামীজীর সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি ও সংস্কৃত ব্যাকরণে নির্ভুল জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া পণ্ডিত একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান।

ইহার পরে ১৮৯৭ খৃঃ স্বামীজী মাদ্রাজে আসিতেছেন জানিয়া আমি ও শ্রীনিবাস •আয়ার গাড়িতে এগমোর স্টেশনে যাই। শ্রীনিবাস কখনও ধর্ম লইয়া মাথা ঘামান না এবং সাধু-সন্তকে শ্রদ্ধা করেন না, তবু তাঁহাকে স্টেশনে যাইতে দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য হই। আয়ার বলেন, স্বামীজী পাশ্চাত্যে ভারতের বেদান্তধর্ম-প্রচারকরূপে সাফল্য ও গৌরব অর্জন করিয়াছেন, সেই জন্যই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছি। বহু চেষ্টায় ভিড় ঠেলিয়া স্বামীজীর গাড়ির পার্শ্বে পৌঁছিয়া তাঁহার পদধূলি লইলাম। স্বামীজী কিন্তু আমাকে ভোলেন নাই এবং ত্রিবান্দ্রামে আমার গৃহে ছিলেন, সে-কথা বলিলেন।

চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে যে, তিনি শিবের অবতার। সকলেই এই কথা বিশ্বাস করে এবং অন্তরের সহিত গ্রহণ করে। সম্ভ্রান্ত বংশের লজ্জাশীলা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ যেন মন্দিরে দেবতার নিকট উপস্থিত হইতেছেন, এইভাবে স্বামীজীর সমীপে আসিতে লাগিলেন।

আলাসিঙ্গাকে আমরা 'আচিঙ্গা' ডাকিতাম। তাহারই সাহায্যে স্বামীজীর সহিত আলাপের সুযোগ ঘটে। স্বামীজী যে কয়দিন মাদ্রাজে ছিলেন, তাঁহার পূত সঙ্গ লাভ করি; তাঁহার বক্তৃতা ও ঘরোয়া আলাপ এবং ভক্তিমূলক গান শ্রবণে ধন্য হই। কি আনন্দে এই দ্বিতীয় 'নবরাত্রি' (৬ই ফেব্রুআরি—১৫ই ফেব্রুআরি) অতিবাহিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত!

লীম্যান অ্যাবট

লীম্যান অ্যাবট ব্রুকলীন প্লীমাথ কংগ্রিগেশন চার্চের খ্যাতনামা ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি ৫'৩" ইঞ্চি লম্বা, বিরলশ্মশ্রু ও উন্নতনাসিকাযুক্ত ব্যক্তি। 'আউট লুক' নামক একটি বিখ্যাত ও বহুল-প্রচারিত সাময়িক পত্রিকার তিনি প্রধান সম্পাদক ছিলেন। সমাজ- ও শিল্প-সংস্কারে এবং ধর্মান্দোলনে অ্যাবট সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। 'আউট লুক' পত্রিকার সম্পাদকীয় কর্মচারীদের সহিত ভোজে স্বামীজী নিমন্ত্রিত হন। ১৮৯৪ খৃঃ ১লা মে ইসাবেল ম্যাক্‌কিণ্ডলিকে স্বামীজী পত্রে লিখেন, 'আমার আগামী পরশু লীম্যান অ্যাবটের সহিত এক ভোজে নিমন্ত্রণ আছে।'

লীম্যান ধর্ম-মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই সভায় লীম্যান বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, যুগে যুগে ঈশ্বরের বাণী আসে। কিন্তু আমরা ইহাও বিশ্বাস করি, প্যালেস্টাইনে অষ্টাদশ শতাব্দী পূর্বে অবতীর্ণ হইয়া খ্রীষ্ট মানুষকে যে প্রত্যাদেশ দিয়াছেন, তাহার সমকক্ষ বাণী আর নাই।'

উনবিংশ শতকের যে-সকল খ্রীষ্টান পাদরী লেখক স্বামীজীর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন,

লীম্যান তাঁহাদের অন্যতম। অবশ্য এই বন্ধুত্বে কিছুটা ব্যবধান ছিল। খ্রীষ্টান পাদরীর পক্ষে ঐ ব্যবধান সংস্কারগত। তথাপি লীম্যান অ্যাবট স্বামীজীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

১৮৯৪ খৃঃ মে মাসে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ইহা সম্ভব নয় বা বাঞ্ছনীয়ও নয় যে, আমরা সকলে একই রকম চিন্তা বা অনুভব করিব এবং একই রূপে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করিব। যদি কখনও ধর্মে একতা আসে, তবে তাহা আমরা যে মূল বিষয়ে একমত তাহার সাধারণ স্বীকৃতি এবং জীবনে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সহযোগিতা হইতে আসিবে। একই বসন্ত ঋতুতে নানা প্রকারের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।' লীম্যান অ্যাবটের ধর্মমহাসভার বক্তৃতা হইতে ইহা নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়াই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী প্রসার লাভ করে। 'বিবেকানন্দ আমেরিকায় বহু খ্রীষ্টানকে হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করিয়াছেন কিনা?'—ভারতীয় মিশনরীরা যখন এই ভয়াবহ খবরের সত্যতা নির্ধারণ করিতে চান, তখন লীম্যান এই কথা বলেন, 'আমরা আমেরিকায় এই ঘটনার সহিত পরিচিত যে, আমেরিকাবাসীরা ক্রমপর্যায়ে আপাতদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকতায়—কখন সম্মোহনবিদ্যায়, কখন বা ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্সে, কখন থিওজফিতে, কখন বা হিন্দুধর্মে অনুরাগী হয়। ইহা কতকটা উদ্দীপনাময় উচ্ছ্বাসে ও কতকটা কৌতূহলের বশে। এই সময় পরিসংখ্যানে দেখা যায়, খ্রীষ্টোপাসনার প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির পথেই চলিয়াছে। লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি অপেক্ষাও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীর বৃদ্ধি দ্রুততর। বিচারশীল ও কার্যকর ধর্মরূপে খ্রীষ্টানদের কার্যও প্রগতিশীল হইতেছে।'

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, একজন উদারভাবাপন্ন পাদরী তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি স্বামীজীকে বন্ধুরূপে আগাইয়া দিলেও তাঁহার বামহস্তে গোঁড়ামির খুঁটিটি শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকেন। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে, স্বামীজীর বক্তৃতাদি শ্রবণে বহু সংশয়বাদী খ্রীষ্টান শেষ পর্যন্ত স্বধর্মে অনুরাগী হইয়াছেন।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

বিখ্যাত বক্তা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক স্বদেশপ্রেমিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বামীজীর পাঠ্যাবস্থার একজন পরিচিত বন্ধু। স্বামীজীর ভাবধারায় তিনি কিরূপ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিকথায় পরিস্ফুট :

'দিনকয়েকের জন্য আমি বোলপুর আশ্রমে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া যেমন হাবড়া ইষ্টিশনে (Howrah Station) পা দিলাম, অমনি কে বলিল—কাল স্বামী বিবেকানন্দ মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে? কেন—তাঁহার তো অনেক উপযুক্ত গুরুভাই আছেন, তাঁহারা চালাইবেন। তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে, তুমি ততটুকু কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি-জয়-ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর। সেই মুহূর্তেই স্থির করিলাম যে, বিলাত যাইব। আমি স্বপ্নেও কখনও ভাবি নাই যে, বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবড়ার ইষ্টিশনে স্থির করিলাম—বিলাত গিয়া বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম—বিবেকানন্দ কে! যাহার প্রেরণাশক্তি মাদৃশ হীনজনকে সুদূর সাগরপারে লইয়া যায়—সে বড় সোজা মানুষ নয়!'

ইহার কিছুদিন পরেই সামান্যমাত্র সম্বল করিয়া (মাত্র ২৭টি টাকা লইয়া) ব্রহ্মবান্ধব বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা নগরী ত্যাগ করেন। অবশেষে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া বেদান্ত-প্রচারকার্যে মনোনিবেশ করেন। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজে তাঁহার বেদান্ত-ব্যাখ্যা শুনিয়া বড় বড় অধ্যাপক চমৎকৃত হন এবং হিন্দু অধ্যাপক আনাইয়া বেদান্ত শিক্ষা করিবেন বলিয়া স্থির করেন। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব লিখিয়াছিলেন: 'আমার দ্বারা এতবড় একটা কাজ হইয়া গেল—তাহা আমার কাছে ঠিক একটা স্বপ্নের মতো। এই সমস্তই বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—আমি মনে করি।'

একবার—স্বামীজীর মহাসমাধিলাভের ছয় মাস পূর্বে কলিকাতায় হেদুয়ার ধারে তাঁহার সহিত ব্রহ্মবান্ধবের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদের এই সময়ের কথোপকথন হইতে বুঝা যায়, দেশের দুরবস্থার জন্য স্বামীজীর হৃদয় কিরূপ বেদনাবিহ্বল হইয়াছিল। ব্রহ্মবান্ধব স্বামীজীকে চিন্তিতভাবে নীরবে থাকিতে দেখিয়া বলেন, 'ভাই, চুপ করিয়া বসিয়া আছ কেন? এস—একবার কলিকাতা শহরে একটা বেদান্ত-বিজ্ঞানের বোল তোলা যাউক। আমি সব আয়োজন করিয়া দিব, তুমি একবার আসরে আসিয়া নামো।'

স্বামীজী উত্তরে কাতরস্বরে বলেন, 'ভবানী ভাই—আমি আর বাঁচিব না (তাঁহার তিরোভাবের ঠিক ছয়মাস পূর্বের কথা)। যাহাতে মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারি; তাহার জন্যই ব্যস্ত আছি —আমার অবসর নাই।'

সেইদিন তাঁহার হৃদয়ের কাতরতা দেখিয়া ব্রহ্মবান্ধব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার হৃদয় ব্যথায় ভারাক্রান্ত। এই ব্যথা দেশের জন্য। আর্যজ্ঞান ও সভ্যতা বিপর্যস্ত, তৎপরিবর্তে ইতর ও অনার্য ভাবধারা আর্য জ্ঞান-গরিমা ও সূক্ষ্ম ও উদার বস্তুকে পরাভূত করিতেছে—স্বামীজীর হৃদয়ে ইহাই বেদনার উদ্রেক করিয়াছিল, যদিও দেশবাসীর মধ্যে কোন সাড়া জাগে নাই। এই বেদনাই স্বামীজীর প্রাণে এত গভীর সাড়া জাগাইয়াছিল যে, ইওরোপ-আমেরিকা তাহার পরিণতি উপলব্ধি করিয়াছে। স্বামীজীকে বুঝিতে হইলে এই দেশের জন্য ব্যথাকে মূর্তিমতীরূপে অনুভব করা চাই।

দক্ষিণভারত-দর্শন

স্বামী অমলানন্দ

১৫ই জানুআরি, ১৯৬৪।

সূর্য উঠছে, প্রভাতসূর্যের অরুণ আলোয় পূর্বদিক রেঙে উঠেছে। মাদ্রাজ সমুদ্র-উপকূলের কাছ দিয়ে আমরা চলেছি মাদ্রাজে বিবেকানন্দ-শতাব্দী-জয়ন্তী-উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য। দেড় দিন ও তুই রাত্রি রেলের কামরায় কেটে গেছে। কিন্তু দেহে ও মনে কোন ক্লান্তি নেই, কারণ স্বামীজীর প্রিয় মাদ্রাজে আমরা পৌঁছে গেছি। স্বামীজীর কত আশা, কত আশীর্বাদ, কত ভরসা এই মাদ্রাজের উপর। স্বামীজীর আলাসিঙ্গা, কিডি, জিজি--সকলকেই যেন দেখতে যাচ্ছি সেই চিরভাস্বর, চিরপ্রেমময় স্বামীজীর সঙ্গে। শ্রদ্ধাবিনম্রচিত্তে প্রণাম করি ভারতসূর্য স্বামীজীকে, আর তাঁর প্রিয় মাদ্রাজকে। স্বামীজীর স্মৃতিপূত দক্ষিণ-ভারত দেখবার আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেকদিনের। মাদ্রাজ মঠ থেকে জয়ন্তী-উৎসবের আহ্বান পেয়ে আমাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হ'তে চলেছে।

ভাবছিলাম স্বামীজীর কথা; কত কথাই না মনে ভিড় ক'রে আসছে। অতীতের সেই কালজয়ী দৃশ্য যেন পুনরাবর্তিত হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণ চলেছেন নিঃসীম নীল সমুদ্রের উপর দিয়ে আর ইঙ্গিত করছেন পরিব্রাজক বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যে যাওয়ার জন্য—একটি মহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত। আজ এ-কথা অনস্বীকার্য যে, এই ইঙ্গিত ভারতের ইসিহাসে এক নবযুগ সূচনা করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে করেছে বিশ্বমানবের এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজন। শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্ব আজ মাদ্রাজের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে কখন পৌঁছে গেছি 'Ice House-র কাছে। এখানেই স্বামীজী কিছুদিন বাস করেছিলেন ১৮৯৭ খৃঃ পাশ্চাত্য থেকে ফিরে। স্বামীজীর পুণ্য নামে নামাঙ্কিত হয়ে সেই ভবন আজ শোভা পাচ্ছে 'বিবেকানন্দ হাউস' রূপে। এর পাশেই স্বামীজীর বিরাট একটি পরিব্রাজক-মূর্তি স্থাপিত হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা (খ্রীষ্টের ১২ জন সাক্ষাৎ শিষ্যের অন্যতম সেণ্ট টমাসের স্মৃতিধন্য) সান্ থোম্ ক্যাথিড্রাল পার হয়ে এবং কপালীশ্বর মন্দির বামে রেখে মায়লাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পৌঁছে গেলাম।

শতাব্দী-জয়ন্তীর বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান চলছে মাদ্রাজ প্রদেশের সর্বত্র। জানুআরির সমাপ্তি-উৎসবের বিরাট আয়োজন এই মায়লাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী-গুণী মিলিত হয়েছেন উৎসব-ক্ষেত্রে। এশিয়া, ইওরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকেও এসেছেন কয়েকজন বিবেকানন্দ-অনুরাগী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান এবং বাইরের থেকেও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রবীণ স্বামীজীরা অনেকে এসেছেন এই উৎসবে যোগদান করতে। হলিউডের স্বামী প্রভবানন্দজী আমাদের কয়েক-দিন আগেই এসে গেছেন।

স্বামী কৈলাসানন্দজীর নেতৃত্বে ও স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানগুলি একটির পর একটি সুষ্টুভাবে নিষ্পন্ন হচ্ছে। সুসজ্জিত বিরাট এক প্যাণ্ডেলে ধর্মসম্মেলন ও বিভিন্ন সভার অধিবেশন চলছে।

সি. পি. রামস্বামী আয়ার, রাজগোপালাচারী স্বামী প্রভবানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী, অধ্যাপক মহাদেবন্ প্রভৃতি সুপণ্ডিত বক্তার ভাষণগুলি একদিকে যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। Students' Day-র অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের সভাটিতে ভাবধারার ধারক ও বাহক তরুণ-সমাজের কাছে স্বামীজীর সম্বন্ধে আমরা অতি সুন্দর সুন্দর ভাষণ শুনলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভাটিও চিরস্মরণীয়।

১৯. ১. ৬৪ তারিখের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শোভাযাত্রাটি আরম্ভ হয় এগমোর স্টেশনে এবং শেষ হয় বিবেকানন্দ-হাউসে। এজন্য সতেরটি বিশেষ তোরণ তৈরী হয়েছিল; তাতে লেখা ছিল সেইসব অমূল্যবাণী, যা স্বামীজীর অভ্যর্থনার জন্য ১৮৯৭ খৃঃ লেখা হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পাশ্চাত্যবিজয়ের পর ১৮৯৭ খৃঃ ঠিক এই পথ দিয়েই স্বামীজীর শুভাগমন হয়েছিল। এবং স্বামীজীকে অভ্যর্থনার জন্য ১৭টি বিশেষ তোরণ তৈরী হয়েছিল। গেটের উপরে লেখা ছিল—'Long live the Venerable Vivekananda', 'Hail Servant of India', 'Hearty Greetings of Awakened India', 'Hail Harbinger of Peace', 'Hail, Sri Ramakrishna's Worthy Son', 'Ekam Sad Bipra Bahudha Badanti'—ইত্যাদি। এই শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। মাউণ্ট রোড, বীচ রোডের মতো বড় বড় রাস্তাগুলি লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। মাদ্রাজ কি কখনও স্বামীজীকে ভুলতে পারে?

এ-ছাড়া ছিল মঠপ্রাঙ্গণে মনোরম একটি প্রদর্শনী। হাজার হাজার মাদ্রাজের অধিবাসী প্রতিদিন এতে যোগদান করেছেন এবং স্বামীজীর জীবনী ও বাণী ছাড়াও অনেক মূল্যবান্ বিষয়ের জ্ঞান আহরণ ক'রে ফিরে গেছেন তৃপ্ত হৃদয়ে। বিশেষ পূজা, হোম, ভজনকীর্তন, সঙ্গীতের আসর, খেলাধুলা, দরিদ্রনারায়ণসেবা নানাদিকে ছিল এই শতাব্দী-জয়ন্তী উৎসবের পরিব্যাপ্তি। তিনসপ্তাহব্যাপী এই উৎসব যে পবিত্র ও ভাবঘন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তা স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের একটি সার্থক প্রয়াস ব'লে নিঃসন্দেহে পরিগণিত হবে।

উৎসব-সমাপ্তির আর বেশী দেরি নেই। এবার আমরা মায়লাপুর উৎসব-ক্ষেত্র থেকে দক্ষিণভারতের বিরাট উৎসব-প্রাঙ্গণের দিকে যাত্রার উদ্যোগ করছি বিরাট পুরুষ স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য। স্বামীজীর জীবনের মূল্যবান্ স্মৃতিসম্ভার ছড়িয়ে আছে দক্ষিণভারতের নগরে নগরে, দেবতার মন্দিরে ও সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে। তাই দক্ষিণভারত সমগ্রভাবেই আমাদের কাছে পরম তীর্থ। আর সেই তীর্থদর্শনের সকল সুযোগ ক'রে দিয়েছিলেন, মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। তাই প্রথমেই তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

দক্ষিণভারতে দ্রষ্টব্যস্থান অনক। সবগুলি দেখতে হ'লে ২।৩ মাস সময় নিয়ে যেতে হয়। ১০।১৫ দিনে যতটুকু দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল, তা দুই পর্যায়ে ভাগ ক'রে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করছি। প্রথম পর্যায়ে মাদ্রাজ শহরের কাছাকাছি কয়েকটি তীর্থ ও দ্রষ্টব্য যথা মহাবলীপুরম্, পক্ষীতীর্থ, কাঞ্চী, শ্রীপেরুমবুদুর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে চিদম্বরম্, শ্রীরঙ্গম্, সেতুবন্ধ, মীনাক্ষী, কন্যাকুমারী ও শুচীন্দ্রম্।

মহাবলীপুরম্

প্রথম পর্যায়ের প্রথম দ্রষ্টব্য মহাবলীপুরম্। মাদ্রাজ শহর থেকে প্রায় ৩৭ মাইল দূরে

মহাবলীপুরম্। শ্রদ্ধেয় স্বামী সর্বজ্ঞানন্দজীর নেতৃত্বে আমরা ১৮.১.৬৪ তারিখে অতি প্রত্যুষে রওনা হই। এখন বাংলাদেশে মাঘ মাস। কিন্তু এখানে শীত নেই বললেই হয়। ভোরবেলা একটা সোয়েটারই যথেষ্ট। সাতটার মধ্যে মহাবলীপুরম্ পৌঁছে যাই। মহাকালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখানকার শিল্পকলা, একদা এই বন্দর-নগরী ছিল পল্লববংশের একটি বিরাট কীর্তি। সমুদ্রের তরঙ্গমালা ধৌত ক'রে দিত এই মন্দিরের পুণ্য পাদপীঠ। সাতটি মন্দির ছিল পাশাপাশি, আজ আছে মাত্র একটি। সেই মন্দিরে আছে বিষ্ণুমূর্তি, কিন্তু কোন পূজার ব্যবস্থা নেই। বিগ্রহের নাম তলাশয়নম্, অর্থাৎ জলশায়ী বিষ্ণু। আনুমানিক নির্মাণ-কাল ৬৭৪ থেকে ৮০০ খৃষ্টাব্দ। অদূরে দেখা যায়—গুহা-মন্দির (Cave Temple), সেখানেও কারুকার্যের বিচিত্র সম্ভার। সেখান থেকে আরও দক্ষিণে—পঞ্চপাণ্ডবের রথ। রথগুলি সবই অসম্পূর্ণ, কিন্তু কারুকার্য অতীব সুন্দর। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব—সবার একটি ক'রে রথ এবং প্রত্যেকটি (monolithic) একখণ্ড পাথর কেটে তৈরী হয়েছে। দ্রৌপদীর রথটি আশ্চর্য কারুকার্যের প্রতীক। পল্লীবাংলার সুঠাম সুন্দর একটি ক্ষুদ্র কুটীর যেন পাথর থেকে নির্মাণ ক'রে এখানে বসিয়ে দিয়েছে। এ-ছাড়া আছে ভীমের হাতী—যেমন প্রকাণ্ড তেমনি সুন্দর; আর আছে মাখন-গোলক (Butter-ball)—বিরাট একখানি গোলাকার পাথর একটুখানি জায়গায় ভর ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাণ্ডবদের রথ দেখে আমরা ফিরে আসছি লাইট হাউসের কাছ দিয়ে প্রাচীরে উৎকীর্ণ চিত্রগুলি (Bas relief) দেখবার জন্য। এই চিত্রগুলি পল্লববংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পাশুপত অস্ত্রলাভের জন্য 'অর্জুনের তপস্যা' ৯০ ফুট লম্বা এবং ৩০ ফুট উচ্চ একটি প্রস্তরের গায়ে খোদিত। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র ব'লে এগুলির খ্যাতি আছে। পাশে আছে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণ এবং পঞ্চপাণ্ডব-মণ্ডপ। দূরে একটু উঁচুতে একটি অসম্পূর্ণ মন্দিরের বিশাল ভিত্তি চোখে পড়ল। বোধহয় পুরানো মন্দির-গুলি সমুদ্র-তরঙ্গাঘাতে ভেঙে যাবার পর এটি পরিকল্পিত হয়, আজও তা বাস্তবে পরিণত হয়নি; কিন্তু কি পৌরুষব্যঞ্জক পরিকল্পনা!

দূর থেকে দেখতে পেলাম একখানা বড় পাথরের ওপর একটা বানর আর একটা বানরের মাথা চুলকে দিচ্ছে। হঠাৎ এখানে বানরের দেখা পেয়ে আমরা আনন্দে চিৎকার ক'রে তাড়া দিতে লাগলাম—কিন্তু তারা নড়ে না; কাছে এসে দেখি, সেগুলি পাথরের মূর্তি! শিল্পীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে নেমে এলাম।

পক্ষীতীর্থ

মহাবলীপুরম্ থেকে প্রায় ১০ মাইল দূরে পক্ষীতীর্থ, তামিল ভাষায় 'তিরুক্কালকুণ্ড্রম্'। এই পক্ষীতীর্থ একটি পাহাড়ের উপর, বাঁধানো সিঁড়ি আছে উপরে উঠবার। যাত্রীরা বললেন, সিঁড়ির সংখ্যা ৬০০। ধীরে ধীরে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। উপর থেকে দৃশ্য অতি মনোরম, কিন্তু সকলেই ক্লান্ত—হাঁপাচ্ছে, দেখবার মন নেই। একটু বিশ্রামের পর আমরা শিবের মন্দিরে গেলাম প্রণাম করতে। শিবের নাম বেদগিরীশ্বর। প্রণাম ক'রে প্রসাদী ভস্ম নিয়ে আমরা পক্ষীতীর্থের যে স্থানটিতে পক্ষীকে খাওয়ানো হয়, সেখানে উপস্থিত হলাম। প্রায় ১২টা বাজল। পূজারী এলেন একটি পিতলের ঘড়া আর একটি থালা নিয়ে। প্রবাদ আছে: দু-জন মুনি বিবাদ করেছিলেন—শিব বড়, না শক্তি বড়? তার ফলে পক্ষী জন্ম নিতে হয়েছে।

তাঁরা রামেশ্বরে স্নান ক'রে কাশীধাম যান বিশ্বনাথ-দর্শনে, পথে এখানে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বেলা বাড়ছে। আমাদের আরও বহুস্থানে যেতে হবে, তাই আমরা বিদায় নিলাম। পক্ষীতীর্থে পক্ষীরূপী মুনিদের দর্শন পাওয়া গেল, কিন্তু তাঁদের খাওয়া দেখার সৌভাগ্য আর হ'ল না।

চিঙ্গলপুট

বালুময় পালার নদীকে বামে রেখে আমাদের বাস ছুটে চলেছে। মাঝে কয়েকটি গির্জা চোখে প'ড়ল, তার চারিদিকে চাষীর কুটির। চিঙ্গলপুটে আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের রেক্টার ও শিক্ষকবৃন্দ অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য। আমরা উপস্থিত হওয়ামাত্র স্নানাহারের ব্যবস্থা হ'ল। তাঁদের আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হলাম। কোন পাচক নয়, নিজেরাই রান্না করেছেন আমাদের ২০।২৫ জনের জন্য। খাবার ব্যবস্থা অতি পরিপাটি—ছাব্বিশ রকমের পদ ছিল তাতে। পদগুলির একটি ইংরেজী তালিকা ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা ছিল। তালিকাটি টুকে এনেছি বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য:

1. Sugar	14. Sakkar Pangal
2. Rice	15. Puliothorai
3. Ghee & Dal	16. Rasa Badai
4. Onion Sambar	17. Gilibi
5. Mor Kuzhgum	18. Padusha
6. Potato Curry	19. Bonde
7. Avial	20. Kerhari
8. Kothu	21. Pal Gova
9. Varuval	22. Sewai Payasam
10. Pachhadi Curd	23. Bengal Bhatt
11. Tomato Sweet Pochchali	24. Curd Butter milk
12. Tomato Lime Sambar	25. Fruits
13. Venu Pangal	26. Pan

অধিকাংশই ঝাল ও টকের সমাহার। আহারের সময় এই তালিকার দৈর্ঘ্য ও বৈচিত্র্য-প্রয়াসই হয়ে উঠল আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল পরিবেশকদের ভক্তি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। খাওয়া-দাওয়ার পর স্কুলের দোতলা-হলে আমরা বিশ্রাম করতে চলে গেলাম। আমাদের কয়েকজন ঢুকলেন রেক্টারের ঘরে। পরে শুনলাম তাঁরা সেখানে যা সংগ্রহ করেছেন, তা আমাদের বিশ্রামের থেকে অনেক মূল্যবান্। রেক্টারের ঘরে একটি বোর্ডে খড়ি দিয়ে আঁকা এক মানচিত্র—তাতে দেখানো রয়েছে মাদ্রাজ, খড়্গপুর, বিষ্ণুপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, তারকেশ্বর, কলিকাতা, বেলুড় ও দক্ষিণেশ্বর। স্বভাবতই মনে হয়েছিল—ছেলেদের কামারপুকুরের পথ শেখাবার জন্যই বোধ হয় এই ম্যাপ। কিন্তু রেক্টার জানালেন, ম্যাপখানি তাঁর নিজের জন্য। এটি তাঁর নিত্যকার 'মানস-ভ্রমণম্'—দিনের কাজ শুরু করার আগে তিনি মনে মনে পরিক্রমা করেন—জয়রামবাটী, কামারপুকুর, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর; প্রণাম করেন শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজীর শ্রীচরণে। বিদ্যালয়টি প্রথমাবস্থায় স্বামী শাশ্বতানন্দজীর উৎসাহে গড়ে উঠেছে; তাঁর একখানি বড় ফটো অফিসঘরে সাজানো রয়েছে।

চিঙ্গলপুট বিদ্যালয়ের দুটি শাখা—একটি বালকদের, অন্যটি বালিকাদের। উভয়ত্র ধর্মের ভিত্তির উপর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। শহরের মধ্যেই খৃষ্টান মিশনরীদের ৪।৫টি স্কুল চোখে প'ড়ল। সেদিক থেকে এ-অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের এ-স্কুলটি গুরুত্বপূর্ণ। এ-স্কুলটি না থাকলে অনেককেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয়ে মিশনরীদের স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে হ'ত।

কাঞ্চী

চিঙ্গলপুট থেকে আমাদের বাস এবার যাবে কাঞ্চীর দিকে। কাঞ্চীর নাম কাঞ্চীপুরম্,

ইংরেজী আমলের কঞ্জিভরম্—দক্ষিণের বারাণসী, সব দেবতার মন্দির আছে। একদা এই কাঞ্চী ছিল দক্ষিণভারতের একটি প্রধান জনপদ—অষ্টম শতাব্দীর পল্লব রাজবংশের রাজধানী। সর্বভারতীয় তীর্থগুলির মধ্যে এর একটি বিশিষ্ট স্থান নির্ণীত রয়েছে—এই শ্লোকে :

কাশী কাঞ্চী চ মায়াখ্যা ত্বযোধ্যা দ্বারবত্যপি।
মথুরাবন্তিকা চৈতাঃ সপ্ত পুর্যোঽত্র মোক্ষদাঃ॥

মহাতীর্থ এই কাঞ্চী একদিকে যেমন বৈষ্ণবদের, অন্যদিকে তেমনি শৈবদেরও প্রিয় স্থান। তাই এই পুরী বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী এই দুই ভাগে বিভক্ত।

বিষ্ণুকাঞ্চীর মন্দিরটি অতি সুন্দর। দেবতা বরদরাজ যেন বরদানের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। শ্রীরামানুজাচার্যের মহৎ জীবনের প্রেরণার উৎস এই বরদরাজ মন্দির। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবও এখানে দর্শন পেয়েছিলেন লক্ষ্মীনারায়ণের। পুরোহিত আমাদের সকলের পূজার অতি সুব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তিনি হিন্দী, ইংরেজী সংস্কৃত ও ভাঙা বাংলায় শ্রীবরদরাজের গুণকীর্তন করলেন। দেবতাকে প্রণাম ক'রে পরমপরিতৃপ্ত হৃদয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

বিষ্ণুকাঞ্চী দর্শনাদির পর আমরা গেলাম শিবকামী বা মা-কামাক্ষীর মন্দিরে। কিংবদন্তী—আচার্য শঙ্কর এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

শিবকাঞ্চীতে বিরাট শিবমন্দির—শিব এখানে পৃথ্বীলিঙ্গ বা ক্ষিতিলিঙ্গরূপে বিরাজিত। দক্ষিণভারতে পাঁচটি প্রধান শিবক্ষেত্র আছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্—এই পঞ্চভূতের নামে পাঁচটি শিবলিঙ্গের নাম, ক্ষিতিলিঙ্গ কাঞ্চীতে, অপ্‌লিঙ্গ শ্রীরঙ্গমে, তেজোলিঙ্গ তিরুভন্নামলাই-এ, মরুৎলিঙ্গ কালহস্তীতে এবং ব্যোম্‌লিঙ্গ চিদম্বরমে। শিবকাঞ্চীতে শিবকামনায় একটি আম্রবৃক্ষের তলায় গৌরী তপস্যা করেছিলেন। দেবী শিবকামী, আর এখানকার শিবের নাম একাম্রেশ্বর। পুরাতন আম্রবৃক্ষটি প্রদক্ষিণ করা মহাপুণ্যের কাজ। শিবলিঙ্গ বালি দিয়ে তৈরী, তাই মধু ও তৈলদ্বারা দেবতার অভিষেক করা হয়। বিরাট মন্দির, গোপুরম্, দ্বারম্, বলিপীঠম্, ধ্বজস্তম্ভ, নাটমন্দির ও নন্দী পার হয়ে গর্ভমন্দিরে যেতে হয়।

মন্দির থেকে বেরিয়ে একটু দূরেই কাঞ্চী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। আমাদের পাণ্ডা স্বামী সর্বজ্ঞানন্দজী এই আশ্রমের কর্মী, এখানেই তিনি আমাদের বৈকালীন চায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। আশ্রমের প্রধান কর্মসূচী একটি গ্রন্থাগার। কাঞ্চীতে কাশীর মতো মাধুকরী ভিক্ষা পাওয়া যায়—অনেকে এখানে থেকে তপস্যাদি ক'রে জীবন কাটান।

শ্রীপেরুমবুদুর

আগেই বলেছি এই কাঞ্চীপুরম্ শ্রীরামানুজাচার্যের জীবনের প্রধান লীলাক্ষেত্র। এখান থেকে অল্প দূরেই তাঁর পুণ্যজন্মভূমিতে একটি নাতিবৃহৎ মন্দির আছে এবং সেই মন্দিরে তাঁর বিগ্রহ তাঁর জীবিতকালেই নাকি স্থাপিত হয়েছিল, তখন তিনি শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে।

আমাদের পাণ্ডাজীর সুচিন্তিত ব্যবস্থানুসারে মন্দির বন্ধ হবার পূর্বমুহূর্তে শ্রীপেরুমবুদুর দর্শন ক'রে আমরা মাদ্রাজে ফিরে এলাম রাত প্রায় ৮॥ টায়—ক্লান্ত শরীরে কিন্তু পরিপূর্ণ মনে।

দ্বিতীয় পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিক্রমা শুরু হ'ল ২১.১.৬৪ তারিখে। আমাদের পরম সৌভাগ্য ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের কয়েকজন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে পেলাম আমাদের এই যাত্রীদলের পুরোভাগে

সাধুব্রহ্মচারী মিলে আমরা ছিলাম ১৬ জন। ভ্রমণের অবসর মুহূর্তে অনেক সময় মনে হয়েছে —আর কিছু না হোক, শুধু এই সাধুসঙ্গ জীবনের এক অমূল্য সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

চিদম্বরম্

একটিবাসে সকলের স্থান হ'ল না, প্রথম দলটি ভোর ৬টার বাসে চলে গেলেন, আমরা ৮টার বাসে। এবার আমরা চলেছি মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণমুখে চিদম্বরম্। পথে দুদিকে অতি সুন্দর দৃশ্য। কিছুদূর যাওয়ার পর চাষবাসের এক নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে প'ড়ল। এ অঞ্চলে এখন কিছু কিছু বর্ষা হয়েছে এবং যতদূর দৃষ্টি যায় চাষবাস চলেছে পুরো দমে। স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে মাঠে কাজ করছে। ধানচাষের ৭টি পর্যায় আমরা পর পর দেখলাম। কোথাও ধানের বীজ ফেলা হচ্ছে, চারা রোয়া হচ্ছে, ধানগাছ বড় হয়েছে, ধানের শীষ বেরিয়েছে, ধান পেকেছে, ধান কাটাও হচ্ছে, ধান কাটার পর আবার চাষের জন্য জমি তৈরী হচ্ছে। এই দৃশ্য তামিলনাদের বহু স্থানে একই সঙ্গে চোখে পড়েছে। প্রকৃতির অকৃপণ দান জল ও অনুকূল আবহাওয়া মাদ্রাজকে শস্যভাণ্ডারে পরিণত করেছে। দেখেছি মাঠের মধ্যে এক একটি পাম্প-হাউস এবং জলসেচনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এদেশে সর্বত্র রয়েছে। খাদ্যসমস্যা-কণ্টকিত বাংলাদেশে কি এই রকম ব্যবস্থা সম্ভব নয়? আরও দেখেছি মাদ্রাজের মাঠে মাঠে কলাগাছের সারি; ঠিক বাংলাদেশের রোয়া ধানের সারির মতো। এ অঞ্চলে কলা খুবই সস্তা এবং অন্যতম প্রধান খাদ্য। যাই হোক আমরা চিঙ্গলপুট, বিল্লুপুরম্ পার হয়ে পণ্ডিচেরী পৌঁছলাম। বঙ্গজননীর বীরসন্তান বিশ্ববরেণ্য মহামানব শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্যে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বেলা প্রায় ২টার কাছাকাছি চিদম্বরম্ বাস-স্টপে গাড়ি থামল। শ্রীযুক্ত রত্নস্বামী চেট্টিয়ার মহাশয়ের 'নটরাজবিলাস'-এ আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। পূর্বের দলটি আগেই পৌঁছে স্নান ক'রে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে চেট্টিয়ারদের প্রতিষ্ঠিত একটি বহুমুখী বিদ্যালয়, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালা পরিদর্শন করবার জন্য আহ্বান এল। বিদ্যালয়েরছাত্রগণ ও শিক্ষক মহাশয়েরা এক প্রীতিপূর্ণ অনুষ্ঠানে আমাদের সম্বর্ধনা জানালেন। আমাদেরও কিছু কিছু বলতে হ'ল।

রত্নস্বামীর ব্যবস্থাপনায় সন্ধ্যার একটু আগে আমরা চিদম্বরম্ মন্দিরে উপস্থিত হলাম। প্রথমে বিনায়ক (গণেশ), সুব্রহ্মণ্যম্ (কার্ত্তিক) ও পার্বতীর মন্দির দর্শন ক'রে আমরা গেলাম মূল মন্দিরে। বলাবাহুল্য, দক্ষিণভারতের মন্দির-গুলির কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে উত্তরভারতীয়রা একটা নূতনত্বের আস্বাদ পায়। মন্দিরের সাতটি অঙ্গ—(১) গোপুরম্ (২) দ্বারম্ (৩) বলিপীঠম্ (৪) ধ্বজস্তম্ভ (৫) নাটমন্দির (৬) নন্দী বা গরুড় (৭) গর্ভমন্দির। গোপুরম্ বা তোরণ খুবই বৃহদায়তন, গর্ভমন্দির তার তুলনায় অনেক ছোট। গর্ভমন্দিরের বিগ্রহকে প্রণাম করার বিধি নেই; সেখানে শুধু দর্শন ও পূজা। প্রণাম করতে হয় বাইরে ধ্বজস্তম্ভের কাছে। নাটমন্দিরগুলি সাধারণতঃ কারুকার্যময়। পূজার নৈবেদ্যের মধ্যে নারিকেল ও কলা প্রধান। প্রসাদের হাঙ্গামা খুবই কম। আধখানা নারিকেল ও একটু ভস্ম বা কুমকুম। শিবমন্দিরে চরণামৃতের কোন ব্যবস্থা নেই।

চিদম্বরমের গর্ভমন্দিরটির ছাদ এক হাজার সোনার টালি দিয়ে তৈরী। দেহের 'সহস্রনাড়ী' এর প্রতীক। চারটি স্তম্ভের উপর রত্নবেদী—

চারটি স্তম্ভ, কিনা চারটি বেদ। বেদীর উপর কোন মূর্তি নেই, কারণ শিব এখানে ব্যোমলিঙ্গ —অর্থাৎ আকাশলিঙ্গ, তাই নিরূপ বা নিরাকার। আকাশের কোন রূপ নেই, তাই বেদীর উপরে কালো পাথরের দেওয়াল—এটিই আকাশলিঙ্গের প্রতীক। সোনার বেলপাতা দিয়ে গাঁথা সারি সারি মালা ঐ আকাশরূপী দেবাদিদেবের উদ্দেশে নিবেদিত। একটি কালো পর্দা দিয়ে সবটা ঢাকা। মাঝে মাঝে সেটি খোলা হচ্ছে—'নি-তে বেশিক্ষণ থাকা যায় না'। আমরা পূজার জিনিস সব নিয়ে গেলাম—নারিকেল, কলা, ফুল ও বিল্বদল। পূজারী ঐ পর্দা সরিয়ে কর্পূরের আরতি করলেন। বলতে ভুলে গেছি—আমাদের সকলকে জামা খুলে উত্তরীয় কোমরে জড়িয়ে মন্দিরে যেতে হয়েছিল। দক্ষিণদেশের প্রায় সব মন্দিরেই পুরুষদের এইরূপ উন্মুক্তদেহে মন্দিরে যাওয়ার বিধি।

চিদম্বরম্ মন্দিরে মৃতপ্রায় মায়াসুরের ওপর দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য নটরাজের নৃত্যপরায়ণ একটি মূর্তি আছে, পাশে শিবকামী বা শিবকামসুন্দরী দাঁড়িয়ে যেন বলছেনঃ এ প্রলয় নৃত্য পরিহার কর। নূতনতর, সুন্দরতর, শিবতর সৃষ্টির উন্মেষ কর। নটরাজ-কল্পনা দক্ষিণভারতের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

প্রধান মন্দিরের সংলগ্ন ডানদিকে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির প্রমাণ করে—এখানে একদা শৈব ও বৈষ্ণব ভাবের সমন্বয় হয়েছিল। মন্দিরের বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে এক সুন্দর মণ্ডপে আমরা একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হ'তে দেখলাম। শ্রোতার সংখ্যা খুবই কম, তবুও মন্দির-কর্তৃপক্ষের এই প্রয়াস যে প্রশংসাজনক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা ফিরে এলাম আমাদের ডেরায়। কাল আমাদের গন্তব্য শ্রীরঙ্গম্ (তিরুচিরপল্লী)। ত্রিচিতে আমরা কোথায় গিয়ে উঠব জানা নেই। এই উদ্বেগের কথা গৃহকর্তা জানতে পেরে তাঁর আত্মীয় শ্রীযুক্ত কামাক্ষী চেট্টিকে ফোন ক'রে দিলেন। নিশ্চিন্ত মনে আমরা শুতে গেলাম।

ভোরে স্নানাদি সেরে জলযোগ। তামিল-নাদে এখন বার্ষিক উৎসব চলেছে। এদের ভাষায় বলে 'পঙ্গল', অনেকটা আমাদের নবান্ন। এই উৎসবে পঙ্গল (এক প্রকার খিচুড়ি) প্রতি বাড়িতে তৈরী হয়। এই ধরনের খিচুড়ি আমাদের জলযোগের একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। আর ছিল ঘরের তৈরী 'দোশে'। চিদম্বরমের এই অতিথিপরায়ণ গৃহস্বামী আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা করেছিলেন, সেজন্য তাঁরা আমাদের চিদম্বরমের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে রইলেন। তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা চললাম ত্রিচির ট্রেন ধরার জন্য। চিদম্বরম্ থেকে ত্রিচি ১৬০ কিলো-মিটার। স্টেশনের অদূরে আন্নামালাই বিশ্ব-বিদ্যালয়টি চোখেই দেখা হ'ল, যাওয়া হ'ল না। ট্রেন এসে পড়েছে, সাইডিং লাইনে দেখলাম কুণ্ডু স্পেশাল দাঁড়িয়ে রয়েছে—রামেশ্বরম্ ফেরত চিদম্বরম্।

ত্রিচির পথে তাঞ্জোর

চিদম্বরম্ থেকে ট্রেন ছাড়ল, গতি অতি মন্থর। আমাদের মনের গতি এখন বড় দ্রুত, অনেক তীর্থে যেতে হবে। কুম্ভকোণম্ যখন পৌছলাম বেলা তখন প্রায় ১২টা। মনে প'ড়ল —স্বামীজীর সেই দিগ্বিজয়ী শফরের কথা। আমাদের একজন—প্লাটফর্মের একটু মাটি মাথায় দিলেন। স্টেশনে প্যাকেট-করা দইভাত পাওয়া গেল, তাই দিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজনের পালা শেষ হ'ল। ট্রেন থেকেই দেখলাম দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ মন্দির ও ঐতিহাসিক তাঞ্জোর দুর্গ। নামবার সময় ছিল না। অতৃপ্ত নয়নে ঐগুলি দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে গেলাম। ত্রিচি বা ত্রিচিনাপল্লীতে আমরা যখন পৌছলাম, তখন বেলা ৪টা। ট্রেন থেকে নামতে না নামতেই দেখে বিস্মিত হলাম আমাদের পাণ্ডা ভজহরি মহারাজ—স্বামী সর্বজ্ঞানন্দজীকে। দেখলাম তীর্থব্যাপারে তিনি শুধু সর্বজ্ঞ নন— সর্বব্যাপীও বটেন। (ক্রমশঃ)

সমালোচনা

Vivekananda (Album)—Published by the Director, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, Delhi 6. Pp. 42 ; price Rs 3·50.

স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে চিত্রপুস্তকটি (Album) শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে ও পরিবেশে তোলা ফটো, বিশেষ ঘটনা-সংক্রান্ত চিত্র, স্বামীজী-সংক্রান্ত বহু স্থানের ছবি আছে ; কয়েকটি গ্রুপ ফটো উল্লেখযোগ্য।

সময় ও ঘটনার পারম্পর্য রক্ষিত হওয়ায় স্বামীজীর সমগ্র জীবনটি মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। প্রারম্ভে স্বামী তেজসানন্দ-লিখিত স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং স্থানে স্থানে ও শেষাংশে প্রদত্ত উক্তিসঞ্চয়ন জীবন ও বাণী অনুধ্যানে সহায়তা করিবে।

অন্যান্য স্মারক চিত্রপুস্তকের তুলনায় এটি আশানুরূপ হয় নাই ; তবে জনসাধারণের ক্রয়-সাধ্যের মধ্যে আছে, ইহাই আনন্দের কথা।

সপ্তর্ষির ঋষি : সুমণি মিত্র। বিবেক-ভারতী, ৫৭ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ষোল+২৪০ ; মূল্য ৫·৫০।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে স্বামীজী-সম্বন্ধে বহু বিচিত্র আলোচনাসম্ভারে বাংলাসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। শ্রীসুমণি মিত্রের 'সপ্তর্ষির ঋষি' সেই সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কয়েকবছর আগে মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে সুমণি মিত্রের 'বিবেকানন্দস্তোত্র' নামে স্বামীজীর যে অনুধ্যান-স্তোত্রাবলী প্রকাশিত হচ্ছিল, তারই অংশবিশেষ অবলম্বনে 'সপ্তর্ষির ঋষি' প্রকাশিত। স্বামীজীর জীবনের আদিপর্বই এখানে প্রধানতঃ আলোচিত এবং এ আলোচনার ভঙ্গী বাংলা সাহিত্যে অভিনব।

স্বামীজীর রচনাবলীতে তাঁর সহজাত আবেগ-স্পন্দনের স্পর্শে যে ছন্দোময় ভঙ্গিমা দেখা দিয়েছে, লেখক স্বামীজীর রচনা থেকে সেই অন্তর্লীন ছন্দটুকু পাঠকদের জন্য পাতার পর পাতা সাজিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে রয়েছে কথকতার ভঙ্গীতে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য ও মন্তব্য। খুব সহজ লঘু ভঙ্গীতে বলবার চেষ্টা করেও বারে বারেই স্বামীজীর জীবন ও বাণীর গভীরতম তত্ত্বপ্রসঙ্গ এসে পড়েছে—সে অংশগুলি তিনি বিস্তৃত পাদটীকায় আলোচনা করেছেন। বস্তুতঃ গ্রন্থের মূল অংশ ও পাদটীকা প্রায় সমান সমান। আকর্ষণের দিক থেকে পাদটীকাও কত মনোহারী হ'তে পারে, এ বইয়ে তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ মেলে।

স্বামীজীর বাণীসংগ্রহে ও বিশ্লেষণে লেখকের নৈপুণ্য এবং এইভাবেই ধীরে ধীরে স্বামীজীর জীবনরেখাঙ্কনের সজীবতা—এ দু-দিক থেকেই লেখকের বিবেকানন্দ চর্চা অপূর্ব সার্থকতা লাভ করেছে। শুধু লেখায় নয়, গ্রন্থটির আদ্যোপান্ত লেখকের নিজের আঁকা স্বামীজীর ছবি ও গ্রন্থ-সজ্জার নানা অলঙ্করণ তাঁর শিল্পিসত্তার প্রতি আমাদের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বইয়ের শেষদিকে স্বামীজীর বয়সানুক্রমে যে জীবনপঞ্জীটি দেওয়া হয়েছে, তথ্যের দিক থেকে এবং একনজরে তাঁর জীবনসম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয়লাভের দিক থেকে সেটি বিশেষ মূল্যবান্। প্রকাশনার ক্ষেত্রে আদ্যোপান্ত যে যত্ন, রুচি, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের উদাহরণ রয়েছে, বাংলা-

সাহিত্যের প্রকাশকদের কাছে তা আদর্শরূপে গণ্য হ'তে পারে।

পূজ্যপাদ স্বামী তেজসানন্দজী-লিখিত ভূমিকায় আছে: 'লেখক এই গ্রন্থের মাধ্যমে স্বামীজীর জীবনের মূল সুর আধ্যাত্মিকতাকেই বিশেষভাবে প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন। আশা করি, ওজস্বিনীভাষায় রচিত এই কাব্যগ্রন্থখানি পাঠকপাঠিকাদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে।' উল্লিখিত অভিমতের সঙ্গে আমরাও একমত হ'য়ে লেখকের সারস্বত সাধনার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রার্থনা করি। —**প্রণবরঞ্জন ঘোষ**

বিবেকানন্দ-স্মৃতি—সম্পাদনা: ডক্টর শ্রীসত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত। প্রকাশক: শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১।১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৩৭০; মূল্য ৩'৫০।

পুস্তকের নাম অনুসারে মনে হয়, যাঁহারা স্বামীজীকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতিকথা সন্নিবেশিত; কিন্তু সেইরূপ কোন স্মৃতি গ্রন্থে স্থান না পাইলেও স্বামীজীর ভাবধারা সার্থক-ভাবে অনুধ্যান করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। 'মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ', 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাতত্ত্বের ভূমিকা', 'বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দ', 'বিবেকানন্দের দর্শন-চিন্তার কয়েকটি দিক'—গ্রন্থের চারিটি প্রবন্ধই সুচিন্তিত ও সুলিখিত।

বিচিত্র বিবেকানন্দ—ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী। প্রকাশক: বাক্‌সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৮৭; মূল্য ২'২৫।

ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে স্বামীজীকে বোঝা দরকার—এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা লইয়া লেখক স্বামীজীর বহুমুখী ভাবধারা চিন্তা করিয়াছেন। পুস্তকের ১১টি রচনার মধ্যে 'বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য ও বিবেকানন্দ' শিরোনামে লেখাটি উদ্বোধনের 'বিবেকানন্দ-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা'য় প্রকাশিত।

জ্যোতির্ময় (স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দ স্মরণিকা) প্রকাশক: স্বামী নির্মোহানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা, ২৪-পরগনা। পৃষ্ঠা ১৪০।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে এই 'স্মরণিকা' বৈশিষ্ট্য দাবি করিতে পারে, পরিচালকগণের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত।

বিদ্যার্থী বিবেকানন্দ— শ্রীদুর্গাপদ তরফদার। প্রকাশক: শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, ২১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১১৭; মূল্য ১'৭৫।

স্বামীজীর শৈশবের ও ছাত্রজীবনের কাহিনী অবলম্বনে সহজ ভাষায় লিখিত পুস্তকটি ছোটদের খুব ভাল লাগিবে ও কাজে আসিবে।

কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয় পত্রিকা (বিবেকানন্দ-জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা): প্রকাশক শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কালনা মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ কালনা, জেলা বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৮০।

পত্রিকাটি স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকীর সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি-রূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। 'বিবেক-তীর্থ দত্ত-দারিয়াটন' (স্বামীজীর পূর্বপুরুষের গ্রাম) লেখাটি আকর্ষণীয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় গৃহী ভক্ত— শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহা সঙ্কলিত। সুরেন্দ্র-কুটির, মহেন্দ্রগঞ্জ, পোঃ কালিয়াগঞ্জ, জেলা পঃ দিনাজপুর। পৃষ্ঠা ৬৬, মূল্য ১৲।

আলোচ্য গ্রন্থে পরিবেষিত গৃহী ভক্তগণের জীবনী-অংশ 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

অতীতের মানব (নাটক)—শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্তী। প্রকাশক : চক্রবুধ গ্রন্থালয়, কাটোয়া, বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৮৮ ; মূল্য ২·৫০।

প্রাচীন আর্য-অনার্য-সংঘাতের উপর কল্পনার তুলি বুলাইয়া নাটকখানি রচিত ; ইহাতে নূতনত্ব আছে।

সমাজ-দর্শন— শ্রীরণজিৎকুমার সেন। প্রকাশক : জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৪। পৃষ্ঠা ১১২ ; মূল্য ৩৲।

পুস্তকটিতে আধুনিক প্রগতিবাদ, মানব-প্রকৃতির জটিলতা, মানবতা-বিকাশের অন্তরায় প্রভৃতি আলোচনায় গভীর মননশীলতার স্বাক্ষর বর্তমান। শিক্ষা ও সাধনার সাহায্যে মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়—ইহাই লেখকের সুচিন্তিত অভিমত। সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান্।

যাত্রী—শ্রীমতী মায়ালতা দেবী। প্রকাশক : শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক, ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১৩৩ ; মূল্য ৫৲।

'কেদার-বদরী'-ভ্রমণের সচিত্র একটি সরস কাহিনী। ব্যক্তিগত অনুভূতির মূল্য অবশ্যই আছে ; তবে ব্যক্তিগত এমন অনেক জিনিস এ-পুস্তকে আছে, যেগুলি বাদ দিলে এই ভ্রমণ-কাহিনী আরও মধুর হইবে।

সহস্রশ্লোকী ভাগবত (পকেট-সংস্করণ : প্রথম খণ্ড)—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার, ৩ অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ১৬০ ; মূল্য ১৲। (৫ খণ্ডে প্রকাশিতব্য)

শ্রীমদ্ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক হইতে এক হাজার শ্লোক নির্বাচন করা দুরূহ ব্যাপার। লেখকের শ্লোক-নির্বাচনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদ সর্বত্র মূলানুগ, ব্যাখ্যা সাবলীল। আমরা পরবর্তী খণ্ডগুলির আশু প্রকাশনের আশায় রহিলাম।

ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী—বাক্-সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫৲।

আলোচ্য গ্রন্থে ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী-পাঠে আমরা তাঁহার ভগবদ্ভক্তির পরিচয় পাই। এই গ্রন্থ শ্রীদিলীপকুমার রায়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। ইন্দিরা দেবী তাঁর প্রাণের অনুভূতি এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের শোনাইয়াছেন।

—সারদারঞ্জন পণ্ডিত

ভ্রম সংশোধন

গত (শ্রাবণ) মাসের সংখ্যার ৩৩৮ পৃষ্ঠায় ২১ পঙক্তি পড়িবেন :

ক্ষমা করিয়াছিলেন ? মনে তো হয় না, আজও ······

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উদ্বাস্তু-সেবাকার্য

পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত অসহায় উদ্বাস্তুদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন পশ্চিমবঙ্গে গেদে, পেট্রাপোল ও বানপুরে এবং মধ্যপ্রদেশে কুরুদ নামক স্থানে সেবাকার্য চালাইতেছেন।

কার্যবিবরণী

পাটনা: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৬২ খৃঃ এপ্রিল হইতে ১৯৬৩ খৃঃ মার্চ পর্যন্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯২২ খৃঃ স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রম ১৯২৬ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। আলোচ্য বর্ষে নানাস্থানে ও আশ্রমে মোট ২৮০টি ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামী অদ্ভুতানন্দ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫৫টি বালক অবৈতনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস আছে। এখানে ২৯টি ছাত্র ছিল: তন্মধ্যে ১৬ জন বিনা খরচে এবং ৪ জন আংশিক ও ৯ জন পুরা খরচ দিয়া ছিল। তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরীর মোট পুস্তক-সংখ্যা ৬,৮৪০; নূতন সংযোজিত পুস্তক ৪৮০। পাঠ-কক্ষে ৬ খানি দৈনিক ও ৭৯টি সাময়িক পত্রিকা রাখা হয়। হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথা-ক্রমে ৬৬,৯০০ (নূতন ৭,৫৮৭) ও ৫২,৯৭০ (নূতন ৮,১০০)। স্বামীজীর শতবার্ষিকী জয়ন্তী-উৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। ভারতের প্রধান বিচারপতি ডক্টর বি. পি. সিংহ এই উৎসবের উদ্বোধন করেন।

রেঙ্গুন: রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৬২-৬৩ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শতবর্ষজয়ন্তী সমিতি যুদ্ধে বিধ্বস্ত হাসপাতালের সকল বিভাগ নূতন করিয়া আধুনিক ভাবে গঠন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। বিশিষ্ট বদান্য ব্যক্তিগণ এই নির্মাণকার্যে অর্থ দান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ১৯৬৩ খৃঃ অগস্ট-সেপ্টেম্বরে রেঙ্গুনে আসিয়া ২২টি শয্যাযুক্ত পুরুষদের চিকিৎসা-বিভাগ ও ২০টি শয্যাযুক্ত শিশুবিভাগ-সমন্বিত স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ স্মারক হাসপাতালের একটি শাখা উদ্বোধন করেন।

ব্রহ্ম-সরকার ও রেঙ্গুন পৌরপ্রতিষ্ঠান এই সেবাশ্রমকে বহুবিধ সাহায্য করিয়াছেন। ভারত সরকার বিদেশী মুদ্রার অভাবের সময়ও এই প্রতিষ্ঠানকে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে সাহায্য করেন। ১৯৬২ খৃঃ সেবাশ্রমে নূতন ৭৩,৪৩৬ এবং পুরাতন ১,৫০,৯৫৬ রোগী—মোট ২,২৪,৩৯২ জনকে বহির্বিভাগে চিকিৎসা করা হয়। অন্তর্বিভাগে ৪,৫৫৪ জন রোগীকে ভরতি করা হয়, তন্মধ্যে ২,৯২৩ পুরুষ, ১,২৯৫ নারী এবং ৩৩৬ জন শিশু।

বিশাখাপত্তনম্: রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ১৯৬২-৬৩ খৃঃ বার্ষিক কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই আশ্রমটি সমুদ্রসৈকতে অতি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। আধ্যাত্মিক আলোচনা, ধর্মগ্রন্থপাঠ, পূজা ইত্যাদি ব্যতীত আশ্রম-কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে। লাইব্রেরীতে ২,৩৪৩ পুস্তক আছে এবং ২০ খানি মাসিক ও ৬ খানি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। ৫ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত শিশুদিগকে রবিবার সরল সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে প্রয়োজনীয় শিক্ষা

দেওয়া হয়। শিশুদেরও একটি লাইব্রেরী আছে, তাহাতে ছবির বই বেশী।

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৫৮ খৃঃ জানুআরিতে আরম্ভ করা হয়। বর্তমানে ৩২৭টি শিশু পড়ে এবং ১৪ জন শিক্ষক তাহাদের শিক্ষা দেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যান্‌ফ্যান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি): নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। পুরাতন মন্দিরে যথারীতি উপনিষদ্-আলোচনা ও ধ্যানের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

ডিসেম্বর, ১৯৬৩: যখন অন্তরাত্মা উদ্বুদ্ধ হন; তোমার কাজ উপাসনায় পরিণত কর; মৃত্যুর পরে কি থাকে? শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী শিবানন্দ; 'আমি'র স্বরূপ—অবচেতন ও অতিচেতন; অতীত কর্মফল জয় করিবার উপায়; শক্তির বাণী; খৃষ্ট—চিরন্তন ও ঐতিহাসিক।

জানুআরি, '৬৪: আগের কাজ আগে; স্বামী বিবেকানন্দের স্পর্শ; বিবেকানন্দ কে? স্বামী ব্রহ্মানন্দ; বিচার ও অতীন্দ্রিয় অনুভূতি; স্যান্‌ফ্রান্সিস্কোয় যে সন্ন্যাসী বাস করিয়াছিলেন; স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের বৈদেশিক নীতি; যৌগিক জ্ঞান

ফেব্রুআরি: মন শান্ত করিবার উপায়; ঈশ্বরের জন্য জীবন-ধারণ কিরূপে হয়? কর্মে বন্ধন, কর্মে মুক্তি; শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাই ধন্য; অদৃশ্যকে দর্শন; অহংকার ও আত্মার পার্থক্য; শ্রীরামকৃষ্ণ কিভাবে তাঁহার দিব্য উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন; মায়ার অর্থ।

মার্চ: সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন; ভয় ও দুশ্চিন্তার কারণ ও দূরীকরণের উপায়; বাহিরে কিছুই নাই, সবই অন্তরে; যোগের শিক্ষা; মানুষের পুনর্জন্ম কেন হয়? বেদান্তের তিনটি মতবাদ; ধ্যান, কর্ম ও দয়া; বিশ্বাস যখন শক্তিতে পরিণত হয়; পুনর্জীবন ও পুনর্জন্ম।

এপ্রিল: রহস্যময় আমাদের মন; দীক্ষা হইতে জ্ঞানোদয় পর্যন্ত; ঈশ্বরই আমার চালক; জন্মমৃত্যুর পারে যে জীবন; আমাদের প্রয়োজন - এক নূতন ধর্ম; আমিত্ব কি? ভাবাবেগ সংযম; বেদান্তের মূলনীতি; স্বামীজীর আধ্যাত্মিকতা।

মে: অন্তরের সাধনা; ইন্দ্রিয়জ্ঞান, বিচার ও অনুভূতি; ঈশ্বরের মানবতা ও মানবের দেবত্ব; চঞ্চল মন কিরূপে শান্ত হয়? নীরবতাই ঈশ্বরের বাণী; শঙ্কর ও তাঁহার সার্বভৌম ধর্ম; ধ্যানযোগ; তুমিই অব্যক্ত ঈশ্বর; যে কাজ মৃত্যুর পূর্বেই শেষ করিতে হইবে।

জুন: অতীন্দ্রিয় জ্ঞান কি? মন, ধ্যান ও সত্তা; জ্ঞানাগ্নি সর্বপাপ ভস্মীভূত করে; বুদ্ধ ও জগতের আচার্যগণ; ধর্মজীবন অতি সহজ, আবার অত্যন্ত কঠিন; পবিত্রতা অভ্যাস, বেদান্তে যুক্তি ও অনুভূতি; ঈশ্বরের অস্তিত্ব-উপলব্ধি।

বিবিধ সংবাদ

স্বামীজীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা

স্বামী বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকীর সমাপ্তি উপলক্ষে মাদ্রাজের সমুদ্রোপকূলে আইস্‌-হাউস্ (Ice-House)-এর সম্মুখে ১০ ফুট উচ্চ স্বামীজীর পরিব্রাজক ব্রোঞ্জ-মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বামীজী আইস্‌-হাউসে অবস্থান করিয়াছিলেন, বর্তমানে ইহার 'বিবেকানন্দ-ভবন' নামকরণ করা হইয়াছে। গত ১২ই জুলাই বিরাট জনসমাবেশে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন স্বামীজীর এই সুন্দর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ও সাধারণ সম্পাদক স্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ সভা

ডিব্রুগড়ঃ গত ২৬শে হইতে ২৮শে জুন স্থানীয় শ্রীসারদা সঙ্ঘ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি ও স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী সমিতির উদ্যোগে সেবাসমিতির বিবেকানন্দ-হলে তিনটি সভার আয়োজন করা হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রথম দিন 'শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী' ও দ্বিতীয় দিন 'শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর আলোকে হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে এবং শেষ দিন স্বামী যুক্তানন্দ 'বর্তমান ভারত ও স্বামী বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বামীজী-বিষয়ক ছায়াচিত্র, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিতরণ ও শারীরিক ব্যায়ামকৌশল-প্রদর্শন উল্লেখযোগ্য।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠা

সিঁথি (কলিকাতা ৫০): গত ২৬শে আষাঢ় (১০ই জুলাই) শ্রীরামকৃষ্ণের পদরেণুপূত সিঁথিতে 'সিঁথি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ' কর্তৃক নির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণের একটি সুন্দর মন্দির বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী বোধাত্মানন্দজী উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে বহু সাধু ও ভক্তের সমাগম হয়। তিনদিনব্যাপী একটি কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রথম দিন সন্ধ্যায় স্বামী বোধাত্মানন্দ ও নিরাময়ানন্দ বক্তৃতা দেন এবং স্বামী জীবানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরাধারমণ কীর্তন-সমাজ মধুর কীর্তন করেন। তৃতীয় দিন স্বামী পুণ্যানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যলীলা সঙ্গীত-সহযোগে বর্ণনা করেন; রহড়া বালকাশ্রমের বালকবৃন্দ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে।

ফ্রান্সে স্বামীজীর শতবার্ষিকী

ফরাসীদেশে গ্রেৎস (সীন এৎ মার্ন) রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্র কর্তৃক গত ৮ই ফেব্রুআরি বৈকাল ৫ ঘটিকায় পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বৃহৎ বৃত্তাকার মঞ্চে এক সভার আয়োজন করা হয়। মিঃ ডেনিয়েল লেভি এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

স্বামী অনন্যানন্দ বৈদিক প্রার্থনা করার পর সভা আরম্ভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বামী ঋতজানন্দ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের বাণী পাঠ করেন এবং গ্রেৎস রামকৃষ্ণ বেদান্ত-কেন্দ্রের

সেক্রেটারি মিঃ জজারিন এই বাণী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন; তিনি স্বামীজীর জীবন সম্বন্ধেও একটি ভাষণ দেন।

বিশিষ্ট ভারতবিদ্যা-বিশারদ অধ্যাপক অলিভার ল্যাকোম্বে স্বামীজীর চিন্তাধারা ও দর্শন সম্বন্ধে বলেন, এবং তাঁহাকে এই বলিয়া অভিনন্দিত করেন যে, সরল ও তেজস্বী ভাষায় পাশ্চাত্যে উপনিষদের বাণী তিনিই সর্বপ্রথম শিক্ষা দেন।

স্বামী ঋতজানন্দ স্বামীজী-কর্তৃক প্রচারিত বেদান্তের বাণী সম্বন্ধে বলেন। পদার্থ-বিজ্ঞানী মঃ শ্যার (M. Charron) বলেন, প্রাচীন হিন্দু ভাবধারার স্বামীজী যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিকগণ তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ (Theory of Relativity) উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আইনস্টাইনের পুস্তক ছাপা হইবার ৩০ বৎসর পূর্বেই স্বামীজী ঐ-বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন। একটি সংস্কৃত প্রার্থনার পরে সভা ভঙ্গ হয়।

ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়-সংবাদ

ইউনিভার্সিটি গ্র্যাণ্টস্ কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৯৬৩-৬৪ খৃঃ লক্ষাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত কলেজে ১৯৬৩-৬৪ খৃঃ ১১'৮৫ লক্ষ ছাত্র ছিল, ১৯৬২-৬৩ খৃঃ ছিল ১০'৬৩ লক্ষ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতি লক্ষণীয়: ১৮'৫ হইতে ১৯'৫ লক্ষ।

সাহিত্যে (Arts) ছাত্রসংখ্যা কিছু কমিয়াছে, বিজ্ঞানে কিছু বাড়িয়াছে।

শতকরা হিসাব	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
সাহিত্য	৪২'১	৪১'৮
বিজ্ঞান	৩০'৭	৩১'৫
টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং	৫'৪	৫'৩
চিকিৎসা		৪
কৃষি		৩

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা পশ্চিমবঙ্গে ছাত্রসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক।

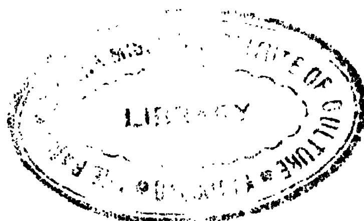
বিশ্ববিদ্যালয়	ছাত্রসংখ্যা
কলিকাতা	১০২,৮২৯
মাদ্রাজ	৭০,৬৭১
কেরল	৬৬,৩২৩
পঞ্জাব	৬১,৫৩৪
আগ্রা	৫৮,১৮৯
বোম্বাই	৫৫,৬৬৯

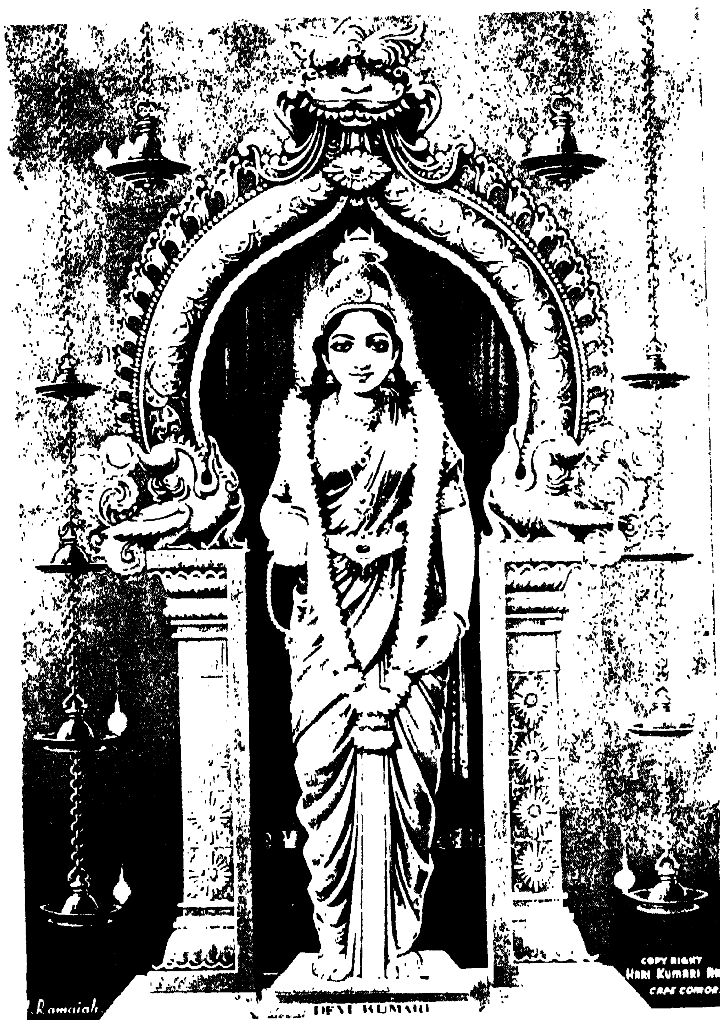
রাজ্য অনুযায়ী ছাত্রসংখ্যা:

পশ্চিমবঙ্গ	১৫৮,৪৪০
মহারাষ্ট্র	১৫১,২০৭
উত্তরপ্রদেশ	১১৮,১৬৫
বিহার	১১১,৯৫১

এই দুই বৎসরে অধ্যাপকের মোট সংখ্যা ৬৬,৩৭০ হইতে ৬৮,৬৩৪ হইয়াছে।

১৯৬৩-৬৪ খৃঃ ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করিয়াছে এবং একটিমাত্র নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পূর্ববৎসরে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৬৩-৬৪ খৃঃ মোট ২,১১১ কলেজের মধ্যে ১২৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ এবং বাকীগুলি অনুমোদিত। পূর্ব বৎসরে মোট ১,৯৩৮ কলেজের মধ্যে ১,৮০৫ অনুমোদিত ছিল।





দেবী কন্যাকুমারী মূর্তি

জ্যোতির্ভবান্তরে মূর্তিং ভাগসৌন্দর্যরূপিণীম্ ।
কুমারীং কন্যকাং দেবীং প্রণমামি তপস্বিনীম্ ॥

[৪০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।] [হরিকুমারী আর্টস্-এর সৌজন্যে]



কথাপ্রসঙ্গে

'ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ—'

যে দেবী সর্বভূতে 'বিষ্ণুমায়া' রূপে অভিহিতা—তাঁহাকে প্রণাম, প্রণাম, বার বার প্রণাম। শিবগেহিনী অসুরসংহারিণী সম্মিলিত-দেবশক্তি এই মহামায়াকে 'বৈষ্ণবীশক্তি' বলা হইয়াছে। কি ইহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব? কি ইহার আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত? শিব ও বিষ্ণুর ঐক্যই কি ইহার লক্ষ্য? না কি সকল শক্তির আধারভূতা—ত্রিগুণাতীতা আদ্যাশক্তিই এখানে অভিলক্ষিতা?

রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে স্থিতি বা পালন, তমোগুণে নাশ বা সংহার অর্থাৎ উপাদান-কারণে প্রত্যাবর্তন, ইহাই তো ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি-শক্তির সৃষ্টিস্থিতিলয়-তত্ত্ব। সৃষ্টিকর্তা রজঃপ্রধান ব্রহ্মা, পালনকর্তা সত্ত্বপ্রধান বিষ্ণু, লয়কর্তা তমঃপ্রধান রুদ্র বা শিব। ব্যক্তভাবের একপ্রান্তে সৃষ্টি, অপরপ্রান্তে লয়, মধ্যে স্থিতি; এই স্থিতি লইয়াই আমাদের জীবন-কর্ম, শাস্ত্র-সমাজ, ইতিহাস-পুরাণ, এই স্থিতিকালেই বারংবার দেবাসুর-সংগ্রাম, অধর্মের অভ্যুত্থান ও ধর্মস্থাপন। এ-সকলই বিষ্ণুলীলা—বিষ্ণুশক্তির লীলা। বিষ্ণুশক্তির সংহার-লীলাও পালনার্থে।

এই সংহার-লীলায় হিংসা-অহিংসার কোন প্রশ্ন নাই, ইহা বৈষ্ণবীশক্তির শাসন-লীলা। মাতা যখন দুষ্ট সন্তানকে শাসন করেন, তখন তাঁহার মনে কোন দ্বেষ বা হিংসা কল্পনা করা যায় না। ঐ সন্তানের কল্যাণে, অন্যান্য সন্তানের কল্যাণে—সমগ্রভাবে সমষ্টির কল্যাণে উন্মার্গগামী ব্যষ্টিকে শাসন করিতেই হইবে; ইহাই হইল বৈষ্ণবীশক্তির প্রয়োগ। ইহা হইল সংসার-পালনী মাতৃশক্তির অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য। এই শাসনের মধ্যে আছে স্নেহ-ভালবাসা, মাতৃভাবের পরিপূর্তি—সত্ত্বগুণের পরিস্ফুরণ। অসুর-শক্তি দমিত হইলে পর দেবর্ষিগণ প্রণতিনম্র শিরে তাই দেবীকে সাক্ষাৎভাবে স্তুতি করিতেছেন:

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

—তুমি বৈষ্ণবীশক্তি, অনন্তবীর্যা। তুমি বিশ্বের বীজভূতা পরম মায়া। তুমি জীবজগৎ মায়ামুগ্ধ কর, আবার তুমি প্রসন্ন হইলে জীবের জ্ঞান ভক্তি মুক্তি হয়।

তুমি অপরাজিতা অপরাজেয়া বিষ্ণুশক্তি; সংসার, সমাজ ও রাষ্ট্র রক্ষার জন্য জগৎকল্যাণে তুমি বারংবার আবির্ভূত হও—কখনও সমষ্টিভাবে, কখনও ব্যষ্টিভাবে। তুমি অশুভ শক্তি নিরস্ত কর, শুভ শক্তি জাগ্রত কর। সত্ত্বগুণের মাধ্যমে সংসারে সমাজে সামঞ্জস্য পুনঃস্থাপিত কর। তুমি নারায়ণী, নারায়ণ-শক্তি—প্রতিটি নরনারীতে তোমারই শক্তি লীলা করিতেছে। সেই শক্তি তুমি কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে চালিত কর—মানুষের মধ্যে দেবতাকে বিকশিত কর, অসুরভাব দূর করিয়া মানব-হৃদয়ে দেবভাব প্রতিষ্ঠিত কর।

'মাকে আমার মনে পড়ে'

শ্রীরমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'খোকা' যতই বড়াই করিয়া বলিতেছে যে, 'মাকে আমার পড়ে না মনে', ততই প্রত্যেকটি ব্যাপারে সে মায়ের কথা না মনে করিয়া পারিতেছে না। একবার বলে, 'মা বুঝি তাঁর গানটি ফেলে গেছে', আবার বলে যে, 'মায়ের আঁখি বুঝি সারা আকাশ ছেয়ে গেছে।' আবার বলে, 'পূজার গন্ধ আসে যে তাই মায়ের গন্ধ হয়ে।' তবু মাকে তাহার মনে পড়ে না!

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্য আজ ভরিয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়া আমাদের মনেও জাগে যে, 'পূজার গন্ধ ভেসে আসে মায়ের গন্ধ হয়ে'। অত পদ্ম, অত শিউলি ফুটিল মায়ের পায়ে স্থান পাইবার জন্যই তো, মা যে আবার আসিতেছেন। আমরাও খোকার মতো, মুখে 'মনে পড়ে না' আওড়াইলেও হৃদয়ের অন্তস্তলে মাকে মনে করিতেছি এবং সারা মনপ্রাণ দিয়া মায়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি।

গত বৎসর বিজয়াদশমীর দিনে অশ্রুসজল নেত্রে মাকে যখন জলে নিরঞ্জন করিয়াছিলাম, তখনই তো বলিয়াছিলাম, 'মা এখন এস, কিন্তু —সম্বৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ'। রানী রাসমণির জামাতা, পরমভাগ্যবান্ মথুরবাবু জিদ করিয়াছিলেন যে, মাকে আর বিসর্জন দিবেন না। শেষে পরম দয়াল ঠাকুরের কথায় তিনি রাজী হন—এই বিশ্বাসে যে, মা তো সত্যই ছাড়িয়া যাইতেছেন না।

বাস্তবিকই তো—মা গেলেন কোথায়, যাবেনই বা কোথায়? মাকে জলে তো রাখিলাম, কিন্তু চণ্ডীর স্তবে (১১।৪) পড়িতেছি:

'অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে
কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে॥'

—তুমিই তো জলরূপে এই সমস্ত জগৎকে তৃপ্ত করিতেছ। ঐ তো মা জলে এবং স্থলে! ফিরিবার পথেও দেখিলাম—এই তো ধরিত্রী-রূপিণী মা, 'মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি'।

তাই ভাবি, মা তো আমাদের ছাড়িয়া যান নাই; আমরাই মাকে ভুলি, কিন্তু শরদাগমে আবার বিশেষ করিয়া মাকে মনে পড়িতেছে চণ্ডীতে (৪।১৭) পড়িতেছি:

'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।'

—বিপদে পড়িয়া মাকে স্মরণ করিলে তিনি সকল জীবের ভয় হরণ করেন এবং সুস্থ অবস্থায় স্মরণ করিলে তিনি অতি শুভমতি বা ভক্তি দান করেন। আবার অন্যত্রও (৫।৮২) পড়িতেছি:

'যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ॥'

মাকে স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি আমাদের সকল বিপদ নষ্ট করেন, তাই তো মাকে স্মরণ করি।

চণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ের 'নমস্তস্যৈ' মন্ত্রগুলি পড়িলে মনে না করিয়া পারি না যে, মা কত ভাবে কত নিবিড় ভাবে পুত্রকে ঘিরিয়া রহিয়াছেন। তিনি আমাদের চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, শক্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি (জীবিকোপায়) স্মৃতি, ভ্রান্তি—আরও কত কি হইয়া নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। তবু যে মাকে স্মরণ করি না, তারও মূলে মায়েরই ঐ 'ভ্রান্তি'রূপ। দেবগণ স্তবে বলিতেছেন (১১।৫), 'সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ'—মায়ের ইচ্ছাতেই সারা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মোহিত হইয়া মায়ের স্বরূপ ভুলিয়া

আছে। ব্রহ্মা বলিলেন, (১।৭২) তুমি মহা-অস্মৃতি মহামোহ। তাই মায়ের কোলে থাকিয়াও আমরা মাকেই ভুলিয়া যাই।

ঋষি অভয় দিতেছেন (১৩।৪-৫): বুদ্ধিমান্ ও বিবেকসম্পন্ন—সকলেই মায়ের মায়ায় মোহিত হয়, এখনও মোহিত হইয়াই রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। তবে ভয়ের কারণ নাই (১৩।৫):

'তামুপৈহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥'

—সেই পরমেশ্বরীর শরণ লউন। হে মহারাজ, তাঁহাকে আরাধনা করিলে তিনিই মানুষের ভোগ, স্বর্গ এবং মুক্তির বিধান করিয়া থাকেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই বলিতেন, 'শরণাগতি, শরণাগতি'—'মহামায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে হবে না।'

মায়ের পূজায় চণ্ডীহোম করা দেখিয়াছি। সমস্ত শেষ হইলে এই কথাই মনে হয় যে, ৭০০টি মন্ত্রদ্বারা বর্ণিত ঐ সুরথ-সমাধির কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে, উভয়েই 'নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ' হইয়া তিনটি বৎসর দেবীসূক্ত জপ করিয়া দেবীর আরাধনা করিলেন; দেবী প্রসন্ন হইয়া উভয়কেই বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। এই পর্যন্ত উভয়েই সমান। কিন্তু প্রার্থনার বেলায় কত তফাত। রাজা চাহিলেন—এ জন্মের নষ্ট রাজ্য যেন পুনরুদ্ধার করিতে পারেন এবং আগামী জন্মেও যেন এমন রাজ্য লাভ হয়, যাহা অবিভ্রংশ—কখনও যাহা নষ্ট হইবে না। দেবী বলিলেন 'তথাস্তু'। হয়তো বা একটু হাসিলেন—এই ভাবিয়া যে, রাজার দেহেন্দ্রিয় সবই যখন নশ্বর, তখন ঐরূপ রাজ্য শেষ পর্যন্ত দুঃখেরই কারণ হইবে। তবে কথা এই—মায়ের লীলার অঙ্গীভূত দুঃখও সুখ।

বৈশ্যের ভাবান্তর লক্ষণীয়। ঋষি তাঁহাকে 'বিজ্ঞ' এই বিশেষণটি দিয়াছেন। সমাধি বৈশ্য এই বর চাহিলেন, 'আমি ও আমার' বলিয়া যে মোহের রাজত্বে রহিয়াছেন, মা যেন তত্ত্বজ্ঞান-প্রদানে তাহার নাশ করেন। মা যেন তাঁহার 'অহং-মম'-ভাব দূর করিয়া দেন।

এক যাত্রায় পৃথক্ ফল লক্ষ্য করা যাইতেছে। কারণ খুঁজিলে দেখিতে পাই যে, রাজার স্ত্রী-পুত্রপরিবার তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন না। শুধু বলবান্ শত্রু এবং দুষ্ট অমাত্যগণের জন্যই তাঁহাকে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়া আসিতে হইয়াছিল। ওদিকে সমাধি-বৈশ্যের বেলায় লক্ষ্য করি, 'পুত্রদারৈর্নিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ' —অসৎ ও ধনলোভী স্ত্রী-পুত্র কর্তৃক তিনি বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সংসারের অনিত্যতা ও আত্মীয়দের প্রীতির অসারতা মর্মে মর্মে বুঝিয়া তিনি বৈরাগ্যবান্, এবং মহামায়ার প্রসাদে তাঁহার মন হইতে মায়া অন্তর্হিত।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক মহামায়ার মাতৃভাবে ভরিয়া গেলেই মায়ার বন্ধন দূরীভূত হইবে, সঙ্গবিচ্যুতিকারক জ্ঞান লাভ হইবে।

এবার ভাবিতেছি প্রার্থনা করিব: যেন এই ভাবটি সদাসর্বদা মনে জাগে যে—

'মা আছেন আর আমি আছি,
ভাবনা কি আছে আমার?
মায়ের হাতে খাই পরি,
মা নিয়েছেন আমার ভার।'

—এবার মহা-অস্মৃতিরূপিণী মাকেই স্মৃতিরূপিণী হইয়া থাকিতে বলিব। আর মাকে ভুলিব না।

'মেধাসি দেবি—'

ডক্টর রমা চৌধুরী

'মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা'—
শ্রীশ্রীচণ্ডী—৪।১১

—দেবি! লোকে যার দ্বারা সর্বশাস্ত্রের মর্ম অবগত হয়, সেই মেধারূপিণী, জ্ঞান-স্বরূপিণী—সরস্বতী আপনি।

মহামাতৃপূজার পরম শুভলগ্নে আজ গৃহে গৃহে উত্থিত হচ্ছে এই মধুর বন্দনা; হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে আমরা আমাদের প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি তাঁরই রাতুল চরণে নানাভাবে তাঁকে নানা বিশেষণে বিভূষিত ক'রে। এই সবের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ বর্ণনা হ'ল এই যে, তিনি অনন্ত অসীম অচিন্তনীয় জ্ঞানস্বরূপিণী। বস্তুতঃ আমাদের দর্শনে ও ধর্মশাস্ত্রে এই জ্ঞানকেই গ্রহণ করা হয়েছে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের একটি মূলীভূত লক্ষণরূপে। কিন্তু এই 'জ্ঞানের' অর্থ কি?

আমাদের অদ্বৈত-বেদান্তমতে, ব্রহ্ম 'জ্ঞান'ই, 'জ্ঞাতা' নন। 'জ্ঞান' ও 'জ্ঞাতৃত্বে'র মধ্যে প্রভেদ কি? 'জ্ঞান' কেবলই নির্বিশেষতা, 'জ্ঞাতৃত্ব' কেবলই সবিশেষতা; 'জ্ঞান কেবলই স্বরূপ, 'জ্ঞাতৃত্ব' গুণ; 'জ্ঞান' কেবলই নিষ্ক্রিয়তা, 'জ্ঞাতৃত্ব' সক্রিয়তা; 'জ্ঞান' কেবলই নির্বিকারতা, 'জ্ঞাতৃত্ব' সবিকারিতা। এরূপে 'জ্ঞান' ও 'জ্ঞাতা'র মধ্যে প্রভেদ মূলীভূত, চিরন্তন, অনিবার্য।

প্রথমতঃ এস্থলে 'জ্ঞান' সম্পূর্ণরূপেই নির্বিশেষ, যেহেতু এই জ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ 'বিশেষ' অথবা ভেদ নেই; অর্থাৎ কোন জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-ভেদ নেই। পুনরায় এস্থলে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই নির্গুণ, যেহেতু এই জ্ঞান জ্ঞাতার গুণ নয়, এই জ্ঞান নিজেই নিজের স্বরূপ। পুনরায় এস্থলে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই নিষ্ক্রিয়, যেহেতু এস্থলে 'করা' কিছুই নেই, 'জানা' কিছুই নেই, কেবল আছে 'থাকা'—স্ব-প্রকাশরূপে 'থাকা'। পুনরায় এস্থলে জ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই নির্বিকার, যেহেতু জ্ঞানের মধ্যে কোনরূপ তারতম্য নেই, কোন অল্পাধিক্য নেই, কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিণাম নেই।

দ্বিতীয়তঃ 'জ্ঞাতা'র কথা। প্রতি পদেই তা জ্ঞানের বিপরীতস্বরূপ। এরূপে জ্ঞাতার রয়েছে সকলপ্রকার 'বিশেষ' বা ভেদ: সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত। জ্ঞাতা যখন অন্য এক জীবকে জানছেন, তখন তাঁর আছে 'সজাতীয়' ভেদ; যখন অন্য ঘট-পটাদিকে জানছেন, তখন তাঁর আছে 'বিজাতীয়' ভেদ, যখন নিজেকেই জানছেন, তখন তাঁর আছে 'স্বগত' ভেদ।

পুনরায় জ্ঞান জ্ঞাতার গুণ—এস্থলে জ্ঞাতা একটি দ্রব্য অথবা বস্তু, জ্ঞান তার গুণ। সেক্ষেত্রে ব্রহ্ম (দ্রব্য) ও জ্ঞান (গুণ) পরস্পর ভিন্ন হয়ে পড়েন, যেহেতু দ্রব্য ও গুণ ভিন্নাভিন্ন। কিন্তু প্রকৃতকল্পে ব্রহ্ম ও জ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই অভিন্ন। ব্রহ্মই জ্ঞান, জ্ঞানই ব্রহ্ম। সেজন্য চিৎ বা জ্ঞান ব্রহ্মের গুণ নয়, স্বরূপ।

পুনরায় জ্ঞাতা সক্রিয়, স্বভাবগত ভাবেই সক্রিয়, জ্ঞান ক্রিয়ার কর্তারূপে সক্রিয়। পরিশেষে জ্ঞাতার বিকার অথবা পরিবর্তন অনিবার্য, যেহেতু জ্ঞাতা এখন জানছেন, তখন নয়; এখন এই বস্তু জানছেন, তখন 'ঐ' বস্তু; এখন পরিপূর্ণ ভাবে জানছেন, তখন খণ্ডিত ভাবে।

এই ভাবে একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে

যে, এরূপ 'জ্ঞান' কেবল 'জ্ঞান'ই, 'জ্ঞাতা' নয়। এবং ব্রহ্ম কেবলই জ্ঞান, জ্ঞাতা নন।

কেবল 'জ্ঞান', কেবল 'চিৎ'! কি মহিমময়, অথচ কি অভূতপূর্ব অচিন্তনীয় অনির্বচনীয় এই তত্ত্ব! জ্ঞাতা নেই, জ্ঞেয় নেই, অথচ আছে 'জ্ঞান'! যদি কেহই জানলেন না, যদি কাকেও জানা হ'ল না, তাহলে আর জ্ঞানই বা হ'ল কোথায়? আর তার প্রয়োজনীয়তাও বা রইল কি; আর তার সার্থকতাও বা হ'ল কখন?

এর উত্তর হ'ল এই:

দেশ-কাল-অবস্থা-পাত্রাদি প্রমুখ অসংখ্য শর্তাকীর্ণ আমাদের সাধারণ জ্ঞান—কত ক্ষীণ তার রশ্মি, কত সঙ্কীর্ণ তার বিস্তৃতি, কত ভ্রমসঙ্কুল তার স্বরূপ! তাকে উন্নত করবার উপায় কি? উপায় নেই, কোন উপায়ই নেই। যতই দীপ্ত কর তার রশ্মি, যতই প্রসারিত কর তার পরিধি, যতই সংশোধিত কর তার স্বরূপ—তা স্বভাবগত ভাবেই, শাশ্বত ভাবেই, অনিবার্য ভাবেই, উপায়বিহীন ভাবেই ক্ষীণ, সঙ্কীর্ণ, ভ্রমসঙ্কুল।

কেন? কারণ এ যে বাইরে থেকে জানা, বাইরে থেকে মানা, বাইরে থেকে টানা—একবার ভেদ ধরে নিয়ে তার উপরে সেতু বসাবার বৃথাই প্রচেষ্টা! একবার ভেদ স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'ল জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে—তারপরে কে তাঁদের পুনরায় এক করবেন? এই এক না হ'লে তো জ্ঞানও হবে না। জ্ঞাতা যাবেন জ্ঞেয়ের দিকে, তাঁকে টেনে নেবেন নিজেরই মধ্যে, ঘুচিয়ে দেবেন দু-জনের মধ্যে সকল ব্যবধান—তবেই তো হবে জ্ঞান!

জ্ঞানের মর্মকথাই এই—জ্ঞাতা পরিণত হবেন জ্ঞেয়ে, তবেই তো হবে জ্ঞান। সাংখ্য-যোগ-বেদান্ত-দর্শনে, এমন-কি সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই মূলীভূত মহাসত্যটি স্বীকার করা হয়েছে বৃত্তি-চৈতন্যবাদের মাধ্যমে। এস্থলে বলা হচ্ছে যে, বাহিরের ঘট-রূপ জ্ঞেয়বস্তু অন্তঃকরণে প্রতিফলিত হ'লে অন্তঃকরণ ঘট-রূপ ধারণ করে; এবং একটি ঘট-রূপা বৃত্তির সৃষ্টি হয়; এবং এরূপ ঘটাকারা বৃত্তির মাধ্যমেই কেবল ঘটটি জ্ঞাত হয়।

অতি যোগ্য উপমার সাহায্যে এই মূল-তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে অদ্বৈত-বেদান্তদর্শনের সুবিখ্যাত প্রমাণ-বিষয়ক গ্রন্থ 'বেদান্ত-পরিভাষা'য়:

'তত্র যথা তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তদ্বদেব চ চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি, তথা তৈজসমন্তঃ-করণমপি চক্ষুরাদিদ্বারা নির্গত্য ঘটাদিবিষয়দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে। স এব পরিণামো বৃত্তিরিত্যুচ্যতে।' (প্রথম পরিচ্ছেদ)

—যেমন পুষ্করিণীর জল কোন ছিদ্র দিয়ে বহির্গত হয়ে ক্ষেতে প্রবেশ করে; এবং সেই ক্ষেত্র ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা গোলাকার হ'লে জলও ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা গোলাকার হয়—সেরূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দিয়ে বহির্গত হয়ে ঘট-পটাদি বিষয়ে যায় ও ঘট-পটাদির আকার ধারণ করে। অন্তঃকরণের এরূপ পরিণামের নামই 'বৃত্তি'।

এরূপে অন্তঃকরণ বস্তুর রূপ ধারণ করে—তবেই সেই বস্তুটি সম্বন্ধে জ্ঞানের উদয় হয়। এর অর্থ কি এই নয় যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকলে জ্ঞানই অসম্ভব? অন্তঃকরণকে হ'তে হবে ঘট; জ্ঞাতাকে হ'তে হবে জ্ঞেয়—তবেই তো উদ্ভূত হবে জ্ঞান।

তাহলে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের মধ্যে প্রভেদ রাখবারই বা প্রয়োজন কি? যা উপরে বলা হ'ল—একবার প্রভেদ করলে আর অভেদ করা যায়

না—পাত্রটি একবার ভেঙে গেলে কি আর জোড়া লাগে ?

বস্তুতঃ জ্ঞাতা যদি এই ভাবে জ্ঞেয়ের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যান ; জ্ঞেয়ও যদি এই ভাবে জ্ঞাতার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যায়, তাহলে আর রইল কি ? রইল কেবলই জ্ঞান—কেবল জ্ঞান, পরম জ্ঞান, শর্তহীন জ্ঞান, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-সম্বন্ধবিহীন জ্ঞান, নির্বিশেষ-নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়-নির্বিকার জ্ঞান। এই তো হ'ল অদ্বৈত-বেদান্ত দর্শনের পরম রমণীয় মতবাদ। মনস্তত্ত্বের দিক্ থেকেই হোক, অথবা দর্শনশাস্ত্রের দিক্ থেকেই হোক—এ সত্যই একটি অতি অভিনব, অতি আশ্চর্য, অতি চিত্তচমৎকারী মতবাদ! নিঃসন্দেহে এ একটি অতুলনীয় মতবাদ! কারণ জ্ঞানের প্রশ্ন উঠলেই আমরা জিজ্ঞাসা করি—কার জ্ঞান এবং কিসের জ্ঞান ? এস্থলে সে প্রশ্নের প্রশ্নই নেই, অথচ জ্ঞানের প্রশ্ন আছে। কি অচিন্তনীয় এই ব্যাপার! এরূপ অদ্ভুত জ্ঞান কি সত্যই থাকতে পারে ? যদি পারে, তার স্বরূপই বা কি ?

ভারতীয় দর্শনানুসারে, এরূপ জ্ঞান নিশ্চয়ই থাকতে পারে—ব্রহ্মের কথা তো বাদই দাও ; এমন-কি, জীবের ক্ষেত্রেও থাকতে পারে। এই মতবাদ অর্থাৎ জীবেরও যে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-সম্বন্ধহীন জ্ঞান থাকতে পারে, তা কেবল অদ্বৈত-বাদিগণই নন, কেবল ব্রহ্ম-জীবৈক্যবাদিগণই নন, অন্যান্য বহু সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণও সগৌরবে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, যথা—সাংখ্য-যোগবাদিগণ। তাঁরা অদ্বৈতবাদী একেবারেই নন ; উপরন্তু পুরুষ-প্রকৃতিরূপ দুই পরস্পরবিরুদ্ধ তত্ত্ববাদী বা পরিপূর্ণ দ্বৈতবাদী। তা সত্ত্বেও তাঁদের মতে 'যোগ' বা 'সমাধি'ই হ'ল মোক্ষের একমাত্র উপায়। 'যোগ' বা 'সমাধি' 'চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ' অথবা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-সম্বন্ধহীন জ্ঞান। এরূপ জ্ঞানই হ'ল তাঁদের মতে একমাত্র প্রকৃত জ্ঞান। এই সাংখ্য-যোগ-মতবাদ—সকল সম্প্রদায়ই আনন্দে গ্রহণ করেছেন। সর্বসম্মত 'নিদিধ্যাসন'ও সেই একই স্বরূপের। 'শ্রবণ' ও 'মননে'র পরে সাক্ষাৎ উপলব্ধির প্রশ্ন আসে। এই উপলব্ধির অর্থ কি, বৈশিষ্ট্য কি ? তা হ'ল এই যে, জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞাতা-রূপে বাইরে থেকে জানা নয়—অন্তরের অন্তস্তলে নিজের সঙ্গে এক ক'রে সেই জ্ঞানকে লাভ করা ; অর্থাৎ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-সম্বন্ধ অতিক্রম ক'রে জ্ঞান লাভ করা।

এইভাবে জড়বাদী চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য সকল দার্শনিকই জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-সম্বন্ধহীন, কেবল, পরম, শর্তহীন, শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছেন আনন্দে।

এরূপ অত্যাশ্চর্য জ্ঞানের স্বরূপ কি ? পূর্ণতম ভাবে স্বরূপ-বর্ণনা অবশ্য অসম্ভব। তাহলেও বলা চলে যে, এই অবস্থা হ'ল সচ্চিদানন্দের পূর্ণতম প্রকাশ। এরূপে এই জ্ঞান 'সৎ' ; এই জ্ঞান 'চিৎ' ; এই জ্ঞান 'আনন্দ'। এই যে অমৃতত্ব, এই যে আলোক, এই যে আনন্দ, তাই তো হ'ল কেবল সৎ, কেবল চিৎ, কেবল আনন্দের প্রতীক। দেখ রবির উজ্জ্বলতাকে, উচ্ছলতাকে, উদ্বেলতাকে—এই উজ্জ্বলতা-উচ্ছলতা-উদ্বেলতাই তার স্থিতি ; এই আনন্দ-অমৃত-আলোকই তার স্বভাব। একই ভাবে আত্মার সত্তা, আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দ দেহমনোগত নয়, আত্মগত।

কি অপরূপ এই ভাব! পরমজননী এবং পরব্রহ্মকে—আমরা এইভাবেই সমন্বিত দেখি।

বৌদ্ধভারত*

স্বামী বিবেকানন্দ

[শেক্স্পীয়র ক্লাব, পাসাডেনা, কালিফোর্নিয়া—২রা ফেব্রুআরি, ১৯০০, সন্ধ্যা ৮ ঘটিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা। নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কেন্দ্র কর্তৃক কিছুদিন পূর্বে সংগৃহীত]

আজ সন্ধ্যায় বৌদ্ধভারত আমাদের আলোচ্য বিষয়। আপনারা অনেকেই হয়তো এড্উইন্ আর্নল্ডের পদ্যে লিখিত বুদ্ধের জীবনী পাঠ করেছেন। কেউ কেউ হয়তো এ-বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনাও ক'রে থাকবেন। কারণ ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি নানা ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্যের উপর প্রচুর পুস্তকাদি প্রকাশিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মই জগতের সার্বভৌম ধর্মের প্রথম অভিব্যক্তি। সুতরাং এর অনুশীলন স্বতই বিশেষ আকর্ষণীয়।

বৌদ্ধধর্মের পূর্বেও ভারতে এবং অন্যত্র নানা ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেগুলি অল্পবিস্তর নিজ নিজ জাতির পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু, ইহুদী, পারসীক প্রভৃতি প্রাচীন জাতির প্রত্যেকেরই মহান্ ধর্ম ছিল। কিন্তু সে-সবই মোটের উপর জাতি-বিশেষের নিজস্ব ধর্ম —সার্বভৌম ধর্ম নয়। বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মের বিশ্ববিজয়রূপ বিচিত্র একটি অভিযানের সূত্রপাত। যে মতবাদ ও বাণী বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত হয়েছিল, যে সত্যসমূহ তার শিক্ষার অঙ্গীভূত—সে-সবের কথা বাদ দিলেও ধর্মজগতে সেই প্রথম এক বিপুল বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। সে ধর্মের জন্মলগ্নের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধশ্রমণগণ নগ্নপদে ও মুণ্ডিতমস্তকে তৎকালীন সভ্যজগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, এমনকি ল্যাপল্যাণ্ডের একপ্রান্ত থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অপর প্রান্ত অবধি তারা প্রচার করেছিল। এইভাবে বুদ্ধদেবের জন্মের অল্প কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই তারা নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং মূল ভারতভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম এক সময়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নরনারীকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

তবে ভারতবর্ষ কখনও সমগ্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেনি। সে ধর্মের পরিধির বহির্ভাগেই ভারতবর্ষ চিরদিন দণ্ডায়মান ছিল। ফলে খ্রীষ্টধর্ম ইহুদীদের মধ্যে যে পরিণতি লাভ করেছিল, অর্থাৎ অধিকাংশ ইহুদী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেনি,—বৌদ্ধধর্মও ভারতবর্ষে অনুরূপ পরিণতিই লাভ করেছিল এবং এভাবেই প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের ধারা অব্যাহত ছিল।

কিন্তু তুলনাটির পরিসমাপ্তি এখানেই। কারণ খ্রীষ্টধর্ম ইহুদী জাতিকে নিজ পরিধির মধ্যে গ্রহণ করতে সমর্থ না হলেও সমগ্র দেশকে নিজ প্রভাবের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। যে-সব স্থানে প্রাচীন ইহুদী ধর্ম প্রচলিত ছিল—অতি অল্পকাল মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম সে-সব স্থানেও প্রবেশ ক'রে তাকে যেন বাতিল ক'রে দিয়েছিল।

সেজন্য প্রাচীন ইহুদীধর্ম শুধু বিক্ষিপ্তভাবেই পৃথিবীর এখানে সেখানে টিকে থাকলো। কিন্তু ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মরূপী শিশুটিকে তার প্রসূতি নিজেই যেন গ্রাস ক'রে ফেলেছিল এবং আজ বুদ্ধের নামও যেন ভারতবর্ষে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে আজ সে-দেশের অধিকাংশ নরনারী অপেক্ষা

* স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষজয়ন্তী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'Swami Vivekananda Centenary Memorial Volume'-এর অন্তর্গত মূল ইংরেজীর অনুবাদ। অনুবাদক: শ্রীতামসরঞ্জন রায়।

আপনারাই হয়তো বৌদ্ধধর্মের কথা বেশী অবগত আছেন। তারা বড়জোর সেই মহাপুরুষের নামটি মাত্র শ্রবণ করেছে। তিনি একজন বিশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন, ভগবানের অবতার ছিলেন—এই পর্যন্ত সংবাদ তারা হয়তো রাখে, এর অতিরিক্ত আর কিছু নয়।

সিংহল অবশ্য আজও বুদ্ধদেবের সাম্রাজ্য, এবং হিমালয়ের কোন কোন অংশেও বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা এখনও কিছু আছে। এ-ছাড়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তবে ভারতের বাইরে, এশিয়ার বিভিন্ন অংশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের অনুগামীদের সংখ্যাই পৃথিবীতে সর্বাধিক এবং এ-ধর্ম পরোক্ষভাবে অন্যান্য ধর্মের শিক্ষা ও অনুশাসনকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিতও করেছে।···

একদা বৌদ্ধধর্মের অনেক কিছু এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেছিল। খ্রীষ্টধর্মে ও বৌদ্ধধর্মে প্রাধান্য এবং প্রভুত্ব নিয়ে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামও একসময়ে বড় কম ছিল না। খ্রীষ্টধর্মের আদিযুগে নষ্টিক (Gnostics) প্রমুখ যে-সব সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়েছিল, তাদের আচার-আচরণ, মতি-গতি বৌদ্ধদেরই অনুরূপ ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর বিচিত্র আবহাওয়ার মধ্যে রোমক আইনের অধীনে যে ধর্মগত সংমিশ্রণ সাধিত হয়েছিল—তারই দানে খ্রীষ্টধর্মের উৎপত্তি হয়।

বৌদ্ধধর্মের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক—তার ধর্ম এবং আচার-আচরণাদি অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণীয়। এবং বিপুলশক্তিসম্পন্ন একটি বিশ্ববিজয়ী ধর্মরূপে তার যে প্রথম আত্মপ্রকাশ—তার মাধুর্যও কম নয়।

আজকের ভাষণে আমি মূলতঃ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধেই আলোচনা করতে চাই। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব এবং তার প্রসার কতকাংশে অনুধাবন করতে হলেও—সে মহান্ ধর্মগুরুর আবির্ভাবকালে ভারতবর্ষের অবস্থা কেমন ছিল—সে-বিষয়ে কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সেদিনের ভারতবর্ষে এক বহুবিস্তৃত বিরাট ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সে ধর্মের সুসম্বদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ—বেদ। বেদসমূহ বাইবেলের মতো একটি গ্রন্থমাত্র ছিল না। পরন্তু নানা গ্রন্থের সমবায়ে বেদ ছিল একটি সাহিত্য-বিশেষ। অবশ্য বাইবেলও বিভিন্ন যুগের রচনার সমষ্টি, বিভিন্ন লেখকের হাতের সৃষ্ট সম্পদ্। কিন্তু বেদ-সংগ্রহ অতি বিশাল। আর তার সব গ্রন্থ পাওয়াই যায় না, এমন-কি তাদের সবগুলির নাম পর্যন্ত ভারতবর্ষেও কেউ অবগত নয়। কিন্তু যদি কোন প্রকারে সে-গ্রন্থের সবগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব হ'ত, তবে এই প্রশস্ত কক্ষটিতেও তাদের স্থান সঙ্কুলান হ'ত না।

সে এক বিরাট—এক বিপুল সাহিত্য সংগ্রহ। সেই মহান্ শাস্ত্রকার শ্রীভগবানের কাছ থেকেই এই সাহিত্য বংশ-পরম্পরায় আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সেজন্য ভারতবর্ষে শাস্ত্রবিষয়ক ধারণা অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী ছিল, গোঁড়ামিতে পূর্ণ ছিল।

আপনারা গ্রন্থপূজার গোঁড়ামি সম্পর্কে অভিযোগ ক'রে থাকেন। কিন্তু এ-সম্পর্কে হিন্দুর মনোভাব জানতে পারলে আপনারা কি ভাববেন—কে জানে? হিন্দু বিশ্বাস করে যে, বেদ প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত জ্ঞান। বেদ-সহায়েই এই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট হয়েছে এবং বেদে নিহিত বলেই তাদের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। একটি গাভী এই স্থূল জগতে বিরাজ

করছে, কারণ 'গাভী' শব্দটি বেদে রয়েছে। একটি মানুষ এই পার্থিব জগতে বিদ্যমান, কারণ 'মানুষ' শব্দটি বেদমধ্যে উল্লিখিত আছে। এরই মধ্যে সেই মতবাদের জন্মসূত্র দেখা যায়—যেটি উত্তরকালে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণ বর্ধিত করেছিলেন এবং এইভাবে প্রকাশ করেছিলেন—'সৃষ্টির প্রারম্ভে ছিল শুধু শব্দ এবং শব্দ ঈশ্বর বা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ছিল।'—এ তত্ত্ব ভারতবর্ষের প্রাচীন তত্ত্ব। এ তত্ত্বের ভিত্তির উপরই শাস্ত্রের ভাবরাশি দণ্ডায়মান। অবশ্য এ-কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, শব্দ-মাত্রই ঐশী শক্তির আধার। বহির্বিশ্ব ভাবের মূর্তপ্রকাশ-স্বরূপ। সুতরাং প্রকাশমাত্রেই জাগতিক ক্ষেত্রে স্থূল প্রকাশ এবং শব্দমাত্রেই বেদ, আর সংস্কৃতই দেবভাষা। একদা দেবমুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল ভাষা। সে-ভাষা সংস্কৃত ভাষা অথবা দেবভাষা। সেজন্য ভারতীয়দের মতে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য সকল ভাষাই নিম্নপর্যায়ের পশুকণ্ঠ-নিঃসৃত ভাষার মতো। আর সে-সব ভাষা-ভাষীরাই 'ম্লেচ্ছ' শব্দে অভিহিত। গ্রীকদের পরিভাষায় 'বর্বর' শব্দটি যেমন, এ 'ম্লেচ্ছ' শব্দটিও (সংস্কৃত) সেইরূপ।……

বেদসমূহ কোন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়, দেবতামণ্ডলীর সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় তারা বিদ্যমান। ভগবান্ অনন্ত, জ্ঞানও অনন্ত এবং সেই অনন্ত জ্ঞান-সহায়েই জগতের সৃষ্টি হয়েছে। ঐ গ্রন্থেই জগতের সবকিছু বিধৃত, তার বাইরে কিছু নেই। মানুষের যতকিছু নীতিজ্ঞান, ভালমন্দ বিচার—সবই ঐ গ্রন্থের অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ ঐশ্বরিক জ্ঞানের উর্ধ্বে মানুষ উঠতে পারে না।—ভারতীয় গোঁড়ামির এই হ'ল মূলকথা।

বেদের শেষাংশ উচ্চতম আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। আর প্রথমাংশ অপেক্ষাকৃত স্থূল।

বেদগ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেই 'এটি ভাল নয়, ওটি ভাল নয়'—এরূপ মন্তব্য আপনারা ক'রে থাকেন। কিন্তু কেন? 'বহু অনভিপ্রেত এবং মন্দ অনুশাসন এর মধ্যে নিহিত আছে'।—এইজন্য? তা হয়তো আছে। কিন্তু ওল্ড টেস্টামেণ্টেও তো এ-জাতীয় ব্যাপার আছে। প্রাচীন গ্রন্থমাত্রেই এমন বহু বিচিত্র মত, বহু উদ্ভট চিন্তার উল্লেখ আছে, যা আজকের দিনে আমরা পছন্দ ক'রব না।

'এ মতবাদটি ভাল নয়', 'আমার নীতিবোধে এটি বাধে।'—

এ-জাতীয় উক্তির 'কারণ' সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করলে, অথবা কেন আপনার নীতিতে বাধে—এ-কথা জিজ্ঞাসা করলে, উত্তর আসে,—'না, এর মধ্যে কোন প্রশ্ন বা যুক্তির অবকাশ নেই।'…এই যদি অবস্থা হয় তবে স্তব্ধ হও, দূরে সরে থাকো।…

বেদের যে নির্দেশ, সেটি পালন করাই বিধি। বেদ-নির্দিষ্ট ভালো-মন্দই শেষ কথা। সে-বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা মানুষের অধিকার-বহির্ভূত।

এখন বিপদ তো এইখানেই। বেদ-বিরোধী কোন উক্তির সমর্থনে কোন হিন্দুকে যদি কেউ বলে যে—'আমাদের বাইবেলে তো এ-কথা নেই।' তবে তন্মুহূর্তে উত্তর হবে—'ওঃ, তোমাদের বাইবেল? ও তো সেদিনের একটি অতি-আধুনিক ইতিহাস। বেদ ভিন্ন আবার শাস্ত্র কোথায়? গ্রন্থ কোথায়?'

ভগবান্ই সর্বজ্ঞানের আকর। কাজেই পুনঃ পুনঃ একাধিক বাইবেলের মাধ্যমে তিনি শিক্ষা দেবেন, এটা সম্ভব নয়। বেদগ্রন্থের মধ্য দিয়েই তাঁর শিক্ষার প্রথম প্রকাশ। সে কি তবে

ভুল? মিথ্যা? উত্তরকালে উচ্চতর কোন শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন বেদ বা বাইবেল তিনি সৃষ্টি করেছিলেন—এমন ঘটনা কি সম্ভব?

'বেদগ্রন্থের মতো প্রাচীন গ্রন্থ আর নেই। অন্য সকল গ্রন্থই বেদের অনুগামী, বেদের অনুকরণে রচিত।' আপনাদের কথা তাঁরা গ্রহণ করবেন না। আবার খ্রীষ্টানগণও বাইবেল গ্রন্থটি দেখিয়ে বলবেন, ও-সকল উক্তি প্রতারণামাত্র। ভগবানের উক্তি অভ্রান্ত এবং তা একবার মাত্রই উচ্চারিত হয়ে থাকে।

এখন এ-সবই বিশেষভাবে চিন্তা করবার বিষয়। গোঁড়ামি অবশ্যই অতি বিষমবস্তু।......

যদি কোন হিন্দুকে কোন সমাজিক সংস্কার-বিষয়ে আপনারা অনুরোধ করেন, যদি বলেন, 'এরূপ করা সঙ্গত' অথবা, 'এরূপ করা সঙ্গত নয়,' তবে উত্তরে সে বলবে, 'এ-সব কি আমাদের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নির্দিষ্ট হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তবে ও-সবের জন্য আমাদের মাথাব্যথা নেই। কোন পরিবর্তন করবার পক্ষপাতী আমরা নই।' কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করলেই দেখতে পাবে যে, আমাদের ব্যবস্থাই কল্যাণপ্রদ।......

যদি বলা হয়,...'তোমাদের সমাজপ্রতিষ্ঠানগুলি উৎকৃষ্ট নয়।' তবে সঙ্গে সঙ্গে তারও উত্তর আসবে—'বটে! তুমি সে-কথা জানলে কিভাবে? তোমার অভিমতের ভিত্তিটি কি? আমাদের বিশ্বাস, আমাদের সমাজ-সংস্থাসমূহ তোমাদের সমাজ-ব্যবস্থার তুলনায় উন্নততর। অপেক্ষা করলে চার-পাঁচ শত বৎসরের মধ্যেই দেখতে পাবে যে, কালকে অতিক্রম ক'রে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আর তোমাদের মৃত্যু ঘটেছে।'...এ-ধরনের কথাই তারা বলবে।

এই হচ্ছে উৎকট গোঁড়ামি আর ভগবানের আশীর্বাদে সে মহাসঙ্কট সমুদ্র আমি অতিক্রম করেছি।

এই গোঁড়ামি ভারতবর্ষে ছিল। কিন্তু গোঁড়ামি ভিন্ন আর কি ছিল? ছিল—বিচ্ছিন্নভাব ও বিভাগ। সমগ্র সমাজটিই—আজকের মতো বহু জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। আর সে-সব বিভাগ আজকের তুলনায় কঠোরতর ছিল।

আরও একটি ব্যাপার আছে লক্ষ্য করবার মতো। অধুনা নূতন নূতন জাতিগোষ্ঠী সৃষ্টি করবার দিকে একটি প্রবণতা পাশ্চাত্যেও এসেছে।

আমি নিজে অবশ্য জাতির বাইরে। জাতিগত বন্ধন ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি না। সে বন্ধন আমি ছিন্ন করেছি। জাতির ভালো দিকও অবশ্য কিছু আছে, কিন্তু ভগবান্ করুন—আমি যেন জাতিবন্ধনে আবদ্ধ না হই। জাতি-গোষ্ঠী শব্দে আমি কোন্ বস্তুটি বোঝাতে চাই তা হয়তো আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন। কারণ মনুষ্যসমাজ অতি দ্রুত একে গ্রহণ ক'রে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে বৃত্তির উপরই জাতি নির্ভরশীল। প্রাচীনযুগে হিন্দুদের জীবনলক্ষ্য ছিল সুখ-শান্তিপূর্ণ সাবলীল এক জীবনধারা। কি উপায়ে জীবনের সবকিছু প্রাণময় হয়ে উঠতে পারে—এই প্রশ্ন। আর তার উত্তর—প্রতিযোগিতা। কিন্তু বংশগত বৃত্তি প্রতিযোগিতা নষ্ট ক'রে দেয়। তুমি কাষ্ঠশিল্পী? সূত্রধর? উত্তম। তোমার পুত্র সূত্রধর হবে।

তুমি? তুমি কর্মকার? কর্মকার-বৃত্তি তো একটি জাতিগত বৃত্তি—অতএব তোমার পুত্রও

কর্মকার হবে। ভারতবর্ষে এক বৃত্তির মধ্যে অন্য বৃত্তির কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কাজেই নিরুপদ্রবে একটি বৃত্তি নিয়েই মানুষ জীবনধারণ করে।

তুমি যুদ্ধব্যবসায়ী, যোদ্ধা? অথবা তুমি পুরোহিত? উত্তম। তোমার বৃত্তির ভিত্তিতে একটি জাতি গড়ে তোল। পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক। অন্যান্য বৃত্তিও তাই। আবার নিরঙ্কুশ উচ্চক্ষমতা বা উচ্চাধিকারের কথা যদি চিন্তা করা যায়, তবে দেখা যাবে যে, তারও একটি বিশেষ দিক আছে। সে দিকটি হচ্ছে এই যে, কোন প্রতিযোগিতা সে বরদাস্ত করে না। তবে এরই ফলে এই জাতি-বিভাগের পরিণতিতেই—ভারতবর্ষ মহাকালের প্রভাব অতিক্রম ক'রে বেঁচে রইল, আর অন্যান্য বহুজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু অন্যভাবে এর একটি মন্দদিকও আছে। এতে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ব্যাহত।

সূত্রধরের পুত্রকে কাঠের কাজই করতে হবে—তা সে পছন্দ করুক, আর নাই করুক। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই এ ব্যবস্থা ভারতীয় শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ ছিল এবং সেই প্রাক্-বৌদ্ধযুগের কথাই আমি এখন বলছি।

আধুনিক যুগের সমাজতন্ত্রবাদ এরই অনুকৃতি। এরও ফল হয়তো পরিণামে ভালই হবে, কিন্তু ক্ষতচিহ্ন একটা থেকে যাবে বৈকি? আমার মতে স্বাধীনতাই মূলকথা।...মুক্ত হও। দেহে মনে ও আত্মায় পূর্ণ মুক্তি, পূর্ণ বন্ধনহীনতা—এই আমার আজীবন কামনা। ব্যক্তিগত-ভাবে আমি স্বাধীনতার সঙ্গে কোন মন্দ কাজ করতেও রাজী আছি, কিন্তু পরাধীনভাবে কোন সৎকাজ করতেও রাজী নই।

যাই হোক, বর্তমানে যে-সব বস্তুর জন্য পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা চীৎকার করছে—ভারতের অসংখ্য নরনারী বহু যুগ পূর্বেই তার অনুশীলন করেছে। ভূমি জাতীয় সম্পদে রূপান্তরিত হয়েছে। দৃঢ়বদ্ধ জাতিবিভাগও ভারতবর্ষে ধিকৃত ছিল। ভারতের মানুষ মনে-প্রাণে সমাজতন্ত্রবাদী। কিন্তু এরও ঊর্ধ্বে আর একটি সম্পদ্ ছিল ভারতবর্ষে; সে সম্পদ্ ব্যক্তিত্বের। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিধি-নিষেধ আরোপের পরও তারা প্রচণ্ডভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিল। সব কিছুর জন্যই অবশ্য তারা নীতি-নিয়ম প্রণয়ন করেছে। পান, আহার, নিদ্রা, মৃত্যু—সবই সেখানে নিয়মে বিধৃত। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করবার মুহূর্ত থেকে রাত্রিতে নিদ্রিত হবার কাল পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি কর্ম শাস্ত্রীয় বিধানে নিয়মিত। নিয়ম, নিয়ম, নিয়ম! এ-কথা কি চিন্তা করা যায় যে, একটা জাতি এমনি নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে? আইন তো প্রাণহীন। যে দেশে আইন যত বেশী, সে দেশের অবস্থা তত মন্দ! সেজন্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ-কামনায় আমরা পাহাড়ে যাই, পর্বতে আত্মগোপন করি—যেখানে কোন আইন নেই, কোন সরকার নেই। যেখানে যত আইন, সেখানে তত পুলিস—তত দুর্জনের প্রাধান্য। আর দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে এই বিধিনিয়মের কড়াকড়ি প্রচণ্ড। যে মুহূর্তে একটি শিশুর জন্ম হ'ল, সেই মুহূর্তে সে প্রথমে বর্ণের দাস হ'ল, তারপর হ'ল জাতির। দাসত্বশৃঙ্খলে সে যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে গেল। তার প্রত্যেকটি কাজ, তার আহার-বিহার, ওঠা-বসা—সবই নিয়ন্ত্রিত হবে আইনে, নিয়মে।

আহারকালে গ্রাসে গ্রাসে তাকে প্রার্থনা করতে হবে, জলপান করতেও তাই। দিনের পর দিন—জীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্বক্ষণ ও সর্বমুহূর্তে এমনি নিয়মাধীন হয়েই তাকে

থাকতে হবে। ভাবতেও আশ্চর্য বোধ হয়। অব্যাহত এই প্রণালী অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে।

কিন্তু তাঁরা চিন্তাশীল লোক ছিলেন—সন্দেহ নাই। তাঁরা জানতেন যে, এমন নিয়মাধীনতায় প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ হয় না, সেজন্য যথার্থ মুক্তিলাভের একটি ঋজুপথও তাঁরা উন্মুক্ত রেখেছিলেন। মোটের উপর বিধান এই ছিল যে, শুধু জাগতিক ক্ষেত্রে এবং সাংসারিক জীবনেই নিয়মাদি প্রযুক্ত হবে; কিন্তু যে-মুহূর্তে কেউ কাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করবে, জাগতিক সুখ বিসর্জন দেবে, তন্মুহূর্তে সে পূর্ণভাবে স্বাধীন হয়ে যাবে। কোন বিধিনিষেধ আর তার উপর প্রযুক্ত হবে না। এদের নাম সন্ন্যাসী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তারা অতীতে কিংবা বর্তমানে—কোন কালেই কোন সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তারা এক অনাসক্ত ও মুক্ত মানবগোষ্ঠী—পুরুষ ও নারী উভয়ই তাদের মধ্যে আছেন। তাঁরা কখনও বিবাহ করেন না, বিত্ত আহরণ করেন না। তাঁরা কোন নিয়মের অধীন নন, এমন কি বেদবিধি মেনে চলতেও তাঁরা বাধ্য নন। বেদশীর্ষে তাঁদের স্থান। আমাদের সমাজ-সংস্থার ঠিক বিপরীত বিন্দুতে যেন তাঁরা দণ্ডায়মান। জাতিগত বিধিনিষেধে তাঁরা আবদ্ধ থকেন না। তাঁদের নিয়মিত করবার মতো কোন শক্তিই বিধিনিষেধের নেই। তাদের সীমিত গণ্ডিকে অতিক্রম করেই সন্ন্যাসীর জীবন। শুধু দুইটি নিয়ম তাঁদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। তাঁরা চিরনিঃসম্বল থাকবেন, চিরকুমার থাকবেন। অর্থ তাঁদের থাকবে না, বিবাহ তাঁরা করবেন না। এই অবস্থায় সমাজের কোন নিয়ম বা অনুশাসন তাঁদের উপর প্রযুক্ত হবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁরা বিবাহ করবেন অথবা অর্থোপার্জন করবেন—সেই মুহূর্তে সমাজের প্রত্যেকটি নিয়ম তাঁদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে, অবশ্যপালনীয় হবে। এই সন্ন্যাসীরাই ছিলেন জাতির জীবন্ত দেবতা এবং এঁদের মধ্য থেকেই শতকরা নিরানব্বই জন মহাপুরুষ উদ্ভূত হয়েছিলেন।

যে-কোন দেশেই হোক, আত্মার পূর্ণ মহিমার উপলব্ধি ব্যক্তিত্বের চরমোৎকর্ষের উপর নির্ভর করে এবং সে উৎকর্ষ সমাজ-বন্ধনের মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্ব সমাজ-বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সেই বন্ধনকে সে ছিন্ন ক'রে ফেলতে চায়। যদি কোন সমাজ বাধাস্বরূপ হয়, তবে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে সে নিজেকে বিকশিত করতে চেষ্টা করে।

এই দুই বিপরীত শক্তির মাঝখানেই একটি সহজ পন্থা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, যদি তুমি সমাজের বাইরে গিয়ে দাঁড়াও, যদি সংসার ত্যাগ কর, তবে তুমি যদৃচ্ছা প্রচার করতে পারো, শিক্ষা দিতে পারো। দূর থেকে আমরা শুধু তোমাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রব।

ফলে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নর ও নারীর উদ্ভব তখন সম্ভব হয়েছিল এবং তাঁরাই সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। এমন-কি সেই মুণ্ডিত-মস্তক গৈরিকভূষণ সন্ন্যাসী উপস্থিত হ'লে রাজাও নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকতে সাহসী হতেন না। তাঁকে আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়াতে হ'ত। এ যেমন একদিক, অন্যদিকে হয়তো আধঘণ্টার মধ্যেই সেই সন্ন্যাসী এক অতি দরিদ্রের জীর্ণ কুটিরের সম্মুখে গিয়ে ভিক্ষার্থী হয়ে দণ্ডায়মান হতেন এবং এক-টুকরা রুটি ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ ক'রে প্রস্থান করতেন।

সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গেই তাঁদের মেলামেশা ছিল। আজ হয়তো এক দরিদ্রের পর্ণকুটিরে সন্ন্যাসীর রাত্রিযাপন, আবার পরদিন রাজপ্রাসাদের মনোরম শয্যায় তাঁর সুখনিদ্রা। একদিন রাজগৃহে স্বর্ণপাত্রে তাঁর ভোজন। অন্যদিন সম্পূর্ণ অনাহারে এবং বৃক্ষতলে দিনযাপন।

এই ছিল সন্ন্যাসীর জীবন। সমাজ এঁদের অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত। কখন কখন নিজের ব্যক্তিত্ব প্রচার করতে গিয়ে কোন সন্ন্যাসী হয়তো উৎকট ধরনের কিছু করেও ব'সত। কিন্তু বৃহত্তর সমাজ তাতে ক্ষুব্ধ হ'ত না, কিছু মনেই ক'রত না। সে শুধু দেখতে চাইত—সন্ন্যাসীর মূল দুটি ধর্ম—পবিত্রতা ও ত্যাগব্রত অব্যাহত রয়েছে কি না।

তাঁদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত প্রবল ছিল ব'লে তাঁরা নূতন চিন্তা এবং তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। নূতন দেশে তাঁরা যেতেন। পুরাতনের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে নূতনের সন্ধান তাঁদের করতেই হ'ত। নিয়মাবদ্ধ সমাজে সকলে চাইত পুরাতন গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে—একই ধরনে চিন্তা করতে। কিন্তু মানুষের নিগূঢ় প্রকৃতি এ ধরনের সংস্কারবদ্ধতা বরদাস্ত করে না। নির্বুদ্ধিতার চেয়ে মানুষের সদ্বুদ্ধি অধিক শক্তিশালী। দুর্বলতার চেয়ে সবলতাই অধিক ক্রিয়াশীল; অসদ্বস্তু থেকে সদ্বস্তু সবলতর। সেই হেতু গণ্ডিবদ্ধ মানুষের একঘেয়েমি বজায় রাখবার চেষ্টা সফল হয়নি। যদি হ'ত, যদি তারা সকল মানুষকে একই ধরনের চিন্তাধারায় গ্রথিত করতে সমর্থ হ'ত, তবে আমরা জড়ত্ব প্রাপ্ত হতাম। চিন্তাজগতে আমাদের মৃত্যু হ'ত।

বস্তুতঃ এখানে এমন একটি সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, যার কোন জীবনীশক্তি ছিল না, যার সদস্যগণ নিয়মের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। পরস্পরকে সাহায্য করতে তারা বাধ্য ছিল। নিয়ম-বন্ধন এত কঠোর এবং নির্মম ছিল যে, কোন কাজই নিয়ম-বহির্ভূত হবার উপায় ছিল না। কিভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে হবে, কিভাবে হাত-মুখ প্রক্ষালিত হবে, এক কথায়, জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি—সবই নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল।

আর, এ-সব গণ্ডিবদ্ধতার বাইরে ছিল সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ব্যক্তিস্বাধীনতা। আর সেই শক্তিশালী সন্ন্যাসীদের মধ্য থেকেই নিত্যনূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হচ্ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এঁদের স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লিখিত হয়েছে। একটি নারীর এরূপ কাহিনী আছে, তিনি বয়স্কা ছিলেন। তাঁর ধরন-ধারণ একটু অস্বাভাবিক রকমের ছিল। কিন্তু নিত্যনূতন চিন্তার অবতারণা তিনি করতে পারতেন। তাঁকে অবশ্য অনেকে অনেক সময় সমালোচনা ক'রত। আবার তাঁকে সমীহও ক'রত, নীরবে তাঁর নির্দেশ পালনও ক'রত। এ-ধরনের নরনারী প্রাচীনযুগে একাধিক ছিলেন।

আবার সেই নিয়মবদ্ধ সমাজে ক্ষমতা ছিল পুরোহিত-শ্রেণীর হস্তে। সমাজের স্তরবিন্যাসে—বর্ণশ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁদের মধ্য থেকেই পুরোহিত হতেন এবং তাঁদের যে কাজ ছিল—তাতে 'পুরোহিত' শব্দ ভিন্ন অন্যশব্দে তাঁদের অভিহিত করা যায় বলেও আমার মনে হয় না। অবশ্য এদেশে যে-অর্থে 'পুরোহিত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, আমাদের দেশে সে অর্থে ব্যবহৃত হ'ত না। পুরোহিতগণ ধর্ম বা দর্শন শিক্ষা দিতেন না। সমাজে নির্দিষ্ট বিধিবিধানসমূহ যথাযথ পালিত হচ্ছে কি না, সেটি দেখা এবং সে-বিষয়ে সাহায্য করাই তাঁদের কাজ ছিল। বিবাহ দেওয়া, শ্রাদ্ধ-শান্তিতে উপাসনা করাও তাঁদের কাজ ছিল। ফলকথা, সমাজের ক্রিয়াকর্মে, উৎসবানুষ্ঠানে পুরোহিতের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। সমাজ-ব্যবস্থায় গার্হস্থ্য ছিল শ্রেষ্ঠ আশ্রম। প্রত্যেককেই বিবাহ করতে হবে—এই ছিল অনুশাসন। বিবাহ ভিন্ন কোন ধর্মানুষ্ঠানে অধিকার জন্মাত না।

অবিবাহিত পুরুষ বা নারী পূর্ণ মানুষ ব'লে বিবেচিতই হ'ত না। অবিবাহিত পুরোহিতেরও ক্রিয়াকর্মে অধিকার থাকত না। অবিবাহিত ব্যক্তি সমাজে বেমানান বলেই বিবেচিত হ'ত।

এ-কালে পুরোহিতের ক্ষমতা খুব বেড়েছিল। যাঁরা সমাজপতি, আইন-প্রণয়ন যাঁদের কাজ, তাঁদের নীতিই এমন ছিল, যাতে পুরোহিতগণ সমাজে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। এদেশেরই মতো একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাদের মধ্যেও ছিল, যার প্রভাবে পুরোহিতবর্গের হাতে অধিক অর্থ যেতে পারত না। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পুরোহিতদের সামাজিক মর্যাদাই বড় হোক, আর্থিক মর্যাদা নয়।

এ-কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, পুরোহিতগণ সব দেশেই মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকেন। ভারতবর্ষে আবার সে মর্যাদা এত বেশী ছিল যে, অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণও আজন্ম সামাজিক মর্যাদায় রাজা অপেক্ষা উন্নত। সমাজব্যবস্থা তাঁকে চিরদারিদ্র্যে নিষ্পেষিত করবে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁকে সম্মান দেবে প্রচুর। তাঁদের জন্য বাধানিষেধ ছিল সহস্র ধরনের। আবার যার বর্ণ যত উচ্চ, তার ভোগ-সুখের পথে বিধিনিষেধ ছিল তত কঠিন। তাছাড়া, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের আহারাদির উপরও প্রচুর নিয়ম-বিধি আরোপিত ছিল। বর্ণ যত উন্নত হবে, আহারাদির ব্যবস্থা তত কঠোর হবে এবং আহার্য-বস্তুনিচয়ের সংখ্যা তত সীমাবদ্ধ হবে। জীবন-ধারণের জন্য যে-সকল বৃত্তি তাঁরা অবলম্বন করতে পারবেন, সেগুলিও অতি অল্প কয়েকটি বৃত্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। এই ছিল ব্যবস্থা। আপনাদের কাছে তাঁদের জীবন একটি অন্তহীন কঠোরতার নিদর্শন ব'লে মনে হবে। আহারে, বিহারে, পানে, গ্রহণে—সর্বক্ষেত্রেই অফুরন্ত বিধিনিষেধ।

আবার সে-সব বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলে যে-সকল শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, তাও নিম্নতর বর্ণের থেকে ব্রাহ্মণের পক্ষে বহুগুণ নির্মম ছিল। একজন নিম্ন বর্ণের লোকের জন্য মিথ্যাভাষণের দণ্ড যদি হ'ত এক টাকা, তবে ব্রাহ্মণের পক্ষে—তাঁর উচ্চতর জ্ঞানের জন্য দণ্ড হ'ত শতগুণ।

প্রারম্ভিক অবস্থায় অবশ্য ব্যবস্থাটি অতি সুন্দর ছিল। কিন্তু উত্তরকালে এমন একটি সময় উপস্থিত হ'ল, যখন এই পুরোহিত-সম্প্রদায় প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হলেন এবং তখনই তাঁরা এই মূল কথাটি বিস্মৃত হলেন যে, তাঁদের ক্ষমতার রহস্য দারিদ্র্যের মধ্যে নিহিত; বিস্মৃত হলেন যে, তাঁরা এমন একটি মানবগোষ্ঠী, যাঁরা গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন, চিন্তা করবেন—এবং সে সুযোগ দানের জন্যই সমাজ তাঁদের আহার, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির যাবতীয় দায়িত্ব বহন করবে। কিন্তু কালক্রমে তাঁদের ভোগ-পিপাসা জাগ্রত হ'ল এবং অর্থলাভের জন্যও তাঁরা হাত বাড়াতে লাগলেন। আপনাদের পরিভাষায় যাদের 'অর্থগৃধ্নু' 'money-grabbers' বলে—তাঁরা তাই হয়ে উঠলেন এবং অন্য সব কিছু বিস্মৃত হলেন।

ব্রাহ্মণের পর দ্বিতীয় জাতি হ'ল ক্ষত্রিয়। যুদ্ধ এবং রাজ্যশাসন—এই ছিল তাঁদের কাজ। প্রকৃত ক্ষমতা এঁদেরই হস্তে ন্যস্ত ছিল। আর তাঁদের মধ্য থেকেই আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উদ্ভব হয়েছে, ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকে নয়। সেও এক বিচিত্র ব্যাপার। অবতারপুরুষ ব'লে আমাদের সমাজে যাঁরা পূজিত, তাঁদের সকলেই ক্ষাত্রকুলোদ্ভব, একটিও ব্যতিক্রম নেই। মহামনীষী শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ঐ ক্ষত্রিয়কুল থেকে। রামচন্দ্রও ক্ষাত্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের দেশের খ্যাতনামা দার্শনিকগণ প্রথমে রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন এবং রাজসিংহাসন থেকেই ত্যাগব্রত দার্শনিকদের উদ্ভব হয়েছে। আবার ঐ রাজসিংহাসন থেকেই নিয়ত এ-আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে—'ত্যাগ কর, ত্যাগ কর'।

যুদ্ধব্যবসায়ীরা দেশের শাসনকর্তা, তাঁরাই দার্শনিক, তাঁরাই উপনিষদের প্রবক্তা। চিন্তায়, ধীশক্তিতে পুরোহিতবর্গ অপেক্ষা এঁরা উন্নত ছিলেন। ক্ষমতাও এঁদেরই অধিক ছিল, কারণ এঁরাই ছিলেন রাজা। অথচ আধিপত্য করতেন পুরোহিতগণ এবং ভীতিপ্রদর্শনের চেষ্টাও তাঁরা করতেন। ফলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়—এই দুই বর্ণের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল।

আরও একটি ব্যাপার আছে। আপনাদের মধ্যে যাঁরা আমার প্রথম ভাষণটিতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষে দুইটি বৃহৎ মানবগোষ্ঠী বিদ্যমান—একটি আর্য, অপরটি অনার্য। আর্যদের মধ্যে আবার তিনটি বর্ণ আছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। এই তিন বর্ণের বাহিরে যে জনসমষ্টি, সেটি সমগ্রভাবে 'শূদ্র' নামে অভিহিত, আর্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তই তারা নয়। বহু বিদেশী পর্যটক বাহির থেকে এসে এই শূদ্রদেরই দেখেছে। তারাই ছিল দেশের আদিবাসী। যাই হোক, কালক্রমে অনার্য গোষ্ঠীর বিপুল জনসমষ্টি এবং আরও যারা নানাজাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়ে অনার্য জাতির দেহে মিশে গেল, তারা সবাই ক্রমশঃ সভ্য হয়ে উঠতে লাগল এবং আর্যদের অনুরূপ অধিকার-লাভের জন্য প্রয়াসী হ'ল।

তারা শিক্ষালাভের জন্য আর্যদেরই মতো বিদ্যায়তনে প্রবেশ করতে চাইল; উপবীত ধারণ করতে চাইল; ক্রিয়া, কর্ম ও উৎসবের অধিকার চাইল। ধর্ম এবং রাজনীতিতেও সমান অধিকার দাবি ক'রল।

অবশ্য পুরোহিতগণ স্বভাবতই এ দাবির বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করলেন। পৃথিবীর সর্বদেশেই পুরোহিতবর্গের এই রীতি। তাঁরা স্বতই অত্যন্ত গোঁড়া হয়ে থাকেন। আর যতদিন পৌরোহিত্য একটি বৃত্তি থাকবে, ততদিন এ গোঁড়ামি থাকবেই। কারণ তাদের নিজ স্বার্থের খাতিরেই এ গোঁড়ামির প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং অনার্য গোষ্ঠীর সে দাবি এবং বিক্ষোভ দমন করবার জন্য পুরোহিতগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। আবার আর্যগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রবল ধর্ম-বিক্ষোভ দেখা দিল এবং সে বিক্ষোভ পরিচালনা করলেন ঐ ক্ষত্রিয়গণ।

আরও এক সনাতনপন্থী সম্প্রদায় ছিল ভারতবর্ষে - সে জৈন সম্প্রদায়। সে সম্প্রদায় অত্যন্ত গোঁড়াও বটে, প্রাচীনও বটে। হিন্দুশাস্ত্র বেদের প্রামাণিকতাই এরা অস্বীকার করেছিল। তারা নিজেরা কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিল এবং এ কথাও ঘোষণা করেছিল যে, তাদের প্রণীত গ্রন্থাদিই যথার্থ বেদ। আর যেগুলি বেদ-নামে প্রচলিত—সেগুলি সর্বসাধারণকে প্রতারিত করবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণরা রচনা করেছিল। অবশ্য তাদের কর্মপন্থাও ঐ একই ধরনের ছিল।

এ-কথা মনে রাখতে হবে যে - নিজ ধর্মগ্রন্থ বিষয়ে হিন্দুদের যে যুক্তি, সে-যুক্তি নিরসন করা সহজসাধ্য নয় এবং সেজন্য জৈনদের দাবিও হিন্দুদেরই অনুরূপ ছিল। অর্থাৎ তাদের ধর্ম-গ্রন্থের মাধ্যমেই সৃষ্টির প্রকাশ হয়েছে। আর সর্বসাধারণে প্রচলিত যে ভাষা, শাস্ত্রগ্রন্থগুলিও সেই ভাষাতেই রচিত।

তখনই সংস্কৃত আর কথ্যভাষা ছিল না। তার সঙ্গে তৎকালীন কথ্যভাষার সম্পর্ক অনেকটা সেই রকম হয়ে উঠেছিল, যেমন সম্পর্ক দেখা যায়—বর্তমান ইতালীয় ভাষার সঙ্গে প্রাচীন লাটিন ভাষার। জৈনধর্মাবলম্বিগণ পালিভাষায় নিজ শাস্ত্র-গ্রন্থাদি রচনা করেছিল, সংস্কৃত ভাষায় নয়। কারণ তারা ব'লত সংস্কৃত আর সজীব ভাষা নয়, ওটি মৃতভাষার পর্যায়ভুক্ত।

তাদের আচার-প্রণালীতেও তারা ছিল স্বতন্ত্র। [ক্রমশঃ]

আরব-যোগীর কথা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ভাঁটার বেলায় লিখেছিলাম
বালুচরে—দুঃখ ব্যথার
কান্না কাঁদাই সার এ-ধরণীতেঃ
জোয়ার এলে দেখি—
এঁকেছিলাম সবি মিথ্যে কথার
ঝাপসা ছবি অজ্ঞান-তুলিতে।

* *

পশুবলে অন্যকে স্ববশে
আনতে কি চাও? যাও, দেখ দর্পণে
তোমার নিজের মুখঃ দেখবে ছায়া
আত্মঘাতীর—রেখো বন্ধু মনে।

* *

যে-প্রাণ করে রূপের উপাসনা
সে সাধে যে-রূপসাধনা-যোগ,
পায় না সে তার দিশা—নয়ন যার
চায় শুধু রূপ করতে উপভোগ।

* *

জীবের মাঝে আপনাকে খণ্ড খণ্ড ক'রে
অখণ্ড শিব আসীন প্রতি জীবেরই অন্তরে।

* *

গড়ল মানুষ যন্ত্র, গেয়েঃ
'চালাই যন্ত্র-দাসে কেমন আমি!'
যন্ত্র পরে চালায় তাকে, গেয়েঃ
'দাসের দাস তুমি আজ, স্বামী!'

কর্মবেগেই বিশ্ব চলে ভাই,
কাজ করতে হবেই তোমায় তাই
ঋতুর আবর্তন দেখ না কেন?
জয়ধ্বনির সমারোহ যেন—
নর্তনে যার নেই এক পল যতি,
ছন্দে করে অনন্তে সে নতি!

যখনই কাজ করবে—কোরো ভাই
বাঁশির মতন। সুর বিনা সুখ নাই
প্রতিটি ফুঁ যেমনি কানে তার
কয় কথা—হয় সুরেলা ঝংকার।
কোন্ মূঢ় চায় হয়ে শরের বন
রইতে বোবা—বিশ্ব গায় যখন!

'কাজ অভিশাপ, দুর্ভোগ'—কে বলে?
যখন করো কাজ, তখনই ফলে
ধরার প্রাণের গভীর স্বপ্ন-ব্যথা
যে-বাজ বুনেছিল সে-সুব্রতা
জন্মদিনেই তোমার মনোমাঝে।

যেদিন তুমি করবে প্রতি কাজে
জপ তার সেই বাণী স্বপ্ন-ব্যথার—
সেদিন শুধু পাবে জীবন তোমার
প্রেমের দীক্ষা কর্মের আশীর্বাদে
প্রেমিক অন্তরের অমৃত-স্বাদে।
প্রেম বিরাজে অরূপ প্রাণের তলে,
কর্মে সেবায় রূপ হয়ে সে জ্বলে।

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিউক রিশল্যু

স্বামীজী পারী ধর্মেতিহাস-মহাসভায় গিয়া লেগেট-দম্পতির মনোরম ভবনে অতিথি হন। এই স্থানে লেগেট-দম্পতি বহু বিশিষ্ট লোককে নিমন্ত্রণ করিতেন, ফলে স্বামীজী ফরাসী দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ পান। অতিথিদের মধ্যে থাকিতেন কবি, দার্শনিক, অধ্যাপক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, গায়ক, অভিনেতা এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। এই সময় পাশ্চাত্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত স্বামীজীর ভাবধারা-প্রচারের ও ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ ঘটে। লেগেট-দম্পতির আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন ছিলেন ডিউক রিশল্যু। এই সময় তাঁহার বয়স বেশী নয়, পাশ্চাত্য মাপ-কাঠিতে যুবক বলা চলে। তিনি ফ্রান্সের প্রাচীন অভিজাত-বংশের লোক ছিলেন। ত্রয়োদশ লুই তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর সম্মানার্থে 'কার্ডিন্যাল্ রিশল্যু' এই উপাধি প্রচলন করেন। এবং ডিউকের এক পূর্বপুরুষ অষ্টাদশ লুই-এর শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ডিউক পারীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জেসুইট সম্প্রদায়ের এক স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়া প্রেভেন্স বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি লাভ করেন। ডিউক স্বামীজীর প্রতি খুবই অনুরক্ত হন এবং প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

পারী ত্যাগ করিবার পূর্বে স্বামীজী ডিউককে প্রশ্ন করেন, 'তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে সংসার ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছ কি?' এই ত্যাগের দ্বারা কি লাভ হইবে—ডিউক জানিতে চাহিলে স্বামীজী বলেন, 'আমি তোমাকে মৃত্যুকে ভালবাসতে শিক্ষা দেবো।' ইহার তাৎপর্য বুঝিতে চাহিলে স্বামীজী বলেন, 'মনের এমন অবস্থা ঘটবে যে, মৃত্যু যখন উপস্থিত হবে, তখন হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করতে পারবে' ডিউক কিন্তু সংসার-জীবন যাপন করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন; তবু সারা জীবন তিনি স্বামীজীকে শ্রদ্ধা করিতেন।

প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া এই ডিউক হঠাৎ এক সময় ইওরোপেই এক গেরুয়া-পরিহিত ভারতীয়কে জাহাজে দেখিয়া তাঁহার নিকট স্বামীজীর কথা উত্থাপন করেন। যখন তিনি জানিতে পারেন, এই ভারতীয় স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনেরই সন্ন্যাসী, তখন তিনি বলেন, 'সে-সময় যৌবনের রঙিন নেশায় ও পার্থিব ভোগবিলাসের মোহে বুঝিনি, স্বামীজী আমাকে কি অমূল্য জিনিস দিতে চেয়েছিলেন। আজ জীবনের অপরাহ্ণে বুঝছি—হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার ক্ষমতার তুলনায় সকল পার্থিব সুখভোগ অতি তুচ্ছ। আজ খুঁজে বেড়াচ্ছি—কে দিতে পারে সেই শক্তি, সেই মনোবল! আপনি ভারতীয় সন্ন্যাসী, জানলাম—তাঁরই সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, পারেন আপনি আমাকে দিতে সেই অমূল্য রত্নভাণ্ডারের সন্ধান?'

সন্ন্যাসী বলেন, 'দেখুন ডিউক, স্বামীজী একজনই। এরূপ মহাপুরুষ বহু শতাব্দী পরে হয়তো জন্মান। আমিও ঐ অমৃতত্বের সন্ধানে আছি। আমার সেই শক্তি কই, যাতে আপনার মনের গতি ফিরিয়ে দিয়ে মৃত্যুকে ভালবাসতে শেখাব।'

ডিউক বলেন, 'কি অমূল্য রত্নই আমি হেলায় হারিয়েছি, আজ সেই অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছি!'

শ্রীমতী সরলা ঘোষাল

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা ঘোষাল (১৮৭২-১৯৪৫) পরবর্তী জীবনে সরলাদেবী চৌধুরানী নামেই পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জানকীনাথ ঘোষাল। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা দেবী। তিনি নানারূপ জনহিতকর কার্যে এবং বিশেষতঃ বাঙালী তরুণদিগের শরীরচর্চায় খুবই উৎসাহী ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনেও কিছু প্রচারের কাজ করেন।

স্বামীজীর সময়ে বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে নারী-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে, এমন মহিলা দুর্লভ ছিল। সরলা দেবী একাধারে শিক্ষিতা এবং উচ্চবংশসম্ভূতা বলিয়া নারীশিক্ষা ও বেদান্তপ্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলে ভাল কাজ হইবে, এইরূপ ধারণা স্বামীজীর মনে এক সময়ে উদিত হয়। কিন্তু সরলা দেবী নারীশিক্ষার কাজে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিলেও সেবাব্রতীরূপে এই ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিনী হইয়া আসেন নাই। পরে স্বামীজী এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন: এদেশে নারীশিক্ষার মহান্ ব্রত গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সেবিকার অভাব, সেইজন্য আজ কয়েকটি বিদেশী নারীর প্রয়োজন।

সরলা দেবী বেলুড় মঠে স্বামীজীর সহিত দেখা করেন। সেই সময় ভগিনী নিবেদিতাকেও সেখানে দেখেন ও তাঁহার সহিত পরিচিতা হন। 'ঝরাপাতা'য় (আত্মচরিত) তিনি স্বামীজীর কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৮৯৭ খৃঃ ৬ই এপ্রিল স্বামীজী দার্জিলিং হইতে এক পত্রে লিখেন—ভারতের সকল লোকের বাহবা অপেক্ষা সরলা দেবীর ন্যায় একজন শিক্ষিতা মহিলার প্রশংসা অনেক মূল্যবান্। ঐ বৎসর ২৪শে এপ্রিল একই স্থান হইতে লিখিত পত্রে স্বামীজী সরলা দেবীকে ভারতীয় নারীশিক্ষার কাজে ব্রতী হইতে উৎসাহ দেন এবং কার্যপদ্ধতির এক পরিকল্পনাও লিখিয়া পাঠান।

১৮৯৯ খৃঃ ১৬ই এপ্রিল বেলুড় মঠ হইতে স্বামীজী সরলা দেবীকে যে-পত্র লিখেন, তাহাতে দেখা যায় তথাকথিত স্বদেশপ্রেম ও সমাজসেবা এবং ঐরূপ কাজ করেন বলিয়া যাঁহারা দাবি করেন, স্বামীজী তাহাদের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

১৮৯৭ খৃঃ ২৯শে জুলাই আলমোড়া হইতে ভগিনী নিবেদিতাকে যে পত্র লিখেন, তাহাতেও ঐরূপ অভিমতই স্পষ্ট প্রতীত হয়। তিনি লিখিয়াছিলেন, 'ভারতের মহৎ কাজের জন্য আজ পুরুষ নয়, নারীই প্রয়োজন। একজন প্রকৃত সিংহিনী ভারতীয়দের জন্য বিশেষতঃ ভারতীয় নারীদের জন্য কাজ করিবে। ভারত এখন সেরূপ নারীর জন্ম দান করিতে পারিতেছে না, সুতরাং তাহাকে অন্য জাতির নিকট ঐরূপ নারী ধার করিতে হইবে।'

তীর্থরাম গোস্বামী

বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ উত্তর ভারত-সফরে বাহির হন, তীর্থরাম গোস্বামী তখন লাহোরে একটি কলেজে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। লাহোর কলেজের ছাত্রদের উদ্যোগে জনসাধারণের নিকট স্বামীজীর বক্তৃতা করিবার ব্যবস্থা তীর্থরামের পরিচালনাতেই অনুষ্ঠিত হয়। তীর্থরাম স্বামীজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।

স্বামীজী এবং গুডউইন সহ তাঁহার শিষ্যবর্গকে তীর্থরাম নিজ গৃহে মধ্যাহ্ন-ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন।

একদিন বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া তীর্থরাম বলেন, 'যিনি আপন ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া সকল ব্যক্তির আত্মায় বাস করেন, তিনিই প্রকৃত মহাত্মা।' স্বামীজী সে-সময় কয়েকজন যুবক ও শিষ্যসহ তীর্থরামের সঙ্গে ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। ইহা শুনিয়া স্বামীজী বলেন, 'আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ঐরূপ ছিলেন।'

স্বামীজী ও তীর্থরামের মধ্যে খুব সৌহার্দ্য গড়িয়া উঠে। তীর্থরাম স্বামীজীকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন। স্বামীজী উহা খুব আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করেন এবং তীর্থ-রামের পকেটে উহা পুনরায় রাখিয়া দিয়া বলেন, 'বেশ বন্ধু, আমি ঘড়িটি এই পকেটেই ব্যবহার করিব।'

স্বামীজীর সহিত আলাপ-পরিচয়ের কিছু কাল পরে তীর্থরাম সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং 'স্বামী রামতীর্থ' নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ভারতে এবং আমেরিকায় তিনি সাফল্যের সহিত বেদান্ত প্রচার করেন। বহু লোক তাঁহার অনুগত হয়।

আইডা আনসেল

১৯০০ খৃঃ স্বামীজী যখন ফেব্রুআরি মাসের প্রথম ভাগে রেভারেণ্ড মিলস্-এর আমন্ত্রণে ওকল্যাণ্ড 'ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চে' কয়েকটি বক্তৃতা দিতে যান, তখন আইডা আনসেল তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

আইডা বিদ্যালয়ে থাকিতেই সাংকেতিক লিপি শিক্ষা করেন। পরে উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বৎসরে স্নায়বিক গোলযোগের জন্য লেখাপড়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এই সময় মিস লিডিয়া বেল ক্যালিফর্নিয়া স্ট্রীটের 'হোম অব ট্রুথে'র নেত্রী ছিলেন। ডাক্তারের উপদেশে পাঠ ত্যাগ করিয়া আইডা মিস বেলের সহকারীর কার্য গ্রহণ করেন। আইডা মিস বেলের সঙ্গে থাকিয়া সকালবেলার ক্লাসের এবং রবিবারের বক্তৃতার বিবরণী লিখিতেন। এই স্থানে সকালের ক্লাসে স্বামীজীর রাজযোগও পড়া হইত। আইডা বাজনাও শিক্ষা দিতেন। নিজের ভবিষ্যৎ উপকারের জন্য আইডা স্বামীজীর কয়েকটি বক্তৃতার সাংকেতিক লিপি সংগ্রহ করেন, পরে এই লিপি হইতেই কিছু তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

স্মৃতিকথায় আইডা এই সময়ের ঘটনা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে সংক্ষেপে কিছু উদ্ধৃত করা হইল :

স্বামীজী জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ নূতন এক ধারণা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁহাকে এক উচ্চতর রাজ্যের জ্যোতির্ময় পুরুষ বলিয়া মনে হইত, তবু তিনি মানব-জীবনের প্রতিটি অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা ও রসিকতা, নীচতার প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ প্রকাশ্য নিন্দা এবং প্রতিটি মানুষের প্রয়োজনে সহানুভূতি সকল স্তরের নরনারীর মর্ম স্পর্শ করিত।

আমাদের ক্ষুদ্র আদর্শের তুলনায় তাঁহার ধারণা এত মহৎ যে, আমরা চমকিত হইতাম। আমরা বুঝিয়াছিলাম, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আমাদিগকে এক নূতন এবং বৃহত্তর ধারণার ক্ষেত্রে প্রবেশ করাইতেছেন।

আমি মিস বেল ও অন্যান্য বন্ধুর সহিত ১৯০০ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাই। যাহা শুনিলাম, তাহাতে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। স্বামীজীর চেহারায় আরও আকৃষ্ট হই। তাঁহাকে মনে হইত—অতিমানব, মহাত্মা,

স্বর্গরাজ্যের দেবতা। কেহ কখনও এরূপ উচ্চাঙ্গের বাগ্মিতা, এমন তৃপ্তিকর রসিকতা, এমন মনোমুগ্ধকর গল্প বলা অথবা এমন সুনিপুণ অনুকরণ করা দেখে নাই বা শুনে নাই।

তাঁহার জন্মভূমির সভ্যতার কথা চিন্তা করিয়া আমি আমেরিকাবাসিনী বলিয়া লজ্জা অনুভব করিলাম। আমি প্রায় তাঁহার প্রত্যেক বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলাম এবং সকলেরই সমান উৎসাহ লক্ষ্য করিয়াছি। মনে হয়, বক্তব্য বিষয় অপেক্ষা বক্তার আকর্ষণও কম ছিল না। আমার পরিচিতা এক ধনী ও অভিজাত মহিলাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'আহা, স্বামীজী যেন সোনায় গড়া অপূর্ব মূর্তি!'

বক্তৃতা ছাড়াও আগ্রহশীল ছাত্রদের জন্য স্বামীজী প্রাতে ধ্যানের ক্লাস করিতেন। এই ক্লাস সেই সময় তাঁহার আবাসস্থান টার্ক স্ট্রীটের বাড়ির একটি ঘরে বসিত। এখানে মিসেস এলিস হান্সবরো (শান্তি) ও মিসেস এমিলি অ্যাস্পিনল (কল্যাণী) তাঁহার গৃহকর্ম দেখাশুনা করিতেন। এই সকল ক্লাসে আমি মাঝে মাঝে গিয়াছি। প্রথমে হইত ধ্যান, পরে কিছু সময় উপদেশ, তারপর প্রশ্ন ও উত্তর এবং অনুশীলন, তৎপরে বিশ্রাম ও খাদ্য সম্বন্ধে কার্যকর ইঙ্গিত। স্বামীজী পরিমিত ও লঘুপাক খাদ্য গ্রহণের উপরই জোর দেন। একটি কথা আমার মনে আছে। লবণ উত্তেজক পদার্থ, স্নায়বিক অপকার হইতে পারে ভাবিয়া এক সপ্তাহ আমরা লবণ খাওয়া বন্ধ রাখি।

এই সকল ক্লাসে বহু প্রশ্ন ও উত্তর হইত যাঁহারা ক্লাসের পূর্বে উপস্থিত হইতে পারিতেন, তাঁহারা স্বামীজীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করিবার সুযোগ লাভ করিতেন, অবশ্য অল্প সময়ের জন্য

জীবনে আমাদের উদ্দাম গতি দেখিয়া তিনি ঠাট্টা করিতেন। তিনি শান্ত, ধীর, স্থির; কখনও তাঁহাকে তাড়াতাড়ি করিতে দেখা যাইত না। কেহ ছুটিয়া গাড়ি ধরিতে গেলে তিনি কৌতুক বোধ করিতেন, বলিতেন—আর কি পরে গাড়ি পাওয়া যাবে না? ক্লাস বা বক্তৃতা আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইলেও তিনি বিচলিত হইতেন না। ক্লাস শেষ করিবারও কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। আলোচ্য বিষয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্লাস চালাইতেন, তাহাতে নিয়মিত সময়ের দ্বিগুণ সময় লাগিলেও তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। ক্লাসের পূর্বে সাক্ষাতেরও কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। তিনি প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং সেই সঙ্গে তামাসার কথাও বলিতেন। এই সময় শুধু সাদা ফ্লানেলের পাজামা পরা থাকিত। দুই মিনিটের মধ্যেই তিনি পোশাক বদল করিয়া গেরুয়া পোশাকে, সুবিন্যস্ত কেশে ক্লাসে উপস্থিত হইতেন।

গুরুতর বিষয়ের মধ্যেও তিনি রঙ্গকৌতুকের অবতারণা করিতেন। যখন কেহ ঈশ্বরের সহিত একত্ব উপলব্ধি করে, তখন তাহার কি হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিদ্রূপ করিয়া বলেন, 'তোমরা—এই দেশের লোকেরা, তোমাদের ব্য-ক্তি-ত্ব হারাতে চাও না, ভয় পাও। এখনও যে তোমরা ব্যক্তিত্ব লাভই করনি! তখনই ব্যক্তিত্ব লাভ করবে, যখন তোমরা তোমাদের সমগ্র প্রকৃতি উপলব্ধি করবে, তার পূর্বে নয়। ঈশ্বরকে জানলে কিছু কি হারায়? প্রায়ই শুনে থাকি, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলা উচিত। তোমরা কি জান না, প্রকৃতিকে জয় করেই মানুষের অগ্রগতি হয়েছে? যদি উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হয়, প্রতি পদে প্রকৃতিকে বাধা দিতে হবে।'

তাঁহাকে বহু প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করা হয়-বলিলে তিনি বলেন, 'যত ইচ্ছা প্রশ্ন কর। প্রশ্ন

যত বেশী হয়, ততই ভাল। আমি এখানে আছি এইজন্যই। যতক্ষণ তোমরা পরিষ্কার না বোঝ, তোমাদের ছাড়ব না। ভারতবর্ষে বলে, অদ্বৈত-বেদান্ত জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া অনুচিত, কিন্তু আমি বলি, একটি শিশুকেও আমি অদ্বৈতভাব বোঝাতে পারি। সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক শিক্ষা যত শীঘ্র হয়, ততই মঙ্গল।'

আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'যত কম পড়, ততই ভাল। গীতা ও বেদান্ত সম্বন্ধে বই পড়, তাতেই প্রয়োজন মিটবে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সর্বৈব ভুল। চিন্তা করতে শিখবার পূর্বেই কতকগুলি ঘটনা দ্বারা মন ভরে দেওয়া হয়। প্রথম শিক্ষা হওয়া উচিত—মনকে বশে আনা। মন সংযত করতে পারে না বলেই শিখতে অত সময় লাগে। মেকলের ইংলণ্ডের ইতিহাস আমি তিনবার পড়ে মুখস্থ করি, কিন্তু আমার মা যে-কোন ধর্মগ্রন্থ ইচ্ছামত একবার পড়েই মুখস্থ করতে পারতেন।'

রবিবার সন্ধ্যায় 'হোম অব ট্রুথে' স্বামীজী উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিতেন। সরল ও সতেজ ভাষায় তিনি আমাদের সম্বন্ধে যাহা ভাবেন, তাহা বলিতেন, এতটুকু স্তুতিবাদ থাকিত না।

গান লইয়াও নানা রকম তামাসা করিতেন!

'I reached the land of corn and wine,
And all its riches freely mine!'

Missionary Hymn-এও তিনি কৌতুক বোধ করিতেন।

'From Greenland's icy mountains,
To India's coral strand……'

তাঁহার সুকণ্ঠে সমস্ত গানটি শেষ পর্যন্ত গাহিয়া থামিয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মুচকি হাসিয়া বলিতেন, 'পাদরীরা যাদের উদ্ধার করতে যায়, আমি হচ্ছি সেই পৌত্তলিকদেরই একজন।'

২রা মে (১৯০০ খৃঃ) স্বামীজী মিস বেলের আমন্ত্রণে ক্যাম্প টেলরে শান্তিকে সঙ্গে লইয়া আসেন। এখানে মিস বেলের সহিত আইডা ইতিপূর্বেই যান। 'দি ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট' পুস্তকটি স্বামীজী খুবই পছন্দ করিতেন। স্যান-ফ্রান্সিস্কোতে এক বক্তৃতায় 'Silence all teachers, silence all books; do Thou only speak unto my soul'. (শান্ত হোন সকল ধর্মবক্তা, শান্ত হোক সমস্ত শাস্ত্র; হে প্রভু, একমাত্র তুমিই আমার অন্তরে কথা কও)—এই কথা উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

আইডা আরও বলেন: স্বামীজীর রান্না আমাদের পক্ষে খুব ঝাল লাগা সত্ত্বেও তাঁহার দেওয়া ঝাল খাইতে আমরা দ্বিধা করিতাম না। স্বামীজী বিষ দিলেও লোকে তাহা পান করিতে পারে।

কিছুই স্বামীজীর দৃষ্টি এড়াইত না। এক রেড ইণ্ডিয়ান শ্রমিক ক্যাম্পে কাজ করিত। সে আমাদের প্রাতরাশের সময় তাকাইতেছিল দেখিয়া স্বামীজী খোঁজ লইয়া জানিতে পারেন, তাহাকে কফি দেওয়া হয় না। সে বলে, 'কালা আদমী কফি পছন্দ করে, সাদা আদমী কফি পছন্দ করে, লাল আদমীও কফি পছন্দ করে।' এই কথায় স্বামীজী খুব কৌতুক বোধ করেন এবং তাহাকে কফি দিতে বলিয়া দেন।

মহা আনন্দে অতি দ্রুত দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল—সকাল গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে, অপরাহ্ণ আমোদে এবং সন্ধ্যা উচ্চ চিন্তায়।

প্রতি শনিবার স্যানফ্রান্সিস্কোয় আমার বাজনা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। এক শনিবার অপরাহ্ণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলে স্বামীজী যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলি, 'আমাকে ক্লাস নিতে হবে।' এই উত্তরের জন্য আমি আজও অনুশোচনা করি,

কারণ অর্থোপার্জন ক্লাসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—মিস বেলের বক্তৃতা। স্বামীজী বলেন, 'তবে যাও; পাঁচ লাখ টাকা ক'রে আমার ভারতীয় কাজে দান ক'রো।' তাঁহার কাজের জন্য এখনও অত টাকা জোটে নাই, কিন্তু আমি শিশুসুলভ আশা ত্যাগ করি নাই। হয়তো কোন দৈব উপায়ে ইহা পাওয়া এখনও সম্ভব। স্বামী তুরীয়ানন্দ বহুবার বলেছেন, 'মা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন।'

স্বামীজীর দৃষ্টি সর্বদা উর্ধ্বে নিবদ্ধ থাকিত। একজন লোক বলিয়াছিল, তিনি টেলিগ্রাফের খুঁটির ছোটা দেখেন না। তাঁহার চলনভঙ্গি এতই জমকাল ছিল যে, আমাদের সম্মুখ দিয়া একটা ইঞ্জিন চলিয়া গেলে জনৈক খালাসী চালক বলিতেছে শুনিলাম, 'এই sky-pilotটি কে?' আমি তখনই ইহার অর্থ বুঝি নাই, পরে শুনিলাম ইহার অর্থ ধর্মনেতা। সত্যই, তাঁহাকে দেখিলে বুঝিতে ভুল হইত না যে, তিনি একজন ধর্মনেতা।

স্বামীজী ২৬শে মে ক্যাম্প ত্যাগ করেন। মনে আজও সেজন্য দুঃখ আছে—কেন ক্যাম্প ছাড়িয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি এই ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করি, তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিয়াছি এবং আমার মাধ্যমে তাঁহার কথা লিপিবদ্ধ হইয়া ছাপা হইবে, যাহা পড়িয়া লোকে সাহস ও অনুপ্রেরণা লাভ করিবে। এই অনুভূতি ও অসামান্য অধিকার জীবনের সকল দুঃখের ক্ষতিপূরণ করিয়া দেয়।

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীকে ভারতের একটি স্বর্ণযুগ বললে অত্যুক্তি হয় না। এই শতাব্দীতে বহু দিক্‌পাল মহামানবের আবির্ভাব জাতির স্তিমিত জীবনে এনেছে নবীন প্রাণের বসন্ত। তাঁদের মধ্যে একজন অরবিন্দ ঘোষ, যাঁকে নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে—এ-যুগের একজন সেরা মনীষী।

একটা আত্মবিস্মৃত জীবন্মৃত জাতিকে দীপ্ত মুক্ত মহাজীবনের চঞ্চলতায় সজীব ক'রে তোলবার জন্যে এমনটি ঘটবার একান্তই প্রয়োজন ছিল। জনসাধারণের স্বভাব হচ্ছে জড়ের স্বভাব। বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে পাওয়া ধারণাগুলিকে নির্বিচারেই তারা গ্রহণ করে। ধারণাগুলির সত্য-মিথ্যা যাচাই ক'রে নেবার মতো মনন-শক্তি তাদের কোথায়? পৃথিবীতে কঠিনতম কাজ যদি কিছু থাকে, সেটি হচ্ছে নিজের মন দিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারা। প্রতিভার যাঁরা বরপুত্র, তাঁরা সকলেই তাঁদের চিন্তায় এই মৌলিকতার ছাপ রেখে গেছেন। তাঁদের সৃজনধর্মী প্রতিভা জনসাধারণকে নূতন পথের বার্তা শুনিয়েছে, নতুন জগতের স্বপ্ন দিয়েছে, নতুন সত্যের সঙ্গে পরিচিত করেছে। ইতিহাসে তাঁদের চিরদিনের ভূমিকা হচ্ছে যুগস্রষ্টা পথিকৃতের বৈপ্লবিক ভূমিকা। এঁরা এসে নূতনতর পথে চলবার প্রেরণা দেন, আর সেই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে স্থবির-স্থাণু সমাজ প্রগতির পথে চলতে আরম্ভ করে। জ্বলন্ত মশালের সংস্পর্শে না এলে কাঠের স্তূপ যতই শুকনো হোক, জ্বলবে না কিছুতেই।

কিন্তু কালেভদ্রে নিশ্চল জাতির মধ্যে সৃজনধর্মী প্রতিভার আবির্ভাব হলেই সেই জাতি সজীব হয়ে উঠবে—এমন কথা বলা যায় না।

ঘুমন্ত সমাজকে জাগানোর জন্যে অনেকগুলি মহামানবের দরকার এবং আরও দরকার তাঁদের উপর্যুপরি আবির্ভাব। উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের উপরে চাই আঘাতের পর আঘাত—যেন গরম লোহা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার অবসর না পায়।

বিধাতার ইচ্ছা—ভারত আবার 'ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে', জগৎকে তার যা দেবার আছে, তা মুক্তহস্তে দিয়ে সে কৃতার্থ হবে। তাই এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ। আর এলেন এঁদের ঐক্যের আদর্শকে সফলতার পথে আরও এগিয়ে দেবার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। এই সঙ্গে নাম করা যেতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ আরও অনেক মহারথীর।

এতক্ষণ যা আলোচনা করা গেল, তারই দার্শনিক পটভূমিকায় শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে কয়েকটি কথা নিবেদন ক'রব। শ্রীঅরবিন্দ যখন নিতান্ত বালক, তখনই তাঁর পিতা সুবিখ্যাত ডাঃ কে. ডি. ঘোষ তাঁকে বিলাতে পাঠান শিক্ষালাভের জন্যে। ছাত্রজীবন শেষ ক'রে যুবক অরবিন্দ যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন তিনি মাতৃভাষায় কথা বলতে পারেন না। কিন্তু পাশ্চাত্যের দর্শনে সাহিত্যে ইতিহাসে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা চমকপ্রদ। স্বদেশে ফিরে এসে অরবিন্দ বরোদা কলেজে কিছুকাল সহকারী অধ্যক্ষের কাজ করেন। ইতিমধ্যে কার্জনের ঔদ্ধত্যের প্রতিবাদে বঙ্গদেশে উঠল স্বদেশী আন্দোলনের ঝড়। এই ঝড়ের মধ্যে অরবিন্দ শুনলেন স্বাধীনতার দৃপ্ত পদধ্বনি। খর্বকায় মানুষটি ছিলেন স্বল্পভাষী এবং নম্র স্বভাবের, কিন্তু সেই কুসুমকোমল নম্রতার মধ্যে ছিল চরিত্রে একটি অনমনীয় দৃঢ়তা, যা অন্যায়কে অন্যায় বলতে কখনও কুণ্ঠিত হয় না। অরবিন্দ স্বাধীনতার আহ্বানে বাংলায় চলে এলেন এবং অবতীর্ণ হলেন বিপ্লবীর ভূমিকায়। 'সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়' সমস্ত দেশের হয়ে তিনি দাবি করলেন বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান—স্বাধীনতা। নরমপন্থীদের আবেদন আর নিবেদনের পথে তিনি পা বাড়ালেন না। দেশ-মাতৃকাকে যারা শৃঙ্খলিত ক'রে রেখেছে, সেই বিদেশীদের কাছে তিনি বাড়িয়ে দিলেন না 'আতুর অঞ্জলি'—ভিক্ষার জন্যে। মানুষের পূর্ণ অধিকার—সে কি কখনও অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা হ'তে পারে? রাজশক্তির আকাশস্পর্শী স্পর্ধার পিছনে রয়েছে তার অস্ত্রবল। সেই বজ্রকঠিন শক্তিকে ভিক্ষার পথে নোয়ানো সম্ভব ছিল না। শক্তিকে পরাস্ত করতে হ'লে শক্তির সাধনা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অরবিন্দ তাই দেশবাসীকে শোনালেন শক্তির মন্ত্র।

পরাধীন দেশে বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে যে মানুষ, তার মাথায় রাজরোষের ঝড় ভেঙে পড়বেই। অরবিন্দও রেহাই পেলেন না। তিনি কারারুদ্ধ হলেন। আদালতে অনেক দিন ধ'রে তাঁর বিচার চ'লল। বিচারে তিনি মুক্তি পেলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে অরবিন্দের এই বিপ্লবীর জীবন ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ পর্যন্ত।

আবার পটপরিবর্তন! এবারের পটভূমি পণ্ডিচেরীর সমুদ্রতীর। সেই সমুদ্রতীরে রাজনীতির কল-কোলাহল থেকে দূরে আশ্রমের নিভৃতে শুরু হ'ল অরবিন্দের যোগসাধনা। উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর সেই যে সাধনা, মহা-অজানাকে জানবার জন্যে সাধকের সেই যে দুর্বার অভিযান—চমকপ্রদ তার রহস্যময় ইতিহাস আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ঠিকমতো বুঝবে না। অবশেষে এল সেই দুর্লভ পরম মুহূর্তটি যখন অরবিন্দ পৌঁছলেন সাধনার শিখর-দেশে। দিব্য জীবনের অনির্বচনীয় উপলব্ধিতে তিনি অধিষ্ঠিত হলেন।

ঈশ্বরকে জানবার জন্যে সুখ-সম্পদ মায়া-মমতার বন্ধন ছিঁড়ে অকূলের পানে তরী ভাসানোর মধ্যে একটি চরম নির্ভীকতার পরিচয় আছে। সেই জ্যোতির্ময় পরমপুরুষকে উপলব্ধি করার মধ্যে যে একটি অনির্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি রয়েছে, সেই আনন্দকে জয় ক'রে নিতে হয় কঠিন তপস্যার দ্বারা। কেউ কাউকে সেই অনুভূতি আস্বাদন করাতে পারে না। সাধনার রাস্তায় সাধককে একলাই চলতে হয়। আর এই অভিযানের শুরুতে নিজের সঙ্গে নিজের কী নিষ্ঠুর সংগ্রাম, কী কঠিন তপস্যা! যে-জীবনকে সাধক ফেলে এসেছে পশ্চাতে, তার সুখময় নীড়ে ফিরে যাবার জন্য সে কী দুরন্ত আগ্রহ! তারপর একদিন রাত্রির তপস্যা আনে দিব্য জীবনের আলো-ঝলমল প্রভাত! দুঃখের হয় অবসান। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধুর্য-স্রোতে সাধক তখন দিবানিশি ভেসে চলে।

পাশ্চাত্যের এবং প্রাচ্যের একটি আশ্চর্য মিলন ঘটেছিল অরবিন্দের জীবনে। পশ্চিম থেকে —রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী অথবা নেহরুর মতো অনেক কিছুই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। প্রতীচ্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতা তাঁকে কিন্তু অভিভূত করতে পারেনি। জাতির অন্তরাত্মার মহিমময় প্রকাশ তাঁর দিব্যজীবনের মধ্যে। ভারতের যে-সত্য রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে', সেই সত্যকে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই ব'লব বিশ্বজাগতিকতা। জ্ঞানে, ভাবে, কর্মে— সকল দিক্ দিয়ে বৃহতের মধ্যে চৈতন্যের আনন্দময় বিস্তারকেই ভারতবর্ষ পরম সত্য ব'লে ঘোষণা করেছে। ঈশ্বরলাভকেই অরবিন্দ জীবনের উদ্দেশ্য ব'লে ঘোষণা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণেরই প্রতিধ্বনি ক'রে তিনি বলেছেন—অবিচলিত বিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই তাঁকে লাভ করবার উপায়। আর সেই সঙ্গে এ-কথাও বলেছেন, 'সৃষ্টির মধ্যে সেই পুরুষোত্তম প্রচ্ছন্ন থাকলেও সমস্ত জীবের মধ্যে, সমস্ত আত্মার মধ্যে এবং সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে তাঁকেই দেখতে হবে। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে, জীবনে তাঁর সঙ্গে যোগ হবে অবিচ্ছিন্ন এবং অঙ্গাঙ্গী।' বিবেকানন্দ-প্রচারিত যোগসমন্বয়—কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান এই তিনেরই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি অরবিন্দের বাণীতে। আর 'জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক্ ক'রে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি'—এই বাণী কি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়নি ?

আজ যখন যন্ত্রসভ্যতার জয়ধ্বনিতে আকাশ মুখর এবং জড়বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সাফল্যে অভিভূত হয়ে প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়েই ধর্মজীবনকে মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছে, তখন কি শ্রীঅরবিন্দের বাণীর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যকে গভীর ক'রে বুঝবার সময় আসেনি ? বিজ্ঞানের কল্যাণে এত যে উপকরণের প্রাচুর্য, ভোগের এত যে আয়োজন,—এর মধ্যে কি আমাদের হৃদয় প্রচ্ছন্ন একটি নৈরাশ্যের এবং ক্লান্তির বোঝায় ভারাক্রান্ত নয় ? এমন তো হবেই। কারণ শ্রীঅরবিন্দের ভাষাতেই আবার বলি, 'জীবন থেকে আমাদের আত্মা যা দাবি করে, তাকে কোনমতেই ইন্দ্রিয়-সুখ বলা চলে না। এমন কিছু আছে ক্ষণিকের এই সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে, এমন কিছু—যা নিত্য, স্বয়ংপূর্ণ এবং আনন্দঘন। সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ এই নিত্যের অন্বেষণে ব্রতী। সাধনার ধনকে পেলে একটি শাশ্বত শান্তি ও নির্মল আনন্দের সে অধিকারী হয়। শ্রীঅরবিন্দের কণ্ঠে এই পরমানন্দঘন অনন্ত ভগবানের সঙ্গে যোগের 'মৃত্যুঞ্জয় পরম ঘোষণা' জ্যোতির্ময় দিব্য-জীবনের অমৃতবাণী !*

* অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও-র সৌজন্যে।

ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি

[জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীর ডায়েরী হইতে]

(পূর্বানুবৃত্তি)

এম. এ. পরীক্ষান্তে দেশে না গিয়া পরীক্ষার ফল জানিবার জন্য আরও কিছুকাল কলিকাতার সেই ছাত্রাবাসেই রহিয়া গেলাম। তখন ১৯১৯ খৃঃ শেষভাগ। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখিলাম আমি প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছি। মনে দৃঢ় ধারণা হইল—শ্রীশ্রীমহারাজের আশীর্বাদেই এইরূপ আশাতীত ফল হইয়াছে। কারণ, তিনিই একদিন ভর্ৎসনার স্বরে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'পড়াশুনা করবি না তো কি মূর্খ হয়ে থাকবি? এখন থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবি।' তারযোগে পিতৃদেবকে আমার পরীক্ষার ফল জানাইয়া কর্মের সন্ধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও হর্তা-কর্তা-বিধাতা শ্রীআশুতোষ মুখার্জী মহোদয়ের বাসভবনে গমন করি। তিনি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু বিধাতার বিধান দুর্লঙ্ঘনীয়। তিনি যে কাহাকে কখন কোন্ পথে পরিচালিত করিবেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহা আমাকে সম্পূর্ণ এক নূতন পথের পথিক করিয়া তুলিল। আমার সমপাঠী কৃতী ছাত্রদের মধ্যে ২।৩ জন চাকুরির বন্ধনে আবদ্ধ না হইয়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করিতে মনঃস্থ করিল এবং আমাকেও সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল। আমিও সেইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া চাকুরি করিয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। আমি পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠপুত্র। অপর দুই ভ্রাতা স্কুলে অধ্যয়ন করে। পিতৃদেব সবেমাত্র সরকারী চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বগৃহে কর্মবিহীন অবস্থায় বসিয়া আছেন। তাঁহার পেনসন-এর উপরই সংসার-নির্বাহ অনেকটা নির্ভর করে। এইরূপ অবস্থায় সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া হঠাৎ সন্ন্যাসী হইবার আকাঙ্ক্ষা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু আমার মনে একবার একটি চিন্তা অঙ্কুরিত হইলে তাহার প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করাও সহজে সম্ভব হইত না। তাই বন্ধুদের প্রেরণায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই আমিও তাহাদের সহিত ভুবনেশ্বর মঠে শ্রীশ্রীমহারাজের নিকট যাওয়াই স্থির করিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম—আমার পরিচিত অনেকেই মহারাজের কাছে রহিয়াছেন। সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় আনন্দের অবধি রহিল না। শ্রীশ্রীমহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'তুইও এসেছিস যে? কুশল তো?' আমি 'আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ' বলিয়া কিছুক্ষণ পর বন্ধুদের নিকট চলিয়া গেলাম। বলা বাহুল্য, শ্রীশ্রীমহারাজের আদেশমত আমাদের ভুবনেশ্বর মঠে থাকিবার সুব্যবস্থাই হইল। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমাদের ঐখানে পৌঁছিবার কিছুদিন পূর্বেই আমার পরিচিত বন্ধুদের অনেকেরই মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হইবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। একদিন একজন বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণে আমার সম্মতি আছে কিনা।

আমি বলিলাম—একবার যখন সব ত্যাগ করিয়া এই পথের পথিক হইয়াছি, তখন এই ব্রতগ্রহণে আপত্তি করিবার তো কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া শ্রীশ্রীমহারাজ-সমীপে আমার প্রার্থনার কথা উত্থাপন করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'না, এখন থাক।' মহারাজের ঐ কথা শুনিয়া আমার জেদ আরও বাড়িয়া গেল। মনে মনে ভাবিলাম —আমি সাধু হইতে চাই, অথচ ইঁহারা নিজেরা সন্ন্যাসী হইয়া আমার এই পবিত্র আদর্শ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে! অদূরদর্শী আমি তখনও জানিতাম না যে, ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষগণ আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ সকলই তাঁহাদের নখদর্পণে প্রত্যক্ষ করিয়াই আমাদের কল্যাণের জন্য এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যাহা হউক, ভুবনেশ্বর মঠে অবস্থান-কালে আমার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরপূজার বাসনপত্র ধুইবার আদেশ হইল। আমিও আনন্দিত চিত্তে সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে দিনের পর দিন করিতে লাগিলাম। মহারাজ আমার নিষ্ঠা ও কর্ম-তৎপরতা দর্শনে খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। কিছুদিন পর আমরা কয়েকজন পুরীধাম-দর্শনে যাই; পূর্বের সেই শশী-নিকেতনেই দুই-তিন দিন থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির, অনন্তবিস্তৃত নীল সিন্ধু ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ তীর্থাদি দর্শন করিয়া ভুবনেশ্বরে ফিরিলাম। ভুবনেশ্বর মঠটি আমাদের আগমনে ভরিয়া গিয়াছিল। প্রতিদিন ভজন কীর্তনাদিতে মঠ আনন্দমুখর থাকিত—আমরাও সেইখানে সেই অনাবিল আনন্দস্রোতে গা ভাসাইয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম।

এতগুলি যুবক কর্মীকে অধিক দিন ঐ মঠে বসাইয়া রাখা সঙ্গত নহে মনে করিয়া মহারাজ আমাকে ও আর একজনকে হিমালয়-ক্রোড়ে অবস্থিত মায়াবতী আশ্রমে প্রেরণ করা স্থির করিলেন এবং তদনুযায়ী চিঠিপত্রাদি লিখিয়া সব ব্যবস্থাও করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন: ঐ স্থানটি অতি নির্জন—সাধন-ভজনের অনুকূল; উহা একটি Prize-post! শ্রীশ্রীমহারাজের চরণে প্রণত হইয়া এবং তাঁহার আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম এবং নির্দিষ্ট দিনে বেলুড় মঠে আসিয়া পৌঁছিলাম

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাদিগকে দেখিয়া খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাকে ভক্তি-ভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। একদিন প্রাতে তাঁহাকে প্রণাম করিবার পর তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন, 'ছাখ, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে —পিতামাতার সেবার জন্য তোমার কিছুদিন কাজকর্ম করা ভাল। তাঁরা এত টাকা পয়সা খরচ ক'রে তোমাকে পড়ালেন, আর তুমিও বেশ ভালভাবে পাস করেছ। কিছুদিন কিছু টাকা-পয়সা উপার্জন ক'রে পিতামাতাকে দেওয়া ভালো।' কথাগুলি শুনিয়া আমি মনে মনে খুবই বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলাম। আমি সাধু হইতে চাই, অথচ ইঁহারা নিজেরা সাধু হইয়া আমার সাধুভাবে জীবনযাপন করার পথে কেবলই বাধা সৃষ্টি করিতেছেন কেন? ভুবনেশ্বরে শ্রীশ্রীমহারাজও প্রায় এইরূপ সুরেই কথা বলিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমার জেদ দেখিয়া পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আর বিশেষ কিছু বলিলেন না। কয়েক দিন মঠে বাস করিয়া আমরা উভয়ে ৺কাশীধামের জন্য রওয়ানা হইলাম। সেখানে পৌঁছিয়া পুরীধামে দৃষ্ট 'লালটুকটুকে সাধু' শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের সহিত দেখা হইল। তিনি তখন সেবাশ্রমে ছিলেন। তিনি আমাদের উভয়কে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং

শ্রীশ্রীমহারাজ আমাদিগকে মায়াবতী আশ্রমের কর্মিরূপে পাঠাইতেছেন জানিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। কাশীধামে অবস্থানকালে নিত্য গঙ্গাস্নান, এবং ৺বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া আমরাও নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিলাম। কয়েকদিন এই পবিত্র তীর্থভূমিতে অবস্থান করিয়া আমরা মায়াবতীর পথে যাত্রা করিলাম। তখনও বাস্ চলাচলের ব্যবস্থা হয় নাই। সুতরাং আমরা টনকপুর হইতে পাহাড়ী কুলির স্কন্ধে মালপত্র চাপাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া চলিলাম। ইতঃপূর্বে কোনদিন পাহাড়ে ভ্রমণ করি নাই। সুতরাং এই দুর্গম গিরিপথে চলিতে যে খুবই কষ্ট হইতেছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রায় ৮ মাইল উঠিবার পর মায়াবতী যাইবার রাস্তাটি ছাড়িয়া দিয়া সুখীডাং নামক ডাকঘর বামে রাখিয়া পূর্বদিকের একটি অপ্রশস্ত পথ ধরিয়া প্রায় ২॥ মাইল অতিক্রমপূর্বক আশ্রমে পৌছিয়া পূজ্যপাদ বিরজানন্দ মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। তিনি খুব যত্নসহকারে আমাদের থাকিবার ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমরাও নিশ্চিন্ত মনে সেই শান্তিপূর্ণ আশ্রমে ২।৪ দিন অবস্থান করিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দিত হইলাম। পরদিন প্রাতে ৭টা-৮টার সময় দেখিলাম মহারাজ কেবলমাত্র কৌপীন পরিধান করিয়া স্বহস্তে কোদালি গ্রহণপূর্বক শাকসব্জী উৎপাদনের জন্য জমি তৈয়ার করিতেছেন! তিনি গলদ্‌ঘর্ম হইয়াছেন—তবুও বিরাম নাই! কত পরিশ্রম করিয়া তিনি যে এই পাথর- ও কাঁকরপূর্ণ স্থানটিকে নানা ফলেফুলে ও শাকসব্জিতে সুশোভিত করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়! তাঁহার এই নিরভিমানতা ও স্বহস্তে কার্য করিবার দৃষ্টান্ত আমাদের জীবনে অনুকরণীয়।

শ্যামলাতালে কয়েকদিন থাকিয়া মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী তখন সেখানকার অধ্যক্ষ। তাহার নির্দেশে পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করিতে লাগিলাম।

একাদিক্রমে একবৎসর সর্বাঙ্গসুন্দর এই মায়াবতী আশ্রমে থাকিবার সুযোগলাভ করিয়াছিলাম। সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও একটা বিষয়ে দারুণ অভাব বোধ করিতেছিলাম। সেই আশ্রমে দেশ-বিদেশ হইতে আগত অন্যধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের ধর্মমত অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাকিতে হইত। যাহাতে কাহারও স্বাধীনতা কোনপ্রকারে ব্যাহত না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই স্বামী বিবেকানন্দ সেখানে মন্দির বা মূর্তিপূজার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইহাতে নিরাকারবাদী উচ্চাধিকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে খুব সুবিধাজনক হইলেও সাকার-উপাসনারত ভক্ত-হৃদয় কখনও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। উপাসনামূলক কোন অনুষ্ঠান ভক্তবৃন্দের জীবন-গঠনে যে একান্ত প্রয়োজন, তাহা দ্বৈতবাদী ভক্তমাত্রের নিকটই অনস্বীকার্য। আমার ভাবপ্রবণ মন কিছুদিনের মধ্যেই অস্থির হইয়া উঠিল—এখানে কোন দেবদেবী বা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতিতে পর্যন্ত পুষ্পার্ঘ্য বা মাল্যাদি অর্পণ করা নিষিদ্ধ। আশ্রমের এই সর্বজনীন আদর্শের দিক দিয়া ইহার কতকটা যৌক্তিকতা থাকিলেও আমাদের মতো তরুণপ্রাণের পক্ষে উহা যে মোটেই কল্যাণকর নহে, এইরূপ মনে হইতে লাগিল।

আমার উপর আশ্রমের দিনপত্রী (ডায়েরী) লিখিবারও ভার অর্পিত হইয়াছিল। একদিন গ্রীষ্মকালে একটি আকস্মিক ঘটনায় আশ্রমবাসী সকলেই সন্ত্রস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। আশ্রমের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তভাগে একটি দাতব্য

চিকিৎসালয় ছিল। ডাক্তার মহারাজ উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। আশ্রমের পশ্চাৎদিকে ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে সমুন্নতশির পাইনগাছগুলি বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া সর্বদা একটি অস্ফুট সোঁ সোঁ শব্দ করিত এবং সেই সকল বৃক্ষের শুষ্কপত্রাদি বৃক্ষতলে ও চতুষ্পার্শ্বে স্তূপীকৃত হইয়া থাকিত। পূর্বোক্ত চিকিৎসালয়টির ছাদ শ্লেটপাথর দ্বারা নির্মিত, কিন্তু উহার কাঠামো চিড় বা পাইন গাছের তক্তায় গঠিত। নিকটেই একটি অনুন্নত ছোট কাঠের গুদামঘরও ছিল। ডাক্তার-স্বামী তাম্রকূট সেবনে অভ্যস্ত ছিলেন। একদিন দ্বিপ্রহরে আহারান্তে আমরা সকলেই বিশ্রামার্থে নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করিয়াছি—এমন সময় 'আগুন আগুন'—এই চীৎকার শুনিয়া আমরা সকলে শশব্যস্তে গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, চিড়ের পত্র অবলম্বন করিয়া সর্বগ্রাসী অগ্নিদেব দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছেন এবং পূর্বোল্লিখিত কাষ্ঠ-স্তূপকেও গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অচিরে কাষ্ঠসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গেল—এখন আশ্রম-গৃহের সন্নিকটস্থ চিড়বৃক্ষগ্রাসের পালা। আশ্রমে জলের একান্ত অভাব, সকলেই নিরুপায়। কেবলই আশঙ্কা—নিমেষের মধ্যে আশ্রমটিও ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। কিংকর্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় প্রায় সকলেই দণ্ডায়মান। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নিকটবর্তী ঝরনা হইতে কোন প্রকারে কিছু জল ও মৃত্তিকাদি সংগ্রহ করিয়া অগ্নির উপর বর্ষণ করিতে লাগিলাম। বৃক্ষশাখা দ্বারাও অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা করা হইল। পূজ্যপাদ বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ করজোড়ে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আশ্রমরক্ষার্থে কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। যাহা হউক, সমবেত প্রচেষ্টায় অগ্নি নির্বাপিত হইল—আশ্রমটি এবং সঙ্গে সঙ্গে ডিস্পেন্সারিটিও রক্ষা পাইল। এই ঘটনায় আশ্রমাধ্যক্ষ পূজনীয় মাধবানন্দ মহারাজ আগুন লাগিবার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ডাক্তার মহারাজের অসাবধানতাবশতঃ এই কাণ্ডটি ঘটিয়াছে, তখন তিনি তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন হইলেন এবং আমাকে এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ—ডাক্তার-স্বামীর অসাবধানতার কথাও উক্ত ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন। আমিও তাঁহার আদেশমত সঠিক ঘটনা উহাতে লিখিয়া রাখিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি—মায়াবতী আশ্রমটি ৬৭০০ ফুট উচ্চে একটি পর্বত-গাত্রে অবস্থিত। বিভিন্ন ঋতুতে—বিশেষতঃ বর্ষা ও শীতকালে যাঁহারা ঐ স্থানের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ সময়ে ঐ স্থানে থাকা খুবই কষ্টকর হইয়া উঠে। বর্ষাকালে বাঞ্জ (oak) বৃক্ষের পাতা পচিয়া অসংখ্য রক্তপিপাসু জোঁক (জলৌকা) সৃষ্টি করে এবং উহাদের উপদ্রবে রাস্তা দিয়া ভ্রমণ করা প্রায় অসম্ভব হয়। বৃষ্টিপাত হইলেই শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রায় সংবৎসর ধরিয়াই গরম জামা ব্যবহার করিতে হয়। আহারান্তে চিমনির পার্শ্বে বসিয়া শীত নিবারণেরও ব্যবস্থা আছে। সেখানে নিয়মিত ভাবে একটি ক্লাসও পরিচালিত হইত। একটু অসাবধান হইলেই ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হইবার বিশেষ আশঙ্কা। কয়েক মাস অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া আমার ভয়ানক কাশি শুরু হইল। উহা এতটা বৃদ্ধি পাইল যে, রাত্রিতে যাহাতে অপরের নিদ্রার ব্যাঘাত না হয়, সেজন্য অনেক দিন রাত্রে উত্তরদিকের দ্বিতলের বারান্দায় লেপ-মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিতাম। তাহাতে কাশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। কাশির অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলাম।

নিরুপায় হইয়া পূজ্যপাদ বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজকে আমার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা জানাইলাম। তিনি একদিন আমাকে নিকটবর্তী এক গ্রামে লইয়া গেলেন এবং তত্রত্য একজন পঞ্জাবী সাধুর নিকট হইতে অভ্রভস্ম ও আরও দু-একটি টোটকা ঔষধ জোগাড় করিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, উক্ত ঔষধসেবনে আমার ব্যাধির খুবই উপশম হইল। কিন্তু আমার মনটি এই পাহাড়ের কঠোর জীবন হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ভাবিলাম—এখানে এইরূপ মানসিক অবস্থায় পড়িয়া থাকার কোনই সার্থকতা নাই, নীচে চলিয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঠিক এই সময় বাড়ি হইতে একখানা টেলিগ্রাম আসিল, এবং আমার মধ্যমভ্রাতা-লিখিত এক পত্রও ২।৩ দিন পরে পৌছিল। তাহার মর্ম এই: পিতৃদেব খুব অসুস্থ—আমাকে দেখিবার জন্য তিনি অস্থির হইয়াছেন এবং গর্ভধারিণী আমার অভাবে দৃষ্টি-শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এদিকে নানা প্রতিকূল ঘটনা ও অবস্থার সমাবেশে আমারও বৈরাগ্যাগ্নি প্রায় নির্বাণোন্মুখ। স্থির করিলাম —এখানে আর কালবিলম্ব না করিয়া ঘরেই ফিরিয়া যাইব এবং পিতামাতার সেবা করিয়া তাঁহাদের শান্তিবিধানে তৎপর হইব। পূজনীয় মাধবানন্দজীর নিকট আমার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলে তিনিও বিশেষ আপত্তি না করিয়া যাহাতে আবার মঠ-মিশনের কার্যে সত্বর যোগদান করি, সে-বিষয়ে উপদেশ দিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। শুভ দিনে শুভ ক্ষণে পূর্বোক্ত ডাক্তার মহারাজের সঙ্গে একত্র মায়াবতী হইতে যাত্রা করিলাম। টনকপুর হইয়া ট্রেনযোগে কলিকাতায় পৌছিলাম। সেই দিনই শিয়ালদহ স্টেশন হইতে রাত্রি ৯টায় ঢাকা মেলে পূর্ববঙ্গে রওনা হইয়া যথাসময়ে স্বগৃহে পৌছিলাম।

আমাকে পাইয়া পিতামাতার আনন্দের সীমা রহিল না। পিতৃদেব বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়া একটি ক্ষুদ্র অর্ধশুষ্ক খাল পার হইবার কালে অসাবধানতাবশতঃ পড়িয়া যান এবং পায়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন এবং সেজন্য তাঁহাকে অনেকদিন শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। বলা বাহুল্য, আমি মায়াবতী হইতে নামিবার অব্যবহিত পূর্বে পূজ্যপাদ রাজা মহারাজকে এক পত্রে সব কথা জানাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি সে-পত্রের কোন জবাব দেন নাই। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে পুনঃ যোগদান করিবার সংকল্প আপাততঃ পরিত্যাগ করিলাম। চাকুরি করিয়া পিতামাতার সেবা ও ছোট দুই-ভাইয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রেরণা অনুভব করিতে লাগিলাম। শুধু তাহাই নহে, আমি নিষ্কর্মা হইয়া বাড়িতে বসিয়া সংসারের উপর একটি ভার-স্বরূপ হইয়া থাকিব—সে-চিন্তাতেও মন খুবই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাই চাকুরির সন্ধান করিতে প্রয়াসী হইলাম। এতদিনে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম—কেন শ্রীশ্রীমহারাজ ভুবনেশ্বরে বলিয়াছিলেন, 'থাক্, ওকে এখন ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করবার প্রয়োজন নেই।' মায়াবতী যাইবার পথে বেলুড় মঠে যখন আসি, তখন কেন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে কিছুদিন চাকুরি করিয়া পিতামাতার সেবা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহারও তাৎপর্য এতদিন পরে উপলব্ধি করিতে পারিলাম। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই প্রাতঃস্মরণীয় ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষদ্বয় আমার মানসিক সংস্কারসমূহ ও জীবনের ভবিষ্যৎ দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই আমার সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ উক্তি করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হইল। অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহাদের কথার গভীর অর্থ

তখন বুঝিতে না পারিয়া নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান্ মনে করিয়াছিলাম এবং তদনুযায়ী তখন কর্তব্যা-কর্তব্যও নির্ধারণ করিয়াছিলাম। পূর্বেই লিখিয়াছি যে, অজ্ঞান আমরা ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণের বাক্য শিরোধার্য না করিয়া মূঢ়ের ন্যায় কার্য করিয়া থাকি এবং অজ্ঞানজনিত কর্মের ফলও আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়।

যাহা হউক, চাকুরির সন্ধানে ফিরিতে লাগিলাম। এম্. এ. পাসের পরই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ পাইয়াছিলাম। কিন্তু তখন আপাতবৈরাগ্যবশতঃ সেই কাজ গ্রহণ না করিয়া রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলাম। ফলে এখন শত চেষ্টা সত্ত্বেও ভাল কাজ যোগাড় করা সম্ভব হইল না। অবশেষে আমাদের বাটী হইতে তিন চার মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম। অনেকের পক্ষেই হয়তো ইহা 'from the sublime to the ridiculous' বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার বর্তমান অবস্থায় এই শিক্ষকতার কার্যগ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না।

বাস্তবিকপক্ষে সকলকে স্ব-স্ব প্রারব্ধানুযায়ী কর্ম করিয়া যাইতেই হইবে।

এই প্রারব্ধবশতই আমাকে যে আবার সাংসারিক পরিবেশের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। আমি এই বিদ্যালয়ে কর্মগ্রহণ করিবার পরই ১৯২১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের বন্ধে ভুবনেশ্বর মঠে যাইয়া শ্রীশ্রীমহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে এক পত্র লিখিলাম। কারণ, তাঁহার নির্দেশমত মায়াবতী আশ্রমে থাকিতে না পারিয়া নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলিয়া মনে হইতেছিল। তাই তাঁহার চরণপ্রান্তে আমার মানসিক অবস্থা আনুপূর্বিক নিবেদন করিয়া স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিবার মানসেই তাঁহার নিকট যাইবার অনুমতি চাহিয়া এই পত্র দিয়াছিলাম। পত্রোত্তরে তিনি আমাকে জানাইলেন, 'তুমি যে চাকুরি গ্রহণ করেছ, তা জানলাম। ভুবনেশ্বর মঠে বর্তমানে অত্যন্ত ভিড়। তুমি গ্রীষ্মের বন্ধে কলিকাতায় এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।' আমি পত্রোত্তর না দিয়াই বড়দিনের বন্ধে ভুবনেশ্বর রওনা হইলাম এবং সেখানে পৌছিয়া মঠের নিকটবর্তী একটি হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, যাহাতে আমার দ্বারা আশ্রমের কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করায় পর দিন মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য মঠে উপনীত হইয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'তুই হঠাৎ চলে এলি? তোকে তো কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছিলাম।' আমি বিনীতভাবে বলিলাম, 'মহারাজ, গ্রীষ্মের বন্ধে আসবার সুযোগ-সুবিধা ঘটবে কি না, তার নিশ্চয়তা নেই বলেই চলে এসেছি। তবে আমার আসাতে মঠের যাতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, তাই পার্শ্ববর্তী একটি হোটেলে উঠেছি।' তখন তিনি আর বিশেষ কিছু বলিলেন না। মঠের সাধুরা আমাকে খুব ভালভাবেই চিনিতেন এবং স্নেহও করিতেন। তাঁহারা আমাকে বিছানাপত্রাদি সহ মঠে চলিয়া আসিতে নির্দেশ দিলেন এবং আমিও সানন্দ-চিত্তে সেখানে আসিয়া মহারাজের সান্নিধ্যেই থাকিতে লাগিলাম।

মাত্র ১০।১২ দিনের ছুটিতে এখানে আসিয়াছি। সুতরাং অধিক দিন এখানে থাকা চলিবে না। স্কুল খুলিবার পূর্বেই পূর্ববঙ্গের সেই বিদ্যালয়ে পৌছিতে হইবে। সময় যতই ঘনাইয়া আসিতেছিল, মনটিও এক অব্যক্ত

বেদনায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। মনের কথা মহারাজকে বলিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলাম। একদিন প্রাতে তিনি ভুবনেশ্বর মঠের বারান্দায় বসিয়া আছেন। আমিও সেই সুযোগে মহারাজের পদপ্রান্তে বসিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে বলিতে লাগিলাম, 'মহারাজ, আপনি আমাকে মায়াবতীতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমারই দুর্বলতাবশতঃ সেখান থেকে চলে এসেছি, আমাকে চাকুরি গ্রহণ করতে হয়েছে। আপনাকে পত্রদ্বারা তা ইতিপূর্বে কতকটা জানিয়েছি। মহারাজ, আমার জীবনে কি সন্ন্যাস কখনও হবে না? আমি কি সংসারে ডুবে যাব?' আমার এই কাতরোক্তি শ্রবণ করা মাত্র মহারাজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'কি বলছিস? আমি বলছি, তোর সন্ন্যাস হবে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কবে হবে, মহারাজ?' মহারাজ পুনঃ বলিলেন, 'যখন হবার তখন হবে, তার জন্য এত ভাবনা কি? তোকে যা (অর্থাৎ যে মন্ত্র) দিয়েছি, তাই নিয়মিত জপ ক'রে যাবি। আর শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতাদি শাস্ত্র একটু একটু পড়বি।' এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া মনে যে কতটা উৎসাহ ও উদ্দীপনা অনুভব করিতে লাগিলাম, তাহা বর্ণনাতীত।

স্বীয় কর্মস্থলে যাইবার দিন সন্নিকট। আমি মহারাজ ও অন্যান্য সাধুসন্ন্যাসিগণকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। তখনও বুঝিতে পারি নাই যে, মহারাজের শ্রীচরণদর্শন আর আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। কারণ, তিনি ১৯২২ খৃঃ মধ্যভাগেই কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে দেহরক্ষা করিয়া স্ব-স্বরূপে লীন হইয়াছিলেন। বলরাম-মন্দির হইতে জনৈক বন্ধু আমাকে মহারাজের তিরোধান-বার্তা জানাইয়াছিলেন এবং মহাসমাধির অব্যবহিত পূর্বে মহারাজের যে-সকল অপূর্ব অনুভূতি হইয়াছিল, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস আমাকে উক্ত পত্রে দিয়াছিলেন।

ধন্য আমরা, যাহারা তাঁহার অপার্থিব কৃপা ও পবিত্র সঙ্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, একমাত্র তাঁহারই আশীর্বাদে কয়েক বৎসর পরে পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের (শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের) নিকট হইতে ব্রহ্মচর্যমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করি এবং অবশেষে পবিত্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে যোগদান করিয়া ধন্য হই। শ্রীশ্রীরাজা মহারাজের দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারিত সেই অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী—'আমি বলছি, তোর সন্ন্যাস হবে'—কখনই ব্যর্থ হইবার নয়।

ভ্রম সংশোধন

ভাদ্র সংখ্যায় 'ব্রহ্মানন্দ স্মৃতি' প্রবন্ধে ৪২১ পৃঃ ৭ম ও ৮ম পংক্তি পড়িবেন:

আমার বন্ধু নীরদের (পরে স্বামী অখিলানন্দ) সঙ্গে উক্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে

আলো ও আঁধার

(তামিল কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতীর একটি কবিতার ভাবানুবাদ)

শ্রীমতী বিভা সরকার

আলোর বন্যা আকাশের গায়—
দূর পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায়
সূর্য তাহার স্বর্ণ ছড়ায়
সাগরের ঢেউ-এ ঢেউ-এ।
ঢেউ 'পরে ঢেউ উল্লাসে আসে
জয়সেনা সম ধেয়ে।
পুলকে আছাড়ি বুকে ধরণীর
চিকন পাতায় বনস্পতির
কত যে নদীর ভরি দুই তীর
আলোর দেবতা জাগে—
মানব-মনের তামসী তবুও
কেন রে আঁধার মাগে ?

জ্যোতির প্লাবনে প্লাবিত হের গো
এ নিখিল চরাচর—
অনাদি অসীম জ্যোতিসমুদ্র
কাঁপিতেছে থর থর।
পবিত্র করি এই বিশ্বেরে
পূর্ণ সে জ্যোতি জাগে—
মানব-মনের তামসী তবুও
কেন রে আঁধার মাগে ?

অমৃত সরস আলোর পরশে
ফোটে ফুল বনে বনে,
বিহঙ্গ-কুল এরই জয়গান
গাহিছে আপন মনে।
বাতাসে সাগরে ধরণীরে আর
প্রেমালিঙ্গনে বাঁধি
পুলক-মাতাল এ জ্যোতি-পাথার
উছলিছে নিরবধি।

আলোর প্লাবনে থৈ থৈ করে
যবে এই ত্রিভুবন,
জীবন-জাগানো পুলক-মাতানো
এমন মধুর ক্ষণ—
তখন কেন রে খোলে না কপাট
বন্ধ হৃদয়-দ্বার ?
মাহেন্দ্র ক্ষণে মানুষের মনে
কেন রে অন্ধকার ?

স্থলে জলে আর গগনে গগনে
ঝলসে রবির আলো
পাহাড়ের চূড়া পরশে আলোর
দেখিতে হয়েছে ভালো
মেঘের জটায় সোনার কিরণ
করিতেছে ঝলমল,
দেশদেশান্তে ভেসে ভেসে যায়
তারা চির চঞ্চল।
মানুষের মন বেদবেদান্ত
শাস্ত্র করিল সার—
কত মহাবাণী মহৎ চিন্তা
তৃপ্তি নাহিত তার।
জানিল মানব পরম আলোয়,
যিনি সে জ্যোতির্ময় !
তবু এ হীনতা দৈন্য কেন রে
মানুষের মনে রয় ?

জীব কি স্বতন্ত্র?

স্বামী ধীরেশানন্দ

জীব কি স্বাধীন? নিজের ইচ্ছামত কর্মাদি করিবার সামর্থ্য তাহার আছে অথবা নাই—এ-বিষয়ে শাস্ত্র কি বলেন, তাহা সংক্ষেপে আমরা বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্রে তিন প্রকার বচন পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ঐ বচনগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ। অতএব বিষয়টি বিচার্য, কারণ বিচার ব্যতীত বিরোধ পরিহারপূর্বক সমন্বয় সাধিত হইতে পারে না।

প্রথমতঃ দেখা যায়, বেদাদি শাস্ত্র জীবের জন্য নানাপ্রকার বিধি ও নিষেধের অবতারণা করিয়াছেন। যথা: 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত', 'স্বর্গকামঃ অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ', 'কলঞ্জং ন ভক্ষয়েৎ'—নিত্য সন্ধ্যাবন্দনা উপাসনাদি করিবে, স্বর্গকামী অগ্নিহোত্র করিবে, কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না—ইত্যাদি। একজন কর্তা না থাকিলে বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যদি জীবের কিছু করিবার বা না করিবার স্বাধীনতাই না থাকে, তবে 'এটা কর', 'ওটা করিও না'—শাস্ত্র এ-সব বলিতেছেন কাহাকে? বিধি-নিষেধ পালন করিবে কে? অতএব এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতার জন্য জীবের কিছু করা বা না করা বিষয়ে স্বাধীনতা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ব্যাকরণেও বলে: 'কর্তা স্বতন্ত্রঃ' – কর্তা স্বাধীন।

ব্রহ্মসূত্রেও আছে: কর্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' (২।৩।৩৩)।

—'জীবই কর্তা, কারণ তাহা হইলেই কর্তার অপেক্ষিত উপায়বোধক বিধিনিষেধ-শাস্ত্র সার্থক হয়। গীতায়ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন: 'তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত' (২।১৮)—হে অর্জুন, তুমি যুদ্ধ কর'। 'তস্মাদুত্তিষ্ঠ' (২।৩৭)—তুমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। 'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' (৯।৩৪)—তুমি আমার চিন্তা কর, আমাকে ভালবাস, আমারই জন্য কর্ম কর ও আমার কাছে নত হও অর্থাৎ অহংকারকে নত কর। 'কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বম্' (৪।১৫)—অতএব হে অর্জুন! তুমি কর্মই কর—ইত্যাদি।

জীবের কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকিলে এ-সব বাক্যের কোন সার্থকতা থাকে না। অতএব জীব স্বতন্ত্র কর্তা এবং তাহা হইলেই স্বকৃত শুভাশুভ কর্মের জন্য জীব দায়ী হইবে। পরাধীন হইলে ভাল মন্দ কর্মের জন্য জীব দায়ী হইতে পারে না—এইটি আমরা প্রথমপক্ষ-রূপে ধরিয়া লইতে পারি।

দ্বিতীয় পক্ষে শঙ্কা হয়: জীব পরতন্ত্র বা পরাধীন কি না? এই পক্ষে বলা যায়, সবই ঈশ্বরাধীন। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত জগতে কিছুই হইতে পারে না। তিনিই সর্বভূতে অন্তর্যামিরূপে বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে চালাইতেছেন। এই বিষয়ে শ্রুতি-বচন দেখা যায়:

'এষ হি এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যম্
এভ্যো লোকেভ্যো উন্নিনীষতে',
'এষ হেবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমধো
নিনীষতে'। (কৌ উপ.—৩।৮)

—অর্থাৎ যাহাকে ঊর্ধ্বতন লোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে দিয়া ঈশ্বর শুভকর্ম করান, আর যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করেন, তাহাকে দিয়া তিনি অশুভ কর্ম করান। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শুভাশুভ কর্ম সব ঈশ্বরই করাইতেছেন। জীব নিতান্তই যন্ত্রবৎ

পরাধীন। অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ও বলিতেছেন—'যঃ পৃথিব্যাম্ তিষ্ঠন্‌· ··· ···পৃথিবীমন্তরো যময়তি' ইত্যাদি (৩।৭।৩।২৩)—যিনি পৃথিব্যাদি সর্ব পদার্থের অন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই অন্তর্যামী।

ব্রহ্মসূত্রও বলিতেছেন, 'পরাত্তু তৎ শ্রুতেঃ' (২।৩।৪১)—জীবের স্বতন্ত্র কর্তৃত্বাদি সিদ্ধ হইতে পারে না। সর্বকর্মাধ্যক্ষ সর্বকর্তা ঈশ্বরের দ্বারাই অবিদ্যাবদ্ধ জীবের কর্তৃত্বাদি সংসার-বন্ধন ও তাঁহার কৃপাতেই জীবের মোক্ষসিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরই কর্তা। গীতাতেও ভগবান্ বলিতেছেন ঃ

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

—হে অর্জুন, সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া স্বমায়াবলে ঈশ্বর সকলকে যন্ত্রারূঢ়বৎ ভ্রামিত করিতেছেন। পুনঃ

'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।'

—অর্থাৎ হে হৃষীকেশ, হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া তুমি আমাকে যেমন করাইতেছ, আমি তেমনি করিতেছি। আমি যন্ত্রমাত্র, তুমিই যন্ত্রী। দুর্যোধনের এই উক্তিটিও লক্ষণীয়। দুর্যোধনের ন্যায় সংসারে অনেকে এইরূপ বলিয়া নিজের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপকর্ম-ফলভোগ পরিহারের নিমিত্ত কোন কর্তৃত্বাভিমানী পুরুষের দ্বারা এই বাক্য কথিত হয় নাই। মূলতঃ ইহা জ্ঞানলাভের ফলে নিজেকে অকর্তারূপে অনুভবকারী কোন জ্ঞানী মহাজনেরই উক্তি।

এইরূপে পূর্বোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-আদির বাক্য-দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, ঈশ্বরই কর্তা এবং জীব নিতান্তই পরতন্ত্র বা পরাধীন।

জগৎ, দেহ, মন ও বুদ্ধি-রূপ উপাধিসমূহে যে পর্যন্ত সত্যত্ব-বুদ্ধি জীবের বিদ্যমান, ততক্ষণ তাহার কর্তৃত্ব-বুদ্ধিও তাহার নিকট সত্য। তখন সে কর্তা ভোক্তা—এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন গুরু, শাস্ত্র ও সৎসঙ্গের মহিমায় ঐ উপাধিগুলি মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, তখন ঐ বিবেকীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরই কর্তা, জীব তাঁহার হাতে যন্ত্রমাত্র। কথঞ্চিৎ শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ, ঈশ্বরই কর্তা ও কারয়িতা—এই তত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না। কর্ম ঈশ্বরের, কর্মফলও ঈশ্বরের, আমি তাঁর দাস, যন্ত্রমাত্র—এই বুদ্ধিতে অহংকার-রহিত হইয়া এবং কর্মফলে আসক্তি ও অভিমান ত্যাগ করিয়া কর্ম করিতে করিতে চিত্ত যতই নির্মল হইতে থাকে, ততই সাধকের স্পষ্ট ধারণা হয় যে, সর্বকর্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্ব ঈশ্বরেরই, জীব মিথ্যাই কর্তৃত্বাভিমান করিয়া থাকে মাত্র। জীব ঈশ্বরের অধীন।

তৃতীয় পক্ষটি হইতেছে অদ্বৈতবাদ। শ্রুতিতে জীব ও পরমাত্মার ঐক্যবোধক বহু বাক্য দৃষ্টিগোচর হয়। যথা—'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি। এই-সকল বাক্যের তাৎপর্য জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্মই। ব্রহ্ম অকর্তা, অভোক্তা, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, আকাশবৎ নির্লিপ্ত ও সর্বগত। ব্রহ্মের সহিত অভেদ বলিয়া জীবও তাহা হইলে অকর্তা, অভোক্তা, নিষ্ক্রিয় ইত্যাদি অবশ্যই হইবেন। সুতরাং জীবের স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র কর্তৃত্বাদির কোন কথাই উঠিতে পারে না। কারণ জীবাভিন্ন ব্রহ্ম কর্তৃত্বাদিরহিত। জীব নিয়ম্য ও ঈশ্বর নিয়ামক—এ-কথা আর বলা চলে না।

এইরূপে জীব-স্বাতন্ত্র্য, জীব-পারতন্ত্র্য ও অদ্বৈতশ্রুতি—এই তিন পক্ষে পরস্পর বিরোধ পরিদৃষ্ট হইতেছে। এখন ইহার সমাধান কি? পৃথক্‌ভাবে এই বচনগুলি গ্রহণ করিলে একের

দ্বারা অপরটি খণ্ডিত হইয়া যায়। অতএব সোপানারোহণন্যায়-ক্রমে ইহাদের সমন্বয় করাই বিধেয়।

আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ এই তিন প্রকার শাস্ত্র-বাক্যসমূহে কোন বিরোধ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, পাঁচজন ব্যক্তি যখন অন্নসম্পাদন করিবার জন্য একত্র হয়, তখন কেহ জল আনিতে যায়, কেহ কাষ্ঠসংগ্রহার্থ অন্যদিকে গমন করে, কেহ স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য সম্মার্জনী সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত এবং দ্রব্যক্রয়ার্থ কেহ যায় দোকানে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গেল—বাহ্যতঃ এইরূপই মনে হয়, কিন্তু তাহা নহে। ঐ পাঁচ ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন কর্ম একই উদ্দেশ্যে সমন্বিত। আমাদের বিচার্য স্থলেও তদ্রূপ।

প্রথম পক্ষে জীব কর্তা। অজ্ঞানী জীবের কর্তৃত্বাদি-বুদ্ধি রহিয়াছে। শুভাশুভ কর্ম সে নিজে ইচ্ছা করিয়াই করে এবং ইহার জন্য সে নিজেই দায়ী ও তাহার কর্মানুসারে ঈশ্বর তাহাকে সুখদুঃখ-ফল প্রদান করিয়া থাকেন। অজ্ঞ জীবের পুরুষকার রহিয়াছে, কিছু করিবার সামর্থ্য তাহার আছে, ইহা সে ভালরূপেই জানে। তাই তাহারই কল্যাণের জন্য শাস্ত্র তাহাকে 'এটা কর', 'ওটা করিও না' ইত্যাদি বিধিনিষেধ বলিয়াছেন। কিন্তু জীবের এই সামর্থ্যও দত্ত সামর্থ্য, নিরঙ্কুশ সামর্থ্য নহে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন কোন বড় রাজকীয় কর্মচারী, তাহার কত ক্ষমতা! কিন্তু এ-সকল ক্ষমতাই তাহার রাজ্যসরকার হইতে প্রাপ্ত। সেই ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে সে অনেক কিছু করিতে পারে, নাও করিতে পারে। যদি ভালভাবে স্বকর্তব্য পালন করে, তবে সে পুরস্কার পায়, আর যদি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে, মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তবে সেও শাস্তি পায়। তেমনি স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে জীব স্বাধীনভাবে কিছু করিতে পারে, নাও করিতে পারে—এটুকু স্বাধীনতা তাহার আছে। অহংকার- এবং কর্তৃত্ববুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব কিছুটা পুরুষকার প্রয়োগ করিতে সমর্থ, তাই শাস্ত্রের বিধিনিষেধ তাহার প্রতি সার্থক।

দ্বিতীয় পক্ষে বলা যায়, বিবেকীর দৃষ্টিতে ঈশ্বরই সর্বকর্তা আর জীব তাঁহার হাতে যন্ত্রমাত্র। যে মিথ্যা অহংকার ও কর্তৃত্ববুদ্ধির জন্য জীব সংসারে আবদ্ধ হইয়া বিবিধ দুঃখানুভব করিতেছে, তাহা দূর করিবার জন্যই পরম-কারুণিক শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ আজ্ঞারূপ শ্রুতি-স্মৃতি-আদি শাস্ত্র বলেন: 'হে জীব, তুমি কর্তা নও, ঈশ্বরই পরম কর্তা। তুমি নিজেকে তাঁহার অধীন জানিয়া তাঁহার শরণাগত হও এবং ভৃত্যবৎ তাঁহার কর্ম করিয়া যাও। তিনিই সব করাইতেছেন, আমি কিছু নই; তিনি যেমন করান, তেমনি করি—এইরূপ ভাব লইয়া কর্ম কর।' নিজের ব্যষ্টি অহংকার খর্ব করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। অধ্যাত্মপথের সাধনাদি সে পরিপূর্ণভাবে করিবে, কিন্তু অহংকার করিবে না। অহংকার আসিলেই সব মাটি হইয়া গেল। আমি এত কর্ম করিয়াছি, এত সাধনা করিয়াছি, তাহার ফল ঈশ্বর দিলেন কোথায়?—এরূপ অভিমান থাকিলে তাহার সর্বকর্ম ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

তাই জীব অহংকার করিবে না। সাধন-ভজন সবকিছুই পূর্ণমাত্রায় করিবে, প্রযত্ন কিঞ্চিন্মাত্রও শ্লথ হইবে না। কিন্তু অহংকার-রূপ মলিনতা তাহার কর্মকে যাহাতে কলুষিত করিতে না পারে, সে-বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে। সে বলিবে—তিনি অন্তর্যামী, তাঁহার ইচ্ছায় সব হইতেছে, আমি কিছুই নই। আমার সাধ্য কি যে কিছু করি। তিনি যতটুকু আমাদ্বারা

করাইয়া লন, তাহাই আমি করিয়া ধন্য হইতেছি মাত্র। ইনি পূর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের সাধক।

তৃতীয় পক্ষ সর্বোত্তম। সাধক অহংকার-রহিত ও ঈশ্বরতৎপর হইয়া সাধন করিতে করিতে যখন সম্পূর্ণ শুদ্ধচিত্ত হন এবং তাঁহার প্রাণে তীব্রভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগে, তখন তিনি গুরুর কৃপায় বেদান্তের মহাবাক্যের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। জীব ও ব্রহ্মপদের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ তখন সাধক বুঝিতে সমর্থ হন এবং জীব ও ঈশ্বরের উপাধি অজ্ঞান ও মায়া মিথ্যা-জ্ঞানে বিচারসহায়ে ত্যাগ করিয়া লক্ষ্যার্থ এক অখণ্ডচৈতন্য-বস্তুতেই তিনি মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ মননের ফলে সংশয় বিপর্যয়াদি সর্ব প্রতিবন্ধ-রহিত হইয়া অখণ্ড এক সচ্চিদানন্দ বস্তু অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারপূর্বক তখন সাধক ধন্য, কৃতকৃত্য হন। তখন তাঁহার আর করিবার বা জানিবার কিছুই বাকি থাকে না। অকর্তাত্মজ্ঞানে তিনি তখন কৃতার্থ। তখন তিনি প্রারব্ধবশে বাহ্যতঃ শরীরমন-সহায়ে সব কিছু করিলেও অন্তরে অহংকার-রাহিত্যবশতঃ কিছুই করেন না এই অবস্থার কথাই ভগবান্ ভাষ্যকার বলিয়াছেন:

'তথা চ কুর্বন্নপি নিষ্ক্রিয়শ্চ যঃ স আত্মবিন্নান্য ইতীহ নিশ্চয়ঃ।'

—অর্থাৎ অদ্বয়াত্মবোধ-সহায়ে যিনি সর্ববস্তু দর্শন করিয়াও তত্ত্বতঃ দর্শন করেন না, তদ্রূপ সব কিছু করিয়াও যিনি তত্ত্বতঃ নিষ্ক্রিয়, তিনিই যথার্থ আত্মতত্ত্ববিৎ, অপরে নহে। ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

গীতাও তত্ত্ববিদের নিশ্চয়-বিষয়ে বলিতেছেন:

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥

—দেখা, শুনা, স্পর্শ করা, গন্ধ লওয়া, ভোজন, গমনাগমনাদি সর্ব কর্ম করিয়াও তত্ত্ববিদ্ দৃঢ়রূপে জানেন যে, 'আমি কিছুই করি না'।

'কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ।'—কর্মে অহংকার-রহিত হইয়া ও ফলের কামনা না রাখিয়া তিনি সর্বকর্মে প্রবৃত্ত হইলেও বস্তুতঃ কিছুই করেন না।

এই দৃঢ় অকর্তাত্মবোধ তাঁহার দৃঢ় অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতেই হইয়া থাকে। তখন তিনি অজ্ঞানাদি সর্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া জীবন্মুক্তি-পদবীতে আরূঢ় হইয়া থাকেন। সর্ব দৃশ্য প্রপঞ্চ তখন তাঁহার নিকট স্বপ্নদৃশ্যবৎ মিথ্যা ও অলীক বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। এক ব্রহ্মই সত্য, সেই ব্রহ্মই আমি এবং সর্বদ্বৈতের একান্ত অভাব—এই জ্ঞানে তিনি তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

এইরূপে দেখা যায়, বিভিন্ন শ্রুতিবাক্যের পরস্পর কোন বিরোধ নাই। সর্ব শ্রুতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরাক্রমে এক অদ্বৈত ব্রহ্মেই সমন্বিত।

জীবন্মুক্তের কর্মধারা

[বিবেকানন্দ-জীবনাদর্শে]

ডক্টর শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

(১)

'বন্ধন' ও 'মুক্তি' পরস্পর সাপেক্ষ। যাঁহার বন্ধনবোধ আছে, তাঁহার মুক্তি-পিপাসাও থাকা স্বাভাবিক। যিনি সকল বন্ধনের অতীত, তিনিই মুক্ত। সংসার-সমুদ্রের দুঃখ-তরঙ্গ মুক্তপুরুষকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না, কিন্তু বদ্ধজীবকে সহজেই বিকল করিয়া ফেলে। বিষয়াসক্তিই জীবের দুঃখময় বন্ধনের প্রত্যক্ষ কারণ। আসক্তি-বশতঃ জীব যে-সকল কর্ম করে, তাহাদের অনুরূপ ফল ভোগ করিবার জন্য তাহাকে বিভিন্ন দেহে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জীব নিজেকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত অভিন্ন মনে করিয়া জন্মে জন্মে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুদ্বারা নিপীড়িত হয়। ইহারই নাম জীবের বদ্ধাবস্থা বা সংসার-দশা। সংসার-দশায় জীবের বিষয়াসক্তি বাসনার সহস্র ফণা তুলিয়া আহার অন্বেষণে বিচরণ করিতে থাকে। আসক্তি-রাক্ষসীর জঠরানল দুষ্পূরণীয়, লক্ষ আহুতিতেও উহা তৃপ্ত হইবার নহে। যতদিন বিষয়াসক্তি, ততদিন সংসারভোগ, ততদিনই বন্ধন। বিষয়াসক্তির মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞান। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই আসক্তির মূলোচ্ছেদ ঘটে, জীবের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়। যেমন আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেইরূপ জ্ঞানের আবির্ভাবে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে জীব তাহার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে। যাঁহার স্বরূপোপলব্ধি ঘটিয়াছে, তিনিই মুক্ত।

জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে সকল দার্শনিকই যে একমত, তাহা নহে। ভারতীয় দর্শনে জীবাত্মার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। চার্বাকদিগের মতে চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই জীবাত্মা। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের মতে জীবাত্মা একটি ক্ষণিক বিজ্ঞানধারা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জৈনদিগের মতে জীবাত্মা ক্ষণিক বিজ্ঞান-ধারার ন্যায় অনিত্য নহে, ইহা নিত্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহা জড় নহে, চেতন। জৈনেরা আত্মার বহুত্বে বিশ্বাসী। প্রত্যেক আত্মাই দেহ হইতে পৃথক্ এবং চৈতন্যবিশিষ্ট। প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত আনন্দের অধিকারী। বদ্ধাবস্থায় কর্ম-মল দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় আত্মার জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ সম্যক্ স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে না। ন্যায়-বৈশেষিক মতাবলম্বীরাও আত্মার বহুত্বে বিশ্বাসী। তাঁহাদের মতেও আত্মা নিত্যদ্রব্য এবং চৈতন্য আত্মার একটি গুণ। কিন্তু তাঁহারা চৈতন্যকে আত্মার স্বরূপগত ধর্ম বা অবিচ্ছেদ্য গুণ বলিয়া মনে করেন না। চৈতন্য আত্মার নিত্য ধর্ম নহে, আগন্তুক ধর্ম, কারণ দেহের সহিত যুক্ত না হইলে আত্মা চৈতন্যের অধিকারী হইতে পারে না। প্রাভাকর-মীমাংসক মতেও আত্মা অচেতন পদার্থের অন্তর্ভুক্ত, বিশেষ কারণে এবং বিশেষ অবস্থায় ইহা চৈতন্যের অধিকারী হইয়া থাকে। ভাট্ট-মীমাংসকেরা বলেন যে, আত্মা স্বরূপতঃ চেতন পদার্থ, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ ইহার স্বরূপ কিয়ৎপরিমাণে আবৃত হইয়া থাকে। সাংখ্যমতে চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ। ইহা আত্মা-নামক কোন দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম নহে। প্রত্যেক আত্মাই নিত্য, শুদ্ধ, সর্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ। সাংখ্যেরা বলেন যে, আত্মা বা

পুরুষ বহু এবং প্রত্যেক পুরুষই সুখ-দুঃখের অতীত। অদ্বৈত বেদান্তমতে আত্মা এক এবং আনন্দস্বরূপ। অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, আত্মা বা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। সাধারণতঃ যাহাকে জীবাত্মা বলা হয়, তাহা ব্রহ্মই। ব্রহ্ম বা আত্মা বিষয়ীও নহেন, বিষয়ও নহেন। আত্মার মধ্যে 'আমি-আমার' ভেদ নাই। আত্মা সর্ববিধভেদরহিত অখণ্ডচৈতন্য-মাত্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদের মতে আত্মা ব্যক্তিত্ববিহীন নির্বিশেষ চৈতন্যমাত্র নহে, আমিত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞাতা। আত্মা বিভু নহে, অণু। চৈতন্য আত্মার আগন্তুক ধর্ম নহে, নিত্য ধর্ম। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন যে, জীব যতদিন দেহ ধারণ করিয়া থাকে, ততদিন তাহার স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে না, জীবদ্দশায় কেহ মুক্তির আস্বাদন লাভ করিতে পারে না, মুক্তি ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ; সাধনপ্রভাবে কর্মপ্রসূত দেহ বিনষ্ট হইলে মুক্তির আস্বাদন লাভ হয়। এই প্রকার মুক্তির নাম 'বিদেহমুক্তি'। বৈষ্ণবগণ বিদেহমুক্তিতে বিশ্বাসী। নৈয়ায়িক বৈশেষিক এবং প্রাভাকর-মীমাংসক মতাবলম্বীরাও বিদেহ-মুক্তিতে আস্থাবান্। আচার্য শঙ্কর বলেন যে, দেহ বিনষ্ট হওয়ার পূর্বেও মুক্তির উপলব্ধি ঘটিতে পারে। জীবদ্দশায় যে মুক্তিবোধ ঘটে, ভারতীয় দর্শনে তাহাকে সাধারণতঃ সদেহমুক্ততা বা জীবন্মুক্ততা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। প্রাচীন উপনিষদ্-গ্রন্থাবলীতে, বৌদ্ধ-শাস্ত্রে এবং সাংখ্যকারিকায় 'জীবন্মুক্তি' শব্দটির উল্লেখ নাই। কিন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬।১৪।১২) শাঙ্করভাষ্য পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উপনিষদে জীবন্মুক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে জীবন্মুক্তি স্বীকার্য। জৈনেরাও জীবন্মুক্তিতে বিশ্বাসী। সাংখ্যেরাও জীবন্মুক্তির সমর্থক।

আচার্য শঙ্করের গ্রন্থে 'জীবন্মুক্তি' শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও তিনি যে 'সদেহমুক্ততা' সমর্থন করেন, সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। কর্ম বিনষ্ট না হইলে মুক্তির আশা নাই, ইহা সকলেরই স্বীকার্য; জ্ঞানের ফলে কর্ম বিনষ্ট হয়, ইহাও স্বীকার্য; কিন্তু জ্ঞানের সাহায্যে সকল প্রকার কর্মই বিনষ্ট করা যায় কিনা, তাহা ধীরভাবে চিন্তনীয়। প্রারব্ধ, সঞ্চিত এবং সঞ্চীয়-মান ভেদে কর্ম তিন প্রকার। অতীত জীবনে কৃত কর্মসমূহের মধ্যে যে যে কর্ম বর্তমান জীবনে ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সেই কর্মকেই **প্রারব্ধ কর্ম** বলা হইয়া থাকে। পূর্ব-জন্মকৃত যে-সকল কর্ম এখনও ফলদান করিতে আরম্ভ করে নাই, কিন্তু ভবিষ্যৎ কালে ফলপ্রসূ হইবার অপেক্ষায় আছে, সেই-সকল কর্মের নাম **সঞ্চিত কর্ম**। এতদ্ব্যতীত যে-সকল কর্ম ইহ জীবনেই প্রতিদিন সঞ্চিত হইতেছে, সেগুলির নাম **সঞ্চীয়মান কর্ম**। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সঞ্চিত কর্ম বিনষ্ট হয় এবং সঞ্চীয়মান কর্মের গতি রুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম প্রতিরুদ্ধ হয় না। প্রারব্ধ কর্ম নিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায়। তীর হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে ব্যাধ যেমন আর তাহার গতি সংযত করিতে পারে না, সেইরূপ যে কর্ম ফলদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে কেহ নিবৃত্ত করিতে পারে না। প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাধ তাহার তূণে যে-সকল তীর সাজাইয়া রাখে, সেগুলির সহিত সঞ্চিত কর্মের তুলনা করা যায়। ব্যাধের পক্ষে তূণস্থ তীর নষ্ট করিয়া ফেলা যেমন সহজ, জ্ঞানীর পক্ষে জ্ঞানদ্বারা সঞ্চিত কর্ম নষ্ট করাও সেইরূপ সুসাধ্য। ব্যাধ যে-তীরটি তূণ হইতে তুলিতেছে, তাহার সহিত সঞ্চীয়মান কর্মের তুলনা করা হইয়া থাকে। উপস্থিত ক্ষেত্রে তীরটির প্রয়োগ অসঙ্গত হইবে মনে করিলে ব্যাধ যেমন সেটি

তূণে রাখিয়া দিতে পারে, জ্ঞানী ব্যক্তিও সেইরূপ সঞ্চীয়মান কর্মের অভ্যুদয় রোধ করিতে পারেন। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের প্রভাব হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই। প্রারব্ধ কর্ম সম্পূর্ণ ফল প্রদান না করিয়া শুধু জ্ঞানপ্রভাবে বিনষ্ট বা রুদ্ধ হয় না। জীবের দেহ তাহার প্রারব্ধ কর্মের ফল। জীবের সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান কর্ম বিনষ্ট হইলেও যতদিন প্রারব্ধ কর্মের প্রভাব থাকে, ততদিন তাহার দেহ বিনষ্ট হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে কর্ম বিনষ্ট হয়, ইহা সত্য; কিন্তু জীবের জ্ঞান-লাভ হইবামাত্রই যে তাহার দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে। আচার্য শঙ্কর শারীরকভাষ্যে তত্ত্বজ্ঞানীর দেহাবস্থান-সম্ভাবনা বুঝাইতে গিয়া দুইটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন: একটি কুলালচক্রের গতির উপমা, অপরটি চক্ষুরোগগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বিচন্দ্র-দর্শনের উপমা। কুম্ভকার ঘূর্ণায়মান চক্রের সাহায্যে মৃত্তিকাদ্বারা ঘটাদি নির্মাণ করিয়া থাকে। ঘটাদি নির্মাণের উদ্দেশ্যে সে যে-চক্রটিকে একবার জোরে ঘুরাইয়া দেয়, নির্মাণকার্য শেষ হইয়া গেলেও সেই চক্রের গতি কিছুক্ষণ চলিতে থাকে। ক্রমাগত ঘূর্ণনের ফলে চক্রে সঞ্চারিত বেগ যখন নিঃশেষ হইয়া যায়, তখন আর চক্রটি ঘোরে না। ঘটনির্মাণকার্য শেষ হইয়া গেলেও যেমন উক্ত কার্যের উদ্দেশ্যে কুম্ভকার কর্তৃক সঞ্চারিত বেগের প্রভাবে চক্রটি কিয়ৎকাল সক্রিয় অবস্থায় থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের পরেও জীবের দেহ তাহার প্রারব্ধকর্মের প্রভাবে কিছুদিন টিকিয়া থাকে, প্রারব্ধের ফলভোগ শেষ হইলেই দেহটি চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। তত্ত্বদর্শনের পরেও জীব দেহে অবস্থান করিতে পারে। যিনি তত্ত্ব-দর্শন করিয়াছেন, প্রারব্ধপ্রভাবে তাঁহাকেও জগৎ-বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হইতে হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জগৎবৈচিত্র্যে আস্থা স্থাপন করেন না। চক্ষুরোগবশতঃ কাহারও দ্বিচন্দ্র-দর্শন ঘটিলে তিনি যেমন উহাকে ভ্রান্তিই মনে করেন, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও জগৎকে সেইরূপ ভ্রমমাত্র মনে করিয়া থাকেন। যেমন একাধিক চন্দ্র প্রতিভাত হইলেও স্বীকার্য নহে, সেইরূপ ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থ দৃষ্ট হইলেও সত্য নহে। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সদেহ অবস্থায় জাগতিক বস্তুর সহিত যুক্ত হইলেও তাঁহার বন্ধন ঘটে না, কারণ দৃশ্যবস্তুর প্রতি তাঁহার কোন আসক্তি নাই।

বৌদ্ধেরা যাঁহাদিগকে 'অর্হৎ' বলেন, তাঁহারা মুক্ত পুরুষ। অর্হৎপদ লাভ হইলেই যে দেহ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে। যতদিন প্রারব্ধ কর্মের ফল নিঃশেষ না হয়, ততদিন অর্হৎকেও দেহে অবস্থান করিতে হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত অর্হৎ মোগাল্লানের কাহিনী হইতে জানা যায় যে, জীবন্মুক্ত দশাতেও তাঁহার দেহে পূর্বজন্ম-কৃত পিতৃহত্যাপাতকের প্রভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তস্করেরা তাঁহার দেহটিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার অস্থিসমূহ চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রারব্ধের ফল প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভুগিতে হয়। প্রারব্ধের প্রভাবে দেহ লাঞ্ছিত, পীড়িত কিংবা আহত হইতে থাকিলে সাধারণ মানুষ উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অর্হৎ বা জীবন্মুক্ত কখনও ক্ষুব্ধচিত্ত হন না।

যাঁহার কামনা-বাসনা নাই, যিনি আসক্তি-রহিত, তিনিই জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্ত ব্যক্তি স্থিতধী হইবেন, ইহাই স্বাভাবিক। গীতায় স্থিতধী ব্যক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, 'স্থিতধী' শব্দটি জীবন্মুক্তেরই নামান্তর। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সকল কামনা বর্জন করিয়া আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকেন। তিনি দুঃখে উদ্বেগশূন্য এবং সুখে নিঃস্পৃহ। তাঁহার চিত্তে অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধের স্থান নাই। তিনি সকল বিষয়েই

মমতাহীন। অনুকূল বস্তু লাভ হইলে তাঁহার সন্তোষ জন্মে না, প্রতিকূল বস্তু উপস্থিত হইলেও তাঁহার অসন্তোষ ঘটে না। তিনি রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করেন না। কচ্ছপ যেমন করচরণাদি অঙ্গসকল দেহের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, তিনিও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতে লীন করিয়া রাখেন। এইরূপ কামনাবাসনাহীন আত্মনিষ্ঠ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির নিজ প্রয়োজনে কিছুই করণীয় নাই; তথাপি গীতাকার তাঁহাকে কর্ম হইতে বিরত থাকিতে বলেন নাই। জীবন্মুক্তের পক্ষে কর্ম করা না করা উভয়ই সমান। কিন্তু তিনি যদি কর্মত্যাগ করেন, তাহা হইলে সমাজ ক্ষতি-গ্রস্ত হইবে। সমাজের সাধারণ মানুষ বিষয়া-সক্ত, স্বার্থান্ধ এবং কর্তৃত্বাভিমানী; তাহারা সকাম কর্মে লিপ্ত হইয়া নিজ নিজ বন্ধন সৃষ্টি করে। মানুষ যে নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম করিতে পারে, ইহা তাহাদের কল্পনার অতীত। শুধু জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে পারেন। গীতার মতে (১) সকল কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, (২) ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জন এবং (৩) কর্তৃত্বাভিমানত্যাগ—এই তিনটি নিষ্কাম কর্মের লক্ষণ। সাধারণ মানুষ আসক্তিবশতঃ যেরূপ নিপুণভাবে কর্ম করে, জীবন্মুক্ত স্বভাবতঃ অনাসক্ত হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য সেইরূপ নিখুঁতভাবে কর্ম করিতে পারেন। তাঁহার কর্ম দেখিয়া লোকে বুঝিতে পারে যে, মানুষ নিজের কর্মকে নিষ্কাম করিয়া ভাগবত কর্মে পরিণত করিতে পারে। জীবন্মুক্তের কর্মের ফল লোকসংগ্রহ বা ধর্ম রক্ষা। জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যদি নিজ নিজ জীবনদ্বারা নিষ্কাম কর্মের আদর্শ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলে সমাজের সাধারণ মানুষ আদর্শচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হইবে। জীবন্মুক্তের কোন ব্যক্তি-গত স্বার্থ নাই, কারণ তিনি সিদ্ধপুরুষ। গীতার মতে তাঁহার কর্ম করিতে বাধা নাই। তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে কর্ম করিয়া যাইতে পারেন, কারণ নিষ্কাম কর্ম বন্ধনের জনক নহে। জীবন্মুক্ত সুখে-দুঃখে এবং লাভ-লোকসানে সমভাবাপন্ন। সাধারণ মানুষ ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্তের ন্যায় নিষ্কাম কর্ম করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদেরও চিত্ত-শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। মনুষ্য সমাজে জীবন্মুক্তই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। লোকে সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আদর্শ ই অনুসরণ করে। জীবন্মুক্তের কর্ম জনসাধারণকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত সমাজের পূজ্য। সামাজিক জীবনে জীবন্মুক্ত কর্মীর অবস্থিতি একান্ত কাম্য।

কিন্তু যিনি সুখ-দুঃখের অতীত, যিনি পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে অবস্থিত, যিনি সর্বতোভাবে স্বার্থ-বুদ্ধিহীন, তাঁহার পক্ষে সামাজিক জীবনের কার্য-কলাপের মধ্যে প্রবেশ করা কি সম্ভবপর? জীবন্মুক্ত ব্যক্তি কি পরের দুঃখে দুঃখী এবং পরের সুখে সুখী হইতে পারেন? তাঁহার হৃদয়ে কি সহানুভূতির স্থান আছে? গীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ জীবন্মুক্তকেও সামাজিক কার্যকলাপে প্রবেশ করিতে বলিয়াছেন। জ্ঞানী ও জীবন্মুক্তের সংসার-যাত্রার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার নিজের ও রাজর্ষি জনকের আচরণ উল্লেখ করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই নির্লিপ্ততা প্রতিপন্ন হইয়াছে। গীতায় জন-সাধারণের প্রতি জীবন্মুক্তের সহৃদয়তা ও সহানু-ভূতির স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু 'যোগবাশিষ্ঠ'-কারের মতে জীবন্মুক্ত স্বরূপতঃ সামাজিক কার্যকলাপের প্রতি নির্লিপ্তভাবাপন্ন হইলেও ব্যাবহারিক জীবনে সমাজের দশজনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারেন। তিনি পরের সুখে সুখীর ন্যায় এবং পরের দুঃখে দুঃখীর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি বালকদিগের সহিত বালকের মতো ব্যবহার করেন, আবার

জ্ঞানীর সহিত তত্ত্বজ্ঞের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। সমাজের সকল স্তরেই তিনি প্রবেশ করিতে পারেন; কোন অবস্থাতেই তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য বা সমত্ব নষ্ট হয় না।

(২)

স্বামী বিবেকানন্দের আচরণ অনেকাংশে যোগবাশিষ্ঠে বর্ণিত জীবন্মুক্তের আচরণের অনুরূপ। 'জীবন্মুক্তের গীতি'তে স্বামীজী তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 'আমি সেই, সোঽহম্'। তিনি বলিয়াছেন যে, আমি দেশ-কালের অতীত, কার্য-কারণের অতীত, মন-বুদ্ধির অগোচর। আমি সাক্ষিস্বরূপ:

'দেশ আর কাল, আর কার্য ও কারণ,
এ সকলি হয় মাত্র বহিরাবরণ।
ইন্দ্রিয়-মনের পারে মোর অবস্থান।
আমি দ্রষ্টা এ বিশ্বের সাক্ষী সে মহান্!'

কিন্তু সামাজিক জীবনে তিনি শুধু সাক্ষী হইয়া থাকেন নাই। অজ্ঞ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, রুগ্ন ভারতবাসী, পতিত ভারতবাসীর দুঃখে বার বার তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তিনি ভারতের যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, 'হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র অজ্ঞ ও অত্যাচার-পীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক। আমি তোমাদের নিকট গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি।' স্বামীজী সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু যে-সন্ন্যাস হৃদয়কে পাষাণে পরিণত করে, তিনি সেই সন্ন্যাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। একবার কাশীতে প্রমদাদাস মিত্রের বাটীতে অবস্থানকালে ঠাকুরের পরমভক্ত বলরামবাবুর সঙ্কটাপন্ন অসুখের সংবাদ পাইয়া স্বামীজী খুব বিষণ্ণ হইয়া পড়েন। তাঁহাকে কাতর দেখিয়া প্রমদাবাবু বলিয়াছিলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এত শোকাকুল হওয়া কি উচিত?' ইহার উত্তরে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'বলেন কি? সন্ন্যাসী হয়েছি ব'লে কি হৃদয়টা বিসর্জন দিয়েছি?' স্বামীজী ছিলেন শঙ্করের ন্যায় জ্ঞানী এবং বুদ্ধের ন্যায় হৃদয়বান্। বাহিরে তিনি ছিলেন কর্মবীর, অন্তরে তিনি ছিলেন আর্তের দরদী। তিনি বলিয়াছেন, 'এ জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজার হাজার জন্ম নিতে হয়, তাও নেব; তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা ক'রব।'

একবার স্বামীজী যখন শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট বেদ-বেদান্ত ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আলোচনা-স্থলে উপস্থিত হন। গিরিশবাবু বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন, তত্ত্বালোচনায় তেমন মন দিতেন না। তাই স্বামীজী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'কি জি. সি., এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু নিয়েই দিন কাটালে!' ইহা শুনিয়া গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার ও-সব দরকার নাই, ঠাকুরের কৃপাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। গিরিশবাবু জানিতেন যে, পাণ্ডিত্যই স্বামীজীর প্রধান পরিচয় নহে, তাঁহার প্রধান পরিচয় তাঁহার মহাপ্রাণতা, তাঁহার জীবদুঃখকাতরতা। সেইদিন গিরিশবাবু যখন দেশের হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, মহাপাতকাদির কথা স্বামীজীকে নূতন করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তখন স্বামীজী অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন কাম-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী, কিন্তু স্বদেশের নারীসমাজের দুঃখদুর্দশা এবং ভারত-বাসীর দারিদ্র্য ও দুরবস্থার কথা তিনি কখনও

বিস্মৃত হন নাই। তিনি যখন গভীরভাবে মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করিতেন, তখন আর তাঁহাকে নির্লিপ্ত পুরুষ বলিয়া মনে হইত না। তাঁহার অতুলনীয় জীবপ্রেম তাঁহাকে সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিতে দিত না, বার বার সমাজের ক্ষতস্থানে টানিয়া আনিত। স্বামীজী শুধু বেদ-বেদান্তের অনুশীলন করেন নাই, জীবসেবাতেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শুধু বেদান্ত নহে, সমাজসেবাও তাঁহার প্রাণের কথা। গিরিশবাবুর মুখে সমাজের দুরবস্থার কথা শুনিয়া তিনি বহুক্ষণ নীরব থাকেন। মানুষের দুঃখ-কষ্টের চিন্তারাশি তাঁহার মনে সেবাকার্যের সংকল্প দৃঢ় করে, জনৈক শিষ্যকে ডাকিয়া তিনি তখনই তাহাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহিত করেন।

স্বামীজী তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও অনেক সময় বালকবৎ আচরণ করিতেন। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া তিনি যখন বেলুড় মঠে বা বলরাম-মন্দিরে থাকিতেন, তখন কখন কখন তাঁহার জননী তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। জননী দ্বিতলে উঠিয়া 'বিলে' বলিয়া ডাকিলেই তিনি ছোট ছেলের মতো ছুটিয়া আসিতেন। ১৯০০ খৃঃ ৯ই ডিসেম্বর রাত্রিতে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা যখন বেলুড় মঠের গেট বন্ধ করিয়া দিয়া ভোজনগৃহে আহার করিতে বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে স্বামীজীকে অপ্রত্যাশিতভাবে সাহেবের বেশে তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইতে দেখিয়া তাঁহারা অবাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। স্বামীজী বালকের মতো উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, 'বাইরে থেকে ার ঘণ্টা শুনে ভাবলুম যে, যদি তাড়াতাড়ি াই, তাহলে রাত্রে আর খেতে পাব না। তাই চিল টপকে এসে পড়লুম। বড় খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দাও।' মায়াবতীতে অবস্থানকালে একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের বিলম্ব দেখিয়া শিষ্যদের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহার নিকট আহার্য আনীত হইলে তিনি বালকের ন্যায় অভিমানভরে বলিয়াছিলেন, 'এ-সব এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি খাব না।' সেবক শিষ্য তাঁহার প্রকৃতি জানিতেন। অভিমান অন্তর্হিত হইলেই স্বামীজী আহার করিতে বসিবেন—এই আশায় তিনি নীরবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার আশা নিষ্ফল হয় নাই, কিছু পরে স্বামীজী আহার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। খাইতে খাইতে স্বামীজী হাসিয়া শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, 'আমি কেন চটেছিলুম জানিস? খুব খিদে পেয়েছিল কিনা, তাই!'

স্বামীজী নিম্নশ্রেণীর লোকদের সহিত এমনভাবে মিশিতেন যে, তাহারা ভাবিতেই পারিত না যে, তাঁহার সহিত তাহাদের বিশেষ দূরত্ব আছে। তিনি যখন পরিব্রাজক-অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহাকে দিন-মজুরদের সহিত বসিয়া গল্প করিতে এবং তাহাদের সহিত তামাক খাইতে দেখা গিয়াছে। একবার তিনি হিমালয়ে পাহাড়ীদের সঙ্গে 'দেবতার ভর' দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রবল যুক্তিবাদী হইয়াও পাহাড়ীদের অনুরোধে উপদেবতাবিষ্ট লোকটির ভূত ছাড়াইবার জন্য তাহার মাথায় হাত দিয়া কিছুক্ষণ জপও করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে মন্মথ ভট্টাচার্যের গৃহে অবস্থানকালে একদিন নিজ জননীর মৃত্যুস্বপ্ন দেখিয়া স্বামীজী চিন্তিত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে তিনি নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ভূত-ভবিষ্যদ্‌দর্শী এক পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তির নিকট গিয়াছিলেন। পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তির উক্তির সত্যতাও প্রমাণিত হইয়াছিল। জননী সুস্থই ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, স্বামীজী অবশ্য এই সিদ্ধাই-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তিনি বলিতেন, 'মহামায়ার রাজ্যে এসে

জগৎ-ভেলকির সঙ্গে সঙ্গে কত কি ভেলকিই না দেখলুম।' দর্শনের রাজ্যে স্বামীজী বেদান্ত-কেশরী। তিনি বার বার বলিয়াছেন, 'আত্মজ্ঞানের চেয়ে বড় আর কিছুই নাই। আত্মা ব্রহ্ম। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই।' এইরূপ গভীর অধ্যাত্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াও স্বামীজী সমাজের দশজনের একজন হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি ছিলেন একদিকে আদর্শ জ্ঞানী, অপর দিকে আদর্শ কর্মী। তাঁহার জীবনটি ছিল গভীর অধ্যাত্মজ্ঞানের সহিত নিপুণ কর্মতৎপরতার মিলনক্ষেত্র। স্বামীজীর ধর্মপরায়ণতা সুবিদিত, কিন্তু ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা যেমন সর্বদা গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন, স্বামীজী সেইরূপ থাকিতেন না। তিনি যখন ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করিতেন, তখন তাঁহার গাম্ভীর্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হইত, আবার তিনি যখন বক্তৃতার শেষে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত হাস্য-পরিহাসে যোগদান করিতেন, তখন তাঁহাকে একটি হাস্য-চপল মানুষ বলিয়া মনে হইত। তিনি ধর্মপ্রচারক হইয়াও সাধারণ লোকের মতো হাসি-তামাসা করেন কেন, বিদেশী ধর্মযাজকেরা ইহা জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, 'আমি আনন্দের সন্তান; বিরসমুখে থাকব কেন?'

স্বামীজী নিজের জন্য কিছুই চাহিতেন না। কত মূল্যবান্ উপঢৌকন যে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। মহীশূরের রাজা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সামান্য একটি চুরুট কিংবা ধাতুসম্পর্কবিহীন একটি হুঁকো ছাড়া কোন মূল্যবান্ জিনিস গ্রহণ করাইতে পারেন নাই। স্বামীজী কাজ করিতেন পরের জন্য। তিনি তাঁহার কোন কোন শিষ্যকে সাধন-ভজন ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া জীবের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে বলিতেন। তাঁহার কাছে যে অর্থ আসিত, তাহার অধিকাংশ তিনি জন-হিতকর কার্যে ব্যয় করিতেন। সঙ্ঘ-গঠন, সেবাশ্রম-স্থাপন প্রভৃতি কার্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি ভক্তদের নিকট হইতেই সেজন্য অর্থ গ্রহণ করিতেন। বস্তুতঃ পরের নিকট হইতে কিছু পরিগ্রহ করার কথাটা তাঁহার সম্বন্ধে খাটে না, কারণ তিনি কাহাকেও পর মনে করিতেন না। তিনি ছিলেন আত্ম-জ্ঞানী। আত্মাই তাঁহার ঈশ্বর। তিনি নিজের ভিতরে যে-ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সকল জীবের মধ্যেও তাঁহাকেই দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জীবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। পরের মঙ্গলের মধ্যেই নিজের মঙ্গল। জীব-সেবা দ্বারাই সকল বন্ধন অতিক্রম করা যায়। শিবজ্ঞানে জীবসেবা নিষ্কর্মার ঈশ্বরধ্যান হইতে ভাল। অপরের দুঃখকষ্টের কথা ভুলিয়া গিয়া নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হওয়া স্বার্থপরতার লক্ষণ। স্বামীজী বলিতেন, 'নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তি-কামনাও তো মহা স্বার্থপরতা। ফেলে দে মুক্তি-ফুক্তি; আমি যে-কাজে লেগেছি, সেই কাজে লেগে যা।' যিনি জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি যদি কর্ম ত্যাগ করিয়া অরণ্য-বাসী কিংবা গুহাশ্রয়ী হন, তিনি যদি সমাজ বর্জন করিয়া নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন, তিনি যদি অপরের কথা ভুলিয়া শুধু নিজের মুক্তি লইয়াই তৃপ্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও স্বার্থপর বলিতে হইবে। অপরে সমাজের সেবা করিবে নিজের মুক্তির জন্য, জীবন্মুক্ত সমাজের সেবা করিবেন তাঁহার স্বরূপোপলব্ধির সার্থকতার জন্য। যিনি সকলের মধ্যে নিজেকে দেখিতে পান না এবং নিজের মধ্যে সকলকে দেখিতে পান না, তাঁহার জীবন্মুক্তির অভিমান ভ্রান্তিমাত্র প্রহ্লাদ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন :

প্রায়েণ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামাঃ
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।

—প্রায়ই দেখা যায় যে, মুনিরা মৌনাবলম্বন করিয়া নির্জনে তপস্যা করেন। শুধু নিজের মুক্তিই তাঁহাদের কাম্য। তাঁহারা পরের জন্য ভাবেন না, আপনাদিগকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন। এই শ্রেণীর জ্ঞানী ব্যক্তি-গণকে সমাজের আদর্শ বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতিই মানবজাতির আদর্শ। তাঁহারা তত্ত্বদর্শী হইয়াও সমাজ-কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিজ নিজ কর্ম করিয়া গিয়াছেন।

এই যুগে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একটি নিত্যমুক্ত-জীবনাদর্শ এবং সর্ববিধ ভয় ও মোহের অতীত। তিনি আত্মাকেই তাঁহার স্বরূপ বলিয়া জানিতেন। তাঁহার হৃদয়ে ছিল সর্বাবগাহী আত্মীয়তা। তিনি স্বয়ং মুক্ত হইয়া সকলকে নিজের আত্মীয়বোধে ভালবাসিতেন এবং সকলের হিতের জন্য—মুক্তির জন্য অক্লান্তভাবে কর্ম করিতেন। পৃথিবীর সম্মুখে তিনি কর্মীর যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আলোকে ভবিষ্যৎ সাধকদিগের সাধনপথের অন্ধকার ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে, সন্দেহ নাই।

উনিশ শতকের নবজাগরণে

রাজা রামমোহন ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত

সূচনা

ভারতে ইংরেজ আগমনের কালে সর্বব্যাপী প্রশাসনিক অরাজকতা, রাজশক্তির শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমাজ ও ধর্ম অবিরাম আত্মরক্ষা করবার প্রয়াসের ফলে পৌরোহিত্য-শক্তির নির্মম কবলে আবদ্ধ হয় এবং সমস্ত গতিশীলতা হারিয়ে একটি বিপুল অচলায়তনে পরিণত হয়। বিজয়ী ইংরেজের সভ্যতা ও শক্তির সঙ্গে প্রথম সংঘাতে তাই তার প্রতিরোধের শক্তি ছিল না। সেজন্য তখনকার প্রখ্যাত সমাজশাস্ত্রকার কার্ল মার্ক্স্ মনে করেছিলেন যে, ব্রিটিশ সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতাকে গ্রাস করতে বসেছে; 'ভারতে ইংরেজ-শাসন' সম্বন্ধে এক নিবন্ধে (১৮৫৩ খৃঃ) তাই তিনি মন্তব্য করেন, 'যে-সব জাতি ভারতে অভিযান করেছে, তার মধ্যে ব্রিটিশ সভ্যতাই ভারতীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নত, ব্রিটিশরা ভারতের গ্রাম্য-সমাজের ভিত ভেঙে দিয়েছে, শিল্প-বাণিজ্য উচ্ছেদ করেছে এবং ভারতীয় সভ্যতায় যা কিছু মহৎ বা গৌরবের বস্তু, তা সমস্তই ধ্বংস করেছে।' মার্কসের এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী ইতিহাসে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ব্রিটিশ সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার বহিরঙ্গে অনেক পরিবর্তন সাধন করলেও তার মূলোচ্ছেদ করতে পারেনি; ভারতের জাতীয় জীবনের মধ্য হ'তে প্রতিরোধ অচিরেই জাগল। প্রথমে নবজাগ্রত ভারতীয় চেতনা বিদেশী শক্তিকে সম্প্রসারণ হ'তে বাধা দিল, পরে বিদেশী সভ্যতার সম্পদ্টুকু আত্মসাৎ ক'রে সমৃদ্ধতর হ'ল এবং বিদেশী সভ্যতা ও সমাজকেই প্রভাবিত করতে ধাবিত হ'ল। আমাদের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে এই প্রথম যুগকে 'সংস্কারের যুগ'

এবং দ্বিতীয় যুগকে 'সমন্বয়ের যুগ' ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে। প্রথম যুগকে আবার তিনটি বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করা যাক: (১) রামমোহনের যুগ, (২) ইয়ং বেঙ্গলের যুগ, (৩) দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের যুগ।

সংস্কার-যুগ

ইংরেজ-শক্তির সংঘাতে ভারতে যে অন্তর্বিপ্লব ঘটে, তার প্রথম মূর্ত প্রকাশ—রাজা রামমোহন। এই আশ্চর্য বিরাট পুরুষের ছিল অসাধারণ ধীশক্তি, মননশীলতা ও বিভিন্ন-শাস্ত্রের জ্ঞান। ভাবলে আশ্চর্য বোধ হয়, সেই অচলায়তন সমাজের মধ্যে বর্ধিত হয়ে তিনি কেমন ক'রে মুক্ত দৃষ্টি, শাণিত যুক্তি ও তীক্ষ্ণ বিচারক্ষমতা ও গতিশীলতা পেলেন। তিনি একদিকে দাঁড়ালেন আমাদের পুরোহিত-শক্তি, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে; অপরদিকে দাঁড়ালেন খ্রীষ্টান মিশনরীগণের ছলেবলে কৌশলে আমাদের ধর্ম ও সমাজকে গ্রাস করবার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে; সর্বোপরি দাঁড়ালেন সম্প্রসারণশীল পশ্চিমী জড়বাদের বিরুদ্ধে।

রামমোহন হিন্দু-সমাজের মধ্যে থেকেই হিন্দুধর্ম ও সমাজকে সমালোচনা করেছেন ও সংস্কৃত করতে চেয়েছেন। কিন্তু ডিরোজিওর নেতৃত্বে 'ইয়ং বেঙ্গল' তা ক'রল না। তারা নির্বিচারে ভারতীয় সভ্যতার সবটুকু বর্জন করতে চাইল এবং বিদেশী সভ্যতার ভালোর সঙ্গে মন্দটুকুও গ্রহণ করবার অভিপ্রায় ক'রল। নিজেদের এরা যুক্তিবাদী ব'লে ঘোষণা করলেও শুধু ধর্মান্ধতা নয়, মূলতঃ সর্বপ্রকার ধর্মের উপরই এরা আঘাত করবার প্রয়াস পেল। ফলে এদের মধ্যে প্রতিভার বরপুত্রের দর্শন মিললেও এরা মনুষ্যত্বের অবদানে দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারলো না। এবং স্বধর্ম- ও স্বজাতি-ত্যাগী এদের ডাকে দেশও সাড়া দিল না। এদের প্রভাব তাই অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

পৃথক্ ব্রাহ্মধর্ম-সংস্থাপক দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সহগামী কেশবচন্দ্র এই ইয়ং বেঙ্গলের নাস্তিকতা ও অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দেশকে স্থূল জড়বাদের কবল থেকে রক্ষা করলেন। সেজন্য ইতিহাসে এঁদের আবির্ভাবের যথেষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। সে-বিষয়ে রামমোহনের প্রবর্তিত ধারাকে এঁরা পুনঃ প্রবর্তিত করলেন। কিন্তু এদের সঙ্গে রামমোহনের কিছু কিছু পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। প্রধান পার্থক্যগুলি নিম্নোক্তরূপ:

(১) প্রথমতঃ রামমোহন কখনও হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করেননি। তিনি গোঁড়ামি, কুসংস্কার প্রভৃতি রোধ করবার উদ্দেশ্যে অদ্বৈতব্রহ্মবাদ প্রচার করতে চেয়ে ব্রহ্মসভা স্থাপন করেছেন বটে, কিন্তু কখনও নিজেকে হিন্দু-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেননি। কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নেয়।

(২) দ্বিতীয়তঃ রামমোহন কুসংস্কার দূর করবার অভিপ্রায়ে মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেছিলেন, এ-কথাই সর্বজনবিদিত; কিন্তু এ-বিষয়ে অনেক সময়ই তাঁকে ভুল বোঝা হয় ও ভুল-বোঝানো হয়। রামমোহন খ্রীষ্টান মিশনরীগণের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর 'The Brahminical Magazines'এ 'The Vedantic Doctrines Vindicated' —এই শিরোনামায় যে প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন, সেগুলিতে তিনি ভ্রান্ত মূর্তিপূজা থেকে প্রকৃত মূর্তিপূজার পার্থক্য প্রদর্শন করেন। মূর্তির মাধ্যমে যেখানে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়, তা প্রকৃত মূর্তিপূজা; আর যখন মূর্তিকেই ঈশ্বর জ্ঞান করা হয়, তখন তা ভ্রান্ত মূর্তিপূজা।

এবং সেই তখনকার দিনে যখন সমাজ-বিজ্ঞানের জন্ম হয়নি, তিনি সমাজতাত্ত্বিক বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে সিদ্ধান্ত দেন—ভ্রান্ত মূর্তিপূজার প্রসার আমাদের দেশে অধিক দিনের নয়। মূর্তিপূজার পক্ষে তাঁর যুক্তিগুলি নিম্নোক্ত প্রকার: (ক) মূর্তিপূজা অশাস্ত্রীয় নয় ('নামরূপে ব্রহ্মের আরোপ করিয়া বর্ণনা করা অশাস্ত্রীয় নহে'), (খ) অধিকারি-ভেদে মূর্তিপূজার প্রয়োজন আছে ('অজ্ঞানীর মনস্থিরের জন্য বাহ্য-পূজাদির কল্পনা করা গিয়াছে'), (৩) মূর্তিপূজা ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপন্থী নয়, সহায়ক ('ঈশ্বরোদ্দেশে ঐ কাল্পনিক রূপের আরাধনা করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়')। এ-সকল যুক্তি থেকে আমরা অনায়াসেই এ সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, রামমোহন রায় নিছক পৌত্তলিকতার বিরোধী হলেও প্রতীকোপাসনা বা মূর্তিপূজা-মাত্রেরই বিরোধী নন। সে যুগের নির্ভীক পুরুষ রামমোহন পৌরোহিত্য ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যতখানি সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, ততখানি অভ্রান্ত সত্য-দৃষ্টির প্রমাণ দিয়েছিলেন প্রতীকোপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ক'রে। রামমোহনের অনুগামী হলেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্ম-নেতাগণ এ-বিষয়ে তাঁকে অনুসরণ করেননি; তাঁরা নির্বিচারে সকল প্রকার মূর্তিপূজার বিরোধিতা করেন। অবশ্য এ-বিষয়ে কেশব-চন্দ্রের শেষ-বয়সে মত-পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রতীকোপাসনার প্রয়োজন পরোক্ষে স্বীকার করেই তিনি নিম্নোক্ত ভাষণগুলি দিয়েছিলেন—'আধ্যাত্মিক দুর্গাপূজা', 'লক্ষ্মীপূজা', 'জয়শক্তিরূপী কার্ত্তিকপূজা' ইত্যাদি।

(৩) মূর্তিপূজা ব্যতীত দার্শনিক মতের দিক থেকেও রামমোহনের সঙ্গে পরবর্তী ব্রাহ্মনেতাগণের মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। রামমোহন অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং সগুণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা অপেক্ষা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা শ্রেয় বলে মনে করতেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদ বা জীবব্রহ্মবাদ পরবর্তী ব্রাহ্মগণ স্বীকার করেননি, এবং তাঁরা সগুণ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেয় মনে করেছেন। এ-বিষয়েও শেষ-বয়সে কেশবের মত-পরিবর্তন লক্ষিত হয়। প্রথম জীবনে তিনি 'Farewell to Vedanta' ঘোষণা করলেও শেষে 'আমাদের বেদান্তে ফিরিয়া আসা' ঘোষণা করেছিলেন।

সমন্বয়-যুগ

দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের যুগাবসানে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-যুগের আবির্ভাব। রামমোহনের মতো রামকৃষ্ণের আবির্ভাবও ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। দেশের মধ্যে কী নূতনের খেলা চলছে, সে-সবের কোন পরিচয় লাভ না করেই রামকৃষ্ণ আবির্ভূত হন; তিনি সম্পূর্ণরূপেই প্রাচীন ভারতের গর্ভ হ'তে জাত। তাঁর আবির্ভাব দেখে মনে হয়, ইতিহাসের প্রয়োজনের জন্য ভারত তার যুগযুগ-সঞ্চিত কত প্রাণশক্তি আছে, কত সম্পদ আছে, তা প্রকট ক'রল। রামমোহন যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন, তা প্রধানতঃ যুক্তি- ও বুদ্ধি-ভিত্তিক হওয়ায় দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তা প্লাবনের মতো সমাজ-জীবনের স্তরে স্তরে গণ-মানসের গভীর অন্তর্লোকে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু রামকৃষ্ণ এলেন এই জনগণের মধ্য হ'তে তাদের পরিচিত বিশ্বাস, মত ও পথ ধরে। তাই জন-সাধারণের তাঁকে চিনতে দেরী হ'ল না। প্রথম কালী-মন্দিরের মূর্তিতে যিনি পূজিতা, তাঁর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং আপন স্বভাবজাত অনমনীয় দৃঢ়তা-সহায়ে তাঁকে প্রত্যক্ষ করবার প্রয়াস

করলেন। রামকৃষ্ণের প্রথম বৈশিষ্ট্য—তাঁর অদ্ভুত বিচারশীল মন, যা দিয়ে শৈশব থেকেই তিনি বর্তমানকালের এই 'চালকলা-বাঁধা বিদ্যা'র স্বরূপ চিনে নিয়ে তা পরিত্যাগ ক'রে 'যে জ্ঞান সকল জ্ঞানের আধার, যা জানলে সকল অজ্ঞানতা দূর হয়', তাই জানবার প্রয়াস করেন। রামকৃষ্ণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—দৃঢ় সঙ্কল্প ও সর্ববিষয়ে অনমনীয় দৃঢ়তা। তৃতীয়—তিনি কোন কিছুই পরীক্ষা না ক'রে গ্রহণ করেননি, তাঁর প্রত্যেকটি বিশ্বাস পরীক্ষিত সত্য। এই-সকল চরিত্রগুণে অচিরেই তিনি অভীষ্ট লাভ করেন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়, সেখান থেকেই তাঁর প্রকৃত যাত্রা শুরু। অদ্ভুত এক পিপাসা নিয়ে তিনি একের পর এক পৃথিবীর যাবতীয় আধ্যাত্মিক নির্ঝর থেকে অমৃত-বারি পান করতে প্রয়াস পেলেন। এবং এও তাঁর চরিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, তিনি নিজের মনের সকল দরজা-জানালা সকল সময় সত্যলাভের জন্য খুলে রেখেছিলেন; আপন 'পৌত্তলিকতা' বাঁচাবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের কাছ থেকে দূরে সরে যাননি; তাদের নিকট তিনি নিজে গিয়েছেন। কারণ, তিনি এক পরম সত্য জেনেছিলেন—'যত মত তত পথ'। তাঁর আরও একটি বৈশিষ্ট্য—কোন চিন্তাই তাঁর কাছে চিন্তামাত্রই থাকত না, তা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধির বস্তু হয়ে প'ড়ত, এবং জীবনরসে পুষ্ট হয়ে প্রতিদিনের আচরণে পরিণত হ'ত। এজন্য সর্বধর্মের সকল দেবতার ভাব মিলে তাঁর কাছে এক পরমদেবতার রূপ নিল এবং যেমন বহু বিচিত্র রাগিণীতে মানুষ বন্দনা সঙ্গীত উচ্চারণ করে, তেমনি রূপে রূপে এবং অমূর্ত অরূপে তিনি সেই পরমদেবতার বন্দনা করতে লাগলেন এবং আস্বাদনও করতে লাগলেন। তাঁর কাছে সকল মানুষের ধর্ম একরূপে মিলিত হয়ে যাওয়ায় সকলের দেবতার মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে সকল মানুষও এক হয়ে গেল এবং জীবে-ব্রহ্মে মানুষে-দেবতায় মিশে সেই পরম-দেবতা তাঁর কাছে এক অদ্ভুত অপূর্ব মহান্ রূপ নিলেন। সে রূপ বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন, 'আমার সাধু-রূপী নারায়ণ, খলরূপী নারায়ণ, ছলরূপী নারায়ণ, লুচ্চারূপী নারায়ণ।'

এমনি ক'রে রামকৃষ্ণের জীবনে 'অসীমের লীলাপথে' 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা'র মিলনে মিশ্রণে 'এক নূতন তীর্থের' উদ্বোধন হ'ল। সে তীর্থ মানবতার মহাতীর্থ, সে তীর্থের দেবতা সেই মহিমান্বিত বিরাট, যিনি সকলের মধ্যে আছেন, সকলের হাতে কাজ করেন, যিনি সকলের পায়ে চলেন, যিনি শক্তিমান্ ও বিনীত, যিনি ভগবান্ ও কৃমিকীট—সর্বোপরি সে-দেবতা হলেন মানুষ। এই বিরাটের পূজারী রামকৃষ্ণের ধর্ম তাই শুধু মূর্তিতে বিশ্বাস করতে বলে না, বলে—যারই অস্তিত্ব আছে, তাতেই বিশ্বাস করতে, বিশ্বাস করতে বলে সকল প্রাণে, সকল জীবনে, সর্বপ্রকার সুখে-দুঃখে; বিশ্বাস করতে বলে সেই ভগবানে, যিনি নিরন্তর আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ ধর্ম তাই আচার-আচরণে, বাহ্যপূজা-অনুষ্ঠানে আবদ্ধ নয়, এ ধর্ম তাই সকল কর্মকেই আবৃত করে; এ ধর্ম তাই জীবনব্যাপী এক অবিরাম রূপান্তর, এক অবিরাম গতি। এ তীর্থের অবস্থান তাই নির্জন গিরি-গুহায় নয়, মন্দিরে দেবালয়ে নয়—তার অবস্থান জনাকীর্ণ সংসারে সমাজে, কর্মমুখর নগরীর রাজপথে।

সেইজন্য মুহুর্মুহুঃ সমাধিমান্ এই পুরুষটিকে পরিণত জীবনে দেখা গেছে কর্মমুখর নগরীর রাজপথে ঘুরতে মানুষের বন্ধুরূপে, জনতার বন্ধু-রূপে, আর্ত-দুঃখী অসহায়ের বন্ধুরূপে। এইরূপে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, তিলে তিলে মৃত্যুর

দিকে এগিয়ে চলে তিনি এক অবিশ্বাস্য দুঃসাধ্য কর্মব্রত সাধনের প্রয়াস করেছিলেন।

দুটি দৃষ্টান্ত আমাদের সে-ব্রতের স্বরূপ বুঝতে সহায়তা করবে। লাটু ছিলেন অজ্ঞাত-কুলশীল, বৃত্তিতে ভৃত্যমাত্র; শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে তিনি বিকশিত হলেন এক মহাজ্ঞানী মহাশক্তিধর বিরাট পুরুষরূপে। দ্বিতীয়—গিরিশচন্দ্র, যিনি নিজমুখে বলেছেন, 'না করেছি হেন পাপ নেই,' কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেবতা ক'রে দিয়ে গিয়েছেন, পুণ্যের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ ক'রে তিনি অমর সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন নাট্যে ও সাহিত্যে। এই ছিল রামকৃষ্ণের কাজ—প্রতি মানুষের মধ্যে যে অসীম আত্মশক্তি বিরাজমান, সকলেরই মধ্যে বড় হবার ও ভাল হবার যে অনন্ত সম্ভাবনা, তাকেই জাগ্রত করা। এবং এইরূপে জন্ম-কর্মের, জাতি-কুলের, বৃত্তি-ধর্মের যত হীনতা, যত খর্বতা, যত অসম্পূর্ণতা, সবের ঊর্ধ্বে সব মানুষকে মহিমা ও পূর্ণতার সমান উচ্চশিখরে উন্নীত করতে চেয়েছেন। মানুষের তৈরী সব বৈষম্যের সকল সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর উপর এমনি করেই তিনি করেছেন কুঠারাঘাত। সুতরাং রামকৃষ্ণের পূর্বে সমাজ-সংস্কারের যে দিকে প্রয়াস চলছিল, তিনি সেদিকেই সম্পূর্ণ এক অভিনব পথের উদ্বোধন করলেন। কিন্তু যে পথেই মানুষ চলুক, সর্ব-প্রকার মানুষের হাতে গড়া অন্যায় গণ্ডী যা মানুষকে খর্ব করে, পূর্ণ বিকশিত হ'তে দেয় না—তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য রামকৃষ্ণ এক জীবন্ত প্রেরণা-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ালেন। এ-বিষয়ে রামমোহনের মধ্যে যে ভাবের স্ফুরণ দেখা যায়, রামকৃষ্ণে তার পূর্ণ ও সার্থক অভিব্যক্তি। কারণ সংস্কারকে শুধু বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে তিনি আনবার প্রয়াস করলেন না, তাকে জীবন-সত্যরূপে সকলের সামনে তুলে ধরলেন। যুগ-প্রবণতা যাঁর মধ্যে পূর্ণরূপ নেয়, তাঁকেই যুগাবতার বলা হয়। সে অর্থে শ্রীরামকৃষ্ণ নিঃসন্দেহে যুগাবতার।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহামনীষার আলোকসম্পাতে প্রাচীন ভারতের তথা সমগ্র পৃথিবীর বিপুল জ্ঞানরাশি সঞ্জীবিত হয়ে যে অপূর্ব মানবতারূপ পরম-সত্যের রূপ নিয়েছিল, তা উপলব্ধি ক'রে যুক্তিবাদী বিবেকানন্দ তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করেন। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্পদ-টুকু আত্মসাৎ ক'রে প্রাচীনকে নবীন ক'রে তুললেন। বিবেকানন্দের ছিল অসামান্য সংগঠন-কারী প্রতিভা। যেমন বহু বিচিত্র উৎস থেকে উদ্গত হয়ে এবং কালে আরও বহু বিচিত্র-পথে প্রবাহিত হয়ে নদ-নদী-জলধারা মহাসমুদ্রে এসে মিলিত হয়ে বিপুল অখণ্ড জলরাশি সৃষ্টি করে, তেমনি বহুকাল ধরে বহু বিচিত্র মানসে যে-সকল চিন্তা জন্মলাভ ক'রে আরও বহু মনীষার দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল, তা তাঁর অতুল চিন্তারাশির মধ্যে মিলিত হয়ে এক সুবিশাল, অনন্য-সমৃদ্ধ ও সমুন্নত চিন্তাসম্পদ সৃষ্টি ক'রল। তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ লব্ধ সত্য-জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্বের জ্ঞানের সম্মিলনে উৎপন্ন যে প্রজ্ঞা ছিল, তৎসহায়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে উদ্ভাসিত পরমতত্ত্বের যুক্তি- ও বুদ্ধি-গ্রাহ্য রূপ দেবার প্রয়াস করেছেন। সেজন্য যে মহৎ চিন্তাধারা জগৎকে দিলেন, তা একদিকে জীবন-সত্য উপলব্ধির বস্তু, অপরদিকে যুক্তি-ভিত্তিক দার্শনিক তত্ত্ব। সেদিক থেকে তিনি রামকৃষ্ণের সঙ্গে রামমোহনের প্রদর্শিত পথও অনুসরণ করেছেন। কেবল দার্শনিকতাই তাঁর লক্ষ্য ছিল না। পরমতত্ত্ব যাতে ব্যাবহারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে—ব্যক্তি-জীবনে, সমাজ-জীবনে কার্যকর হয়, বাস্তব হয়ে ওঠে, তার প্রয়াসও তিনি করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ তাঁর আবির্ভাব। এজন্য, ধর্ম-দর্শনের সঙ্গে সমাজ-

দর্শনের চর্চাও তাঁকে করতে হয়েছে এবং সমাজ-বিকাশের ধারা সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞান-সম্মত পূর্ণ তত্ত্বও তিনি দিয়েছেন, যা সমাজ-বিজ্ঞানকে অপার সমৃদ্ধিশালী করেছে। পরিশেষে সমাজ-রূপান্তর বাস্তব করবার জন্য একটি অভিনব কর্মসূচী প্রণয়ন ক'রে তিনি সেটি চালুও ক'রে গিয়েছেন।

অর্থাৎ উনিশ শতকে রামমোহনের ধর্মান্দোলন, বিদ্যাসাগর ও পরবর্তী ব্রাহ্মসমাজের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নব-জাগরণের উন্মেষ হয়েছিল আমাদের দেশে, যার পরিপূর্ণ রূপমণ্ডন ঘটে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে, তার লক্ষ্য কি, সে লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় কি, সে পথে চলবার শক্তি কি—এ সমস্তের নির্দেশ দিয়ে যান বিবেকানন্দ। তখন এই জাগরণ আপন লক্ষ্য-কেন্দ্রে স্থাপিত হয়ে শুধু যে আমাদের জাতীয়-জীবনকেই উন্নতির পথে গতিশীল ক'রল তা নয়, তা সারা জগৎকে সমৃদ্ধিশালী করতে প্রধাবিত হ'ল। তাই উনিশ শতকের জাতীয় জাগরণের শেষ ও সার্থক নায়ক তিনি, কারণ তিনিই জাতিকে ও জগৎকে আগামী কালের অগ্রগতির পথে আরূঢ় করলেন; সেজন্য বিশ শতকেরও তিনি রূপকার। এই কারণেই তাঁর দর্শন-চিন্তায় পাই—বিশ শতকের বিজ্ঞানের অগ্রগতির পূর্বাভাস, পাই—বিশ শতকের সমাজ-বিপ্লবের যাত্রারম্ভ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ও অভ্রান্ত স্থানকাল-নির্দেশ।

এর থেকে সুস্পষ্ট যে উনিশ শতকের ধর্মান্দোলন—ইতিহাসের পশ্চাদপসরণ নয়, কোন অচল সমাজের প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়। এই ধর্মান্দোলনকে কেন্দ্র করেই আমাদের জাতীয় জীবনে জাগরণ এসেছে, সর্বক্ষেত্রে আজ উন্নতি শুরু হয়েছে। তাই হয়, ইতিহাসে ইতিপূর্বেও তাই হয়েছে ধর্মান্দোলনের ফলে পুরোহিত-শক্তি বিনষ্ট হয়, সমাজের অবহেলিত শ্রেণী তাদের লুপ্ত অধিকার ফিরে পায়; ফলে সমাজের নিম্নস্তরে অবরুদ্ধ সৃজনী শক্তি মুক্তি পায়। এই কারণে ভগবান্ বুদ্ধের সময়েও জ্ঞানে গরিমায়, শিল্প-সমৃদ্ধিতে এক গৌরবময় স্বর্ণযুগ দেখা দিয়েছিল।

ইতিহাস পর্যায়ে পর্যায়ে বিকশিত হয়, স্তরে স্তরে অভিব্যক্ত হয়, তাই প্রত্যেকটি পর্যায় এবং স্তরের সমান গুরুত্ব। তবে শেষ স্তরে স্বাভাবিক-ভাবেই যুগ-প্রবণতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে তাই উনিশ শতকের যুগ-প্রবণতা পূর্ণ পরিণত, কিন্তু তাই ব'লে অগ্রগামীদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রস্তুতির পথে বিবেকানন্দের জীবন-দর্শন ও সমাজ দর্শন' পুস্তকের একটি অধ্যায়ের সারাংশ।—লেখিকা

সাহিত্য-সাধক রামেন্দ্রসুন্দর

ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

সাহিত্য-সংসারে জানা এক জিনিস, জানানো আর এক; বোঝা এক কথা, বোঝানো অন্য এক। অনেকেই জানেন অনেক কিছু, কিন্তু জানাতে পারেন কই? ঠিক তেমনি বোঝেন অনেকেই, কিন্তু বোঝাতে পারেন ক-জন? ক-জন রপ্ত করতে পারেন জানার সঙ্গে জানানোর এবং বোঝার সঙ্গে বোঝানোর বিদ্যে? রামেন্দ্রসুন্দর পেরেছিলেন। তাঁর জ্ঞানের তরী ভারী ছিল। তাই ব'লে সে-তরীর গতি শ্লথ হয়নি কোন দিন।

সাহিত্যের অনুকূল স্রোতে দর্শনের পাল খাটিয়ে বিজ্ঞান-রসিক রামেন্দ্রসুন্দর তরী বাইলেন চিরকাল—যে-নদী বহু বিচিত্র দেশ-দেশান্তরের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়ে প্রাণ- ও জড়-জগতের শত-সহস্র বৈচিত্র্যকে পিছনে ফেলে দূরে বহুদূরে কোন এক নাম-না-জানা দেশের অনির্দেশ্য রহস্যময় লোকে চলে গেছে, সে-নদীতে তরী বাইলেন। সেই নদীপথের অভিজ্ঞতাকে লিখে গেলেন এমন সজীব ও সরস ভাষায়, বাংলার সাহিত্য-তীর্থের দেবমন্দিরে যার অকুণ্ঠ প্রবেশাধিকার। রামেন্দ্রসুন্দর তাই সাহিত্যিক—প্রথম শ্রেণীর মননশীল সাহিত্যিক। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ও যশস্বী অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানী নন তিনি; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি দার্শনিক নন; সাহিত্যিকের রাজসম্মানই তাঁর প্রাপ্য। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলার চিন্তাশীল সাহিত্যরথীদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই। বিজ্ঞানের কুয়াসাচ্ছন্ন, রহস্যঘেরা জগৎ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর যে বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করেছেন, সেখানে এমন কি রবীন্দ্রনাথও যেতে পারেননি। তার কারণ, পথ-পরিক্রমার ময়ূরপঙ্খিতে বিজ্ঞান-বিদ্যার যে-রসদ রামেন্দ্রসুন্দরের মজুত ছিল, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানকে দেখেছেন বাইরে থেকে, আর রামেন্দ্রসুন্দর দেখেছেন ভিতর থেকে। বিজ্ঞান-মহলের ভিতরে দাঁড়িয়ে অতি পরিচিতের অন্তরঙ্গ ও সন্ধানী দৃষ্টিতে বিজ্ঞানকে দেখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এ দেখা শুধু নিজের জন্যে নয়, অপরকে দেখানোর জন্যেও বটে। এ জানা শুধু নিজের খাতিরে নয়, দেশের দশজনের খাতিরেও বটে। তাই বিজ্ঞান-মহলের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন যাঁরা, যাঁরা বিজ্ঞানকে জানতে চান, অথচ জানবার মতো শিক্ষা নেই যাঁদের, তাঁদের জন্যে সরল ও সরস ভাষায় বিজ্ঞান-রাজদরবারের খবর তিনি মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন।

স্বদেশবাসীর প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি—স্বদেশের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা ও মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা থেকেই রামেন্দ্রসুন্দরের এই সাহিত-প্রয়াস। এদেশের পূজা-অর্চনা, যাগ-যজ্ঞ, ধর্ম-কর্ম, বেদ-ব্রাহ্মণ সব-কিছু সম্বন্ধেই তাঁর এক সশ্রদ্ধ কৌতূহল ছিল। তাই 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (১৯০৬) লিখতে পেরেছিলেন তিনি। বৈদিক যজ্ঞের বিবরণ দিয়ে 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' (১৯১১) রচনা করেছিলেন। জীবনের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ নির্ণয় ক'রে কর্মপ্রবৃত্তির মাধ্যমে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন 'কর্ম-কথা'য় (১৯১৩)। ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে বেদপন্থীদের কুসংস্কার দূর ক'রে বেদ-পন্থার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' (১৯১৪)। আর 'যজ্ঞ-কথা'য়

(১৯২০) তিনি অনুপ্রবেশ করেছেন ভারত-সংস্কৃতির এক সুদুর্গম ক্রিয়াকাণ্ডে। মাতৃভূমির বরণীয় সন্তানদের প্রতি তাঁর যে কি গভীর শ্রদ্ধা, তার প্রমাণ মিলবে 'চরিত-কথা'য় (১৯১৩)। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কি যে নিঃসীম নিষ্ঠা ছিল তাঁর, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার উন্নতিকল্পে উপযুক্ত পরিভাষা-প্রণয়নে তিনি যে কতখানি আগ্রহী ছিলেন, তার প্রমাণ মিলবে 'শব্দ-কথা'য় (১৯১৭) এ ছাড়া 'নানা কথা'য় (১৯২৪) স্বদেশের বহু বিচিত্র সমস্যা নিয়ে ভেবেছেন রামেন্দ্রসুন্দর। এদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন।

স্বদেশপ্রেমিক ও বিজ্ঞান-রসিক রামেন্দ্র-সুন্দরের সাহিত্য-মানসে আগাগোড়া এক সংস্কার-বিমুক্ত বিজ্ঞান-চেতনা বর্তমান ছিল বলেই এগুলি সম্ভব হয়েছে। উদার ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে স্বদেশের ধর্ম-কর্ম ও সাহিত্য-সংস্কৃতিকে দেখতে পেরেছেন তিনি। কিন্তু মনে যেন রাখি, রামেন্দ্রের-জীবন ও সাহিত্যে দেখার চেয়েও বড় কথা দেখানো, জানার চেয়েও বড় সত্য জানানো। কোথায় দাঁড়িয়ে কিভাবে দেখলে সবটা দেখা যায় এবং কোথায় বসে কিভাবে বিচার করলে বিচারের সুবিধে হয়, তা তিনি জানতেন। আর জানতেন দেখাবার কৌশল, জানাবার পন্থা। রামেন্দ্র-সাহিত্য তাই রামেন্দ্র-দর্শনের দর্পণ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিচারকের আসনে বসে বিজ্ঞানকে এমন ক'রে দর্শন করেননি আর কেউ। বিজ্ঞানবিদ্যার ক্ষমতা-অক্ষমতা দোষ-গুণ সত্য-মিথ্যা নিয়ে এমন চুলচেরা বিচার বাংলা সাহিত্যে আর কেউ কোনদিন করেননি। তাই রামেন্দ্রসুন্দর শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধকার নন, বিজ্ঞানের ভাষ্যকারও বটে। শুধু ধর্ম-কর্মের লেখক নন, টীকাকারও বটে।

বিজ্ঞান-সূত্রের টীকা-টিপ্পনী-রচনায় তিনি অদ্বিতীয়। বিজ্ঞান-বিদ্যার স্বরূপ-অন্বেষণের ক্ষমতায় তিনি অতুলনীয়। তাই ব'লে বিজ্ঞান নিয়ে গতানুগতিক প্রবন্ধ লেখেননি তিনি। বৈজ্ঞানিক সত্যকে পাথেয় ক'রে তিনি বেরিয়েছেন জগৎ-রহস্যের মূল অনুসন্ধানে। বিজ্ঞান-বিদ্যা তাঁর কাছে শেষ কথা নয়, অশেষকে জানার উপকরণ মাত্র। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করছে বিজ্ঞান; কিন্তু কত রহস্য আজও অজানা থেকে গেল। প্রকৃতির আরও কত রহস্যের উত্তর-দানে বিজ্ঞান-বিদ্যা অক্ষম। তাই তাঁর প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থ 'প্রকৃতি'তে (১৮৯৬) দেখি, বিজ্ঞানীদের সাধনায় বিশ্বজগতের রহস্য-যবনিকা কেমন ক'রে একে একে উন্মোচিত হচ্ছে এবং জগতের মূল রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে বিজ্ঞান-বিদ্যা কেমন ক'রে বিফল হচ্ছে, তারই কাহিনী বিজ্ঞান-বিদ্যার এই বিফলতা থেকেই 'জিজ্ঞাসা'র (১৯০৪) পরিকল্পনা। পরবর্তী রচনা 'বিচিত্র জগৎ'-এ (১৯২০) জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে জ্ঞানের জগতে রামেন্দ্রসুন্দরের অভিসার।

জগৎ-রহস্যের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা যুগ যুগ ধরে বিশ্বের অনেক মনীষীই করেছেন; কিন্তু সফল হননি কেউই। হয়তো কেউ কোনদিন সফল হবেনও না। এ অভিসার তাই ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। রামেন্দ্রসুন্দরও ব্যর্থ হয়েছেন শেষ অবধি। কিন্তু জগৎ-রহস্যের গোড়ায় পৌছতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছেন, বিশ্ব-প্রকৃতির যে রহস্যকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করেছেন, বাংলা-সাহিত্যের তা এক অমূল্য সম্পদ্। বিষয়ের দুরূহতায় তাঁর রচনা কোথাও ভারাক্রান্ত হয়নি। বৈজ্ঞানিক চিন্তার জটিলতায় তাঁর রচনা কোথাও দুর্গম হয়নি। বর্ণনার

প্রসাদগুণ, জগৎ ও জীবনের প্রতি এক সহৃদয় দৃষ্টি এবং তার চেয়েও বড় কথা, এক আনন্দময়, সরস ও প্রফুল্ল বাগ্‌ভঙ্গিমা তার রচনাকে এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক-গৌরবে অভিষিক্ত করেছে।

এই সাহিত্যিক-গৌরব ছাড়া আরও অনেক অনন্য গৌরবের অধিকারী আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বিজ্ঞানের তিনি শুধু সাহিত্যিক নন, শিক্ষকও বটে। তাই দেখি, এদেশে যাতে বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার ঘটে সেজন্য তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই। ছাত্রদের জন্য মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের পাঠ্য-বই লিখছেন। লিখছেন 'পদার্থ বিদ্যা' (১৮৯৩), 'ভূগোল' (১৮৯৮) 'বিজ্ঞান-পাঠ' (১৯০২) ও 'বিজ্ঞান-কথা'। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চিন্তার প্রসারের জন্য সরল বাংলায় লিখছেন 'জগৎ-কথা'র (১৯২৬) প্রবন্ধগুলি। রিপন কলেজের উঁচু ক্লাসে তিনি বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন বাংলা ভাষায়। সাহিত্য সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিত্ব করতে গিয়ে মাতৃ-ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার উপযোগিতার কথা বলছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানালোচনার উপযোগিতার কথা দেশবাসীকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

এক কথায় কর্মসাধক ছিলেন তিনি, জ্ঞান-তপস্বীও ছিলেন। কিন্তু এই কর্মসাধক বা জ্ঞান-তপস্বী নিজেকে দশজনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাননি। জ্ঞানলব্ধ ঐশ্বর্যকে স্বার্থপরের মতো আপন চিন্তাজগতে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখতে চাননি। তাই সাহিত্য-সাধনাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। সাহিত্যের মাধ্যমে স্বীয় জীবনের সাধনালব্ধ সকল ঐশ্বর্যকে অকাতরে সকলের উদ্দেশ্যে দান ক'রে গেছেন তিনি। আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা সাহিত্যে তাঁর সেই দানের কথা আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কর্মযোগী, জ্ঞান-তপস্বী, সাহিত্য-সাধক ও বন্ধুবৎসল রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্দেশে অন্তরের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে প্রশ্ন উপস্থাপিত করি—রামেন্দ্রসুন্দরের স্বপ্ন কবে সফল হবে? উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চায় মাতৃভাষার ব্যবহার কবে শুরু ক'রব আমরা?

দক্ষিণভারত-দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী অমলানন্দ

স্টেশনে একখানি বাস প্রস্তুত—সেই বাসে আমরা চেট্টী মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। হাতমুখ ধুয়ে কফি ও জলযোগ সেরে বাসেই আমরা রঙ্গনাথজীর মন্দিরের দিকে চললাম। কাবেরী নদীর উপর বিরাট সেতু। শ্রীরঙ্গমের মন্দির বস্তুতঃ একটি দ্বীপের মধ্যে—যার চারদিকে কাবেরী অবিরাম কুলুকুলু স্বরে বয়ে যাচ্ছে। বাস থামলো একটা ঘাটের ধারে। এই ঘাট থেকে শ্রীরঙ্গনাথজীর স্নানের জন্য প্রতিদিন জল নিয়ে যাওয়া হয়। একবার এক চণ্ডাল ভক্ত—তিরুপ্পান বীণা বাজিয়ে ভগবানের নাম-কীর্তনে মাতোয়ারা ছিলেন। পূজারী জল নিতে গিয়ে দেখলেন যে, এই অস্পৃশ্য ব্যক্তি তার পথ জুড়ে রয়েছে। পূজারী একটা ঢিল ছুঁড়ে তাকে পথ থেকে সরে দাড়াবার ইঙ্গিত করলেন। তিরুপ্পান সরে গেলে মন্দিরের পূজারী যথানিয়মে জল নিয়ে এসে দেখেন—মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। ভেতর থেকে মন্দির কে বন্ধ ক'রল? অন্যান্য পূজারীরা সকলেই তো বাইরে, কাজেই ঐ পূজারীর সন্দেহ হ'ল—প্রভু কি তাঁর কোন অপরাধের জন্য নিজেই দরজা বন্ধ করেছেন? দৈববাণী হ'লঃ 'পূজারী, তুমি যে আঘাত তিরুপ্পানকে করেছ, সে আঘাত আমাকেই করা হয়েছে। যাও সেই তিরুপ্পানকে কাঁধে ক'রে নিয়ে এই মন্দির প্রদক্ষিণ কর।'

•

শ্রীরঙ্গম

মন্দিরের বাইরে আমাদের বাস থামল। বিরাট মন্দির ও তার বিরাট প্রাঙ্গণ। বাইরের চারিদিক একবার প্রদক্ষিণ করতে হ'লে দু-মাইলেরও বেশী ঘুরতে হয়। আমরা যখন গিয়ে পৌছেছি তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হঠাৎ ইলেকট্রিক কারেন্টও বন্ধ হয়ে গেছে, যন্ত্রযুগের এই যন্ত্রণায় কলকাতায় আমরা খুবই অভ্যস্ত। যাই হোক কিছুক্ষণের মধ্যে মন্দিরের এক অফিসার আমাদের সহায় হলেন। নিজেই সঙ্গে ক'রে মন্দিরে নিয়ে চললেন। রঙ্গনাথজীর মন্দিরে যে গোপুরম্, তাতে নয়টি জানালা আছে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার—এ-সকল নামে সেগুলিকে অভিহিত করা হয়। গোপুরমে নানা দেবদেবীর মূর্তি। গোপুরমের পর ছয়টি প্রাকার পার হ'তে হয়। তারপর বলিপীঠম্, মহা-মণ্ডপম্ এবং গরুড়কে অতিক্রম ক'রে গর্ভমন্দিরে যেতে হয়। প্রথমে গরুড়ের পূজা ও প্রণাম—ভক্তকে না ধরলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। ১২ জন আলবারের মূর্তিও সম্মুখে রয়েছে—তাঁদের সকলকে প্রণাম জানিয়ে আমরা গর্ভমন্দিরে উপস্থিত হলাম। মন্দিরের মধ্যে অনন্তশয্যায় শায়িত বিরাট বিষ্ণুমূর্তি, তিন দরজা দিয়ে দেখতে হয়, মহাপ্রলয়ের সময় ভগবান্ অনন্ত জলরাশির মধ্যে শুয়েছিলেন—কাবেরীর পবিত্র জলরাশি-মধ্যগত দ্বীপেই সেই অনন্ত-শয়ান মূর্তি। কত দিনের প্রাচীন মন্দির, তা সঠিক বলা শক্ত। ঐতিহাসিকেরা বলেন, প্রায় ৪০০০ বছরের মতো এর বয়স। শ্রীশঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্যদেব সকলেই এই মহাতীর্থ দর্শন ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। যুগ যুগ ধরে কত ভক্ত নরনারী তাঁদের হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন শ্রীরঙ্গ-

নাথের চরণে। দক্ষিণভারতের বৈষ্ণবদের এইটিই সবচেয়ে বড় তীর্থ।

তামিলে বৈষ্ণব সিদ্ধপুরুষদের বলা হয় 'আলবার'। রঙ্গনাথজীর পুণ্য নামের সহিত সংশ্লিষ্ট বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বার জন আলবারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা তিরুপ্পানের নাম আগেই বলেছি। আর বাকী এগার জন হলেন—পোয়উহ, পূদত্ত, পেয়, তিরুমাড়র, নম্ম, মধুরকবি, রাজাকুলশেখর, তুণ্ডরড়ি, প্লোড়ি, তিরুমড়ি এবং অণ্ডাল। অণ্ডাল ছিলেন মহাভাগ্যবতী। এঁর অন্য নাম 'গোদা'। উত্তরভারতের মীরাবাঈ-এর সঙ্গে এঁর অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে। মীরাবাঈ-এর ভজনের মতো অণ্ডালের ভক্তিঘন ভজনগুলি দক্ষিণ-ভারতের সর্বত্র জনপ্রিয়; অণ্ডালের পিতা এক-জন পরমভক্ত ছিলেন, তিনি শ্রীবিল্লীপুতুরের বট-পত্রশায়ী বিষ্ণুর জন্য রোজ মালা তৈরী করতেন। একদিন দেবতার জন্য গাঁথা মালা বালিকা নিজের গলায় পরেছিলেন এবং সেই মালায় তার মাথার চুল দেখে অণ্ডালের পিতা এই মালা দেবতাকে নিবেদন করলেন না। বটপত্রশায়ী তাঁকে রাত্রে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'অণ্ডাল সাধারণ মেয়ে নয়—তার পরা মালা আমাকে নিবেদন ক'রো; তাতে আমি খুশীই হবো।' শ্রীরঙ্গনাথজী ছাড়া আর কাউকেই বালিকা পতিত্বে বরণ করতে রাজী নয়। প্রবাদ আছে —শ্রীরঙ্গনাথজীর সঙ্গে তার বিবাহও হয়েছিল। বিবাহের রাত্রে অণ্ডাল যখন সাজসজ্জায় ভূষিত হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন, রঙ্গনাথজী তাঁকে আলিঙ্গন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অণ্ডালের দেহ শ্রীভগবানের দেহে লীন হয়ে যায়।

শ্রীরঙ্গনাথ

কর্পূর-আরতির মৃদু আলোকে দেখা গেল—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিগ্রহের সৌম্যমূর্তি বিশ্বকল্যাণ-চিন্তায় শান্ত সমাহিত। পাশেই মহালক্ষ্মীর মন্দির। দর্শনাদি সেরে আমরা বাইরে এলাম। বাইরে তখন শ্রীবিগ্রহের শোভাযাত্রা চলছে। প্রত্যেক মন্দিরেই বিগ্রহের প্রতিনিধি উৎসব-মূর্তি থাকে। তাঁকে নিয়ে এই শোভাযাত্রা। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সামনে বেদপাঠ করছেন। পিছনে ভক্তজনের ভজন-কীর্তন—পথের দুই ধারে ভক্ত-নরনারীর নীরব শ্রদ্ধাঞ্জলি। অপূর্ব লাগছিল মন্দিরের বহিঃপ্রাকারের বাইরে এই শোভাযাত্রা—ভক্ত হনুমানের পৃষ্ঠে শ্রীরামলক্ষ্মণ।

জম্বুকেশ্বর

পথে দূর থেকে Rock temple আমরা আগেই দেখেছি। এবার আমরা চলেছি জম্বুকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। জম্বুকেশ্বর অপ্‌লিঙ্গ। রাস্তা থেকে অনেকটা নীচে নেমে যেতে হয়। সিঁড়ি আছে। কাবেরীর অখণ্ড জলধারা বয়ে চলেছে মন্দিরের মধ্য দিয়ে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূজাদি সেরে আমরা আর এক ভক্তগৃহে এলাম। ট্রেনের আর বেশী দেরি নেই। গৃহস্বামী অল্প সময়ের মধ্যে অতি নিপুণভাবে আমাদের আহারের বন্দোবস্ত করেছিলেন। বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত সকলেই আমাদের পরিবেষণ করছিল। দোতলায় ছোট্ট ঠাকুরঘর; সেখানে আমরা সকলে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীকে প্রণাম ক'রে গৃহস্বামীর কাছ থেকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে বিদায় নিয়ে শ্রীরঙ্গম্ স্টেশনের পথে চললাম। রাত ১০টায় গাড়ি।

সেতুবন্ধযাত্রা

এবার আমাদের গন্তব্য ধনুষ্কোডি বা সেতুবন্ধ। শ্রীরঙ্গম্ থেকে ধনুষ্কোডি ১৬০ কিলো-মিটার। তাড়াহুড়া ক'রে স্টেশনে আসা হ'ল বটে, কিন্তু ট্রেন ২ ঘণ্টা লেট্। তাতে ক্ষতি নেই;

বেশ লাগছিল স্টেশনের কাঁকর-বিছানো প্লাটফর্ম। উপরে জ্যোৎস্নায় ভরা আকাশ। ব্যস্ততার মধ্যে যা দেখতে পাইনি, এই নিরুদ্বেগ অবসরে শ্রীরঙ্গমের সেই মধুর শ্রী উপভোগ করলাম। ভজহরি মহারাজ এখনও আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে তিনি ফিরে যাবেন মাদ্রাজে। ট্রেন এল, কিন্তু তিলধারণের জায়গা নেই। তৃতীয় শ্রেণীর সাধারণ কামরায় আমরা উঠে পড়লাম। বসবার জায়গাও নেই। আমাদের মধ্যে যাঁরা বয়স্ক, তাঁরা কিভাবে সারারাত কাটাবেন—এই চিন্তায় আমরা উদ্বিগ্ন হলাম। কিন্তু ভজহরি মহারাজ আছেন, ভয় কি? ইতিমধ্যে তিনি ১৮টি Sleeper berth রিজার্ভ ক'রে ফেলেছেন। আমরা সেই-সব বার্থ-এ বিছানা মেলে নিদ্রার আয়োজন করতে লাগলাম।

ভোর হ'ল মনমাদুরায়। ক্রমে রামনাদ প্রভৃতি স্টেশন পার হয়ে মণ্ডপম্ স্টেশনে ট্রেন থামল। এর পরে পাম্বান ব্রীজ। দেড় মাইল লম্বা ব্রীজটি সত্যি একটা বিস্ময়কর বস্তু, রেল-লাইনের দুধারে সমুদ্রের জল। ট্রেনের কামরা থেকে মাটি দেখাই যায় না। যেন সমুদ্রের জলের উপর দিয়েই আমরা চলেছি। সামনের দিকেও জল, ট্রেনের দুধারে জল—সে এক অপূর্ব দৃশ্য! আমাদের গাড়ি ব্রীজ পার হয়ে যখন পাম্বান জংশনে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এইখান থেকে রেল-লাইন পূর্ব দিকে গেছে রামেশ্বর, আর দক্ষিণপূর্ব কোণে ধনুষ্কোডি। ১৯১৪ খৃঃ ব্রীজ তৈরী হওয়ার পর এই রেল-লাইন হয়। আগে জাহাজে যাতায়াত ছিল। মণ্ডপম্ স্টেশনেই রামেশ্বর মন্দিরের কর্মচারী শ্রীনিবাস আয়ার এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন। মাদ্রাজ মঠ থেকে খবর পেয়ে রামেশ্বর কর্তৃপক্ষ এঁকে পাঠিয়েছেন। ধনুষ্কোডিতে স্নান-দর্শনাদি করিয়ে আমাদের রামেশ্বর নিয়ে যাবার জন্য।

ধনুষ্কোডি

ধনুষ্কোডিতে আমরা প্রায় ১০টায় নামলাম বৃষ্টি পড়ছিল, বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই আমরা স্থানীয় রামমন্দিরে আশ্রয় নিলাম। আমাদের পাণ্ডা বৈদ্যনাথঠাকুর আমাদের নিয়ে চললেন সেতুবন্ধে স্নান করার জন্য। স্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল বালির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয় এই স্নানের জায়গায়। বৃষ্টিতে বালি ভিজে ছিল ব'লে বৃষ্টি আমাদের শাপে বর হ'ল। চারিদিকে অনন্ত জলরাশি—বঙ্গোপসাগর মিশছে ভারত-সমুদ্রে। এইখানেই রামচন্দ্র মহাসমুদ্রকে বন্ধন করেছিলেন। সেতুবন্ধের উপর দিয়ে নর-বানরের বাহিনী অভিযান চালিয়েছিল মা-জানকীকে উদ্ধার করবার জন্য। সীতাকে উদ্ধার ক'রে রামচন্দ্র যখন ফিরে এলেন, তখন সমুদ্র কাতর কণ্ঠে শ্রীরামচন্দ্রের কাছে আর্তি জানালেন, 'প্রভু, আপনি আমাকে বন্ধন করেছিলেন মা-জানকীকে উদ্ধার করার জন্য, সে কাজ তো সম্পূর্ণ হয়েছে। এখনও যদি আপনি এই সেতু রেখে যান, তাহলে কুকুর শেয়াল ইতর প্রাণী আমার উপর দিয়ে যাতায়াত করবে। এই অপমান থেকে আমায় নিষ্কৃতি দিন।' শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের এই কাতর প্রার্থনায় লক্ষ্মণকে আদেশ করলেন এই সেতু ভেঙে দিতে। লক্ষ্মণ তাঁর ধনুকের অগ্রভাগ দিয়ে সেতু ভেঙে দিলেন। তাই থেকে এই স্থানের নাম 'ধনুষ্কোডি'। পাণ্ডা ঠাকুর এই কাহিনী ব'লে আমাদের মন্ত্রপাঠ করালেন: 'রামেণ যৎ কৃতং কর্ম তন্ময়াদ্য স্মৃতং সরিৎ'—বালিতে ধনুক আঁকালেন, তার একভাগ থেকে খানিকটা বালি আবার সমুদ্রে ফেলতে হ'ল, তবে গিয়ে আমরা সমুদ্রে স্নান করতে

পেলাম। বহু যাত্রী। নির্জন সমুদ্র-সৈকত আজ জনপূর্ণ মেলায় পরিণত হয়েছে। নানা রঙের সামুদ্রিক ঝিনুক, শামুক প্রভৃতির ছোট ছোট দোকান। একটু দূরে ধনুষ্কোডি পায়ার—এখান থেকে সিংহলের ষ্টীমার ছাড়ে; জলপথে ২২ মাইল। দেখলাম—একটি জাহাজ আসছে। স্নানাদি সেরে রামেশ্বর মন্দিরের পরিচালিত পান্থশালায় এসে প্রসাদ পেলাম—ভাত, সম্বর, কুমড়োর তরকারিআর ঘোল। ভাবতে লাগলাম—কুমড়ো কি সর্বব্যাপী? যাই হোক, কি তৃপ্তি ভরেই যে আমরা খেলাম, তা ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যাবে না! বালির উপর দিয়ে হাঁটার পর আমাদের খিদেটা একটু বেশীই পেয়েছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে আমরা স্টেশনে চলে এলাম। সেখানে এসে দেখি গাড়িও বিশ্রাম নিচ্ছে, যেন আমাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছে, আমরা ওঠার একটু পরেই ছেড়ে দিল।

শ্রীরামেশ্বর

পাম্বানে গাড়ি বদল করতে হ'ল। পাম্বান থেকে রামেশ্বর মাত্র ১২ কিলোমিটার। চারটার মধ্যেই আমরা রামেশ্বর স্টেশনে পৌছে গেলাম। রামেশ্বর মন্দিরের পরিচালক (Executive Officer) ষ্টেশনেই ছিলেন। তিনি আমাদের স্বাগত জানালেন। তাঁর ব্যবস্থাপনায় মন্দিরের নিজস্ব অতিথি-ভবনেই আমাদের থাকার স্থান হ'ল। স্বামীজী রামেশ্বরে অবস্থান-কালে এই ভবনেই ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে এই বাড়িটির সংস্কার করা হয়েছে এবং প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাধাকৃষ্ণন এই বাড়িটির দ্বারোদ্ঘাটন করে গেছেন। বাড়িটির নাম হয়েছে স্বামীজী ও রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতির যুক্তনামে 'বিবেকানন্দ-ভাস্করম্'। কাছেই সমুদ্র, বিশ্রামাদির পর সমুদ্র-স্পর্শন ও নিকটবর্তী শঙ্করাচার্য মঠ দর্শন ক'রে আমরা রামেশ্বর মন্দিরের দিকে এগোতে লাগলাম। রামেশ্বর ভারতের একটি প্রধান তীর্থ—চারধামের এক ধাম। উত্তরে হিমালয়ে বদরিকাশ্রম, পশ্চিমে দ্বারকা, পূর্বে পুরী এবং দক্ষিণে এই রামেশ্বর। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলেও রামেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রসিদ্ধি। রামেশ্বর-দর্শন প্রতিটি ভারতবাসীর জীবনের একটি পরম আকাঙ্ক্ষা। যুগ-যুগ ধরে এই তীর্থ ভারতবর্ষের অগণিত নরনারীকে আকর্ষণ করছে। রামেশ্বর-মহাদেব শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিলেন। লঙ্কা জয় ক'রে ফেরার পথে রামচন্দ্র ও মা-জানকীর শিবপূজা করার বাসনা হয়। কথিত আছে—সীতাদেবীর ইচ্ছানুসারে শ্রীহনুমান্ কাশী গিয়েছিলেন শিবকে আনবার জন্য। হনুমানের আসতে অনেক দেরি হওয়ায় সীতাদেবী বালি দিয়ে এক শিব গড়ে নেন এবং শ্রীরামচন্দ্র তা প্রতিষ্ঠা ক'রে পূজা করেন। এদিকে হনুমান্ কাশী থেকে শিবলিঙ্গ নিয়ে এসে হাজির! উক্ত বিশ্বনাথ শিব এখনও মন্দিরে রয়েছেন এবং তখন থেকে উভয় শিবেরই পূজা হয়ে আসছে। একটি আশ্চর্যের কথা—বৎসরের ৩৬৫ দিনই গঙ্গাজল দিয়ে শ্রীরামেশ্বরের অভিষেক করা হয়।

পুরোহিত ও মন্দিরের কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি আমাদের সকলকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। প্রবেশদ্বারটি খুব বড় এবং একশত ফুট উঁচু। পূর্বদিকে গোপুরম্ দিয়ে আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। মন্দিরের চারদিক ঘিরে বিরাট করিডর দেখা গেল। এর কথা আমরা পূর্বেই শুনেছিলাম। বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে আমরা এই চারহাজার ফুট লম্বা বারান্দাটির কারুকার্য দেখতে লাগলাম। স্তম্ভগুলির প্রত্যেকটি এক-একটি প্রস্তর থেকে প্রস্তুত, তার ওপর খিলান—এত বড় বড় পাথর কিভাবে আনা হয়েছিল এবং

কি যন্ত্রের সাহায্যে স্তম্ভগুলির মাথায় তোলা হয়েছিল, তা আজও স্থাপত্যবিদ্যা-বিশারদগণের কাছে এক বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে। মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মন্দিরের ধনরত্নাদি আমাদের দেখালেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বলিপীঠম্, ধ্বজস্তম্ভ ও নন্দী পার হয়ে গর্ভমন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। রামেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণে মা পর্বত-বর্ধিনীর (পার্বতীর) মন্দির এবং তার কাছেই হরপার্বতীর শয়নঘর। প্রতি শুক্রবার দেবীকে নয় প্রকার মহামূল্য রত্ন দিয়ে সাজিয়ে শোভা-যাত্রা বার করা হয়। আমাদের বিশেষ পূজারূপে 'সহস্রনামে'র ব্যবস্থা হ'ল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অপরে মহাদেবকে বিল্বদল অর্পণ করতে লাগলেন। শিবের সহস্রনামের এই ভক্তিপ্লুত আবৃত্তি শ্রবণ করতে করতে আমরা যেন আর এক জগতে চলে গেছি এবং কিছুক্ষণের পর আরতি দর্শন ক'রে ফিরে এলাম আমাদের বিশ্রামস্থানে। একটু বিশ্রাম করেই আমরা আবার গেলাম মন্দিরে। পুরোহিত ব'লে দিয়েছিলেন— শয়নারতি ও তার পূর্বে শোভাযাত্রা বিশেষ দর্শনীয় বস্তু। আমরা যখন গেলাম, তখন শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে, উৎসব-মূর্তিকে নিয়ে ব্রাহ্মণেরা এগিয়ে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে নানাপ্রকার বাদ্যের ব্যবস্থা রয়েছে। পার্বতীর মন্দিরের নিকটবর্তী একটি কক্ষে শিবপার্বতীর শয়নের ব্যবস্থা। শয়নারতি দর্শন ক'রে আমরা ধন্য হলাম। মন্দিরের মধ্যে ২২টি তীর্থ আছে।*

* (১) মহালক্ষ্মী তীর্থ (২) সাবিত্রী তীর্থ (৩) গায়ত্রী তীর্থ (৪) সরস্বতী তীর্থ (৫) মাধব তীর্থ (৬) গন্ধমাদন তীর্থ (৭) গবাক্ষ তীর্থ (৮) গয় তীর্থ (৯) নল তীর্থ (১০) নীল তীর্থ (১১) শঙ্খ তীর্থ (১২) শঙ্কর তীর্থ (১৩) ব্রহ্মহত্যা-বিমোচন তীর্থ (১৪) সূর্য তীর্থ (১৫) গঙ্গা তীর্থ (১৬) চন্দ্র তীর্থ (১৭) যমুনা তীর্থ (১৮) গয়া তীর্থ (১৯) শিব তীর্থ (২০) সত্যামৃত তীর্থ (২১) সর্ব তীর্থ (২২) কোটি তীর্থ।

এ ছাড়াও মন্দিরের বাহিরে আছে ২১টি তীর্থ। কিন্তু এগুলি ভাল ক'রে দেখার সময় আমাদের ছিল না। রামেশ্বর ও মা পার্বতীকে দর্শন করেই আমরা তৃপ্ত হলাম। মন্দিরের মধ্যে নটরাজের একটি নৃত্যপরায়ণ মূর্তি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

রামেশ্বরের মন্দিরের সঙ্গে বাংলা দেশের তথা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর সম্পর্ক অনেক দিনের এবং অতি নিবিড়। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃদেব পুণ্যশ্লোক ক্ষুদিরাম পদব্রজে এই মন্দিরে এসেছিলেন এবং সেইজন্য তাঁর মধ্যম পুত্রের নামও রেখেছিলেন 'রামেশ্বর'। শ্রীশ্রীমা রামেশ্বর-দর্শনে এসে ১০৮টি স্বর্ণবিল্বপত্রে পূজা করেছিলেন। আর স্বামীজীর সঙ্গে এই মন্দিরের সম্পর্ক কি, তা পাঠকমাত্রেই সবিশেষ অবগত আছেন। রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি ছিলেন স্বামীজীর একান্ত অনুগত ও গুণমুগ্ধ ভক্ত। স্বামীজী পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এলে রামনাদের রাজা তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করেছিলেন। গাড়ির ঘোড়া খুলে রাজা নিজেই সে গাড়ি টেনেছিলেন। স্বামীজীর সম্মানে রামেশ্বর মন্দিরের মধ্যেই একটি সংবর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে স্বামীজী বলেছিলেন :

'This is the gist of all worship—to be pure and to do good to others. He who sees Siva in the poor, in the weak and in the diseased really worships Siva ; and if he sees Siva only in the image, his worship is but preliminary. He who has served and helped one poor man seeing Siva in him, without thinking of his caste and creed or race or anything, with him Siva is more pleased than with the man, who sees Him only in temples.'

মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢোকবার প্রধান দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে মার্বেল পাথরে এই কথাগুলি খোদাই করা আছে। স্বামীজীর এই বক্তৃতা রাজাকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে, পরদিনই তিনি এক সহস্র দরিদ্রকে অন্ন বস্ত্র দিয়ে সেবা করেন।

এ-ছাড়া ভাস্কর সেতুপতি স্বামীজীর পাশ্চাত্য-বিজয়ের স্মারকরূপে পাম্বানে একটি বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন, যার মাথায় লেখা ছিল—'সত্যমেব জয়তে।' সেই স্তম্ভটির অবশ্য কোন খোঁজ পাওয়া গেল না, বোধ হয় সমুদ্রে চলে গিয়েছে।

এ-সকল কথা ভাবতে ভাবতে 'বিবেকানন্দ-ভাস্করম্'-এ ফিরে এসেছি। কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের প্রধান পরিচালক এসে আমাদের প্রত্যেককে এক-একটি কৌটা উপহার দিলেন। এতে প্রসাদী চন্দন ও কুমকুম ইত্যাদি আছে এবং বললেন, 'রাজার পক্ষ থেকে আপনাদের আমি এই প্রসাদ-কৌটা নিবেদন করছি।' এই প্রসাদ-কৌটা আমরা পরম শ্রদ্ধায় মাথায় ঠেকালাম—শ্রীরামেশ্বরের প্রসাদ ছাড়াও এর সঙ্গে ছিল স্বামীজী ও সেতুপতি ভাস্করের পুণ্যস্মৃতি।

আমাদের আহারের ব্যবস্থা মন্দির-কর্তৃপক্ষই করলেন; এবং পুরোহিত ব'লে গেলেন ভোরে অভিষেক-দর্শনের জন্য।

ভোর ৬টায় আমাদের ট্রেন। রাত্রি ৩টায় আমরা উঠে পড়লাম এবং বিছানাপত্র বেঁধে ৪টায় মন্দিরের মধ্যে গেলাম। মঙ্গলারতি, স্ফটিকলিঙ্গের অভিষেক ও পঞ্চামৃত-স্নান বেশ ভালভাবেই দর্শন করতে পেলাম।

মন্দিরের কর্তৃপক্ষ আমাদের সব রকমের সুযোগ সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। নতুবা এই অল্প সময়ের মধ্যে এত সব দেখার সুযোগ কখনই হ'ত না। শ্রীরামেশ্বরকে আমাদের শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ের অসংখ্য প্রণতি জানিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলাম।

মাদুরা

এবার আমরা চলেছি মাদুরার দিকে। পাম্বান জংশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে, কফি কেনার জন্য এখানে অনেকেই নামেন। আমিও নেমেছি দু-কাপ কফি নেব—এক কাপ নিজের জন্য, আর এক কাপ একজন সঙ্গীর। কফি কেনা হয়ে গেছে, কিন্তু ট্রেনও চলতে আরম্ভ করেছে। কফির কাপ নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গার্ডের কামরার কাছে যখন এসে পৌছলাম, তখন ট্রেন পুরোদমে চলছে। কাজেই লাফ দিয়ে গাড়িতে উঠতে হ'ল। গার্ড-ভদ্রলোক আমার একটা হাত যদি না ধরতেন, তাহলে হয়তো এই প্রবন্ধ লেখা কখনই সম্ভব হ'ত না। অজানা অচেনা সেই গার্ডটিকে তাই এখানেই অজস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বলা বাহুল্য কফির কাপ আগেই হস্তচ্যুত হয়েছে। মাদুরায় আমাদের পৌছতে বেলা প্রায় ১টা হ'ল। গাড়ি থামবার আগেই চেয়ে দেখি—আমাদের চিরপরিচিত এবং এখানে অপ্রত্যাশিত ভজহরি মহারাজ! মাদুরায় গান্ধী-স্মারকনিধির প্রকাণ্ড অতিথি-ভবনে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্নানাহার বিশ্রামের পর সেক্রেটারি দত্তবাবু গান্ধী-সংগ্রহালয়টি ঘুরে ঘুরে দেখালেন।

মীনাক্ষী

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মাদুরার বিখ্যাত মীনাক্ষী-মন্দিরে উপস্থিত হলাম। রাজা মকরধ্বজ পাণ্ড্যের একমাত্র কন্যারূপে দেবী জন্মগ্রহণ করেন। ভাসা ভাসা সুন্দর চোখ-দুটির জন্য তাঁর নাম রাখা হয় 'মীনাক্ষী'। পুত্রহীন রাজা যজ্ঞ করেন পুত্রকামনায়। কিন্তু পুত্র-সন্তানের পরিবর্তে পবিত্র হোমানল থেকে আবির্ভূত হ'ল এক অপরূপ সুন্দরী বালিকা! বালিকার তিনটি পয়োধর! এই সময় দৈববাণী হ'ল—'এ বালিকা সামান্যা নয়। যে মুহূর্তে বালিকা তার স্বামীর দর্শন পাবে, সেই মুহূর্তে তার মধ্যের পয়োধরটি অদৃশ্য হবে।'

বালিকা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ

করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে রাজ্য বিস্তার করতে করতে শিবরাজ্য কৈলাসপুরী আক্রমণ করেন। কৈলাসপতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু বালিকা দেখলেন কৈলাসপতি-দর্শনে তাঁর তৃতীয় পয়োধরটি অন্তর্হিত হয়েছে। বুঝলেন, ইনিই তাঁর স্বামী। শিবও তাঁকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কুমারী মীনাক্ষীর সঙ্গে শিবের বিবাহ হ'ল। এখানে শিবের নাম হ'ল 'সুন্দরেশ্বর' বা 'সোমসুন্দর' এবং তাঁদের যে পুত্র-সন্তান লাভ হ'ল, তাঁরই নাম সুব্রহ্মণ্য। দক্ষিণ ভারতে কার্তিক এই নামে পরিচিত।

মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢুকে প্রথমেই সুব্রহ্মণ্য-মন্দিরে যেতে হয়—এদেশের কার্তিক 'আইবুড়ো' নয়, তাঁর দুপাশে দুই স্ত্রী—বল্লী ও দেবসেনা। প্রাচীরে ও ছাদে (ceiling) সুন্দর সব চিত্র। সম্মুখের বড় চিত্রটিতে কার্তিকের বিবাহ বর্ণিত; বিষ্ণু 'কন্যাদান' করছেন।

মীনাক্ষীদেবীর মন্দিরটি অতি পুরাতন। এখানকার গোপুরম্‌গুলি দক্ষিণ ভারতের মধ্যে সর্বোত্তম। কিছুদিন পূর্বে প্রেসিডেণ্ট ডক্টর রাধাকৃষ্ণন এখানে এসেছিলেন। তাঁর আসার পূর্বে মন্দিরের সংস্কার-কার্য সাধিত হয়েছে। গোপুরমের সংখ্যা নয়টি। গোপুরমে অসংখ্য মূর্তি ও কারুকার্য দর্শককে সত্যই মুগ্ধ করে।

মন্দিরে মায়ের ধূপ-দীপ নারিকেল-কলা প্রভৃতি পূজাদ্রব্য নিবেদন করা হ'ল। এই-সব নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত মাকে কর্পূরের আরতি ও কুমকুম নিবেদন করলেন। বলা বাহুল্য, আমাদের জামা উত্তরীয়াদি খুলে উন্মুক্ত দেহে মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়েছিল। মন্দির দর্শন ক'রে আমরা মহা তৃপ্তি নিয়ে অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখতে গেলাম।

মীনাক্ষী-মূর্তি অতি কমনীয়। উচ্চতায় ৪ ফুট। মায়ের মন্দিরের পাশেই শিবের মন্দির। নৃত্য-পরায়ণ নটরাজ এখানেও রয়েছেন। নানা দেবদেবীর মূর্তিতে এই মন্দিরটি সুসজ্জিত। সুন্দরেশ্বরের সহিত মীনাক্ষীর বিবাহ-চিত্র (মীনাক্ষী-কল্যাণম্‌), ও শিবের বিভিন্ন কীর্তির চিত্র বিশেষ দর্শনীয়। ঘুরতে ঘুরতে আরও দেখলাম বিষ্ণুর মোহিনীবেশ, সহস্র-স্তম্ভের নাট-মন্দির, বৃষোপরি হরপার্বতীর যুগলমূর্তি, অর্ধনারীশ্বর, হরিহর-মূর্তি, শিবের রণবেশ, দক্ষিণ পাদ স্কন্ধে দিয়ে নৃত্যরত শিব। সহস্র স্তম্ভের নাট-মন্দিরটি কারুকার্যের অপূর্ব নিদর্শন। এ ছাড়া আরও একটি জিনিস উল্লেখ করার মতো। একটি সুর-স্তম্ভ (Music Pillar) দেখলাম—মৃদু আঘাতে সাতটি সুরই তাতে শুনতে পাওয়া যায়।

একদল ভক্ত নরনারী বোধ হয় সংবাদ পেয়ে এসেছিলেন এবং আমাদের অনুগমন করছিলেন। আমরা তামিল ভাষা জানি না, তারাও বাংলা জানেন না, দু-একটি ইংরেজী কথার মাধ্যমে, বেশির ভাগ নীরব হাসিতে ভাব-বিনিময় হ'ল। 'সারদা-সঙ্ঘের' একদল ভক্ত মহিলাও ছিলেন এঁদের মধ্যে। মা মীনাক্ষীদেবীর কিছু প্রসাদ তাঁদের দিলাম। কয়েকটি ছেলে আমাদের দেখিয়ে বলছিল, 'বিবেকানন্দর্'—স্বামী বিবেকানন্দের লোক, শেষের 'র' সম্মানজ্ঞাপক।

সন্ধ্যার কিছু পরেই ফিরে এসে রাত্রির আহার হ'ল স্মারকনিধির অক্লান্ত কর্মী বিশ্বনাথনের বাড়িতে। বিশ্বনাথনের পরিবারের সকলেই রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত পরিচিত। তাঁদের আদর-আপ্যায়নে আমরা সত্যই অভিভূত হয়েছি। ঠাকুর-স্বামীজীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা তাঁদের। এঁরা আসলে গুজরাতী, কিন্তু এখানকার বাসিন্দা হয়ে গেছেন। মাদুরা থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যাওয়ার একটি বাসের ব্যবস্থা করে দিলেন এখানকার ভক্তেরা।

কন্যাকুমারী যাত্রা

পরদিন ভোরে প্রায় চারটায় বাস ছাড়লো। রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত শহর ও শহরতলী বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বিরুদ্ধনগরে এসে গেছি। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীকামরাজের জন্মভূমি ও কর্মভূমি এই বিরুদ্ধ-নগর। এখানে ব'লে রাখা ভাল—এই দিনই ছিল ২৬শে জানুআরি। অতি প্রত্যুষেই এখানে পথে গৃহে চারিদিকে জাতীয় পতাকার সমারোহ। প্রজাতন্ত্র দিবসের আনন্দোজ্জ্বল উৎসবের চিহ্ন সর্বত্রই স্পষ্ট। বাস এগিয়ে চ'লল। পথের দুই ধারে কোথাও শস্যশ্যামল গ্রাম, কোথাও ছোট ছোট পাহাড়ের শিখর-শোভা, কোথাও বা নির্মীয়মাণ শহরের নূতন নূতন কলকারখানা। দূরদিগন্তে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা—নব নব দৃশ্যের অভিনব সম্ভার। প্রায় বেলা ৮টার সময় তিরুনেলভেলীতে এসে হাজির হলাম। শ্রীরত্নম্ এর Thangu Villa-তে আমাদের কফির ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য—কফি মানেই পঙ্গল, দোশে, কলা প্রভৃতি আনুষঙ্গিক অনেক কিছুই। এখানে কিছুদিন পূর্বে স্বামীজীর শতবার্ষিকী-উৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রকাশিত একটি সুদৃশ্য স্মারকগ্রন্থও আমরা দেখলাম। আর দেখলাম স্বামী নিরাময়ানন্দ-লিখিত 'ছোটদের বিবেকানন্দ' পুস্তকের তামিল সংস্করণ। রত্নম্‌কে যখন বলা হ'ল নিরাময়ানন্দ যে এখানে উপস্থিত, তখন তিনি তার ছোট ছেলেকে বললেন, 'তুমি ওঁকে দিয়ে তোমার বই-এ নামসই করিয়ে নাও।' ছেলেটিও তৎপর—আলাপ হ'ল নীরব ভাষায়। আমাদের পরিচিত গোপাল চট্টোপাধ্যায়-রচিত দক্ষিণেশ্বরের বিবরণ-পুস্তিকাও (ইংরেজীতে) রত্নম্-এর টেবিলের ওপর ছিল। এঁদের বাড়ির অনেকেই বেলুড়-দক্ষিণেশ্বর দর্শন ক'রে এসেছেন। তিরুনেলভেলী থেকে আমরা সোজা দক্ষিণে চলেছি, একজায়গায় পথ দুভাগ হয়ে গেল—ডান দিকে 'নাগের কোইল', বামে কন্যাকুমারীর পথ। বাস চলেছে জোরে—তার চেয়ে জোরে চলেছে আমাদের মন। হঠাৎ মাইল-পোস্ট চোখে প'ড়ল কন্যাকুমারী ১ মাইল! ১১টার সময় কন্যাকুমারী পৌঁছে সরকারী চৌল্‌ট্রিতে (পান্থশালা) আমরা ৬।৭ খানি ঘর পেয়ে গেলাম নির্দিষ্ট ভাড়ায়। সমুদ্রের ওপরেই এই পান্থশালা। অতি মনোরম দৃশ্য। জিনিসপত্র রেখেই আমরা দৌড়লাম মন্দিরে, ধুলা-পায়ে মাকে দর্শন করার জন্য। দীপমালার মধ্যে মায়ের কুমারী-মূর্তি দণ্ডায়মানা—করে অক্ষমালা, সন্তান-কল্যাণে মা চিরতপস্বিনী—মা ভারতজননী, মা বিশ্ব-জননী! স্বামীজীকে কে ও কেন হিমালয় থেকে কুমারিকায় আকর্ষণ করেছিল, তার কিছুটা রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'ল। আমরা পান্থশালায় ফিরে এলাম, আর চাঞ্চল্য নেই, গতি স্থির। এবার স্নান ও আহারের ব্যবস্থা, মন্দিরের নিকটেই ১৬টি স্তম্ভযুক্ত একটি মণ্ডপ—তার কাছেই স্নানের ঘাট। সকলেই পরিতৃপ্ত মনে তিন সমুদ্রের সঙ্গমে স্নান করতে লাগলাম। আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল স্থানীয় একটি পরিচ্ছন্ন হোটেলে।

কন্যাকুমারী

কন্যাকুমারীর মন্দির অতি প্রাচীন। কথিত আছে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পরশুরাম স্বয়ং। ছোট মন্দিরটি একেবারে সমুদ্রের উপরেই, একটা শক্ত প্রাচীর দিয়ে চতুর্দিক সুরক্ষিত। উত্তর গোপুরম্ দিয়েই মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়; দ্বারম্, বলিপীঠম্, ধ্বজস্তম্ভ, নাটমন্দির প্রভৃতি অতিক্রম ক'রে গর্ভমন্দিরে যেতে হয়। মায়ের

মূর্তিটি অতীব সৌম্য। দক্ষিণদেশে প্রচলিত কুমারীর বেশে মা সুসজ্জিতা।

মায়ের পূজার সময়াদির খবর নিলাম। পূজার সময় নিম্নরূপ। এ-ছাড়া নবরাত্রির সময় মন্দিরের বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়ে থাকে।

প্রাতে ৫ ঘটিকায় দেবীর অভিষেক ও সন্ধিপূজা। সকাল ৮ ঘটিকায় উদয়-মার্তণ্ড পূজা। ১০ ঘটিকায় মহা অভিষেক এবং অলঙ্কার দ্বারা শৃঙ্গার। ১১॥০টায় মধ্যাহ্নে মহাপূজা ও দীপারতি। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় আবরণ-উন্মোচন। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সন্ধ্যারতি এবং রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যন্ত অর্চনা। ৮ ঘটিকার পর ভোগ ও আরতি এবং শোভাযাত্রা।

কন্যাকুমারী সম্বন্ধে একাধিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

ভরত-রাজার ৮ পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। ভারতের দক্ষিণাংশ এই কন্যার অংশে পড়ে। এই দক্ষিণাবর্তে তিনি কুমারীরূপে বহুকাল তপস্যা করেছিলেন—তাই এই স্থানের নাম 'কন্যাকুমারী'।

আবার কেহ কেহ বলেন, বাণাসুরকে বধ করার জন্য পার্বতী কন্যারূপে আবির্ভূত হয়ে কুমারীরূপে এই স্থানে তপস্যারতা ছিলেন, তাই এর নাম 'কন্যাকুমারী'। বাণাসুর অমরত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিল। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বাণাসুরকে বর দেন—কুমারী ব্যতীত আর কেউই তোমাকে বধ করতে পারবে না। গর্বান্ধ অসুর একেই অমরত্ব-বর মনে ক'রে দেবতাদের উপর প্রবল অত্যাচার শুরু করে। অত্যাচারিত দেবগণ হরপার্বতীর শরণাপন্ন হন এবং মা পার্বতী তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করতে স্বীকৃতা হন। দেবতারা এক বিরাট যজ্ঞ করেন এবং সেই হোমানল থেকে দেবী কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। কালক্রমে কন্যারূপা পার্বতী বয়ঃপ্রাপ্তা হলেন। এদিকে শিবও 'শুচীন্দ্রম্' নামক তপঃক্ষেত্রে এসে গেছেন। বিবাহের আয়োজন চলতে থাকে। দেবতারা প্রমাদ গণলেন। তাঁরা নারদকে ধরলেন এর প্রতিবিধান করতে। কিন্তু দেবাদিদেবের বিবাহ বন্ধ করা কঠিন ব্যাপার। বিবাহের নির্দিষ্ট রাত্রিও এসে গেছে। দেবতারা অনেকেই মহাদেবের বিবাহে বরযাত্রী হলেন; নারদও নিমন্ত্রিত হয়ে চললেন তাঁদের সঙ্গে। কিছুদূর যাওয়ার পর নারদ একটি পাহাড়ের আড়াল থেকে মোরগের ডাক ডাকতে লাগলেন। আত্মভোলা মহাদেব ভাবলেন—প্রভাত হয়ে গেছে, বিবাহ তো হবে না, আর অগ্রসর হওয়াও ঠিক নয়। মহাদেব ফিরে এলেন। কুমারী এ-সংবাদ পেয়ে দুঃখিত হলেন। বরযাত্রীদের জন্য প্রস্তুত অন্নাদি পাথরে পরিণত হ'ল। এ অঞ্চলে এখনও অনেক প্রস্তর-কণিকা পাওয়া যায়, যেগুলির আকার খাদ্যবস্তুর মতো। ভাতের মতো কাঁকরও চোখে প'ড়ল অনেক। ইতিমধ্যে লগ্নভ্রষ্টা কুমারী পার্বতীর পূর্বকথা স্মরণ হ'ল। তিনি বাণাসুরকে বধ করার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

বাণাসুরও তার দূতমুখে সংবাদ পেয়েছে—দক্ষিণাবর্তে এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা রয়েছেন, বিবাহের জন্য প্রস্তাব পাঠালো। কিন্তু দেবী বললেন, 'যদি সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজিত করতে পারো, তবেই এ প্রস্তাব বিবেচিত হবে।' দেবীর সঙ্গে বাণাসুরের প্রবল যুদ্ধ হ'ল, যুদ্ধে বাণাসুর নিহত হয়। দেবতারা অসুরের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পান। দেবী কিন্তু সেই থেকে সন্তান-কল্যাণে কন্যাকুমারীরূপে গভীর তপস্যায় নিমগ্না!

কন্যাকুমারীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম! পূর্বদিকে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে আরবসাগর আর দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের অনন্ত জলরাশি!

মন্দিরের একটু কাছে দাঁড়ালে পূর্ণিমার দিন সূর্য ও চন্দ্রকে একই সঙ্গে দেখা যায়। একদিকে সূর্যাস্ত, অন্যদিকে চন্দ্রোদয়। এখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দুইই দেখবার জিনিস।

মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে একটি ছোট মন্দিরে ঐ দিনই (২৬শে জানুআরি) স্বামীজীর ধ্যানমূর্তি একটি বসানো হ'ল। শুনলাম—এই মন্দিরের মতো আর একটি মন্দির হবে—শঙ্করাচার্যের। স্বামীজীর পুণ্যনামাঙ্কিত একটি লাইব্রেরিও আছে টেম্পল রোডের উপর। সমুদ্রের কাছে বৃহৎ গান্ধী স্মৃতি-সৌধটি পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় না। এ-ছাড়া আছে কয়েকটি গীর্জা এবং মায়ের মন্দিরের অদূরে 'বিবেকানন্দ-রক' (Rock)। পরিব্রাজক স্বামীজীর ভারত-পরিক্রমার ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছিল এই কন্যা-কুমারীতে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে। কন্যা-কুমারীর মন্দিরে দেবী-অর্চনার পর স্বামীজী সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা অতিক্রম করেছিলেন সন্তরণে এবং একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। সকলেই জানেন—নরঋষির ধ্যানমানসে ভারতবর্ষের বর্তমান দুরবস্থার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাসিত হয়েছিল। সে থেকে এই প্রস্তর-দ্বীপ স্বামীজীর পুণ্য নাম বহন ক'রে আসছে।

পরদিন মায়ের অভিষেক দেখার জন্য অতি প্রত্যুষেই আমরা মন্দিরে উপস্থিত হলাম। মায়ের সমস্ত সজ্জা উন্মোচন ক'রে ঘড়া ঘড়া সমুদ্রবারি দিয়ে স্নান করানো হ'ল এবং তারপর অতি সাধারণ বেশভূষায় মায়ের দেহ আচ্ছাদিত হ'ল। নিরাভরণ সেই কৃষ্ণপ্রস্তরের মূর্তির সৌন্দর্য সত্যই অপরূপ। মনে হ'ল মহাশান্তি, মহাপ্রেম, মহাকরুণা মায়ের মুখমণ্ডল থেকে চারিদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। পূজাদি যা দেবার এখনি তা সেরে নিতে হবে, কেননা ৯টার মধ্যেই আমাদের রওনা হওয়ার কথা।

বিবেকানন্দ-রক

ইতিমধ্যে আমাদের বিবেকানন্দ-রকে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বিবেকানন্দ-রক কমিটির সৌজন্যে ও ব্যবস্থাপনায় একটি নৌকা পাওয়া গেল। অবশ্য সমুদ্র বড় অশান্ত—বড় বড় ঢেউ নৌকাকে ডুবিয়ে দেবার উপক্রম করছে। কিন্তু ভয় কিসের? আমরা যে অভয়ের পূজারী, 'অভীঃ'-মন্ত্রের উপাসক!—এই কথা ভাবতে ভাবতে প্রায় দু-ফার্লং আমরা সমুদ্র অতিক্রম করেছি। নৌকা বিবেকানন্দ-রকে এসে গেছে

আমরা ভারতের শেষ শিলাখণ্ডে! এই প্রস্তরখণ্ডের উপর স্বামীজীর মূর্তি-প্রতিষ্ঠা নিয়ে সারা দেশে এক আলোড়ন হয়ে গেছে। এখানে মূর্তিপ্রতিষ্ঠা হ'লে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হানি হবে—এ ধরনের আশঙ্কা কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন; কিন্তু বিবেকানন্দ-রকে দাঁড়িয়ে এ ধরনের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক বলেই আমাদের বোধ হ'ল। এই পুণ্য শিলাখণ্ডের উপরে দুইটি দ্রষ্টব্য বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য—একটি মায়ের পদচিহ্ন—অবিকল একটি বালিকার পায়ের ছাপ, ঈষৎ লাল রঙের; অন্যটি মিষ্টি জলের ফোয়ারা—জল মুখে দিয়ে দেখলাম, সত্য সত্যই মিষ্টি। রক দুটির প্রত্যেকটি আয়তনে প্রায় এক একরের মতো।

বিবেকানন্দ-রক থেকে ফিরে মাকে আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে একান্ত অতৃপ্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করতে লাগলাম। একদিন বা দুদিনে এই স্থান দেখে দেখার আশা মেটে না—সে-কথা বলাই বাহুল্য। তবু আমাদের যেতে হবে। অপেক্ষমাণ বাস হর্ন দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে: আমি প্রস্তুত; এবার চলো উত্তরমুখে। (ক্রমশঃ)

মৃত্যুভয় ও মৃত্যুঞ্জয়

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

জনৈক ভক্তকে শ্রীমা সারদাদেবী আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, 'যদি শরীর থাকতে (দর্শন) না পাও, তাহলে দেহান্তে পাবে। মরবার সময় আমি আসব। আমার কোলে ব'সে মরবে। আমি এসে কোলে ক'রে তোমাকে নিয়ে যাব।'

এই আশীর্বাদ লাভ করিয়া ভক্তটি সুখী হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু মনঃক্ষুণ্ণও হন নাই কি? কেননা, আশীর্বাদের ভিতর মৃত্যুর কথা ছিল। একদিন যে মরিতে হইবে, ইহা মা ভক্তের হৃদয়ে গাঁথিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মরিতে হইবে, ইহা ভাবিয়া কাহার না দুঃখ হয়? মৃত্যু আমরা অহরহ দেখি, তবে নিজ-দিগকে মৃত্যুর সহিত জড়িত দেখিতে চাই না। একটি সহজ অবশ্যম্ভাবী ঘটনা জানিয়া দুঃখ-হাহাকার-বর্জিত দৃষ্টিতে মৃত্যুকে কয়জন দেখিতে পারেন? যিনি পারেন, তিনি ধন্য।

জীবনে আমাদের ব্যস্ততা এত উগ্র যে, আমরা মৃত্যুর কথা ভাবিবার সময় পাই না। মৃত্যুর জন্য আমাদের প্রস্তুতি এতটুকুও থাকে না। ইহার ফলে ওপারের ডাক যখন আসে, তখন আমরা একেবারেই দিশাহারা হইয়া পড়ি, আমাদের অন্তর্বেদনা এবং ভয়ের আর সীমা থাকে না। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলেই আমাদের জন্য উদ্বিগ্ন হন, আমাদিগকে এই পৃথিবীতে টানিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন, আমাদের জন্য নানা দেবদেবীর কাছে কত প্রার্থনা করেন। কখন কখন হয়তো আমরা বাঁচিয়া যাই, আবার কখন বা কোন কিছুতেই কাজ হয় না। চারিপাশে শোকের বন্যা তুলিয়া আমরা চিরকালের জন্য চোখ বুজি। বহুদিনকার পরিচিত, শতভাবে সম্পর্কিত বহু আশা-আনন্দ-সার্থকতার আবাস-স্থল পরিষ্কার জগৎটি এক মুহূর্তে অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। আমরাও কোন্ অজানা অন্ধকারের গর্ভে ঝাঁপ দিই, তাহাই কি আমাদের জানা আছে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সত্যই বলিয়াছেন, 'মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্'—(গীতা, ১০।১৪)। যাহা কিছু ভালবাসিতাম, যাহা কিছু নিকটে টানিতাম, যাহা কিছুর দিকে চাহিয়া থাকিতাম, সকলই মৃত্যুকালে হারাইতে হয়। একটি সূচ পর্যন্ত লইয়া যাইবার উপায় নাই। মৃত্যু সর্বহরই বটে।

কিন্তু ভগবদুক্তির তৃতীয় শব্দটিও তো তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান্ বলিতেছেন—মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চ অহম্। সকল বস্তু ও অভিজ্ঞতার হরণকারী যে মৃত্যু, তাহা আমিই—ভগবান্ যেমন সূর্যের আলো হইয়াছেন, চন্দ্রের কিরণ হইয়াছেন, ফুলের শোভা, আকাশের নীলিমা, শীতলতা হইয়াছেন, ভূচর-খেচর-জলচর অসংখ্য জীবের মধ্যে প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তেমনি সময় হইলে তিনিই মৃত্যুরূপে প্রাণ-স্পন্দনকে থামাইয়া দেন। মৃত্যু ভগবানেরই আর এক বিভূতি, কল্যাণ-শক্তি। মৃত্যু তাঁহারই মহিমা। জন্মমৃত্যু দুই লইয়া তাঁহার নৃত্য-ছন্দ। মৃত্যুকে বাদ দিলে ঈশ্বরের বিশ্ব-নৃত্য সম্পূর্ণ হয় না, তাল কাটিয়া যায়।

শ্রীভগবানের এই ঘোষণা মনে রাখিতে পারিলে আমাদের মৃত্যুভয় অনেকটা দূর হয়। আমরা বর্ষাকালে শরৎকালে মাঠে সবুজ-শ্রী

দেখি, বসন্তকালে অসংখ্য গাছে এবং লতায় বড় রকমের পুষ্পসম্ভার দেখি, দেখিয়া আনন্দ পাই। কিন্তু বৎসরের অন্য সময়ে যখন তৃণ শুকাইয়া যায়, বৃক্ষলতায় ফুলের মরশুম ক্ষান্ত হয়, তখন কি আমরা কাঁদিতে বসি? জানি সবুজের অন্তর্ধান—ফুলের অ-কাল একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। আবার মাঠ শস্যে ভরিয়া যাইবে, আবার সময়ে গাছে ফুল দেখা দিবে। প্রকৃতিতে প্রাণের উৎস্ফূর্তি এবং স্তিমিতভাব আমরা যেমন সহজ-ভাবে মানিয়া লই, নিজেদের ক্ষেত্রে ঐরূপ পারি না কেন? মানুষও তৃণ-বনস্পতির মতো বিশ্বপ্রাণের একটি অভিব্যক্তি নয় কি? জন্ম ও মৃত্যু তাহার স্বাভাবিক নিয়ম। ফুল যেমন ফুটিয়া শুকাইয়া যায়, আবার ফোটে—মানুষকেও তেমনি জন্মাইয়া মরিতে হয়, আবার জন্মাইতে হয়। প্রকৃতির এই নিয়মের মধ্যে কোন নিষ্ঠুরতা নাই, অন্যায্যতা নাই। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গোড়াতেই সংসারের এই সাধারণ ঘটনাটি মনোযোগ দিয়া লক্ষ্য করিতে বলিয়াছিলেন:

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ (২।২৭)

—যে জন্মিয়াছে, সে যে মরিবে, তাহা নিশ্চিত; যে মরিল, সে যে আবার জন্মাইবে, তাহাও ধ্রুব। অতএব এই অপরিহার্য ব্যাপারে তোমার শোক করা উচিত নয়। ভগবান্ বুদ্ধ সন্তানহারা জননীকে মৃত্যুর এই অপরিহার্যতা কী সুন্দরভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন! মৃত সন্তানকে বুকে লইয়া ব্যাকুলা নারী তথাগতের নিকট আসিয়াছেন, যদি তিনি অলৌকিক কোন উপায়ে সন্তানটিকে বাঁচাইতে পারেন। তথাগত বলিলেন, 'বেশ, বাঁচাইয়া দিব, যদি যে-গৃহে কখনও কেহ মরে নাই, এমন কোনও গৃহ হইতে এক মুষ্টি সর্ষপ লইয়া আসিতে পারো।' কত আগ্রহ লইয়া নারী দ্বারে দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন! সর্ষপ সর্বত্রই প্রচুর, কিন্তু মৃত্যুস্পর্শহীন গৃহ কোথাও মিলিল না। মাতা যখন ভগ্নহৃদয়ে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শাস্তাকে আর বেশী কথা বলিতে হইল না। নারী বুঝিলেন, অপরিহার্যের জন্য শোক করা বৃথা। প্রাচীন গ্রীসে স্টোয়েক দার্শনিকগণ অপরিহার্যকে ধীরভাবে গ্রহণ করিবার শিক্ষা দিতেন। ইহুদী ভক্ত মুশা (Moses) তাঁহার একটি গীতিতে (Psalm 90, Old Testament) বলিতেছেন—'মানুষ যেন ঘাসের মতো। সকালে তাহারা বাড়িয়া উঠে, সন্ধ্যায় শুকাইয়া গেলে তাহাদিগকে কাটিয়া লওয়া হয়। হে ভগবান্, তুমিও মানুষকে মৃত্যুর পথে টানিয়া লইতেছ, বলিতেছ—হে মানবশিশুরা, ফিরিয়া এস।'

* * *

যাঁহারা ভগবানের ভক্ত, তাঁহাদের চিন্তা ও আদর্শের সঙ্গে মৃত্যুভয় খাপ খায় না। তাঁহারা জানেন, দেহ ভঙ্গুর, জীবন চিরস্থায়ী নয়, পৃথিবীর আশা-আকাঙ্ক্ষা হর্ষ-বেদনা সাময়িক ঘটনা মাত্র, কিন্তু দেহের মধ্যে দেহের স্বামী চৈতন্য-ভাস্বর জগন্নাথ বাস করিতেছেন,—যাঁহার মৃত্যু নাই, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ কখনও ঘুচিয়া যায় না। তাঁহারই মধ্যে পৃথিবীর সকল প্রীতি ভালবাসা নিহিত রহিয়াছে, তাঁহারই ঐশ্বর্যে পৃথিবীর সকল প্রাপ্তি মূল্যবান্। দেহ হারাইতে পারি, পৃথিবীর পরিচিতদের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে পারি, পৃথিবীর দ্রব্যচয় আর না দেখিতে পারি, কিন্তু সর্বময় ভগবান্‌কে কখনও হারাইব না। জীবনের এপারে তিনি, ওপারেও তিনি। তাঁহারই আলোতে তো এই জীবনের সব কিছু দেদীপ্যমান ছিল, সেই আলো মৃত্যুর পরও নিভিবে না। সে-আলো যে স্বয়ংজ্যোতি, উহার যে জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই,

পরিবর্তন নাই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :

মষ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মষ্যেব অত উর্ধ্বং ন সংশয়ঃ॥

—মন আমাতে স্থাপন্ করিবার অভ্যাস কর, বুদ্ধি আমাতে নিবিষ্ট কর। এইভাবে আমার সহিত সম্পর্ক যদি পাকা করিয়া লইতে পারো, তাহা হইলে এই দেহ যখন থাকিবে না, তখনও আমাতেই তুমি অবস্থান করিবে। ইহা মনগড়া কথা নয়, নিঃসান্দগ্ধ সত্য।

হাঁ, ভক্তের নিকট ভগবানের আশ্রয়, কৃপা ও ভালবাসা পুঁথির কথা—কবির কল্পনা নয়, বাস্তব দৃঢ় সত্য। তাই মৃত্যু ভক্তের নিকট ভয়াবহ নয়। জীবনের মূল্য, তৃপ্তি, সার্থকতা তাঁহার নিকট ঈশ্বরকে লইয়াই। সেই ঈশ্বর যখন দূরে চলিয়া যাইবেন না, তখন মৃত্যুর সময় চোখ বুজিলে অনিশ্চিত অন্ধকারে ডুবিয়া যাওয়া তো নয়, জ্যোতির্ময় শ্রীভগবানের মুখই দেখিতে পাওয়া। ইহা শুধু অন্ধ বিশ্বাস নয়। কেন-না ভগবানের সত্তা ও প্রেম ভক্ত যে জীবনে ভূয়োভূয়ঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার সত্তা যে অবিনাশী, তাঁহার প্রেম যে অপরিবর্তনীয়, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ যে চিরন্তন!

কিন্তু এইরূপ মরণজয়ী ভক্ত হইতে গেলে কিছু সাধনার প্রয়োজন। শ্রীভগবান্ গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণ পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন। এই লক্ষণগুলি জীবনে ফুটিয়া উঠা চাই। সেজন্য প্রয়োজন চেষ্টা, উৎসাহ, অধ্যবসায়। যিনি ভক্ত হইবেন, তাঁহাকে সর্বভূতের প্রতি মৈত্রী ও করুণা অভ্যাস করিতে হইবে, 'আমি, আমার' ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে; তাঁহাকে হইতে হইবে সুখদুঃখে সমবুদ্ধি, ক্ষমাশীল। সন্তোষ, আত্মসংযম, ভগবানে মন বুদ্ধি সমর্পন তাঁহার অন্যতম সাধনা। সর্বদা তাঁহাকে শান্তভাব সাধিতে হইবে; উৎকট উল্লাস, ভয় ও উদ্বেগ তাঁহার পক্ষে বর্জনীয়। পবিত্রতা, অনাসক্তি হইবে তাঁহার চরিত্রের ভূষণ। শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-গ্রীষ্ম, নিন্দা-স্তুতিতে তিনি অবিচলিত থাকিবেন। ভগবান্‌কে ভালবাসাই তাঁহার পরম লক্ষ্য।

এইভাবে আমরা যদি দিনের পর দিন ভক্তি সাধিতে পারি, যদি যথার্থ ভক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে মৃত্যু আমাদিগের নিকট কোন সমস্যা বলিয়াই মনে হইবে না। মৃত্যুর মধ্যে আমরা প্রিয়তম ইষ্টদেবতার মুখ দেখিতে পাইব। ভক্ত তুলসীদাসজী একটি দোঁহাতে বলিয়াছেন, 'হে তুলসী, তুমি যখন পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে, তখন আত্মীয়স্বজন হর্ষ প্রকাশ করিতেছিল, তুমি কিন্তু কাঁদিতেছিলে! এখন এমনভাবে ভগবৎ-কেন্দ্রিক জীবন যাপন করিয়া চল, যাহাতে মৃত্যুর সময় লোকে তোমার জন্য কাঁদিবে, কিন্তু তুমি হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতে পারিবে।' এই 'হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাওয়াই' ভক্তের মৃত্যুজয়।

শ্রীভগবানের উপর বিশ্বাস-ভক্তি থাকিলে মৃত্যু যে আর বিভীষিকা বলিয়া মনে হয় না, তাহা ভক্ত-সাধকদের জীবন ও বাণী আলোচনা করিলে বুঝা যায়। সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার একটি গানে শমনকে শুনাইয়া বলিতেছেন : 'আমি কৃতান্তদলনী শ্যামার পুত্র, তাঁহার নামের গণ্ডি দিয়া দাঁড়াইয়া আছি; হে শমন, তুমি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না! তাঁহার আর একটি গানে আছে : মায়ের অভয় পদে প্রাণ যখন সমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার আর যমের ভয় নাই। হৃদয়ে কালীনাম-কল্পতরু রোপণ করিয়াছি। মৃত্যু যখন আসিবে, হৃদয় খুলিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিব—সে কাছে ঘেঁসিতে পারিবে না। রামপ্রসাদ তাঁহার

আর একটি মাতৃসঙ্গীতের শেষে বলিয়াছেন:

'শ্রীরামপ্রসাদে কয়, তবে আর কি রে ভয়!
অনায়াসে যম-জয় জীবনে মরণে ॥'

যাঁহারা আত্মবিচার করেন, নিজদিগকে দেহ-মন প্রাণ হইতে পৃথক্ চৈতন্য সত্তা বলিয়া জানেন, তাঁহাদের মৃত্যুভয় নাই। ইঁহারা জ্ঞানযোগী। জন্ম-জন্মান্তর হইতে আমরা একটি সর্বনাশা ভুল ধারণার বশে চলিতেছি—দেহ-মনের সহিত তাদাত্ম্যবোধ। ইহারই নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা। এই অবিদ্যা লইয়া আমরা পৃথিবীতে আসি। পৃথিবীর খেলা খেলিয়া চলি, পৃথিবী হইতে বিদায় লই, আবার মৃত্যুর পর অন্য জীবনে হাজির হই। আমরা নিত্যমুক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা হইলেও নিজদিগকে দেহ-মনের সহিত এমন ভাবে জড়াইয়া ফেলিয়াছি যে, দেহ-মনের সহিত সম্পৃক্ত বিশ্বকেই নিজেদের 'ঘর' বলিয়া মনে করি। সেই 'ঘর' হইতে চলিয়া যাইবার কথা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠি। অবিদ্যা আমাদের দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে। পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সামাজিক মান-প্রতিপত্তি, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, প্রভৃতির অনুশীলনে আমরা ব্যাপৃত থাকি, ইহাদের বাহিরে কখন কখন পরোপকার, সমাজসেবা বা সাধারণভাবে ধর্মকৃত্যও কিছু কিছু অনুষ্ঠান করি। কিন্তু বৃহৎ আত্মসত্যকে জানিবার ইচ্ছা ক্বচিৎ কখনও উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ এবং মনের দ্বারা উপলব্ধ ভাব ও জ্ঞানসমষ্টি বস্তুতঃ পারমার্থিক সত্যের তুলনায় অত্যন্ত সামান্য বস্তু। পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধি হইলেই কেবল সকল ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। জন্মহীন মৃত্যুহীন পরিবর্তনহীন ভূমাবস্তুই যে আমাদের আত্মস্বরূপ, উহা তখন আমরা বুঝিতে পারি। এই আত্মজ্ঞান হইলে আমাদের জন্মমৃত্যু-প্রবাহ ক্ষান্ত হয়—আমরা অসীম শান্তি ও শক্তি লাভ করি। ভগবদ্ভক্ত ভক্তির সাধনা দ্বারা যে আনন্দ ও অভয় লাভ করেন, জ্ঞানযোগীও আত্মানাত্ম-বিচার সহকারে আত্মসত্যের উপলব্ধি করিয়া সেই সার্থকতায় উপনীত হন। প্রণালী আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য একই। কঠোপনিষৎ বলিতেছেন:

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ (১।৩।১৫)

—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ হইতে পৃথক্ আদি-অন্ত-ক্ষয়-হীন ধ্রুব নিত্যবস্তু আত্মাকে জানিতে পারিলে আর মৃত্যুর মুখে পড়িতে হয় না।

এ-কথার অর্থ এই যে, আমি যখন ঠিক ঠিক বুঝিতে পারি যে, আমি অপরিবর্তনীয় জন্মহীন মৃত্যুহীন চৈতন্যসত্তা, তখন দেহ-মনের কোন বিকারই আমাকে আর স্পর্শ করে না। আমি জানি যে, দেহের মৃত্যু হইলেও আমার মৃত্যু নাই। এই জ্ঞানের বলে আমাকে আর কোন নূতন দেহ ধারণ করিতে হয় না।

কঠোপনিষদের উপসংহারে (২।৩।১৭) আছে:

মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত স্থানে অন্তরাত্মা সর্বদা বসিয়া রহিয়াছেন। অবিচলিত ধৈর্য লইয়া তত্ত্বদৃষ্টি আনিয়া দেহ হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিতে হইবে। তাঁহাকেই চিরশুদ্ধ জ্যোতির্ময় অমৃতস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'সম্রাট্, আপনি তো বেদবেদান্ত অনেক পড়িয়াছেন, পণ্ডিত বলিয়া বহু পূজা সম্মান লাভ করিয়াছেন, আচ্ছা, বলিতে পারেন এই দেহের পরমায়ু ফুরাইলে কোথায় যাইবেন?'

জনক প্রশ্ন শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গেলেন। পুঁথিগত বিদ্যা এক, আর উপলব্ধিমূলক বিদ্যা স্বতন্ত্র। জনকের শাস্ত্রজ্ঞান উপলব্ধির পর্যায়ে তখনও উপনীত হয় নাই। তাই তিনি ম্লানমুখে বলিলেন, 'নাহং তদ্ভগবন্ বেদ যত্র গমিষ্যামীতি।' —না ভগবন্, ঠিক তো বলিতে পারিতেছি না, মৃত্যুর পর কোথায় যাইব।' ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য তখন আত্মজ্ঞানের মর্ম তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন: যিনি সকল বাক্য এবং চিন্তার পারে, ইন্দ্রিয়ের 'অগ্রাহ্য', সর্বপ্রকার বিকার বন্ধন ও দুঃখ হইতে মুক্ত—তিনিই হইলেন মানুষের অন্তরতম সত্য আত্মা। এই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আর যাতায়াত নাই, ভয় নাই। যিনি নিজেকে আত্মা বলিয়া জানেন, তিনি আর যাইবেন কোথায়? তিনি দেখেন—এমন কোন কাল নাই, যখন তিনি বিদ্যমান থাকেন না; এমন কোন স্থান নাই, যেখানে তিনি নাই।

আত্মজ্ঞান হইলে অবিদ্যামুক্ত এমনই একটি আশ্চর্য দৃষ্টি আমরা লাভ করি। যতক্ষণ আমরা অবিদ্যার বশে, ততক্ষণই যমরাজ কাল-দণ্ড তুলিয়া আমাদের শাসাইতে পারেন। সেই অবস্থায় আমরা দেহ-মনের সঙ্গে নিজেদের জড়াইয়া বিশ্বসংসারের অসংখ্য বিক্ষেপের মধ্যে দিশাহারা। বার বার জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া কতই না বেদনা ও সন্তাপ আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞানের প্রভাবে অবিদ্যা যখন চলিয়া যায়, তখন আর আমরা যমের শাসনাধীন নই। তখন আর আমাদের কোন ভয় নাই, মোহ নাই, দুঃখ নাই। তখন আমরা প্রকৃতই মৃত্যুজয়ী।

ভক্তিলাভ করিতে গেলে যেমন যথারীতি সাধনা করিতে হয়, আত্মজ্ঞান-লাভের জন্যও সেই প্রকার পরিশ্রম আবশ্যক। কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন: যিনি অসৎ প্রবৃত্তি হইতে বিরত হন নাই, ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করেন নাই, চিত্তকে স্থির করেন নাই, তাঁহার পক্ষে আত্মাকে জানা সম্ভবপর নয়। সম্যক্ জ্ঞান দ্বারাই আত্মার উপলব্ধি হয়।

মৃত্যু আমাদের জীবনে একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। এই ঘটনাটি ভুলিয়া না থাকিয়া ইহার জন্য নিজদিগকে সময় থাকিতে প্রস্তুত করিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য। কতভাবে এই প্রস্তুতি হইতে পারে, তাহার কয়েকটি দিক আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম। উহাদের একটি বা দুইটি বা আরও অধিক উপায় আমরা সাধিতে পারি। কিন্তু সাধা প্রয়োজন। শুধু পুঁথির বুলি আওড়াইয়া মৃত্যুর ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। তত্ত্বদৃষ্টি বাস্তব হওয়া চাই, ভগবৎপ্রেম জীবন্ত হওয়া চাই, আত্মজ্ঞান পাকা হওয়া চাই। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে যিনি মৃত্যু-সমস্যার সমাধান করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বাঁচিবার সুখ উপভোগ করেন।

শিবসীমন্তিনী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রণাম করি দেবদেবীরে
যেখানেতে থাকেন যিনি,
থাকি আমি মায়ের কাছে
মা মোর শিবসীমন্তিনী।
তিনি ত্রিভুবনেশ্বরী
পাইনে দেখা কেঁদে মরি
তিনি সদানন্দময়ী
মহাকালের মনমোহিনী।

মা থাকিতে পাইনে খেতে
থাকি যে মা মরার মত,
দুখের মাঝে সুখেই থাকি
তাতেই বুকে গর্ব কত!
পারেন তিনি সব করিতে—
বিশ্বাস আমার অটুট চিতে।
ভাগ্যবন্ত পড়েই থাকি
যেন নেহাৎ ভাগ্যহত।

বিপদ্-সাগর গর্জে যখন,
ভয়ের যখন নাইক সীমা,
হাত বাড়িয়ে আমায় ডাকেন
কোলে কমল-কামিনী মা।
মোর চেয়ে কেউ নীচে তো নয়,
নেইকো আমার পতনের ভয়
বুকভরা মোর মায়ের কৃপা—
তাঁর বরাভয়, তাঁর গরিমা!

জীবন-স্ফুলিঙ্গ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথিবী,
স্বল্প আয়ু, বহু বিঘ্ন ; সঙ্কটে আকীর্ণ যাত্রাপথ ;
নৈরাশ্যে ও অবসাদে স্তিমিত জীবন
ভগবান্ ভাগ্য 'পরে একান্ত নির্ভর,
এমনি তো সহস্রের জীবন-চেতনা
মাঝে মাঝে ক্রোধে ক্ষোভে অশান্ত অস্থির।

তবু কৃতি মানুষেরই, ক্রতুতে সে অজর অমর
তাই চাই অগ্নি-জ্বালা
জীবন-স্ফুলিঙ্গে জ্বালা অসংখ্য মশাল।
অন্ধকার যাত্রাপথে সহস্র শিখায় যেন তার
জ্বলে ওঠে একই সঙ্গে অজস্র প্রাণের আকুলতা
বাহু মেলি' আকাশেরে ধরিবার উদ্ধত প্রয়াস
প্রচ্ছন্ন শক্তিতে হবে দুর্নিবার বাধাবন্ধহীন।

আমি জানি এ-পথের সমস্ত সংশয়
জীবন-স্ফুলিঙ্গে জ্বলি' ছাই হয়ে মিলাবে ধূলায়।
বিশ্বাসে আগামীকাল প্রসন্ন প্রভাতে
এ যাত্রার শেষ হবে, নিভে যাবে মশালের আলো
স্ফুলিঙ্গ-শিখায় প্রাণ প্রস্ফুটিত অরণ্য-কুসুমে
ঢেলে দেবে সুরভিত আঘ্রাণের আনন্দ-বৈভব।

মাটিতে শ্মশান-শয্যা, ঊর্ধ্বাকাশে জীবনের দ্যুতি
সে দ্যুতি উজ্জ্বলতর, জীবন-স্ফুলিঙ্গে অনির্বাণ।
নূতন রক্তের স্রোতে প্রবাহিত যে যুগ-যন্ত্রণা
সে যন্ত্রণা সহস্র মশালে
বার বার জ্বলে ওঠে অন্ধকারে। পথের দিশারী
দুর্গম পথের বন্ধু, অগ্নিমন্ত্রে বন্দনা তাহার।

সত্যি তুমি মা!

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

পাতানো মা নও তো তুমি, সত্যি তুমি মা,
অপার স্নেহময়ী তুমি, দয়াময়ী মা!
পাছে না পাই দেখতে তোমায়,
রূপ যে তোমার ভুবন ভরায়,
জ্যোতি তোমার উথলে পড়ে, জ্যোতির্ম্ময়ি মা!
পাতানো মা নও তো তুমি, সত্যি তুমি মা!

স্থলে জলে নভে তুমি, হয়েও নিরাকারা,
সন্তানেরে বক্ষে ধ'রে সদাই আপন-হারা!
আর্ত্ত-প্রাণের আকুল স্বরে,
তোমার প্রাণের স্নেহ ক্ষরে,
তাই তো আসো বক্ষে ভ'রে স্নেহের গরিমা,
পাতানো মা নও তো তুমি, সত্যি তুমি মা!

প্রাণ যে তোমার ঘনীভূত মধুর মমতায়,
দৃশ্যমান এই বিশ্ব গো তাই ভরা সুষমায়!
যা চেয়েছি, হয়েছ তাই,
তোমার কৃপার সীমা না পাই,
জড়াকারা তাই তুমি গো, চেতনময়ি মা!
পাতানো মা নও তো তুমি, সত্যি তুমি মা!

তোমার সাথে বাঁধন আমার নয় ক্ষণিকের নয়,
আমায় নিয়ে তোমার লীলা নিত্য হয়ে রয়!
সিন্ধু তুমি, বিন্দু আমি,
তবু কাছে আসো নামি',
এমনি করেই প্রকাশ কর তোমার মহিমা!
পাতানো মা নও তো তুমি, সত্যি তুমি মা!

আমার চোখে চাইছ তুমি, আমার তুমি প্রাণ,
আমার বুকের স্পন্দনেতে তুমি স্পন্দমান!
আমার জীবন-মরণ-মাঝে,
তোমার চলার ছন্দ বাজে,
তোমার বুকে মিলিয়ে নেবে, সেই তো তুমি মা!
পাতানো মা নও তো তুমি, সত্যি তুমি মা!

আগমনী

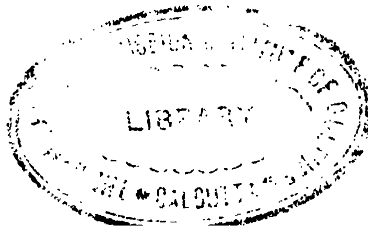
শ্রীমতী অমিয়া ঘোষ

আসিছে জননী ধরণীর বুকে
এনেছে শরৎ বারতা যার
আকাশে বাতাসে নিখিল ভুবনে
ছড়াল স্বরভি বারতা তার।
কমল-কোরক মুদিয়া নয়ন,
ভাবিছে এল কি পূজার লগন—
ধরিবে মায়ের কমল-চরণ
মেলি শতদল-হিয়ায় তার,
আসিছে জননী ধরণীর বুকে
বাজিছে চরণ-নূপুর যার।

আলো-ঝলমল স্বনীল আকাশে
রবি-শশী-তারা হাসে,
আশা-উন্মুখ মুগ্ধা ধরণী,
চেয়ে আছে যার আশে।
তুলেছে যতনে যত পুরবালা
কত না কুস্থম ভরে গেছে ডালা
পরিবে জননী গাঁথে তাই মালা,
স্বরভি পবনে ভাসে,
সাজায় ধরণী হৃদয়-অর্ঘ্য
জননীর অধিবাসে।

নিখিল বিশ্বে হেরি চারিদিকে
মাধুরীর পরকাশ,
শরত-আকাশে অরুণ-আভাসে
জাগে মা'র প্রতিভাস।
বোধনের বাঁশী বাজে মধু-ক্ষরা—
মঙ্গল-ঘট হয়ে গেছে ভরা,
ধরণীর বুকে আসিবে অধরা
পুরাতে সবার আশ ;
আসিছে জননী, নিখিল বিশ্বে—
জাগে তাই উল্লাস !

ঝরা শেফালীর আঁচল বিছানো—
স্বরভিত পথ দিয়ে,
আসিছে জননী বরাভয়করা,
স্নেহ ও করুণা নিয়ে।
বিশ্বমায়ের বেদীতলে আজ—
মিলিছে সকলে ফেলি শত কাজ ;
ছোট বড় দীন সবাকার মাঝ—
সাম্যের বাণী নিয়ে,
আসিছে জননী বিশ্বপ্রেমের
মিলনের সেতু দিয়ে।



যাত্রা

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

তখনো যে ঘণ্টা বাজে দূরে নদীতীরে,
অন্ধকারে যুক্ত কর ঊর্ধ্বে তুলে রাখে
ছায়ার মন্দির, স্তব্ধ অস্তাচল ঘিরে
শেষ রশ্মি আপনার আশীর্বাদ রাখে,
দিনান্তের খেয়াপারে ছলচ্ছল ধ্বনি
তখনো ঘাটের বুকে বাজে ঘুরে ফিরে,
জোনাকির দীপ জ্বেলে নিঃশব্দে ধরণী
জপ করে ঝিল্লিমন্ত্র সায়াহ্ন-সমীরে।

খুলে গেল রুদ্ধদ্বার, হয়েছে সময়,
আলোর আড়াল থেকে শুনেছে সে ডাক,
যে মহামৌনের বাণী চরাচরময়
ধ্বনিত স্পন্দিত ক'রে থেমে গেল শাঁক,
এসেছে আহ্বান তাঁর রাত্রির তিমিরে,
চেনার জগৎ থেকে অচেনার তীরে।

সে সুন্দরে পেতে হবে

শ্রীশান্তশীল দাশ

সে সুন্দরে পেতে হবেঃ আরো চাই দুশ্চর সাধনা;
সে আসে বন্ধুর পথে, যেখানেতে অজস্র বেদনা।
অনেক বিনিদ্র রাত্রি, রক্ত-ঝরা বিক্ষত হৃদয়,
তপ্ত অশ্রুকণা দিয়ে জীবনের পাথেয় সঞ্চয়
যেখানে, সে-পথ ধ'রে আস তুমি, তুমি যে নির্মম,
নিষ্ঠুর, নির্দয় তুমি, অপরূপ তুমি অনুপম।
কত না আঘাত হানো প্রতিদিন দিবসে নিশীথে;
বিনিদ্র রজনী কাটে, আস তুমি তীব্র ব্যথা দিতে
স্বপ্নমাঝে; যে-নিশীথে অবসন্ন, ক্লান্ত হয়ে পড়ি—
সেখানেও হে নিষ্ঠুর, সুঠাম সুন্দর মূর্তি ধরি'
দাঁড়াও সম্মুখে এসে; কাছে যাই, দূরে সরে যাওঃ
দিনে রাতে স্বপ্নমাঝে অহরহ আমারে কাঁদাও।
তোমার বিলাস একি! হাসো তুমি অপরে কাঁদিয়ে,
বলো, কী আনন্দ পাও অজস্র বেদনা ব্যথা দিয়ে
জানি না—আকুল হয়ে কাঁদি আমি তীব্র বেদনায়;
তবু বলি, হে নিষ্ঠুর, হে সুন্দর, ভুলো না আমায়।

মহাভারতে নীতিমূলক উপাখ্যান

অধ্যাপিকা ডক্টর যূথিকা ঘোষ

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে বেদ উপনিষদ্ পুরাণের সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের উল্লেখ অপরিহার্য, আবার এই মহাকাব্যদ্বয়ের উল্লেখের সঙ্গে সুপ্রাচীন গ্রীকসাহিত্যের ইলিয়াড ও ওডিসির কথাও স্বতই স্মৃতিপথে উদিত হয়। অবশ্য অন্যান্য দেশের প্রাচীন সাহিত্য মন্থন করলে অনুরূপ গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, তবে ভারতবর্ষের ও গ্রীসদেশের মহাকাব্যগুলি প্রায় সমধর্মী ব'লে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই কয়টি সুপরিচিত মহাকাব্যের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে সাতিশয় সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় একটি উল্লিখিত হ'লে প্রসঙ্গক্রমে অপরটির উল্লেখ স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়

এই সকল মহাকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বহুদিন ধরে এগুলি রচিত হয়েছে এবং দীর্ঘ রচনাকালের মধ্যে মূল কেন্দ্রীভূত কাহিনীর সঙ্গে অন্যান্য বহু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু অবাধে নিজ নিজ স্থান ক'রে নিয়েছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিপুণভাবে বিচার ক'রে দেখলে বোঝা যায় যে, মহাভারতের পূর্ণ রূপ গ্রহণ করতে অর্থাৎ 'শতসাহস্রী সংহিতা'য় পরিণত হ'তে প্রায় ৯০০ বৎসর সময় লেগেছিল এবং সেই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে চারণ-কবিগণ কুরু-পাণ্ডবের চিত্তবিনোদক যুদ্ধকথার সঙ্গে নিজেদের অভিপ্রেত নৃপতিদের বীর্যব্যঞ্জক উপকথা সংযুক্ত করতে দ্বিধা বোধ করেননি। ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ের বিষয়বস্তু সংযুক্ত হওয়ার ফলে মহাভারতের আয়তন অতিশয় পরিবর্ধিত হ'তে থাকে।

মহাভারতের নীতিমূলক উপাখ্যানের আলোচনার জন্যই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে মহাভারতের মধ্যে মূল কাহিনীর সঙ্গে অসংখ্য নীতিবাদের সমর্থক উপাখ্যানগুলির সংযোজন করা হয়েছে, তা যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রায় দীর্ঘ ৯০০ বৎসর সময়ের মধ্যে ক্রমে ক্রমে মহাভারতের স্বরূপের পরিবর্তন ও আয়তনের বিবর্ধন যেরূপে সাধিত হয়েছিল, তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'আর এক শ্রেণীর কবি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।···রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই—ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।··· আমাদের দেশে যেমন রামায়ণ মহাভারত, প্রাচীন গ্রীসে তেমনি ইলিয়ড ছিল। তাহা সমস্ত গ্রীসের হৃৎপদ্মসম্ভব ও হৃৎপদ্মবাসী ছিল। কবি হোমর আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষা দান করিয়াছিলেন। সেই বাক্য উৎসের মতো স্ব-স্ব দেশের নিগূঢ় অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইয়া চিরকাল ধরিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়াছে।' (প্রাচীন সাহিত্য—রামায়ণ)

কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয়পক্ষের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে সংঘটিত হয়েছিল, তাই মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু। এই যুদ্ধকাহিনী ক্ষত্রিয়-মাহাত্ম্য সগৌরবে

বিঘোষিত করে এবং এ-কথা সর্বজনবিদিত যে, প্রাচীন যুগে শৌর্যসূচক কাহিনী অতিশয় রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক ছিল। এই-সকল কাহিনীর এমন একটি মাদকতা বা সম্মোহনী শক্তি আছে, যার ফলে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় সহজেই অভিভূত হ'ত। কাহিনীগুলি তাদের চিত্তের সরসতা সম্পাদন ক'রত, স্মৃতিশক্তির উন্মেষ সাধন ক'রত, নীতিজ্ঞান-আহরণে সহায়তা ক'রত, আর অবসরসময়-যাপনের লোভনীয় উপায়স্বরূপ ছিল। মহাভারতের মধ্যে দুষ্মন্ত, যযাতি, নহুষ, নল প্রভৃতি অন্যান্য নৃপতির উপাখ্যান কাল-ক্রমে মূলকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় শ্রোতৃবর্গ নূতন রসাস্বাদনের সুযোগ লাভ ক'রে যে সমধিক তৃপ্ত হয়েছিল, সে-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। জনসাধারণের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীর প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ লক্ষ্য ক'রে চারণ-কবিগণ যে নৃপতিদের রাজসভায় সঙ্গীত পরিবেশন করতেন, প্রধান কাহিনীর সঙ্গে সেই-সব নৃপতির কীর্তিগাথা নিঃসঙ্কোচে সংযুক্ত করেন। ক্ষত্রিয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত মহাভারত কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্যসূচক বিবিধ উপাখ্যানের জন্যও দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণগণ নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর হয়ে অগস্ত্য, চ্যবন, কপিল প্রভৃতি প্রভাবসম্পন্ন ঋষিদের তপস্যালব্ধ অলৌকিক বিভূতি ও শক্তির বিবরণ দিতে সচেতন হয়েছিলেন। তারপর মহাভারতের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য ক'রে তৎকালীন চিন্তাশীল সম্প্রদায় জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব প্রচার ও ধর্মবোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে উপ-নিষদের আত্মতত্ত্ববোধক কয়েকটি উপাখ্যানের অবতারণা করেন; তা ছাড়া নীতিবোধ ও সদ্বুদ্ধি বিকশিত করার অভিপ্রায়ে এই বিশাল মহাকাব্যের মধ্যে অগণিত নীতিমূলক উপাখ্যানও সংযুক্ত করেন। ধীরে ধীরে বিবিধ বস্তু সংযুক্ত হওয়ার ফলে মহাভারতের কলেবর স্ফীত হয়ে উঠল। এ ছাড়া মহাভারতের মধ্যে দুর্বোধ্য দার্শনিক তত্ত্ব, রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থ-নীতির বিস্তৃত আলোচনাও বিরল নয় এই কারণে মহাভারত সম্বন্ধে সুচিন্তিত মন্তব্যটি 'যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে' প্রবাদ-বচনে পরিণত হয়েছে। মূল সংস্কৃত মহাভারতের মধ্যে অনুরূপ ভাবদ্যোতক শ্লোক (১।৫৭।২৪) আছে:

ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ।
যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ॥

—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে এই মহাকাব্যে যা আছে, তার সন্ধান অন্য রচনার মধ্যেও মিলবে; কিন্তু যা এখানে নেই, তা অন্যত্র কোথাও পাওয়া যাবে না।

মহামতি ব্যাসদেব মহাভারতকে অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই মহাকাব্যের বহুব্যাপকত্বেরই উল্লেখ রয়েছে এই (১।৫০।২৩) শ্লোকে:

ধর্মশাস্ত্রমিদং পুণ্যমর্থশাস্ত্রমিদং পরম্।
মোক্ষশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥

চিত্তবিনোদক উপাখ্যান শ্রবণের আগ্রহ মানুষের চিরন্তন কালের। প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছিন্ন কর্মানুষ্ঠানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য মানুষ বৈচিত্র্যের সন্ধান করে। প্রকৃতির রাজত্বে বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য, সময়ের ব্যবধানে প্রকৃতির রূপ-পরিবর্তন প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের তৃপ্তিসাধনে সহায়তা করেছে। দৈনন্দিন কর্মসমাপ্তির পর বৈচিত্র্যপ্রয়াসী মানুষ অন্য উপায়েও আনন্দ উপভোগের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। মহাভারতীয় উপাখ্যান শিশুসুলভ সরলতায় পূর্ণ প্রাচীন মানুষের মানসিক আহার্য-বিতরণের পক্ষে প্রকৃত উপযোগী ছিল। রূপকথার রাজকুমার ও রাজকুমারীর গল্প, তাদের জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত—তাদের

বিরহমিলন সম্পূর্ণ কল্পনারাজ্যের বিলাস হ'লেও যেরূপ শিশুমনকে সহজেই প্রভাবান্বিত করে, সেরূপ প্রাচীনকালের মানুষ মহাভারতীয় উপাখ্যানগুলির যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে প্রশ্নবাণে নিজেদের অন্তরকে জর্জরিত না ক'রে চিত্ত-বিনোদনের অপরিহার্য উপায় বিবেচনা ক'রে মনোযোগের সঙ্গে সেগুলি শ্রবণ ক'রত। সরস উপাখ্যানই জনগণকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করবার প্রকৃষ্ট উপায়; সেজন্য সমাজের কল্যাণ-কামী সম্প্রদায়ের উপাখ্যানের মাধ্যমে নীতি-প্রচারের উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিতই হয়েছিল। প্রতিটি গল্পের নীতি যাতে জনগণের চরিত্রের উৎকর্ষ ও সামাজিক আচার-ব্যবহারে পরিমার্জিত রুচি-বিকাশের সহায়তা করে, তার প্রতি তাঁরা সচেতন ছিলেন। পরবর্তীকালে গুণাঢ্য-রচিত যে 'বৃহৎকথা', যার পরবর্তী সংস্করণ সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' এবং ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথা-মঞ্জরী' নামে বিদিত, তার মধ্যে মহাভারতের নীতিমূলক উপাখ্যানের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বিবিধ উপকথার সমাবেশ হয়েছে। ঈসপের যে উপাখ্যান-সমূহ আছে, সেখানেও আমরা অনুরূপ প্রচেষ্টার নিদর্শন পাই। সেখানেও কাহিনী বিবৃত করার পর একটি ছোট বাক্যের মাধ্যমে মূলনীতি-কথাটির প্রচার করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট রচনা—'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ'—এই সমস্ত গ্রন্থে উপাখ্যান-বর্ণনার পর শ্লোকের মধ্যে নীতিবাদটি বিকশিত করা হয়েছে এবং এই শ্লোকগুলির মধ্যে কয়েকটি মূল মহাভারত থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

'We do not know how far these stanzas are original, for some of them occur in the epics and elsewhere, but they are generally phrased with epigrammatic terseness and form an interesting feature, inspite of the tendency to over-accumulate them.'

(De & Dasgupta, History of Sanskrit Literature. P. 91.)

গল্পের মাধ্যমে নীতিপ্রচারের রীতিটি ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধজাতক ও মহাভারতের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। মহাভারতের মধ্যে অষ্টাদশ পর্ব এবং বেশ কয়েকটি পর্বে কোথাও বেশী, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত কম এই-সব নীতিমূলক উপাখ্যান যুক্ত হয়েছে। উপাখ্যানগুলি সংযোজনার জন্য মহাভারতে যথোচিত পরিবেশ-সৃষ্টি আয়াসসাধ্য হয়নি, কেন-না বক্তার মুখে স্বমত সমর্থনের জন্য প্রায়ই নীতিমূলক উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের শ্রদ্ধাভাজন মহামতি রণকুশল ভীষ্মদেব এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর উভয় পক্ষকে সৎপথে পরিচালিত করবার জন্য ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধে কত যে উপদেশবাণী বর্ষণ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্ম, ইচ্ছামৃত্যু ছিল তাঁর, কিন্তু সমস্ত যন্ত্রণা সহাস্যবদনে নীরবে সহ্য ক'রে তিনি প্রিয় পাণ্ডব ও কৌরবদের হিতসাধনের জন্য নানাভাবে গল্পের মাধ্যমে উপদেশ দিয়ে গেছেন। যে পক্ষ তাঁর উপদেশ অনুসারে কর্মসাধনে তৎপর হয়েছে, সে পক্ষই উপকৃত হয়েছে। এই সব নীতিমূলক উপাখ্যানের সরসতা, যৌক্তিকতা, সুসমঞ্জস প্রয়োগ, সার্থকতা ও উপযোগিতা বিস্তৃতভাবে আলোচনার যোগ্য। কোথাও বা উপাখ্যান-গুলিতে প্রাণিজগতের প্রাধান্য, কোথাও বা প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রাচুর্য, কোথাও বা সাক্ষাৎ দেবগণের প্রভাব পরিস্ফুট, কোথাও বা এই-সবের সংমিশ্রণ ঘটে গেছে; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই নীতিপ্রচারের মূল উদ্দেশ্যটি অক্ষুণ্ণ ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে শর্করাবৃত

ঔষধের ন্যায় এই সব উপাখ্যানের উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। উইন্টারনিজ এ-সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন :

'But it is not only the morality of ascetism which finds expression in the moral narratives of the Mahabharata. Many of them appeal to us particularly for the reason that they teach more the everyday morality which is rooted in the love between husband and wife, parents and children.'

(History of Indian Literature, P. 413)

সামাজিক মানুষকে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখার জন্য কয়েকটি নৈতিক নিয়ম মেনে চলতে হয়। সভ্যতা-সন্ধানী মানুষ সমাজের বিশৃঙ্খলা কঠোরহস্তে দমন করে এবং প্রয়োজন-বোধে প্রকৃত অপরাধী ব্যক্তিকে যথোচিত দণ্ডদানে তৎপর হয়। পারস্পরিক সদাচার ও সুব্যবহার মানুষের স্বার্থবোধকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে, কেন-না সমাজে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভিন্ন একটি বৃহত্তর স্বার্থ রয়েছে, সেই স্বার্থের প্রয়োজনে অনেক সময় স্বকীয় ক্ষুদ্র স্বার্থকে প্রতিহত করা যুক্তিযুক্ত। সমাজ-জীবনে মানুষ যেমন অনেক কিছু সুবিধা ভোগ করে, সেই সঙ্গে তার মধ্যে কর্তব্যবোধও জাগ্রত হয়। এ কর্তব্য নিজের প্রতি, আত্মীয়স্বজনের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং এ কর্তব্য যথোচিতভাবে পালন করার জন্য নীতিশাস্ত্রের উপদেশের প্রয়োজনীয়তা আছে। নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে উপদেশাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা অপেক্ষা জীবনে অবস্থাবিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে যে বৃদ্ধব্যক্তি প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তাঁর কাছে নীতিশিক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। কেন-না তিনি জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে কখন কিভাবে প্রতিকূল পরিবেশকে স্বকীয় উদ্দেশ্য-সাধনের অভিমুখী ক'রে তুলেছিলেন, তা জানতে পারলে বহু বিপর্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সহজসাধ্য হ'তে পারে। অতি প্রাচীনকালে জগতের কল্যাণের জন্য ভার্গবমুনি নীতিশাস্ত্র প্রচার করেন—এ-কথা মহাভারতে উক্ত হয়েছে। বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞান-বৃদ্ধদের সাহচর্যের যে বিবিধ গুণ আছে, সে-কথা মহাভারতে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছে। মহাভারতের নীতিমূলক উপাখ্যানের সঙ্কলন একটি গ্রন্থে পরিণত হবে, সেজন্য প্রধান প্রধান কয়েকটি উপাখ্যানের আলোচনার দ্বারা মহাভারতের নীতিপ্রচারের উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হবে ব'লে মনে হয়।

আদিপর্বের মধ্যে নৃপতি যযাতির উপাখ্যান একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে আছে। ভোগলিপ্সু রাজা যযাতি সারা জীবন ধরে পার্থিব সুখের সন্ধান করেছেন। শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী রাজার স্ত্রী। দেবযানীর দাসী শর্মিষ্ঠার প্রতি রাজা প্রণয়াসক্ত হন ও ফলে শুক্রাচার্যের নিকট রাজার শাপপ্রাপ্তি। শুক্রাচার্যের শাপে অকালে জরাগ্রস্ত হয়ে নৃপতির মন অতিশয় দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে; আকস্মিক জরাক্রমণ-হেতু ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করতে না পারায় তাঁর দুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়সমূহ মানসিক উত্তেজনার সঞ্চার করে। সমস্ত রাজ্যসম্পদ্ স্তরে স্তরে নয়নের সম্মুখে সজ্জিত, অথচ দুর্দৈববশতঃ বিষয়বাসনা তৃপ্ত করতে অক্ষম হওয়ায় নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ও চিত্তবিকৃতির সম্মুখীন হন রাজা। এই সময় নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় হিতাহিতজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে নৃপতি যযাতি নবযৌবনে উপনীত পুত্র পুরুর নিকট স্বীয় জরার বিনিময়ে তাঁর কমনীয় যৌবন প্রার্থনা করেন। আপাতদৃষ্টিতে পিতার এই আচরণ অতিশয় নৃশংসতার পরিচায়ক, কিন্তু এ দ্বারা তাঁর ভোগাসক্তির তীব্রতাই প্রমাণিত হয়। নৃপতি যযাতি ভোগতৃষ্ণার

প্রাবল্যে পরিচালিত হয়ে এভাবে পুত্রের কাছে নিজেকে দীন প্রতিপন্ন করতেও কুণ্ঠা বোধ করলেন না। এদিকে আমরা দেখি, তরুণ পুত্র পুরুর কি দৃঢ় মনোভাব, কি ভোগাসক্তিশূন্যতা, কি দেবোপম মাহাত্ম্য, কি চারিত্রিক উৎকর্ষ, কি অদ্ভুত পিতৃভক্তির পরিচয়! অপরিসীম শ্রদ্ধায় সকলের মস্তক অবনত হয়ে আসে! পুত্রের যৌবন গ্রহণ ক'রে দিনের পর দিন বিবিধ পার্থিব সুখভোগে প্রমত্ত হয়ে উঠলেন রাজা, কিন্তু নৃপতি যযাতি কি এভাবে প্রকৃত শান্তির অধিকারী হ'তে পারলেন? যযাতির মুখনিঃসৃত বাণী মানব-সমাজের আলোকবর্তিকা, কেন-না প্রকৃত পথের সন্ধান পায় মানুষ সেই বাণীতে; বিষয়-বিরক্ত রাজা অবশেষে উপলব্ধি ক'রে ব'লে উঠলেন:

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

—কামনার উপভোগের দ্বারা কামনার নিবৃত্তি হয় না। ঘৃতের সংযোগে অগ্নি যেরূপ বর্ধিত হয়, সেরূপ কামনার উপভোগের দ্বারা কামনা বৃদ্ধিই পায়।

মূল মহাভারতীয় কাহিনীর সঙ্গে নৃপতি যযাতির উপাখ্যানের কোন সম্পর্ক নেই, তথাপি এই উপাখ্যানের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় রাজার কাহিনী ও উপরি-উক্ত নৈতিক উপদেশ প্রচারের অভিপ্রায় প্রকাশিত হয়েছে।

বনপর্বের শ্যেন-কপোতীয় উপাখ্যান নীতি-শিক্ষার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। এই উপাখ্যানের সরসতা ও নীতিপ্রচারের উপযোগিতা লক্ষ্য ক'রে সংস্কৃত গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে 'মহাত্মনঃ শিবেরুপাখ্যানম্'—এই শিরোনামায় উপাখ্যানটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অতি পরিচিত সুন্দর ছোট গল্প। নৃপতি শিবির চরিত্র-মাহাত্ম্য প্রদর্শনের জন্য গল্পের পরিবেশটি সুন্দরভাবে টয়ে তোলা হয়েছে। বিভিন্ন চারিত্রিক গুণে গরীয়ান্ তিনি—তাঁর চরিত্রের শরণাগতবৎসলতা প্রমাণ করার প্রচেষ্টাই এখানে পরিস্ফুট। শ্যেনরূপী ইন্দ্র কপোতরূপী অগ্নির অনুসরণরত। বুভুক্ষু শ্যেন ভয়ার্ত কপোতকে সমর্পণ করার জন্য নৃপতি শিবিকে বারংবার অনুরোধ জানায়, কিন্তু নৃপতি স্বক্রোড়ে পতিত কপোতকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। তিনি শেষপর্যন্ত ক্ষুধার্ত শ্যেনকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কপোতের সমান ওজনের মাংস নিজের দেহ থেকে কাটতে থাকেন এবং অবশেষে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় তুলাদণ্ডে দাঁড়াতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন না—এমন সময় স্বর্গ থেকে নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি হ'তে থাকে। প্রাণ বিসর্জন দ্বারাও শরণাগত প্রাণীকে রক্ষা করা কর্তব্য এই নীতি প্রচার করাই এ-গল্পের মুখ্য উদ্দেশ্যে। চরিত্র-গঠন ও মানসিক উৎকর্ষ-সাধন অভিপ্রায়েই যে মহাভারতের মূল কাহিনীর সঙ্গে এরূপ গল্পের সংযোজন, তা সহজেই বোঝা যায়। শরণাগত রক্ষার সম্বন্ধে রাজা শিবির উক্তি:

যো হি কশ্চিদ্দ্বিজান্ হন্যাদ্ গাঃ লোকস্য মাতরম্।
শরণাগতঞ্চ ত্যজতে তুল্যং তেষাং হি পাতকম্॥

—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে হত্যা করে, যে ব্যক্তি লোকমাতা গাভীকে বধ করে এবং যে ব্যক্তি শরণাগত প্রাণীকে ত্যাগ করে, তাদের সকলের পাপ সমান।

বনপর্বের 'পতিব্রতোপাখ্যান' স্বকীয় অনুপম বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। পাতিব্রত্যের মহিমা বিবিধ শাস্ত্রে কীর্তিত হয়েছে। পতির প্রতি পরম আনুগত্য নারীকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করে—এই ভাব মহাভারতে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছে। এভাবে নারী যে শুধু সমাজে বিশেষ গৌরবের অধিকারী হন তা নয়, যথার্থ পতিব্রতা হ'লে সংসারে থেকেও নারী অলৌকিক শক্তি-লাভ ক'রে থাকেন, তা এই পতিব্রতোপাখ্যান দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। অবশ্য বর্তমান যুগের

দৃষ্টিভঙ্গীতে এ ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পতিব্রতার শুচিতাসম্ভূত তেজের দ্বারা কোপন-স্বভাব ব্রাহ্মণের প্রভাবও খর্ব হয়ে যায়, তার প্রমাণ বহন করছে এই পতিব্রতোপাখ্যান।

কৌশিক নামে বেদজ্ঞ সদাচারী তপস্বী ব্রাহ্মণ একসময় বৃক্ষমূলে বেদপাঠে নিরত ছিলেন, তখন একটি বলাকা উড্ডীয়মান অবস্থায় তাঁর গাত্র দূষিত করায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তার দিকে তাকান। পাখিটি ভস্ম হয়ে যায়। এভাবে ক্রোধবশীভূত হওয়ার জন্য তিনি পরে বিশেষ অনুতপ্ত হন। ভিক্ষা আহরণের উদ্দেশ্যে তিনি কোন এক গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হ'লে গৃহস্থপত্নী তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন। ঠিক এই সময় ক্ষুধার্ত পতি উপস্থিত হওয়ায় পতিসেবায় নিরত হন পতিব্রতা পত্নী। ভিক্ষাপ্রদানের বিলম্ব দেখে অতিশয় ক্রুদ্ধ হন ব্রাহ্মণ কৌশিক এবং এইরূপ নারীর ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, তাঁর অভ্যর্থনার ত্রুটি অমার্জনীয় অপরাধ, কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রীর নিকট ব্রাহ্মণের প্রভাব অকিঞ্চিৎ-কর ব'লে প্রতীয়মান হয় এই উপাখ্যানে। পতির পরিচর্যা সমাপ্ত ক'রে ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হ'লে গৃহস্থপত্নী কঠোর ভৎ‍সনার সম্মুখীন হন, কিন্তু তিনি বলেন—'বলাকার মতো আমায় ভস্মীভূত করার শক্তি আপনার নেই'—এই একটিমাত্র কথায় চমকিত হন ব্রাহ্মণ। কিরূপে এই ব্যাপার ঐ নারী অবগত হয়েছেন? ঐ নারী কি বলাকা-ভস্মসময়ে সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন? অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী কি এই নারী? বিভিন্ন প্রশ্নবাণে জর্জরিত হ'তে থাকে ব্রাহ্মণের হৃদয়। ব্রাহ্মণকে অধিকতর বিস্মিত ক'রে পতিব্রতা তাঁকে ব্রাহ্মণের প্রকৃত কর্তব্য ও আচরণ সম্বন্ধে বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতে থাকেন। তাঁর প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান ও অতুলনীয় মেধাশক্তি যে-কোন শ্রোতার হৃদয়ে বিস্ময়ের উদ্রেক করবে। পতিব্রতার অমৃতবর্ষী প্রশান্ত বাণীতে ধীরে ধীরে দূরীভূত হয় বিস্মিত ব্রাহ্মণের ক্রোধ; ক্রোধ ও বিস্ময়ের অবসান ঘটলে তিনি অতীব লজ্জিত হয়ে স্বকীয় আচরণের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। পতিব্রতা নারী ব্রাহ্মণের হিতসাধনের অভিপ্রায় প্রকাশ ক'রে তাঁকে মিথিলায় ধর্মব্যাধের নিকট বিবিধ বিষয়ে উপদেশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। ব্রাহ্মণ স্বকীয় শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে গর্ববোধ করলেও ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান তাঁর ছিল না। তিনি পতিব্রতার কথানুসারে মিথিলায় উপস্থিত হয়ে ধর্মব্যাধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ধর্মব্যাধ ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে সমস্ত পূর্ব বৃত্তান্ত অবগত হন এবং রমণীর কথানুযায়ী এই ব্রাহ্মণের যে ধর্মসম্বন্ধীয় উপদেশ গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত, তা উপলব্ধি ক'রে তাঁকে ধর্ম, শিষ্টাচার, দেশাচার, লোকাচার, পাপ, পুণ্য, জীবাত্মা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত শিক্ষা দিতে থাকেন। জ্ঞানার্জন ব্রাহ্মণের প্রধান কর্তব্য; এই ব্রাহ্মণের যে জ্ঞানাভাব ছিল, তা দূর করার উদ্দেশ্যেই এইরূপ দীর্ঘ উপদেশের অবতারণা। পতিব্রতার মাহাত্ম্য-কীর্তন, অহঙ্কারীর পতন এবং প্রয়োজন হ'লে প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানী শূদ্রের নিকটও ব্রাহ্মণের উপদেশ-গ্রহণ যে কোনক্রমেই নিন্দনীয় নয়, সে-কথা মনুষ্যসমাজে স্পষ্টভাবে প্রচার করার জন্যই মহাভারতের বনপর্বের মধ্যে পতিব্রতা ও ধর্মব্যাধের উপাখ্যানের অবতারণা। সুযোগ্য ভর্তা স্ত্রীলোকের পরম আশ্রয়স্থল এবং ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে ভর্তার স্বাচ্ছন্দ্যবিধানই পত্নীর প্রধান কর্তব্য—এই ভাব মহাভারতে বার বার বিঘোষিত হয়েছে। এই

প্রসঙ্গে পতিব্রতা রমণীর উক্তি উল্লেখযোগ্য:

পতিশুশ্রূষয়া ধর্মো যঃ স মে রোচতে দ্বিজ।
দৈবতেষ্বপি সর্বেষু ভর্তা মে দৈবতং পরম্।
অবিশেষেণ তস্যাহং কুর্যাং ধর্মং দ্বিজোত্তম॥

—হে ব্রাহ্মণ! পতিসেবারূপ যে ধর্ম, তা আমার নিকট অতিপ্রিয়। সমস্ত দেবতার মধ্যে পতিই আমার পরম দেবতা, সেজন্য পতি-সেবারূপ ধর্ম সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে আমি ক'রে থাকি।

মহাভারতে পাতিব্রত্য-ধর্মের কীর্তন বিভিন্ন প্রধান স্ত্রীচরিত্রের মাধ্যমে করা হয়েছে এবং অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য মধ্যে মধ্যে এই উদ্দেশ্যে উপাখ্যানের সংযোজনও ঘটেছে। মহাভারতে নারীচরিত্রগুলির মধ্যে পতির প্রতি আনুগত্য, তেজস্বিতা, শাস্ত্রজ্ঞান, সত্যের প্রতি আকর্ষণ, ধর্মশীলতা, অতিথিবৎসলতা, জীবের প্রতি অনুকম্পা প্রভৃতি সদ্গুণের অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় এবং উপরে পতিব্রতার যে উপাখ্যান আলোচিত হ'ল, সে উপাখ্যানেও এই গুণগুলির সমাবেশ ঘটেছে। (ক্রমশঃ)

স্বামীজীর বাণীতে নূতনত্ব কি ছিল?

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

মহাপুরুষেরা এ-কথা কদাচিৎ স্বীকার করেন যে, তাঁহারা নূতন কোন বাণী প্রচার করিতে আসিয়াছেন। বরং তাঁহাদের মুখে এই কথাই শোনা যায় যে, মানবজাতি যে সত্য পূর্ব হইতেই লাভ করিয়াছে, সেই সত্যের পূর্ণতা-সাধনের জন্যই তাঁহাদের আগমন। অনেকে হয়তো মনে করেন, যুগে যুগে বিভিন্ন নির্বাচিত সত্যদ্রষ্টা বা মহামানবের মাধ্যমে ভগবান্ মানবজাতির উদ্দেশে সেই সত্য প্রচার করেন। কিন্তু বেদান্তের একনিষ্ঠ অনুগামী স্বামী বিবেকানন্দের মতে মানবজাতি আবহমান কাল হইতে এই সত্যের অধিকারী। মানবের অস্তিত্ব এই সত্যোপলব্ধিতে বিধৃত। আমাদের অন্তর্নিহিত এই মহাসত্য কোন অচল অনড় বস্তু নহে, বিকাশের পথে সকল বাধা বিচূর্ণ করিয়া এই গতিশীল শক্তি আপনাকে বিচিত্রভাবে প্রকাশরত। স্তিমিত চেতনার অবসাদে যখন এই গতিবেগ ব্যাহত হয়, তখনই মানবজাতির ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা দুঃসময়। জীবনের অভিশাপ-স্বরূপ পুঞ্জীভূত তামসিকতা হইতেই জড়তার সৃষ্টি। ব্যক্তি-জীবনের মতো জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও এ-কথা সমান সত্য।

যুগ-যুগান্তব্যাপী কুসংস্কার ও পুরোহিত-তন্ত্রের জটিলতায় ভারতবর্ষ যে সমাচ্ছন্ন, এ-কথা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বামী বিবেকানন্দ গভীর বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিপুল গৌরবময় মহান্ অতীত সত্ত্বেও এ অধঃপতন সত্যই ঘটিয়াছিল। প্রাণস্রোতের অভাবে মানুষের অন্তর্নিহিত সত্য, স্বামীজীর ভাষায় 'অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম'ও গতিশক্তিহীনতার ফলে স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। ভারতবর্ষে মানবের অন্তর্নিহিত সত্যের পূর্ণতা-সাধনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল এই তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহী প্রেরণা—এই জড়তার দুর্গ ভেদ করিয়া অগ্রগামী হওয়ার সাধনা। জড়তা বলিতে কেবল নঞর্থক কিছু বুঝায় না, প্রত্যক্ষভাবে ওই জড়তা আলস্য অকর্মণ্যতা এবং মানবাত্মার সঙ্কোচনের কারণ।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রদীপ্ত ব্যক্তিত্ব ওই বিদ্রোহী চেতনার প্রতীক। বহির্বিশ্বের ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও অন্তরের অধ্যাত্ম-উপলব্ধিরাশির দ্বারা স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত গতিশীলতা আরও গভীরতা লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমগ্র মানবজাতির দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের প্রেরণাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। বিবেকানন্দের বাণী শুধু চিন্তার উদ্রেক করে নাই, মানুষের অন্তরের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। ইহাই স্বামীজীকে সমকালীন অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে এবং দেশ-বিদেশের অগণিত নরনারীর কাছে এত আপন ও এত আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

স্বামীজী শুধু পুরানো ধরনের গতানুগতিক ধর্মব্যাখ্যাতা ছিলেন না। দেশে ও বিদেশে প্রদত্ত তাঁহার কিছুসংখ্যক ভাষণ-পাঠে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রচারই তাঁহার জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে, মাঝে মাঝে স্বামীজীকে প্রবলভাবে হিন্দুধর্মের পক্ষ সমর্থন করিতে হইয়াছে। কারণ হিন্দুধর্মের কুৎসা-প্রচারকের সেকালে অভাব ছিল না। কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে স্বামীজীর রচনাবলী অনুধাবন করিলে সকলেই এ-কথা স্বীকার করিবেন যে, স্বামীজী মূলতঃ বেদান্তেরই প্রচারক। বেদান্তের গৌরব হিন্দুধর্মের গৌরব—এই কারণেই স্বামীজী বেদান্তের প্রচারক, তাহা নহে; অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ফলে তিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন যে, বেদান্তই মানবের অন্তর্নিহিত সত্য বা ব্রহ্মের পরিপূর্ণ উপলব্ধির অভ্রান্ত পথনির্দেশক। তাই স্বামীজীর কাছে বন্ধনের অর্থ মানবের অন্তর্নিহিত সত্যের আনন্দময় অমৃতময় সমুজ্জ্বল সম্ভাবনার ক্রমসঙ্কোচন।

'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' (ওঠো জাগো)—এই বাণী বিবেকানন্দের সব প্রচারকার্যের মূলমন্ত্র—তাঁর বাণী ও রচনায় এই জাগরণের আহ্বান অক্লান্তকণ্ঠে বারংবার উচ্চারিত। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—শব্দ-দুটির তাৎপর্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। 'উত্তিষ্ঠত' শব্দটির দ্বারা প্রথমতঃ আত্মবিস্মৃতি হইতে জাগরণ, এবং দ্বিতীয়তঃ মানবের অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা বুঝায়। স্বামীজীর কাছে বেদান্ত বলিতে সংক্ষেপে ইহাই বুঝাইত। তাঁহার মতে, নাস্তিকতা ততটা ধর্মবিরোধী নহে, জড়তাই যথার্থ অধর্ম। কৌতুকচ্ছলে এ-বিষয়ে তিনি যে উদাহরণটি দিয়াছিলেন, সেই ঘটনাটিই স্বামীজীর ধর্মজীবন সম্বন্ধে মতামতের অভ্রান্ত পথনির্দেশক।

(একবার একটি অলস নির্বোধ ও অকর্মণ্য ব্যক্তি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'ঈশ্বরলাভের জন্য আমার কি করা প্রয়োজন, কেমন করিয়া আমি মুক্তিলাভ করিব?' স্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলিতে পারো কি?' সে উত্তর দিল, 'না'। তখন স্বামীজী বলিলেন, 'তবে তোমায় মিথ্যা কথা বলা শিখিতে হইবে। একটি পশুর মতো বা কাঠপাথরের মতো জীবন-যাপন করা অপেক্ষা মিথ্যা কথা বলা ভালো। তুমি অকর্মণ্য; কর্মের অতীত যে অবস্থায় মন সম্পূর্ণ শান্ত ভাব লাভ করে, সেই সর্বোচ্চ অবস্থা তোমার নিশ্চয়ই লাভ হয় নাই। তুমি এত জড়প্রকৃতি যে, একটা অন্যায় কার্যও করিতে পার না।')

বৈরাগ্যের নামে অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন জীবন-যাপন স্বামীজীর একান্ত অসহ্য ছিল। বারংবার তিনি আমাদের মনে করাইয়া দিয়াছেন যে, বেদান্ত শক্তিমান্ কর্মতৎপর মানুষের গতিশীল ধর্ম, দুর্বল অকর্মণ্যের ধর্ম নহে। (ক্রমশঃ)

[রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী-সংখ্যা বুলেটিনে ডঃ দাশগুপ্ত-লিখিত 'Swami Vivekananda: What was new in his message?' প্রবন্ধের অনুবাদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডক্টর দাশগুপ্তের অকালপ্রয়াণের কথা স্মরণে রাখিয়া তাঁহারই নির্দেশে কৃত অনুবাদটির প্রথমাংশ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। অনুবাদক: অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ]

স্বামী অখণ্ডানন্দের দুইখানি পত্র*

(১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Orphanage, Bhabda P. O.
Dt. Murshidabad
19.10.98

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়াছি। কিন্তু আমি কয়েকদিন ধরিয়া বড়ই ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া পত্রের উত্তর যথাসময়ে দিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। আপনি আমাকে পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, আমিও সেই কথা মনে করিয়া বড়ই আনন্দানুভব করিলাম। সে একদিন গিয়াছে, আর এই একদিন! মনুষ্যাত্মার পরিবর্তন নাই, কিন্তু মনুষ্য-জীবনের পরিবর্তন আছে। এখন আর আমার দেশভ্রমণ ভাল লাগে না। যখন আমি প্রথম হিমালয়ে যাই, তখন আমি আর এক মানুষ ছিলাম, আমিই এখন আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য হই। তখন আমি হিমালয়ে গিয়া পর্যন্ত মানুষ দেখিয়া বেজার হইয়াছিলাম, এবং পাহাড়ী গ্রাম ছাড়িয়া অতিশয় বিজন ও হিংস্র-জন্তু-পরিপূর্ণ পর্বতশিখরে গিয়া মনুষ্যসমাজ পরিত্যাগ করিয়া বাস করিতে ভালবাসিতাম। এইরূপে ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ নিভৃত বাস করিয়াও দেখিয়াছি; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, যে আমি মানুষকে ত্যাগ করিয়া একদিন হিমালয়ের উচ্চ উচ্চ পর্বতশ্রেণীর মস্তকে বেড়াইয়া বেড়াইতাম, সেই আমি মনুষ্যেই সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে দেখিতেছি; এবং বুঝিতেছি মনুষ্যসমাজের সেবাই তাঁহার সেবা। ভগবান্ স্বয়ং যেন আমার কানে কানে বলিতেছেন, 'ওরে! এই মানুষই বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ও রাম-কৃষ্ণাদি অবতার, এই মানুষই সব !!!' এই মনুষ্যসমাজের চরম উন্নতির সময়েই আমরা মনুষ্যের মধ্যেই রাম-কৃষ্ণাদি অবতার দেখিতে পাই। সেই মনুষ্যসমাজের হীনাবস্থা উপস্থিত হইলে তাহার উন্নতিকল্পে মনুষ্যমাত্রেরই প্রাণ পর্যন্ত পণ করা কর্তব্য; যাক্ এখন আপনার প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর এই যে, অর্থসাধ্য লোকহিতে ব্রতী হইয়া আমাকে অর্থচিন্তা বড় করিতে হয় নাই; বরং ঈশ্বরচিন্তাতেই অধিক সময় গিয়াছে ও যাইতেছে, এবং ইহাও জানি যে, তাঁহার কার্য তিনি আমাদিগকে দিয়া করাইতেছেন।

মরণাপন্ন কঙ্কালসার ভারতবাসীর দৈহিক সংস্কার না করিয়া আধ্যাত্মিক চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। অনাথদিগকে লইয়া সন্ধ্যার সময় প্রত্যহ প্রায় আধ ঘণ্টার উপর ভগবদ্‌গুণানুকীর্তন করিয়া থাকি এবং বৈদিক রীত্যনুসারে ভগবানের নিকট তাঁহার তেজ বল প্রভৃতি যাহাতে আমাদের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকি। তারপর সদাসর্বদাই বালকদিগের নৈতিক ও ধর্মজীবনলাভের জন্য তাহাদিগকে সৎকার্যোপযোগী করিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু জীবনের কল্যাণ সাধন করিতে করিতে স্বীয় আধ্যাত্মিক জীবনের পুষ্টি-সাধন ভিন্ন কোনও ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা নাই। আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে নির্জন-সেবা প্রভৃতি করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা কি চিরকালই করিবে? মানুষ যতই আত্মবিস্তার লাভ করিবে, ততই তাহার হৃদয় কোমল ও সরল হইবে। জীবসেবা করিলে শমদমাদি ভূষণ আরও অধিকতর উজ্জ্বল হয়,—নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান যে করে তার। ইহা যে অমুক করিবে—আর অমুক করিবে না—এরূপ

* কাশীর রইস্ (জমিদার) প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিত; 'স্বামী অখণ্ডানন্দ' জীবনীগ্রন্থে আংশিক প্রকাশিত।

বাঁধাবাঁধি হওয়া অসম্ভব। কারণ 'যাবৎ শরীর তাবৎ ক্রিয়া', অতএব সে ক্রিয়া নিষ্কাম হওয়াই চাই, এবং আত্মজ্ঞানী সহস্র কার্য করিয়াও স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকেন—এ নিগূঢ় তত্ত্ব মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবের বুঝিবার সাধ্য নাই। ইহা সেই সৎকর্মনিষ্ঠ আত্মজ্ঞানী পুরুষেরই হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে। আজ আপনার পত্রের উত্তর এই পর্যন্তই দিলাম। পরে আরও লিখিবার ইচ্ছা রহিল।······

ইতি—

আপনার **অখণ্ডানন্দ**

(২)

অনাথাশ্রম, ভাবদা পোঃ
মুর্শিদাবাদ ১০.১.৯৯

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,

আপনার ২৯.১০.৯৮-এর পত্রের উত্তর আজ দিতেছি। আমার এই দীর্ঘকাল ধরিয়া পত্রোত্তর না দিবার কারণ আছে। আমি পূজার পূর্ব হইতে বার বার তিন বার জ্বরে পড়িলাম—এবং এখনও শরীর বড় খারাপ, anti-malarial pills খাইতেছি। তারপর আমাকে অনাথাশ্রমের জন্য বড়ই খাটিতে হইতেছে। আশ্রমের সকল ভার সম্প্রতি আমার উপর। আশ্রমের সকল ব্যয়নির্বাহের চেষ্টা আমাকেই করিতে হয়। আবার একখানি (আশ্রমের) পাকাবাড়ি করিবার আয়োজন করিতেছি। অন্ততঃপক্ষে ৫,০০০৲ টাকার কমে আর বাড়িখানা হইবে না। ইহার কিনারাও আমাকে করিতে হইবে। এই সকল কারণে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় আপনার পত্রোত্তর দিতে এত বিলম্ব হইল। অতএব আশা করি, ক্ষমা করিবেন।

গত ১৭ই ডিসেম্বর এই জেলার Magistrate Egerton বাহাদুর আমাদের আশ্রম দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনের পর হইতেই আমরা অনাথ বালকদিগকে দরজীর কাজ শিখাইতেছি; এবং একটি দেশী তাঁত বসাইয়া কাপড় বোনার কাজ আরম্ভ করিবারও আয়োজন হইতেছে। আমরা আশ্রমে এক্ষণে সর্বশুদ্ধ ১১ জন।

'আত্মজ্ঞানই মানুষের পরম কল্যাণস্বরূপ, এবং সেই আত্মজ্ঞান ভগবদ্‌ভক্তি ও ভগবৎপ্রসাদ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না'—ইহা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু যদি স্বীয় ক্রিয়ার নিদর্শন দ্বারা ও বাক্য দ্বারা ভগবদারাধনার উপদেশ করিতে হয়, তবে লোকের প্রধান অভাব দূর করিতে হইবে। দেশের রাজা মহারাজা ও ধনাঢ্য জমিদারগণ যদি লোকের সে অভাব দূর করিতেন, তাহা হইলে আর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা লোকদুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণের জন্য এত শ্রম ও যত্ন করিতেন না। দেশের বড় বড় গৃহস্থরা যে পাষাণ দিয়া বুক বাঁধাইয়াছেন! তাঁহাদের হৃদয় এমন বজ্রোপম কঠিন উপাদান-নির্মিত বর্মদ্বারা আবৃত যে, আর্তের সকাতর ক্রন্দনধ্বনিও সেখানে প্রবেশ করিতে পায় না! আর শুষ্ক শাস্ত্রীয় কথায় প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। আমার প্রভু আমার হৃদয়েই আছেন, এবং সদাকালই থাকিবেন, আমার প্রভু কেবল গিরিশৃঙ্গে বা নীলাকাশেই বসিয়া নাই! আমার প্রভু—আমার আত্মা—সর্বজীবে। সেই সর্বজীবরূপী ভগবান্‌কে আমি মুহুর্মুহুঃ বলিতে শুনিতেছি—যথা 'ওরে! মানুষেই বৈদিক ঋষিবৃন্দ—মানুষেই রাম-কৃষ্ণাদি অবতার, সেই মানুষের কি শোচনীয় অবস্থা দেখছিস্‌নি?' এ-কথা যে শোনে, তার কি স্থির থাকিবার জো আছে? এই মানুষ-ভগবানের সেবায় এ জীবন তো দিয়াইছি—আরও কত জীবন যে দিতে হইবে বলিতে পারি না।······

ইতি— আপনাদের

অখণ্ডানন্দ

রামায়ণ-প্রসঙ্গ*

(সীতাসংবাদ)

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

নবযুগের প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ মহাবীর-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'মহাবীরের চরিত্রকেই তোদের এখন আদর্শ করতে হবে। দেখ্ না, রামের আজ্ঞায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল। জীবন-মরণে দৃক্‌পাত নেই—মহা জিতেন্দ্রিয়, মহা বুদ্ধিমান্! দাস্যভাবের ঐ মহান্ আদর্শে তোদের জীবন গঠিত করতে হবে। দ্বিধাশূন্য হয়ে গুরুর আজ্ঞা-পালন আর ব্রহ্মচর্যরক্ষা—এই হচ্ছে secret of success (সাফল্যলাভের গোপন রহস্য) 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। হনুমানের একদিকে যেমন সেবাভাব—অন্যদিকে তেমনি ত্রিলোকসন্ত্রাসী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না। ···এরূপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই।'

শ্রদ্ধা-ভক্তিই মহাবীর্যের জনক। অমিত পরাক্রমশালী রামভক্ত মহাবীর প্রচণ্ড বিক্রমে তরঙ্গময় বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অপরপারে উপনীত হইলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে তিনি ধীরে ধীরে কেতক উদ্দালক ও নারিকেল বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন। দূর হইতে পর্বতের উপর অবস্থিত লঙ্কানগরী দেখা গেল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে অবশেষে হনুমান্ পুরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। চতুর্দিকে সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ও সমুদ্র-পরিবেষ্টিত সেই বিশাল পুরী দর্শনে হনুমানের চিন্তা হইল: বানরগণ কোন প্রকারে এই দ্বীপে আসিতে সমর্থ হইলেও এখানে যুদ্ধের অবকাশ কোথায়? অবশ্য তাঁহার প্রথম কর্তব্য বিদেহরাজনন্দিনী জীবিত আছেন কিনা সংবাদ লওয়া। পরে যুদ্ধের বিষয় চিন্তা করা যাইতে পারে। দিনের বেলায় রাক্ষসগণের নিকট ধরা পড়িবার সম্ভাবনা, সুতরাং সূর্যাস্তের প্রতীক্ষায় হনুমান্ বনমধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। অবশেষে দিবাবসানে বিড়ালের ন্যায় লঘুপদে প্রাচীরের উপর আরোহণপূর্বক নগরীর অভ্যন্তর দর্শনে তিনি বিস্মিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ, বিশাল চত্বর, রমণীয় উদ্যান ও বিচিত্র অট্টালিকা-সমূহে সুসজ্জিত সেই নগরীকে ইন্দ্রপুরী বলিয়াই ভ্রম হয়। সাহস করিয়া প্রাচীর অতিক্রম করিয়া হনুমান্ নগরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে সমগ্র আকাশ জ্যোৎস্নাকিরণে প্লাবিত করিয়া চন্দ্রোদয় হইল। সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল আর সেই শুভ্র চন্দ্রালোকে ঐশ্বর্যময়ী লঙ্কা সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্য লইয়া হনুমানের নিকট দেখা দিল।

প্রশস্ত রাজপথের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে হনুমান্ দেখিলেন সুসজ্জিত প্রতি গৃহ পানোন্মত্ত রাক্ষসগণের হাস্যালাপ ও কৌতুকে এবং বিচিত্র-বেশিনী, রক্তবসনা, বিশাল কর্ণালঙ্কারভূষিতা পানোন্মত্তা রাক্ষসীগণের নৃত্যগীতে মুখরিত। তিনি চারিদিকে বহু সুন্দরী, তযুক্তা, পুষ্পালঙ্কারভূষিতা, মনোহরবেশধারিণী রমণী-গণকে দেখিতে পাইলেন—কেবল দেখিতে পাইলেন না সীতাকে—আভিজাত্যসম্পন্না, রাজকুলসম্ভূতা সেই সীতা—যিনি শ্রেষ্ঠ নারী হইতেও শ্রেষ্ঠা, রামাভিলাষিণী বিরহবিধুরা—সেই সীতার দর্শন তিনি পাইলেন না।

শোকান্বিতামশ্রুচিতৌষ্ঠকণ্ঠীং বরাং বরার্হাং বরনিষ্কণ্ঠীম্।
অজাতপক্ষামভিজাতকণ্ঠীং বনে প্রবৃত্তামিব নীলকণ্ঠীম্॥

---

* ৬৪তম বর্ষ আষাঢ় সংখ্যায় 'রামায়ণ-প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য; বর্তমান প্রবন্ধ তাহারই অনুবৃত্তি।

**অব্যক্তরূপামিব চন্দ্ররেখাং পাংশুপ্রদিগ্ধামিব হেমরেখাম্।
ক্ষতপ্ররূঢ়ামিব বাণরেখাং বায়ুপ্রভিন্নামিব ধূম্ররেখাম্॥**

কোথায় সেই শোকান্বিতা জানকী—যাঁর ওষ্ঠ এবং কণ্ঠ অশ্রুজলে সিক্ত! উত্তমকণ্ঠভূষণে অজাতপক্ষা মধুরকণ্ঠী অরণ্যবর্তিনী ময়ূরীর ন্যায় সেই জানকী কি নয়নের অগোচরেই থাকিয়া যাইবেন! অপরিব্যক্ত চন্দ্রকলা ভস্মলিপ্ত স্বর্ণরেখা, ক্ষতমধ্যস্থ বাণরেখা অথবা বায়ুদ্বারা বিচ্ছিন্ন ধূম্ররেখার ন্যায় সেই সীতাকে কোথাও না দেখিতে পাইয়া হনুমান্ বিষণ্ণ হইলেন!

নগরের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে অবশেষে অলক্ষ্যে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া তিনি অভিভূত হইলেন। কিষ্কিন্ধ্যানগরীর রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যের সহিত হনুমানের পরিচয় ছিল। কিন্তু রাবণ-পুরীর ঐশ্বর্যের ছটা তাহার শতগুণ নয়নমুগ্ধকর। রামায়ণের এই অংশে লঙ্কা নগরীর ও রাজপুরীর ঐশ্বর্য-বর্ণনায় বাহুল্য ও পুনরুক্তি-দোষ বিশেষভাবে দৃষ্ট হইলেও ইহা অনুমান করা যায় যে, অনার্য সভ্যতা বাহ্যসম্পদে আর্য সভ্যতা অপেক্ষা কোনক্রমেই নিকৃষ্ট ছিল না। হনুমান্ দূর হইতে দেখিলেন—গৃহে গৃহে বিচিত্র মণিময় সজ্জা, রত্নখচিত উৎকৃষ্ট আসন ও মহামূল্য আস্তরণ-বিশিষ্ট শয্যা। অগুরু ও ধূপের গন্ধে চারিদিক সুরভিত। সর্বত্র পানোৎসব চলিয়াছে। পানোন্মত্ত রাক্ষস-রাক্ষসীর ইতস্ততঃ বিচরণ ও উদ্দাম নৃত্যের সঙ্গে নূপুর, চন্দ্রহার, মৃদঙ্গ ও করতালের ধ্বনি অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছে। ভোগের বিচিত্র উপকরণ। কারুকার্যখচিত পাত্রে বিবিধ আহার্য ও পানীয়। মধু ও সুরার যেন স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। বিচিত্রবেশী রাক্ষস রাক্ষসী ভোগে উন্মত্ত।

ক্রমে রজনী গভীর হইল। বাদ্য, সঙ্গীত ও নৃত্যের শব্দ থামিয়া গেল। হনুমান্ নিঃশব্দে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে সীতার অন্বেষণে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি রাবণের গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহের চারিদিকে স্বর্ণময় গবাক্ষ, মণিময় সোপানাবলী, প্রশস্ত হর্ম্যতল বিবিধ কারুকার্যমণ্ডিত শ্বেত-প্রস্তরাবৃত। মধ্যে মধ্যে মণি মুক্তা প্রবাল প্রভৃতি, প্রস্তরে নির্মিত স্তম্ভসমূহ, ঊর্ধ্বে স্ফটিকময় বিস্তীর্ণ আস্তরণ। স্বর্ণ-প্রদীপে দীপশিখা উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। বিচিত্র শয্যা ও আসনে নৃত্যগীতে পরিশ্রান্ত ও সুরাপানে বিহ্বল বহু সুন্দরী রমণী নিদ্রায় অচেতন। তাহাদের অলঙ্কার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, বেশবাস অসংযত। বিস্মিত চিত্তে হনুমান্ ভাবিলেন, 'স্বর্গোঽয়ং দেবলোকোঽয়মিয়ং সিদ্ধিঃ পরা ভবেৎ'—ইহাই স্বর্গ, দেবলোক এবং হয়তো ইহাই চরম সিদ্ধি। উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণে সুসজ্জিতা সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা রমণীগণকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, রামপত্নী সীতা যদি রাক্ষস-রাজের এই পত্নীগুলির ন্যায় সুন্দরী হন, তবে তাঁহার জন্ম সার্থক। কিন্তু পরক্ষণেই এই চিন্তা তাঁহাকে ব্যথিত করিল। লঙ্কাধিপতি রাবণ বহু আয়াসে যাঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন এবং যাঁহার বিরহে স্বয়ং রামচন্দ্র শোকে অধীর, তিনি অবশ্যই ইহাদের অপেক্ষা সৌন্দর্যে ও গুণে গরীয়সী। অতঃপর হনুমান্ রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইলেন—রত্নখচিত উজ্জ্বল শয্যায় মধুপানে বিহ্বল ও নিদ্রিত। রাবণ-সমীপে অবস্থিতা প্রধানা মহিষী অপূর্ব সুন্দরী মন্দোদরীকে ক্ষণকালের জন্য সীতা বলিয়া মনে করিয়া হনুমান্ অনুতপ্ত হইলেন। সুসজ্জিতা ও পানাসক্তা হইয়া রাবণের নিকট অবস্থান কি সীতার পক্ষে সম্ভব?

গভীর নিশীথে রাজপুরীর কক্ষগুলিতে বার বার অনুসন্ধান করিয়াও হনুমান্ সীতার

দর্শন পাইলেন না, অথবা এমন কাহাকেও দেখিলেন না, যাহাকে সীতা বলিয়া মনে করিতে পারেন। বিফলপ্রযত্ন বিষণ্ণ মহাবীরের চিত্তে তখন প্রশ্ন জাগিল, তিনি যে এতক্ষণ ধরিয়া রাবণের অন্তঃপুরে নিদ্রিত পরস্ত্রীগণকে দর্শন করিতেছেন—ইহা তো কোনক্রমেই ধর্মসঙ্গত নহে! পরদার-নিরীক্ষণ অতি গর্হিত কর্ম, বিশেষতঃ রজনীতে। মহা জিতেন্দ্রিয় হনুমান্ তখন নিজের অন্তস্তল নিরীক্ষণ করিলেন। কই এই সুন্দরী নারীগণকে দেখিয়া তাঁহার চিত্তে কোনরূপ বিকার ঘটে নাই তো! শুভ অথবা অশুভ সর্ববিষয়ে মনই ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির হেতু। মহাবীর দেখিলেন তাঁহার মন অবিকৃত রহিয়াছে, কোন প্রকার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ঘটে নাই। তিনি তো সীতার চিন্তায় নিমগ্ন, সীতার অন্বেষণে নিযুক্ত। অন্তঃপুর ব্যতীত সীতার অন্বেষণ কোথায় বা করিবেন? রাক্ষসীগণের মধ্যেই তাঁহার দর্শন পাইবার সম্ভাবনা। পবিত্রচিত্তে তিনি কর্তব্য কর্ম করিয়াছেন, ধর্ম হইতে বিন্দুমাত্র চ্যুত হন নাই।

দৃঢ়চিত্তে হনুমান্ পুনরায় সমগ্র অন্তঃপুর, চিত্রশালা, ক্রীড়াগৃহ, প্রমোদভবন প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন। কোথাও সীতার সন্ধান না পাইয়া অবশেষে তিনি হতাশ চিত্তে প্রাচীরের উপর উপবেশন করিলেন। চিন্তাকুল নেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল অশোক-কাননের উপর। শাল, অশোক, চম্পক, নাগপুষ্প প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষরাজি-সমন্বিত সুন্দর উদ্যান। হনুমান্ লম্ফ-প্রদানে অতিশয় পটু ছিলেন, ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষগুলির শাখা হইতে শাখান্তরে আরোহণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল না। অবশেষে একটি শিংশপা বৃক্ষে আরোহণ করিয়া তিনি কতকগুলি বিকটাকার রাক্ষসী দেখিতে পাইলেন, পরক্ষণেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল অশোক-বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা শুক্লপক্ষের প্রতিপদের মলিন চন্দ্রকলার ন্যায় আনন্দহীনা ও বিষাদময়ী সীতার প্রতি।

আশামিব ব্যপগতামাজ্ঞাং প্রতিহতামিব।
অশ্রুধৌতমুখীং দীনাং কৃশামনশনেন চ ॥
দুর্বলাং দুঃখসন্তপ্তাং সুকুমারীং তপস্বিনীম্।
নিঃশ্বাসবহুলাং ভীতাং পন্নগেন্দ্রবধূমিব ॥
শোকজালেন মহতা বিততেনাভিসংবৃতাম্।
সংচ্ছন্নাং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ ॥
নীলনাগাভয়া বেণ্যা জঘনং গতয়ৈকয়া।
ভূমৌ দেবী তদাসীনাং নিয়তাং তাপসীমিব ॥
প্রধ্যানপরমাং বালাং রুদতীং কুররীমিব।
প্রিয়ং জনমপশ্যন্তীং পশ্যন্তীং রাক্ষসীজনম্ ॥

—রাক্ষসী-পরিবেষ্টিতা অশোক-কাননে তরুতলে উপবিষ্টা সীতার একটি সুন্দর চিত্র! সীতাকে কবি তুলনা করিয়াছেন অপগত আশা ও প্রতিহত আজ্ঞার ন্যায়! অনাহারে কৃশা, দীনভাবাপন্না; সুন্দর মুখমণ্ডল অশ্রুপ্লাবিত। সেই ক্লিষ্ট, দুর্বল, দুঃখসন্তপ্তা, কোমলাঙ্গী সীতা সন্ত্রস্তা সর্পীর ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে-ছিলেন। মহাশোকে সমাচ্ছন্না দীপ্তিমতী তাঁহাকে মনে হইতেছিল যেন ধূমজালে আবৃতা অগ্নিশিখা। ব্রতচারিণী তপস্বিনীর মতো সেই দেবী ভূতলে উপবিষ্টা ছিলেন; কৃষ্ণসর্পের ন্যায় একটি মাত্র বেণী তাঁহার জঘন-দেশ স্পর্শ করিয়া লম্বিত ছিল। প্রিয়জন-অদর্শনে ব্যথিতা, রাক্ষসীগণ কর্তৃক লাঞ্ছিতা বালা অধীর আবেগে অশ্রুজল বিসর্জন করিতেছিলেন।

কোথায় অযোধ্যার রাজপুরী সখীজন-পরিবেষ্টিতা সৌভাগ্যবর্ধিতা উৎফুল্লা রাজবধূ! আর কোথায় সুদূর লঙ্কায় অশোক-কানন—রাক্ষসী-নিপীড়িতা দুঃখসন্তপ্তা বিষণ্ণবদনা তপস্বিনী! সীতা-দর্শনে মহাবীরের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এই সীতার জন্যই বালী নিহত। কবন্ধ, বিরাধ প্রভৃতি রাক্ষসগণের নিধনের কারণও সীতা। আর তিনি নিজেও তো এই আয়তলোচনা দেবীর জন্যই অগাধ জলধি অতিক্রম করিয়া লঙ্কা নগরীতে উপনীত! রামচন্দ্র যদি ইঁহার জন্য আসমুদ্র পৃথিবীর আধিপত্য ত্যাগ করেন, তবে তাহাও সুধীজন কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া উচিত। হনুমান্ দেখিলেন: সীতা রামচিন্তায় তন্ময়। রাক্ষসদিগের প্রতি ইঁহার দৃষ্টি নাই। পুষ্পভারাক্রান্ত পাদপ-রাজিও নিরীক্ষণ করিতেছেন না। তাঁহার সমগ্র অন্তঃকরণ একাগ্র হইয়া যেন নিরন্তর রামকেই দর্শন করিতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উদ্বাস্তু-সেবা

রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে পূর্ব পাকিস্তান উদ্বাস্তু-সেবাকার্য পশ্চিমবঙ্গে গেদে, পেট্রাপোল ও বানপুরে এবং দণ্ডকারণ্যে ৩নং কুরুদ ক্যাম্পে চালাইয়া যাওয়া হইতেছে।

৫.৬.৬৪ হইতে ৩০.৭.৬৪ পর্যন্ত মিশন উদ্বাস্তুদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি বিতরণ করিয়াছেন:

চিড়া ২৮ কুইণ্টাল ৩৫ কে. জি., গুড় ১৩ কুইণ্টাল ২৪ কে. জি., বিস্কুট ২৪ প্যাকেট, ধুতি ৯৭৪, শাড়ি ৯৫৮, অন্যান্য পোশাক ১,৩৬৭, চাদর ১২৭, কম্বল ৩, এনামেল থালা ৫২, কাপড়কাচা সাবান ৬৭ এবং বহুসংখ্যক পুরাতন জামাকাপড়। পেট্রাপোলে ৬,৪২৪ জনকে নারিকেল-তৈল বিতরণ করা হয়।

পেট্রাপোল এবং বানপুরে মোট ৭১,২৭২ জনকে রান্না-করা খাদ্য দেওয়া হয়।

কুরুদ ক্যাম্পে ১৬.৭.৬৪ পর্যন্ত বিতরিত দ্রব্য: ধুতি ৩৮৮, শাড়ি ১,২৯৭, পোশাক ২১০, ১,৭৭০·৬ কে.জি. গুঁড়া দুধ হইতে প্রস্তুত দুগ্ধ, মুড়ি ৯০০ কে. জি., 'মাল্টি-পার্পাস' খাদ্য ১১৪·৫ কে. জি., হর্লিক্স ১০৬ পাউণ্ড, বার্লি ৭২·৮১ কে.জি., বালতি ইত্যাদি ১৫১, বহু পরিমাণে 'মাল্টি ভিটামিন' ট্যাবলেট ও হ্যালিব-অরেঞ্জ এবং ২,২৫১ পুরাতন বস্ত্রাদি।

উদ্বাস্তু-সেবাকার্যে সামান্য দানও নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে এবং প্রাপ্তি-স্বীকার করা হইবে:

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পো: বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া।

সহস্রদ্বীপোদ্যানে বেদান্ত-অধ্যাপনা

আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের অন্তর্গত সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) বিবেকানন্দ-কুটিরে প্রতি বৎসর জুলাই-অগস্ট মাসে গ্রীষ্মাবকাশের সময় যখন নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র বন্ধ থাকে, তখন দুই সপ্তাহ যাবৎ গ্রীষ্মকালীন বেদান্ত-অধ্যাপনা অনুষ্ঠিত হয়।

১৮৯৫ খৃ: গ্রীষ্মকালে স্বামীজী ছয় সপ্তাহ যাবৎ সহস্রদ্বীপোদ্যানে অবস্থান করিয়া ১০।১২ জন মার্কিন শিষ্যশিষ্যাকে জ্ঞানভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা দেন, এইগুলি 'Inspired Talks' নামে পরিচিত।

এই বৎসর প্রথম দশদিন স্বামী নিখিলানন্দ এবং শেষ চার দিন তাঁহার সহকারী নবাগত স্বামী ভাষ্যানন্দ বেদান্তের ক্লাস পরিচালনা করেন। ২৪ জন নির্বাচিত ছাত্র এই ক্লাসে যোগদান করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়, সমগ্র ঈশোপনিষৎ এবং বেদান্ত-দর্শনের প্রথম চারটি সূত্র আলোচিত হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

সেণ্ট লুই: বেদান্ত-সোসাইটির বার্ষিক (এপ্রিল, ৬৩—মার্চ, ৬৪) কার্যবিবরণী: কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ।

(১) রবিবারে ধর্মালোচনা: সোসাইটিতে উপাসনা-মন্দিরে গ্রীষ্মকালে ছয় সপ্তাহ ব্যতীত স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। নানা ধর্মীয় ও শিক্ষা-মূলক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় হইতে অনেকে যোগদান করেন।

(২) ধ্যান ও কথোপকথন: প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গীতাব্যাখ্যা হয় এবং আগ্রহ-শীল ব্যক্তিগণকে ধ্যানাভ্যাস শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৩) উৎসব: শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজা, ভজন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) অতিরিক্ত সভা: সোসাইটির উপাসনা-মন্দিরে সিনিয়র হাইস্কুলের ছাত্রদের জন্য অনুষ্ঠিত দুইটি সভায় স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে 'মৃত্যু ও পুনর্জন্ম' এবং খৃষ্টজন্ম-সন্ধ্যায় 'স্বর্গরাজ্য তোমার অন্তরে' বিষয়ে বক্তৃতা হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'শ্রীরামকৃষ্ণ এবং হিন্দুধর্মে তাঁহার স্থান', 'হিন্দুধর্ম ও খৃষ্টধর্ম'।

(৫) স্বামীজীর শতবার্ষিকী: স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী-সমাপ্তি-উৎসব উপলক্ষে উপাসনা-মন্দিরে সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা ও ধ্যানাদি অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত সভায় স্বামীজীর শতবার্ষিকী-রচনাপ্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার একশত ডলার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে স্বামী নিখিলানন্দ-সঙ্কলিত ১০ ডলার মূল্যের 'Vivekananda: The Yogas and other Works' উপহার দেওয়া হয়। বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ২৩২ খানি এই বিরাট গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে—স্বামীজীর শতবার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

টেক্সাস (Texas) নামক স্থানে শত-বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত দুইটি সভায় যথাক্রমে 'যুগপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ' (Swami Vivekananda: the Man of the Hour) ও 'জগতের প্রয়োজন—সার্বভৌম বাণী' (The world's need of a Universal message)—রেকর্ড-করা বক্তৃতা শোনানোর পর স্বামীজী-সম্বন্ধে প্রাণস্পর্শী আলোচনা ও পুস্তিকা-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ছাত্রবৃন্দ।

(৬) বেদান্ত-সোসাইটির ২৫তম বার্ষিকী: সেণ্ট লুই বেদান্ত-সোসাইটির ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় গত ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যায় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সোসাইটির বন্ধুবর্গ ও সভ্যবৃন্দ মিলিত হইয়া স্বামী সৎপ্রকাশানন্দকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ২৪শে মার্চ এই উপলক্ষে আয়োজিত সাধারণ সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভাষণ দেন। এই সভায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের বাণী পাঠ করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, সোসাইটির ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও লাইব্রেরিতে 'Gospel of Sri Ramakrishna' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের অনুবাদ—সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৭) গ্রন্থাগার: সোসাইটির সদস্যবৃন্দ গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহের সদ্ব্যবহার করিতেছেন।

(৮) পরিদর্শকবৃন্দ: আলোচ্য বর্ষে ৩৫ জন বিশিষ্ট অতিথি বেদান্ত-সোসাইটি পরিদর্শন করেন।

(৯) নানাস্থানে প্রচারকার্য: ক্যানসাস শহর, মিজুরী ও ইহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রচার-কার্য বিস্তৃতিলাভ করিতেছে।

দেহত্যাগ-সংবাদ

এবারও দুঃখিত চিত্তে সঙ্ঘের দুইজন সন্ন্যাসীর দেহত্যাগ-সংবাদ জানাইতেছি:

স্বামী শ্রীকণ্ঠানন্দ: গত ১৬ই অগস্ট রাত্রি ২টা ৪৫ মিনিটের সময় ত্রিবান্দ্রম আশ্রম হাসপাতালে স্বামী শ্রীকণ্ঠানন্দ মহারাজ ৭৭ বৎসর বয়সে মস্তিষ্ক হইতে রক্তক্ষরণের ফলে (Cerebral Thrombosis) দেহত্যাগ করিয়াছেন; ৪ঠা অগস্ট তিনি প্রথম আক্রান্ত হন।

১৯২৪ খৃঃ তিনি ত্রিবান্দ্রম আশ্রমে সঙ্ঘে যোগদান করেন, ১৯২৮ খৃঃ তাঁহার সন্ন্যাস-দীক্ষা হয়। ১৯২৮ হইতে ১৯৪৪ খৃঃ পর্যন্ত তিনি সালেম আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন; ইহার পর হইতে তিনি ত্রিবান্দ্রম আশ্রমেই ছিলেন।

স্বামী রামানন্দ: গত ২০শে অগস্ট রাত্রি প্রায় ১২টার সময় বেলুড় মঠে মস্তিষ্ক হইতে রক্তক্ষরণের ফলে স্বামী রামানন্দ মহারাজ ৭৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১০।১২ দিন পূর্বে তিনি কাশীধাম হইতে মঠে আসিয়াছিলেন। ১৯১৬ খৃঃ তিনি বেলুড় মঠে সঙ্ঘে যোগ দেন ও শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। ১৯২০ খৃঃ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। ১৯২১ খৃঃ তিনি বেলুড় মঠ হইতে বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে যান এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত উক্ত আশ্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন; মাঝে কয়েক বৎসর তিনি পাটনা আশ্রমে কাটাইয়া যান। ভজন-সঙ্গীতে তিনি সুদক্ষ ছিলেন এবং কাশী অদ্বৈত আশ্রমে ও অন্যত্র 'কালীকীর্তনাদি' পরিচালনা করিয়া সকলকে আনন্দ দিতেন। তাঁহার সরল ও মধুর স্বভাবে সকলে মুগ্ধ হইতেন।

এই সন্ন্যাসিদ্বয়ের দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত শান্তি লাভ করিয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বিবিধ সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মরণোৎসব

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮৫৫ খৃঃ জুলাই মাসে (১২৬২, আষাঢ়) কামারপুকুর যাইবার পথে আঁটপুর গিয়াছিলেন এবং সেখানে রামপ্রসাদ মিত্রের বাটীতে কয়েকদিন ছিলেন। গুরু-পূর্ণিমার দিন সেখানে তাঁহার অবস্থান হইয়াছিল। এই উপলক্ষে গত গুরুপূর্ণিমার দিন তথায় এক স্মরণোৎসব হয়। সমবেত ভক্তমণ্ডলী সকাল ৮টার সময় শঙ্খধ্বনির সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। পরে নামকীর্তন হয়। ইহার পর শ্রীরামকৃষ্ণের আঁটপুর গমনের কারণ, সেই সময়ের কিছু বর্ণনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী-আলোচনা হয়। শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অপর শিষ্যগণের আঁটপুর-গমনের কথাও আলোচিত হয়।

পরলোকে মণিমোহন মুখোপাধ্যায়

ভক্ত মণিমোহন মুখোপাধ্যায় গত ২৫শে অগস্ট মঙ্গলবার বারাসত শহরে তাঁহার বাস-ভবনে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তিনি বারাসত কোর্টের সরকারী উকীল ছিলেন। তিনি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দের নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। বারাসত রামকৃষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমের অন্যতম পরিচালকরূপে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে তাঁহার আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সংবাদপত্রবিষয়ক তথ্য

প্রেস রেজিস্ট্রারের ১৯৬৪ খৃঃ রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৯৬৩ খৃঃ ভারতে মোট দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৫০৩; তন্মধ্যে ৯টি দৈনিকের প্রচার-সংখ্যায় লক্ষাধিক। ক্রমিক হিসাবে সাজাইলে সর্বভারতীয় চিত্রটি নিম্নরূপ :

আনন্দবাজার পত্রিকা	(কলিকাতা)	...	১,৪৬,৮১৯
মালায়া-মনোরমা	(ত্রিবান্দ্রম)	...	১,৪০,০৯৬
টাইমস অব ইণ্ডিয়া	(বোম্বাই)	...	১,৩৮,০৪১
হিন্দু ...	(মাদ্রাজ)	...	১,৩৩,২১০
লোকসত্ত ...	(বোম্বাই)	...	১,২৪,৫৯১
তন্তি ...	(মাদ্রাজ)	...	১,০৯,৭৪৬
যুগান্তর ...	(কলিকাতা)	...	১,০৭,৫৬৬
হিন্দুস্থান টাইমস	(দিল্লী)	...	১,০৬,৭০৯
স্টেটস্‌ম্যান ...	(কলিকাতা)	...	১,০৩,৪৮৩

১৯৬৩ খৃঃ ভারতে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ৫'৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। যে ৪,৫৭০ পত্র-পত্রিকার প্রচার-সংখ্যার হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মোট প্রচার-সংখ্যা ছিল ২,০২,৯১,০০০।

১৯৬২ খৃঃ সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল ৬,৮৮০ ; ১৯৬৩ খৃঃ উহা বাড়িয়া হয় ৭,২৩৬। আলোচ্য বর্ষে ১০টি সাময়িক পত্রের সংখ্যা লক্ষাধিক ছিল। এ বৎসরও ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িক হইল তামিল সাময়িক 'কুমুদম্' ; এ বছর ইহার প্রচার-সংখ্যা ২,৬৮,০৭৪। ইংরেজী সাময়িক পত্রিকাগুলির সংখ্যা ৯৮৫ ; মোট প্রচার-সংখ্যা ৩৭,৯৬,০০০। ৮১৫ হিন্দী সাময়িক পত্রিকার মোট প্রচার-সংখ্যা ছিল ২৭,৩২,০০০।

রাজ্য-হিসাবে সাময়িক পত্রিকা (প্রথম ৫টি) :

মহারাষ্ট্র	...	১,১৩৪
পশ্চিমবঙ্গ	...	৯৮৯
উত্তরপ্রদেশ	...	৯২৭
মাদ্রাজ	...	৭০৮

১৯৬৩ খৃঃ ২,১৬৩ সপ্তাহিক, ৮২৬ পাক্ষিক এবং ৩,২৪৪ মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের পত্রিকা :

সাহিত্য ও সংস্কৃতি	...	১,০৬০
ধর্ম ও দর্শন	...	৯০১
শিল্প ও বাণিজ্য	...	৩০৮
স্বাস্থ্য ও ভেষজ	...	২৯৩
সমাজকল্যাণ	...	২৮৯
চলচ্চিত্র	...	২৭৩
শিশুদের	...	১২২
মহিলাদের	...	৬২



কথাপ্রসঙ্গে

বিজয়া

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করিতেছি।

শক্তির সাধনা

যে নাস্তিক কিছুই মানে না, তাহাকেও শক্তি মানিতে হয়। এই জগৎসৃষ্টির পিছনে এক সৃজনী শক্তি আছে, সৃষ্টির পরে জগৎ রক্ষা করিবার জন্য এক পালনী শক্তি অবশ্যই প্রয়োজন, এবং শেষে দেখা যায়—সব কিছুই ধ্বংস হইয়া যায়, অতএব সংহারকারী লয়শক্তিও অবশ্য স্বীকার্য। এই তিনটি শক্তি পৃথক্ অথবা এক, ইহা লইয়া বহু দার্শনিক বিচার হইয়া গিয়াছে। হয়তো আরও হইবে, তবে দার্শনিক বিচারের রীতি অনুসারে যদি একই আধারে তিনটি শক্তি সমন্বিত করা যায়, তবে আর তিনটি পৃথক্ শক্তিমান্ স্বীকার করিতে হয় না। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ-স্বরূপ এক শক্তি বা শক্তিমান্ কেহ আছেন—ইহাই তন্ত্র বা বেদান্তের সিদ্ধান্ত; কেহ বা আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন: শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ অথবা ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শান্ত স্থির সমুদ্র ব্রহ্মের উপমা, উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল ক্ষুব্ধ সমুদ্র সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী শক্তির প্রতীক।

সৃষ্টির পর হইতেই শক্তির এলাকা। জগৎ মানিলে শক্তি মানিতেই হইবে। শক্তির তারতম্য আছে, ক্রমবিকাশ আছে, স্তরভেদ আছে। নিম্নতম স্তর হইতে শুরু করিয়া জীবের সাধনা চলিয়াছে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের দিকে।

প্রাথমিক স্তরে জীবচেতনা শারীর স্তরে—তদনুযায়ী সাধনাও শরীর-কেন্দ্রিক—পেশীশক্তিই এখানে সিদ্ধির পরিমাপক। আসুরিক বল-বীর্য দম্ভ-দর্প মানুষকে পশু-স্তরেই আবদ্ধ রাখে। মহিষাসুরের প্রতীকে পুরাণকার এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ধীরে ধীরে মানসিক স্তরে বিকাশ দেখা দেয়, তখন শুরু হয় বুদ্ধির সাধনা, মস্তিষ্কশক্তি-বলে মানুষ প্রতিকূল অবস্থা জয় করিয়া, কূটবুদ্ধিবলে প্রতিবেশীকে পরাভূত করিয়া ঐহিক স্বার্থ-সুখভোগে মত্ত হয়। ক্রমশঃ হৃদয়ের বিকাশ হইতে থাকিলে প্রেম বা প্রীতি-শক্তির সাধনায় মানুষ স্বার্থত্যাগ করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে শেখে, এইভাবেই উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্তি-সাধনার মাধ্যমে জীব ক্রমে স্বীয় শিবত্ব উপলব্ধি করে।

ইহাই মনুষ্যজীবনের তথা মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ইহার আদিতে মধ্যে ও অন্তে রহিয়াছে বিভিন্ন স্তরের শক্তির সাধনা। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সকলেই করিয়া চলিয়াছে কোন-না-কোন প্রকারের শক্তির সাধনা। শক্তিকে এড়াইয়া চলিবার উপায় নাই। অজ্ঞাতসারে অন্ধের মতো এই সাধনা না করিয়া জ্ঞাতসারে করাই সমধিক কল্যাণকর।

বহিঃপ্রকৃতির শক্তি—এমনকি অন্তঃপ্রকৃতির শক্তিও জড়ের পর্যায়ে। প্রাকৃতিক শক্তি—অগ্নি বিদ্যুৎ বন্যা হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য; মানসিক শক্তি—কামক্রোধাদি মানুষকে অন্ধ অচৈতন্য করিয়া ফেলে। কিন্তু বিজ্ঞান-সহায়ে নিয়ন্ত্রণ করিতে জানিলে অগ্নি বন্যা বা বিদ্যুৎকে বিবিধ কল্যাণ-কর্মে নিযুক্ত করা যায়। যোগসহায়ে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মানুষ শান্ত সমাহিত হয়।

কোন শক্তি, এমন-কি আণবিক শক্তিও ভাল না মন্দ, তাহা নির্ভর করিতেছে—কে উহা কি কার্যে প্রয়োগ করিতেছে, তাহার উপর। অতএব শক্তি যত বড়ই হউক, উহার কল্যাণকারিতা নির্ভর করে প্রয়োগকর্তার জ্ঞানের উপর, চেতন মানুষের ইচ্ছার উপর—এক চৈতন্যময় সত্তার উপর।

এই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ—সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী নগ্ন নিষ্ঠুর সত্যের প্রতিমূর্তি মহাশক্তিকে স্থাপন করিয়াছেন কেবল-চৈতন্যস্বরূপ শিবের উপর। শিবশক্তির মিলনেই কল্যাণ, শিব-বিরহিতা শক্তি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, শক্তি বিরহিত শিব শবমাত্র—জড়প্রায়।

দীপান্বিতার অজস্র আলোকে অমার অন্ধকার দূরীভূত হউক, অন্তরে জ্ঞানদীপ জ্বালিয়া আমরা অন্তর্যামিণী ব্রহ্মময়ীর মুখ দর্শন করি, এবং প্রণাম করি :

শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।

করুণা-পাথার কেন মা তোমার

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

মিশ্র ভৈরবী—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

স্বরলিপি : শ্রীভবতোষ দত্ত

করুণা-পাথার কেন মা তোমার করালিনী নাম বল না।
অমিয়হাসিনী মধুরভাষিণী কেন তবু বলে ভীষণা ॥
(তব) করুণা-কোমল নয়নে প্রলয়-বজ্র জ্বলে কেমনে।
তুমি নাকি নিজ সন্তানে গরাস মা করাল-বদনা ॥
লজ্জা তুমি জীবে জীবে, মাতৃ-স্নেহ তুমি শিবে !
কেন তবু বিনাশে বিপ্লবে উল্লাসে নাচ মা নগনা ॥
তুমি ভীষণের ভীষণতা, মৃত্যুরূপা তুমি মাতা !
সুরনর-চির-আরাধিতা মঙ্গলা হর-মনোরমা ॥

— সা রে নি সা রে ম ম — প ধ ম প নিধি পধ মপ
S ক রু ণা পা S থা র S কে ন মা তো SS মাS Sর

— সাগ গরে সা রে সা নিধ নি সা রে সা রে নি সা — —
S করা SS লি S নী নাS ম ব ল না S S S S S I

— প ধ নি সা — নি সা — নি ধ নি প নি ধ প
S অ মি য় হা S সি নী S ম ধু র ভা S ষি ণী

—	সাগ	গরে	সা	সা	রে	সা	নিধ	নি	সা	র্রে	সা	রে	নি	সা	—
S	কেS	নS	S	ত	S	বু	বS	লে	ভী	ষ	ণা	S	S	S	S I
														ম ত	ম ব
গ	ম	প	—	নি	ধ	নি	সা	সা	গরে	সা	রে	নি	সা	সা	—
ক	রু	ণা	S	কো	S	ম	ল	ন	য়S	নে	S	S	S	S	S
প গ	গরে	সা	সা	রে	সা	নিধ	নি	সা	গ রে	সা	—	—	—	—	—
প্র	লS	য়	ব	S	জ্র	অS	লে	কে	ম	নে	S	S	S	S	S
সা	নি	রে	সা	নি	ধ	নি	সা	প	নিধ	প	ধ	ম	প	—	—
তু	মি	না	কি	নি	জ	স	S	স্তা	SS	নে	S	S	S	S	S
গপ	ম	গ	ম	গ	রে	গ	ম	সা	গরে	সা	রে	নি	সা	—	—
গS	রা	স	মা	ক	রা	ল	ব	দ	SS	না	S	S	S	S	S I
সা	—	গ	সা	গ	গ	ম	ম	ধ র্ম	—	ম	র্ম	গ	ম	—	—
ল	S	জ্জা	তু	S	মি	জী	বে	জী	S	বে	S	S	S	S	S
গ	ধ	প	ম	প	ম	গরে	গ	ম	সা	নি	সা	—	—	—	—
মা	S	তৃ	স্নে	S	হ	তুS	মি	শি	S	বে	S	S	S	S	S
সা	নি	রে	সা	নি	ধ	নি	সা	প	নিধ	প	ধ	ম	প	—	—
কে	ন	ত	বু	বি	না	শে	বি	প্ল	SS	বে	S	S	S	S	S
গ	—	প	ম	গ	রে	গ	ম	সা	গরে	সা	রে	নি	সা	—	—
উ	S	ল্লা	সে	না	চ	মা	ন	গ	SS	না	S	S	S	S	S I
গ	ম	ম	ম	নি	ধ	নি	সা	র্গ রে	সা	সা	রে	নি	সা	—	—
তু	মি	ভী	ম	পে	র	ভী	ষ	ণ	S	তা	S	S	S	S	S
প	গ	রে	সা	রে	সা	নিধ	নি	সা	গরে	সা	রে	নি	সা	—	—
মৃ	S	ত্যু	রূ	S	পা	তুS	মি	মা	SS	তা	S	S	S	S	S
প	গ	গ	গ	গ	রে	গ	ম	সা	গরে	সা	রে	নি	সা	—	—
স্থ	র	ন	র	চি	র	আ	রা	ধি	SS	তা	S	S	S	S	S
সা	নি	ধ	প	ম	গ	গপ	ম	সা	গরে	সা	রে	নি	সা	—	—
ম	S	ঙ্গ	লা	হ	র	মS	নো	র	SS	মা	S	S	S	S	S I

বৌদ্ধভারত

স্বামী বিবেকানন্দ

(শ্রীতামসরঞ্জন রায়-কৃত অনুবাদের পূর্বানুবৃত্তি)

তাঁদের আচারে পদ্ধতিতেও তাঁরা স্বতন্ত্র ছিলেন। বস্তুতঃ হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র এই বেদ এক বিশাল শাস্ত্র-সংগ্রহ। এর কতকাংশ একেবারে স্থূল ও অসার, অপরাংশ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে পূর্ণ—এ-অংশ থেকেই ধর্মজ্ঞান লাভ হ'তে পারে। আর এ-সব সম্প্রদায়ের সকলেই বেদের ঐ অংশটুকুই প্রচার করেন ব'লে দাবি ক'রে থাকেন।

প্রাচীন-বেদে আবার তিনটি স্তরবিভাগ দেখা যায়। প্রথমে কর্ম, দ্বিতীয়তঃ উপাসনা এবং তৃতীয়তঃ জ্ঞান। কর্ম এবং জ্ঞান দ্বারা নিজেকে পরিশুদ্ধ করলেই ভগবান্ মানুষের অন্তরে প্রতিভাত হবেন। তিনি যে নিরন্তর অন্তরেই অধিষ্ঠিত—এ-উপলব্ধিও তখন তার হবে। অন্তরের বিশুদ্ধতার ফলেই এ-উপলব্ধি সম্ভব হয়। শুধু কর্ম এবং উপাসনার দ্বারাই মন পবিত্র হ'তে পারে। সেই একমাত্র পন্থা। মুক্তি তখন করায়ত্ত হয়। অতএব কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান—এই তিনটি সোপান-বিশেষ। যে সম্প্রদায়ের কথা বলছি, তাদের বিচারে কর্মের অর্থই অপরের উপকার-সাধন। এ-কথার তাৎপর্য অবশ্যই একটি আছে। কারণ ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কর্মের অর্থই ছিল বিস্তৃত উৎসবানুষ্ঠান—গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি পশুবলি অথবা অন্যবিধ প্রাণীদের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি-প্রদান।

এখন জৈনধর্মাবলম্বিগণ এ-সব কর্মের বিরুদ্ধে কঠিন মত প্রকাশ ক'রত। তারা ব'লত যে এ-সব কর্ম কর্মই নয়। অন্যকে আঘাত দেওয়া কখনও সৎকার্য হ'তে পারে না। পরন্তু এ-সব কর্ম এ-কথাই প্রমাণ করে যে, ব্রাহ্মণদের বেদ মিথ্যা; সেটি পুরোহিতদের তৈরী একটি পুস্তকমাত্র। কারণ কোন মহৎ গ্রন্থ মানুষকে প্রাণী হত্যা করতে নির্দেশ দেবে—এটা অসম্ভব, এটা অবিশ্বাস্য। অতএব প্রাণিহত্যা, পশুবলি প্রভৃতির যে-সব নির্দেশ বেদে লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেগুলি ব্রাহ্মণদেরই রচনা। কারণ সেগুলি তাদেরই স্বার্থের অনুকূল, তাদেরই অর্থাগমের সহায়ক। কাজেই সে-সবই পুরোহিতদের কৌশল-মাত্র।

জৈনদের আর একটি মত হচ্ছে এই যে, ভগবানের কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, আর সেই সূত্রে ধনসম্পদ্ সংগ্রহ করবার জন্য—পুরোহিতদেরই সৃষ্টি—এই ভগবান্। সবটাই এক বিরাট ধাপ্পা। অস্তিত্ব আছে প্রকৃতির, অস্তিত্ব আছে আত্মার। ব্যস্, আর কিছু নেই, ভগবান্ অবাস্তব—অস্তিত্বহীন।

এ-জীবনটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আত্মা জড়িয়ে পড়েছে। দেহ যেন একটি বহির্বাস-রূপে তাকে আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছে। সুতরাং সৎকর্মের অনুষ্ঠান ক'রে যাও। সেটিই পথ।

এদের মতবাদ থেকেই জড়বস্তুর হেয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছিল। এরাই জগতে কৃচ্ছ্রসাধনার প্রথম শিক্ষক। অপরিশুদ্ধতা থেকেই যদি দেহের জন্ম হয়, তবে দেহটি কোন উৎকৃষ্ট বস্তু নয়। যদি কেউ কিছু কাল এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে—উত্তম, সেটি তার শাস্তিস্বরূপ হয়ে গেলে। যদি অকস্মাৎ দেয়ালে মাথাটি ঠুকে যায়, তবে সেটিও একটি আকাঙ্ক্ষিত শাস্তি মাত্র।...

একদা ফ্রান্সিস্কান সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতৃস্থানীয় পুরুষ—সেণ্টফ্রান্সিস তাঁদের অন্যতম—কোন ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাত্রা করেছিলেন। সেণ্টফ্রান্সিসের সঙ্গে একজন সহযাত্রী পথ চলছিলেন। কথা হচ্ছিল এই নিয়ে যে—যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তাঁরা যাচ্ছেন, তিনি তাঁদের অভ্যর্থনা করবেন কিনা। তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন কিনা। সহযাত্রীটি বললেন, খুব সম্ভব তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করবেন না—প্রত্যাখ্যান করবেন। তদুত্তরে সেণ্টফ্রান্সিস বলেছিলেন, 'তাঁর প্রত্যাখ্যানই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বন্ধু! যদি দ্বারে আমাদের করাঘাত শুনে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং আমাদের দূর ক'রে তাড়িয়ে দেন, তবে সেটাও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে না; অথবা তিনি যদি আমাদের হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করেন, তাহলে সেটিও পর্যাপ্ত হ'ল ব'লে আমি মনে ক'রব না; তবে যদি আমাদের হাত-পা সব দৃঢ়ভাবে বেঁধে, বেত্রাঘাতে প্রতি লোমকূপ থেকে রক্তমোক্ষণ করিয়ে তিনি আমাদের ঘরের বাইরে বরফের মধ্যে ফেলে রাখেন, তবে সেটাই আমাদের উদ্দেশ্যলাভের পক্ষে পর্যাপ্ত হ'তে পারে।'

এমনি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার একটি মনোভাব সে-যুগে বিদ্যমান ছিল।

বস্তুতঃ জৈনরাই ছিল কৃচ্ছ্রসাধনার পথিকৃৎ। তবে সেই সঙ্গে তারা কিছু কিছু মহৎকার্যও সম্পন্ন করেছিল। তাদের কথা ছিল—কাউকে আঘাত ক'রো না, দুঃখ দিও না, যথাশক্তি অপরের উপকার সাধন করো। এই কর্ম, এই নীতি ও সদাচার—এ-ছাড়া আর যা-কিছু সবই ব্রাহ্মণদের হাতে গড়া বাজে জিনিস; সেগুলি বর্জন কর।

এই মতবাদের ভিত্তিতেই তারা কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং এটিকেই নানাভাবে পূর্বাপর তারা বিস্তৃত করেছিল। সে এক বিচিত্র আদর্শ। শুধু অ-বৈরী ও পরোপকারের ভিত্তিতে সকল নৈতিক আদর্শকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া—একটি অভিনব আদর্শ বৈকি!

বুদ্ধদেবের অন্ততঃ পাচশত বৎসর পূর্বেকার এই সম্প্রদায়। আবার বুদ্ধদেবও খ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে-পাচশত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। এরা সমগ্র প্রাণিজগৎকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছিল। তাদের মধ্যে সর্ব নিম্নস্তরের যে জীব, তার মাত্র একটি ইন্দ্রিয় বর্তমান, সেটি স্পর্শেন্দ্রিয়। তার উপরের স্তরে রয়েছে স্পর্শ- ও আস্বাদন-ইন্দ্রিয়। তারও উপরে—স্পর্শ-স্বাদ-এবং শ্রবণেন্দ্রিয়। চতুর্থ স্তরে আবার—পূর্বের তিনটির সঙ্গে দর্শনেন্দ্রিয় যুক্ত হয়। আর সর্বশেষ স্তরে পঞ্চেন্দ্রিয়ের সবই বর্তমান থাকে।

এক বা দুই ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট যে-সব প্রাণী—তারা চর্মচক্ষে দৃশ্যমান নয়। তারা জলমধ্যে অবস্থান করে। এদের—এই অতি-নিম্নপর্যায়ের প্রাণীদের হত্যা করা অতি ভয়াবহ কার্য।

এ-যুগে প্রাণিজগতের এ-সকল তত্ত্ব অতি অল্পদিন আগে মাত্র জানা গেছে। তৎপূর্বে এ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। জৈনদের মত এই ছিল যে, সর্ব নিম্নস্তরের প্রাণীদের এক স্পর্শানুভূতি ভিন্ন আর কিছু নেই। তার উপরের স্তরের প্রাণীরাও অদৃশ্য। জৈনরা জানত যে, এ-সব প্রাণী শুধু জলেই বাস করে এবং জল ফুটালে এরা মারা যায়। কাজেই জৈনসন্ন্যাসীরা তৃষ্ণায় মরে গেলেও নিজেরা জল ফুটিয়ে পান করতেন না। কিন্তু ভিক্ষার্থী হয়ে কোন গৃহে গেলে গৃহস্থ যদি জলপান করতে দিত, তবে সে জল তাঁরা গ্রহণ করতেন। কারণ সেক্ষেত্রে প্রাণিহত্যার দায় ছিল গৃহস্থের, আর জলপানের সুবিধাটুকু মাত্র ছিল তাঁদের নিজেদের।

অহিংসার ধারণাটিকে এরা ক্রমশঃ এক হাস্যকর পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল। যেমন—স্নানের সময় শরীর মার্জনা করলে অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায় মনে ক'রে এরা স্নানই ক'রত না। এরা নিজেরা মরতে প্রস্তুত ছিল। কারণ মৃত্যু এদের কাছে এক অতি তুচ্ছ পরিণতি ছিল। আর অপর কোন প্রাণীকে হত্যা ক'রে বেঁচে থাকতেও এরা প্রস্তুত ছিল না।

এদেরই সমসাময়িক কালে আরও নানা কৃচ্ছ্রসাধন-পরায়ণ সম্প্রদায় ছিল এবং এই কৃচ্ছ্রসাধনার কালেই পুরোহিত এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে রেষারেষি ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠেছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নানা বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়েছিল।

আরও কঠিন সমস্যা ছিল জনসাধারণকে নিয়ে। কারণ এ-কালেই জনসাধারণ সর্ববিষয়ে আর্যদের সম-অধিকার দাবি করছিল। প্রকৃতির নিত্য-প্রবহমান স্রোতস্বিনীর তীরে দাঁড়িয়ে জলপানের অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত হওয়া তাদের পক্ষে যেন ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।...

এই মহাসন্ধিক্ষণেই সেই বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল। তাঁর জীবন এবং চরিতকথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। নানা অলৌকিক ঘটনা বা কাহিনীতে মণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও—যা মহাপুরুষ মাত্রেরই জীবনে হয়ে থাকে—বুদ্ধদেব জগতের ইতিহাস-স্বীকৃত মহাপুরুষগণের অন্যতম। বস্তুতঃ এদিক থেকে মাত্র দুজন মহাপুরুষের নামই উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁদের সম্বন্ধে শত্রু-মিত্র উভয়েই একমত, একজন সুপ্রাচীন বুদ্ধদেব, অপরজন হজরৎ মহম্মদ। সুতরাং এঁদের উভয়ের সম্বন্ধেই আমরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। অন্যান্য মহাপুরুষ-সম্বন্ধে তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের উক্তি ভিন্ন আর বিশেষ কিছু আমাদের হাতে নেই।

আমাদের শ্রীকৃষ্ণের বিষয় আপনারা জানেন। হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে অবতার-পুরুষরূপে তিনি পূজিত। তাঁর কাহিনী বহুলাংশে আখ্যান-চরিত মাত্র।

শুধু তাঁর অনুগামী শিষ্যগণই তাঁর জীবনের অধিকাংশ কথা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। এর ফলে, অনেক সময় একই ব্যক্তির মধ্যে যেন একাধিক ব্যক্তি মিশ্রিত হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ বহু অবতার-পুরুষ সম্বন্ধেই আমরা খুব বেশী কিছু জানি না। কিন্তু বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ শত্রু ও মিত্র—উভয়পক্ষই তাঁর কথা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। আরও একটি কথা: মহাপুরুষদের জীবনের সঙ্গে যত কাহিনী, যত অলৌকিক গল্প ও উপাখ্যান জড়িত হয়, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাহ্যকাহিনীসমূহের অন্তরালে প্রত্যেকেরই একটি নিজস্ব সত্তা, একটি আভ্যন্তরীণ স্বকীয়তা থাকে। কিন্তু এ মহাপুরুষটির জীবনের কোন স্তরে, কোন সময়ে স্বকীয় প্রয়োজনে কোন প্রয়াস দেখা যায় না। এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে এই যে, যখনই কোন মহাপুরুষকে অবলম্বন ক'রে কোন আখ্যায়িকা রচিত হয়, তখনই সেই মহাপুরুষের মাহাত্ম্য ও মহিমায় সেটি অনুরঞ্জিত হয়ে থাকে। বুদ্ধদেবের বেলায়ও তাই হয়েছিল সত্য; কিন্তু তাঁর জীবন বা চরিত্র নিয়ে যত উপাখ্যান রচিত হয়েছে, তার কোনটিতে কোথাও কোন অসদাচরণ বা নীচকার্যের ইঙ্গিত নেই। এমন-কি তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও তাঁর প্রশংসাই করেছে।

জন্মলগ্ন থেকেই বুদ্ধ এত পবিত্র ছিলেন, এত নির্মল ছিলেন যে, যেই তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করেছিল, সেই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং পরিত্রাণ লাভ করেছিল। ফলে দেবতাগণ এক সভা আহ্বান ক'রে নিজেদের অসহায় অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন।

কারণ যাগযজ্ঞের উপরই ছিল দেবতাদের নির্ভর, যজ্ঞভাগই ছিল দেবতাদের প্রাপ্য। আর বুদ্ধের প্রভাবে সেই যাগযজ্ঞই বিলুপ্ত হয়েছিল। ফলে একদিকে দেবতাদের আহারও যেমন বন্ধ হয়েছিল, অন্যদিকে তাঁদের প্রভাব তেমনি বিলুপ্ত হয়েছিল। সুতরাং দেবতাগণ তখন এ-কথাই ঘোষণা করেছিলেন, 'যেমন করেই হোক, বুদ্ধকে পতিত করতে হবে। তা-ছাড়া আমাদের আর কোন গতি নেই। তার পবিত্রতা আমাদের পক্ষে দুঃসহ।'

এ-সিদ্ধান্তের পরই দেবতামণ্ডলী বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে সৌম্য, তোমার কাছে আমাদের একটি নিবেদন আছে। আমরা একটি মহাযজ্ঞের সঙ্কল্প করেছি। সেজন্য একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করতে হবে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করেও এমন একটি পবিত্র স্থান আমরা বের করতে পারলাম না, যেখানে সে অগ্নি প্রজ্বলিত করা যায়। তবে এখন সে-স্থানের সন্ধান আমরা পেয়েছি। তুমি যদি নিজ বক্ষদেশ উন্মুক্ত ক'রে শয়ন কর, তবে তোমারই বুকের উপর আমরা অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করতে পারি।'

বুদ্ধ বললেন, 'তাই হবে। আপনারা যজ্ঞ আরম্ভ করুন।' দেবগণ বুদ্ধের বুকের উপর বিশাল অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন এবং ভাবলেন যে, সে অগ্নির উত্তাপে বুদ্ধের মৃত্যু হবে। কিন্তু তা হ'ল না। বুদ্ধ মরলেন না। তখন দেবতাগণ একান্ত হতাশ হলেন এবং তাঁদের হতাশার ভাব সর্বত্র প্রকাশ করতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ বুদ্ধদেবকে কঠিন আঘাত করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'ল না। বুদ্ধকে হত্যা করা গেল না।

তখন সে অগ্নিকুণ্ডের নীচ থেকে এই প্রশ্ন শব্দিত হ'ল : 'আপনারা এ বৃথা শ্রম করছেন কেন? আপনাদের উদ্দেশ্য কী?' উত্তর হ'ল, 'তোমার পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে যেই দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, সেই শুদ্ধ হয়ে যায়, আর কেউ আমাদের উপাসনা করে না; সেজন্য তোমার ধ্বংস আমরা কামনা করছি।'

তদুত্তরে বুদ্ধ বললেন, 'তাহলে আপনাদের পরিশ্রম বৃথা। পবিত্রতা কখনও ধ্বংস হয় না।'

এই কাহিনী বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদীদের রচনা। অথচ এর মধ্যেও বুদ্ধচরিতের প্রতিকূলে শুধু এই দোষটুকুই আরোপিত হয়েছে যে, তিনি এক অদ্ভুত ধরনের পবিত্রতা প্রচার করেছিলেন। আর কিছু নয়। বুদ্ধের মতবাদ-সম্বন্ধে আপনাদের অনেকে কিছু কিছু অবগত আছেন।

বর্তমানকালের যে-সব চিন্তাশীল মনীষী অজ্ঞেয়বাদী ব'লে পরিচিত, তাঁদের কাছে বুদ্ধের মতবাদের বিশেষ একটি আবেদন আছে। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মহান্ প্রবক্তা ছিলেন বুদ্ধদেব। তাঁর কথা এই ছিল : 'আর্য-অনার্য-নির্বিশেষে, জাতি-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে—প্রত্যেক মানুষের অধিকার রয়েছে ধর্মের উপর, অধিকার রয়েছে ঈশ্বরের উপর, স্বাধীনতার উপর। অতএব সে-অধিকারের ক্ষেত্রে সকলকেই আমি আহ্বান করি।'

কিন্তু এ-ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর অজ্ঞেয়বাদী। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন হতেই তিনি সর্বদা উপদেশ দিতেন। একদা পাঁচজন তরুণ—সকলেই ব্রাহ্মণ—একটি প্রশ্নের উপর তর্ক-বিতর্ক করতে করতে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। 'সত্যলাভের পথ কি?'—এই ছিল তাদের প্রশ্ন। তাদের একজন ব'লল, 'আমাদের মতে—এইটি সত্যের পথ। আমার পূর্বপুরুষগণ এ-কথাই প্রচার করেছেন।'

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'আমি কিন্তু অন্যরূপ শিক্ষা লাভ করেছি, এবং আমার বিশ্বাস আমাদের নির্দিষ্ট পথটিই সত্যলাভের একমাত্র পথ।'

'হে আচার্য,—এখন এর মধ্যে কোন্‌টি ঠিক, তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য।'

বুদ্ধদেব তখন তাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে এই কথা বলেছিলেন, 'তোমাদের আত্মগোষ্ঠী সবাই সত্যলাভের জন্য এক একটি পথ নির্দেশ করেছেন। উত্তম! কিন্তু তুমি নিজে কি ঈশ্বর দর্শন করেছ? অথবা তোমাদের পিতা কিংবা পিতামহ কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?'

'না, তারা কেউ ঈশ্বর দর্শন করেনি, তাঁদের পিতা-পিতামহও ঈশ্বর দর্শন করেননি।'

'আচ্ছা, তোমাদের আচার্যদের মধ্যে কেউ কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?'

'না, তাঁরাও ঈশ্বর দর্শন করেননি।

সকলের মুখেই এক উত্তর। সকলেরই এক কথা। কেউ তারা ঈশ্বর দর্শন করেনি।

তখন বুদ্ধদেব সেই পঞ্চ-তরুণকে একটি উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন; বলেছিলেন: দেখ, একবার এক গ্রামে হঠাৎ কোথা থেকে একটি যুবক উপস্থিত হয়েছিল। সে কখনও কাঁদছে, কখনও বিলাপ করছে, কখনও চীৎকার করছে। বলছে, 'আহা, আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি, নিবিড়ভাবে ভালবাসি।' তার চীৎকারে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে এল। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রল, 'কাকে তুমি ভালবাস? কে সে?' 'তা আমি জানি না।' 'কোথায় থাকে সে কন্যা? তার চেহারাই বা কেমন?' 'হায়, আমি সে-সব কিছুই জানি না। কোন সংবাদ রাখি না। শুধু এইটুকু জানি যে, আমি তাকে অত্যন্ত ভালবাসি।'

এখন এই যুবকটি সম্বন্ধে তোমাদের অভিমত কি—তা আমি জানতে চাই।

তরুণগণ তখন সবাই একযোগে ব'লে উঠল, 'কেন মশাই, ও তো একটি আস্ত নির্বোধ! যাকে সে জানে না, চেনে না, যাকে কখনও দেখেনি—এমন একটি অবাস্তব মেয়ের জন্য যে চীৎকার ক'রে বেড়াচ্ছে, তাকে একান্ত বেকুব ভিন্ন আর কি বলা যাবে?'

তখন বুদ্ধ বললেন, 'তাহলে তোমরাও কি অনেকাংশে তাই নও! তোমরা নিজেরাই স্বীকার ক'রছ যে, তোমরা কিংবা তোমাদের পিতা, পিতামহ কেউ কখনও ঈশ্বর দর্শন করেনি। ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বংশপরম্পরায় তোমাদের কারও নেই। অথচ সেই ঈশ্বর নিয়েই তোমরা তর্ক ক'রছ, পরস্পরের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলতে চাইছ। একি পাগলামি নয়?'

তখন তরুণগণ বিব্রত হয়ে বুদ্ধকে প্রশ্ন ক'রল, 'তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত—তাই বলুন।' বুদ্ধদেব বললেন, 'বেশ, তবে শ্রবণ কর। আচ্ছা, তোমাদের পূর্বপুরুষগণ কখনও কি এমন কথা বলেছেন যে, ভগবান্ কোপনস্বভাব, ভগবান্ অসৎ।' 'আজ্ঞে না, তেমন কথা তাঁরা কখনও বলেননি। তিনি চির-সৎ, চির-পবিত্র—এই তাঁরা বলেছেন।'

'তাহলে হে তরুণগণ—তোমরা যদি কায়মনোবাক্যে সৎ হও, সর্বভাবে পবিত্র হও, তবেই ভগবানের সান্নিধ্যে পৌছতে পারবে। তর্ক-বিতর্ক ক'রে বা পরস্পরকে আক্রমণ ক'রে ভগবান্-লাভ হয় না। অতএব আমার নির্দেশ এই যে—পবিত্র হও, সৎ হও। সর্বান্তঃকরণে অপরকে ভালবাস। ভগবান্-লাভের এই চিরন্তন পথ, অন্য পথ কিছু নাই। [ক্রমশঃ]

দক্ষিণভারত-দর্শন

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী অমলানন্দ

দক্ষিণ দিগন্তের শেষ তীর্থ 'কন্যাকুমারী' দর্শন ক'রে এবার আমরা চলেছি উত্তরমুখে। পথে 'শুচীন্দ্রম্' দর্শন এবং 'নাগের কোয়েলে' এক ভক্তগৃহে মধ্যাহ্নভোজনের কথা। নাগের কোয়েল থেকে আমাদের বড় দলটি চলে যাবেন ত্রিবান্দ্রম্। সেখান থেকে কালাডি, তারপর মহীশূর হয়ে তিরুপতি দেখে তাঁরা ফিরবেন মাদ্রাজ; আর আমরা জনপাঁচেক ফিরছি মাদুরা হয়ে সোজা মাদ্রাজ মঠে।

শুচীন্দ্রম্

এখন শুচীন্দ্রম্-এর কথা। শুচীন্দ্রমের অপর নাম ছিল 'জ্ঞানারণ্য'। এখানে মুনি-ঋষিরা ধ্যান-তপস্যাদি সহায়ে জীবনের চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করতেন। এই জ্ঞানারণ্যে একদা বাস করতেন মহর্ষি অত্রি ও তাঁর সতী সাধ্বী পত্নী অনসূয়া দেবী। তপস্যার জন্য অনেক সময় ঋষি অত্রি গভীরতর অরণ্যে চলে যেতেন, তখন অনসূয়া একাকিনী আশ্রমে থাকতেন স্বামীর পাদোদক ভরসা ক'রে। অনসূয়ার পাতিব্রত্যের কথা দেবলোকেও পৌঁছেছিল। নারদ একদিন স্বর্গের দেবদেবীগণের কাছে গিয়ে বললেন--এই ত্রিভুবনে অনসূয়ার মতো এমন সতী আর নেই। স্বভাবতই দেবীগণের ঔৎসুক্য হ'ল অনসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষা করার জন্য। দেবীগণের ইচ্ছানুসারে একদিন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর সামান্য ব্রাহ্মণের বেশে অনসূয়ার নিকট অতিথিরূপে উপস্থিত হলেন তাঁর সতীত্ব পরীক্ষা করবার জন্য। অনসূয়া যথারীতি আদর আপ্যায়ন করলেন। কিন্তু আহারকালে ছদ্মবেশী অতিথিরা বললেন, 'আমরা স্থির করেছি—পরিবেশনকারিণী অনাবৃত দেহে পরিবেশন না করলে আমরা কিছুই গ্রহণ ক'রব না।'

অনসূয়া ভাবিত হলেন · কারা এঁরা, এই বা কি অতিথির রীতি! এ যে তাঁর সতীত্বের চরম পরীক্ষা! কিন্তু অতিথি নারায়ণ, অতিথিসেবা না হ'লে তিনি পাপে লিপ্ত হবেন। এখন কি উপায়? সতীর পরম অবলম্বন পতি। কিন্তু পতি অনুপস্থিত, তাঁর পাদোদক আছে আশ্রমে। পতির পাদোদকে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটুট। এই পাদোদক তাঁকে এতদিন রক্ষা করেছে সকল আপদে-বিপদে। আজও সেই আশ্বাসে তিনি বুক বাঁধলেন। পতির পবিত্র পাদোদক সতী ছিটিয়ে দিলেন অতিথিদের উপর। আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল। ব্রাহ্মণবেশী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর পরিণত হলেন দুগ্ধপোষ্য তিনটি শিশুতে। তখন আর অনাবৃত দেহে অতিথিসেবার কোন বাধাই রইল না। দেবতারা পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করলেন। সতী অনসূয়া তাঁর সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্তু বিপদ হ'ল দেবপত্নীদের। স্বামীদের অনেকদিন কোন খবর না পেয়ে তাঁরা অত্রি-অনসূয়ার আশ্রমে উপস্থিত হয়ে দেখলেন—তাঁদের স্বামীরা শিশুরূপে সেখানে অবস্থান করছেন। অবশেষে তাঁরা অনসূয়ার কাছে কৃপাভিক্ষা করলেন; ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তখন স্ব স্ব রূপ ফিরে পেলেন। শুচীন্দ্রমের মন্দিরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি আজও বিরাজ করছে।

এই পুণ্য স্থানে তপস্যা ক'রে দেবরাজ ইন্দ্র শুচিতা লাভ করেছিলেন, তাই এর নাম 'শুচীন্দ্রম্'। ইন্দ্র গৌতম-মুনির পত্নী অহল্যাকে পাবার জন্য গৌতমের সঙ্গে ছলনা করেছিলেন। একদিন গভীর রাত্রে আশ্রমের বাইরে ইন্দ্র কাকের আওয়াজ করলেন। মুনি মনে করলেন—রাত্রি প্রভাত হয়েছে। তিনি স্নান-আহ্নিকের জন্য বেরিয়ে গেলেন। এই সুযোগে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরে আশ্রমে প্রবেশ ক'রে অহল্যার সহিত মিলিত হন। গৌতম-মুনি এদিকে সরোবরে স্নান করতে গিয়ে বুঝলেন—এখনও প্রভাত হ'তে অনেক দেরি ; কে তাঁকে ছলনা ক'রল? বিপদের ভয়ে তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরে এলেন। সমস্ত জানতে পেরে ঋষি গভীর দুঃখে অভিশাপ দিলেন, যার ফলে অহল্যা পরিণত হয়েছিলেন পাষাণে, এবং বহুকাল পরে পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যার শাপমুক্তি হয়েছিল—এ-কথা রামায়ণে বর্ণিত। অন্যায়ভাবে পরনারীর প্রতি আকর্ষণের জন্য ইন্দ্রকেও ঋষি অভিশাপ দিয়েছিলেন, 'কুপ্রবৃত্তির ফলস্বরূপ তোমার সারা দেহ যোনি-চিহ্নে ভরে যাক'। শাপমুক্তির জন্য ইন্দ্র এইস্থানে বহুদিন কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তপস্যার ফলে তিনি পুনরায় শুচিতা লাভ করেছিলেন ; তাই এই স্থানের নাম 'শুচীন্দ্রম্'।

শুচীন্দ্রম্-মন্দিরের কারুকার্য অতি সুন্দর। এখানকার নাটমন্দিরটিতে নানারকমের দর্শনীয় জিনিস আছে। এখানেও একটি সুরস্তম্ভ আছে, যাতে প্রতিটি সুর স্পষ্টভাবে শোনা যায়। মন্দিরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি পূজিত হন, তবে এখানে প্রধান দেবতা হলেন শিব—তাঁকে 'শুচীন্দ্রেশ' বা 'স্থানেশ্বর' নামে অভিহিত করা হয়। কন্যাকুমারী দেবীর সঙ্গে শুচীন্দ্রেশ-শিবের বিবাহ স্থগিত হওয়ার কথা পূর্বেই আমরা বর্ণনা করেছি। এখানে শিবের পাশে তাই পার্বতী-মূর্তি নেই, তিনি একা তপস্যারত—যেন চির-প্রতীক্ষারত।

শুচীন্দ্রম্-মন্দিরে আঞ্জনেয় মহাবীরের এক অপূর্ব বিরাট মূর্তি আছে। এ পর্যন্ত এত বড় মূর্তি আমরা আর কোথাও দেখিনি। কি তার চোখের দৃষ্টি! আর্তি ও আত্মবিশ্বাস যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। জ্ঞানভক্তির এরূপ অপরূপ সমন্বয় কি ক'রে পাথরে ফুটে উঠল—সে এক পরম বিস্ময়! খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল—একটি ছবি তুলে নিয়ে আসি, কিন্তু উপায় ছিল না ; তাই সে ছবি মনেই তোলা রইল।

এখানকার মন্দিরের একটি বিশেষত্ব দেবতার অভিষেক-বারি মন্দিরের বাইরে দেখা যায় না, কথিত আছে, তা কন্যাকুমারী-মন্দিরের স্নানঘাটের নিকট সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়। আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয়—মন্দিরের নিকট যে বড় জলাশয়টি আছে, তাকে বলা হয় 'ত্রিবেণী'।

নাগের কোয়েল

শুচীন্দ্রম্ থেকে মাত্র দু-মাইল উত্তরে নাগের কোয়েল। নাগের কোয়েল একটি ছোট্ট শহর। নারকেল গাছের সারিগুলি মনে করিয়ে দেয়—আমরা কেরল প্রদেশের দিকে এগোচ্ছি। শহরের প্রান্তে বড় রাস্তার ধারে একটি মাটির দেওয়াল-ঘেরা বাড়ির দরজায় আমাদের বাস থামলো। এইখানেই আমাদের মধ্যাহ্নভোজনের আমন্ত্রণ। এক মধ্যবিত্ত পরিবারের অনাড়ম্বর কিন্তু পরিচ্ছন্ন একটি পর্ণকুটীর। বাইরের বারান্দায় আমাদের বিশ্রামের স্থান হ'ল। অদূরে দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র। পরিবেশটি ভারি সুন্দর লাগছিল। তাঁদের ভাষা আমরা বুঝতে পারছিলাম না। ইংরেজীতে সামান্য

সামান্য আলাপ-পরিচয় হচ্ছে, কিন্তু তারই মধ্যে যে আন্তরিকতার সুর ভেসে আসছে, তাতে মনে হ'ল আমরা যেন একান্ত আপনজনের সান্নিধ্যই লাভ করেছি—বিশেষ ক'রে মুগ্ধ হলাম গৃহস্বামীর বৃদ্ধা মাতার আপ্যায়নে। বৃদ্ধা কত-রকমই যে রান্না করছেন, কিন্তু তাঁর সাধ মিটছে না! তাঁর মনোমত সব পদগুলি এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এদিকে আমাদের তাড়া আছে। খেতে দেরি হ'লে ত্রিবান্দ্রমের বাস পাওয়া যাবে না। আর একটু দেরি হ'লে মাদুরাগামী যাত্রীরাও মাদ্রাজের ট্রেন ধরতে পারবে না। মিনিট-ঘণ্টার কাঁটায় বাঁধা আধুনিক জীবনের সঙ্গে বৃদ্ধার পরিচয় অল্প। সে জটিলতার মধ্যে তিনি ঢুকতেও রাজী নন। আমাদের ব্যস্ততাকে তিনি একেবারেই আমল দিতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত, যাই হোক, আমাদের খাওয়ার জায়গা হ'ল এবং আমরা খেতে বসলাম। বৃদ্ধা নিজেই পরিবেষণ আরম্ভ করলেন! তাঁর নিজের ভাষায় (তামিল-জানা ব্রহ্মচারীর নিকট পরে জানলাম) তিনি আমাদের অনুনয় করছেন আস্তে আস্তে খেতে। আমাদের মন কিন্তু রকেটের গতিতে চলতে আরম্ভ করেছে। সম্বর, রসম্—সব কিছু শেষ ক'রে শেষ পদ 'বাটার মিল্কে' হাজির হয়েছি। এমন সময় দেখা গেল ধূমায়মান উপমার হাণ্ডা। 'উপমা'র উপমা নেই, তবে দেখতে অনেকটা আমাদের ঘিভাতের মতো। চালের বদলে গোটা গোটা গম দিয়ে তৈরী হয় এই উপমা। পেট ভরতি হয়ে গেছে; সকলেই বলছেন 'কুঞ্চ কুঞ্চ' (অর্থাৎ অল্প অল্প) দিন, বৃদ্ধা কিন্তু জোর ক'রে হাতা ভরতি গরম উপমা পাতে ফেলে দিচ্ছেন আর তাঁর ভাষাতে বলছেন—সবটা খেতে হবে। স্নেহবৎসলা, সেবাপরায়ণা ভারতীয় নারীর মাতৃহৃদয়ের সে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা! নাগের কোয়েলে মধ্যাহ্নভোজনের পর বড়দলের যাত্রীরা বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে ত্রিবান্দ্রম্‌গামী বাস ধরলেন।

সে কাহিনী আমরা প্রবন্ধান্তরে শুনতে পাবো। এখন আমরা মাত্র পাঁচজন রইলাম বাসে, আমাদের বাস ছুটল মাদুরার দিকে। পথে পুরাতন দৃশ্যাবলীর পুনরাবর্তন। তিনেভেলিতে আমাদের গাইড নেমে গেলেন। ড্রাইভার যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে বাস চালিয়ে মাদুরাই স্টেশনে আমাদের যখন নামিয়ে দিল, তখন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। ইচ্ছা থাকলেও মীনাক্ষী-দর্শনের সময় আর ছিল না। মনে মনে মাকে প্রণাম জানালাম। মাদ্রাজগামী ট্রেন ছাড়তেও অল্প বাকী। বিশ্বনাথন্ সপরিবারে আমাদের বিদায় দিতে এসেছেন। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে—মাদুরার 'গান্ধী-স্মারক নিধি'তে যখন আমরা উঠেছিলাম, তখন এঁদের চেষ্টাতেই আমাদের মীনাক্ষী-দর্শনাদি সহজ হয়েছিল। মাত্র দু-একদিনের আলাপে আমরা একান্ত আত্মীয়ে পরিণত হয়েছি।

মাদুরা থেকে ট্রেন ছাড়লো সন্ধ্যা ৬॥ টায়। সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতিরিক্ত যাত্রীর ভিড় ছিল খুব। যাই হোক, একটা রাত্রি কেটে যাবে কোন রকমে। মাদ্রাজগামী এক খৃষ্টান পরিবার ছিলেন সেই কামরায়; তাঁদের সঙ্গে কিছু আলাপ হ'ল। ইংরেজী তাঁদের মাতৃভাষা হলেও একটা জিনিস খুব ভাল লাগলো যে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা।

পরদিন বেলা ৮টার সময় আমরা নামলাম মাদ্রাজের এগমোর স্টেশনে। খানিকটা ভাষা-বিভ্রাটের জন্য আশ্রমে পৌঁছতে আমাদের দেরি হ'ল। দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করতে হ'লে শুধু ইংরেজী জানলে চলে না; কিছুটা তামিল জানা যে একান্ত প্রয়োজন, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি

করলাম। যাই হোক, বেলা প্রায় ৯॥টায় আমরা মাদ্রাজ মঠে পৌঁছলাম।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজ সম্বন্ধে এখানে দু-চারটি কথা নিবেদন ক'রে এ ভ্রমণকাহিনী শেষ ক'রব। তীর্থময় দক্ষিণ ভারতের অনেক তীর্থ আমরা দর্শন ক'রে ধন্য হয়েছি। কিন্তু এই মাদ্রাজ শহরের প্রতিটি ধূলিকণা পবিত্র। এখানে সেই পার্থসারথির মন্দির, যাঁর আশীর্বাদে আচার্য রামানুজের জন্ম, যে মন্দিরের কথা স্বামীজী আমেরিকা থেকেও উল্লেখ করেছেন। এইখানেই সেই মায়লাপুর, দেবী ময়ূরীর রূপ ধরে যেখানে শিবকে খুঁজে পেয়ে পূজা করেছিলেন। ময়ূরের নামেই এ অঞ্চলের নাম 'মৈলাপুর' বা 'মায়লাপুর'। শিবের নাম কপালীশ্বর। এখানেই আলবার পেয় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিম্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেও জীবনের পরম গতি তিনি লাভ করেছিলেন—ঈশ্বরদ্রষ্টা মহাপুরুষরূপে তিনি দক্ষিণভারতে আজ সর্বজনপূজ্য। সর্বোপরি রাম-কৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নামাঙ্কিত ধর্মচক্রপ্রবর্তনের এক মহাকেন্দ্র এই মাদ্রাজ। এই প্রবন্ধের প্রথমেই আমরা উল্লেখ করেছি—ভারতের বাইরে ধর্ম-প্রচারের প্রেরণা স্বামীজী পেয়েছিলেন এই মাদ্রাজ শহরেই। ভারতবর্ষে ফিরে এই মাদ্রাজেই তিনি তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত বক্তৃতা দিয়েছিলেন:

(১) My Plan of Campaign (Victoria Hall)

(২) Vedanta in its Application to Indian life

(৩) The Sages of India

(৪) The Work before us (Triplicane Literary Society)

(৫) The Future of India.

এগুলিতে ভারতের নবজাগরণের মহান্ পরিকল্পনা উদ্ঘাটিত হয়েছে। শুধু পরিকল্পনার খসড়া দিয়েই তিনি তৃপ্ত ছিলেন না, সেগুলি কাজে পরিণত করার জন্য কলকাতায় ফিরে মাসখানেকের মধ্যে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে মাদ্রাজে পাঠিয়ে দেন। দক্ষিণভারতে আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের যে বিরাট মহীরুহ শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে লক্ষ লক্ষ নরনারীর আশ্রয়-স্থল হয়েছে, তার মূলে আছেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী। তাঁর প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে-সব বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—মায়লা-পুর' সেগুলির মধ্যমণি। শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এই মঠের কাছে কিছুদিন বাস ক'রে বহু ভক্তকে কৃপা ক'রে গেছেন। অবতার-বরিষ্ঠের মানসপুত্র শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজও এই মঠে বহুদিন বাস করেছিলেন। তাঁদের পবিত্র স্মৃতি ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর তপস্যা এখানকার আকাশে বাতাসে ওতপ্রোত হয়ে একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। এই নিবিড় শান্তিময় পূত পরিবেশ নিত্য শত শত ভক্তজনকে কিভাবে আকর্ষণ করছে, তা আমাদের প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছিল। শতবর্ষ-জয়ন্তী-উৎসবের বিভিন্ন দিনে বিশেষ ক'রে পূজনীয় রাজা-মহারাজের জন্মতিথি ও পূঃ লাটুমহারাজের স্মৃতি উপলক্ষে দুটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে আমরা তার কিছুটা পরিচয় পেয়েছি।

এখানকার প্রকাশন-বিভাগটি দক্ষিণ ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য কৃষ্টিকেন্দ্র। এটিরও প্রতিষ্ঠাতা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী। এই মঠের সংলগ্ন দাতব্য চিকিৎসালয়-বিভাগটিও আর্ত-নারায়ণের সেবার প্রাণকেন্দ্র। এ-ছাড়া মাদ্রাজ শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্টুডেন্ট্স্ হোম, বিবেকানন্দ কলেজ, বয়েজ্ হাইস্কুল, সারদা বালিকা-বিদ্যালয়

প্রভৃতি বিদ্যায়তনের মাধ্যমে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শ সার্থক রূপায়ণের পথে চলেছে সহস্র সহস্র বালক-বালিকার জীবনে। নবভারতের নবীন তীর্থ—এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেখবার সুযোগ পেয়েও নিজেদের ধন্য মনে করেছি।

মাদ্রাজ শহরে দেখবার জিনিস আছে অনেক। মাদ্রাজের সমুদ্র-সৈকত একটি অতি মনোরম স্থান। শহরের দক্ষিণাংশে আডিয়ারে অ্যানি বেস্যান্ট-প্রতিষ্ঠিত থিওজফিস্ট সোসাইটি একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। কপালীশ্বর মন্দির ও সেণ্ট থোম (St. Thome) ক্যাথিড্রাল অবশ্য দর্শনীয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়টির সুরম্য ভবনও বহু দর্শককে আকর্ষণ করে।

*   *   *

অবশেষে প্রত্যাবর্তন। ৩০শে জানুআরি সন্ধ্যায় 'কলকাতা মেল' ছাড়লো। কত ছবি মনের উপরে ভেসে যাচ্ছিল; ভাবছিলাম—সত্যই দক্ষিণভারতে যা দেখেছি, যা পেয়েছি তার তুলনা নেই। দক্ষিণভারতের এই কয়েকটি দিন জীবনের কয়েকটি বছরের মতোই মূল্যবান্। দক্ষিণভারতের ঐতিহ্যময় মন্দিরগুলির উত্তুঙ্গ মহিমা, প্রাকৃতিক পরিবেশের অনবদ্য মাধুর্য, পর্বত-প্রান্তর; নদনদী, সমুদ্রের অপরূপ সৌন্দর্য স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। তার সঙ্গে স্মরণ করছি দাক্ষিণাত্যবাসীদের অপূর্ব আতিথেয়তা। ভৌগোলিক দূরত্ব ও আবহাওয়ার তারতম্য দক্ষিণভারতকে উত্তরভারত থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র করেছে—তা অবশ্য স্বীকার্য, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা ও রীতি-নীতিতে উত্তর ও দক্ষিণের ব্যবধান অনেকখানি—তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ মনে হচ্ছে—মাত্র কয়েকদিনের মেলামেশায় আমরা যেন এক-পরিবারভুক্ত হয়ে গেছি। ট্রেনে-বাসে, পথে-ঘাটে, নগরীর প্রাসাদে, পল্লীর কুটীরে, দেবতার দেউলে—দক্ষিণভারতের যে দাক্ষিণ্য আমরা লাভ করেছি, তার জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাষা আমাদের নেই। শুধু হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে উপলব্ধি করেছি—তারা আমাদের একান্ত আপনার জন আর আমরা সকলে একই দেশজননীর সন্তান—একই জগন্মাতার সন্তান।

ক্ষণিকের জন্য হলেও মাঝে মাঝে একটি প্রত্যয়—একটি ভাব এসে মনকে অধিকার ক'রে বসেছে—রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে হু হু শব্দে ট্রেন যখন চলেছে উত্তরমুখে—তখন সেই ভাবটি মৌন মনের একতারায় কেবলই বাজতে লাগলো:

মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥

মহাভারতের নীতিমূলক উপাখ্যান

(পূর্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপিকা ডক্টর যূথিকা ঘোষ

মহাভারতে মূল কাহিনীর গতি অতি মন্থর, কেন-না বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনার জন্য কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকথা প্রতিপদে ব্যাহত হয়েছে। শান্তিপর্ব ও অনুশাসন-পর্বের মধ্যে প্রধানতঃ মূল কাহিনীকে উপেক্ষা ক'রে ধর্ম দর্শন ও রাজনীতি আলোচনার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। নীতিপ্রচার ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত, সেজন্য এই দুইপর্বের মধ্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানের সংযোগ সাধিত হয়েছে। উপাখ্যানগুলি অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত এবং সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলির সহিত তুলনীয়। রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষধর্মের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শান্তিপর্বে, সেই দুরূহ আলোচনা মধ্যে মধ্যে সরস ও প্রীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানের দ্বারা 'ঋষি-শকুনি-সংবাদ', 'শ্যেনজিৎ-উপাখ্যান', 'কালকবৃক্ষীয়-উপাখ্যান', 'ব্যাঘ্রগোমায়ু-সংবাদ', 'সরিৎসাগরসংবাদ', 'কৃতঘ্নোপাখ্যান' প্রভৃতি গল্পগুলি গভীর উপদেশে পূর্ণ এবং সুস্পষ্ট-ভাবে নীতিজ্ঞানের ধারক ও বাহক, অতএব এগুলির নীতিগত মূল্য কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নকর্তা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং সেই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরদাতা মহাপ্রাজ্ঞ হিতাকাঙ্ক্ষী যুক্তিনিপুণ পিতামহ ভীষ্ম।

'শ্যেনজিৎ-উপাখ্যানে' আমরা দেখি—নৃপতি শ্যেনজিৎ শোকাভিভূত অবস্থায় মানবজীবনে মহাকালের অনিবার্য প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হন। মানবের জন্ম হ'লে মৃত্যু সুনিশ্চিত, মৃত্যুর করাল কবল থেকে ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ—কেহই পরিত্রাণ লাভ করে না এবং কখন যে ধীর পদবিক্ষেপে মৃত্যু কার নিকট অচকিতে এসে উপস্থিত হয়, তা কেউ জানে না। ক্লেশপূর্ণ পৃথিবীতে ক্লেশ পরিহার করা দুষ্কর :

দুঃখমেবাস্তি ন সুখং তস্মাত্তদুপলভ্যতে।
তৃষ্ণার্তিপ্রভবং দুঃখং দুঃখার্তিপ্রভবং সুখম্ ॥

—এই সংসারে দুঃখই প্রচুর, সুখ নহে; সেজন্য দুঃখের অনুভবই অধিক হয়ে থাকে। তার মধ্যে বিষয়বাসনায় দুঃখ জন্মে আর দুঃখ-নাশের পরে সুখ হয়।

এই ধারণা মনের মধ্যে বলবতী থাকলে আর প্রিয়জনের আকস্মিক বিয়োগে দুঃখে অভিভূত হ'তে হয় না। যুধিষ্ঠির যখন কুরুক্ষেত্রের সমরের পর শোককাতরা স্বজনবিহীনা কামিনীগণের বিলাপধ্বনিতে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন, তখন তাঁর চিত্তস্থৈর্যের জন্য শ্যেনজিৎ রাজার উপাখ্যান বিবৃত করা হয়।

মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মদেব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সুযোগ্য পাত্র বিবেচনা ক'রে রাজনীতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন সরস গল্পের মাধ্যমে। 'কালকবৃক্ষীয়-উপাখ্যান' সুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন ও দুষ্ট অমাত্য-দমনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। রাজনীতিবিদ্ পিতামহ ভীষ্মের প্রগাঢ় রাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এই সব গল্পের মধ্য দিয়ে। কালকবৃক্ষীয় নামে এক মহর্ষি কোশলরাজ ক্ষেমদর্শীর রাজ্যে উপস্থিত হয়ে রাজার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন। পণ্ডিত-প্রবর ঋষি রাজ্যমধ্যে অবাধে বিচরণ ক'রে

অমাত্যবর্গের হীন আচরণ সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য নিরূপণ করেন, তারা যে প্রতিনিয়ত রাজকোষ অপহরণ ক'রে রাজাকে গোপনে ক্ষতিগ্রস্ত করছেন, সে-সংবাদ তিনি নিশ্চিতভাবে অবগত হয়ে রাজাকে নিবেদন করেন এবং এরূপ গৃহ-শত্রুর বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য রাজাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। কপটাচারী অমাত্যগণ ধীরে ধীরে রাজার বিনাশের কারণ হবে এবং সমস্ত রাজ্যে প্রজাগণও রাজা কর্তৃক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের অভাবে সমূহ ধ্বংসের সম্মুখীন হবে—এ-বিষয়ে তিনি রাজাকে সতর্ক ক'রে দেন: তৃণ যেরূপ উচ্চ বৃক্ষের আশ্রয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অবশেষে দাবাগ্নিসহযোগে সেই বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে, সেরূপ আপনার অমাত্যগণ আপনারই আশ্রয়ে পরিবর্ধিত হয়ে আপনার ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে, অতএব এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আপনাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। আপনি তাদের সমস্ত অপরাধ প্রমাণ ক'রে একে একে তাদের হীনবল ক'রে বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করুন। একযোগে সকলের বিনাশসাধনের চেষ্টা সমীচীন নয়, কেন-না সেক্ষেত্রে তারা একত্র হয়ে রাজার প্রচেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিতে পারে। মহর্ষির দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণ জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে রাজা ক্ষেমদর্শী তাঁকে প্রধান পুরোহিত-পদে নিযুক্ত করেন। এই মহর্ষি রাজাকে অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক বিবিধ জ্ঞান প্রদান ক'রে নৃপতির চারিত্রিক উৎকর্ষ-সাধনেও অত্যন্ত সচেষ্ট হয়েছিলেন। বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু উভয়কেই সমূলে অবদমিত করার পন্থা প্রদর্শিত হয়েছে এই উপাখ্যানে। সুশাসন ও শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শত্রুর উচ্ছেদ-সাধনে নৃপতির সর্বদা তৎপর থাকা উচিত।

'ব্যাঘ্রগোমায়ুসংবাদ' নামক যে ক্ষুদ্র কাহিনীর অবতারণা কিছু পরেই করা হয়েছে, সেখানেও নীতিপ্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য। কোন এক রাজা পূর্বজন্মের পাপাচরণ-হেতু শৃগালযোনি প্রাপ্ত হন। পূর্বজন্মের কথা স্মরণে থাকায় তিনি সদ্ভাবে জীবনযাপনের অভিলাষ পোষণ করেন এবং সেহেতু অন্যান্য শৃগালের ন্যায় পশুবধে প্রবৃত্ত না হয়ে ধর্মাচরণের দ্বারা কাল যাপন করতে থাকেন। পশুরাজ ব্যাঘ্র তার এতাদৃশ আচরণ লক্ষ্য ক'রে তাকে প্রধানমন্ত্রী-রূপে বরণ করে; কিন্তু অন্যান্য শৃগালেরা ঈর্ষাপরবশ হয়ে কুমন্ত্রণা দ্বারা শৃগালের প্রতি ব্যাঘ্রের বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে। ব্যাঘ্র শৃগালের প্রাণ-নাশে উদ্যত হয়, কিন্তু মাতার উপদেশে হঠকারিতা থেকে নিবৃত্ত হয়। শৃগালের সৎ মনোভাব সম্বন্ধে অপর আর এক অনুচরের কাছ থেকে প্রকৃত সংবাদ অবগত হয়ে ব্যাঘ্র নিজ আচরণের জন্য লজ্জা বোধ করে। পরে শৃগালকে পূর্বের মতো মন্ত্রিত্ব অর্পণ করতে ব্যাঘ্র সম্মত হয়, কিন্তু শৃগাল তা প্রত্যাখ্যান করে, কেন-না একবার যে-সম্বন্ধে ভাঙন ধরে সে-সম্বন্ধে পুনরায় প্রত্যয়ের উদ্রেক করতে হ'লে চাতুর্যের আশ্রয় নিতে হয়, তথাপি পূর্বতন সম্বন্ধের মাধুর্য পুনরায় অনুভূত হয় না। কোন কারণে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'লে পুনরায় নূতনভাবে পারস্পরিক প্রীতির সম্বন্ধ গঠন করা সম্ভব হয় না, সংশয় ও অবিশ্বাসের ভাব সহজে দূরীভূত হয় না। প্রতি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত-গ্রহণের পূর্বে সম্যগ্‌ভাবে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। সাধারণ জগতে এতাদৃশ ব্যাপারে যেরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়, তারই উল্লেখ এই গল্পটিতে:

দুঃখেন শ্লিষ্যতে ভিন্নং শ্লিষ্টং দুঃখেন ভিদ্যতে।
ভিন্না শ্লিষ্টা তু যা প্রীতির্ন সা স্নেহেন বর্ততে॥

—বিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে অনেক কষ্টে সংযুক্ত

করা যায় এবং সংযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন করাও আয়াসসাধ্য। একবার বিচ্ছিন্ন হবার পর পুনরায় সংযোগের ফলে যে প্রীতির উদ্ভব হয়, সে প্রীতিতে আর পূর্বের মতো মাধুর্য থাকে না।

অহঙ্কারী ব্যক্তির পতন রোধ করা যায় না—এই সুপরিচিত নীতিকথাটি নিবেদনের জন্য 'সরিৎসাগরসংবাদ' নামক সরস উপকথার বিবৃতি হয়েছে শান্তিপর্বে। সমুদ্রের অনুযোগ নদী-সমূহের কাছেঃ তোমরা বিরাট বৃক্ষ ও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিরন্তর আমার জলে আনয়ন কর, কিন্তু কখনও লঘু বেতসখণ্ড জলের মধ্যে দেখা যায় না—এর কারণ কি? গঙ্গানদী বলেন যে, স্রোতের বেগে বেতসখণ্ড সর্বদা অবনত থাকে, কিন্তু অন্যান্য গুরু বস্তু—যা কিছু নদীস্রোতের প্রতিকূলে গমন করে, তাদের সমূলে উৎপাটিত ক'রে সাগরাভিমুখে নদী নিয়ে যায়। নম্রতা ও বিনয় মানুষের উন্নতির কারণ—কিন্তু ঔদ্ধত্য বিনাশ সূচনা করে। নদী ও সাগরের কথোপ-কথন এই সাধারণ সত্যের নির্দেশকঃ

যো হি শত্রোর্বিবৃদ্ধস্য প্রভোর্বন্ধবিনাশনে।
পূর্বং ন সহতে বেগং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি॥
সারাসারং বলং বীর্যমাত্মনো দ্বিষতশ্চ যঃ।
জানন্ বিচরতি প্রাজ্ঞো ন স যাতি পরাভবম্॥

—যে ব্যক্তি শক্তিশালী শত্রুর বিনাশক তেজ পূর্ব হ'তে সহ্য করতে না পারে, সে শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের ও শত্রুর বল ও শিক্ষানৈপুণ্য, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অবগত হয়ে বিচরণ করেন, তিনি কখনও পরাভব প্রাপ্ত হন না।

শান্তিপর্বের 'শাকুলোপাখ্যান' দীর্ঘসূত্রতার নিন্দা প্রদর্শনের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনাগত-বিধাতা, প্রত্যুৎপন্নমতি ও দীর্ঘসূত্র নামে তিনটি মৎস্য কোন জলাশয়ে বাস ক'রত। মৎস্যজীবীরা জলাশয়ে মৎস্যসংগ্রহের জন্য উপস্থিত হ'লে অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি নিজেদের বুদ্ধি অনুসারে সমূহ বিপদ উপলব্ধি ক'রে জলাশয় থেকে পলায়ন করে, কিন্তু দীর্ঘসূত্র নিজ আলস্য-বশতঃ বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা না করায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে কর্মসম্পাদন মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, নচেৎ অমূল্য জীবন কর্মহীনতা ও নিশ্চেষ্টতার ফলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতি সাধারণ উপদেশ বিবৃত করার জন্য মৎস্যত্রয়ের কাহিনীর সংযোজনাঃ

অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিশ্চ যঃ।
দ্বাবেব সুখমেধেতে দীর্ঘসূত্রী বিনশ্যতি॥

—যে লোক পরিণামদর্শী ও যে লোক প্রত্যুৎপন্নমতি, তারা দুজনে সহজে উন্নতি লাভ করে, কিন্তু দীর্ঘসূত্রতা যে ব্যক্তির আচরণে বিদ্যমান, সে বিনষ্ট হয়।

'কপোতলুব্ধক-সংবাদ'রূপ উপাখ্যানটির বাঙ্ময় প্রতিফলন ও ভাবগত ব্যঞ্জনা অতি অপূর্ব। নীতিমূলক উপাখ্যানের মধ্যে এই কাহিনীটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে—এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য। নিষ্ঠুরতার মূর্ত প্রতীক লুব্ধক, নির্মম ভাবে পশুহত্যার দ্বারা জীবিকা-সংস্থানে প্রবৃত্ত সে, কোন প্রকার করুণার স্থান নেই সে পাষাণ-হৃদয়ে। একদিন প্রবল বারিবর্ষণের মধ্যে বনে বিচরণকারী ব্যাধ এক কপোতীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে। নিরুপায় অবস্থায় সেই দুর্যোগে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সমস্ত আশা ত্যাগ ক'রে সে বিরাট বটবৃক্ষের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। পিঞ্জরাবদ্ধ কপোতীর বাসস্থল সেই বৃক্ষের নীড়ে; কপোত সেই সময় কপোতীর জন্য করুণস্বরে বিলাপরত, কিন্তু পিঞ্জরাবদ্ধ কপোতীর কি উদার মনোভাব! পতিবিরহে কাতরা ক্লেশ-পীড়িতা প্রাণসংশয়ে দোলায়মানা কপোতী বিস্মৃত হয় না গার্হস্থ্য-ধর্মের কথা। পিঞ্জর থেকে

পতিকে অতিথি-সৎকারের জন্য সে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে থাকে। গৃহস্থের ধর্মসম্বন্ধে সচেতন হয়ে কপোত মহাশত্রু লুব্ধকের জন্য পর্ণশয্যা রচনা করে এবং অগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে তার মধ্যে প্রবেশ করে। উদ্দেশ্য এই যে, নিজের শরীরের সুসিদ্ধ মাংস দ্বারা অতিথির ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে এতক্ষণে বিবেকের উদয় হয় ব্যাধের মনে স্বকীয় হীন আচরণের জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হয় ব্যাধ। নিজের মানসিক দৈন্য ও জীবিকা-অর্জনের হীন উপায়ের কথা চিন্তা ক'রে অত্যন্ত অনুশোচনায় পূর্ণ হয় তার মন—

অহো দেহপ্রদানেন দর্শিতাতিথিপূজনা।
তস্মাদ্ধর্মং চরিষ্যামি ধর্মো হি পরমা গতিঃ॥

—দেহপ্রদানের দ্বারা কপোত অতিথি-সৎকার ক'রল। এজন্য আমিও ধর্মাচরণ ক'রব, কেন-না ধর্মই একমাত্র পরম আশ্রয়।

কপোতকে অগ্নিতে প্রবেশ করতে দেখে অনুতপ্তচিত্তে কপোতীকে মুক্ত ক'রে ব্যাধ সেস্থান ত্যাগ করে। পিঞ্জরমুক্ত কপোতীর পতির লোকান্তর-প্রাপ্তিতে যে মর্মভেদী বিলাপ, তা পাঠকমাত্রের হৃদয়কে বিচলিত করে। কপোত ও কপোতী সদাচরণ ও ধর্মবোধের উজ্জ্বল নিদর্শন, তাদের আশ্রয় ক'রে গার্হস্থ্য-ধর্মের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে, তাদের যুক্তিপূর্ণ কথোপকথন করুণরস পরিস্ফুরণের সহায়ক। করুণরসের এই নিপুণ ও স্পষ্ট পরিস্ফুরণ আর অন্য কোন নীতিমূলক উপাখ্যানে দৃষ্ট হয় না। পিঞ্জরাবদ্ধ কপোতীর বন্ধন ও মুক্তি দুই-ই গভীর বিষাদের চিত্র। হৃদয়ের বেদনা অন্তস্তলে নিগৃহীত ক'রে কর্তব্যবোধের প্রেরণায় অতিথি-সৎকারের জন্য পতির প্রাণত্যাগেও সে সম্মতি জানায়। পিঞ্জরমুক্ত কপোতী শোকার্ত হৃদয়ে মৃতপতির আত্মার অনুসন্ধান করে, বাহিরের শুষ্ক কর্তব্যবোধ অন্তরের গভীর বেদনা প্রশমিত করতে পারে না। এদের সদাচরণের গৌরব ও জয় সূচিত হয়েছে ব্যাধের মনোভাব-পরিবর্তনের দ্বারা। নিষ্ঠুর ব্যাধ আত্মধিক্কারের গ্লানিতে জর্জরিত হয়ে এতদিনের জীবিকা-অর্জনের নিন্দিত পথ পরিহার ক'রে ধর্মাচরণে ব্রতী হয়, আর উপাখ্যানের নীতিগত আদর্শ যে অতিথি-সৎকার গৃহস্থের ধর্ম, তাও পাশাপাশি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

'কৃতঘ্নোপাখ্যানে'র মধ্যে দুরাচারী অসংযমী পশুভাবাপন্ন গৌতম-নামক ব্রাহ্মণের উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণের স্বধর্ম পরিহার ক'রে দস্যুদের সঙ্গে বাণশিক্ষা করার ফলে পশুহননই ব্রাহ্মণ গৌতমের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। গৌতমের পরিচিত একটি ব্রাহ্মণ অতিথি-রূপে দস্যুগৃহে আগমন করায় গৌতমকে হীনবৃত্তি ত্যাগ ক'রে স্বধর্মে ব্রতী হ'তে অনুরোধ জানায় তার উপদেশ উপেক্ষা ক'রে গৌতম সে স্থান ত্যাগ ক'রে অনেক দূরে রাজধর্ম-নামে এক বকের আতিথ্য গ্রহণ করে। বকের উপদেশে বিরূপাক্ষ-নামক রাক্ষসের নিকট প্রচুর ধনরত্ন লাভ ক'রে প্রত্যাবর্তনের পথে পুনরায় রাজধর্মের অতিথি হয়। রাজধর্ম তার পথশ্রান্তি দূর করার সর্বোতোভাবে চেষ্টা ক'রে নিজে বিশ্রামগ্রহণে অভিলাষী হয়। কিন্তু গৌতমের কি অদ্ভুত মনোবৃত্তি! কি হীন আচরণ! গৌতম চিন্তা করে যে, সুদূর পথ অতিক্রম ক'রে ধনরত্ন বহন ক'রে নিয়ে যেতে হবে, কিন্তু তার কাছে খাদ্যদ্রব্য কিছু নেই, এজন্য আশ্রয়দাতা বককে নিদ্রিত অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে সংহার ক'রে তার মিষ্ট মাংস হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করে। এদিকে রাক্ষসরাজ বিরূপাক্ষ পর পর দুদিন বন্ধুবর রাজধর্মের অদর্শনে চিন্তিত হয়ে নিজপুত্র ও অন্যান্য রাক্ষসদের বন্ধুর সন্ধানে প্রেরণ করেন। তিনি

অনুমান করেছিলেন—ঐ দুরাচারী ব্রাহ্মণ গৌতম নিশ্চয়ই রাজধর্মকে বধ করেছে এবং তাঁর অনুমান সত্য হওয়ার পরে তিনি গৌতমের বিনাশ সাধন করেন। গৌতম কতদূর কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়েছিল, তা চিন্তা করলে সমস্ত শরীরে শিহরণ জাগে। নিরন্তর পশুবধের দ্বারা তার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়েছিল। তার বিচারবুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটেছিল, স্বার্থসাধনই তার মূল লক্ষ্য ছিল এবং সেই স্বার্থসম্পাদনের ক্ষেত্রে মানবধর্মবোধের কোন স্থান ছিল না। রাজধর্মের ঔদার্য ও সদাচরণের পাশে এরূপ কুৎসিত জঘন্যচরিত্র গৌতমের হস্তে রাজধর্মের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের চিত্রটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কৃতঘ্ন ব্যক্তির ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্থান নেই। ভীষ্মদেব ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলতে থাকেন: যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, রাক্ষসেরাও তার মাংস ভোজন করে না। বরং সুরাপায়ী, তস্কর ও ব্রতঘ্ন ব্যক্তির নিস্তার আছে; কিন্তু যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, সে গভীর অন্ধকারে নিপতিত হয়:

কুতঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্।
অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নো হি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥

—কৃতঘ্নের যশই বা কোথায়? স্থানই বা কোথায় আর সুখই বা কোথায়? নিন্দাভাজন কৃতঘ্নের নিষ্কৃতি নেই।

শান্তিপর্বের মধ্যে আরও কয়েকটি নীতিমূলক উপাখ্যান আছে। শান্তিপর্বের 'মার্জার-মূষিক-সংবাদ', 'পবনশাল্মলীসংবাদ', 'ঋষি-কুক্কুরসংবাদ', 'চিরকারিক উপাখ্যান'—এগুলির প্রত্যেকটিই বিশেষ বিশেষ নীতি প্রচার করে। অনুশাসন-পর্বের মধ্যেও 'দৈবপুরুষকার', 'শৃগালবানর-সংবাদ', 'কীটোপাখ্যান', 'হরিণকৃষকাখ্যান' প্রভৃতি আখ্যানগুলি একই উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গৌতমী, লুব্ধক, ব্যাল, কাল ও মৃত্যু সংবাদ—অনুশাসনপর্বের একটি বিশিষ্ট উপাখ্যান, এখানে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব জনশিক্ষার জন্য সহজ-ভাবে প্রচার করা হয়েছে। শান্তিপরায়ণা ধর্ম-প্রাণা গৌতমী-নাম্নী এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর একটি মাত্র পুত্র ছিল। ভাগ্যবিড়ম্বনা-বশতঃ সেই পুত্রটি সর্পদষ্ট হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হ'লে লুব্ধক গৌতমীর অনুমতি নিয়ে সর্পটির প্রাণনাশ করতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু গৌতমী সর্পকে দোষী না ক'রে মৃত্যুর প্রেরণায় সর্প এরূপ কাজ করেছে—বার বার বলতে থাকেন। সর্পই পুত্রের বিনাশের কারণ—এ বিশ্বাসে লুব্ধক অটল, কিন্তু সর্পবিনাশে বাধা-প্রাপ্ত হয়ে যখন বিষণ্ণবদনে অবস্থান করছিল, তখন মৃত্যু সেখানে উপস্থিত হয়ে জানান যে, কালের প্রভাবেই এরূপ শোকপ্রদ ব্যাপার ঘটেছে। কাল কিছুক্ষণ পরে সেইস্থানে উপস্থিত হয়ে মানুষ যে তার পূর্বজন্মের কর্মফলবশতঃ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে-কথা জানিয়ে দেন:

যদনেন কৃতং কর্ম তেনায়ং নিধনং গতঃ।
বিনাশহেতুঃ কর্মাস্য সর্বে কর্মবশা বয়ম্॥

—পুত্র নিজের কর্মের জন্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে। কর্মই এর বিনাশের কারণ, আমরা সকলেই কর্মের বশবর্তী।

কর্মই মানুষের পাপ পুণ্য প্রকাশ ক'রে থাকে, মনুষ্য কর্মসমুদায়ের বশীভূত। কর্মসমুদায়ও সেরূপ মনুষ্যের আয়ত্ত; ছায়া ও রৌদ্রের ন্যায় কর্ম ও কর্তা নিরন্তর পরস্পর সুসম্বদ্ধ রয়েছে। অতএব এক্ষেত্রে সর্প মৃত্যু বা কাল—শিশুর বিনাশের কারণ নয়, শিশুর পূর্বজন্মের কর্মফলই এরূপ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। জন্মান্তরবাদ এবং কর্মফলের অমোঘ প্রভাব ব্যক্ত হয়েছে এই তত্ত্বপূর্ণ কাহিনীটিতে।

আধুনিক যুগে উপাখ্যানের যুগোপযোগী রূপান্তর ঘটেছে, উপাখ্যান-রচনার ধারা

পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। ছোট গল্প ও উপন্যাসে সাহিত্য আজ সুসমৃদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ ভাবে নীতিপ্রচারের প্রাক্তন রীতির তিরোধান ঘটেছে। অবশ্য আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের মধ্যে সরাসরিভাবে নীতি-প্রচারের স্পৃহাকে অবদমিত করতে পারেননি এবং এজন্য তাঁর উপন্যাসগুলির যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। আধুনিক যুগে কাব্যরসপিপাসু পাঠক সাহিত্যিক রচনায় নীতি-প্রচারের প্রয়াসকে সমাদর করে না। আদর্শবাদের প্রাধান্য সাহিত্যের সৌন্দর্যবিকাশের ব্যাপারে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে এবং রসসৃষ্টিরও প্রধান প্রতিবন্ধক। কাব্যের মাধুর্য আস্বাদন করাই কাব্যরসিকের প্রধান অভিপ্রায়; সেজন্য যেখানে নীতিজ্ঞান অতি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাকে এবং কাব্যরসই প্রধান হয়ে ওঠে, সেখানে আপত্তির কারণ নেই। মানবকে সৎপথে পরিচালিত করবার জন্য আইন আদালত ও ধর্মশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ আছে, এজন্য সাহিত্যকে নীতি-প্রচারের বাহন করা বর্তমান পাঠকের দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে মহাভারতীয় যুগের নীতিবোধ ও আধুনিক যুগের নীতিবোধের মধ্যে বৈষম্য আছে, তা অবশ্যই স্বীকার্য। মহাভারত মহাকাব্যও বটে, ধর্মশাস্ত্রও বটে, অতএব মহাভারতের তথ্য-বহুল বহুব্যাপক স্বরূপটিই কাব্যগত মাধুর্য ও ধর্ম-শাস্ত্রগত নীতিপ্রচারের সুসমঞ্জস সঙ্গতির পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছে।

অপর মহাকাব্য রামায়ণের যে কাহিনী, তার সঙ্গে অন্যান্য উপকাহিনীর যোগ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু মূলকাহিনী দ্বারাই সেখানে নীতিবোধকে অন্তঃকরণে পরিস্ফুটভাবে জাগ্রত করার জন্য রামচন্দ্রের মতো আচরণ করা উচিত এবং রাবণের মতো আচরণ নিন্দার্হ—এই আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। মহাভারতের মূল কাহিনীও প্রত্যেক চরিত্রের আচরণের মাধ্যমে রামায়ণের ন্যায় অনুরূপ আদর্শ বিঘোষিত করে এবং প্রতি পর্বে বিশেষতঃ শান্তি- ও অনুশাসন-পর্বে পরিবেশটি নীতিপ্রচারের উপযোগী ক'রে তোলা হয়েছে। তবে 'ইন্দ্রিয়জয়স্য মূলং বিনয়ঃ', 'বিনয়স্য মূলং বৃদ্ধোপসেবা', 'কদাচিদপি চারিত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ', 'নীচেষু বিশ্বাসো ন কর্তব্যঃ' ইত্যাদি উপদেশ দ্বারা যে নীতিপ্রচার, তা শুষ্ক ও নীরস, কিন্তু মহাভারতের নীতিবাদ সে পর্যায়ের নয়। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষার ক্ষেত্র সেখানে প্রসারিত করা হয়েছে। ভারতীয় চিন্তাধারায় সুন্দরের সঙ্গে সত্য ও শিবের আদর্শ বিজড়িত হয়ে আছে। মহাভারত-রচনার সময়ে যে 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর বাণী জ্ঞানিগণের মুখে মুখে প্রচারিত হ'ত, তার প্রতিধ্বনিই ঐ জনপ্রিয় মহাকাব্যে যে শ্রুত হবে, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? প্রেয়োবোধ ও শ্রেয়োবোধের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন এবং একদিক দিয়ে মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী যেমন চিত্ত-বিনোদনের উপায়-হিসেবে প্রেয়োবোধের উন্মেষ-সাধনে সহায়তা করেছে, তেমন অন্যদিকে নীতি-শিক্ষার দ্বারা প্রেয়োবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারেও মহাভারতের দান অপরিসীম—এ-কথা অনস্বীকার্য। স্মরণাতীত কাল থেকে এই মহাকাব্য পাঠকমণ্ডলী ও শ্রোতৃমণ্ডলীর জিজ্ঞাসু মনের জটিল প্রশ্ন-সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছে এবং বর্তমান যুগেও সমস্যাবিক্ষুব্ধ ক্লেশজর্জরিত মানবসমাজের জন্যও মহাকাব্যের প্রশস্ত দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিন্স ওয়ল্‌কন্সকী

যদিও রুশদেশের ধর্মযাজকগণ ১৮৯৩ খৃঃ চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন নাই, তথাপি জানা যায়—প্রিন্স ওয়ল্‌কন্সকী (Prince Wolkonsky) রুশদেশের প্রতিনিধি-রূপে এই মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয় নাই, মাত্র রুশদেশের স্বাধীন প্রতিনিধিরূপে তিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় তাঁহার কথায় উদারতার সুর শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সহিত পরিচিত হন এবং এই পরিচয় বিশেষ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

বহু বৎসর পরে বিখ্যাত বেহালাবাদক অ্যালবার্ট স্পালডিং-এর নিকট প্রিন্স ওয়ল্‌কন্সকী স্বামীজীর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। স্পালডিং-এর 'Rise to follow' নামক আত্মচরিতে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

'ওয়ল্‌কন্সকী একজন চমৎকার আলাপপটু ব্যক্তি ছিলেন। দেখিলাম—তিনি ১৮৯৩ খৃঃ ধর্মমহাসভায় রুশদেশের প্রতিনিধিত্ব করায় আমাদের দেশের (আমেরিকার) সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করি, 'আপনি কি সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত পরিচয়-লাভের সুযোগ পেয়েছিলেন?' তিনি উত্তরে বলেন, 'নিশ্চয়' এবং আরও জানান যে, পরবর্তী কালে উভয়ে চিঠিপত্র বিনিময়ও করিতেন, অবশ্য সেই পত্রগুলি পাওয়া যায় নাই।

'আমি সে-সময় অল্পবয়স্ক ছিলাম, তাই কিরূপে স্বামীজীকে মনে রাখিয়াছি, তাহা বুঝাইবার জন্য বলি যে, আমাদের পরিবারের সকলে স্বামীজীর সহিত পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহারা আমাকে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন।'

ওয়ল্‌কন্সকী বলিলেন, 'স্বামীজী তোমাদের দেশে—যাকে চাঞ্চল্যকর সাফল্য বলে, তাই লাভ করেছিলেন।'

১৮৯৩ খৃঃ ৩০শে অক্টোবর সেণ্টলুই-এ এক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রিন্স ওয়ল্‌কন্সকী এক ভাষণ দেন। এই ভাষণে প্রিন্সের স্বাভাবিক সরলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তিনি বলেন, 'কে কোন্ ধর্মসম্প্রদায়-ভুক্ত?—এ প্রশ্ন নিরর্থক। কে কিরূপ মানুষ, সেই অনুসারে তার বিচার কর। ধর্মমহাসভার বড় সার্থকতা এই যে, সেখানে উপস্থিত সকলে 'মানুষ' চিনতে শিখেছেন। সেখানে এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি আধ্যাত্মিকতার মূর্তবিগ্রহ। আমি জানি না, তিনি কোন্ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীর ন্যায় চিন্তা করেন, কাজ করেন এবং কথা বলেন; কিন্তু তোমরা বলো, তিনি খ্রীষ্টান নন; বেশ ভালই। তোমরা বলো, তিনি বৌদ্ধ; আরও ভাল। তোমরা যদি মনে কর—তোমরা উন্নততর ধর্মসম্প্রদায়-ভুক্ত, তবে তোমরা আরও ভাল হ'তে চেষ্টা কর।'

এই বক্তৃতা ৩১শে অক্টোবর সেণ্টলুই 'রিপাব্লিকান' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়

উপরি-উক্ত ঘটনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই অভিজাত-বংশসম্ভূত রুশ প্রতিনিধি স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং স্বামীজীর ভাবধারা এই প্রতিনিধির মাধ্যমে রুশদেশেও প্রবেশ করিয়াছিল—সন্দেহ নাই। এস্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য প্রিন্স ওয়ল্‌কন্সকী 'মানুষ'—এই ভাবেরই প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহা স্বামীজীর বহুল-প্রচারিত ভাবেরই প্রতিধ্বনি।

জি. জি. নরসিংহাচারিয়ার

দাক্ষিণাত্যে যে কয়েকজন যুবক স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহার পরিব্রাজক-জীবনে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা ও গভীর আধ্যাত্মিকতার জন্য ভবিষ্যৎ কালে ভারতের গৌরব জগৎসভায় প্রতিষ্ঠিত করিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বলিয়া অনুভব করিয়া তাঁহার অনুগত শিষ্যে পরিণত হন, জি. জি. নরসিংহাচারিয়ার তাঁহাদের অন্যতম। স্বামীজী ইঁহাকে 'জি জি' বলিয়াই সম্বোধন করিতেন। মাদ্রাজী ভক্তদিগের কথা তিনি প্রায়ই আলাসিঙ্গা পেরুমলের ঠিকানাতে পত্রে উল্লেখ করিতেন এবং আলাসিঙ্গাকে বহুবার এইরূপ সতর্ক করিয়াছেন যে, সুবিধার জন্যই স্বামীজী তাঁহাকে পত্র দেন, কিন্তু সকলকে যেন পত্রের সংবাদ জানানো হয় এবং আলাসিঙ্গাকে স্বামীজী বিশেষরূপে নির্বাচিত করিয়াছেন—এই ভাব যেন তাঁহার মনে না উঠে।

জি. জি. বাঙ্গালোরের অধিবাসী ছিলেন এবং 'ব্রহ্মবাদিন্'পত্রিকা-প্রকাশনে আলাসিঙ্গা পেরুমলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

স্বামীজী ১১ই জানুআরি, ১৮৯৫ খৃঃ চিকাগো হইতে জি. জি.কে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—মাদ্রাজে স্বামীজীর ভাবধারা-প্রচারে জি. জি.-র উপর স্বামীজী গভীর আস্থা রাখিতেন।

স্বামীজীকে আমেরিকা পাঠাইতে মাদ্রাজী যুবকদলের মধ্যে জি. জি.-র অবদান অনেকখানি, মাদ্রাজে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা-প্রচারেও তাঁহার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা অতি স্পষ্ট।

স্বামীজী বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইলে যে-সব মাদ্রাজী ভক্ত স্বামীজীর সহিত কলিকাতা আসেন, তন্মধ্যে জি. জি. একজন। জি. জি. স্বামীজীর সহিত দার্জিলিং পর্যন্ত যান। এই সময়ে মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী ও স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্য-শিষ্যাগণের সহিত জি. জি.-র পরিচয়-লাভের সুযোগ উপস্থিত হয়। এই কালে স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। স্বামীজীর সহিত ঐ সময়ের ঘনিষ্ঠতা অবশ্যই মাদ্রাজে ভবিষ্যৎ কার্যসূচীর এক সুস্পষ্ট পরিকল্পনা এই শিষ্যদিগের নিকট পরিস্ফুট করিয়াছিল।

মৃণালিনী বসু

মৃণালিনী বসু ছিলেন স্বামীজীর শিষ্যা। তাঁহার নিবাস চব্বিশপরগনা জেলার বড় জাগুলিয়া গ্রামে। স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের সহিত তাঁহার আত্মীয়তাও ছিল।

পত্রাবলীতে এই মহিলাকে লিখিত স্বামীজীর দুইখানি পত্র পাওয়া যায়। ১৮৯৮খৃঃ ৩রা জানুআরি দেওঘর-বৈদ্যনাথ হইতে যে পত্র লিখেন, তাহা হইতে মনে হয়—নানা সমস্যা সমাধানের জন্য শিষ্যা গুরুর উপদেশ চাহিয়া-ছিলেন এবং গুরুও শিষ্যাকে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করিয়াছিলেন।

অন্য পত্রটি ১৯০০ খৃঃ ২৩শে ডিসেম্বর দেওঘর-বৈদ্যনাথধামের প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

গৃহ হইতে লিখিত। এই পত্র ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে স্বামীজীর সতেজ ও নূতন ভাববহুল আলোচনা এবং আধ্যাত্মিক উপদেশে পূর্ণ।

স্বামীজীর ভারতে দীক্ষিতা শিষ্যা মাত্র দুই জনরেই নাম পাওয়া যায়, একজন মৃণালিনী দেবী এবং দ্বিতীয়া—হরিপদ মিত্র মহাশয়ের সহধর্মিণী ইন্দুমতী মিত্র।

মিস এম্মা থার্স´বি

লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়িকা মিস এম্মা থার্সবি মিসেস ওলিবুলের বন্ধু ছিলেন। স্বামীজী যখন নিউইয়র্কে ১৮৯৫ খৃঃ প্রথম ভাগে স্বাধীনভাবে বেদান্ত প্রচার করিতে থাকেন, সেই সময় এম্মা বেদান্ত-সমিতির সভ্যতালিকাভুক্তা হন।

স্বামীজী একদিন মিস থার্সবির গৃহে আমন্ত্রিত হইয়া যান। সেখানে একজন প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের অসহিষ্ণু পাদরীর সহিত স্বামীজীর আলোচনা হয়। আলোচনায় পাদরীটি যুক্তি দ্বারা স্বামীজীকে পরাভূত করিতে না পারিয়া যুক্তির অভাব ক্রোধ এবং কটূক্তি দ্বারা পূরণ করেন। ইহাতে খুবই এক বিসদৃশ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

এই ব্যাপারে মিসেস ওলিবুল মনে করেন, এই সব পাদরী বিরুদ্ধাচরণ করিলে স্বামীজীর নিউইয়র্কে বেদান্ত-প্রচারকার্যের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য তিনি বলেন, এই সকল ধর্মযাজক যতই অসহিষ্ণু বা গোঁড়া হউন না কেন, স্বামীজী যেন তাঁহাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করেন, যাহাতে তাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে না পারে।

কচ্ছের মহারাজা

স্বামীজী পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণকালে ভুজ রাজ্যে আসিয়া দেওয়ানজীর গৃহে বাস করিতে থাকেন। দেওয়ানজীর সহিত স্বামীজীর নানা জনহিতকর বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। তন্মধ্যে শিল্প কৃষি ও শিক্ষা-বিস্তার সমস্যা এবং দেশের আর্থিক সমস্যাই প্রাধান্য লাভ করে। স্বামীজীর সহিত আলাপে পরিতুষ্ট হইয়া দেওয়ান সাহেব স্বামীজীকে কচ্ছের মহারাজার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। মহারাজার সহিত স্বামীজীর দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয় এবং এই কথোপকথন মহারাজের মনে বিশেষ রেখাপাত করে।

প্রভাসতীর্থে স্বামীজীর সহিত মহারাজার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে মহারাজা প্রভাবিত হন এবং তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। মহারাজা বলিতেন, 'স্বামীজী, বহু পুস্তক পাঠের পরে যেমন মাথা ঘোরে, আপনার আলোচনা শুনে তেমনি আমার মাথা ঘোরে! আপনি এত ধীশক্তি কিরূপে কাজে লাগাবেন? যতদিন না আশ্চর্যজনক কাজ করতে পারবেন, ততদিন আপনার বিশ্রাম নেই।'

কচ্ছ-মাণ্ডবীতে স্বামী অখণ্ডানন্দের সহিত স্বামীজীর দেখা হয়। প্রায় এক পক্ষকাল এক সঙ্গে অবস্থানের পর স্বামীজী একাকী থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করায় অখণ্ডানন্দ অন্যত্র চলিয়া যান। মহারাজার বিশেষ অনুরোধে এখান হইতে তিনি আর একবার ভুজে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

রঘুনাথ ভট্টাচার্য

স্বামী অখণ্ডানন্দের সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া স্বামীজী ১৮৯০ খৃঃ শীতকালে টিহিরি রাজ্যে পৌছান। এস্থানে রঘুনাথ ভট্টাচার্যের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ঘটে। রঘুনাথবাবু টিহিরি রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। তিনি কলিকাতার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

স্বামীজী এই সময় ভাগীরথীর তটে তপস্যা করিবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিতেছিলেন। দেওয়ানজী সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন এবং ভাগীরথী ও ভিলাঙ্গনা নদীর সঙ্গম-স্থলে গণেশ-প্রয়াগে মনোমত স্থান পাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কিন্তু যেদিন এই ব্যবস্থা সমাপ্ত হয়, সেই দিনই স্বামী অখণ্ডানন্দ অসুস্থ হইয়া পড়েন। স্থানীয় চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া বলেন, রোগটি নিউমোনিয়া এবং সত্বর সমতলে স্থানান্তরিত করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা করা প্রয়োজন। যদিও গণেশ-প্রয়াগে যাওয়ার সব ঠিক, তবু স্বামীজী দেওয়ানকে এই ব্যবস্থা-পরিবর্তনের কারণ জানান এবং বলেন, ভবিষ্যতে যদি কখনও সুযোগ উপস্থিত হয়, তবে এই ব্যবস্থানুযায়ী কাজ করিতে চেষ্টা করিবেন।

দেওয়ানজী দেরাডুনের সিভিল সার্জনকে এক পরিচয়-পত্র দেন এবং মুসৌরী পর্যন্ত যাইবার জন্য দুইটি টাট্টু ঘোড়া এবং পাথেয় খরচের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময় স্বামীজী টিহিরিতে প্রায় একমাস বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু বিধির বিধানে স্বামীজীর জীবনে আর নির্জনবাস বা ভাগীরথী-তটে তপস্যার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই।

মিঃ এরিক হ্যামণ্ড

মিঃ এরিক হ্যামণ্ড ইংরেজ এবং ইংলণ্ডে স্বামীজীর প্রচারকার্যে ইঁহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইঁহারা স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হন। ইংলণ্ডের কাজে ইঁহাদের নিকট হইতে স্বামীজী বিশেষ সহায়তা লাভ করেন।

মিঃ হ্যামণ্ড 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় স্বামীজী-সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান। স্বামীজী ১৮৯৭ খৃঃ ৫ই মে আলমবাজার মঠ হইতে মিস নোবল্‌কে (নিবেদিতা) পত্রে লিখেন: মিঃ হ্যামণ্ড 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় একটি চমৎকার কবিতা পাঠিয়েছেন—যদিও আমি মোটেই এ প্রশস্তির যোগ্য নই।

মিঃ হ্যামণ্ড স্বামীজী-সম্বন্ধে যে স্মৃতিকথা লিখেন, তাহা 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই স্মৃতিকথা হইতে স্বামীজীর লণ্ডন আগমন ও একটি ক্লাবে বক্তৃতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল: লণ্ডনে আগমন করিলে লণ্ডনবাসীরা তাঁহাদের স্বভাবানুযায়ী ধীর চিন্তাশীল ও হিসাবী মন লইয়া স্বামীজীকে স্বাগত জানান। সর্বত্রই বোধ হয় ধর্মপ্রচারক এমন একটি পরিবেশের সম্মুখীন হন, যাহা প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে, কিন্তু অল্পবিস্তর সন্দেহপূর্ণ। এই সন্দেহ ও বিস্ময়ের ভাব স্বামীজী নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহাও নিশ্চিত যে, তাঁহার বিশ্ববিজয়ী ব্যক্তিত্ব ইহার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে এবং বহু ব্যক্তির হৃদয় অধিকার করিতে সক্ষম হয়।

ক্লাব, সমিতি, বৈঠকখানা প্রভৃতির দ্বার তাঁহার জন্য উন্মুক্ত হইল। শিক্ষার্থিগণ একত্র হইয়া নানা স্থানে নির্দিষ্ট অবকাশের পর তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতে সমবেত হইত। তাঁহার বাণী শুনিয়া শ্রোতাদের আর যেন তৃপ্তি হইত না, শুনিবার ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি পাইত!

এইরূপ এক সভায় একজন শুভ্রকেশ বিখ্যাত দার্শনিক বলেন, 'আপনি সুন্দর বলেছেন, আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু মহাশয়, আপনি আমাদিগকে নূতন কথা কিছু শুনান নাই।' বক্তার (স্বামীজীর) স্বরে ঘর নিনাদিত হইয়া উত্তর আসিল, 'যা সত্য, তাই আপনাদের শুনিয়েছি। সত্য স্মরণাতীত কালের পর্বতের মতো, মানবজাতির মতো,

সৃষ্টির মতো ও মহান্ ঈশ্বরের মতোই প্রাচীন। যদি এই সত্য এমনভাবে ব'লে থাকি, যাতে আপনাকে চিন্তা করতে হবে এবং সেই চিন্তার অনুরূপ জীবন যাপন করতে বাধ্য করবে, তবে কি ভাল করিনি?' চারিদিকে মৃদু 'শোন, শোন' রব এবং জোর করতালি-ধ্বনি হইতে বুঝা গেল, স্বামীজী শ্রোতাদিগকে তাঁহার ভাবে কতদূর আকর্ষণ করিয়াছেন!

স্বামীজী অত্যুৎকৃষ্ট বাগ্মিতায় শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বলেন। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া ও উপেক্ষা করিয়া গুরুর কথায় বলেন, 'আমাকে যে দেখছ এবং আমি যা হয়েছি, তা তাঁরই জন্য; আমি বা আমার কথায় যা কিছু উত্তম, সত্য এবং চিরন্তন—সবই তাঁর মুখনিঃসৃত; তাঁর আত্মা থেকে তা আমার নিকট এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীর এই যুগের ধর্মজীবনের শক্তি ও কর্মতৎপরতার উৎস। যদি পৃথিবীতে আমার গুরু-সম্বন্ধে ক্ষণিক আলোকপাত করতে সক্ষম হই, তবে আমার জীবন সার্থক।'

সিসেম ক্লাবে বক্তৃতাকালে এরিক হ্যামণ্ড স্বামীজীর প্রথম দর্শন পান। সেই দিন শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। এখানে প্রধানতঃ ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে বিশুদ্ধ সুললিত ইংরেজীতে বক্তৃতা দিয়া উপস্থিত সকলকে চমৎকৃত করেন। ইহার পর হইতেই মিঃ হ্যামণ্ড স্বামীজীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, ক্রমে তাহা নিবিড় শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

অনন্ত জিজ্ঞাসা

শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত

আকাশের নীলরশ্মি মানবেরে দিল যে-বিস্ময়
সৃষ্টির প্রথম দিনে,—বিস্ময়ের সেই ব্যাকুলতা
দু'চোখে উঠল ফুটে,—কণ্ঠে তার জাগলো যত কথা
তারো মাঝে বিচ্ছুরিত বিস্ময়ের প্রগাঢ় সঞ্চয়।

আশ্চর্য সুন্দর যত আকুলতা, করেছে তন্ময়
মানুষের মনগুলি টেনে নিয়ে অদ্ভুত সোহাগে:
ব্যাপ্ত সাগরের প্রাণ কলরোলে হ'ল গতিময়,
সুসজ্জিত অন্ধকারে দৃষ্টি ফিরে কী চায় বা কাকে!

বিস্ময়ের প্রেরণায় আনন্দের চেতন-সমীরে
বুকের প্রহরগুলি নির্ভুল সূর্যের চায় ভাষা:
নীহারিকান্তর থেকে তৃণের শ্যামল রূপ ঘিরে
যুগে যুগে উচ্চারিত মানবের অনন্ত জিজ্ঞাসা।

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

[পূর্বানুবৃত্তি]

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

ক্রমে চন্দ্রের আলো ম্লান হইয়া আসিল। রজনীর অবসানে প্রত্যুষে নানাবিধ মাঙ্গলিক বাদ্যধ্বনি শোনা গেল। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়াই রাবণের চিত্তে সীতাদর্শনাভিলাষ উদিত হইল। পত্র পুষ্প ও লতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া হনুমান্ দেখিলেন, বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত পানোন্মত্ত রাবণ বহুরমণী-পরিবেষ্টিত হইয়া অশোক-কাননে প্রবেশ করিল। দুরাত্মা রাবণের আগমনে ভীতা হইলেও সীতা পূর্ববৎ ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া রামের চিন্তাই করিতে লাগিলেন। রামগতচিত্তা সীতার উপেক্ষা-দর্শনে ক্রুদ্ধ হইলেও রাবণ প্রথমে সীতার সৌন্দর্যের অশেষ প্রশংসা করিয়া তাহাকে ভজনা করিবার জন্য যথেষ্ট অনুনয় করিল। তারপর নানাভাবে নিজের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া প্রলোভন দেখাইয়া অবশেষে ভয় প্রদর্শন করিল

রাবণের অনুনয় ও প্ররোচনার উত্তরে দৃঢ়তার সহিত বৈদেহী বলিলেন, 'মহৎ বংশে আমার জন্ম ও বিবাহ। সজ্জন সহধর্মিণীর বিনিন্দিত কোন প্রকার কার্যই আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' অতঃপর রাবণের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া সীতা তেজের সহিত বলিলেন, 'যদি নিজের নিধন কামনা না কর, এবং লঙ্কাপুরী রক্ষার আগ্রহ থাকে, তবে রামচন্দ্রের সহিত মৈত্রী স্থাপনা কর, নতুবা তাঁহার হস্তে তোমার পরিত্রাণ নাই।'

সীতার দর্পিত বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণ বলিল, 'তুমি স্ত্রীলোক, অতএব অবধ্য; কেবল সেজন্যই বাঁচিয়া গেলে।'

সীতাও সমুচিত উত্তর দিলেন, 'রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতেই তুমি আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছ। তাঁহার সম্মুখে তোমার ঐরূপ সাহস হইত না। পরন্তু কুকুরের ন্যায় অবস্থান করিতে।'

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া রাবণ বলিল, 'লোকে সাধারণতঃ অনুনয়-বিনয়ের দ্বারা রমণীগণের অনুগ্রহভাজন হয়। কিন্তু আমি যতই তোমাকে প্রিয়বাক্য বলিতেছি, ততই তোমার নিকট উপেক্ষিত হইতেছি। তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে বলিয়াই তোমাকে বলপূর্বক অধিকার বা হত্যা করিতেছি না। আরও দুইমাস সময় দিলাম। দুইমাস পরে আমাকে ভজনা না করিলে তোমার প্রাণবধ সুনিশ্চিত।'

সীতা বলিলেন, 'তোমার কল্যাণকামী নিশ্চয় কেহ নাই, থাকিলে এই নিন্দিত কর্ম হইতে তোমাকে বিরত করিত।'

নিকটস্থ রাক্ষসীবৃন্দকে রাবণ আদেশ দিল, জনকনন্দিনী সীতা যাহাতে সত্বর তাহার বশবর্তিনী হয়, সেজন্য কোনপ্রকার চেষ্টার ত্রুটি যেন না হয়। অতঃপর মন্দোদরী আসিয়া রাবণকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

রাবণ প্রস্থান করিলে বিকটকায় রাক্ষসীবৃন্দ পুনরায় সীতার চারিদিকে বসিয়া নানাভাবে তাড়না করিতে লাগিল। ভীতা জানকী তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া দূরে শিংশপা বৃক্ষের পাদমূলে উপবেশন করিলেন। অতঃপর অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে তিনি বলিলেন,

'জানিয়া রাখো, আমি বামপদের দ্বারাও কখনও রাবণকে স্পর্শ করিব না, ভজনা করা দূরে থাকুক। প্রলাপ বকিয়া লাভ কি? আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটো, প্রজ্বলিত অনলে নিক্ষেপ কর, অথবা তোমাদের যাহা খুশি কর। আমি এখানে আছি জানিতে পারিলে রামচন্দ্র এই নগরী ধ্বংস করিবেন। নিশ্চয় জানিও, লঙ্কানগরী অচিরেই শ্মশানভূমিতে পরিণত হইবে এবং দুষ্টাত্মা রাবণের নিধনও অবশ্যম্ভাবী।'

ক্রূর রাক্ষসীদলের ক্রোধ বাড়িয়া গেল। বিকট অঙ্গভঙ্গী ও কর্কশবাক্যে ত্রাস সঞ্চার করিয়া তাহারা বলিল, যুক্তি ও অনুনয় প্রদর্শনে যখন কোন কাজ হইল না, তখন হত্যা করিয়া সীতার মাংস ভক্ষণ করাই সঙ্গত। অতঃপর তাহাদের মধ্যে আলোচনা চলিল—সীতার কোমল মাংস কিরূপে উপাদেয় ভোজ্যে পরিণত হইতে পারে। কেহ কেহ রাবণের নিকট সীতার এইসকল দুর্বিনীত বাক্য ঘোষণা করিবার জন্য ছুটিল। একটু দূরে শয়ন করিয়া বৃদ্ধা রাক্ষসী ত্রিজটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কোলাহল ও চীৎকারে তাহার নিদ্রা ভাঙিয়া গেল। সে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে—লঙ্কানগরী বিধ্বস্ত, রাবণের শিরশ্ছেদ হইয়াছে এবং রামচন্দ্র সীতার সহিত মিলিত হইয়া দিব্য রথে আরোহণ করিয়াছেন। ত্রিজটার ভর্ৎসনা বাক্যে ভীতা রাক্ষসীদল তখন সীতাকে ছাড়িয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিবার জন্য তাহাকে ঘিরিয়া বসিল।

হনুমান্ দেখিলেন—সীতাকে পরিচয় ও আশ্বাস প্রদানের ইহাই উপযুক্ত সময়। সহসা তাঁহার দর্শনে সীতার চিত্তে ভয় বা সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। অনেক চিন্তার পর বুদ্ধিমান্ হনুমান্ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট থাকিয়াই মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে রামচন্দ্রের গুণ বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিলেন, 'হে দেবি, বিদেহরাজনন্দিনি! আপনার স্বামী রামচন্দ্র ও দেবর লক্ষ্মণ আপনাকে কুশল জ্ঞাপন করিয়াছেন।'

কতদিন সীতা রামচন্দ্রের নাম শ্রবণ করেন নাই। সত্যই কি কেহ রামচন্দ্রের সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে? অথবা তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, অথবা ইহা দুরাত্মা রাবণেরই কোন ছলনা? নিরন্তর ভয় ও উদ্বেগে অবসন্না সীতা সন্ত্রস্ত হইয়া ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া শাখান্তরালে অবস্থিত বানরকে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর হনুমান্ সীতাকে প্রণাম নিবেদন করিয়া সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, 'আপনি কোথায় আছেন—শ্রীরামচন্দ্র তাহা অবগত নহেন বলিয়াই আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিতেছেন না। আপনার অন্বেষণেই আমার লঙ্কায় আগমন।' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ধীরে ধীরে সীতাও তাঁহার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন, 'দুষ্ট রাবণ আর দুই মাস মাত্র সময় দিয়াছে। এই দুই মাসের মধ্যে রঘুনন্দন কি আমাকে উদ্ধার করিবেন না?'

মহাবীরের বীরহৃদয় কাতর হইল। রামচন্দ্র নিশ্চয়ই তাঁহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু দেবী যদি তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করেন, তবে তিনি তাঁহাকে সেই মুহূর্তেই বহন করিয়া সাগর লঙ্ঘনপূর্বক রামচন্দ্রের সমীপে লইয়া যাইবেন। সীতার আশীর্বাদে তাঁহার এ শক্তি আছে। কিন্তু সীতা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাবণ বলপূর্বক তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। স্বেচ্ছায় স্বামী ব্যতীত অপর কোন পুরুষের অঙ্গস্পর্শ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। ইহা ব্যতীত তিনি বীরপত্নী, এরূপ ভাবে গোপনে শত্রুপুরী ত্যাগ করিয়া গেলে মর্যাদার লাঘব হইবে। রামচন্দ্র সসৈন্যে আসিয়া রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন—ইহাই কাম্য।

মহাবীর তখন রামচন্দ্রের প্রত্যয়-নিমিত্ত কোন নিদর্শন প্রার্থনা করিলেন। সীতা তাঁহার বেণী হইতে একটি চূড়ামণি লইয়া মহাবীরকে অর্পণ করিলেন। বনবাস-কালের দু-একটি ঘটনারও উল্লেখ করিলেন, যাহা কেবল রামচন্দ্র ও তিনি অবগত আছেন। অতঃপর অভিবাদন ও প্রদক্ষিণান্তে হনুমান্ সীতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মহাবীরের দৌত্য

সীতা-দর্শনে মহাবীর আনন্দিত হইয়াছিলেন, —জনকনন্দিনীর সংবাদ তিনি রামচন্দ্রকে দিতে পারিবেন। তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। তবে শত্রুর নিকট নিজের পরাক্রম কিছুমাত্র জাহির না করিয়া ফিরিয়া যাইতে মন চাহিল না। শত্রুকে কিঞ্চিৎ দমন করাও উচিত। শত্রুদমনের চারটি উপায় আছে—সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। ইহার মধ্যে শেষোক্ত উপায় অবলম্বনপূর্বক নিজের বিক্রম-প্রকাশ ও শত্রুকে শিক্ষা দেওয়া একান্তই আবশ্যক। ইহা ব্যতীত সীতা-উদ্ধারের নিমিত্ত রাবণের সহিত রামচন্দ্রের যুদ্ধ অনিবার্য, সুতরাং শত্রুপক্ষের বলবীর্য জানিলে রামের উপকার হইবে। শত্রুর সহিত সংঘর্ষ ব্যতীত তাহা জানিবারই বা উপায় কি ?

অতএব বহু চিন্তার পর অশোক-কানন ধ্বংস করাই স্থির হইল তাহা হইলে রাবণ সৈন্য প্রেরণ করিবে এবং অনায়াসে যুদ্ধ সংঘটিত হইতে পারে। মহা উল্লাসে মহাবীর তখন বৃক্ষের শাখাসমূহ ভগ্ন ও লতাগৃহসকল উৎপাটিত করিতে লাগিলেন। উদ্যানের শোভা নষ্ট হইল। রাক্ষসীগণ দ্রুত রাবণ-সমীপে গিয়া সংবাদ দিল—একটা বানর বনের মধ্যে বড় উৎপাত করিতেছে, দাপাদাপি করিয়া গাছের ডালপালা ভাঙিয়া বনের সৌন্দর্য নষ্ট করিয়াছে। রাবণ তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করিল বানরকে ধরিয়া আনিবার জন্য। হনুমান্ ততক্ষণে উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ সহস্রস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদের উপর আরোহণ করিয়া বসিয়া আছেন। অবিলম্বে রাবণের সৈন্যদলের সহিত হনুমানের একটি খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাক্ষস-দিগের অস্ত্র—শর, হনুমানের অস্ত্র—বৃক্ষশাখা ও শিলাখণ্ড। মহাবীরের বিক্রম ও সৈন্যদলের নিধন-বার্তা রাবণের নিকট পৌছিলে রাবণ উপলব্ধি করিল, বানরকে আর উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না। সুতরাং বানরকে ধরিবার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা পুত্র ইন্দ্রজিৎ প্রেরিত হইল। ইন্দ্রজিৎ দুর্ধর্ষ বীর, মহাবীরও অমিত পরাক্রমশালী। অবশেষে বহু চেষ্টার পর ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা বানরকে বন্ধন করিতে সমর্থ হইল। রাক্ষসরাজ হয়তো কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবেন—এই ভাবিয়া হনুমান্ ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিলেন। অতঃপর রাক্ষসগণ শণ পাট ও বৃক্ষের বল্কল দ্বারা হনুমান্‌কে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া রাবণের সম্মুখে উপস্থিত করিল।

সিংহাসনে উপবিষ্ট রাবণের ঐশ্বর্য ও বল-বীর্য দর্শনে হনুমানের দুঃখ হইল। তাঁহার মনে হইল, বস্তুতঃ রাক্ষসরাজের সমস্ত সুলক্ষণই আছে। অধর্মপরায়ণ না হইলে এই ব্যক্তি প্রকৃতই স্বর্গলোকেরও অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত। রাবণ নিকটস্থ প্রহস্ত-নামক রাক্ষসকে আদেশ দিল: জিজ্ঞাসা কর—কে এই দুরাত্মা, উহার প্রয়োজন কি, অশোক-বন ভগ্ন করিয়াছে কেন, রাক্ষস-দিগকেই বা বধ করিবার কারণ কি ? হনুমান্ উত্তরে বলিলেন, রাক্ষসরাজের দর্শনলাভ তাঁহার উদ্দেশ্য এবং সেজন্যই অশোক-বন নষ্ট করিয়াছেন, যেহেতু অন্য উপায়ে উহা সম্ভব হইত না, আর

যুদ্ধে নিজের শরীর-রক্ষার নিমিত্তই রাক্ষস-সংহারে বাধ্য হইয়াছেন। পরিশেষে পরিচয় দিয়া বলিলেন, তিনি রামচন্দ্রের দূতরূপে সেখানে উপস্থিত। তারপর হনুমান্ সংক্ষেপে রামচন্দ্র কর্তৃক বালী-বধ, সুগ্রীবের রাজ্যলাভ এবং সুগ্রীব কর্তৃক সীতান্বেষণে চতুর্দিকে দূত-প্রেরণ প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া রাবণকে হিতোপদেশ দিয়া বলিলেন, রাবণ যেন অবিলম্বে সীতাকে প্রত্যর্পণ করে। বলা বাহুল্য, হনুমানের এই হিতোপদেশে রাবণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বানরকে বধ করিবার আদেশ দিল। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মাত্মা বিভীষণ তখন অগ্রসর হইয়া বলিল, বানরটি দূত-মাত্র এবং দূত সর্বদাই অবধ্য। দূতের জন্য নানাবিধ দণ্ডের বিধান থাকিলেও প্রাণদণ্ডের বিধান নাই; সুতরাং উহাকে বধ করিলে রাবণের অত্যন্ত নিন্দা হইবে; বরং যাহারা এই বানরকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহাদেরই বিনাশ করা উচিত। এই বানরকে ছাড়িয়া দিলে সে গিয়া রাজপুত্রদ্বয়কে সংবাদ দিয়া এখানে লইয়া আসিতে পারিবে। তখন রাবণ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রকৃত শত্রুবধে সমর্থ হইতে পারেন।

বিভীষণের যুক্তি সঙ্গত মনে হইল। রাবণ ভাবিল, দূতের প্রাণনাশ করা প্রকৃতই নিন্দার কার্য, কিন্তু অবশ্যই উহার প্রতি অন্য কোন দণ্ড প্রয়োগ করিতে হইবে।—তবে উহার অলঙ্কার-স্বরূপ লাঙ্গূলে অগ্নি সংযোগ করিয়া ছাড়িয়া দাও। উহার বন্ধু-বান্ধব সহ সুহৃদ্‌গণ, বানররাজ সুগ্রীব এবং জ্ঞাতিগণ উহার অঙ্গবিকৃতি অবলোকন করুক—

কপীনাং কিল লাঙ্গূলমিষ্টং ভূষণসংজ্ঞিতম্।
তদস্য দীপ্যতামাশু তেন দগ্ধেন গচ্ছতু॥
পশ্যন্তু জ্ঞাতয়শ্চৈনমঙ্গবৈরূপ্যকর্ষিতম্।
সমিত্রবান্ধবাঃ সর্বে সুহৃদঃ সকপীশ্বরাঃ॥

হনুমানের কি সত্যই লাঙ্গূল ছিল? পূর্বেই বলা হইয়াছে—রাক্ষসের ন্যায় বানরও আর্যেতর জাতি। অনার্যদিগের বহু প্রকার উৎকট চিহ্ন-ধারণ প্রথা ছিল। উহা একজাতি হইতে অপর জাতির পার্থক্য সূচিত করিত। বানরগণ লাঙ্গূলের ন্যায় কোন চিহ্ন ধারণ করিত—ইহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। পরবর্তী শ্লোকেও উহা অনুমিত হয়।

রাবণের আদেশে রাক্ষসগণ কার্পাসবস্ত্র দ্বারা হনুমানের লাঙ্গূল বেষ্টিত করিল। তারপর কার্পাসবস্ত্র তৈলসিক্ত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিল এবং বাদ্য-সহযোগে ঘোষণা করিতে করিতে বানরকে পুরীর সিংহদ্বারের নিকট লইয়া চলিল। হনুমান্ ভীত হন নাই। তিনি জানিতেন, বন্ধন ছেদন করিয়া লম্ফ প্রদান-পূর্বক পলায়ন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইবে না। পূর্বেই তিনি উপায় স্থির করিয়াছিলেন।

সংবেষ্ট্যমানে লাঙ্গূলে ব্যবর্ধত মহাকপিঃ।
শুষ্কমিন্ধনমাসাদ্য বনেষ্বিব হুতাশনঃ॥

—বনমধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ পাইলে অগ্নি যেমন বর্ধিত হয়, লাঙ্গূল বেষ্টিত করিলে হনুমান্ সেইরূপ বর্ধিত হইতে লাগিলেন। হনুমান্‌কে পূর্বেই রাক্ষসগণ শণ রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করিয়াছিল। এখন লাঙ্গূল বেষ্টন করা হইলে তিনি শরীর বর্ধিত করিলেন কেন?

কামং বন্ধৈশ্চ মে ভূয়ো লাঙ্গূলাদীপনেন চ।
পীড়াং কুর্বন্তু রক্ষাংসি ন চ মে মনসি ক্লমঃ॥

হনুমান্ ভাবিলেন—রাক্ষসগণ তাঁহাকে পুনরায় বন্ধন এবং লাঙ্গূল প্রজ্বালন দ্বারা পীড়িত করিলেও তাঁহার কোন ক্লান্তি নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, কার্পাসবস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা পুনরায় তাঁহার সর্বাঙ্গ বেষ্টন করা হইয়াছিল। **অতঃপর মহাবীর গাত্রস্থিত বন্ধন-রজ্জু স্খলিত করিবার কৌশল অবলম্বন করিলেন:**

স ভূত্বা শৈলসঙ্কাশঃ ক্ষণেন পুনরাত্মবান্।
হ্রস্বতাং পরমাং গত্বা বন্ধনানি ব্যশাতয়ৎ ॥

—বুদ্ধিমান্ হনুমান্ প্রথমে পর্বত-সদৃশ হইয়া অর্থাৎ শরীর দৃঢ় এবং বর্ধিত করিয়া পরমুহূর্তে শরীর সঙ্কোচন করিলেন এবং বন্ধনও স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। গাত্রস্থিত বন্ধন মুক্ত করিবার উপরি-উক্ত কৌশল ব্যায়ামবীরগণ অবগত আছেন।

বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের পর হনুমান্ তোরণের উপর আরোহণ করিয়া একটি লৌহ-লগুড় দেখিতে পাইলেন। বাদ্যের শব্দে বহু রাক্ষস সমবেত হইয়াছিল। লগুড় লইয়া মহাবীর তাহাদের তাড়না করিলেন। লগুড়াঘাতে অনেকেরই প্রাণ গেল। অবশিষ্ট সকলে ভয়ে পলায়ন করিল। হনুমান্ তখন উৎসাহের সহিত প্রজ্বালিত বস্ত্র লইয়া রাজপুরীর বহু কক্ষের জানালা-দরজায় অগ্নি সংযোগ করিলেন! বাতাস পাইয়া অগ্নিও শিখা বিস্তার করিয়া সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। অতঃপর সমুদ্রে অবগাহন করিয়া তিনি শরীর শীতল করিলেন।

বেশ কিছু রাক্ষস সংহার, অশোক-কানন ধ্বংস এবং গৃহে গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া মহাবীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলেন। একাই তিনি অনেকটা কার্য সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দূরে অগ্নির লেলিহান্ শিখা দেখিয়া সহসা হনুমানের খেয়াল হইল, কাজটা ভাল হয় নাই। অগ্নি যদি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া অশোক-কানন পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে, তবে তো জনকনন্দিনী সীতারও ক্ষতি হইতে পারে! অবিমৃষ্যকারিতার জন্য হনুমান্ তখন নিজেকে সহস্রবার ধিক্কার দিলেন।

সীতার নিকট পূর্বেই সংবাদ আসিয়াছিল—যে বানর অশোকবনের শোভা নষ্ট করিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে। তাহার শরীরে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে ইত্যাদি। সুতরাং হনুমানের প্রাণসংশয় সম্ভাবনায় সীতা কাতরভাবে দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিভীষণ-পত্নী সরমা আসিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, বানরের প্রাণনাশ হয় নাই, বরং অগ্নিদ্বারা লঙ্কার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অগ্নি নির্বাপিত করিতে রাক্ষসদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। একটা বানর একাকী যখন এতদূর ক্ষতিসাধনে সমর্থ হইল, তখন সীতার অভীষ্টলাভ নিশ্চিত।

হনুমান্ অবশ্য পুনরায় সীতাকে দর্শন করিতে আসিলেন এবং তাঁহাকে অক্ষত দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সমুদ্রের অপরপারে জাম্ববান্ প্রভৃতি বানরগণের সহিত অঙ্গদ উদ্বিগ্নচিত্তে মহাবীরের প্রতীক্ষায় ছিলেন। দূর হইতে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া বানরগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইল। অগ্রসর হইয়া রাশি রাশি ফল, মধু প্রভৃতি দিয়া তাহারা হনুমানের অর্চনা করিল। হনুমান্ সংক্ষেপে 'দেবীকে দেখিয়াছি'—এইমাত্র বলিলেন। অতঃপর সকলে মহেন্দ্র-পর্বতের রমণীয় অরণ্য-প্রদেশে সমবেত হইলে হনুমান্ তাঁহার সমুদ্র-লঙ্ঘন, সীতা-দর্শন, রাবণের সহিত সাক্ষাৎ ও সমুচিত শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি বিস্তারিত নিবেদন করিলেন।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অঙ্গদ বলিলেন, জাম্ববান্ প্রভৃতি কয়েকজন বলশালী বানরগণকে লইয়া তিনি লঙ্কায় গমন করিবেন। রাবণকে নিহত এবং সীতাকে উদ্ধার করিয়া রামচন্দ্রের নিকট লইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইবে না। অন্যান্য বানরগণের কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, তাহারা এখানেই অপেক্ষা করিবে।

কিন্তু জাম্ববান্ অঙ্গদের এ প্রস্তাব সমর্থন

করিলেন না। রামচন্দ্র ও সুগ্রীব তাঁহাদের সীতার সংবাদ আনিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। সীতাকে তাঁহারা উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলে রামচন্দ্রের সীতা-উদ্ধার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না, তাঁহার বংশ-মর্যাদারও হানি হয়। সুতরাং তাঁহাদের উপস্থিত কার্য— রামচন্দ্রকে সীতার সংবাদ প্রদান করা অঙ্গদ তখন সদলবলে যাত্রা করিলেন। হনুমান্ কার্যোদ্ধার করিয়াছেন। অতএব অঙ্গদের দলের বানরগণের চিত্তে বেশ উল্লাস হইয়াছিল। পথিমধ্যে তাহারা সুরক্ষিত মধুবন ধ্বংসপূর্বক মধুপান করিয়া তৃপ্ত হইল। তারপর মহোল্লাসে নানারূপ শব্দ ও চীৎকার করিয়া বিজয়ী সেনার মতো হনুমানের সহিত তাহারা রামচন্দ্রের সমীপে উপস্থিত হইল। হনুমান্ রামচন্দ্রকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার হস্তে নিদর্শন-স্বরূপ সীতার চূড়ামণি প্রদান করিলেন এবং ধীরে ধীরে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। চিত্রকূট পর্বতে বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র একদিন মনঃশিলা দিয়া সীতার ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন, আর একদিন সীতার উৎপীড়নকারী কাকের উদ্দেশ্যে তিনি ঐষীক অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সীতা-কর্তৃক বিবৃত অপরের অজানিত ঘটনাদুটিও হনুমান্ নিদর্শন-স্বরূপ রামের নিকট বর্ণনা করিলেন। সেই রাক্ষস-পুরীতে অবরুদ্ধা সীতা কিভাবে দিন যাপন করিতেছেন, তাহা বর্ণনা করিলেন।

হনুমান্ অসাধ্য সাধন করিয়া বিজয়ী বীরের ন্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। জগতের সম্মুখে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। প্রীতিপূর্ণ নেত্রে তাঁহাকে অভিষিক্ত এবং গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—আপাততঃ আমার সর্ব সম্পদ্ এই আলিঙ্গনই তোমার কার্যের পুরস্কার-স্বরূপ গ্রহণ কর।

শরণাগত

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তোমার চরণে শরণ নিয়েছি,
আর কি ভয় ?
ভক্তজনের চিরসখা তুমি
হে প্রেমময় !
চরম তৃপ্তি কেবল ভূমায় !
অসীমের তৃষা হিয়ায় হিয়ায় !
তুমি সে অসীম ; সুখ তো কখনো
অল্পে নয় !

দুদিনের খেলাঘর নিয়ে ছিনু
তোমারে ভুলে !
মরেছি পিয়াসে তাই তো অমৃত-
সাগরকূলে !
পরমানন্দঘন হে মাধব,
দেহো শিরে তব পদ-পল্লব ;
শরণাগতেরে রাখো প্রভু, আমি
নিরাশ্রয় !

শিবানন্দ-স্মৃতি

[জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীর ডায়েরী হইতে]

চিরতুষারমণ্ডিত হিমাদ্রি-শিখর হইতে উৎসারিত পূতসলিলা ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ বিগলিত করুণাধারার ন্যায় তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া কখন মৃদু কলরবে, কখন ভৈরবগর্জনে, আবার কখনও গৈরিকরঞ্জিতগাত্রা হইয়া অনন্ত নীল সিন্ধুপানে আকুল আগ্রহে ছুটিয়াছে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই সুরধুনীর উভয় তটে কত তীর্থ, কত নগরী, কত সংস্কৃতিসৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার কালের করাল তাণ্ডব নর্তনে এইসকল পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত প্রাচীন কীর্তিসমূহ চিরতরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। ঐতিহ্যগৌরব ভারতের বৈচিত্র্যবহুল ইতিহাস আজও উত্থান-পতনের, সৃজন ও প্রলয়ের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিতেছে। কৌতূহলী মানবচিত্তের জিজ্ঞাসার অন্ত নাই—কতকাল ধরিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বহুমুখী প্রতিভা এই ধ্বংসস্তূপের অতলগর্ভ হইতে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উৎসের সন্ধানকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে! ইতিহাস এখনও সাক্ষ্য দেয়—পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তটে তটে স্বয়ং ভগবান্ নরদেহ ধারণ করিয়া লোক-কল্যাণ-কামনায় যুগে যুগে অপূর্ব লীলা করিয়া পথভ্রান্ত মোহমুগ্ধ জীবকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়াছেন—ভাগ্যবান্ কেহ কেহ তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা লাভ করিয়া স্ব স্ব জীবন ধন্য ও সার্থক করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। বর্তমান যুগে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যাম-শ্যামা-শিবের সমন্বয়কেন্দ্র, মাধুর্যের রঙ্গভূমি পবিত্র সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর-তপোবনে যে কঠোর তপস্যা ও অলৌকিক লীলা করিয়া গিয়াছেন, তাহার উজ্জ্বল প্রভায় আজও দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত। তাঁহারই নিজ হস্তে গড়া স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ নবীন সন্ন্যাসিবৃন্দ পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহাকে তাঁহাদের অধ্যাত্মচেতনায় সর্বদা উজ্জীবিত রাখিয়া সর্ব-সাধারণের সেবা ও সাধনার মূল কেন্দ্ররূপে ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং সকলকে তাহাদের আকুল হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত পবিত্র আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার অপূর্ব সুযোগ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। দেশ বিদেশ হইতে অবিশ্রান্ত ধারায় তীর্থযাত্রী দলে দলে জাহ্নবীর পূতধারাবিধৌত এই নূতন তীর্থে মিলিত হইয়া ইহার দর্শন-স্পর্শনে আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছেন। যুগাবতারের লীলাসহচর-গণের পাদপূত, সর্বধর্মের সমন্বয়ক্ষেত্র এই বেলুড় মঠ জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বকালের জন্য সর্বজনের মিলনকেন্দ্র ও আশ্রয়স্থল হইয়া রহিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আমার নিষ্কিঞ্চন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম প্রভাত—ব্রহ্মজ্ঞপুরুষগণ-অধ্যুষিত বিশ্ববিশ্রুত এই বেলুড় মঠে। আজ এই জীবনসন্ধ্যায় যে পবিত্র স্মৃতি গোধূলির রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া আমার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছে, বলা বাহুল্য আমার দুর্বল লেখনীমুখে তাহারই বাণীরূপ দেওয়ার ক্ষীণ প্রচেষ্টামাত্র। কেমন করিয়া এই জাহ্নবী-তটলগ্ন বেলুড় তীর্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ—পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের পূতসঙ্গ লাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল এবং তাঁহার বিশাল হৃদয়ের অযাচিত করুণা অমোঘ আশীর্বাদরূপে

আমার উপর বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থানে শতধারে বর্ষিত হইয়াছিল, তাহাই গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায়, আজ এই পবিত্র স্মৃতিকথার মাধ্যমে তাঁহারই রাতুল চরণে অর্পণ করিয়া ধন্য হইতে প্রয়াসী হইয়াছি।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ কেন 'মহাপুরুষ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তাহা স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমুখোচ্চারিত বাণী হইতে আমরা পরবর্তীকালে জানিতে পারিয়াছি। বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপূত বলরাম-মন্দিরে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামীজী তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে সঙ্গে করিয়া ঐ স্থানে গমন করেন। ভজন-কীর্তন ও আহারাদির পর শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসঙ্গে তাঁহারা সকলে পুনঃ মাতিয়া উঠিলেন। ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজী বলিলেন, 'এক ঠাকুরই ছিলেন কামজিৎ; নইলে বিবাহিত জীবনে কামজিৎ পুরুষ জগতে বিরল।' এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতদার স্বামী শিবানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'তা কেন? ঠাকুর আমার ভেতর এমন শক্তি সঞ্চার করেছিলেন যে, তার বলে আমিও কাম জয় করতে পেরেছি। তাঁর ইচ্ছায় সবই সম্ভব।' এই কথা শুনিবামাত্র স্বামীজী আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'তাহলে তো আপনি মহাপুরুষ!' সমবেত গুরুভ্রাতৃবৃন্দ ঐ ঘটনা শ্রবণে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। সেইদিন হইতেই স্বামীজী নিজেও স্বামী শিবানন্দজীকে 'মহাপুরুষ' বলিয়া ডাকিতেন এবং মঠবাসীরাও তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতে আরম্ভ করেন। বাস্তবিক শ্রীগুরু-কৃপায় তিনি 'মহাপুরুষ' নামের মহিমাদ্যুতি অম্লান কুসুমের মতো চিরতরে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে অগণিত নরনারীর জটিল জীবন-সমস্যার সমাধানপূর্বক তাহাদের জীবন সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। ধন্য আমরা যে, তাঁহার 'সূর্যকোটিপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলং' প্রদীপ্ত দিব্য জীবন-জ্যোতির সহায়তায় এই সর্পিল বন্ধুর ধূলিমলিন পৃথিবীর পথে চলিবার সামর্থ্য কতকটা অর্জন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। এই সকল যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট উচ্চকোটি তপস্যাপরায়ণ যোগী মহাপুরুষগণের সন্ন্যাস-জীবনকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাদের সম্যক্ পরিচয়প্রদানকল্পে শাস্ত্রকারগণ লিখিয়াছেন:

ধৈর্যং যস্য পিতা ক্ষমা চ জননী
শান্তিশ্চিরং গেহিনী
সত্যং সূনুরেব দয়া চ ভগিনী
ভ্রাতা মনঃসংযমঃ।
শয্যা ভূমিতলং দিশোঽপি বসনং
জ্ঞানামৃতং ভোজনম্
এতে যস্য কুটুম্বিনো বদ সখে
কস্মাৎ ভয়ং যোগিনঃ॥

—ধৈর্য যাঁহার পিতা, ক্ষমা জননী, শান্তি গৃহিণী, সত্য পুত্র, দয়া ও সংযম—ভগিনী ও ভ্রাতা, ভূমিতলকে যিনি শয্যা এবং দিক্‌সমূহকে যিনি বসন করিয়াছেন, জ্ঞানরূপ অমৃত যাঁহার ভোজন—হে সখে! একমাত্র এইরূপ আত্মীয়-কুটুম্বসম্পন্ন যোগীর পক্ষেই এ সংসারে নির্ভয়ে বিচরণ করা সম্ভব, অপরের পক্ষে নহে। বলা বাহুল্য, তপস্বী ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের জীবনেও শাস্ত্রোক্ত এই গুণরাশি জীবকল্যাণে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী-প্রণয়নকল্পে ঠাকুর, স্বামীজী এবং মঠ-মিশন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে মহাপুরুষজীর ব্যক্তিগত স্মৃতি জানিবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে

এক শ্রদ্ধাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন—'আমি এখনও বুঝতে পারিনি যে, তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) মানুষ কি মহাপুরুষ, কি দেবতা, কি ভগবান্ স্বয়ং। আমি তাঁকে সম্পূর্ণ অহংশূন্য, শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যযুক্ত, পরম জ্ঞানবান্ এবং প্রেমের মূর্তবিকাশ ব'লে জানি। যত দিন যাচ্ছে ও ধর্মজগতের সঙ্গে আমি যতই অধিকতর পরিচিত হচ্ছি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের অনন্ত বিস্তৃতির সঙ্গে অনন্ত গভীরতা অনুভব করছি, ততই আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় হচ্ছে যে, তাঁকে ভগবানের সহিত তুলনা করলে—ভগবান্ বলতে সচরাচর লোকে যেমন বোঝে—তাঁর অসীম মহত্ব খর্ব করা হবে।...আমি জোর ক'রে বলতে পারি, বর্তমান যুগে তাঁর মতো মানবকল্যাণ-নিরত অত বড় মহাপুরুষ কেহ নাই। অপরের মধ্যে ধর্মসংক্রামণ করবার শক্তি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের এবং তিনি তাদের মন জ্ঞানের উচ্চভূমিতে তুলে দিতে পারতেন।...তাঁর কৃপায় আধারানুযায়ী আমাদেরও উচ্চ উচ্চ জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করবার সুযোগ হয়েছিল। আমার নিজেরই তাঁর স্পর্শে, তাঁর ইচ্ছায় তাঁর জীবৎকালেই তিনবার সমাধিলাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল। তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি প্রমাণ করতে আজও আমি বেঁচে আছি। এ মোহ নয়, কিংবা স্বপ্ন নয়।'

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মধ্যে মধ্যে পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠে যাতায়াত করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। সময় সময় বন্ধুবান্ধবসহ এই পবিত্র মঠে রাত্রিযাপনও করিতাম এবং উৎসবাদিতে যোগদান করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতাম। ১৯১৮ খৃঃ কোন এক সময়ে বেলুড় মঠেই প্রথম শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। ঐকালে বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীরাজা-মহারাজের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতাম। তজ্জন্য মহাপুরুষ মহারাজের পবিত্র সঙ্গলাভ করিবার জন্য ঘনঘন বেলুড় মঠে আসা-যাওয়া সম্ভব হইত না। তবে যখনই মঠে আসিতাম, তখনই মহাপুরুষ মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্নেহাশীর্বাদ লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি ও আনন্দ বোধ করিতাম।

আমি যখন ১৯১৯ খৃঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া সমাপ্ত করিয়া জনৈক বন্ধুসহ ভুবনেশ্বর মঠে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের চরণ-প্রান্তে উপনীত হই এবং অপরকে দিয়া আমার সন্ন্যাসী-সঙ্ঘে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি, তখন তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'ও হয়তো থাকবে না; ওকে এখন ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করবার প্রয়োজন নেই।'

ইহার পর ভুবনেশ্বর হইতে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে যাই, সেখান হইতে দেশে পিতৃমাতৃ-সকাশে গিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ করিতে হয়—সে-কথা 'ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি'-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। অতঃপর ১৯২৭ খৃঃ প্রথম ভাগে বিদ্যালয়ের চাকরিতে ইস্তফা দিয়া পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জিলার অন্তঃপাতী কলিকাতার সন্নিকট এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলাম। এই সময় হইতে সুযোগ সুবিধা পাইলেই কর্মস্থল হইতে মধ্যে মধ্যে বেলুড় মঠে আসিয়া পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া যাইতাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! তখন যখনই মঠে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতাম, তখনই আমাকে বলিতেন, 'কি, আর কতদিন গোলামি করবে? কবে চাকরি

ছাড়বে ?' যিনি একবার আমাকে পিতামাতার সেবার জন্য চাকরি গ্রহণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, আজ আবার তিনিই 'গোলামি ছাড়বে কবে ?'—বলিয়া প্রশ্ন করিতেছেন! মনে মনে স্থির করিলাম—এবার আমি স্বেচ্ছায় এই কর্ম ত্যাগ করিব না। যদি মহাপুরুষ মহারাজ স্বয়ং তাঁহার শক্তি-প্রভাবে আমার এই চাকরির মোহ কাটাইয়া দিতে পারেন, তবেই চাকরি ছাড়িয়া দিব—নচেৎ নহে। একবার আমি ইঁহাদের সাবধান বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া নিজেকে সর্বজ্ঞ পণ্ডিত মনে করিয়া দারুণ শিক্ষা পাইয়াছি; আবার যাহাতে সেরূপ ভুলভ্রান্তি না হয়, তজ্জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কোন সিদ্ধান্ত করিব না—ইহা স্থির করিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

ক্রমে গ্রীষ্মের বন্ধ সমাগত লইল। সংবাদ আসিল—কোন জরুরী কার্যোপলক্ষে আমাকে সত্বরই পিতামাতার সন্নিধানে পৌঁছিতে হইবে। তদনুযায়ী স্থির করিলাম—স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্বে বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে একবার দর্শন করিয়া যাইব এবং সম্ভব হইলে সেই রাত্রেই ঢাকা-মেলে পূর্ববঙ্গে রওনা হইব। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্কুল বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মহাপুরুষ মহারাজকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবার পর তিনি আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমাকে কয়েকদিন মঠবাস করিবার নির্দেশ দিলেন। উভয় সংকটে পড়িয়া আমাকে কোন জরুরী কার্যের জন্য আজই ঢাকা-মেলে রওনা হইতে হইবে—ইহা মহারাজকে নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আরে, রেখে দাও তোমার জরুরী কাজ! কাজের কি শেষ আছে? এতদিন পরে মঠে এলে, এখানে অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস ক'রে যাবে।' মহারাজের আদেশ শিরোধার্য করিয়া মঠেই রহিয়া গেলাম। তখনও বুঝিতে পারি নাই—তিনি কি উদ্দেশ্যে আমাকে ত্রিরাত্রি মঠবাসের নির্দেশ দিলেন।

সন্ধ্যারতি চলিতেছে। গুরুগম্ভীর আরাবে আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। শ্রুতিমধুর ঘণ্টাধ্বনি সমগ্র মঠভূমি মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে—আধ্যাত্মিকতার জমাটভাব সকলের হৃদয়-মন স্পর্শ করিয়া সাধু-ব্রহ্মচারী নির্বিশেষে সকলকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ নিজের ঘরে ভাবে গরগর মাতোয়ারা; তিনি ক্ষণে ক্ষণে 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি করিতেছেন। তিনি বাহ্য জগতের সকল চিন্তা হইতে মনকে তুলিয়া লইয়া দিব্য অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। আমি ও আমার জনৈক সন্ন্যাসী বন্ধু শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক আরম্ভ হইবার পূর্ব হইতেই পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শয়নকক্ষে হাজির রহিয়াছি। আরতি-সমাপনান্তে তিনি স্বীয় শয্যায় বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন এবং আমার সন্ন্যাসী বন্ধুবর মহাপুরুষ মহারাজের পদ-সংবাহনে আত্মনিয়োগ করিলেন। কিয়ৎকাল পরেই আমার অন্তরেও মহারাজের পদসেবা করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। আমার প্রাণের ইচ্ছা মহারাজকে নিবেদন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমিও পা-টা একটু টিপে দাও।' আমি অপ্রত্যাশিতভাবে এই অপূর্ব সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহার পদসেবায় লাগিয়া গেলাম। মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে স্নেহপূর্ণস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'আর কতদিন চাকরি করবে? রাজা-মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ প্রভৃতি সকলের প্রাণভরা আশীর্বাদ লাভ করেছ। ঠাকুর-স্বামীজীর কাজের জন্যই তো তোমরা এসেছ। ছাখ, আমিই একদিন

তোমাকে চাকরি করতে বলেছিলাম—আবার আমিই তোমাকে চাকরি ছাড়তে বলছি। আমাকে বিশ্বাস কর?' আমিও সুযোগ বুঝিয়া মহারাজকে বলিলাম, 'মহারাজ, একবার আপনাদের নির্দেশ অগ্রাহ্য ক'রে আমি আমার নিজের খেয়ালমত চলেছিলাম এবং তার শোচনীয় ফলও ভোগ করেছি। আমি নিজের ইচ্ছায় চাকরি ছাড়তে সাহসী হচ্ছি না। আপনি যদি কৃপা ক'রে এই চাকরির মোহপাশ ছিন্ন ক'রে আমাকে আপনাদের চরণপ্রান্তে টেনে আনতে পারেন, তবেই চাকরি ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হবে—নচেৎ নয়।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করিলাম—আমার অন্তর্নিহিত প্রসুপ্ত বৈরাগ্য-বহ্নি সহসা উদ্দীপিত হইয়া আমাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। আমার মনে হইতে লাগিল—আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইয়া এই সুদীর্ঘ কঠিন পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে; আর আমি যেন সংসারের পঙ্কিল পূতিগন্ধময় আবর্জনায় আবদ্ধ হইয়া অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি! মনে প্রচণ্ড ঝড় বহিতে লাগিল—আর ধিক্কারে আমার হৃদয়-মন ভরিয়া গেল। ঠিক এই মুহূর্তে মহাপুরুষ মহারাজ দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ছাখ, তুমি এইক্ষণে যা বলবে, ঠিক তাই হবে। তুমি বলো,—কবে এই গোলামি ছাড়বে?' আমি আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে অভিভূতের ন্যায় সহসা বলিয়া উঠিলাম, 'এই session (বৎসর) শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি ছেড়ে দেবো।' মহারাজও আমাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'ঠিক হবে, যা বলেছ ঠাকুরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।' এখন বুঝিতে পারিলাম, কেন তিনি আমাকে মঠে ত্রিরাত্রি-বাসের আদেশ করিয়াছিলেন। চাকরির মোহপাশ হইতে মুক্ত করিয়া আমার আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই যে তিনি এইভাবে আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

মঠে ত্রিরাত্রি-বাসের পর পূর্ববঙ্গে পিতৃ-সন্নিধানে চলিয়া গেলাম। গ্রীষ্মের বন্ধ সমাপ্ত হওয়ায় পুনরায় কর্মস্থলে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। যাত্রার প্রাক্কালে পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে সংসার ত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করিয়া পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে এই বৎসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি ছাড়িয়া দিব বলিয়া যে স্বীকৃতি দিয়াছিলাম, কেবল সেই কথাই মনের কোণে সর্বদা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা—চাকরির কি মোহ! 'ম্যয় তো কমলী ছোড়তা হুঁ, লেকিন কমলী তো মুঝ্‌কো নহি ছোড়তী।' বস্তুতঃ চাকরির সংস্কার আমার হৃদয়-ফলকে এত গভীর রেখাপাত করিয়াছিল যে, 'হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে একজন ইতিহাসের অধ্যাপক প্রয়োজন'—এই মর্মে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়াই দরখাস্ত করিয়া বসিলাম এবং কয়েকদিনের মধ্যেই সেই কলেজের অধ্যক্ষের নিকট হইতে Interview-এর একখানা চিঠিও পাইলাম। লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। নির্দিষ্ট দিনে কর্মস্থল হইতে Interview-এর জন্য কলিকাতায় আসিয়া মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমের মুক্তারামবাবু-স্ট্রীটস্থ শাখাকেন্দ্রে আসিয়া হাজির হইলাম। তখন আমারই অন্তরঙ্গ জনৈক বন্ধু সেই কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানাদি করিত; সে তখন ব্রহ্মচারী। আহারান্তে বিশ্রামের পর কি উদ্দেশ্যে কলিকাতায়

আসিয়াছি—সেই আসল কথাটি গোপন রাখিয়া তাহাকে বলিলাম, 'ছাখ্ ভাই, আমি যদি এখন কোন কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হই, তাহলে কেমন হয়?' বন্ধুবর ইহা শুনিয়া আমাকে তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে ও বিদ্রূপভরে বলিতে লাগিল, 'তোর ধর্মধ্বজিতা দেখলে অবাক্ হ'তে হয়। তুই তো প্রায়ই বলিস্—সাধু হবি, চাকরি আর ভাল লাগে না। এক হেডমাষ্টারী করতে করতে তোর কত বৎসর কেটে গেল। এই সামান্য চাকরির মোহই এতদিনে ছাড়তে পারলি না। এর পর যদি কলেজে প্রফেসারী জোটে, তাহলে তোর আর কোনদিনই সাধু হওয়া হবে না।' বলা বাহুল্য, এই তিরস্কার দৈববাণীর মতো আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সত্যই তো—যে আমি পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে সত্বরই চাকরি ছাড়িয়া দিব বলিয়া কিছুদিন পূর্বেই কথা দিয়া আসিয়াছি, সেই আমিই আবার নূতন চাকরি গ্রহণের জন্য ব্যস্ত হইয়াছি! কি ভ্রান্তি! কি মোহ! মনে তীব্র ধিক্কার জন্মিল। আমি বন্ধুটির নিকট আমার আগমনের আসল কথাটি গোপন রাখিয়া বাহিরে আসিয়া Interview cardখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম এবং বিকালে বন্ধুবরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কর্মস্থলে ফিরিয়া আসিলাম। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজই বন্ধুটির মুখ দিয়া আমাকে প্রকারান্তরে আঘাত প্রদান করিয়া আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিলেন। তাঁহার কৃপার কথা চিন্তা করিয়া হৃদয়-মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। আমিও উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

ক্রমে ৺দুর্গাপূজার বন্ধ ঘনাইয়া আসিল। আমিও স্থির করিলাম—এবার স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্তন না করিয়া ৺কাশীধামে গমন করিব এবং সেখানেই অদ্বৈতাশ্রমে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা দর্শন করিব। তখন খুব সম্ভবতঃ ১৯২৭ খৃঃ অক্টোবর মাস। বিশ্বজননী মহামায়ার পূজার তোড়জোড় চলিতেছে—প্রতিদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিকের পর সেবাশ্রমে আগমনী-গানের মহড়া চলিতেছে। একটা জমজমাট ভাব। এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে আসিয়া আমি খুবই স্বস্তিবোধ করিতে লাগিলাম। পূজনীয় জগদানন্দ মহারাজ তখন সাধুদের জন্য অদ্বৈতাশ্রমে উপনিষদের ক্লাস করিতেন—আমিও সেই ক্লাসে যোগদান করিলাম। ক্লাসের পর তিনি প্রতিদিন আমার নিকট ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলিতেন,—আর আমিও তাঁহার প্রাণস্পর্শী উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিতাম। কিছুদিনের মধ্যেই মন হইতে চাকরি করিবার নেশা একেবারে ছুটিয়া গেল এবং আমি সেখান হইতেই ইস্তফাপত্র (resignation letter) লিখিয়া স্কুলের সেক্রেটারি মহোদয়ের নিকট উহা রেজেস্টারী করিয়া পাঠাইয়া দিলাম। আমার গোলামি-পর্ব এইভাবে এখানেই শেষ হইল।

১৯২৭ খৃঃ ১৯শে অগস্ট তারিখে পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের অকস্মাৎ দেহত্যাগ হয়। তাঁহার তিরোধানজনিত বিয়োগব্যথায় অল্পদিনের মধ্যেই মহাপুরুষ মহারাজের স্বাস্থ্যও একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। অসুখের প্রাবল্য ও মানসিক অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জীবন সম্বন্ধেও সকলে শঙ্কিত হইলেন। সুচিকিৎসা ও সেবাযত্নাদির ফলে তিনি কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলে জনৈক প্রবীণ ভক্তের সনির্বন্ধ অনুরোধে বায়ু-পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে উক্ত ভক্তের মধুপুরস্থ 'শেঠভিলা' নামক বাড়িতে গমন করেন। সেখানকার নির্জন পরিবেশ,

স্বাস্থ্যকর নির্মল জলহাওয়া ও ভক্তগণের অকুণ্ঠ প্রাণঢালা সেবাযত্নাদির ফলে দুই মাসের মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিল। তিনি যখন মধুপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় কাশী অদ্বৈতাশ্রম হইতে জনৈক সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে মধুপুরের ঠিকানায় পত্রদ্বারা জানাইয়া দিলেন যে, আমি চাকরি ত্যাগ করিয়া সঙ্ঘে যোগদান করিবার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তিনি সেই পত্রখানা পাইয়া অতি আনন্দের সহিত তদুত্তরে জানাইলেন, '—— গোলামি ছেড়েছে জেনে খুব খুশী হয়েছি। তাকে আমার আন্তরিক স্নেহাশিস্ জানাবে। আমিও সত্বর অদ্বৈতাশ্রমে আসছি।'

মধুপুর হইতে সংবাদ আসিল—পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ ২২শে নভেম্বর বেলা ৮-৩০ মিনিটের সময় বারাণসীধামে আসিয়া পৌঁছিবেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র উভয় আশ্রমের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং মহারাজকে স্টেশন হইতে আনিবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। নির্দিষ্ট দিনে প্রাতে দুইখানা মোটর (motor car) ও ঘোড়ার গাড়িসহ অদ্বৈতাশ্রম ও সেবা-শ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সুন্দরপুষ্পস্তবক-হস্তে ট্রেন আসিবার পূর্বেই স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, আমারও তাঁহাদের সহগামী হইবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। যথাসময়ে ট্রেন আসিল এবং বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে মহারাজকে পুষ্পমালায় বিভূষিত করা হইল। অদ্বৈতাশ্রমে পৌঁছিয়া তিনি দুর্গাপূজার মণ্ডপ-ঘরে চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন এবং সকলে একে একে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। তাঁহার মধুপুর হইতে হঠাৎ এখানে চলিয়া আসিবার কারণ সম্বন্ধে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'কি আর ব'লব ; রবিবারও স্থির ছিল না যে, আমি ৺কাশীধামে আসব। বিশ্বনাথের কি কৃপা! তিনি হঠাৎ এখানে টেনে আনলেন ; এমনভাবে আনলেন যে, আর একদিনও দেরি করবার উপায় ছিল না—যেন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা! জয় বিশ্বনাথ—তাঁর ইচ্ছাতেই সব হয়।'

অদ্বৈতাশ্রমের দ্বিতল গৃহের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে ঘরটি তাঁহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তিনি সেখানে মনের আনন্দে বাস করিতে লাগিলেন। মধুপুর হইতে কাশীধামে পৌঁছিয়া আমাকে দেখিয়া তিনি খুবই প্রসন্ন হইলেন এবং আমাকে অভয় প্রদান করিয়া প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলেন, 'ভগবানের জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, ভগবান্ স্বয়ংই তাদের ভার গ্রহণ করেন। তোমার কোন চিন্তা নাই। ঠাকুর রয়েছেন—ভাবনা কি?' এইভাবে আশ্বাস দিয়া তিনি আমাকে তাঁহার চরণপ্রান্তে আশ্রয় প্রদান করিলেন এবং আমিও নিশ্চিন্ত মনে অদ্বৈতাশ্রমে বাস করিতে লাগিলাম। (ক্রমশঃ)

স্বামীজীর বাণীতে নূতনত্ব কি ছিল?

(পূর্বানুবৃত্তি)

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত

কর্মে পরিণত বেদান্তের আবিষ্কার

যে বেদান্তধর্ম স্বামীজী এত আগ্রহের সঙ্গে প্রচার করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন মনে জাগে, তাহা এই যে, আচার-আচরণে যে গুরু দ্বৈতসাধনার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, শিষ্যের পক্ষে তাঁহার নিকট অদ্বৈতবাদ-কেন্দ্রিক বৈদান্তিক প্রেরণা ও জীবব্রহ্মের চরম ঐক্যোপলব্ধির প্রেরণা লাভ করা কি সম্ভব? ইহার উত্তরে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, বিবেকানন্দ-গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে পরমসত্যের স্বরূপ-সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, তাহার সহিত তাঁহার দ্বৈতবাদী-সুলভ আচরণের ততটা সম্পর্ক ছিল না, কারণ সত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়া অপেক্ষা সত্যের আনন্দ-লাভই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তবু এই প্রশ্ন থাকিয়াই যায় যে, শিষ্যের অধ্যাত্ম-প্রেরণায় অদ্বৈতের প্রতি পক্ষপাত কেন দেখা দিল, তাঁহার সব বক্তৃতায় কেন তিনি অদ্বৈতের উপরই জোর দিতেন বেশী, কেন তিনি পৃথিবীর নানা জায়গায় অদ্বৈত বেদান্ত-প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন? আসলে মনে হয়—বিবেকানন্দের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বৈত বা অদ্বৈত কোন বেদান্তেরই প্রচারক ছিলেন না। শিষ্যের কাছে তিনি ছিলেন মানুষের—শুধু মানুষের নয়, সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত ভগবৎসত্তার নিশ্চিত প্রমাণস্বরূপ। মানুষের যুক্তিবাদী সত্তার প্রতি আস্থাশীল এই বলিষ্ঠ যুবকের পক্ষে শুধুমাত্র সামাজিক ঐতিহ্যরূপে কোন ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব ছিল না। যুক্তি যখন তাঁহাকে অজ্ঞেয়বাদ ও সংশয়বাদের পথে লইয়া যাইতেছিল, তখন একমাত্র প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছাড়া অন্য কিছু তাঁহাকে অবিচলিত বিশ্বাসে উপনীত করিতে পারিত না। প্রথমতঃ তাঁহার গুরুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি সম্বন্ধে নিশ্চয়তায়, দ্বিতীয়তঃ গুরু-কৃপাবলে নিজের অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ফলে অধ্যাত্ম-সত্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রাথমিক বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। প্রথমে নিজের এই বিশ্বাস পাকা করিয়া লইয়া স্বামীজীর পরবর্তী কাজ হইল—এই বিশ্বাসকে ব্যক্তি ও জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের ব্যাবহারিক জীবনের সর্বস্তরে প্রয়োগের দ্বারা অর্থপূর্ণ করিয়া তোলা। ইহার ফলেই তিনি যাহাকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যাবহারিক বেদান্ত বলিতেন, সেই 'ব্যাবহারিক বেদান্ত' ধর্মের আবিষ্কার ও প্রচার সম্ভব হয়।

ভারতবর্ষে বেদান্ত কিছু নূতন জিনিস নয়। স্বামীজীর কথানুসারে, বেদান্তই ভারতের ধর্ম। নানা অনুষ্ঠান, উপাসনা ও উৎসবে পরিপূর্ণ এবং অগণিত মন্দির, দেবতা ও বিগ্রহ-সমন্বিত ভারতের বিচিত্র ধর্মজগতের কথা মনে করিয়া প্রথমে স্বামীজীর এ-কথায় বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের ধর্মেতিহাসের যে-কোন সাধারণ পাঠকের কাছেও এ-কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, হিন্দুধর্মের সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে এই সব বহু বিচিত্র উপাদান একটি মূলগত ঐক্যে বিধৃত; কোন ব্যক্তি-হিসাবে নয়, চিরন্তন সত্য হিসাবে বেদান্ত এই বহু-বিচিত্রের মধ্যে এক সর্বময় নৈর্ব্যক্তিক, পরমতম উপলব্ধির ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করিয়াছে।

কিন্তু হিন্দুধর্মের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে যখন বেদান্ত চিরকালই ঐক্যসংস্থাপকরূপে স্বীকৃত, তখন স্বামীজী-প্রচারিত বেদান্তে নূতনত্ব কি ছিল? স্বামীজীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—সন্ন্যাসী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার সমাজ-সচেতনতা। তাঁহার মতে সন্ন্যাসের সঙ্গে সমাজ-সচেতনতার—মানুষ, মানবসমাজ এবং বিবর্তনের পথে যে সামাজিক শক্তিসমূহের বিকাশ হয়, সে-সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণার কোন বিরোধ ছিল না। এই সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী যথার্থ ধার্মিক ব্যক্তিকে সর্বশ্রেণীর মানবের জন্যই তাঁহার সমগ্র ধর্মচেতনা প্রয়োগ করিতে হয়। বেদান্তের যদি কোন মূল্য থাকে, তবে শুধুমাত্র শাস্ত্রের গণ্ডিতে উহাকে আবদ্ধ না রাখিয়া জীবনসংগ্রামের সকল পর্বে প্রয়োগ করিতে হইবে, বৈদগ্ধ্য কেবলমাত্র দার্শনিকদের জটিল ও বিপুল আলোচনায় আবদ্ধ না রাখিয়া একান্ত সাধারণ মানুষের আত্মকেন্দ্রিক জীবন ও চিন্তা-ধারার আমূল পরিবর্তনের শক্তিরূপে উহার প্রয়োগ প্রয়োজন। বেদান্ত-সম্বন্ধে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করিতে হইলে ভারতবর্ষে যে দুইভাবে বেদান্তকে গ্রহণ করা হইত, সে-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। বেদান্ত বলিতে প্রথমতঃ বেদের অন্তভাগ, বিশেষতঃ উপনিষদ্‌সমূহ-প্রচারিত সর্বব্যাপী সর্বাধার ও সর্বনিয়ামক অদ্বৈত পরমব্রহ্মের উপলব্ধিমূলক ধর্ম বুঝায়। দ্বিতীয় স্তরে দার্শনিক অর্থে বেদান্ত বলিতে বুঝায়—আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুগামী সম্প্রদায়কর্তৃক বেদান্তসূত্রসমূহের ভাষ্য। দার্শনিক বেদান্তবাদীরা নিজেদের একটি প্রমাণশাস্ত্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সবসময় তাঁহাদের যুক্তি ও আলোচনার সমর্থনে উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়াছেন এবং ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, তাঁহাদের আলোচনামূলক যুক্তিধারা ঔপনিষদিক বেদান্তেরই যথার্থ ব্যাখ্যামাত্র। অবশ্য দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারেরা সর্বদাই বলিয়াছেন যে, শঙ্কর ও শঙ্করানুবর্তীরা বেদান্তের মর্মার্থকে বিকৃত করিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে স্বামীজী অনুভব করিয়াছিলেন যে, বেদান্তদর্শন একদল উন্নাসিক বুদ্ধি-কৌশলীদের মধ্যেই গণ্ডিবদ্ধ, এবং সাধারণ মানুষের কুসংস্কার ও পুরোহিতদের ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হইয়া উপনিষদ্ তাহার সমস্ত গতিশীলতা হারাইয়া বসিয়াছে। একদিকে দেহগত, মননগত ও নীতিগত আলস্য ও জড়তা—অন্যদিকে নির্বোধ নিষ্ফল ন্যায়চর্চা এক ধরনের বুদ্ধিগত আফিঙের নেশায় পরিণত। এ-কথা ভাবিয়াই স্বামীজী সর্বাপেক্ষা দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন যে, সমগ্র জগৎ যখন নূতন নূতন আবিষ্কারের প্রেরণায় উন্মাদ, তখন আমরা ভারতবাসীরা ডান হাতে না বাঁ হাতে জলের গেলাস লইব, তালগাছের পাতা পড়ার দরুণ কাক উড়িয়া গেল, না কাক উড়িয়া গেল বলিয়া তালের পাতা পড়িল, এই সব 'যুগান্তকারী' চিন্তা লইয়া ব্যস্ত। ধর্ম বলিতে ছিল ছুঁৎমার্গ, আর ঠাকুর ছিলেন ভাতের হাঁড়িতে। সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ছিল, নিজেদের বেদান্তবাদী-জ্ঞানে আমাদের অহঙ্কার।

বেদান্ত-সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার সংশোধন

বেদান্ত-সম্বন্ধে দুইটি বিষয় স্বামীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রথমতঃ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কোনরকম প্রভাব বিস্তারের শক্তি না থাকায় তাঁহার অধিকাংশ দেশবাসীর কাছেই বেদান্ত প্রায় বিস্মৃত। দ্বিতীয়তঃ স্বদেশে হইয়াছে বেদান্তের বদহজম, এবং বিদেশে বেদান্তের বিকৃতি। শঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুগামী বেদান্তবাদীদের ভাষ্যকেই বেদান্ত মনে করা হইত এবং শাঙ্কর বেদান্ত সমগ্র জগৎ ও

জীবনধারাকে মায়া ও অসত্য ঘোষণা করিয়া মানব-জীবনের একেবারে মূলে আঘাত করিয়াছে, —ইহাই ছিল প্রচলিত ধারণা। পাশ্চাত্য-সমালোচকদের মনে এই ধরনের অবসরবিনোদন-কারী চিন্তাই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, প্রধানতঃ বেদান্তের উপর নির্ভরশীল হিন্দুধর্ম মানুষের কোন নৈতিক ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে নাই, কারণ যে বাস্তব-জীবনবোধ নীতির মূলকথা হিন্দুধর্ম তাহাকেই অস্বীকার করে। বেদান্ত-সম্বন্ধে বলিতে স্বামীজী বিশেষ কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যান নাই, যদিও সব ধরনের বৈদান্তিক যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সঙ্গেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। জগৎ ও মানব সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব দিব্যদৃষ্টি এবং তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধ ও ব্যাখ্যাত উপনিষদের উক্তিসমূহকে তিনি ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উপনিষদের প্রেরণার উপর বিশেষভাবে জোর দিবার সময় এ-কথাও বলিয়াছেন যে, শঙ্করের বেদান্তব্যাখ্যা কোনমতেই উপনিষদের মৌল প্রেরণার বিরোধী নয়। ভ্রান্তধারণা ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যার অনুগামী না হইলে বেদান্তের মায়ার দ্বারা কখনই জীবনকে একেবারে অস্বীকার করা বুঝায় না।

মায়ার দার্শনিকতত্ত্ব স্বামীজী যেভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা এ-কথা বুঝায় না যে, জগৎ মিথ্যা বলিতে জগতের অস্তিত্বই নাই অথবা বিষয়ের ধারণার উপরেই জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে। ব্যাবহারিক প্রমাণের দ্বারাই জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়; জগৎ এই অর্থে অসত্য যে, ইহার অস্তিত্বের কোন আধ্যাত্মিক নির্ভরভূমি না থাকিলে দৃশ্যমান সংসারের কোন চিরন্তন মূল্য থাকে না। একবার যদি প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা সেই নির্ভরভূমিটি আবিষ্কৃত হয়, এবং জাগতিক সমস্ত বিচিত্র প্রকাশই দেশে-কালে সেই অনন্ত একেরই প্রকাশরূপে উপলব্ধি করা যায়, তখনই জগৎ ও জীবনের সবটুকু অপরিসীম তাৎপর্য লাভ করে। ধাবমান প্রবাহ-রূপে এ জগৎ ততক্ষণই মায়াময়, যতক্ষণ আমরা এই প্রবাহের মধ্যে থাকিয়াই এই জগৎকে লক্ষ্য করিতেছি। কিন্তু যে ভগবৎচেতনা-স্পন্দনে দেশে ও কালে 'সংখ্যাতীত বিচিত্র বিকাশের উদ্ভব', তাহার দ্বারা মণ্ডিত দেখলে জগৎ কখনই অলীক নয়। লণ্ডনে প্রদত্ত তাঁহার অন্যতম একটি বক্তৃতায় স্বামীজী এ-বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়াছেন: বেদান্ত জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে না। বেদান্তে যেমন চরম বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, তেমন আর কোথাও নেই; কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নয়, নিজেকে শুষ্ক করিয়া ফেলা নয়। বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ জগতের ব্রহ্মভাব—আমরা যেভাবে জগৎকে দেখি, যেভাবে জানি, যেভাবে এ জগৎ আমাদের কাছে প্রতিভাত, তাহার বদলে জগতের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি কর। জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখ। বাস্তবিক, জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম উপনিষদের সূচনায় আমরা পাই, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—জগতে যাহা কিছু আছে, সে-সব কিছুকে ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করিতে হইবে।[১]

লণ্ডনে প্রদত্ত স্বামীজীর আর একটি উল্লেখ-যোগ্য শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা 'ব্যাবহারিক বেদান্তে'ও স্বামীজী এই ভাবটির উপর জোর দিয়েছেন। 'বেদান্ত জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দেয় না, জগৎকে ব্যাখ্যা করে, ব্যক্তিকে ধ্বংস করে না, আসল ব্যক্তিত্ব কি তাহা বুঝাইয়া দিয়া ব্যক্তিকে

১ সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন—জ্ঞানযোগ: স্বামী বিবেকানন্দ

ব্যাখ্যা করে। বেদান্ত বলে না যে, এ জগৎ অলীক বা ইহার অস্তিত্ব নাই, বরং বলে, এ জগৎ কি তাহা বোঝ, যাহাতে জগৎ তোমাকে আঘাত করিতে না পারে।'[২]

স্বামীজীর চিন্তাধারা অনুসারে বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর অর্থ পটভূমির পরিবর্তন—জড়ের পটভূমি হইতে চৈতন্যের পটভূমিতে উত্তরণ। এই যথার্থ পটভূমির অভাবেই এ জগৎ বিবদমান স্বার্থের রণক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়, যুক্তিহীন যন্ত্রণার কারাগারে পরিণত হয়, এমন এক নরক হইয়া ওঠে, যেখানে কোন দিক হইতে পরিত্রাণের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন কর, তখনই সব বিরোধ এক ভালোবাসায় সম্মিলিত হইবে, যে ভালোবাসার অর্থ—সেই এক কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ; নরক হইতেও তখন অনন্ত মুক্তির অমৃত-আলোক বিকীর্ণ হইবে।

জগৎকে অস্বীকার করা নয়, মানুষের সেবা করা—স্বামীজীর এই বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত অবশ্য যুক্তিগত জটিলতা হইতে মুক্ত নয়। কিন্তু স্বামীজী বেদান্তকে শুধুমাত্র যুক্তিগত পরম্পরার দিক হইতেই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে বেদান্ত এমন এক দিব্য দর্শন ও শক্তি, যাহা ব্যক্তির আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া পরমসত্যের সহিত তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিবে—এমনকি সেই সত্যের সহিত একাত্মবোধ আনিয়া দিবে। বেদান্তের আর একটি বিশেষত্বের উপর স্বামীজী জোর দিয়াছেন, সেটি জগৎ ও জীবনের উপর নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তে নিশ্চিত ইতি-মূলক মনোভাবের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী।

অধ্যাত্ম-উপলব্ধির অনুসন্ধানে জগৎকে ত্যাগ করা অপেক্ষা সর্বপ্রাণী ও সর্বমানবের প্রতি পরম শ্রদ্ধায় সেবাধর্ম-পালনের জন্য অগ্রসর হওয়ার উপরেই স্বামীজী বিশেষ জোর দিয়াছেন। একদিকে পরমসত্যলাভের আগ্রহে ইহজীবনের সত্যকে অস্বীকৃতির প্রবণতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, অন্য দিকে পরম সত্যের আলোকে জীবনের গভীরতম অর্থ আবিষ্কারের একান্ত প্রয়াস। নিরাসক্তির জন্য প্রথম প্রথম হয়তো জগৎসম্বন্ধে একটি নেতিবাচক মনোভাব গড়িয়া তুলিতে হয় এবং সন্ন্যাস হয়তো আত্মপ্রস্তুতিরই একটি অঙ্গ; কিন্তু এইখানেই থামিয়া যাওয়াটা দুর্ভাগ্য, কারণ স্বামীজীর মতে এইখানে থামিয়া যাওয়ার অর্থ সত্যানুসন্ধানের একান্ত অসম্পূর্ণতা—সত্যের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ লাভ করা। সাধক যদি সাহসের সঙ্গে বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিয়া ইতিহাসের গতিপথে ছোট বড় সব রকম ঘটনার অধ্যাত্ম-তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে না চায়, তাহা হইলে অধ্যাত্ম-জীবন কখনই সম্পূর্ণতা লাভ করে না। অধ্যাত্ম-সাধকের সক্রিয় সামাজিক জীবনটি ভগবৎ-আরাধনায় রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন।

সর্বব্যাপী অধ্যাত্ম-চেতনার পরম সত্য উপলব্ধি করিয়া বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসা এবং মানবজীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এই অন্তরতম সত্যের আলোকে ব্যঞ্জনাময় করিয়া তোলার এই আদর্শ বেদান্তদর্শনের একটি নূতন অধ্যায়। এ অধ্যায়ের চমকপ্রদ সূচনা বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রচারে। স্বামীজী নিজে এই আদর্শকে কখনই নূতন বলিতেন না, বরং বলিতেন, ইহাই বেদান্তের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া বাদবাকি সব আংশিক বা বিকৃত দৃষ্টির ফল। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক হইতে দেখিতে গেলে আমরা বলিব, এ আদর্শ নিশ্চয়ই পূর্বাবধি বিদ্যমান ছিল, তবু আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে এবং ভগবৎসেবার শ্রেষ্ঠপন্থা-জ্ঞানে মানবসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ একটি সঙ্ঘবদ্ধ সন্ন্যাসী-

২ কর্মজীবনে বেদান্ত—দ্বিতীয় প্রস্তাব : জ্ঞানযোগ

সম্প্রদায় গড়িয়া তোলার মধ্য দিয়া বৈদান্তিক জীবনাদর্শে নবপ্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে।

মানবজীবনের এই নূতন মূল্যবোধ এবং সমগ্র সংসার-প্রবাহকে অধ্যাত্ম-চেতনারই বহিঃ-প্রকাশরূপে উপলব্ধি—উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অনেক মনীষীরই চিন্তাধারার বিশিষ্ট লক্ষণ। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের নাম উল্লেখ করা চলে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে—প্রকৃতি ও মানবজীবনে এবং সৌন্দর্য ও প্রেমে বিকশিত রূপেই ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ উপলব্ধি করিতে হইবে। কেবল মানুষের নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমেই ভগবানের সেবা সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দের চিন্তানুসারে ধর্ম-জীবনে জগতের অনিত্যতাবোধ এবং একটি নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলার মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু এ কেবল বৃত্তের অর্ধাংশ। ভগবৎসাধনার এই প্রথম পর্যায়কে বলে 'আরোহ'। কিন্তু এই প্রথমার্ধ আপন তাৎপর্য হারায়, যদি বৃত্তের দ্বিতীয়ার্ধ—এই রক্তমাংস, মানবিক অনুভব, বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তব জগতে দিব্যচেতনার 'অবতরণে'র ফলে আমাদের দৈহিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আমূল রূপান্তর --ইহাকে সম্পূর্ণতা না দেয়। এ প্রবন্ধের অন্যত্র আমরা আভাস দিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে যে-কথা সর্বাপেক্ষা বেশী মনে জাগে, তাহা এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে তাঁহার ন্যায় এমন আর একটি ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া কঠিন, যিনি আপনার মধ্যে আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক কর্ম ও প্রেরণার এমন সম্মিলন ঘটাইতে পারিয়াছেন অথবা যিনি মানুষের আধ্যাত্মিক পটভূমিতে এমন পরিবর্তন করিতে পারিয়াছেন, যাহার ফলে নিঃস্বার্থ সমাজসেবাই আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নতির পন্থারূপে সাগ্রহ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

নব মানবিকতা

উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ চিন্তানায়কই ছিলেন মানবিকতাবাদী। বাংলাদেশের কয়েক-জন মনীষী পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদী মানবিকতার সঙ্গে সর্বজনীন ধর্মচিন্তার সমন্বয়-সাধনের প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বঙ্কিম-চন্দ্রের নাম স্মরণীয়। বঙ্কিম তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলীতে চিরন্তন মানব ও বিশ্বমানবের প্রতি তাঁহার প্রীতিকে ভগবৎপ্রীতির সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত করার প্রয়াসী ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম ও চিন্তাধারায় বৈদান্তিক ভিত্তিতে এই মানবিকতাবাদই নূতন তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। যুক্তিমূলক সংশয়বাদ ও সহজ ভগবৎবিশ্বাসের দীর্ঘ মানসদ্বন্দ্বের অবসানে ব্যক্তিগত উপলব্ধির দ্বারা স্বামীজী মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব এবং সর্বোচ্চ সীমায় পরম সত্যের ঐক্যোপলব্ধি বিষয়ে নিশ্চিত হন। দেশ ও কালের সীমায় আচ্ছন্নদৃষ্টি মানবের নিকট এই অদ্বৈততত্ত্ব যতই অস্পষ্ট মনে হউক না কেন, তাঁহার অন্তরে এই সত্যই মানব-মহিমাবোধ উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। ইহার ফলে, মানুষ যে মূলতঃ পাপী—এই ধারণা সম্বন্ধে তাঁহার মনে গভীর বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। এই ধারণার বিরোধী মনোভাব তাঁহার মধ্যে এতটা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি অনেক সময়ই ঘোষণা করিয়াছেন, মানুষকে পাপী বলাই সবচেয়ে বড় পাপ। অপরপক্ষে তিনি বারংবার এই কথাটির উপরেই জোর দিতেন যে, মানুষ আসলে অমৃতের সন্তান। প্রগতির যাত্রাপথে মানবজাতিকে এই অন্তর্নিহিত দেবত্বের ভাব ও উপলব্ধি হইতেই প্রেরণা আহরণ করিতে হইবে। মানুষের এই চৈতন্যময় সত্তা হইতেই সাম্য ও সৌভ্রাত্রের সর্ববিধ আদর্শ দেখা দিবে। শুধু সাম্য ও সৌভ্রাত্রের বাণী নয়, বিশ্বপ্রেমের আদর্শও

'ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়'—এই অধ্যাত্ম-সত্য উপলব্ধির ভিত্তিতেই গড়িয়া তুলিতে হইবে। লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছেন: 'অতি ক্ষুদ্র জীবকোষেও সেই অনন্ত পূর্ণব্রহ্মই অন্তর্নিহিত। বহিরাবরণের জন্যই ইহাকে জীবকোষ (amoeba) বলা হয় ; কিন্তু জীবকোষ হইতে মহামানব পর্যন্ত সকলের আভ্যন্তর সত্তার কোন পরিবর্তন নাই—ইহা এক ও অপরিবর্তনীয় ; কেবল বাহিরের আবরণেরই পরিবর্তন ঘটে।'[৩] সর্বজীবের প্রাণপ্রবাহ সেই পরমসত্য আত্মারই বিভিন্ন-স্তরের বিকাশ—এই কথা মনে রাখিয়াই সকলের সাম্য স্বীকার করা যায়। সুতরাং কোন পার্থক্যের প্রশ্ন যদি ওঠে, তাহা কোন মূলগত পার্থক্য নহে, শ্রেণীগত পার্থক্য। স্বামীজী বলিয়াছেন, 'আত্মা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া এক আত্মা অন্য আত্মা অপেক্ষা বড়—এরূপ বলার কোন অর্থ হয় না। মানুষ ইতর প্রাণী বা উদ্ভিদ্ অপেক্ষা বড়—এ-কথা বলাও সেজন্য নিরর্থক। সমগ্র জগৎ এক। উদ্ভিদের মধ্যে আত্মার প্রকাশের বাধা একটু বেশি, ইতরপ্রাণীর মধ্যে একটু কম ; মানুষের মধ্যে আরও কম ; সংস্কৃতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বে তাহা অপেক্ষাও কম ; কিন্তু পূর্ণতম ব্যক্তিত্বে আত্মার প্রকাশের বাধা সম্পূর্ণ অপসৃত।'[৪]

অন্তর্নিহিত আত্মার সত্যকে বিকশিত করিতে গিয়া সকল প্রাণীই কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ অনুভব করে ; কেন্দ্রের প্রতি এই মূলগত আকর্ষণ হইতেই বিশ্বপ্রেমের উদ্ভব। মানবহৃদয়ে যখন এই আকর্ষণ দেখা দেয়, তখনই মানুষ অনুভব করে, 'সকলেই আমাদের সহযাত্রী, সেই এক পথের পথিক—সব জীবন, সব তৃণ-তরু, সকল প্রাণী—সকলেই সেই এক দিকে চলিয়াছে। কেবল আমার ভালো ভাইটি নয়, আমার খারাপ ভাইটিও, শুধু আমার ধার্মিক ভাইটি নয়, আমার দুর্বৃত্ত ভাইটিও—সকলেই একই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিয়াছি।'[৫]

বিশেষ অধিকার—জীবনের অভিশাপ

বৈদান্তিক সাম্যবাদের ধারণা স্বামীজীকে বিশেষ অধিকারবাদের তীব্র সমালোচক করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিশেষ অধিকারবাদকে তিনি মানবজীবনের অভিশাপ বলিয়া মনে করিতেন। জন্মগত উৎকৃষ্টতা বা নিকৃষ্টতার এক ভিত্তিহীন ধারণার উপর এই বিশেষ অধিকারবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ধারণা যে কেবল নেতিবাচকভাবেই অসত্য তাহা নহে, মানুষের সামাজিক আর্থিক এবং শোচনীয়ভাবে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সর্বপ্রকার শোষণের মূল কারণরূপে ইতিবাচক দিক হইতেও প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকর।

অননুকরণীয় সরলতার সহিত স্বামীজী ব্যক্ত করিয়াছেন: সর্বশেষ এবং সর্বনিকৃষ্ট অধিকারবাদ হইতেছে আধ্যাত্মিক অধিকারবাদ। ইহাই নিকৃষ্টতম, কেন-না ইহা সর্বাধিক পরপীড়ক। যাহারা মনে করে যে, আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহারা বেশী জানে, তাহারা অন্যের উপর বেশী অধিকার দাবি করে। তাহারা বলে, 'ওহে সাধারণ ব্যক্তিরা, এসো আমাদের পূজা কর। আমরা ঈশ্বরের দূত, আমাদের পূজা করা তোমাদের কর্তব্য।' এই ধরনের গোঁড়ামির উত্তরে স্বামীজীর সাফ জবাব: 'ঈশ্বরের বিশেষ দূত কেহ নাই, কোনকালে ছিল না এবং কখনও হইতে পারে না।…সেই শাশ্বত বাণী চিরকালের মতো সকল প্রাণীর হৃদয়ে মুদ্রিত রহিয়াছে। যে-কোন স্থানেই একটি প্রাণীও

৩ Vedanta and Privilege : বেদান্ত ও অধিকার
৪ তদেব
৫ তদেব

বর্তমান, তাহারই অন্তরে সেই মহামহীয়ানের বাণী নিহিত রহিয়াছে।'[৬]

মানুষ নিজের জন্য কী বিশেষ সুবিধা দাবি করিতে পারে? স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিবেন, 'মানবজাতির সেবার অধিকার।' মাঝে মাঝে তিনি এমন চরম কথাও বলিয়াছেন, 'মানবদেহের অন্তরালে মানবাত্মাই একমাত্র উপাস্য ভগবান্'। 'যদি তুমি প্রত্যক্ষ ভগবান্ তোমার ভ্রাতৃস্বরূপ মানুষের সেবা করিতে না পারো, তাহা হইলে কেমন করিয়া সেই অপ্রত্যক্ষ ভগবানের সেবা করিবে?' মানুষ শুধু এই সেবাধর্মে নিজেকে উৎসর্গ করিবার অধিকার লইয়া গৌরব করিবে—অজ্ঞ, দুর্বল, দরিদ্র মানুষের অন্তর্নিহিত নারায়ণের সেবা এবং মানবের অন্তর্নিহিত সত্যের আত্মপ্রকাশের পথে সর্ববিধ বাধা দূরীকরণের মধ্য দিয়াই সেই সেবাধর্মের রূপায়ণ সম্ভব হইবে। দরিদ্রের সেবার অর্থ তাহাকে করুণা করা নয়। 'তাহাদিগকে এমন শিক্ষা দাও, যাহার বলে উহাদের বিলুপ্ত ব্যক্তিত্ব আবার ফিরিয়া পাইবে।' স্বামীজীর প্রিয় উপমা ছিল—সেই আত্মবিস্মৃত সিংহশিশু, আপন স্বরূপ ভুলিয়া যে নিজেকে ভেড়া বলিয়া মনে করিতেছিল, সিংহকে তাহার বীর্যময়স্বরূপ মনে করাইয়া দাও—উহা দ্বারাই তাহার অন্তরস্থ ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিবেন।

এই সেবাধর্মপ্রবণতা স্বামীজীকে সেই অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি লইয়া আসিয়াছিল, যাহারা একদিকে স্বার্থপর পেশাদার প্রচারক ও পুরোহিত-সম্প্রদায় এবং অন্যদিকে সমাজগত শিক্ষাসংস্কৃতিগত ও আর্থিক কারণে যাহারা নিজেদের তথাকথিত উন্নত শ্রেণী বলিয়া মনে করে, তাহাদের দ্বারা ঘৃণিত ও পদদলিত হইতেছিল। শিক্ষাই তিনি সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন তিনি বলিতেন, 'যদি দরিদ্র ছাত্র শিক্ষার নিকট আসিতে না পারে, শিক্ষাকে তাহার নিকট যাইতে হইবে।' নিম্নতম দরিদ্র ব্যক্তির নিকট শিক্ষা পৌছাইয়া দিতে হইবে। অজ্ঞ ক্ষুধার্ত জনগণের প্রতি একদিকে পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের চূড়ান্ত ঔদাসীন্য এবং অন্যদিকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্থূল স্বার্থান্ধতা স্বামীজীকে ব্যথিত করিত এবং এই উভয়কেই তিনি বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। কারণ সাধারণ মানুষের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করিয়া জীবন নির্বাহ করিলেও ইহারা কোনদিন সেই সাধারণ মানুষের দিকে তাকায় নাই। স্বামীজী বারংবার বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ এই গ্রাম্যকুটিরগুলির মধ্যেই বাস করে, আর এই কুটিরগুলিকে অন্ধকারে ফেলিয়া রাখার অর্থ ভারতবর্ষকে অন্ধকারে ফেলিয়া রাখা। একটি সাক্ষাৎকারে স্বামীজী বলিয়াছিলেন, 'আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের জাতীয় মহাপাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, ভাল খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। ঐ জনসাধারণ আমাদের শিক্ষার জন্য—রাজকররূপে—পয়সা দিয়াছে, আমাদের ধর্মলাভের জন্য—শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু এ-সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাথিই খাইয়া আসিয়াছে—তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ক্রীতদাস হইয়া আছে। ভারতের

৬ তদেব

পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের অবশ্যই কাজ করিতে হইবে।'[৭] ছুঁৎমার্গের বিকৃত প্রভাবে জাতির অধিকাংশ মানুষের উপর যে অসাম্য ও সামাজিক অবিচার চলিয়াছে, স্বামীজী সে-কথা মনে করিয়া বিশেষ বেদনা অনুভব করিতেন। প্রতিটি মানুষে, প্রাণীতে, বস্তুতে পরমসত্তার অধিষ্ঠান যে জাতির ধর্মবিশ্বাসের মূলসূত্র, সেই জাতি যে ছুঁৎমার্গের এতটা পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে—ইহাই স্বামীজীর অন্তরে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছিল।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম পচিশ বৎসরে ভারতবর্ষে ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে এই ছুঁৎমার্গের প্রতিবাদ ও সেই সঙ্গে সর্বমানবের সাম্যাদর্শের জয়গান এবং মহাত্মা গান্ধীর ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছুঁৎমার্গকে গান্ধীজী মনে করিতেন 'জাতীয় পাপ'। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দই বোধ করি সর্বপ্রথম বজ্রনির্ঘোষে ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। ১৮৯৩-এর জুলাই মাসে তিনি জাপান হইতে মাদ্রাজবাসী বন্ধুদিগকে লিখিতেছেন:

এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও—গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে! তোমরা—দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছর ধ'রে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিচার ক'রে শক্তিক্ষয় ক'রছ! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্ব একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বলো দেখি? আর তোমরা এখন করছই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে ক'রে সমুদ্রের ধারে পায়চারি ক'রছ! ইউরোপীয় মস্তিষ্কের কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০, টাকার কেরানিগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকিল হবার মতলব ক'রছ। এই হ'ল ভারতীয় যুবকদের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে-পাশে একপাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—'বাবা খাবার দাও, খাবার দাও' ক'রে উচ্চ চীৎকার তুলেছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেলতে পারে না?

এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর ক'রে দাও। কারণ, এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখনো শোধরাবে না। তাদের হৃদয়ের কখনো প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উদ্ভব; আগে তাদের নির্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজনেরা কাঁদুক; পেছনে চেয়ো না, সামনে এগিয়ে যাও।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো —মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাঁধাধরা সভ্যতা ভাঙবার জন্য ইংরেজ গভর্নমেণ্টকে প্রেরণ করেছেন, আর মাদ্রাজের লোকই ইংরেজদের ভারতে বসবার প্রধান সহায় হয়। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আনবার জন্য সর্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন করবে, মাদ্রাজ এমন কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত—যারা দারিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধার্তমুখে অন্ন দান করবে, সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে নেমে এসেছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা করবে?[৮]

'ইহার জন্য আমি আমার গুরুদেবের নিকট ঋণী',

বৈদান্তিক মানবিকতার যে আদর্শকে স্বামীজী 'ব্যাবহারিক বেদান্ত' নামে অভিহিত করিতেন, ইহা আগ্রহী চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগায় যে, এই বৈদান্তিক মানবিকতার কতখানি স্বামীজী তাঁহার গুরুদেবের নিকট লাভ করিয়াছিলেন এবং কতখানি স্বামীজীর সহজাত সংস্কার হইতে উদ্ভূত। আধ্যাত্মিক বিষয়ে স্বামীজীর স্বাধীন প্রবণতা ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদিও সাকার

৭ Madras Times: February 1897: পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সন্ন্যাসীর প্রচার: স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা: দশম খণ্ড, পৃঃ ৪৭২—৪৭৩

৮ পত্রাবলী: প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

বা নিরাকার ভগবৎস্বরূপকে গুরু বা শিষ্য কেহই একেবারে পৃথক্ মনে করিতেন না, তবু গুরুর ঝোঁক ছিল সগুণ উপাসনার দিকে, শিষ্যের নির্গুণ উপাসনার দিকে। ইহা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ-প্রচারিত বৈদান্তিক মানবধর্মের বিবর্তন যে তাঁহার গুরুর দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য। প্রসঙ্গতঃ স্বামীজীর প্রথম জীবনের দুইটি ঘটনা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। একদিন সমাধিস্থ অবস্থা হইতে ব্যুত্থানের সময় ঐশীপ্রেরণার বশে শ্রীরামকৃষ্ণ সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সর্বপ্রাণীর প্রতি করুণা ও দয়াধর্মের কথা বলিতেছিলেন। বলিতে বলিতে কিছুক্ষণ থামিয়া গিয়া তিনি অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'দয়া! সর্বজীবে দয়া! কী ভুল ধারণা! কাকে তুমি দয়া করবে? ভগবান্‌ই নানা রূপ ধরে রয়েছেন। তাহলে কি ভগবান্‌কে করুণা করবে, দয়া করবে? জীবে দয়া নয়, জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।' গ্রহণশীল মন লইয়া শিষ্য কাছেই দাঁড়াইয়াছিলেন। গুরুপ্রচারিত ধর্মের আদর্শ তিনি এই ইঙ্গিতের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইলেন।

আর একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাও স্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কণ্ঠনালীর কর্কটরোগে ভুগিতেছিলেন, রোগযন্ত্রণার তীব্রতায় তিনি তরল খাদ্য পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন না। নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ তাঁহার শিষ্যবর্গ চিন্তান্বিত হৃদয়ে সব সময়ই সেবাশুশ্রূষায় ব্যস্ত ছিলেন। একদিন এক বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়া শাস্ত্রসম্মতভাবে ও সরল বিশ্বাসে বলিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো একজন মহাপুরুষের পক্ষে ইচ্ছামাত্রেই এই ব্যাধিমুক্ত হওয়া সম্ভব। পণ্ডিত ব্যক্তিটি বিদায় লইয়া যাইবার পর তরুণ সেবকশিষ্যদের মুখপাত্ররূপে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ব্যাধিমুক্তির ইচ্ছা করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিয়া জানাইলেন—মায়ের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হইবার জো নাই। তরুণ নরেন্দ্রনাথ ইহাতে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি মায়ের কাছে জানাইবার জন্যই বিশেষ অনুরোধ করিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণকে এ-কথায় রাজী হইতে হইল। কয়েকদিন পরে নরেন্দ্রনাথ যখন মায়ের কাছে বলার ফল কী হইল, তাহা জানিতে চাহিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন: মাকে আমার গলা দেখিয়ে বললুম, 'গলার ঘায়ের জন্য কিছুই খেতে পারছি না, যাতে একটু খেতে পারি তেমন কিছু ক'রে দাও।' মা তোদের সবাইকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে এত মুখে খাচ্ছিস?' আমি লজ্জায় আর একটি কথাও কইতে পারলুম না।

গুরুর এই কথায় সচকিত নরেন্দ্রনাথ মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারিত আধ্যাত্মিক ঐক্যের ভাবটি উপলব্ধি করিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতা ও উপদেশাবলীতে বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের প্রসঙ্গে এই চিন্তাধারাই সর্বদা সক্রিয় ছিল, ক্রমে ইহাই বৈদান্তিক মানবিকতাবাদে ঘনীভূত আকারে দেখা দেয়। 'The Way to Blessedness' বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছেন, 'কেন আমরা সকলকে ভালবাসিব? কারণ আমি ও আর সকলে মূলতঃ এক।…সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এই ঐক্য বর্তমান। আমাদের পদতলে যে হীনতম কীট ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের সর্বোচ্চ মহিমান্বিত যে-কোন ব্যক্তি অবধি দেহেরই বিভিন্নতা, আত্মা আসলে এক। সব হাতে তুমি কাজ করিতেছ, সব চোখে তুমি দেখিতে পাইতেছ। লক্ষ কোটি দেহে তুমি স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিতেছ, আবার লক্ষকোটি

দেহে ব্যাধি-যন্ত্রণাও অনুভব করিতেছ। যখন এই ধারণা আসে, যখন আমরা ইহা দেখিতে পাই, উপলব্ধি করি, তখনই সমস্ত ভয় ও যন্ত্রণার অবসান।'[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মধ্যরাত্রে মেথরের ঘরে যাইয়া তাঁহার দীর্ঘ কেশরাশি দিয়া ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে বলিতেন, 'মা, আমাকে মেথরের চাকর ক'রে দাও, আমাকে বুঝতে দাও যে, আমি মেথরের চেয়েও ছোট।'[১০] দরিদ্র পতিত মানবের প্রতি এই মহাপুরুষের সেবাবুদ্ধি ও দৈন্যভাবের এ আর একটি উদাহরণ। আবার, গলার অসুখের তীব্র যন্ত্রণা লইয়াও শ্রীরামকৃষ্ণ যখন অভ্যাগতদের উপদেশবাণী দান করিতেন, তখন শিষ্যদের নিষেধ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য ছিল, 'এ রকম বিশ হাজার শরীর আমি একটি মানুষের কল্যাণের জন্য ত্যাগ ক'রব।'[১১]

বিবেকানন্দের বৈদান্তিক মানবিকতাবাদ যে তাঁহার গুরুর প্রেরণাবলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, উল্লিখিত কাহিনীগুলি তাহারই প্রমাণ। আদর্শ শিষ্যের মতোই স্বামীজী স্বীকার করিতেন যে, তাঁহার এমন একটি কথা বা কাজ ছিল না, যাহা তাঁহার গুরুদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই। 'যদি আমি একটি সত্য, একটি মাত্র উপলব্ধির কথাও বলিয়া থাকি, তাহা আমার গুরুদেবেরই কথা, কেবল ভুলগুলি আমার নিজস্ব।'[১২] কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে আমরা জানি, স্বামীজীর এক যুগস্রষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব ছিল, তিনি ছিলেন সত্যদ্রষ্টা, অনন্যশক্তি-সম্পন্ন সংগঠক। গুরুর নিকট তিনি প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রেরণাকে যুগের মনন ও মানবিকতার দাবি অনুযায়ী জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া একটি মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। এই আদর্শ উত্থাপনের ব্রতে তিনিই ছিলেন অগ্রগামী। নিজেকে তিনি ঈশ্বরের দূতরূপে প্রচার করেন নাই, বরং মানুষ হইয়া মানুষের ভগবান্‌কে চিন্তায় কর্মে ও কথায় সেবার অধিকার লাভ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার গৌরববোধ ছিল—সেই মহৎ আদর্শের উত্তরাধিকার এবং সেই আদর্শের যোগ্যতা অর্জনের দায়িত্ব তিনি আমাদের উদ্দেশে রাখিয়া গিয়াছেন।*

৯ Complete Works—Vol. II

১০ মদীয় আচার্যদেব : স্বামী বিবেকানন্দ

১১ তদেব।

১২ তদেব

* অধ্যাপক শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ কর্তৃক ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনুদিত

বিজয়া-প্রণাম

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

বোধে বোধে ফুটে ওঠ—কোথা যেন
পুনঃ চলে যাও,
নিরঞ্জনা মা আমার, সত্তা তব
স্বরূপে মিলাও!
বোধময় রূপাভাস জেগে থাকে
সর্ব চরাচরে,
তুমি থাকো বুকে বুকে, তুমি থাকো
অন্তরে অন্তরে!
তুমি ছাড়া কিছু নাই—বহুত্বের
মাঝে একাকার,
সেই ঠাঁই রাখিলাম বিজয়ার
প্রণাম আমার!

কবিশিল্পী রসেটি

অধ্যাপক রেজাউল করীম

ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের মধ্যভাগে সাহিত্যে ও শিল্পে একটি নূতন ধরনের আন্দোলন আত্মপ্রকাশ ক'রল, তার নাম 'প্রি-রাফেলাইট আন্দোলন'। প্রথমে এই শব্দ কেবল চিত্র-শিল্পের জন্যই ব্যবহৃত হ'ত। তারপর চিত্র থেকে সাহিত্যে ও কাব্যে প্রবেশ ক'রল। বিখ্যাত চিত্রকর রাফেলের পূর্বে যে-সব ইটালিয়ান চিত্রকর ছিলেন, তাঁদের আদর্শ অনুসারে চিত্রাঙ্কন-রীতি প্রবর্তনের জন্য এই নবতর আন্দোলনকে 'প্রি-রাফেলাইট' বলা হয়। ভিক্টোরিয়া যুগের একদল কবি ও শিল্পী ইংরেজী সাহিত্য 'প্রি-রাফেলাইট' আদর্শদ্বারা প্রভাবিত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তাঁদের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে কয়েকজন জার্মান শিল্পী সে-যুগের আর্টকে মধ্যযুগের বিশুদ্ধতা ও সরলতার দিকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য কাজ আরম্ভ করলেন। কিছুদিনের মধ্যে ইংলণ্ডেও এই প্রকার প্রচেষ্টা আরম্ভ হ'ল। যাঁরা আরম্ভ করলেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন—দান্তে গেবরিল রসেটি। রসেটি, তাঁর ভ্রাতা ও অপর ক'জন শিল্পী ১৮৪৮ খৃঃ 'প্রি-রাফেলাইট ব্রাদারহুড' নামে একটি শিল্পী-সঙ্ঘ গঠন করলেন। তাঁদের আদর্শ-প্রচারের বাহন হ'ল—একটি সাময়িক পত্রিকা, তার নাম 'দি জার্ম' (The Germ); এই পত্রিকাতে কবি-শিল্পী উইলিয়াম মোরিস ও রসেটির বহু প্রকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'তে লাগলো। আরও বহু খ্যাতনামা শিল্পীর রচনা-সম্ভারে পত্রিকাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। প্রাথমিক যুগের ইটালিয়ান চিত্রকরদের তাঁরা আদর্শরূপে গ্রহণ করলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, আদিযুগের ইটালিয়ান চিত্রকরগণ ছিলেন 'Simple sincere and religious'—সরল, আন্তরিকতাপূর্ণ ও ধর্মভাবাপন্ন। ভিক্টোরিয়া-যুগের নবাগত শিল্পীদের উদ্দেশ্য হ'ল—তাঁরা শিল্পে ও সাহিত্যে সরলতা ও স্বাভাবিকতা প্রবর্তন করবেন। তাঁদের মতে শিল্পের গভীরতর অন্তরালে থাকা চাই একটি ধর্মভাব। ভিক্টোরিয়া যুগের সন্দেহবাদ ও জড়বাদের প্রাবল্যসত্ত্বেও তাঁরা ভক্তি ও ভয় জাগ্রত ক'রে মানুষের মনকে উন্নত ক'রে তুলতে চাইলেন। এইসব গুণ ছিল মধ্যযুগের সাহিত্যের ও শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই 'প্রি-রাফেলাইট' শিল্পিগণের শিল্পকর্মের মধ্যে মধ্যযুগের 'মিষ্টিসিজম্' ও 'সিম্বলিজমে' প্রত্যাবর্তন করতে চাইলেন। এই ভাবে তাঁরা প্রকারান্তরে কার্ডিনাল নিউম্যানের 'অক্সফোর্ড আন্দোলনকে'ই শক্তিশালী ক'রে তুললেন। ইংলণ্ডের কয়েকজন কবি ও শিল্পী এই 'প্রি-রাফেলাইট' আন্দোলনকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন এবং তার সাফল্যের জন্য কাজ আরম্ভ করলেন। রসেটি ছিলেন একজন নির্বাসিত ইটালিয়ান চিত্রকরের পুত্র। তাঁরা ইংলণ্ডে বসবাস করতেন ও বৃটিশ নাগরিক হয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই রসেটির কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি যেমন কাব্যচর্চা করতেন, সেইরূপ অবসর-সময়ে চিত্রাঙ্কন অভ্যাসও করতেন। ফলে শিল্পের এই দুই বিভাগেই পারদর্শিতা লাভ করেন। 'প্রি-রাফেলাইট আন্দোলনে'র তিনিই হয়ে পড়লেন অবিসংবাদিত নেতা। ১৮২৮ খৃঃ তাঁর জন্ম হয়। তিনি

১৮৬০ খৃঃ এলিজাবেথ মিডাল্‌কে বিবাহ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে অমর ক'রে রেখেছেন তাঁর অঙ্কিত কয়েকটি চিত্রে ও তাঁকে লক্ষ্য ক'রে লিখিত কয়েকটি কবিতায়। এই কবিতাগুলি ইংরেজী ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতার অন্তর্গত। তাঁর স্ত্রী দীর্ঘজীবন লাভ করেননি। বিবাহের দু-বছর পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। রসেটি পত্নী-বিয়োগের মর্মজ্বালা কোন দিন ভুলতে পারেননি। যখন এলিজাবেথ মিডালের শব সমাহিত করার সময় উপস্থিত হ'ল, তখন রসেটি মনের দুঃখে তাঁর সমস্ত অপ্রকাশিত কবিতার পাণ্ডুলিপি শবাধারের উপর রেখেছিলেন। তিনি ভাবলেন, এ-সব কবিতাগুলিকে সযত্নে রেখে দেবার কোন দরকার নেই, স্ত্রীর সহিত এগুলিও সমাহিত হোক। কিন্তু তাঁর কয়েক-জন বন্ধুর হস্তক্ষেপের ফলে কবিতাগুলি শবের সহিত সমাহিত হ'ল না। পরে ১৮৭০ খৃঃ ঐ কবিতাগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হ'ল। এগুলি ছিল প্রেমের কবিতা। মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ামাত্র কবিতাগুলি কবি-সমাজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি ক'রল। তাঁরা রসেটিকে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে অভিনন্দন করলেন। ১৮৮১ খৃঃ 'Ballads and Sonnets' প্রকাশিত হ'ল। এর অনেকগুলি কবিতা প্রথম শ্রেণীর। তাঁর পরবর্তী কাব্য গ্রন্থের নাম 'Ballads of Sister Helen'। মধ্যযুগের একটি কাহিনী অবলম্বন ক'রে এ গ্রন্থ রচিত। 'The King's tragedy' রসেটির আর একখানা বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই কাহিনী-কবিতাটি নাটকীয় ভঙ্গীতে লেখা। রসেটির 'The House of Life'-এ আছে শতাধিক সনেট। প্রেম ও বিরহের উপর কয়েকটি উৎকৃষ্ট সনেট এতে আছে। এই কাব্য-গ্রন্থটি ব্রাউনিং পত্নীর 'Sonnets from Portuguese'-এর সহিত তুলনীয়। রসেটির কবিতার মধ্যে শুধু যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেমের কথা আছে, তা নয়। তিনি ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের পরশ অনুভব ক'রে-ছিলেন, তার প্রমাণও তিনি বিবিধ কবিতার মধ্যে দিয়েছেন।

রসেটি একাধারে কবি ও চিত্রকর। সেই জন্য তাঁর বহু কবিতার মধ্যে আছে চিত্রকরের তুলিকার পরশ। কবিতার মধ্যে রঙ ও রেখার স্পষ্ট চিহ্ন দীপ্যমান। 'The Portrait' তাঁর একটি অনবদ্য কবিতা। কথিত আছে, তাঁর স্ত্রীর চিত্র অঙ্কিত করার পর সেই চিত্রটি সামনে রেখে তিনি এই কবিতা রচনা করেন। এটা কবিতাও বটে, আবার চিত্রও বটে। কবিতাটি পড়লে মনে হবে যে, তিনি যেন অক্ষরের সাহায্যে চিত্রটি অঙ্কিত করেছেন। কবিতায় চিত্রাঙ্কন করার ক্ষমতা খুব কম কবিরই আছে। এ-কথা সত্য যে, রসেটি তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি নন, কিন্তু তবু তাঁর কবি-খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। তিনি মূলতঃ শিল্পী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে যে শিল্প-সাধনা আরম্ভ হয়েছিল, রসেটি তারই যেন জীবন্ত মূর্তি। কবিতার মাধ্যমে তিনি কোন বাণী বা উপদেশ দিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন না। ব্রাউনিং ও টেনিসন কবি এবং শিক্ষক। কিন্তু রসেটি শিক্ষক হ'তে চাননি, তিনি কবি হয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি শিল্পের মৌল প্রত্যয় ও আদর্শের সহিত অন্য কোন আদর্শকে মিশ্রিত করতে চাননি। তিনি কবি কীটসের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন: 'যা সুন্দর তাই সত্য, এবং যা সত্য তাই সুন্দর আর যা সুন্দর নয়, তা সত্যও নয়।'

সমালোচনা

যুগাচার্য-বিবেকানন্দঃ—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত। বিবেকানন্দ-জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী প্রকাশন। প্রকাশক: স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সেক্রেটারি, বিবেকানন্দ-জন্মশতাব্দী জয়ন্তী সমিতি, পোঃ বেলুড় মঠ, জিঃ হাওড়া। পৃষ্ঠা ৩৯৪ ; মূল্য ৩৲।

বিবেকানন্দ-জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় এবং অনেক বিদেশী ভাষায় স্বামীজীর ছোট-বড় বহু জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের যতদূর জানা আছে, ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের জননী সংস্কৃতভাষায় ইতঃপূর্বে স্বামীজীর কোন জীবন-চরিত লিখিত হয় নাই। সংস্কৃতভাষায় লিখিত একখানা সর্বাঙ্গসুন্দর নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক বিবেকানন্দ-জীবনীর অভাব ভারতীয় হিন্দুমাত্রেই বিশেষভাবে অনুভব করিয়া আসিতেছিল। এই অভাবপূরণের জন্য আলোচ্য গ্রন্থখানি সকলের প্রশংসা ও অভিনন্দন পাইবার যোগ্য।

ভারতকে শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ ও সংস্কৃতিমান্ করিবার জন্য সংস্কৃতভাষার শিক্ষা ও প্রসার অতি আবশ্যক। স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কৃতশিক্ষার উপ-যোগিতা সম্বন্ধে জোর দিয়া বলিয়াছেন, 'সংস্কৃত-ভাষা আমাদের গৌরবের বস্তু—এই ভাষায় আমাদের ধর্মরত্নগুলি রক্ষিত আছে। এগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করিতে হইবে। সংস্কৃত-শিক্ষা দ্বারা—সংস্কৃত-শব্দের উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগিবে। সংস্কৃতভাষার প্রসারের দ্বারা জ্ঞানের বিস্তার হয়, সঙ্গে সঙ্গে 'গৌরব-বোধ' ও 'সংস্কার' জন্মে। সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণজাতি সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি-গুলির অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করা। জাতিভেদের বৈষম্য দূর করিয়া সমাজে সাম্য, সংহতি ও মৈত্রী স্থাপনের প্রকৃষ্ট উপায় উচ্চবর্ণের শক্তির কারণ-স্বরূপ সংস্কৃত-শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা।' যে যুগাচার্য মহাপুরুষ সংস্কৃতের এত অনুরাগী ও উৎসাহী প্রচারক ছিলেন, তাঁহার জীবনবেদ সেই দেবভাষায় রচিত হওয়ায় গ্রন্থখানি শাস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে।

স্বামীজীর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, তাঁহার বিপুল কর্মশক্তি, অনুপম স্বদেশানুরাগ, অপূর্ব গুরুভক্তি, কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা, দেশ-বিদেশে অতন্দ্র ভাবপ্রচার, ভারতের নবজাগরণে শক্তিসঞ্চার, পাশ্চাত্যে তাঁহার জীবন ও বাণীর প্রভাব, নবভারত-গঠনে কর্মপ্রচেষ্টা প্রভৃতি বিষয় গ্রন্থকার সহজ সরস সংস্কৃত ভাষায় সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থের শেষাংশে অবতার, ঈশ্বর, ধর্ম, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ, দেশভক্তি, সেবা, শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, ভারত-মহিমা প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর দুইশত উপদেশ, এবং তাঁহার রচিত স্তোত্রমালা, সন্ন্যাসীর গীতি ও জীবন্মুক্তি-গীতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্বামীজীর চরিত্র-মাহাত্ম্য-বর্ণনাত্মক একশত শ্লোক, পুরাতন ও বিবেকানন্দ-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা 'উদ্বোধন' হইতে সংগৃহীত সুধী-ভক্ত-বিরচিত আঠারটি বিবেকানন্দ-স্তোত্র এবং প্রশস্তিও সংযোজিত হইয়াছে।

গ্রন্থ-প্রণয়নে কাশীর কয়েকজন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও অধ্যাপক সহায়তা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের 'যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ' নামক বাঙলা ভাষায় লিখিত চরিতাখ্যান পাঠ

করিলে বাঙলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ আলোচ্য সংস্কৃত জীবন-চরিতখানি সহজে বুঝিতে পারিবেন। আমরা আশা করি ভারতের সর্বত্র এবং সংস্কৃতানুরাগী বৈদেশিকগণের নিকট গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

—রমণীকুমার দত্তগুপ্ত

ইতিহাস-শিক্ষণ—অধ্যাপক শ্রীদিলীপ-কুমার বিশ্বাস-প্রণীত। প্রকাশক: দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি (প্রাইভেট) লিঃ, ৫৪-৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৩৫২ ; মূল্য ৪·৫০।

মানবসভ্যতার অগ্রগমন ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল। সমাজের রূপান্তর ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ইতিহাসের দ্বারাই সংসাধিত হয়—এ-কথার সত্যতা উপলব্ধির পক্ষে আলোচ্য গ্রন্থখানি বিশিষ্ট সহায়ক। ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তার প্রতি স্বদেশের সাম্প্রতিক কালের সাধারণ সমাজ অত্যন্ত উদাসীন—আত্মবিস্মৃত জাতির এই ঔদাসীন্যকে দূর করার পক্ষে এ-ধরনের গ্রন্থের ব্যাপক প্রচার আবশ্যক।

আলোচ্য গ্রন্থের অনুরূপ গ্রন্থ পাশ্চাত্য দেশে বিরল নয়, কিন্তু আমাদের দেশে অল্পসংখ্যক। 'ইতিহাস-শিক্ষণে'র অধিকাংশ প্রবন্ধাকারে ইতিপূর্বেই শিক্ষাসংক্রান্ত পত্রিকাগুলিতে আত্ম-প্রকাশ করেছে। গ্রন্থকার ইতিহাসের উপাদান-সম্পর্কে বিশেষ আলোক সম্পাত ক'রে পাঠকদের ইতিহাস-পাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছেন। স্থানে স্থানে সাধু ও কথ্য ভাষায় এবং প্রাচীন ও আধুনিক বানানের সংমিশ্রণে গ্রন্থখানির অঙ্গ-হানি হয়েছে। ছাপা কাগজ ও মলাটের নিকৃষ্টতার জন্যে গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব ব্যাহত হয়েছে।

বাণী ও প্রার্থনা—শ্রীপরমশরণানন্দ-সঙ্কলিত ; শ্রীশ্রীবিশ্বরূপ সেবাশ্রম, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা ৩৫। পৃষ্ঠা ১৪২ ; মূল্য ১·৫০।

প্রার্থনা ও স্তোত্রাদি, প্রার্থনা-সঙ্গীত ও বিবিধ প্রসঙ্গ—এই তিনটি স্তবক ব্যাপ্ত করা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতির বাণী ও বৈদিক যুগ থেকে শুরু ক'রে সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত প্রার্থনা-সঙ্গীত ও স্তোত্র স্থান পেয়েছে এই সঙ্কলনে। আলোচ্য গ্রন্থে সঙ্কলয়িতার উত্তম রুচি-বোধের পরিচয় পাওয়া গেল। তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ভক্তদের কাছে গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে, এরূপ আশা করা যায়।

গীতি-বীথিকা—সাধনভাই-প্রণীত ; ২৬নং বাদুড় বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১৬৩ ; মূল্য ২৲।

আলোচ্য গ্রন্থে স্বরচিত তিনশো ছয়টি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। ভক্তিমূলক গানই বেশী, তবে চৈনিক আক্রমণ, মজদুর, নওজোয়ান, দেশপ্রেম-সম্পর্কীয় গানও আছে। গানগুলির জীবনীশক্তি নির্ভর করছে সুর-সংযোজনা ও শিল্পীর স্বরবিন্যাসের ওপর। আবেগ ও আকৃতি আছে, গতানুগতিকতাও প্রাধান্য লাভ করেছে। রচনার দিক থেকে রয়ে গেছে দুর্বলতা, ফলে কোন গানই পড়ে রসানুভূতি হ'ল না। সঙ্গীত-রচনার পদ্ধতি আয়ত্ত না হওয়াতে গীতি-বীথিকার মূল্যায়ন ব্যর্থ হয়েছে—এ-কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। **—অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য**

সহজ ব্রহ্মচর্য-সাধন—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশ, আনন্দ-আশ্রম, চন্দননগর। পৃষ্ঠা ১১০ ; মূল্য ১৲।

কি ধর্মজীবনে, কি কর্মজীবনে ব্রহ্মচর্যের ভিত্তিতে গঠিত চরিত্রই সাফল্যমণ্ডিত হইতে দেখা যায়। ছাত্রছাত্রীরা এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবে।

(তৃতীয় ভাগ)—শ্রীমোহিতকুমার মুন্সী প্রকাশক: ঋষভ আশ্রম, কোঁড়া, বারাসত, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ২০০; মূল্য ২.২৫।

এই পুস্তক গুরুভক্তির উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। যাঁহারা শ্রীশ্রীভূপতিনাথের শিষ্য, তাঁহারা ইহা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন।

সর্পশক্তি-সাধনা ও সহজ সাধনার ব্যাপ্তি—শ্রীযোগানন্দ ব্রহ্মচারী। প্রকাশক: শ্রীপতি মিশ্র, জ্ঞানালোক সঙ্ঘ, বাঙ্গীটোলা, মালদহ। পৃষ্ঠা ৯৪; মূল্য ২৲।

কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে সর্পের ন্যায় কুণ্ডলিনী আকারে প্রসুপ্তা থাকেন, এবং জাগরিতা হইলে সাধারণতঃ সর্পের ন্যায় কুটিল গতিতে মূলাধার হইতে মস্তকস্থ সহস্রারে গমন করেন বলিয়া এই শক্তি 'সর্পশক্তি' নামে অভিহিতা। বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি-সহ বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

Vivekavani: Vivekananda Birth Centenary Number, 1963. প্রকাশক: বিবেক-সাধন সঙ্ঘ, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী মন্দির, গান্ধীপুরম্, বাঙ্গালোর ১৯। পৃষ্ঠা ৮১।

এই শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যায় ২২টি সুন্দর প্রবন্ধ স্বামীজীর জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন দিক অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে।

মায়ামুক্তি—ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ ভাই। প্রকাশক: শ্রীগোপীনাথ মল্লিক, ২৮এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা ৪। পৃষ্ঠা ১৩৩; মূল্য ২৲।

সংসারের গতানুগতিক ঘটনা না লইয়া ভক্তি-বিশ্বাসের কাহিনী অবলম্বনে উপন্যাস রচিত হইলেও যে তাহা জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে, আলোচ্য পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব—শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক: শ্রীঅনন্তলাল বণিক, রামকৃষ্ণ আশ্রম, গাঙ্গাইল রোড, আগড়তলা। পৃষ্ঠা ৪৮; মূল্য ১৲।

পুস্তিকাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ-পাবন ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

Dialogues with the Guru—Compiled by R. Krishnaswami Aiyar. Published by Chetana Limited. Bombay. Pp. 181; Price 5/-.

শৃঙ্গেরী মঠের ভূতপূর্ব শঙ্করাচার্য শ্রীচন্দ্রশেখর ভারতী-স্বামীর সহিত শিষ্যের তত্ত্বকথা আলোচ্য পুস্তকে প্রকাশিত। ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহশীল ব্যক্তি নূতন আলোক পাইবেন।

বেদান্ত-পরিচয় (প্রথম খণ্ড)—শ্রীমাধবচন্দ্র পঞ্চতীর্থ কর্তৃক সম্পাদিত। প্রকাশক: শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ, বীরেশ পল্লী, পোঃ মধ্যমগ্রাম, জেলা ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১২৪; মূল্য ২.৫০।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ; অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ, শৈবমতবাদ, শক্তিবাদ ও অদ্বৈতবাদ আলোচনায় পণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ—শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী। প্রকাশক: এস. সি. সরকার এণ্ড সনস্ প্রাঃ লিঃ, ১।১সি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১৭৪; মূল্য ৫৲।

'জিজ্ঞাসু রবীন্দ্রনাথ' একটি জিজ্ঞাসাই নয়, ইহা এক বিরাট ব্যক্তিত্বের চরণে আত্মনিবেদন ও অসামান্য মনীষার স্তুতিগান। যাঁহারা সাহিত্যরসিক, তাঁহাদের নিকট এই পুস্তক নূতন তথ্য পরিবেশন করিতে সমর্থ হইবে—ভরসা করা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠ: যথাযোগ্য ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্জননী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর উপাসনা বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজার কয়দিন আবহাওয়া ভাল ছিল এবং বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া মঠে পূজা ও প্রতিমাদর্শনের জন্য প্রচুর লোক-সমাগম হয়। খাদ্যাভাবমূলক বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এবার বসাইয়া প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। বহু ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। ১৪ই অক্টোবর মহাষ্টমীর দিন পূর্বাহ্নে কুমারীপূজার সময় এবং সন্ধিপূজাকালে সর্বাপেক্ষা বেশী ভিড় হয়; এই দিন ৮,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। শত শত ভক্ত শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। শ্রীশ্রীবিজয়াদশমীর আনন্দোৎসবও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

শাখাকেন্দ্রে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, কাটিহার, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, জলপাইগুড়ি, জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, বরিশাল, বারাণসী, (অদ্বৈত আশ্রম), বালিয়াটি, বোম্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহড়া, শিলচর, শিলং, শেলা (খাসি হিল), শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কার্যবিবরণী

নিউ দিল্লী: রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯৬২-৬৩ খৃঃ কার্যবিবরণীতে প্রকাশ: আলোচ্য বর্ষে নিয়মিত ধর্মালোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচার করা হয়।

এই কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, অবৈতনিক যক্ষ্মা ক্লিনিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় আছে।

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১৩,১২০ (সংযোজিত ১,৩১৯); পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্যা ১৪,৫১১। পাঠাগারে ১৩টি দৈনিক ও ১১৮টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়; গড়ে প্রত্যহ ৩৫৭ জন পাঠ করেন।

চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৩০,৮৬৬ (নূতন ৬,৮৮৬) রোগী চিকিৎসা লাভ করে। যক্ষ্মা-ক্লিনিকে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৩৯,২২০ (নূতন ২,০৪৭); অন্তর্বিভাগে ৫২৬ জন পর্যবেক্ষণ করা হয়।

মহিলা-সমিতির উদ্যোগে সারদা-মন্দিরে বালক-বালিকাদের ভজন, ধ্যান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

কলম্বো: রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যবিবরণী (১৯৬০ জানু.—'৬২ মার্চ) পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কলম্বো কেন্দ্র সিংহল শাখার প্রধান কর্মকেন্দ্র।

প্রতি রবিবার আশ্রমে ইংরেজী ও তামিল ভাষায় ধর্মালোচনা হয়। কলম্বো হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী ওয়াটুপিটিবেলায় তরুণ অপরাধী-দিগের শিক্ষায়তনে ধর্মমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয়। নবরাত্রির শেষ তিন দিন উৎসব করা হয় এবং বিজয়া-দশমীর দিন শিশুদিগের হাতে খড়ি দেওয়া হয়।

লাইব্রেরি এবং অবৈতনিক পাঠাগার আছে।

লাইব্রেরির পুস্তক-সংখ্যা ২,২০০; পাঠাগারে ২৫টি মাসিক, ৪টি সাপ্তাহিক, ২টি পাক্ষিক এবং ৪টি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক কৃষ্টিভবন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ১৯৬২ খৃঃ ১৫ই অক্টোবর উদ্বোধন করেন। বর্তমানে কৃষ্টিকেন্দ্রের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য, যথাঃ (১) দরিদ্র ছাত্রদিগকে স্থান দেওয়া, (২) অতিথিদিগকে রাখা, (৩) ধর্ম ও কৃষ্টি সম্বন্ধে ক্লাস করা।

একটি পুস্তক-বিভাগ আছে। এখানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয় করা হয়। আলোচ্য সময়ে তামিল ভাষায় ভজনাবলী ও সিংহলী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী এই বিভাগ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কাটারাগামা তীর্থযাত্রীদিগকে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সাহায্য করা হইয়া থাকে। কাটারাগামা রামকৃষ্ণ মিশন ধর্মশালায় প্রতিদিন গড়ে ২০০ জন এবং শনি-রবিবার গড়ে প্রায় ৬০০ জন তীর্থযাত্রী আসে। প্রতি বৎসরের ন্যায় বাৎসরিক উৎসবের সময় (জুলাই-অগস্ট) ১৬ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ প্রায় ৮,০০০ তীর্থযাত্রীকে বিনামূল্যে আহার্য দেওয়া হয়।

মিশনের কর্তৃত্বাধীনে বাট্টিকালোয়া, বাদুল্লা, জাফনা, ত্রিনকোমালি ও ভাবুনিয়ায় ২৬টি বিদ্যালয় আছে। মোট ৩১১ জন শিক্ষক ও ৯,০৬৯ জন ছাত্র আছে। অনাথদিগের জন্য একটি ছাত্রাবাস এবং দুইটি ছাত্রীনিবাস আছে; ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১১০।

কানপুরঃ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (১৯৬৩ এপ্রিল—'৬৪ মার্চ) কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

কানপুর কেন্দ্র ১৯২০ খৃঃ সামান্যভাবে আরম্ভ হয়, বর্তমানে ইহা শহরের অন্যতম প্রধান জন-কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

আশ্রমের মন্দিরে নিয়মিত পূজা পাঠ ইত্যাদি ব্যতীত প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে এবং প্রান্তে শহরের অন্যান্য অংশে ধর্মসম্বন্ধে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী উপলক্ষে বক্তৃতা, রচনা ও ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৪৫টি স্কুল ও কলেজ হইতে ৫০০ ছাত্র প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৬৪০ জন ছাত্র ছিল। স্কুল-লাইব্রেরিতে ৪,১১৪টি পুস্তক আছে, পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা ৪,২৩৯ শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রমের মধ্যে ভ্রমণ এবং বন-ভোজন ইত্যাদিতে প্রায় ৫০০ ছাত্র যোগদান করে। প্রতি বৎসর প্রাক্তন ছাত্রসম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বৎসরে ৮৫ জন প্রাক্তন ছাত্র উপস্থিত থাকে।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি উভয়বিধ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বৎসরে মোট ১,৭০,৮৭২ রোগীকে চিকিৎসা করা হয়। চিকিৎসিতের শতকরা ৭৫ জন শিশু ও নারী। এই হাসপাতাল দরিদ্র রোগীদিগের বিশেষ ভরসাস্থল।

জামসেদপুরঃ রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির ১৯৬২—৬৩ খৃঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে।

আশ্রমে দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

সাধারণ গ্রন্থাগারে ৩,২৫০ পুস্তক আছে, পাঠাগারে ১৭টি মাসিক, ৩টি দৈনিক ও ৫টি সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখা হয়।

সোসাইটি-পরিচালিত দুইটি ছাত্রাবাসের একটি সোসাইটির জমিতে, অন্যটি সাকচীতে সুবর্ণরেখা-নদীতীরে অবস্থিত। ছাত্রাবাস-

দুইটিতে আলোচ্য বৎসরে ৩৬টি গ্রামাঞ্চলের ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে ৪ জন ফ্রি এবং একজন আংশিক খরচ দিত।

শহরের বিভিন্ন স্থানে সোসাইটির তত্ত্বাবধানে ১২টি স্কুল আছে; তন্মধ্যে পাঁচটি উচ্চ মাধ্যমিক—তিনটি বালকদের ও দুইটি বালিকাদের জন্য। বিদ্যালয়গুলির মোট ৮,১৫১ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৪,৪২৪ জন বালক ও ৩,৭১৭ জন বালিকা।

১২টি স্কুল-লাইব্রেরির মোট পুস্তক-সংখ্যা ১৯,৫৯৫। প্রত্যেক স্কুলে খেলাধুলার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ শতবার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা আগামী বৎসর হইতে জামসেদপুর শহরের একটি দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে প্রতি বৎসর মাসিক ২৫৲ বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমেরিকায় বেদান্ত

হলিউড বেদান্ত-সোসাইটি : কেন্দ্রাধ্যক্ষ—স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী—স্বামী বন্দনানন্দ।

রবিবারের বক্তৃতা :

জুলাই, ৬৩ : কর্মযোগ; জ্ঞানযোগ; ভক্তিযোগ; আধ্যাত্মিকতার যৌগিক শক্তি।

সেপ্টেম্বর : ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি; 'শুদ্ধাত্মারাই ঈশ্বর দর্শন করিবে'; অন্তরের শান্তি; 'তত্ত্বমসি'; যুক্তি ও অনুভূতি।

অক্টোবর : মনন ও আনন্দ; শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণ; ঈশ্বরের মাতৃভাব; মায়া ও সত্য।

ডিসেম্বর : ধর্মসমন্বয়; গুরু ও শিষ্য; শ্রীশ্রীমা; বিজ্ঞান কোথায় যাইতেছে? খৃষ্ট ও বেদান্ত।

ফেব্রুআরি, ৬৪ : ঈশ্বর ও প্রকৃতি; চিন্তার শক্তি; শ্রীচৈতন্য; শ্রীরামকৃষ্ণ।

এতদ্ব্যতীত প্রতি মঙ্গলবার 'বিবেক চূড়ামণি' ও বৃহস্পতিবার উপনিষদের ক্লাস হয় এবং **সান্টা বারবারা** শাখাকেন্দ্রে প্রতি রবিবার বক্তৃতা হয়।

বক্তৃতা-সফর

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত ২রা মে হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধুবড়ী হরিসভা, গৌহাটী গ্রাম-সেবক শিক্ষা কলেজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম—ডিগবয়, ডিগবয় কালিবাড়ি, নামরূপ, মার্গারিটা, দুলিয়াযান, বকুল—টি স্টেট্, মাকুম, ডিব্রুগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম, নালিয়াপোল, গোলাঘাট, ফারকাটিং, সরুপাথার, বড়পাথার, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি লামডিং, রামকৃষ্ণ মিশন শিলচর, কাছারি উচ্চ বিদ্যালয়, উদারবন্দ, নরসিংপুর উচ্চ বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর, বড়তল টি স্টেট্, বিলপাড় উচ্চ বিদ্যালয়, হাইলাকান্দি রামকৃষ্ণ আশ্রম, হাইলাকান্দি কলেজ, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, হরিচরণ মহামায়া বালিকা বিদ্যালয়, হরকিশোর বিদ্যালয়, মণিপুর টি স্টেট্, কাঠালিচড়া উচ্চ বিদ্যালয়, কাটাখাল, আগড়তলা রামকৃষ্ণ আশ্রম, উমাকান্ত একাডেমি, উদয়পুর, বিলোনিয়া, কমলপুর, মানিকভাণ্ডার উচ্চ বিদ্যালয়, কৈলাশহর কলেজ, ধর্মনগর, ধর্মনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন, পাথারকান্দি, রামকৃষ্ণনগর উচ্চ বিদ্যালয়, শ্রীগৌরী উচ্চ বিদ্যালয়, ভাঙ্গা, বদরপুর, কাঠিগড়া, জারইতলা ইত্যাদি অঞ্চলে 'জাতীয় জাগরণে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য বিবেকানন্দ', 'শিক্ষার উদ্দেশ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ', 'বিশ্বসভ্যতায় স্বামী বিবেকানন্দের অবদান', 'ধর্মসমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ', 'ভারতীয় কৃষ্টি', 'নারীশিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ' ইত্যাদি বিষয়ে মোট ৮৪টি বক্তৃতা দিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬২টি ছায়াচিত্র যোগে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ

পৃথিবীর লোকসংখ্যা

প্রতি বৎসর প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বৃদ্ধির হার ফরাসী দেশ ও চেকোশ্লোভেকিয়ার যুক্ত লোকসংখ্যারও অধিক।

১৯৬২ খৃঃ মধ্যভাগে পৃথিবীর আনুমানিক লোকসংখ্যা ছিল ৩১৩ কোটি ৫০ লক্ষ এবং এই সংখ্যা বৎসরে শতকরা ২.১ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বৃদ্ধির হার অভূতপূর্ব। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ-সহ মধ্য আমেরিকার লোকবৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৫৮ খৃঃ হইতে এ-স্থানের লোকবৃদ্ধির হার শতকরা ২.৯।

কিন্তু মোট লোকসংখ্যা গণনা করিলে পূর্ব এশিয়ায় সর্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে। ১৯৫৮ খৃঃ হইতে ১৯৬২ খৃঃ পর্যন্ত এখানে মোট ৭ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই সংখ্যাগুলি রাষ্ট্রসংঘের ১৯৬৩ খৃঃ পরিসংখ্যান-দপ্তর হইতে প্রকাশিত বাৎসরিক পুস্তিকা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার অন্ততঃ এক-পঞ্চমাংশ চীন দেশে বাস করে। যদিও রাষ্ট্র সংঘে চীনের লোকসংখ্যার সরকারী হিসাব নাই, তথাপি বেসরকারী ভাবে ১৯৫৮ খৃঃ চীনের লোকসংখ্যা ৬৭।৬৮ কোটি ছিল—অনুমান করা হইয়াছে।

১৯৬২ খৃঃ মধ্যভাগে জনবহুল আরও ৯টি দেশের লোকসংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

দেশের নাম	মোট লোকসংখ্যা কোটি হিসাবে
ভারত	৪০.৯
সংযুক্ত সোভিয়েট রাশিয়া	২২.১
যুক্তরাষ্ট্র	১৮.৭
ইন্দোনেশিয়া	৯.৮
পাকিস্তান	৯ ৭
জাপান	৯ ৫
ব্রেজিল	৭.৫
পশ্চিম জার্মানি	৫ ৫
যুক্তরাজ্য	৫.৩

উপরি-উক্ত ১০টি বৃহদায়তন দেশে পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ বাস করে। আরও জানা যায়, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় শহর টোকিও, এখানে লোকসংখ্যাও সর্বাধিক।

আফ্রিকার আইভরি উপকূলে জন্মহার গত কয়েক বৎসর সর্বাপেক্ষা অধিক। ১,০০০ বাসিন্দার মধ্যে প্রতি বৎসর ৫৬টি শিশুর জন্ম হয়। আঞ্চলিক ভিত্তিতে সর্বোচ্চ জন্মহার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিলক্ষিত হয়। প্রতি ১,০০০ অধিবাসীর মধ্যে বৎসরে ৪৯টি শিশু জন্মগ্রহণ করে।

উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ইওরোপে বাৎসরিক জন্মের হার হাজারে ১৮ এবং পশ্চিম বার্লিনে ১১.১। প্রধান দেশসমূহের মধ্যে হাঙ্গেরিতে সর্বনিম্ন জন্মহার—হাজার করা ১২.৯। পৃথিবীর বাৎসরিক গড় জন্মহার—হাজারে ৩৭।

আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগে ও গ্রীষ্মমণ্ডলে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় আঞ্চলিক মৃত্যুর হার বাৎসরিক হাজার-করা ২৪। আইভরি উপকূলে মৃত্যুর হার ৩৩.৩ পর্যন্ত পৌছায়। পৃথিবীর মধ্যে আইসল্যাণ্ডে মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা নিম্ন, হাজারে ৬.৮। পৃথিবীর বাৎসরিক গড় মৃত্যুর হার, হাজারে ১৭।



কথাপ্রসঙ্গে

আজিকার প্রকৃত অভাব

আজ চারিদিকে রব উঠিয়াছে—নাই, নাই, নাই। যদি প্রশ্ন করা যায়ঃ কি নাই? সঙ্গে সঙ্গে শত কণ্ঠে, উত্তর আসিবেঃ কিছুই **নাই**—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শিক্ষা নাই, স্বাস্থ্য নাই, গৃহ নাই, ট্রেনে ট্রামে বাসে দাঁড়াইবার স্থান নাই, আরও কত কি নাই! ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা নাই, বিভিন্ন প্রদেশে মানুষের মধ্যে সংহতি নাই, নেতাদের প্রতি আনুগত্য নাই,—সর্বশেষ দেশরক্ষার জন্য আমাদের আণবিক শক্তিও নাই। এতগুলি 'নাই'-এর মধ্যে আমরা যে কি করিয়া বাঁচিয়া আছি, একটি দিনের পর আর একটি দিন অতিক্রম করিতেছি—তাহাই এক পরম বিস্ময় বলিয়া মনে হয়। অভাবই আজ যেন আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সর্বব্যাপী সর্বগ্রাসী অভাবে আমাদের স্বভাব নষ্ট হইবার ভয় আর নাই—এইটুকুই সান্ত্বনা।

এখন দেখা যাক—এতগুলি অভাবের মধ্যে তারতম্য আছে কিনা, প্রধান অপ্রধান আছে কিনা—ইহাদের মধ্যে কার্যকারণ-সম্বন্ধ কিছু আছে কিনা; সর্বশেষে দেখা প্রয়োজন—এইসব নানাবিধ অভাবের আড়ালে আমাদের আসল অভাবটি ঢাকা পড়িয়াছে কিনা, বা আমরা সেই প্রধান অভাবটিকেই অস্বীকার করিয়া একটা হট্টগোলের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি কিনা।

অন্নবস্ত্রের অভাব অবশ্য রূঢ় বাস্তব, শতকরা ৮০ জনের উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবও স্পষ্ট। আধুনিক সমালোচক বলেনঃ পূর্বে এদেশে মানুষকে রাস্তায় মরিতে দেখিলে হৈচৈ পড়িয়া যাইত, সভাসমিতি করিয়া চাঁদা তুলিয়া একটা কিছু ব্যবস্থা করা হইত। আজ মানুষ রাস্তায় শুধু মরে না, রাস্তায় জন্মায়, বড় হয়, রাস্তায় সংসার পাতে, জীবন যাপন করিয়া ধীরে সুস্থে নিজেই শ্মশানের দিকে অগ্রসর হয়—কাহারও অপেক্ষা করে না, অপেক্ষা করিলেও কাহারও সে দিকে ফিরিয়া তাকাইবার সময় নাই, ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই, অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাও নাই।

আমাদের 'নাই'-এর তালিকায় আরও তিনটি বাড়িয়া গেল, এখন দেখিতে হইবে—সত্যই আমাদের নাই কোনটি অর্থাৎ কোন্ জিনিসটির আজ একান্ত অভাব ঘটিতেছে।

মাঝে মাঝে তো আমরা শুনি—প্রাকৃতিক কারণে, উন্নততর সেচ-ব্যবস্থা ও সারের জন্য এ বৎসর দেশে বেশী শস্য উৎপন্ন হইয়াছে, তদুপরি বিদেশ হইতে বহু খাদ্য সাহায্যরূপে আসিতেছে, তবু কেন অন্নাভাব? মাঝে মাঝে তো আমরা সংবাদ পত্রে পড়ি—শিল্পোন্নয়নের ফলে এ বৎসর আমরা বিদেশে বহু বস্ত্র বিক্রয় করিয়া বেশ কিছু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছি, তবু কেন আমাদের বস্ত্রাভাব? হয়তো অভাব নয়, দুর্মূল্য—অর্থাৎ দরিদ্র ও মধ্যবিত্তের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে!

অন্নবস্ত্র ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে—সর্বোপরি না হইলেও সর্বশেষে আছে শিক্ষার

প্রশ্ন। সেখানেও দেখা যায়—ব্যয়ের সূচক ক্রমশঃ বাড়িতেছে, কিন্তু শিক্ষার মান ক্রমশঃ নামিতেছে। স্বাস্থ্য জাতীয় জীবনের একটি বড় প্রশ্ন, সেখানেও দেখা যায়—ভাল চিকিৎসা ও খাঁটি ঔষধ দুষ্প্রাপ্য—যেটুকু পাওয়া যায় তাহাও ভেজাল ও দুর্মূল্য। বিবিধ অভাবের বেড়াজালে আজ আমরা বাস করিতেছি। কেন এই অভাব, তাহা চিন্তা করিবার অবসরও নাই, অভাব দূর করা তো দূরের কথা। এমনই এক বিষ-চক্রের মধ্যে আজ জাতীয় জীবন ঘুরপাক খাইতেছে যে, সকলেই ইহা হইতে পরিত্রাণের জন্য অস্থির। চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ও আর্থনীতিক অবস্থার সমালোচনা করিয়া যাহা বলিতেছেন, রাজনীতিক নেতাগণ তাহা শুনিতে চান না; তাঁহারা মনে করেন—চিন্তা ও কর্মের দায়িত্ব তাঁহাদেরই, দেশবাসী শুধু তাঁহাদের অনুসরণ করিবে।

অভাবের তালিকায় আর একটি বাড়িতেছে—বোধ হয় এইটিই প্রধান অভাব, দেশে আজ উপযুক্ত চিন্তানেতা নাই; নেতা নাই—এ-কথা বলিবার উপায় নাই, বহু নেতা আছেন, সেই জন্যই তো প্রকৃত পথপ্রদর্শক নাই। এক এক জন এক-একটি পথ দেখাইতেছেন—দেশবাসী দিশাহারা, বিভ্রান্ত।

কেহ বলিতেছেন, 'লোকসংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়াই দেশের এই দুরবস্থা—নতুবা আমরা যে-সব পরিকল্পনা করিয়াছি, সেগুলি সফল হইলে আর দুঃখ-দুর্দশা থাকিতে পারে না।' দেশবাসী পরিকল্পনার কথা না বুঝিলে নেতারা ক্রুদ্ধ হন। তাঁহাদের পূর্বাহ্ণেই জানা উচিত, লোকসংখ্যা কমানোই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে মানুষের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। তাহার উপায়—প্রথমে নিজেদের 'মানুষ' হইতে হইবে, এবং যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে দেশবাসীকে 'মানুষ' করিতে হইবে। এই মানুষের অভাবই আজ আমাদের প্রকৃত অভাব।

'মানুষ' কাহাকে বলে—তাহা লইয়া একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। নিজের মনে সকলেই জানে, কাহাকে 'মানুষ' বলে, সকলেই চায় ছেলেটিকে 'মানুষ' করিতে, সে ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে পিতা-মাতা দুঃখ করিয়া বলেন, 'ছেলেটা মানুষ হ'ল না।'

স্বার্থবুদ্ধি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এই স্বার্থ সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলেই মানুষ অমানুষে পরিণত হয়। স্বার্থবোধ ক্রমশঃ বিস্তৃত করিলেই মানুষ সমাজকে ভালবাসে, দেশকে ভালবাসে—বিশ্বমানবকে ভালবাসে। ইহাই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত যে অনন্তত্ব বা ভূমা রহিয়াছে, তাহার বিকাশ করিলেই মানুষ যথার্থ 'মানুষে' পরিণত হয়, ইহাকেই কেহ 'দেবত্ব' বলিয়াছেন, কেহ 'আদর্শ মানব' বলিয়াছেন। এই আদর্শের আজ একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয়। এ অভাবের জন্য অভিযোগ করিয়া কিছু হইবে না, প্রতিবাদ সভাও এক্ষেত্রে নিষ্ফল। প্রয়োজন—ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে নূতন করিয়া সাধনা—মানুষ হইবার সাধনা—মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনা—ত্যাগ ও সেবার সাধনা, শক্তি ও সহানুভূতির সাধনা—দেশপ্রীতি ও মানবপ্রীতির সাধনা; তবেই দূরীভূত হইবে বর্তমান কালের অভাবের এই বিভীষিকা, দূরীভূত হইবে হৃদয়হীন অসাম্যমূলক বণ্টন ও বিতরণ, দূরীভূত হইবে একশ্রেণী নরপশুর ভ্রাতৃঘাতী আচরণ, দূরীভূত হইবে জাতীয়-জীবনে সংহতিহীন দুর্বলতা ও অনিশ্চয়তা।

এই অবস্থার পরিবর্তন করিতেই হইবে—যত শীঘ্র করা যায়, ততই মঙ্গল। যদি স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথে, সুপরিচালিত শিক্ষার মাধ্যমে ত্যাগ ও সেবার পথে এই পরিবর্তন আসে, তবেই মঙ্গল। নতুবা এই অনিবার্য পরিবর্তন আসিবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো—বন্যার মতো—ঘূর্ণিবাত্যার মতো—মনুষ্য-নিয়ন্ত্রণের একেবারে বাহিরে। খণ্ডপ্রলয়ের পর প্রকৃতি আবার নূতন পরিবেশে নূতনতর সৃষ্টির সূচনা করিবে; তাহা ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, সে-বিচার এখন সম্ভব নয়, তাহার প্রয়োজনও নাই। দ্বিতীয় প্রকল্প বাদ দিয়া এখন আমাদের কর্তব্য—প্রথম প্রকল্প অনুসারেই সমবেত-ভাবে চেষ্টা করা, যাহাতে মানুষ 'মানুষ' হয়।

বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান*

স্বামী আদিনাথানন্দ

'হিন্দুধর্ম'শীর্ষক তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধে বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্মমহাসভায় সমবেত সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে মন্তব্য করিয়াছিলেন: যে তত্ত্ব হিন্দুগণ বহু শতাব্দী সযত্নে অন্তরে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-সহায়ে অধিকতর ওজস্বিনী ভাষায় এবং অধিকতর যুক্তির আলোকে শিক্ষা দিবার সময় আসন্ন, সেজন্য হিন্দুগণ আনন্দ লাভ করিতেছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহাই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, বেদান্তের বিচার ও সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের আধুনিকতম সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়। এস্থলে 'আধুনিকতম সিদ্ধান্ত' দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। কারণ ইহার পূর্ববর্তীকালে ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর বিরোধী ছিল। পাশ্চাত্য মনে যখন পদার্থবিজ্ঞানের নব আবিষ্কারের অরুণ আলোক প্রতিভাত হয়, তখন বৈজ্ঞানিকগণ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ও বিশ্বপ্রক্রিয়ার দার্শনিক ব্যাখ্যা সর্বৈব কল্পনাপ্রসূতজ্ঞানে উড়াইয়া দিতেছিলেন। কোন প্রকার অপার্থিব সত্তা ছিল উপহাসের বিষয়। একমাত্র জড়বাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক একদা বলিয়াছিলেন, 'যদি পরীক্ষাগারে ঈশ্বরের ছাঁচ তৈয়ারী করা সম্ভব হয়, তবেই আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইব।' অষ্টাদশ শতাব্দীতে লাপ্লাস্ যখন নেপোলিয়নের সম্মুখে ক্রমবিকাশবাদ উত্থাপন করেন, নেপোলিয়ন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'আপনার মতবাদে ঈশ্বরের স্থান কোথায়?' বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তার সহিত উত্তর দিয়াছিলেন, 'প্রকৃতির নিয়ম ব্যাখ্যা করিবার জন্য ঈশ্বর বা কোন অপার্থিব বস্তুর প্রয়োজন নাই।' ডারুইনের ক্রমবিবর্তনবাদ, নিউটনের গতির নিয়মাবলী আবিষ্কৃত হওয়ায় বিশ্বের ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বলবিজ্ঞানসম্মত এক ব্যাখ্যা (machanistic interpretation) প্রচলিত হইয়াছিল।

দুই শতাব্দীরও অধিক কাল মানব-মনে বিশ্বে জড়বাদ-প্রসূত এই আলেখ্যটি আধিপত্য করিয়াছিল: সমগ্র বিশ্ব কঠিন বিলিয়ার্ড বলের ন্যায় পরমাণু দ্বারা গঠিত এবং পরমাণুসকল মহাবেগে মহাশূন্যে আবর্তিত হইতেছে এবং প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং পদার্থ এবং গতি সর্বপ্রকার ঘটনা ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে যথেষ্ট, প্রাণ মন এবং চৈতন্য জড়েরই অভিব্যক্তিমাত্র—ইহাই ছিল ধারণা। বিশ্ব নিষ্প্রাণ যন্ত্ররূপে ও অন্ধভাবে উদ্দেশ্যবিহীন কার্যপরম্পরা সাধন করিতেছে। ইহার পশ্চাতে কোন চৈতন্যের প্রক্রিয়া নাই। জড়বস্তু এবং নিরর্থক গতি সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম। প্রাণ ও মন জড়, এবং জড়ের আভ্যন্তরীণ শক্তিরই আকস্মিক সংযোগে ইহারা সৃষ্ট।

কিন্তু নূতনতর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে 'পরমাণু জড়ের চরম উপাদান'—এই ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে জে. জে. টমসন কর্তৃক প্রণালীবদ্ধ পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকগণের মনে পরিষ্কার ধারণা হয় যে, বিশ্বের চরম উপাদান পরমাণু নয়। তিনি

---

* জামসেদপুর রোটারী ক্লাবে পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধ। অনুবাদক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গবেষণা করিয়া ১৮৯৭ খৃঃ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পৃথিবীতে জ্ঞাত সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম পদার্থ হাইড্রোজেন-পরমাণু অপেক্ষা সহস্রগুণ ক্ষুদ্র তড়িৎশক্তিপূর্ণ কণিকা দ্বারা এই পরমাণু-সকল গঠিত। উক্ত কণিকাগুলিকে 'ইলেক্ট্রন' নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহাই সকল পদার্থের মৌলিক উপাদান। পরের ধাপে রাদারফোর্ডের আবিষ্কারে এই ধারণা হয় যে, প্রতিটি পরমাণু যেন এক একটি 'ক্ষুদ্র সৌরজগৎ', কেন্দ্রে 'প্রোটন' নামক তড়িৎ-বিন্দু এবং ইলেক্ট্রনগুলি যেন উহার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান গ্রহ। একটি টেবিল বা একটি চেয়ার ঐ-সকল তড়িৎকণিকার সমষ্টি। সুতরাং পদার্থ-বিজ্ঞানীরা সাধারণ জড়বস্তু পরিত্যাগ করিয়া শক্তিতত্ত্বে প্রবেশ করিলেন। পরবর্তীকালে যে মতবাদ প্রবর্তিত হইল, তাহাতে পরমাণুর ধারণা আরও পরিবর্তন করিয়া উহাকে একটি বিরাট তড়িৎচুম্বক-ক্ষেত্রের কেন্দ্র হইতে তরঙ্গ-প্রবাহ মনে করা হইল। ইহাই আমাদের অনুভূত ত্রিমাত্রিক জগতের অধিষ্ঠান। পদার্থ-বিজ্ঞানের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত। অন্যভাবে বলিতে গেলে জগতের প্রকৃত সত্তা জড় নয়—উহা শক্তি-সাগরে তরঙ্গের ন্যায়। প্রশ্ন হইতে পারে—ঐ সত্তা কি চৈতন্যময়, না যন্ত্রবৎ নিরর্থক? এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের বর্তমান মতামত নিম্নে আলোচনা করা হইয়াছে।

পূর্বে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত দ্বারা এখন সহজেই বোধগম্য হইবে যে, জড়বাদ অগ্রাহ্য হওয়ায় বর্তমানে সুদূরপ্রসারী বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের অবকাশ রহিয়াছে এবং মন ও বোধশক্তি জড় হইতেই উৎপন্ন—এইরূপ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নাই। বিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বৈজ্ঞানিকগণের জগৎসম্বন্ধে ধারণায় পাশ্চাত্যে আদর্শবাদী দার্শনিক মতবাদ এবং প্রাচ্যের শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবেদান্ত-মতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। জীনস্ ও এডিংটনের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত পদার্থ-বৈজ্ঞানিকগণ দার্শনিকে পরিণত হইতেছেন—এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন যে, তাঁহারা দাবি করেন—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ এক অতীন্দ্রিয় জগৎ হইতে আমাদের বুদ্ধি বা চৈতন্য দ্বারা অনুভূত মাত্র। অতীন্দ্রিয় জগৎ মূল-স্বরূপে এক বিরাট বিশ্বব্যাপী মন। জীনস্ বলেন, 'বাহ্যজগৎ এই প্রকারে ছায়া-জগতে পরিণত হইয়াছে। মনই একমাত্র চূড়ান্ত কর্তা।' এডিংটনের মতে, 'বিজ্ঞান—বংশী হইতে নির্গত সুরের ন্যায় ঘটনাকেই পর্যবেক্ষণ করিতেছে, কিন্তু সেই বংশীবাদককে আবিষ্কার করিতে পারে নাই, যাহার উপর ক্রিয়াশীলতার চেতনা আরোপ করা যায়।' এখন প্রশ্ন—রূপ-রস-গন্ধ-অভিজ্ঞতাময় জগতের স্বরূপ কি? ইহার ব্যাখ্যা নিম্নরূপে দেওয়া হইয়াছে: গোলাপফুল বা রামধনু একটি তড়িৎচুম্বক-ক্ষেত্রে তরঙ্গ ব্যতীত আর কিছু নয়, স্বভাবতঃ আকৃতি-বিহীন, স্বাদ-গন্ধ-শূন্য—নির্গুণ। উক্ত উৎপত্তি-স্থল হইতে নির্গত তরঙ্গসকল মানবেন্দ্রিয়ে বিশেষতঃ মস্তিষ্কে অনুভূতি-উৎপাদক গুণবিশিষ্ট। মস্তিষ্কে এই তরঙ্গ-প্রতিক্রিয়ায় আমরা শব্দ, স্বাদ, রং, সৌন্দর্য ও উপযোগিতার অনুভূতি লাভ করি। এক অব্যক্ত বস্তু হইতে এই সকল রূপ-গুণ সৃষ্ট হয় কিরূপে? কারণ মন দৃশ্য-পটে উপস্থিত হইয়া এই সকল ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাকে এক অনুভূতি-সমষ্টিতে রূপান্তরিত করে। সুতরাং জাগতিক সাধারণ অভিজ্ঞতার সকল গুণই মনের রচনা। ইহা স্বতই আমাদিগের বেদান্ত-মায়াবাদের দৃঢ় উক্তিই সমর্থন করে, পরে আমরা ইহা আলোচনা করিব। স্যার জেমস্ জীনস্ তাঁহার 'Mysterious Universe' নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, জড় পদার্থ এখন মনের

সৃষ্টি ও প্রকাশ রূপে বিশ্লেষণ করা হয়। জগৎ এক বিরাট গণিতজ্ঞের সৃষ্টি বলিয়া বোধ হয়। ইহা দ্বারা তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জগৎসৃষ্টিতে বুদ্ধিমূলক পরিকল্পনা ও সুবিন্যস্ত কর্মপদ্ধতি বিদ্যমান। ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ অকারণ যন্ত্রচালিত বিষয় নয়। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও বিজ্ঞানের ব্যবধান বহু বৎসরের অধ্যবসায়পূর্ণ গবেষণা ও পরীক্ষার পরে বহুলাংশে অপসারিত হইতেছে, বিশ্ব-সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পথ সুগম হইয়াছে।

বিজ্ঞানের ন্যায় বেদান্তেরও উদ্দেশ্য বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান, বহুত্বকে একত্বে লঘূকরণ, সকল ঘটনায় এক মহাজাগতিক নিয়ম প্রয়োগ। উপনিষদের সেই বহু প্রাচীন অতীতে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু ঋষি সনৎকুমারকে প্রশ্ন করিতেছেন, 'প্রভু, যাহাকে জানিলে সকলই জানা যায়, সেই বিষয়ে আমাকে উপদেশ করুন।' 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।' তাঁহারা ইহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সেই অপার্থিব সত্তা সৎ-চিৎ-আনন্দময়। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যের জীনস্ ও এডিংটনের বিরাট্ মনের (cosmic-mind) ধারণা হইতে আরও ঊর্ধ্বে। কারণ আমাদের দার্শনিকদের মতে পূর্ববর্ণিত সূক্ষ্মবস্তু মনেরও উপাদান। কারণ মনের ও বুদ্ধির অস্তিত্ব কোন অপরিবর্তনশীল প্রত্যক্ষ চৈতন্য-সত্তার উপর নির্ভর করে।

এখন প্রশ্ন ওঠে—আমরা কেন এই সত্যের অনুভূতি হারাইয়াছি?

অন্যভাবে প্রশ্ন করা যায়—জড় বস্তু কিভাবে এই বহুরূপে প্রকাশিত হয়? এস্থলে পূর্বালোচিত বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টিভঙ্গির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তর বৈদান্তিকগণ উপস্থিত করেন। তাহা সর্বজনবিদিত 'মায়াবাদ'। এই মতবাদ না বোঝার জন্যই এত বিরুদ্ধ সমালোচনা। লণ্ডনে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় স্বামীজী এইরূপ বলিয়াছিলেন: 'সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে এই মতবাদই বিশ্ব-রহস্যের যথাসম্ভব সমাধানে সক্ষম এবং এই মতবাদ-সহায়ে জীবনের মূল্য-নিরূপণে হিন্দু চিন্তাবীরগণ আধুনিকদিগের অপেক্ষা বহুপরিমাণে বেশী সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।'

জাগতিক জ্ঞান ব্যাখ্যা করিবার আমাদের মূলনীতি—মায়াবাদ। ইহার তাৎপর্য এই যে, জগৎ দেশ ও কালে বর্তমান, কিন্তু ইহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই। আমার মন, তোমার মন, অন্য সকলের মনের আপেক্ষিক সম্বন্ধে ইহার অস্তিত্ব। এই ত্রিমাত্রিক আয়তন-বিশিষ্ট জগৎ আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি, আমাদের আরও একটি ইন্দ্রিয় থাকিলে আমরা জগৎ অন্যরূপ দেখিতাম। যদি আরও একটি বেশী ইন্দ্রিয় থাকিত, আমরা ইহাকেই আবার ভিন্নরূপ দেখিতাম।

সুতরাং জগতের অস্তিত্ব আপেক্ষিক এবং আমরা জগতে যাহা কিছু দেখি, তাহা আমাদের মানসিক গঠনের সম্বন্ধ-সাপেক্ষ। এই বিশ্ব যেন পুস্তক, প্রত্যেকে পাঠ করিতে আসিয়াছে এবং নিজ ভাবানুযায়ী পাঠ করিতেছে।

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, বর্তমান কালের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি 'আত্মমুখ-শর্তাধীন' বলিয়া স্বীকার করেন। ডিমোক্রিটাস যখন বলেন, 'ব্যবহারেই ভাল মন্দ, ব্যবহারেই অম্ল ও মধুর; কিন্তু বাস্তবপক্ষে শুধু পরমাণু ও শূন্যই বর্তমান,' তখন তিনিই প্রথম অধ্যাত্মবাদের (Subjectivism) ভিত্তি স্থাপন করেন। জড় জগতের সকল গুণই এক বিষয়মুখী আকৃতিহীন বস্তুতে প্রক্ষিপ্ত

হয়, যাহার যথার্থ স্বরূপ বৈজ্ঞানিকগণ বর্ণনা করিতে অক্ষম। এই আকৃতি, সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যপূর্ণ জগৎ এক উৎপত্তিস্থল হইতে তরঙ্গে গঠিত হয়, যাহার স্বরূপ অবর্ণনীয়। ইহা এমন বস্তু, যাহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা যায় না। এই অজ্ঞেয় বিষয়-সম্বন্ধেই বেদান্ত সুনির্দিষ্ট প্রচার করিয়াছেন, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

সকল বস্তু 'কেন' কার্য করে, তাহার আদি-কারণের ব্যাখ্যা দিতে বিজ্ঞান অক্ষম। বিজ্ঞান শুধু আমাদিগকে জগতের কার্যপ্রক্রিয়া ও গতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান দেয়। কিন্তু যখন এই প্রশ্ন জাগে, জগতের তাৎপর্য কি, ক্রমবিকাশ উদ্দেশ্যমূলক কিনা, তখনই আমাদিগকে বেদান্তের আশ্রয় লইতে হইবে। পুনরায় যদি কেহ জটিলতা ও উদ্বেগ, মানসিক আঘাত ও বিচ্ছেদ দ্বারা প্রপীড়িত হয়, তবে শান্তি ও ঐক্যের উৎস বেদান্ত-ধর্মের সান্ত্বনার সাহায্যই তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ দর্শন ও বিজ্ঞানকে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ বিষয় মনে করেন না। বরং এক সুসম্বদ্ধ জ্ঞানের অংশরূপে এককে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেওয়া হয়। রাজনীতিবিদ্ ও কূটনৈতিকদিগের দ্বারা ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত না হইয়া যাহাতে বিজ্ঞান মানব-কল্যাণ-সাধনে প্রযুক্ত হইতে পারে, সেইজন্য বর্তমান কালের মানুষকে বেদান্তের শিক্ষায় বিশ্বের একত্ব ও মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অবশ্যই অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। যদি এইভাবে বেদান্ত ও বিজ্ঞান এক লক্ষ্যাভিমুখী হয়, তবে পৃথিবী যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না হইয়া সুখপূর্ণ আনন্দময় ভূমিতে পরিণত হইবে। বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতির শক্তির উপর আধিপত্য লাভ করিয়া যান্ত্রিক প্রগতি দ্বারা জীবনকে আরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ও স্বাস্থ্যকর করিবে এবং বেদান্ত আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রীর প্রচেষ্টা উচ্চতর পথে পরিচালিত করিবে।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মন সর্বদা নূতন সত্য-দর্শনের জন্য প্রস্তুত—পূর্ব সিদ্ধান্ত সন্দেহ করিতে এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধন করিতেও সর্বদা প্রস্তুত। বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিয়া, উপযুক্ত পরীক্ষা করিয়া যে কিছু গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক।

উপনিষদের সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ ঐরূপ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা অকুতোভয়ে সত্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন, পূর্বের সকল নৈতিক আদর্শ ও ধর্মের ধারণা সন্দেহ করিয়া যুক্তিমূলক অনুসন্ধানের পথে অগ্রসর হইয়া যে দৃঢ়মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা মাণ্ডুক্য-কারিকায় ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে।

বৌদ্ধদিগের যুক্তিবাদ এবং অন্যান্য দার্শনিক মতের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহান্ দার্শনিক আচার্য শঙ্কর সমগ্র ভারতে কৃষ্টির এক বিজয়-অভিযান পরিচালনা করেন। বর্তমান কালে বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ খ্যাতিমান্ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্দিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বেদান্তের উচ্চতম জ্ঞানের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহাদের অধিকাংশকেই ঐ মতের সারবত্তা উপলব্ধি করান। ভারতবাসীর পূর্বপুরুষদিগের সমৃদ্ধ কৃষ্টি যুক্তিপূর্ণভাবে পরিবেশন করাই রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী-প্রচারকদিগের আমেরিকা, ইওরোপ, পূর্ব আফ্রিকা ও মরিশাসে প্রচেষ্টার সাফল্যের কারণ। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, শাস্ত্রে প্রচারিত তত্ত্ব অযৌক্তিক নয় এবং যদি গোঁড়ামি পরিত্যাগ করা হয়, তবে মানুষকে ধর্মের পরিবেশে আকৃষ্ট

করা সম্ভব। মহান্ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের ভাষায় 'ধর্ম ব্যতীত বিজ্ঞান অঙ্গহীন এবং বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম দৃষ্টিহীন'।

বিজ্ঞান ও বেদান্ত উভয়ই আমাদিগকে বিষয়ের বাহিরে দৃষ্টি না দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির গভীরে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে নির্দেশ দেয়। এই প্রকারেই আমরা ক্রমশঃ জগৎসম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দিকে পরিচালিত হইব। আলবার্ট আইনস্টাইন তাঁহার সর্বশেষ পুস্তকে জীবনে এক আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'জগৎ শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যাপক সত্তা, কোন ঘটনা আকস্মিক নয়, এই দৃঢ় বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃঢ় ভিত্তি।' মহাপুরুষদের আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রাকৃতিক নিয়মের সামঞ্জস্যে এক চৈতন্যময় সত্তার অস্তিত্বে প্রমাণ উপস্থিত করিয়া মহোল্লাস ও বিস্ময় সৃষ্টি করে। বর্তমান কালের সকল দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ কতক পরিমাণে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিশ্বের পশ্চাতে এক শক্তি বা নীতি কার্য করিতেছে—সৃষ্টির মহতী আদি শক্তি।

পরিশেষে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের তাৎপর্যপূর্ণ উক্তির প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি, 'উচ্চতম আদর্শবাদ ইহাই: অনন্ত স্পন্দনের অন্তরে অনন্ত শান্তি বিরাজমান।' বিখ্যাত কাব্য 'বলাকা'তে কবি রবীন্দ্রনাথও একই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, 'পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেগ।'

এই মহাজাগতিক বিরাট স্পন্দন এক অপরিণামী সত্তার অভ্যন্তরে আরম্ভ হয়—সেই অপরিবর্তনীয় সত্তা, যার আত্মপ্রকাশেই আনন্দ। ইহাই বেদান্ত-মতবাদের চরম সিদ্ধান্ত।

শ্রীশ্রীমায়ের সংসারে একদিন

শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তী

পুরো একদিন নয়। মাত্র ঘণ্টাদেড়েক সময়। সেইটুকু সময়ের মধ্যে দেখা আমার শ্রীশ্রীমায়ের সংসার!

অতীতের স্মৃতিজড়ানো পুরানো গলির সেই ঝকঝকে তকতকে সুন্দর বাড়িটি—'উদ্বোধন কার্যালয়'। মহান্ ধর্মের উদ্বোধনী বাণী মহাসঙ্গীতের মন্দ্রতালে ধ্বনিত হচ্ছে এখানে।

সেখানেই একদিন আমার আমন্ত্রণ! কেউ ডেকে বলেনি, 'এসো', তবু সবাই অন্তরে নিভৃতে গভীরে নিবিড়স্নেহে বলেছে, 'এসো, এখানে সবাই আসে

কেন আসে? মা-সারদা সবাইকে ডাকেন—কাছে পেতে চান—মায়ের মন—ছেলেমেয়েগুলো সব দূরে থাকলে বড় কাঁদে। তাই কাছে টেনে নেন তিনি। বুকভরে স্নেহের ক্ষুধা মেটান!

তাই তো আমার ছুটে যাওয়া মায়ের কাছে। মায়ের বুক জুড়োতে—নিজের মন ভরাতে।

সেদিন (৬ই জানুআরি, ১৯৬৪) সারদা-মায়ের বিশ্ববিজয়ী ছেলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি, উৎসবের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শুরু হ'ল। মায়ের সংসারে সেদিন কত ব্যস্ততা! কত সমারোহ! লক্ষ্মীছেলেরা সবাই—কেউ ফল কাটছে, কেউ ধূপ জ্বালছে, পূজা-স্থান সাজাচ্ছে, কেউ বা করছে চণ্ডীপাঠ—স্তোত্রপাঠ, কেউ করছে পূজা আরতি! কেউ বা মহাসঙ্গীতে আত্ম-মগ্ন—হৃদয়-পুরে। কারও নিভৃত প্রণাম নীরবে

অভিষিক্ত—পূজার ঘরে, বাইরে, মায়ের সামনে!

মা বসে আছেন। আছে তাঁর বড় ছেলে নরেন্দ্র—ফুল-মালা-চন্দনে, ধূপে সাজে—রূপে অপরূপ! সেখানে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালাম, শান্ত গম্ভীর পুণ্যস্নাত প্রভাত! নতশিরে প্রণাম লুটিয়ে, তাঁর স্নেহের কোলে মুখ রেখে মন জুড়োয়, চোখ জুড়োয়, আবার কত যেন ব্যাকুল হয়ে উঠি। মায়ের শান্ত, লক্ষ্মী 'দেবী'-রূপ কখনও এমন ক'রে প্রত্যক্ষ করিনি। দেখিনি এমন সাজানো সংসার!

ছেলেরা সবাই ব্যস্ত মায়ের কাজ নিয়ে। মা বসে আছেন—হাসি-ছড়ানো মুখে, শান্ত দুটি চোখ মেলে—সেই খাট, সেই বিছানা, রক্তরাঙা শাড়িতে জড়িয়ে অপরূপা সেজে!

এখানে মা এগারো বছর ছিলেন। তারপর কত এগারো বছর পায়ে পায়ে কত দূর চলে গেছে।···কিন্তু মা আমাদের ছেড়ে চলে যাননি। কেমন ক'রে যাবেন? মায়ায় জড়িয়ে আছেন মহামায়া। আর আছে তাঁর সোনার সংসার! তেমনি সাজানো, গোছানো। তেমনি ক'রে—মায়ের স্নেহ-জড়ানো, আদর ছড়ানো, শান্তি ও সান্ত্বনার ছড়াছড়ি!

তাই তো মায়ের ছেলেরা সবাই সেখানে আনন্দে পরিপূর্ণ। মেয়েরা আসছে যাচ্ছে···, যে যার সুখ আঁচল-ভরে কুড়িয়ে নিচ্ছে! মা আনন্দে বসে আছেন সারাদিন সারাক্ষণ। চোখে যেন পলক নেই। অতন্দ্র দিন, অতন্দ্র রাত। সংসারে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের শিয়রে দীপশিখার মতো জ্বলছেন, মা নীরবে একা বসে আছেন। কখনও ক্লান্ত ঘুমের রাতে বড় ছেলে নরেন্দ্রকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বলেন: আয়রে উঠে আয়! ওরা ঘুমোয় ঘুমোক, তুই ঘুমোসনে। তুই ঘুমোলে এদের ঘুম কে ভাঙাবে?

ঠাকুর একদিন আমায় কি বললেন জানিস? 'এবার তোমার কেমন চমৎকার এক ছেলে আসবে।' অনেক দিন মনে হ'ত ছেলে নেই আমার, সংসার কেমন শূন্য! তিনি বললেন, 'ওই নরেন তোমার ছেলে। লক্ষ মানিক ছেলে ওর মধ্যে ঘুমিয়ে। আর বিশ্বের জননী তুমি। কত ছেলে তোমার। কিন্তু নরেনের মতো অমনটি আর একটিও নেই।'

ছেলেরা একে একে সব উঠে পড়ে পুণ্যস্নান সেরে ব্রাহ্ম মুহূর্তে স্তোত্রপাঠে প্রার্থনাগীতে মগ্ন হয়—মঙ্গলকর্মে রত হয়।

আস্তে আস্তে সেই প্রাত্যহিক নিয়মে গড়া সেই কাজ আর মনের আনন্দ। কাজও যেন খেলা—লীলা। মায়ের সংসারে ছেলেরা খেলে বেড়ায়। মা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেন—আনন্দের কেন্দ্রে আনন্দময়ী।

এই তো দেখলাম মায়ের সংসার। শ্রীশ্রী-মায়ের স্নেহ, প্রীতি, পুণ্য দিয়ে ভরা, এ ঘর—এ সংসার! শান্ত পূর্ণ পরম পবিত্রতায় পরিচ্ছন্ন—পরিপূর্ণ আনন্দ-নিকেতন!

নিজেও ফিরি পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে নিজের ঘরে, সব যেন নতুন মনে হয়। নতুন আনন্দ যেন এখানেও খুঁজে পাই। সঙ্গে কুড়িয়ে আনা মায়ের হাসি, মায়ের স্নেহ, মায়ের আশীর্বাদ আমার জীর্ণ সংসারের চেহারা কেমন নতুন ক'রে দেয়। তাই আমার মাকে প্রণাম ক'রে বলি, 'মা গো, মা! তোমার স্নেহ, তোমার শক্তি এ বিশ্বের সব অনাচার দূর ক'রে দিক। বিশ্ব-সংসারে তোমার ক্ষমা দুষ্টদের ভাল করুক। সবাই তোমার কাছে শান্তি চেয়ে নেয় যেন। তোমার স্নেহের নিবিড় ছায়ায় শান্ত সুখী হোক—দুঃখী ও অশান্ত যারা। তুমি থেকো মা, সকলের কাছে—সকলের মনে, সকলের প্রাণে—সর্বদা সর্বত্র।'

শিবানন্দ-স্মৃতি

[জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীর ডায়েরী হইতে]

(পূর্বানুবৃত্তি)

প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার ঘরটি সাধু ও ভক্তগণের আগমনে ভরিয়া যাইত। আমিও তখন সকলের সঙ্গে তাঁহার শ্রীমুখে ভগবৎ-প্রসঙ্গাদি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতাম। তিনি একদিন বলিলেন, 'এই কাশীক্ষেত্র সবটাই শিবের। আমরা শিবের মধ্যে বাস করছি।' অপর একদিন উভয় আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ প্রাতঃকালে তাঁহাকে প্রণাম করিবার পর সহসা জনৈক সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন: দেখ, কালরাত্রে হঠাৎ ভারী মজা হয়েছে। গভীর রাত, শুয়ে আছি। হঠাৎ দেখি যে, এক শ্বেতকায় পুরুষ, জটাজুটধারী, ত্রিনয়ন—সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর দিব্য কান্তিতে চারিদিক আলোকিত হয়ে গেছে। আহা, কি সুন্দর কমনীয় মূর্তি! কি সুন্দর চাহনি! তাঁকে দেখামাত্রই ভেতর থেকে মহাবায়ু একেবারে গরগর ক'রে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পড়লাম,—খুব আনন্দ। এমন সময় দেখি যে, সে মূর্তি ক্রমে বিলীন হয়ে গেল, আর তার স্থানে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন, সহাস্যবদন। আমায় হাত দিয়ে ইসারা ক'রে বললেন, 'তোকে এখন থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে।' ঠাকুরের এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার নীচের দিকে আসতে লাগলো এবং প্রাণবায়ুর কাজও চলতে লাগলো। সবই তাঁরই ইচ্ছা। আমি কিন্তু বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর কেউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ।

অদ্বৈতাশ্রমে অবস্থানকালে তিনি সকলের সঙ্গে যে-সমস্ত মর্মস্পর্শী কথোপকথন করিতেন, তাহা শ্রবণ করিবার অপূর্ব সুযোগ আমারও ঘটিয়াছিল। আমার তৎকালীন লিখিত ডায়েরী (দিনপত্রী) হইতে কিয়দংশ মাত্র পরিবেশন করিতেছি।

একদিন মহাপুরুষ মহারাজ পূর্বোক্ত মণ্ডপ-ঘরে চেয়ারে উপবিষ্ট রহিয়াছেন; দেখিতে দেখিতে অনেক সন্ন্যাসী ও গৃহী-ভক্তের আগমনে অচিরেই ঐ স্থানটি পূর্ণ হইয়া গেল। পূর্ববঙ্গের বালিয়াটির জমিদার যামিনীবাবু আসিয়া প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার ও বাটীস্থ অন্যান্য সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিতে লাগিলেন: গুরু আর কে? এক ভগবান্ই গুরু। আমরা তো শুধু তাঁর নাম দিচ্ছি। ঠাকুর 'গুরু, কর্তা, বাবা'—এ-সব কথায় বড় রাগ করতেন। তিনি মোটেই এ-সব পছন্দ করতেন না। এক ভগবান্ই সব—তাঁর ইচ্ছা হলেই সব হয়। আবহমান কাল থেকে তীর্থাদি ও বেদ-পুরাণ শাস্ত্রাদি সবই তো রয়েছে। কালে মানুষের বুদ্ধির বিপর্যয়ের সঙ্গে ও মনের মালিন্যের জন্য শাস্ত্রাদির মর্ম মানুষ ঠিক ঠিক ধারণা করতে পারে না; তাই দেশে অনাচার, ব্যভিচার প্রভৃতি হ'তে থাকে। ভগবান্ তাই নররূপে অবতীর্ণ হন। নররূপ ধারণ না করলে মানুষ তাঁকে বুঝবে কি ক'রে? কেউ কি ভগবানকে ধারণা করতে পারে? শুধু মহাপুরুষদের আবির্ভাবেই এই সব জাগ্রত হয়। এই তো কাশী রয়েছে—বিশ্বনাথ রয়েছেন, প্রয়াগাদি তীর্থস্থান রয়েছে। ভগবান্ নররূপে এসে এ-সবই জাগ্রত ক'রে তোলেন,

তবেই তো সকলে এর মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। তখন শাস্ত্রাদির মর্মও ঠিক ঠিক লোকে বোঝে। ঠাকুর এবার তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসেছেন—স্বামীজী, মহারাজ—এঁদের কথা ভাবো দেখি! দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে মঠে একদিন ধ্যানের পর স্বামীজী নীচে নেমে এসে আমাদের সামনে বললেন, 'দেখ, এবার ভারতে যে স্রোত বইছে, তা সাত-আটশো বৎসর অপ্রতিহত বেগে চলবে। ঠাকুরের ভাব-প্রচারের জন্য কতজন এসেছে, আরও কত আসবে, তার কি ঠিক আছে!' স্বামীজী তখন খুব ধ্যান করতেন—তাঁর শরীর যাবার সময় হয়েছিল কিনা, তাই। তিনি অতি জোরের সহিত এই কথাকয়টি বললেন।

দেখ, কারও ভাব নষ্ট করতে নেই। দেখছি, অনেকে কুল-গুরুর নিকট দীক্ষাদি নিয়ে আবার আমাদের কাছে আসে। কেউ বা কৃষ্ণের ভক্ত, কেউ বা শিবকে ভজনা করে। তার ভাব রক্ষা ক'রে—সেইভাবেই তাকে থাকতে বলা হয়। ঠাকুর তো এ-সব ছাড়া আর কিছুই নন। তিনি হলেন সব; তাঁর ভিতর সব ভাবই আছে। যে যে-ভাবে থাকতে চায়, থাকুক না। তার ভাব নষ্ট ক'রে শুধু ঠাকুরের নাম দেবো কেন? এত ক্ষুদ্র গণ্ডি করা অত্যন্ত খারাপ।

অপর একদিন তিনি সেই মণ্ডপ-গৃহে বসিয়া আছেন। সন্ধ্যার আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মহাপুরুষ মহারাজ 'জয় রামকৃষ্ণ', 'জয় রামকৃষ্ণ' এই কথাকয়টি ভাবগদ্গদ কণ্ঠে প্রশান্ত-গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করিলেন। ঘরটি পবিত্র ভাবে জমজম করিতে লাগিল। আমরা পূর্ব হইতেই তাঁহার চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া রহিয়াছি। আরতি চলিতে লাগিল। সকলেই নীরব নিস্পন্দভাবে বসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের ধ্যান-চিন্তায় নিমগ্ন। আরতির শেষে আরও অনেক সাধু-ব্রহ্মচারী সেখানে আসিয়া জুটিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ সকলকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, 'চুপচাপ বসে থেকে লাভ কি? কিছু ভগবচ্চর্চা কর; কিছু জিজ্ঞাসা কর। আর না হয়, আমি ঘরে যাই।'

জনৈক ব্রহ্মচারী।—মহারাজ, ধ্যান-জপের সময় যদি মন ঠিক ঠিক ভাবে সংযত না রাখতে পারি, তবে শুধু জপে কোন ফল হবে কি?

মহাপুরুষ মহারাজ।—মনকে ধ্যানের সময় খুব ক'রে সংযত রাখতে চেষ্টা করবে। তবে শুধু জপেও ফল হয় বৈকি? জপ করতে করতে হঠাৎ একেবারে লেগেও যায়। এ আমি নিজেও দেখেছি। মনটা কেমন জানো? ঠিক দুষ্টু ছেলের মতো! সে যেমন পড়তে আরম্ভ ক'রে একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায়, পড়ায় মোটেই মনোযোগ দেয় না; কিন্তু পণ্ডিতের বেত্রাঘাতে ও শাসনে পুনঃ মনোযোগ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করে, আমাদের মনও তেমনি এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে; তবে যখন বুঝবে যে, মনটি ঐরূপ ছুটাছুটি করছে, তখনই পণ্ডিতের মতো শাসাতে আরম্ভ করবে, বলবে—মন, কেন তুমি এমন চঞ্চল হচ্ছ? তুমি তো ভগবানের ধ্যান করতে বসেছ। এখন এত বাজে চিন্তা কেন?—এমনি ক'রে মনকে চাবুক কশতে হয়, তারপর ঠিক লেগে যায়। প্রথম প্রথম ঠিকঠিক ধ্যান না হলেও জপ ছাড়তে নেই।

অন্য একজন ব্রহ্মচারী।—আচ্ছা মহারাজ, আমরা যে ঠিক সাধন-ভজনের পথে এগিয়ে যাচ্ছি, তা কি ক'রে বুঝবো?

মঃ মঃ।—তোমার মনই বুঝিয়ে দেবে। ভেতরে দিন দিন আনন্দ অনুভব করবে। ভগবচ্চিন্তা সর্বদা করতে ইচ্ছা হবে। ভেতরে

সকলের প্রতি ভালবাসা, প্রীতি, সহানুভূতি জাগবে। দরিদ্রনারায়ণের প্রতি ভালবাসা হবে। কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগুলি দিনদিন কমে যাবে—এই তো সব tests; এছাড়া আর কি test হবে? সাধন-ভজনের দিকে যে যত এগিয়ে যাবে, তার ভেতরে সদ্গুণগুলি তত বিকাশ পাবে।

ব্রঃ। মহারাজ, সাধন-ভজনের জন্য কিছুদিন সঙ্ঘের সকলের নিকট থেকে একটু দূরে স'রে নিরালম্ব হয়ে থাকা উচিত কি না?

মঃ মঃ। হ্যাঁ, ভাব দৃঢ় হ'লে ঐরূপ করা ভাল। যখন সমস্ত দিনরাত ঐভাবে মশগুল হয়ে থাকতে ইচ্ছা হবে, তখন অমনিভাবে কিছুদিন বাইরে কাটানো ভাল। কখনও ধ্যান-জপ, কখনও পাঠ, শাস্ত্রাধ্যয়নাদি ক'রে সব সময় ঐরূপ থাকতে পারলে ভাল, এতে ভাব পোষ্টাই হয়। তবে তোমরা যে সঙ্ঘের ভেতর থেকে কাজ ক'রছ, এ তো তাঁরই (ঠাকুরেরই) কাজ! সংসার ছেড়ে যে এখানে এসেছ, তাঁর কাজের জন্যই তো এসেছ। ধ্যান-জপের চেয়ে এ কাজ কি কম? আমি তাঁরই জন্য কাজ করছি, তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনি করছি—এইভাবে যদি কাজ করতে পার, তবে তা কি ধ্যান-জপের চেয়ে কম হ'ল? ধ্যান-জপই আর কি! এই কাজেই যে তাঁর ধ্যান-জপ হয়ে যাবে। পায়খানা-সাফ থেকে পূজা পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঠাকুরের কাজ; কোনটিই ছোট নয়। তোমরা তো আর সংসারের স্ত্রীপুত্রের জন্য চাকরি ক'রছ না। তাঁর কাজের জন্যই সব ছেড়ে এসেছ। তাঁর কাজ ক'রে যাও—তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন।

ব্রঃ। মহারাজ, এই কাজকর্ম করতে হ'লে সকাল-সন্ধ্যায় ধ্যান-জপ করা ঠিক নয় কি? নইলে কাজের ঠিক spirit (ভাব) রক্ষা করা যাবে কি?

মঃ মঃ। ধ্যান-জপ করতে হবে বৈকি? তা না হ'লে কোন ভাব না নিয়ে শুধু রোগীর সেবা করলে কি হবে? ধ্যান-জপ করতে হবে এবং কাজও করতে হবে—দুই-ই চাই। তুমি মলমূত্র পরিষ্কার ক'রছ, রোগীর পথ্যাদির ব্যবস্থা ক'রছ, সব-রকম শুশ্রূষা ক'রছ,—কিন্তু যদি সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান-জপ না থাকে—আর নারায়ণ-জ্ঞান না থাকে, তবে এ সেবা ক'রে আর কি হবে?

জনৈক সন্ন্যাসী।—মহারাজ, যদি কেউ ধ্যান-জপ না ক'রে ঠাকুরের কাজ করছি, এইভাবে সর্বক্ষণ কাজ ক'রে যায়, তবে সে সাধন-পথে অগ্রসর হ'তে পারবে কি?

মঃ মঃ। কেন পারবে না? যদি সব সময়ই মনে হয় যে, তাঁর কাজ করছি, তবে ঐ তো ধ্যান-জপ হয়ে যাচ্ছে। তখনই ঠিক ঠিক কাজ হ'ল। work-টাই তখন worship-এ দাঁড়ালো। তবে প্রথম অবস্থায় এ ভাবটি যদি দৃঢ় না হয়, তবে ধ্যান-জপ করতে হবে। পরে ঐ ভাব দৃঢ় হ'লে কাজের ভেতরেই সর্বক্ষণ স্মরণ-মনন হ'তে থাকবে আর পৃথক্ ধ্যান-ভজনের প্রয়োজন হয় না।

জনৈক সাধু।—মহারাজ, একজনের কতক্ষণ ধ্যান-ভজন করা দরকার?

মঃ মঃ। সে তুমি নিজেই বুঝবে কতক্ষণ করা উচিত, কি না উচিত। তোমার যতক্ষণ ভাল লাগে, ততক্ষণ করবে। যখন ভাল লাগবে না, তখন পাঠাদি করবে বা একটু বেড়াবে।

স্বামী জগদানন্দ।—মহারাজ, আমাদের বেদান্ত-ক্লাসে অনেকের ভেতরে একটু খটকা লেগেছে যে, ভগবান্ যদি নির্গুণ ব্রহ্ম হন, তবে তাঁকে সাকার গুণময় ভেবে ভক্তেরা উপাসনা বা ভক্তি করবে কি ক'রে?

মঃ মঃ। কেন, জ্ঞানপথে কি ভক্তি নেই? আত্মার স্বরূপানুসন্ধান করাতে কি ভক্তি নেই? তিনিই আত্মজ্যোতি পরব্রহ্ম আবার তিনিই ভগবান্—তিনিই তো সব হয়েছেন। বেদান্ত পড়লে তো ভক্তির হানি হবার কথা নয়, বরং বাড়বে। তাঁকে যে যে-ভাবে চিন্তা করুক, তিনি তো সেইভাবেই তার নিকট প্রকট হন। চরমে সকলেই এক অবস্থায় এসে পড়বে।

স্বামী জগদানন্দ।—মহারাজ, যাদের জ্ঞান হয়, তাদের কাছে এ জগৎটা কিরূপ মনে হয়?

মঃ মঃ। সে তো পৃথক্ জগৎ দেখতেই পায় না—সবই ব্রহ্মময় দেখবে। জ্ঞানচক্ষু খুলে গেলে আর বাহ্যজগৎ তার কাছে পৃথক্ বস্তু ব'লে বোধ হয় না—সর্বত্র একাত্মানুভূতি হবে

জনৈক ভক্ত। মহারাজ, আমাদের সংসারী জীবের উপায় কি? আমরা তো আর ঘর-সংসার ছেড়ে আসতে পারিনি!

মঃ মঃ। তাতে কি হয়েছে? তিনি তো সব জায়গায়ই আছেন। তবে সংসারে থেকেও সর্বক্ষণ তাঁরই কাজ করছি, এই ভাবটা রাখতে পারলে খুব ভাল। অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যায় বাড়ির সকলকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যও তাঁর চিন্তা করতে পারলে আর ভয় থাকে না। যারা সংসারে থেকেও তাঁর স্মরণ-মনন করে, তারা খুব ভাল সংসারী; আর যারা রাতদিন টাকা-পয়সা, হিসাব-নিকেশ, স্ত্রী-পুত্র, মামলা-মকদ্দমা নিয়ে মজে থাকে, তারা ভাল লোক নয়—তারা ভগবানের দিকে এগোতে পারে না। এরা (সন্ন্যাসীরা) যেমন সব ছেড়ে দিয়ে তাঁরই কাজ করছে, আপনারাও সংসারে থেকে তাঁরই কাজ করছেন মনে ক'রে, সকাল-সন্ধ্যায় একটু বিশেষ-ভাবে স্মরণ-মনন ক'রে চললে তিনি ঠিক ক'রে দেবেন। এতে কল্যাণ হবে।

জনৈক সাধু।—মহারাজ, স্বপ্ন কি? অনেক সময় খুব ভাল স্বপ্ন দেখে বা দেব-দেবীর মূর্তি দর্শন ক'রে মনে খুব আনন্দ হয়। এ-সব স্বপ্ন কি ঠিক ঠিক হয়, না মনের ভ্রম?

মঃ মঃ। স্বপ্ন, স্বপ্নই। জাগলে কি আর দেখতে পাও? তবে ভাল স্বপ্ন দেখা তো খুব ভাল। মনে যে-স্বপ্ন আনন্দ দেয়, সে-স্বপ্ন হ'তে তো কোন দোষ নেই; বরং সহায়তাই করে। তবে যদি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখা যায়, কাকেও খুন করছি বা অন্য কোন দোষ করছি, সে-স্বপ্ন অবশ্য খুব খারাপ।

অপর একজন সাধু।—মহারাজ, যদি স্বপ্নে দেখি যে, কোন মহাপুরুষ আমাকে কিছু করবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, তাহলে সেই উপদেশ মতো কাজ ক'রব কি? যদি সেই উপদেশ আমার নিজের গুরুর আদেশের বিপরীত হয়, তাহলেও তা পালন করা উচিত কি?

মঃ মঃ। স্বপ্নে যদি প্রকৃত মহাপুরুষেরই দর্শন হয়, তবে তাঁর উপদেশ পালন করতে দোষ কি? যিনি প্রকৃত মহাপুরুষ, তিনি স্বপ্নেও কখনও অন্যায় আদেশ করেন না। যদি করেন, তবে বুঝতে হবে যে, তিনি মহাপুরুষ নন। প্রকৃত মহাপুরুষের আদেশ স্বপ্নেও কখনও নিজ গুরুর আদেশ বা উপদেশের বিরোধী হয় না।

একজন ব্রহ্মচারী। মহারাজ, দর্শনাদি না হ'লে আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি, তা বুঝব কি ক'রে?

মঃ মঃ। দর্শন কি যার তার হয়? অনেক ক্ষেত্রেই ওটা hallucination-এ দাঁড়ায়। সকলের মেধা, brainও সমান নয়। তাঁরই দর্শন ঠিক ব'লে বুঝব, যাঁর ব্যাবহারিক জীবনেও সাত্ত্বিক ভাব দেখতে পাব। তাঁর চরিত্রে কোন গলদ দেখব না—নম্র, বিনয়ী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, চরিত্রবান্ যদি তিনি হন, তবে

তাঁর দর্শনাদি ঠিক ব'লে ধরা যেতে পারে; নইলে কত জনে মাথার খেয়ালে কত কি দেখে, ওগুলো তো আর দর্শন নয়, বরং hallucination.

একজন সাধু।—নির্বিকল্প সমাধির দিকে অগ্রসর হবার পূর্বে আমাদের জীবনে এমন কতকগুলি milestone চাই, যা দেখে আমরা বুঝতে পারব যে, আমরা ঠিক ঠিক ভাবেই চলেছি এবং জীবন-পথে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্তু আমাদের জীবনে তো তা (milestone) দেখতে পাচ্ছি না।

মঃ মঃ। তোমরা যে ঘর-সংসার ছেড়ে সাধুর জীবন যাপন ক'রছ, এই জীবনে তার স্বাদ না পেলে কি আর এতদিন থাকতে পারতে? যদি ভাল না লাগে সংসারে ফিরে যাও না। তা যদি যেতে ইচ্ছা না হয়, তবে বুঝবে—এই সন্ন্যাস-জীবনেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছ। উপলব্ধি কি সকলেরই সমান হয়? তবে ত্যাগ, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, চরিত্রবল যত বাড়বে, ততই বুঝবে যে ঠিকঠিক সাধন-পথে এগিয়ে যাচ্ছ।

অপর একদিন মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার শয়নঘরে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন। বেলা তখন ৭॥টা বাজিয়াছে। মেঝেতে কয়েকজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিতে লাগিলেন: দেখ, ঠাকুর যাকে দিয়ে যা করাতে ইচ্ছা করেন, তাকে তাই করতে হয়। আমি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের কাছে যেতুম, তখন অন্য লোকের সঙ্গে বড় একটা মিশতুম না—কারণ লোকের সংস্রব মোটেই ভাল লাগত না। কিছুদিন রামবাবুর (ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের) বাড়িতে থাকতুম। ঠাকুরকে প্রচার করবার জন্য রামবাবুর মনে একটা খুব ঝোঁক এসেছে। তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই ঠাকুরের কথা ব'লে বেড়াতেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে ঐরূপ না করাতে তিনি একটু বিরক্ত হয়ে ঠাকুরের নিকট আমার সম্বন্ধে সব বললেন। ঠাকুর কিছুদিন চুপ ক'রে থেকে পরে বললেন, 'ওদের কথা আলাদা। যখন সময় হবে, তখন সবই করবে।' ঠাকুর তাঁর কাজ যে কিভাবে করাবেন, তা কি বোঝা যায়? আমরা যখন ঠাকুরের কাছে ছিলুম, তখন মনে করতুম আমরাই শুধু তাঁর কাজের জন্য এসেছি। এখন দেখছি কত ভাল ভাল ছেলে—বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, ত্যাগী ছেলেরা সব আসছে। আরও কত আসবে। এমনও আছে—যারা এখনও জন্মায়নি।

ঠাকুর এ-যুগে জগতের দুর্দশা দেখেই এসেছিলেন। কোন অবতার আবির্ভাবের পূর্বে প্রকৃতি তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়। সর্বত্রই এক তমের লীলা দেখতে পাওয়া যায়। অবতার-পুরুষ সেই তমোনাশের জন্যই সাধনা করতে আরম্ভ করেন। তাঁর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তমো-গুণের আবরণ প্রকৃতির উপর থেকে সরে যায়—সত্ত্ব ও রজোগুণের আবির্ভাব হয়। সত্ত্বের রজঃ দ্বারা কাজ চলে। তাই ঠাকুর সাধন ক'রে প্রকৃতির তমোগুণ নাশ ক'রে লীলা প্রকট করেছেন। যা দেখছ, তা তাঁর ইচ্ছাতেই হচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার, ইংরেজী ১৯২৭ খৃঃ ২৯শে নভেম্বর। প্রতিদিনের ন্যায় অনেক সাধু-ব্রহ্মচারীতে মহারাজের ঘরটি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অনেকে আবার প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছেন এবং তিনি সকলকেই শারীরিক কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে উত্তরপাড়া-নিবাসী জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণ-দর্শনে আসিলেন। তাঁহার কুশলাদি প্রশ্নের পর মহাপুরুষ মহারাজ

বলিলেন, 'আপনার শরীর বেশ সুস্থ বোধ হচ্ছে। আপনারা কে কে কাশীতে থাকেন?'

ভদ্রলোক। আমি ও আমার স্ত্রী কয়েক বৎসর যাবৎ কাশীবাস করেছি, ছেলে-পিলে নেই। এখন pension পাচ্ছি।

মঃ মঃ। এই বয়সে কাশীবাস করছেন—এ তো পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগবানের ধ্যান-ধারণা, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন, নিত্য গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা মায়ের দর্শন—এই তো চাই।

ভদ্রলোক। এখানে শরীরটা বেশ থাকে, মহারাজ। আয়ুটাও বেড়ে যায় ব'লে মনে হয়।

মঃ মঃ। হঁ্যা, কাশীতে কি যেন কি একটা আছে। প্রায়ই দেখা যায়, বৃদ্ধবয়সে অনেকেরই কাশীবাসকালে শরীর বেশ সুস্থ হয়। নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে। তবে আয়ু-বৃদ্ধি বুঝি না। যার যে সময় নির্দিষ্ট আছে, তাকে তখন যেতেই হবে—এদিক ওদিক করবার জো নেই। অদৃষ্ট মানতে হয়। আর আয়ু দু-এক শো বছর বেড়েই বা কি লাভ? ভগবানে যদি বিশ্বাস ভক্তি ভালবাসা না হ'ল, তবে এ দেহধারণে ফল কি? চাই জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। মানুষের যে কর্তব্য, তা যদি সে না করে, তবে শরীরের সুস্থতাই বলুন, বা আয়ু বৃদ্ধিই বলুন, কিছুতেই কিছু হয় না।

এমন সময় জনৈক সন্ন্যাসী একতোড়া ফুল একটি ফুলদানিতে সাজাইয়া আনিয়া মহারাজের টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, 'হলদে ফুলটাই সব মাত করেছে। কি চমৎকার গন্ধ! সাধুদের মধ্যে যে ভগবৎপ্রেমিক, সে সকলকে মাতিয়ে রাখে। গ্রামে বা শহরে যেখানেই হোক, একজন লোকও যদি বৈরাগ্যবান্ ও ভগবদ্ভক্ত হয়, তবে চারিদিকের সকলেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষগণ যখন যেখানেই অবস্থান করেন, তাঁহারা তাঁহাদের উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে সকলের মনের সংশয় ও দুর্বলতা দূর করিয়া তাহাদিগকে অমৃতপথের অভিযাত্রী করিয়া তোলেন। আমিও এই পবিত্র আবহাওয়ার মধ্যে কিছু দীর্ঘকাল থাকিবার ও সঙ্গে সঙ্গে তপস্বী সন্ন্যাসী স্বামী শান্তানন্দ মহারাজের অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা ও আধ্যাত্মিক জীবনগঠনমূলক উপদেশাদি লাভ করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলাম।

ক্রমে ১৯২৭ খৃঃ ১৫ই ডিসেম্বর সমাগত হইল। জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র জন্মতিথি-দিবস উদ্‌যাপনের বিশেষ আয়োজন চলিতে লাগিল। অদ্বৈতাশ্রমের দু-এক জন শুভাকাঙ্ক্ষী সন্ন্যাসী পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের নিকট ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আমাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্বে ১৯২৬ খৃঃ বেলুড় মঠে Working Committee (কার্যকরী সমিতি) স্থাপিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, মঠে যোগদান করিবার তিন বৎসর অতীত না হইলে কাহাকেও ব্রহ্মচর্য দেওয়া হইবে না। এই অবস্থায় আমার পক্ষে ব্রহ্মচর্য-গ্রহণের প্রার্থনা করা যে অত্যন্ত অসমীচীন, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি বন্ধু-বর্গের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমি একদিন পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার বিনীত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলাম, 'যদি নির্দিষ্ট সময় অতীত হবার পূর্বে আমাকে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত করলে আপনাকে কোন প্রকার অসুবিধায় পড়তে হয় এবং কার্যকরী সমিতির সদস্যগণের নিকট হ'তে কোন প্রকার অনুযোগ

শুনতে হয়, তবে এই ব্রহ্মচর্য-ব্রতে আমাকে দীক্ষিত করিবার প্রয়োজন নাই।' আমার এই স্পষ্ট ও সরল উক্তিতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া একটু উত্তেজিত স্বরেই বলিয়া উঠিলেন, 'কি ব'লছ? আমি তোমাকে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত ক'রব। তুমি এজন্য ভাবিত হ'য়ো না। তুমি তো বরাবর আমাদেরই রয়েছ। কয়েক দিনের জন্য পিতামাতার সেবার জন্য বাড়ি গিয়েছিলে, তাতে কি হয়েছে? তুমি সময়মত তৈরী হয়ে থাকবে।' আমি তো অবাক্! মহাপুরুষ মহারাজের অপার স্নেহ ও করুণার কথা স্মরণ হইলে আজও আনন্দাশ্রু সংবরণ করা সম্ভব হয় না। তাঁহার এই অহৈতুকী কৃপা ও নিবিড় স্নেহস্পর্শ শ্রীশ্রীমহারাজের অভাবকেও ভুলাইয়া দিয়াছিল। যাহা হউক, নির্দিষ্ট দিনে মধ্যাহ্নে পূজা ও হোমান্তে তিনি আমাকে ও অপর দু-তিন জনকে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে এবং শেষরাত্রে কতিপয় ব্রহ্মচারীকে পবিত্র সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করিলেন। সম্মুখে প্রজ্বলিত অগ্নিতে পবিত্র হোমমন্ত্রে আহুতি প্রদান-পূর্বক আজ নবজীবন লাভ করিলাম। বস্তুতঃ একমাত্র শ্রীগুরুদেবের অমোঘ আশীর্বাদ ও পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের অপার স্নেহ ও করুণাতেই আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার জীবনে এই দুস্তর সংসার-পারাবার উত্তীর্ণ হইবার একটা অবলম্বন প্রাপ্ত হইলাম এবং আমিও দীর্ঘকাল পরে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া পরম স্বস্তি ও শান্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

অতঃপর ১৯২৮ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুআরি বুধবার পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে কাশীধাম হইতে পাটনা হইয়া ১৯শে ফেব্রুআরি বেলুড় মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে সকলের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইয়া খুবই আনন্দিত হইলাম। কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। বেলুড় মঠে বেশী দিন থাকা সম্ভব হইল না। মাদ্রাজ-মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহারাজ 'বেদান্তকেশরী' পত্রিকা-পরিচালনার জন্য আমাকে সেখানে পাঠাইবার জন্য মঠে এক জরুরী পত্র লিখিলেন এবং আমিও শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্মরণ করিয়া এবং পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শুভাশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া যথাসময়ে মাদ্রাজ-মঠে পৌছিলাম এবং পূর্বোক্ত ইংরেজী মাসিক পত্রিকা পরিচালনার গুরুদায়িত্ব-পূর্ণ কার্যভার গ্রহণ করিলাম। এই নূতন পরিবেশের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। এখানেও বিবিধ উপচারে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপূজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন সময়ে উৎসবাদি উপলক্ষে অগণিত ভক্ত-সমাগমে সুমধুর ভজন-কীর্তনে এবং বিদ্যার্থী-ভবনের বালকবৃন্দের কোমলকণ্ঠে তাল-লয়-সহকারে বেদ-পাঠে আশ্রমটি মুখরিত হইয়া ওঠে। যাহা হউক, তিন বৎসর এই মঠে ধ্যান-জপ ও স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া শারীরিক ও মানসিক উন্নতি-সাধনের অপূর্ব সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। অতঃপর সন্ন্যাস-ধর্মে দীক্ষিত হইবার এবং কিছু দীর্ঘকাল নির্জন স্থানে সাধন-ভজন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের নিকট পত্রদ্বারা আমার প্রার্থনা নিবেদন করিলাম। তিনি আমার এই সদিচ্ছা অবগত হইয়া সানন্দে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া যাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের পূর্বেই আমি বেলুড় মঠে পৌছিতে পারি, মাদ্রাজ-মঠের অধ্যক্ষ মহারাজকে সেই মর্মে একখানি পত্র লিখিলেন এবং আমি তদনুযায়ী অধ্যক্ষ মহারাজ ও অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বেলুড় মঠে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের চরণ-প্রান্তে উপনীত হইলাম। (ক্রমশঃ)

'সত্য তুমি মৃত্যুরূপা'

শ্রীরমানাথ ঘোষ

চিত্তচিতার মহাশূন্যে
        নাচছে শ্যামা তালে তালে,
সেই নাচই যে প্রাণের ছন্দ
        বুঝবে যেদিন—আপন ভুলে,
সেদিনই যে ব্রহ্মরন্ধ্রে
        ঝরবে সুধা সহস্রারে—
তখন রে তুই মায়াময়ীর
        মহামায়ার মায়ার পারে।
অষ্টপাশের বাঁধন হ'তে
        মুক্ত হওয়াই মাকে পাওয়া—
সব সাধই তোর মিটে যাবে
        শেষ হবে সব দেওয়া-নেওয়া।

ডুবতে কি আর সবাই পারে
        রূপ-তরঙ্গে যায় রে ভেসে—
রূপসায়রে ডুব দিয়ে রে
        কুণ্ডলিনী অট্ট হাসে।
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা
        সে-রূপ সবাই সইতে নারে—
তাই বুঝি শ্যাম বনমালী
        সৃষ্ট হ'ল সুখাধারে,
        তোমার কায়ার ছায়া ঘিরে;
সেও নাচে আর বাজায় বাঁশী
        তোমার নাচের তালে তালে
হৃদয়-চিতার মহাশূন্যে
        নাচছে শ্যামা তালে তালে।

শান্তিপর্বের শিক্ষা

অধ্যাপক শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য

(১) বিষয়সূচনা

শান্তিপর্ব মহাভারতের উপনিষৎ

প্রাচীন পরিভাষায় মহাভারত—ইতিহাস। কাব্য-হিসাবেও ইহার মর্যাদা অপূর্ব ও অনুপম। ইহার অনুক্রমণিকায় বলা হইয়াছে ঃ

'অস্য কাব্যস্য কবয়ো ন সমর্থা বিশেষণে।
বিশেষণে গৃহস্থস্য শেষাস্ত্রয় ইবাশ্রমাঃ॥

—অন্য তিন আশ্রম যেমন গৃহস্থাশ্রমের স্বরূপ-নির্ধারণে সমর্থ নয়, কবিগণও এই কাব্যের বিশেষণে তেমনি অশক্ত। ইহার আঠার পর্বের মধ্যে শান্তিপর্ব দ্বাদশ। ইহা ভারত-দ্রুমের ফল (১।১।৯২)। ইহাকে মহাভারতের 'উপনিষৎ' বলা যাইতে পারে। উপনিষৎ বেদান্ত অর্থাৎ শ্রুতির শিরোভাগ এবং নিগূঢ়তম তত্ত্বের আকর, তাই রহস্য-গ্রন্থ। মহাভারতের বিরাট অঙ্গে শান্তিপর্বও সেইরূপ। পঞ্চম বেদ-স্বরূপ এই মহাকাব্যের উপাদান—আখ্যান ও উপাখ্যান, উপমা ও উপদেশ। এই তিনটি ধাতু সর্বত্র বিসর্পিত থাকিলেও বিভিন্ন অংশে মাত্রার তারতম্য আছে। শান্তিপর্ব ও অনুশাসন-পর্বে উপদেশই প্রধান, তাই এ দুইপর্ব ধর্মশাস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত।

মূল আখ্যানাংশ

শান্তিপর্বের মূল আখ্যান-অংশ সংক্ষিপ্ত। উহা উপদেশরাশির পটভূমিকা-স্বরূপ। কুরুক্ষেত্রের মহাসমর শেষ হইয়াছে। নিহত স্বজনগণের জন্য গঙ্গাতীরে একমাস অশৌচ-কাল যাপন করিয়া পাণ্ডবগণ রাজধানী ফিরিবেন। কিন্তু অপূর্ব বীরত্ব সত্ত্বেও কর্ণের আজীবন ভাগ্য-বিপর্যয়ে এবং সহোদর হইলেও অর্জুন-হস্তে তাহার নিধনে যুধিষ্ঠির শোকে ও মনস্তাপে কাতর ও অবসন্ন। যুদ্ধের নৃশংসতায় তাঁহার মনে ধিক্কার আসিয়াছে। ক্ষত্রিয়-ধর্ম ত্যাগ করিয়া বনে তপস্যা করাই কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে। এদিকে অনুজ ভ্রাতারা ও মহিষী দ্রৌপদী একবাক্যে এই নির্বেদের নিন্দা করিতেছেন। মহর্ষি ব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি তাঁহাকে রাজোচিত কর্তব্য-পালনে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর হইতে পাপের গ্লানি কিছুতেই যাইতেছে না। অবশেষে তিনি মনঃস্থ করিলেন, পিতামহ ভীষ্মের নিকট সবিস্তারে ধর্মের তত্ত্ব শুনিবেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে পুরোবর্তী করিয়া সকলে রাজধানীতে ফিরিলেন। এই সন্ধিক্ষণে দুর্যোধনের বন্ধু রাক্ষস চার্বাক তপস্বী ভিক্ষুর ছদ্ম-বেশে রাজপ্রাসাদে বিনানুমতিতে প্রবেশ করিয়া নানা কটুবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে ধিক্কার দিতে লাগিল—চার্বাক যেন তাঁহার অন্তরের গ্লানির প্রত্যক্ষ প্রচণ্ড মূর্তি। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণ এই দুর্বিনীতের ধৃষ্টতায় রুষ্ট হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন শোক ও সন্তাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্মপুত্র সিংহাসনে আসীন হইয়া অভিষেকের বিহিত সকল অনুষ্ঠান পালন করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞামত সকল কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পিতামহের উপদেশ-প্রার্থনা

উত্তরায়ণের প্রারম্ভেই শরশয্যাগত ভীষ্ম পুরুষোত্তমকে স্মরণ করিলেন। ব্যাস বসিষ্ঠ প্রভৃতি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, কৃপ, যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুজেরা সকলে রথারোহণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ওঘবতী

নদীর সৈকতে শরশয্যায় শয়ান কুরু-পিতামহ। কিছু কাতরভাবে শরীর-মনের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া অর্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদেবকে বলিলেন, রাজ্যমধ্যে সহস্র রমণী-পরিবৃত হইয়া যিনি সম্পূর্ণ আত্মজয়ী ছিলেন, এখন স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে রোধ করিয়া শরকণ্টকে শয়ান থাকিয়া দেহধারণ করা জগতে শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার দেহান্তের আর ছয় দিন বিলম্ব। জ্ঞাতিবধে সন্তপ্ত যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট ধর্মের সকল তত্ত্ব জানিতে আসিয়াছেন, অন্যথা তাঁহার দেহের সহিত এই অতুলনীয় জ্ঞানরাশি লুপ্ত হইবে। ভীষ্ম যুক্তকরে বলিলেন, সম্মুখে স্বয়ং বাক্‌পতি নারায়ণ—এখনও তাঁহার কৃপাতেই জীবন রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বাহ্যজ্ঞান গতপ্রায়, বাক্‌শক্তি ক্ষীণ—বিশ্বকর্তা নিখিল গুরু উপস্থিত থাকিতে তিনি কি বলিবেন? পুরুষোত্তম আশ্বাস দিলেন—সকল ক্লেশ ও মোহ, ক্ষুধাতৃষ্ণা অবসাদ দূর হইবে—তাঁহার বরে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও জ্ঞানচক্ষু সর্বত্র প্রসারিত হইবে। প্রথম দিনের শেষে সন্ধ্যাকালে সকলে স্বস্থানে ফিরিলেন। পরদিন সকলে পুনরায় সমবেত হইলে অভিশাপের ভয়ে সঙ্কুচিত যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিয়া পিতামহ বলিলেন—গুরু ও স্বজন অন্যায় যুদ্ধ করিলে তাহাদিগের নিধনে অধর্ম নয়, ধর্মই হয়। তখন ভীষ্মের চরণ ধারণ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রশ্ন ও উত্তরেই শান্তি- ও অনুশাসন-পর্বের বিস্তৃত উপদেশমালা। ১৩,৭৩৭ শ্লোকে শান্তিপর্ব, বনপর্বে ১১,৮৫৯ শ্লোক, সুতরাং দৈর্ঘ্যে শান্তিপর্ব বিপুল মহাভারতের অংশ।

নামের সার্থকতা

এই উপদেশরাশিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এই পর্বে দেখানো হইয়াছে তিনটি পর্বাধ্যায়—যথা: রাজধর্ম, আপদ্‌ধর্ম ও মোক্ষ-ধর্ম। কিন্তু পরস্পর অসঙ্কীর্ণ এরূপ তিন কোঠায় উপদেশগুলি পৃথক্ করা অসম্ভব। কতকগুলি বিষয়ে বিধিনিষেধ সর্বত্র বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, যেমন—বর্ণ ও আশ্রম, আপদ্‌বৃত্তি, ত্যাগ, সংযম, বৈরাগ্য, কর্মফল, দেবতত্ত্ব ও দেবস্তুতি, সৃষ্টির বিবরণ। আচার ও অনুষ্ঠানের বিধি-নিয়ম মূল প্রতিপাদ্য হইলেও নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষই জীবনের পরম কল্যাণরূপে বনস্পতির মতো সর্বত্র ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের নির্বেদ বা বিষয়-বিরাগে এই পর্বের সূচনা এবং উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের মহিমা-বর্ণনে ইহার উপসংহার। অধ্যায়-হিসাবে রাজধর্মে ১৩০, আপদ্‌ধর্মে ৪৩; এতদ্ভিন্ন অবশিষ্ট ১৯২ অধ্যায় মোক্ষধর্মের বিবরণে অন্তর্ভুক্ত। কুরুক্ষেত্রের পরিণামে যুধিষ্ঠিরের যে মনস্তাপ, তাহার নিবৃত্তি দেখানো হইয়াছে এবং সমাজের মধ্যে শান্ত পরিবেশে কল্যাণ-পরিবেশন ইহার সর্বোচ্চ লক্ষ্য। সুতরাং ঐ-সব দিক্ দিয়াই ইহার 'শান্তিপর্ব' নাম সার্থক। উপদেশগুলি বিমিশ্রভাবে সাজানো বলিয়া একটি সরল রেখা ধরিয়া ইহার তত্ত্ব বিবৃত করা দুরূহ। নিপুণ সমালোচকগণের অভিমত এইরূপ যে, মহাভারতে মূলতঃ কাব্য বা ইতিহাস থাকিলেও পরে তাহাই বিস্তারিত হইয়া ধর্মশাস্ত্রের আলম্বন হইয়াছে। ইহাতে বৈদিক এবং বেদোত্তর উপাখ্যান ও বংশবৃত্তান্ত মিলিত হইয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনীতি; দর্শন ও কবিকল্পনা জড়িত হইয়াছে।

কাব্যগুণ তত্ত্ববিবৃতির উপযোগী

শান্তিপর্বে প্রধানতঃ মোক্ষধর্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে—গ্রন্থের বৃহত্তর ভাগ—৩৬৫ অধ্যায়ের মধ্যে ১৯২টি মোক্ষপর্বাধ্যায়ের অন্তর্গত। বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য—ইহার অন্তর্গত

তত্ত্ব ও উপদেশের সমীক্ষা। ইহাতে যে-সকল কাব্যগুণ আছে, তাহার বিবরণ সাহিত্য-বিশ্লেষণের অঙ্গ। কিন্তু এক্ষেত্রে কাব্যগুণগুলিও প্রধান আলোচ্যের পরিপোষক—তাহারই রঙে রঞ্জিত। মাঝে মাঝে নিবিষ্ট হইয়াছে কয়েকটি বিস্তৃত উপমা। কতকটা Homeric বা Epic simile-জাতীয়—এগুলি পাঠকমাত্রকে চমৎকৃত করে। অদ্ভুত, শান্ত বা করুণরসে সম্পৃক্ত বর্ণনাগুলি—মহাকবির অভিপ্রায় বৈরাগ্য, নির্বেদ, মুমুক্ষার উদ্রেক। দৃষ্টান্ত—২৪ ও ৯৫ অধ্যায়ে রণ ও যজ্ঞের তুলনা। মনে হয় যেন বৈদিক কর্মকাণ্ডের পরিভাষায় শৌর্যের উদ্দীপন—ব্রাহ্মণ্যের পরিবেশে ক্ষাত্রধর্মের সঞ্জীবন করা হইয়াছে।

যজ্ঞের রূপকে যুদ্ধচিত্র

রাজা হয়গ্রীব শত্রুসংহারে অসমর্থ ও ক্রমশঃ নিঃসহায় হইয়া পরিশেষে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। যথাসাধ্য নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সংগ্রামের পর প্রাণত্যাগ করিয়া তিনি স্বর্গসুখের অধিকারী হন। এই যুদ্ধ-যজ্ঞের বর্ণনায় কবি বলিতেছেন ঃ

ধনুর্যূপো রশনা জ্যা শরঃ স্রুক্
স্রুবা খড়্গো রুধিরং যত্র চাজ্যম্।
রথো বেদী কামজো যুদ্ধমগ্নি
শ্চাতুর্হোত্রং চতুরো বাজিমুখ্যাঃ॥
হুত্বা তস্মিন্ যজ্ঞবহ্নাবথারীন্
পাপান্ মুক্তো রাজসিংহস্তরস্বী।
প্রাণান্ হুত্বা চাবভৃথে রণে স
বাজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে॥ (৩১-৩২)

—সেই যুদ্ধে তাঁহার ধনু ছিল যূপকাষ্ঠ, ধনুর জ্যা (ছিলা) হয় বলির পশু বাঁধিবার রজ্জু, বাণ স্রুক্ (কুশী), খড়্গ স্রুবা (কোশা), শোণিত হবিঃ, রথ যজ্ঞবেদি, যুদ্ধ—স্বেচ্ছায় প্রজ্বালিত অগ্নি, চারিটি প্রধান ধূর্য অশ্ব—চারিজন হোতা। পরাক্রান্ত রাজশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীব সেই যজ্ঞের অগ্নিতে প্রথমে শত্রুশ্রেণীকে ও পরে নিজ প্রাণ আহুতি দিয়া পাপনির্মুক্ত হন এবং যুদ্ধশেষ-রূপ যজ্ঞসমাপ্তি-স্নানে পবিত্র হইয়া দেবলোকে উপনীত ও উল্লসিত হন।

রণক্ষেত্রে যজ্ঞাঙ্গ

৯৮ অধ্যায়ে এই রূপক আরও বিস্তৃত এবং বীরত্বব্যঞ্জক হইয়াছে। নাভাগ-পুত্র রাজা অম্বরীষ স্বর্গে গিয়া দেখেন—সেনাপতি সুদেব অগ্রেই সেখানে উপনীত। সামান্য সৈনিক হইতে তাঁহারই সেনাধ্যক্ষ হন এই সুদেব। অসংখ্য রাক্ষস-দলে প্রভুকে আক্রান্ত দেখিয়া এবং তাঁহার জয় নিশ্চিত করিবার জন্য সুদেব মহেশ্বরের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে দুশ্চর তপস্যা করেন এবং তাঁহার বরে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়া সংগ্রামে প্রভুর জন্য প্রাণোৎসর্গ করেন। সেই দারুণ যুদ্ধ ৪২ হইতে ৭৫ শ্লোক পর্যন্ত দীর্ঘ যজ্ঞের রূপকে বর্ণিত। উপমায় বলা হইয়াছে—হস্তিসকল ঋত্বিক্। অশ্বগণ অধ্বর্যু, শত্রু-দেহের মাংস হবিঃ এবং শোণিত ঘৃত। শৃগাল ও শকুনি প্রভৃতি সদস্য, অস্ত্রসমূহ স্রুক্, তীক্ষ্ণ বাণ স্রুব, খড়্গাকৃতি কাষ্ঠ। শত্রুসৈন্য-গাত্রস্রুত রক্তধারা পূর্ণাহুতি, সৈন্যগণের রণরব সামগান, বীরগণ শ্যেনচিত অগ্নি, নিহত শূরগণের কবন্ধ খদির-যূপ, গজারূঢ়গণের স্পর্ধিত আহ্বান বষট্‌কার দুন্দুভি উদ্গাতা, আততায়িবধের জন্য উৎসৃষ্ট প্রিয়-শরীর অনন্ত দক্ষিণা, রক্তপ্রবাহ যজ্ঞান্ত স্নানের বারি, ঘনরক্ত নদীর ঘাট, ভেরীগুলি ভেক কচ্ছপ, রক্ত-মাংস কর্দম, বীরগণের অস্থি কঙ্কর, বিকীর্ণ কেশ শৈবাল, ছিন্ন ভিন্ন অশ্ব রথ ও হস্তী সেতুস্বরূপ, ধ্বজ-পতাকা বেতস, রক্ত বারি, নিহত হস্তিসকল কুম্ভীর, খড়্গ প্রভৃতি বৃহদস্ত্র নৌকা, গৃধিণী প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী ক্ষুদ্রতরী—পরলোকমুখী

অমঙ্গলময়ী এই নদী ভীরুর পক্ষে ভয়ঙ্কর, বীরের জন্য স্বর্গে উত্তরণের উপায়। নির্ভীক যোদ্ধা শত্রুসৈন্যের পুরোভাগকে পত্নীশালা ও নিজ সৈন্যের সম্মুখাংশকে হোমদ্রব্যের আগার করেন, তাঁহার দক্ষিণে ও উত্তরে স্থিত সৈন্য সদস্য ও আগ্নীধ্র, শত্রুসেনা ভার্যা মনে হয়। সম্মুখে জনশূন্য দেশ যজ্ঞবেদি, তিন বেদ ও তিন অগ্নি সেখানে অবস্থিত। এ হেন যজ্ঞে প্রাণোৎসর্গ করিলে স্বর্গ নিয়ত। এই যুদ্ধধর্ম-পালনে তপস্যা, স্নানাদি, সনাতন ও আশ্রমধর্ম সম্পন্ন হয়।

কান্তার-রূপকে সংসার

সংগ্রামের মতোই সংসারের স্বরূপ-বর্ণনায় মহাভারতকার কয়েকটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। কান্তার, নদী ও বৃক্ষ সেই উপমান। স্ত্রী-পর্বের ৫ম অধ্যায়ে এবং শান্তি-পর্বের ২০০ অধ্যায়ে কান্তার-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। নিশ্চেষ্ট ও নির্বাক্ পুত্র নিবন্ধন। মাতা ভোগবতী বারংবার তাহাকে কর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য উপদেশ দেন; উত্তরে নিবন্ধন সংসার-গহন বর্ণনা করেন। কোন সংসারী ব্যক্তি লাভের ইচ্ছায় এই বিশাল বনে প্রবেশ করে। সিংহ-ব্যাঘ্র-হস্তিগণে পূর্ণ বৃহৎ প্রান্তরে ভয়ে আকুল হইয়া সে বিচরণ করিতেছে—দেখিতে পাইল নিবিড় বন—সকল দিকেই জালে পরিবৃত এবং মধ্যে রহিয়াছে একটি বৃক্ষলতায় বেষ্টিত কূপ। তৃণলতায় জড়িত হইয়া সে কূপমধ্যে পড়িয়া গেল। লতাবন্ধনে ঝুলিতেছে এমন অবস্থায় এক নারী তাহাকে ধরিয়া ফেলে। ফলে ঊর্ধ্বপাদ ও নিম্নশির হইয়া সে লম্বমান রহিল। ক্রমে তাহার লক্ষ্য হইল তলদেশে একটি জম্বুবৃক্ষ আর কূপের ধারে নানা ফলের গাছ—প্রচুর ফলের ভারে নামিয়া পড়িয়াছে। পুষ্পাকীর্ণ লতা গগন স্পর্শ করিয়াছে—ভ্রমর উড়িতেছে এবং ফলরাশি হইতে মধু-ক্ষরণ হইতেছে। কিন্তু সে মধুতে পিপাসা মিটিতেছে না, ফলে সে দুঃখেই মগ্ন রহিল। মাতা ভোগবতীকে এই বনটি দান করিয়া নিবন্ধন নিজে মুক্ত হইল। 'নিবন্ধন' ও 'ভোগবতী' নাম স্পষ্টই অর্থপূর্ণ মনে হয়।

নদীর উপমায় সংসার-বর্ণনা

সংসার নদীর মতো—এই উপমা ২৩২, ২৪৭ এবং ৩১৮ অধ্যায়ে—এই তিন স্থলে বিস্তৃতভাবে এবং অন্যত্র সংক্ষেপে যথা ১১শ অধ্যায়ে রহিয়াছে। পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইতে মনে হয়, লেখকের অন্তরে ইহা একটি দৃঢ়বদ্ধ কল্পনা। এই ভাবে চিরচঞ্চল, নিত্য-পরিবর্তনশীল জগতের স্বরূপ বুঝিলে জ্ঞানী মানব ইহা হইতে নিস্তার পায়—ইহাই উপদেশের লক্ষ্য।

> পঞ্চেন্দ্রিয়জলাং ঘোরাং লোভকূলাং সুদুস্তরাম্।
> মন্যুপঙ্কামনাধৃষ্যাং নদীং তরতি বুদ্ধিমান্॥

—চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইহার জল, লোভ ইহার তীর, ক্রোধ ইহার পঙ্ক, ভীষণ এই নদী, ইহাতে বিচরণ করা কঠিন, ইহা আয়ত্ত করা অসাধ্য, কিন্তু বুদ্ধিমান্ মনুষ্য ইহা উত্তীর্ণ হয়।

> স্বভাব-স্রোতসা বৃত্তমুহ্যতে সততং জগৎ।
> কালোদকেন মহতা বর্ষাবর্তেন সন্ততম্॥

—স্বভাবের স্রোত বর্তমান জগৎকে নিত্য বহন করিতেছে, কালরূপ নদের এই জল, বৎসর ইহাতে ঘূর্ণীর মতো—সেই ঘূর্ণীতে ইহা ব্যাপ্ত।

> মাসোর্মিনর্তুবেগেন পক্ষো লতাতৃণেন চ।
> নিমিষোন্মেষফেনেন অহোরাত্র জলেন চ॥

—মাসগুলি ইহার তরঙ্গ, ঋতুচক্র ইহার বেগ, পক্ষদ্বয় ইহার লতা ও তৃণ, চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষ ইহার ফেন, দিন ও রাত্রি ইহার সলিল।

> কামগ্রাহেণ ঘোরেণ বেদযজ্ঞ-প্লবেন চ।
> ধর্মদ্বীপেন ভূতানাং চার্থকাম-জলেন চ॥

—কাম ইহাতে হিংস্র জন্তু, বেদ ও যজ্ঞ তরণী, ধর্ম দ্বীপ, অর্থ ও কাম ইহার জল।

ঋতবাঙ্ মোক্ষতীরেণ বিহিংসাতরুবাহিনা।
যুগহ্রদৌঘমধ্যেন ব্রহ্মপ্রায়ভবেন চ
ধাত্রা সৃষ্টানি ভূতানি কৃষ্যন্তে যমসদনম্॥

—সত্য কথা ইহার তীর, হিংসা ইহাতে ভাসমান তরু, যুগ ইহার প্রবাহমধ্যে হ্রদপ্রায়, ব্রহ্মরূপ মহাপর্বতে ইহার উদ্ভব—ইহা ঈশ্বরসৃষ্ট জীব-সমূহকে অন্তকের আলয়ে টানিয়া লইতেছে।

দুস্তর স্রোতস্বিনী-তরণের উপায়

আবার ২৪৭ অধ্যায়ে মহর্ষি ব্যাস পুত্র শুকদেবকে কিছু পরিবর্তিত রূপে এই সংসার-নদী অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন:

সর্বতঃ স্রোতসংঘোরাং নদীং লোকপ্রবাহিণীম্
পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহবতীং মনঃসঙ্কল্পরোধসম্।
লোভমোহতৃণচ্ছন্নাং কামক্রোধসরীসৃপম্
সত্যতীর্থানৃতক্ষোভাং ক্রোধপঙ্কাং সরিদ্বরাম্॥
অব্যক্তপ্রভবাং শীঘ্রাং দুস্তরামকৃতাত্মভিঃ
প্রতর স্ম নদীং বুদ্ধ্যা কামগ্রাহসমাকুলাম্।
সংসারসাগরগমাং যোনিপাতালদুস্তরাম্
আত্মকর্মোদ্ভবাং তাত জিহ্বাবর্তাং দুরাসদাম্।

—ভয়ঙ্কর এই লোকনদী, নানা স্রোতের যোগে ইহা দুরন্ত, পঞ্চেন্দ্রিয় ইহার ভিতর হিংস্র জন্তু, মনের সঙ্কল্প ইহার তীর বা প্রান্ত, লোভ ও মোহের তৃণজালে ইহা আচ্ছন্ন, কাম ও তাহার ব্যাঘাতে উদ্দীপ্ত দ্বেষ ইহাতে সর্পের মতো সতত সঞ্চারী, ইহা হইতে তীরে উঠিবার সোপান-শ্রেণী সত্য, মিথ্যায় ইহা বিক্ষুব্ধ, কোপ ইহার কর্দম, প্রকৃতি হইতে ইহা উদ্ভূত এবং প্রখর ইহার বেগ, অসংযতগণ ইহা উত্তরণে অশক্ত, কামনার নক্র-মকরে ইহা ব্যাপ্ত, সংসার-সাগরের অভিমুখে ইহার গতি, অগাধ বাসনার জন্য ইহা দুস্তর, রসনা ইহার ঘূর্ণী-স্বরূপ, নিজ কর্মফলে জীব ইহাতে ভাসিতে থাকে—বৎস! তুমি তত্ত্ব-জ্ঞানের বলে ইহা অতিক্রম কর।

৩১৮ অধ্যায়েও শুকদেবকে ব্যাসের এইরূপ উপদেশ। এইভাবে সংসার-নদী বর্ণনা করিয়া মহর্ষি বলিতেছেন:

ক্ষমারিত্রাং সত্যময়ীং ধর্মস্থৈর্যবটরিকাম।
ত্যাগবাতাধ্বগাং শীঘ্রাং নৌতার্যাং তাং নদীং তরেৎ॥

—এই নদী মায়ামুগ্ধ জীবের পক্ষে নিতান্ত বাস্তব, ক্ষমা ইহা তরিবার নৌকার ক্ষেপণী, ধর্মে দৃঢ়তা ইহা তীরে বাঁধিবার রজ্জু, এবং ত্যাগ—তাহার অনুকূল বায়ু।

মহীরুহ রূপক

এই উপদেশের বিস্তারে মহর্ষি অন্য রূপকে সংসারে বর্ণনা করিয়াছেন—মহীরুহ-রূপে।

হৃদি কামদ্রুমশ্চিত্রো মোহসঞ্চয়সম্ভবঃ
ক্রোধমানমহাস্কন্ধো বিধিৎসা পরিষেচনঃ।
তস্য চাজ্ঞানমাধারঃ প্রমাদঃ পরিষেচনম্
যোঽভ্যসূয়া পলাশো হি পুরা দুষ্কৃতসারবান্॥
সম্মোহচিন্তা বিটপঃ শোকশাখো ভয়াঙ্কুরঃ
মোহনীভিঃ পিপাসাভির্লতাভিরনুবেষ্টিতা।
উপাসতে মহাবৃক্ষং সুলুব্ধাস্তৎফলেপ্সবঃ
আয়সৈঃ সংযুতাঃ পাশৈঃ ফলদং পরিবেষ্ট্য তম্॥

—জীবের হৃদয়ক্ষেত্রে প্ররূঢ় বিচিত্র এই কামনা-বৃক্ষ। মোহের বীজে ইহার উৎপত্তি, ক্রোধ ও অভিমান ইহার স্থূল স্কন্ধ, কর্মোদ্বেগ চারিদিকে ল সেচিবার আলবাল এবং প্রমাদ সেচিবার জল, অজ্ঞান ইহার মূল, অসূয়া ইহার পত্র এবং পূর্বকৃত পাপ ইহার সার। অবসাদ ও চিন্তা পত্রপল্লবের বিস্তার, শোক শাখা, ভয় প্ররোহ, মোহময়ী তৃষ্ণার লতায় ইহা পরিবেষ্টিত, লোভাতুর মানব স্ত্রী-পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া ভোগরূপ ইহার ফল পাইবার চেষ্টায় লৌহের মতো দৃঢ় আশার জালে ইহাকে ঘিরিয়া রাখিয়া এই কাম মহাতরুর সেবা করে।

শরীরের পুর-রূপক

এই বাসনা-বৃক্ষের উচ্ছেদে উপায় হইয়া থাকে তত্ত্বজ্ঞান ও যোগানুষ্ঠান। নিদান ও প্রতীকার উভয়ের বর্ণনাতে কবি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। ২৫১ অধ্যায় ব্যাসের উক্তি :

শরীরং পুরমিত্যাহুঃ স্বামিনী বুদ্ধিরিষ্যতে।
তত্ত্ববুদ্ধেঃ শরীরস্থং মনোনামার্থচিন্তকম্
ইন্দ্রিয়াণি জনাঃ পৌরাস্তদর্থন্তু পরাকৃতিঃ।
তত্র দ্বৌ দারুণৌ দোষৌ তমো নাম রজস্তথা
তদর্থমুপজীবন্তি পৌরাঃ সহ পুরেশ্বরৈঃ।

—মুনিরা বলেন : শরীর পুর বা নগর, বুদ্ধি তাহার কর্ত্রী, আর শরীরস্থ মন বুদ্ধির সচিব। ইন্দ্রিয়সকল পৌরজন, মনের প্রধান কার্য উহাদের জন্য শব্দাদি বিষয় আহরণ করা। সেই পুরে দুই দুর্বৃত্ত—ভীষণ দোষ—কাম ও মোহ। পুর-বাসিগণ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-রূপ প্রভুর সহিত সেখানে মনের সংগৃহীত বিষয়সকল উপভোগ করে।

যোগের রথোপমা

যোগকর্মকে রথের সহিত তুলনা করিয়া ২৩৩ অধ্যায়ে অপূর্ব বর্ণনা আছে :

ধর্মোপস্থো হ্রীবরূথ উপায়াপায় কূবরঃ।
অপানাক্ষঃ প্রাণযূপঃ প্রজ্ঞায়ুর্জীববন্ধনঃ॥
চেতনা বন্ধুরশ্চারুশ্চাচার গ্রহনেমিমান্।
দর্শনস্পর্শনবাহা ঘ্রাণশ্রবণবাহনঃ॥
প্রজ্ঞানাভিঃ সর্বতন্ত্রপ্রতোদোজ্ঞানসারথিঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতো ধীরঃ শ্রদ্ধাদমপুরঃসরঃ।
ত্যাগসূক্ষ্মানুগঃ ক্ষেম্যঃ শৌচগো ধ্যানগোচরঃ।
জীবন্মুক্তো রথো দিব্যো ব্রহ্মালোকে বিরাজতে॥

—এই যোগরথে সারথির আসন ধর্ম, লজ্জা আবরণ, উপায় ও অপায় (যোগাঙ্গ ও নিঃস্পৃহতা) ধুর্দণ্ড, অপান বায়ু অক্ষ (চক্র), প্রাণবায়ু যূপ, বুদ্ধি আয়ুঃ ও জীবন বন্ধন, চেতনা বন্ধুর ফলকের (যোজক) সদাচার নেমি বা চক্রপ্রান্ত, দর্শন স্পর্শন ঘ্রাণ ও শ্রবণ—বাহন অশ্ব, বুদ্ধি নাভি বা চক্রমধ্য, সর্বশাস্ত্র কশা, জ্ঞান সারথি এবং জীব রথী। ধীরগামী এই রথ, শ্রদ্ধা ও সংযম ইহার পুরোগামী, ত্যাগ সমীপে থাকিয়া উপকারী, চিত্তশুদ্ধি ইহার পথ, গন্তব্য ধ্যেয়ের সহিত ঐক্য, মুক্তিকামী জীব এই রথের যোজনা করে। অপার্থিব সুদর্শন এই রথ ব্রহ্মলোকের যান। উদ্ধৃত রূপকগুলি গ্রন্থের প্রতিপাদ্যের—নিঃশ্রেয়সের অনুকূলভাবে কল্পিত এবং তাহার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।



শ্রীকৃষ্ণলীলার কালানুক্রমিক সমস্যা

ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

[পূর্বানুবৃত্তি]

উত্তর-গোগৃহযুদ্ধের সময় অর্জুন উত্তরকে বলিয়াছিলেন, গাণ্ডীব ধনু ব্রহ্মা হাজার বছর, প্রজাপতি ৫০৩ বছর, ইন্দ্র ৮৫ বছর, চন্দ্র ৫০০ বছর, বরুণ ১০০ বছর ও শ্বেতবাহন অর্জুন ৬৫ বছর ধারণ করিয়াছিলেন (৪।৩৮।৪১-৪২)। এই উক্তি যেভাবে করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, ইহা একটি প্রচলিত প্রথা—এখানে অর্জুনের মুখ দিয়া আবৃত্তি করানো হইয়াছে মাত্র। উহার যদি আক্ষরিক অর্থ ধরিয়া মানে করা যায় যে, গাণ্ডীব উত্তর-গোগৃহযুদ্ধের সময় পর্যন্ত অর্জুনের নিকট ৬৫ বৎসর ছিল, তাহা হইলে ঐ যুদ্ধের সময় অর্জুনের বয়স হয় ৩৩ + ৬৫ = ৯৮। এরূপ হওয়া অসম্ভব। নীলকণ্ঠ তাঁহার পূর্ববর্তী এক টীকাকারের মত উল্লেখ করেন যে, ৬৫ বৎসরের মধ্যে কিছুটা কাল উত্তর-গোগৃহযুদ্ধের পূর্বে ও কিছুটা পরে ধরিতে হইবে। কিন্তু নীলকণ্ঠ ঐ মত স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন, 'আধারয়ৎ' এই অতীত ক্রিয়াপদ যখন ব্যবহার করা হইয়াছে, তখন ঐ সময় অর্জুন যত বৎসর উহা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার কথাই বলা হইয়াছে; আর অর্জুনের পক্ষে ভবিষ্যতে কত কাল উহা তাঁহার হাতে থাকিবে, তাহা জানা অসম্ভব। তাই তিনি ৬৫ বৎসরের এক অদ্ভুত মানে করিয়াছেন। তাঁহার মতে বর্ষা বছরে দুইবার আমে বলিয়া বর্ষ-শব্দ এখানে ছয়মাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ও ৬৫ মানে সাড়ে বত্রিশ বৎসর। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় আবার বর্ষের মানে ঋতু ধরিয়া 'পঞ্চ চ ষষ্টি বর্ষাণি' বলিতে ৫ বৎসর ও ১০ বৎসরে ষাট ঋতু একুনে ১৫ বৎসর ধরিয়াছেন। শ্লোকটিকে প্রাচীন গাথারূপে গ্রহণ করিলে আর এত কষ্টকল্পনা করিবার দরকার হয় না। পূর্বের হিসাবমত আমরা বলিতে পারি যে, গাণ্ডীব-লাভের ২৩ বৎসর পরে উত্তর-গোগৃহের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার এক বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও তাহার ৪১ বৎসর পরে অর্জুনের গাণ্ডীব পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান।

এই ৪১ বছরের মধ্যে ৩৬ বছর শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার মধ্যে ও ৫ বৎসর তাঁহার অপ্রকটের পর ধরিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পরে শ্রীকৃষ্ণ তিরোহিত হন—এই কথা মহাভারতের বহুস্থানে বলা হইয়াছে। স্ত্রীপর্বে (২৫।৪৪ সিদ্ধান্তবাগীশ সং) দেখি—শ্রীকৃষ্ণকে গান্ধারী শাপ দিতেছেন, 'ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর সমুপস্থিত হইলে তুমিও নিশ্চয়ই জ্ঞাতি, অমাত্য এবং পুত্রহারা হইয়া বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায়ে নিধনপ্রাপ্ত হইবে।' মৌষল পর্বে (ঐ ১।১৬) আছে, 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ৩৬ বৎসর উপস্থিত হইলে যদুবংশীয়গণের মধ্যে গুরুতর দুর্নীতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাই তাঁহারা কালপ্রেরিত মুষলদ্বারা পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল।' আবার ঐ পর্বেরই ৩।২০ শ্লোকে আছে যে, ছত্রিশ বৎসর উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ যেন গান্ধারীর শাপকে সত্য করিবার জন্যই প্রভাস-তীর্থে যাত্রার আদেশ দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পরও অর্জুন যে পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া

কোথাও বলা হয় নাই। তবে শ্রীকৃষ্ণের পরিজনদিগকে দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে আনিতে প্রায় সাত মাস সময় লাগিয়াছিল, তাহা ভাগবতে লিখিত আছে (১।১৪।৭)। তারপর বজ্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করা ও বেদব্যাসের উপদেশ অনুসারে তীর্থযাত্রায় বাহির হওয়ায় কিছুকাল অতীত হইয়াছিল। পঞ্চপাণ্ডব প্রথমে পূর্বদিকে লোহিত-সাগর বা ব্রহ্মপুত্রের দিকে যান। তারপর দক্ষিণ দিকে যাইয়া লবণ-সমুদ্রের তীর ধরিয়া দ্বারকায় যান। সেখান হইতে ঘুরিয়া উত্তর দিকে হিমালয়ে যান। হিমালয় পার হইয়া তাঁহারা বালুকার্ণব (গোবি মরুভূমি কি ?) ও মেরু পর্বতে যান। এই সময়ে তিনি তপস্বীর মতন পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন, সুতরাং এত দেশ ঘুরিতে পাঁচ বৎসর লাগা অসম্ভব নহে।

কিন্তু মহাভারতের সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ৫৭ বছর+৩৬ বছর একুনে ৯৩ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। ডাঃ বিভূতি-ভূষণ দত্তের মতে শ্রীকৃষ্ণ ৮৪½ বৎসর ও অর্জুন প্রায় ৮৭½ বৎসর জীবিত ছিলেন (সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা, ৪৪।২০০ পৃঃ)। এই সব হিসাবের সহিত কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের উক্তির বিরোধ দেখা যায়। বিষ্ণুপুরাণে (৩৭।১৮) আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ 'বর্ষাণামধিকং শতম্' হইল পৃথিবীর ভারহরণের জন্য প্রকট হইয়াছেন। ভাগবতে দেখি—ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিতেছেন : আপনি ১২৫ বৎসর (শরচ্ছতং ব্যতীতায় পঞ্চবিংশাধিকং প্রভো' যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন (১১।৬।২৫)। মহাভারতের বর্ণনার সঙ্গে ভাগবতের বর্ণনার যে কোন কোন স্থলে সামঞ্জস্য করা যায় না, তাহা শ্রীজীব গোস্বামীর ন্যায় প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতেরও দৃষ্টি এড়ায় নাই।

শ্রীজীব শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৭৪, পৃঃ ৪৭৭) দেখাইয়াছেন যে, ভাগবতের দশম স্কন্ধে কোন কোন লীলা কালানুক্রম অনুসারে বর্ণিত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন যে, ৭৯ অধ্যায়ে বর্ণিত বলদেবের তীর্থযাত্রা ও দুর্যোধন-বধ একই সময় ঘটিয়াছিল। অথচ তৎপরবর্তী ৮২ হইতে ৮৪ অধ্যায়ে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে যাদবগণের সহিত ব্রজের গোপগোপীদের মিলনের কথা লিখিত হইয়াছে। ঐ ঘটনা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ঘটিতে পারে না, কেন-না ঐ সময়ে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং শিশুপালের পিতা দমঘোষ সূর্যগ্রহণে স্নান করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন (১০।৮২।২৪-২৬)। কুরুক্ষেত্রে মিলন ঠিক কখন ঘটিয়াছিল, তাহা লইয়া শ্রীধর ও সনাতন গোস্বামীর সহিত শ্রীজীবের মতভেদ দেখা যায়। শ্রীধর ১০।৮২।২৬ শ্লোকের 'যুধিষ্ঠিরমনুব্রতাঃ' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, সমস্ত রাজাকে যুধিষ্ঠির রাজসূয়ে জয় করিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, শ্রীধরের মতে রাজসূয়ের পর কুরুক্ষেত্রে মিলন ঘটে। সনাতন গোস্বামী ৮২ অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, 'দ্বারকায়ামিতি শ্রীযুধিষ্ঠিরস্য রাজসূয়ং সম্পাদ্য শাল্বাদীংশ্চ হত্বা সুখং তস্যাং নিবসতি ইত্যর্থঃ।' রাজসূয় সম্পাদন করিয়া ও শাল্বাদিকে বধ করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণ সুখে দ্বারকায় বাস করিতেছিলেন, তখন পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ঘটিয়াছিল। শ্রীজীব কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৭৪) বলেন, প্রথমে সূর্যগ্রহণ-উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা (ভা ১০।৮২), তারপর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-সভা, (ভা ১০।৭৪) সেখানে শিশুপালবধ, (১০।৭৫) তারপর দ্যূতক্রীড়া, তারপর বনপর্বে বর্ণিত শাল্ববধ, (ভা ১০।৭৬) তারপর দন্তবক্র-বধ (ভা ১০।৭৮), পাণ্ডবদের বনে গমন, তারপর বলদেবের তীর্থযাত্রা (ভা ১০।৭৮) ৭৯ ও

তারপর দুর্যোধন-বধ (ভা ১০।৭৯।২৮)। তাঁহার মতে সূর্যগ্রহণ-উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা কংসবধের অধিককাল পরে ঘটে নাই। তাঁহার যুক্তি এই যে, কুরুক্ষেত্রে মিলনের সময় রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী প্রভৃতিকে দ্রৌপদী অনুরোধ করেন যে, তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কি করিয়া বিবাহ হইল, তাহা তাঁহারা বর্ণনা করুন (১০।৮৩।৭)। রাজসূয়-যজ্ঞের সময় ইঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়াছিলেন বলিয়া ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে (১০।৭১।৪২)। প্রথমে যখন দ্রৌপদীর সহিত কৃষ্ণমহিষীদের দেখা হইয়াছিল, তখনই বিবাহবিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করা স্বাভাবিক। শ্রীজীব বলেন, 'যদি কুরুক্ষেত্র-যাত্রা কংসবধের নাতিদূরবর্তী এবং রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্ববর্তী ঘটনা না হয়, তাহা হইলে যজ্ঞ উপলক্ষে বহুদিন একসঙ্গে অবস্থান করার পর কুরুক্ষেত্রে পুনর্মিলনকালে বিবাহ-বিষয়ক প্রশ্ন সঙ্গত হয় না।' তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে একটি প্রবল আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা শ্রীজীব নিজেই তুলিয়াছেন। ভাগবতে বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ বসুদেব প্রভৃতি যখন কুরুক্ষেত্রে স্নান করিতে আসেন, তখন দ্বারকা-রক্ষার ভার ছিল গদ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব, সুচন্দ্র, শুক ও সারণের সহিত অনিরুদ্ধের উপর। রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্বেই যদি কুরুক্ষেত্রে সূর্যস্নান উপলক্ষে মিলন ঘটে, তাহা হইলে অনিরুদ্ধের কি করিয়া নগররক্ষা করিবার মতন বয়স হয়? ইহার উত্তরে শ্রীজীব বলেন যে, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ অল্পকালেই যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই ইহা অসম্ভব নহে। তিনি অন্য একটি সমাধানের প্রতিও ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন যে, অনিরুদ্ধ বলিতে হয়তো এখানে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্রের কথা বলা হয় নাই—দশম স্কন্ধের শেষে (১০।৯০।৩২ ৩৩) শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশ মহারথ পুত্রদের নামের তালিকায় যে অনিরুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতে পারেন। কিন্তু 'হরিবংশ,' 'মহাভারত', 'বিষ্ণুপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও শ্রীকৃষ্ণের 'অনিরুদ্ধ' নামক বীরপুত্রের নাম পাওয়া যায় না। ভাগবতেও ঐ শ্লোকের পরেই বলা হইয়াছে যে, প্রদ্যুম্নের ঔরসে রুক্মবতীর গর্ভে অযুত হস্তীর বল-সমন্বিত অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীধরস্বামীও ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, মূলে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দামবীর্য পুত্রদের মধ্যে আঠারজন মহারথ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে সতের জন পুত্র ও একজন পৌত্রের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং শ্রীজীবের উভয় বিকল্পই দুর্বল।

ভাগবতের দন্তবক্র-বধের বর্ণনার পর শ্রীকৃষ্ণের বিক্রমসূচক শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সনাতন গোস্বামী বলেন, 'পদ্মপুরাণে'র উত্তরখণ্ডে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে দন্তবক্র-বধের পর পুনরায় ব্রজে ফিরিয়া আসিয়া দুইমাস কাল গোপনারীদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং তারপর নন্দগোপ প্রভৃতিকে পুত্রদের সহিত বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি 'বৃহদ্‌বৈষ্ণব-তোষণী'র ১০।৭৮।১৬ শ্লোকের টীকায় 'পদ্মপুরাণ' উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাগবতে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাবর্তনের কথা কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। সনাতন গোস্বামীর মতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাবর্তন ঘটে রাজসূয়-যজ্ঞের পরে, দ্যূতক্রীড়ার পূর্বে ও কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে যাত্রার পরে (তত্‌ রাজসূয়াৎ পশ্চাৎ শ্রীযুধিষ্ঠির-দুর্যোধন-দ্যূতাশ্চ প্রাগ্‌বৃত্তায়াঃ কুরুক্ষেত্র-যাত্রায়া অনন্তরং জ্ঞেয়ম্)। মহাভারতের বন-পর্বে দেখি—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, দ্যূতক্রীড়ার সময়ে হাস্তিনপুরে উপস্থিত থাকিলে কখনই তিনি ঐরূপ পাশাখেলা হইতে দিতেন না—রাজসূয়-যজ্ঞের পরে তিনি শাল্ববধ করিতে সৌভপুরীতে গিয়াছিলেন (৩।১৫।২)। ভাগবতে শাল্ববধের পরেই দন্তবক্র-বধের বর্ণনা আছে।

কিন্তু মহাভারতের উদ্যোগপর্বে দেখি, দ্রুপদ বলিতেছেন যে, পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য দন্তবক্র, রুক্মী ও পৌণ্ড্রের নিকট দূত পাঠানো হউক (৫।৪।২২)। দ্যূতক্রীড়ার তের চৌদ্দ বছর পরে এই উক্তি—তখনও দন্তবক্র জীবিত ছিলেন। এই বিরোধের সমাধান কোন প্রাচীন টীকাকারই করেন নাই

শ্রীজীব দন্তবক্র-বধের বর্ণনার মধ্যে আর একটি আপাত-প্রতীয়মান বিরোধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতের বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, দন্তবক্র-বধ দ্বারকার নিকটে ঘটিয়াছিল, অথচ পদ্মপুরাণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, কৃষ্ণের সহিত দন্তবক্রের যুদ্ধ হইয়াছিল মথুরার নিকটে এবং দন্তবক্র বধ করিয়া যমুনা পার হইয়া কৃষ্ণ নন্দব্রজে গমন করেন। শ্রীজীব উভয়গ্রন্থের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের জন্য বলেন যে, ভগবানের সংকল্প হইবামাত্র তাহা সিদ্ধ হয়, সুতরাং দ্বারকা হইতে তৎক্ষণাৎ মথুরায় আসা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। তিনি মথুরার নিকটবর্তী 'দতিহা' গ্রামের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সেইখানেই দন্তবক্র নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ গ্রামের নাম হইয়াছে 'দতিহা'। ভাগবতের বহুস্থানে (১০।৩৯।৩৩, ১০।৪৫।১৭, ১০।৪৬।২৫-২৬) আছে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন। শ্রীজীব ও সনাতন বলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের কথা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই ব্রজে একবার আসিয়াছিলেন। শ্রীজীব আরও বলেন, ভাগবতে আছে যে, দ্বারকার প্রজারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বলিতেছেন, 'হে অম্বুজাক্ষ! আপনি যখন আত্মীয়দর্শনের ইচ্ছায় 'কুরূন্' বা 'মধূন্' যান, তখন আমাদের একক্ষণের বিরহ কোটি বৎসর তুল্য মনে হয় (১।১১।৯)। এখানে শ্রীধরস্বামী 'মধূন্' অর্থে মথুরাপুর অর্থ করিয়াছেন। মথুরানগর হইতে তো শ্রীকৃষ্ণ সকল লোককেই দ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং এখানে ব্রজবাসীদের কথাই বলা হইয়াছে। এই যুক্তিবলে শ্রীজীব সিদ্ধান্ত করেন যে, দন্তবক্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাবর্তন ভাগবত-সম্মত (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ১৭৫)। ঐ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বয়স কত ছিল সে-সম্বন্ধে শ্রীজীব 'গোপালচম্পূ'তে লিখিয়াছেন যে, ভারত-যুদ্ধের পূর্বে ১২ বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাস, এই ১৩ বছর পূর্বের এই ঘটনা। ভারত-যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ৫৭, সুতরাং ব্রজে ফিরিবার সময় তাঁহার বয়স ছিল ৪৪ (উত্তরচম্পূ, ২৯ পূরণ, পৃঃ ১,৩৮৩)। ভাগবতের বর্ণনা হইতে (৩।২।২৬) জানা যায় যে, বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণ কংসের অলক্ষিতরূপে ব্রজে ১১ বৎসর ব্যাপিয়া 'গুপ্ততেজ' হইয়া বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং শ্রীজীবের মতে তিনি বৃন্দাবন হইতে মথুরা যাইবার তেত্রিশ বৎসর পরে ব্রজে প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু মহাভারতের মতে রাজসূয়-যজ্ঞের চৌদ্দ বছর পরে উদ্যোগ-পর্বের সময়ও দন্তবক্র জীবিত ছিলেন (৫।৪।২২)।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের এগার বছরের বৃন্দাবন-লীলার কালক্রম—মাত্র কয়েকটি ঘটনার সময় দেওয়া হইয়াছে। যথা তিনমাস বয়সকালে শকটভঞ্জন (২।৭।২৭ ও ১০।২৬।৫); এক বছর বয়সে তৃণাবর্ত-বধ (১০।২৬।৬); পাঁচ বছর বয়সের সময় অঘাসুর-বধ (১০।১২।৩৬)। পৌগণ্ড বয়সে অর্থাৎ ছয় বৎসর বয়সের পর ধেনুকাসুর-বধ (১০।১৫।১); সাত বৎসর বয়সে গোবর্ধন-ধারণ (১০।২৬।১৪)। এই কয়টি লীলা ছাড়া অন্য কোন লীলা-সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের কত বয়সে ঐ লীলা ঘটিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে ভাগবতে কোন প্রকার নির্দেশ নাই। তবে ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীজীব গোস্বামী লেখেন

যে,　　বয়স যখন তিন বৎসর, সেই সময়ে কার্ত্তিক মাসে তিনি দামবন্ধনলীলা (১০।৯) ও যমলার্জুন-ভঙ্গ (১০।১০) করেন। উহার কিছুদিন পরে নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামাদি-সহ গোকুল পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন (১০।১১)। শ্রীজীবের মতে বৃন্দাবন-গমনের দুই-তিন মাস পরে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি সহ গোরুর ছোট ছোট বাছুর চরাইবার খেলা শুরু করেন এবং সেই সময়েই বৎসাসুর ও বকাসুর-বধ করেন (১০।১১)। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের বয়স যখন তিন বৎসর পূর্ণ হইয়া চতুর্থ বৎসরে পড়িল, তখন শরৎকালে ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করেন (১০।১৩)। পঞ্চম বৎসরের প্রারম্ভে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ আরম্ভ করেন (১০।১৫।১) এবং ঐ বৎসরই গ্রীষ্মকালে কালিয়-নাগকে দমন করেন (১০।১৬)। ভাগবতে শুধু পৌগণ্ড-বয়সে ধেনুক-বধের কথা আছে (১০।১৫), কিন্তু শ্রীজীব বলেন যে, ঐ ঘটনা শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম বৎসর বয়সে হইয়াছিল এবং উহার কিছু পরেই গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া প্রথম অনুরাগ প্রকাশ করেন।* অষ্টম বৎসরের আশ্বিন মাসে বেণুগীত শুনিয়া গোপীদের পূর্বরাগ প্রকট হয় (১০।২১)। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে গোবর্ধনযাগ, তৃতীয়া হইতে নবমী　　সাতদিন গোবর্ধন-ধারণ (১০।২৬), একাদশীতে ইন্দ্র ও সুরভি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন ও গোবিন্দের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় (১০।২৭)। দ্বাদশীতে নন্দকে বরুণ জলমধ্যে অপহরণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ বরুণলোকে যাইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন (১০।২৮)। ঐ পূর্ণিমায় ব্রজবাসীরা ব্রহ্মহ্রদে অবগাহনের পর গোলোক দর্শন করেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অষ্টম বৎসরের সময়েই অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় গোপকুমারীগণ কাত্যায়নী পূজা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বস্ত্রহরণ করেন। ঐ বৎসরই গ্রীষ্মকালে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের পত্নীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অন্নদান করেন (১০।২৩)। শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন আট বৎসর পূর্ণ হইল অর্থাৎ তিনি নবম বৎসরে পড়িয়া একমাস তেইশ দিন অতিবাহিত করিলেন, তখন শ্রীজীবের মতে রাসক্রীড়ার আরম্ভ হয় (১০।২৯)। ভাগবতে অবশ্য আছে যে, রাস এক-আধ রাত্রি ধরিয়া নহে, 'ব্রহ্মরাত্রি' ধরিয়া হইয়াছিল। সহস্র চতুর্যুগ হইতেছে এক ব্রহ্মরাত্রির পরিমাণ (১০।৩৩)।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষপাদে কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার 'দশাবতার-চরিতে' কৃষ্ণচরিত্রের বিষয় লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ 'মদনোদ্দাম যৌবনে' গোপাঙ্গনাদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ক্ষেমেন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনের পূর্বেই যৌবন সমাগম হইয়াছিল। ভাগবতের রাস-লীলার বর্ণনা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে যুবকই মনে হয়, তবে বয়স তাঁহার এগার বৎসরের চেয়ে কম। বিষ্ণুপুরাণের মতে কৈশোর বয়সে রাসলীলা (৫।১৩।৫৯)। এগার বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া পনরো বছর পর্যন্ত বয়সকে কৈশোর বলে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'সারার্থদর্শিনী'তে (১০।২৯।১) বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সপ্তমবর্ষ বয়সে

* সনাতন গোস্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী'তে (১০।২৬।৩) বিষ্ণুপুরাণের মত তুলিয়া বলিয়াছেন যে, ভাগবতের সহিত যে বিরোধ দেখা যায়, তাহা 'কল্পভেদ' ব্যবস্থা মানিয়া সমাধান করা কর্তব্য। বিষ্ণুপুরাণের মতে সাত বছর বয়সে কৃষ্ণ বৎসপালনে অর্থাৎ গোরুর বাছুর চরাইতে প্রবৃত্ত হন। সেই বৎসরে বা পরের বছরে তিনি কালিয়দমন ও ধেনুকাসুর ও প্রলম্বাসুর বধ করেন এবং তারপর শরৎকালে গোবর্ধন ধারণ করেন।

কার্তিক অমাবস্যাতে নন্দাদির নিকট যুক্তি উত্থাপন করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করাইয়াছিলেন। তার পরদিন শুক্লা প্রতিপদে গোবর্ধন-মহোৎসব ও দ্বিতীয়াতে যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ভোজনোৎসব হইয়াছিল। তৃতীয়া হইতে নবমী পর্যন্ত সাতদিন কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। একাদশীতে গোবিন্দের অভিষেক হয় এবং ঐদিন রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ বরুণের ভৃত্য কর্তৃক অপহৃত নন্দকে উদ্ধার করেন। পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে ব্রহ্মলোক দর্শন করাইয়াছিলেন। তার পরের বৎসর শ্রীকৃষ্ণের অষ্টমবর্ষের আশ্বিন পূর্ণিমাতে রাসোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন যে, বলিষ্ঠের পক্ষে সাত বৎসর সাত মাসের পর হইতেই কৈশোর আরম্ভ হয়। ধনপতি সূরি 'গূঢ়ার্থদীপিকা'য় বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নবমবর্ষের আশ্বিনী পূর্ণিমায় রাস হইয়াছিল।

কংসবধের পর পাণ্ডবেরা কেমন আছেন দেখিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে হাস্তিনগরে পাঠান। সেই সময় কৃষ্ণ বলেন যে, পিতার মৃত্যুর পর বালক পাণ্ডবেরা মায়ের সহিত বড় দুঃখে পড়েন; ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে নিজের নগরে আনিয়াছেন; তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদের সহিত পুত্রের মতন ব্যবহার করেন না শুনিয়াছি, তাই অক্রূর যেন খবর লইয়া আসেন (ভা ১০।৪৮।৩৩-৩৪)। এই সময়ে কৃষ্ণের বয়সও বারো বৎসরের বেশি নহে, কিন্তু বলবীর্যে ও অভিজ্ঞতায় তিনি বড় বলিয়া প্রবীণের মতন পাণ্ডবদিগকে বালক বলিয়াছেন—মনে হয়।

জরাসন্ধের ১৮ বার আক্রমণে তিন চার বছর লাগিয়াছিল। পনরো বছর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিবাহ করেন—দেখাইয়াছি। তাহার কিছু পরেই তিনি জাম্ববতী ও সত্যভামাকে বিবাহ করেন (ভা. ১০।৫৬ ও ১০।৫৭)। ৫৯ অধ্যায়ে বর্ণিত নরকাসুর-বধ রাজসূয়-যজ্ঞের পূর্বেই ঘটিয়াছিল, কেন-না বনপর্বের প্রথমেই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন 'তুমি নরকাসুরকে বধ করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (আসাম) যাতায়াতের পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছ (মহাভারত ৩।১৩।২৯)।' নরকাসুর-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দ্বারা অবরুদ্ধ ষোলহাজার রমণীকে দ্বারকায় আনিয়া বিবাহ করেন (ভা. ১০।৫৯)।

ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৬১ অধ্যায়ে রুক্মী-বধ, ৭২ অধ্যায়ে জরাসন্ধ-বধ, ৭৪ অধ্যায়ে শিশুপাল-বধ বর্ণিত হওয়ায় কালানুক্রম রক্ষিত হয় নাই। জরাসন্ধ-বধ রাজসূয়ের পূর্বে ও শিশুপাল-বধ রাজসূয়-সভাতে ঘটে। তারপর দ্যূতক্রীড়া, বনবাস, অজ্ঞাতবাস ও যুদ্ধের উদ্যোগ প্রভৃতি ১৪ বছর ধরিয়া ঘটে। উদ্যোগ-পর্বের শেষের দিকে দেখা যায়, রুক্মী যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিতেছেন যে, তিনি পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতিত্ব করিতে রাজী আছেন, কিন্তু অর্জুন ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দুর্যোধনও অনুরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় রুক্মীও বলদেবের ন্যায় সমরপরাঙ্মুখ হইয়া তীর্থপর্যটনে বাহির হন (মহাভারত ৫।১৫৫।৩৬-৩৭)।

ভাগবতে রুক্মী-বধের পর বাণ কর্তৃক অনিরুদ্ধের বন্ধন ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে (১০।৬২ ও ৬৩ অধ্যায়)। কিন্তু উদ্যোগপর্বের গোড়ার দিকেই শ্রীকৃষ্ণের বীর্য দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, তিনি বাণকে নিহত করিয়াছেন (৫।১২৮।৪৭)। দশমস্কন্ধের ৬৬ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পৌণ্ড্রক বাসুদেবের বধের কথা লিখিত হইয়াছে। এই ঘটনা রাজসূয়-যজ্ঞের পরে ঘটিয়াছিল, কেন-না মহাভারতে ঐ সভার বর্ণনায় পৌণ্ড্রক বাসুদেবের উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে (২।৩১।১০)। ভাগবতের ৭৮।১ শ্লোকে আছে যে, শিশুপাল,

শাম্ব ও পৌণ্ড্রক-বধের পর ও দন্তবক্র-বধের পূর্বে পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিহত হন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব নিজেকে কেন আদি ও অকৃত্রিম বাসুদেব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার কারণ হরিবংশে ও বায়ুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। হরিবংশে আছে, বসুদেবের সুতনু ও সুতারা নামে দুই স্ত্রী ছিলেন। সুতনুর পুত্র পৌণ্ড্র ও সুতারার পুত্র কপিল। কপিল বনে যান ও পৌণ্ড্র রাজা হইয়াছিলেন (হরিবংশ ১০৩।২৫)। বায়ুপুরাণের মতে বসুদেবের দাসীর গর্ভে জাত পুণ্ড্র ও কপিল—পুণ্ড্র রাজা হন। সুতরাং পৌণ্ড্র বসুদেবের পুত্র হিসাবে বাসুদেবত্ব দাবি করিতে পারেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন। ভাগবতে (১০।৬৬।১) পৌণ্ড্র বাসুদেবকে 'করূষ' দেশের অর্থাৎ সাহাবাদ জেলার নৃপতি বলা হইয়াছে, কিন্তু মহাভারতে ও ভাগবতে (১০।৭৮।৪) দন্তবক্রকে করূষ-দেশাধিপতি বলিয়া বর্ণনা আছে। পৌণ্ড্র দেশ উত্তর বঙ্গে—বগুড়া জেলা।

শ্রীকৃষ্ণ যে জরা নামক ব্যাধ কর্তৃক বাণবিদ্ধ হন, সেই জরাও হরিবংশের মতে বসুদেবের অন্য এক পুত্র (১০৩।২৭)। 'বসুদেবের ঔরসে চতুর্থবর্ণা অর্থাৎ শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন জরানামক পুত্র ধনুষ্ক নিষাদদের প্রভু বা রাজা হইয়াছিলেন।' তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের ব্যাপারেও গৃহবিবাদের প্রভাব লক্ষিত হয়।

শ্রীজীব বলেন, মহাভারত অপেক্ষা ভাগবতের মত বিশিষ্টতর (ভারতাৎ শ্রীভাগবতং মতং বিলক্ষণমিতি—গোপালচম্পূ, উত্তরচম্পূ ২৯ পূরণ, পৃঃ ১,৩৮৪)। একদিক দিয়া এ-কথা সত্য। মহাভারতের মধ্যে বহু লেখকের হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে। ডাঃ সুখথঙ্কর বলেন, তাহার কোন শ্লোক আবার খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হস্তের রচনার মধ্যে কিছু অসামঞ্জস্য থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু ভাগবত যে একই মহর্ষির রচনা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই ভাগবতে ক্রমভঙ্গ থাকিলেও পরস্পরবিরোধী উক্তি বড় বেশি দেখা যায় না।

ভাগবতে মহাভারত-বর্ণিত ঘটনার কাঠামো ব্যবহার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বহুস্থলেই এমন অনেক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, যাহার সহিত মহাভারতের বর্ণনার সুস্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মহাভারতে আছে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ১৫ বৎসর পরে ধৃতরাষ্ট্র বনে গমন করেন এবং উহার বৎসর খানেক পরে বিদুর দেহত্যাগ করেন। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে লেখা আছে যে, বিদুর তীর্থযাত্রা করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের কথা শুনিয়া আসেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নিকট উহা প্রকাশ করেন না। মহাভারতের মতে শ্রীকৃষ্ণ বাণকে নিহত করেন (৫।১২৮।৪৭), কিন্তু ভাগবতে আছে, শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদকে বর দিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশের কাহাকেও বধ করিবেন না বলিয়া তৎপৌত্র বাণকে প্রাণে মারেন নাই। এই সব বিরোধ থাকায় উভয় গ্রন্থের বর্ণনার কালানুক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না।

রামায়ণ-প্রসঙ্গ

(সেতুবন্ধন)

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

সীতার সংবাদ পাওয়া গেল পর্বত-শিখরে অবস্থিত রাবণের দুর্গ-সম্বন্ধেও হনুমান্ বিস্তৃত বর্ণনা দিলেন। তিনি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। কোনক্রমে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিলে রাবণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ সুনিশ্চিত। কিন্তু কিরূপে এই বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্র বানরসৈন্য-সহ লঙ্কায় উপস্থিত হইবেন! সুগ্রীব আশ্বাস দিলেন, বানরগণ সকলেই অসাধ্য সাধন করিবার জন্য প্রস্তুত এবং সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য একটি সেতু নির্মাণ করিতে হইবে।

মহা উৎসাহের সহিত সুগ্রীব ও অঙ্গদের নেতৃত্বে বানরদল পুনরায় যাত্রা করিয়া মহেন্দ্র-পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সামনে অসীম নীল জলরাশি। ঊর্ধ্বে অনন্ত নীলাচল দিগন্তে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া গ্রামে সকলে উজ্জ্বল ও নির্মল প্রস্তর খণ্ড পরিবেষ্টিত জলের তরঙ্গে প্লাবিত বিশাল বেলাভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষ-পরিপূর্ণ সমুদ্রতীরে সৈন্য-শিবির স্থাপিত হইল। বানরগণ-সহ রামচন্দ্র সেতুনির্মাণ-পরিকল্পনার বিষয়ে গভীর চিন্তামগ্ন, এমন সময়ে রাবণের ভ্রাতা বিভীষণ আসিয়া উপস্থিত।

লঙ্কানগরী বিধ্বস্ত ও রাক্ষসদিগকে সংহার করিয়া হনুমান্ লঙ্কায় বেশ একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পূর্বেই জনস্থানে রামচন্দ্র কর্তৃক খর, দূষণ ও মারীচ প্রভৃতি বলশালী রাক্ষসগণ নিহত হওয়ায় রামের বীরত্বকাহিনী মুখে মুখে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জনস্থান হইতে যে-সকল রাক্ষস পলাইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সকলেই রামের ভয়ে ভীত। আবার রামের একজন অনুচর আসিয়া রাজপুরীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়া নিরাপদে চলিয়া গেল। আতঙ্কগ্রস্ত হইবারই কথা! রাবণের মাতা ধার্মিক পুত্র বিভীষণকে ডাকিয়া বলিলেন, তাঁহার মনে হয়, রাবণের সমূহ বিপদ্ উপস্থিত; রাম লঙ্কায় আগমন করিলে কোনক্রমেই পরিত্রাণ নাই, সুতরাং বিভীষণ যেন অবিলম্বে মিষ্টবাক্যে রাবণকে হিতজনক উপদেশ প্রদান করে—'রাবণকে গিয়া বল—সীতাকে প্রত্যর্পণ করুক।'

বিভীষণ ধর্মাত্মা। সেজন্য সমগ্র রাক্ষস-সমাজে তাঁহার খ্যাতি ছিল। রাবণের সীতা-হরণ তাঁহার কোনদিনই ভাল লাগে নাই। মাতার আদেশ শিরোধার্য করিয়া ধর্মজ্ঞ বিভীষণ রাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য অভিবাদনান্তে ধীরে ধীরে বলিলেন, যেদিন হইতে রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন, সেইদিন হইতে রাজ্যে অমঙ্গলের সূচনা দেখা গিয়াছে। মনে হয়, রাজ্যের কল্যাণার্থে সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই সঙ্গত। বিভীষণের উপদেশ রাবণের ভাল লাগিবার কথা নহে। ত্রিলোকে এমন কে আছে যে, রাবণের ভীতি উৎপাদনে সক্ষম! পরন্তু হনুমানের কার্যক্রম স্মরণ করিয়া উত্তপ্ত রাবণ বিভীষণ ও মন্ত্রিবর্গের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিল—হনুমান্ লঙ্কা-নগরীর রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সীতাকে দর্শন করিয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে প্রাসাদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন ও রাক্ষস বিনাশ করিয়াছে। প্রতিবিধানকল্পে কি

করণীয়? স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে, সহস্র সহস্র বানর পরিবেষ্টিত রাম সমুদ্র অতিক্রম করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিবে—তখনই বা কী কর্তব্য?

অমাত্যবর্গ সকলেই রাবণের মতের প্রতিকূল অপ্রিয় বাক্যের পরিণাম অবগত ছিল। সুতরাং তাহারা রাবণের চিত্তানুকূল কথাই বলিল। মহাবলশালী রাবণ দুর্ধর্ষ রাক্ষস, যক্ষ ও দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়া এই বিশাল লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়াছে। ক্ষুদ্র মানব রামচন্দ্র হইতে রাবণের ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। তাহারাই রামচন্দ্রকে নিহত করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ হইতে কাহারও নিস্তার নাই। সেনাপতি প্রহস্ত বলিল, যেভাবে হউক বানর রাক্ষসদিগকে প্রতারিত করিয়া অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। রাক্ষসগণ বিপদ্ সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। পূর্ব হইতে অবহিত থাকিলে কাহার সাধ্য রাবণের কোন অনিষ্ট সাধন করে! রাক্ষসগণ সকলেই যখন আস্ফালনপূর্বক নিজ নিজ বিক্রম ঘোষণা করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে পরাজিত ও নিহত করিবার আশ্বাস প্রদান করিল, তখন ধর্মজ্ঞ বিভীষণ পুনরায় কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,. শত্রুগণকে সাম দান ও ভেদ—এই ত্রিবিধ উপায়ে নিবৃত্ত করিতে না পারিলেই শেষোক্ত উপায় অর্থাৎ দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারা যায়। পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া রামচন্দ্রের পরাক্রম অগ্রাহ্য যুক্তিসঙ্গত নহে। আর রাজনন্দিনী সীতা হইতেই যখন লঙ্কায় ভয় সমুপস্থিত, তখন রাজ্যের কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেই সব সমস্যার সমাধান ঘটে।

রাবণ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে অমাত্যদিগের সহায়তা প্রয়োজন, সুতরাং তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, অমাত্যদিগের ঐকমত্যের উপরেই শত্রুপক্ষের ধ্বংস এবং রাবণের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে। অমাত্যবর্গই স্থির করুক—অতঃপর কি কর্তব্য। স্বীয় আচরণ-সমর্থনের আশায় রাবণ আরও বলিল, 'আমি যে কোন অন্যায় করি নাই এবং আমি জিতেন্দ্রিয় তাহার নিদর্শন এই যে, সীতাকে লাভ করিয়াও মত্ততা আমাকে স্পর্শ করে নাই। তাহার উপর আমি বলপ্রয়োগ করিতেছি না।' চতুর রাবণ আরও যুক্তি দিয়া এবং বিভীষণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, 'রাবণ তপস্বীর উপর অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া কোন মার্জিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়তো নিন্দা করিতে পারে। কিন্তু এই রামচন্দ্রই বা তপস্বীদের অলঙ্কার জটা ও বল্কল পরিধান করিয়া ধনুর্বাণহস্তে রাক্ষসদিগকে ভীত করেন কেন? সর্বদা প্রশান্তচিত্ত, সর্বভূতে দয়াপরবশ ও ফলাহারী হওয়াই কি আশ্রমবাসীদের ধর্ম নহে? রামচন্দ্র কি আশ্রমধর্ম পালন করেন? আর সীতার ন্যায় রক্তবস্ত্র-পরিহিতা, উজ্জ্বল সুবর্ণকুণ্ডলধারিণী, আশ্রমবাসিনী কি কখনও তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন? রাজান্তঃপুরই সীতার প্রকৃত স্থান। রাক্ষসদিগকে বধ করিয়া স্বীয় ধর্মানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় রামচন্দ্রও নিন্দনীয় এবং দণ্ডার্হ।' কথাগুলি বেশ যুক্তিসঙ্গত। অমাত্যবর্গও রাবণকে সমর্থন করিল। বাস্তবিক ক্ষুদ্র মানবের এত স্পর্ধা সহ্য করা উচিত নয়। তাহাকে সমুচিত দণ্ড দেওয়াই কর্তব্য। তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া মন্ত্রণা চলিল। সীতাকে প্রত্যর্পণ না করিলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধের কথা চিন্তা করিলে দেখা যায়, রাবণের দুর্গ অতীব সুরক্ষিত। রামচন্দ্রকে পুরীর বাহিরে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার পরাজয় সুনিশ্চিত।

ধর্মাত্মা বিভীষণ সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, 'পরস্ত্রী-হরণ

অতি গর্হিত কর্ম। সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই উচিত।' বারবার সীতা-প্রত্যর্পণের উল্লেখে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে বহু কটূক্তি করিয়া অমাত্যবর্গকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে নির্দেশ দিল।—বিভীষণ কেবল শত্রুর বল-বীর্যই দেখিতেছে। এরূপ কাপুরুষের যুদ্ধ-ক্ষেত্রের নিকট অবস্থান করা উচিত নহে, কারণ উহাতে তাহার কাপুরুষতা অপর যোদ্ধা-দিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইবার সম্ভাবনা।

বিভীষণ দেখিলেন, রাবণ হিতকথা শুনিবার পাত্র নহে। মন্ত্রণা যাহা হইতেছে, তাহাও ন্যায়-সঙ্গত নহে। কিরূপেই বা হইতে পারে! নেতা ধর্মের প্রতিকূল আচরণ করিতেছে এবং সহচর-গণ নেতার মনোরঞ্জক কথা বলিতেছে, সুতরাং যথার্থ মন্ত্রণা কি প্রকারে সম্ভব হয়? বাধ্য হইয়া বিভীষণ বলিলেন, তিনি ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বরং স্বধর্মপরিত্যাগী, স্বেচ্ছাচারীকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্মপরায়ণ রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল। তিনি শুনিয়াছেন, রামচন্দ্র কদাপি শরণাগত শত্রুকে পরিত্যাগ করেন না। পরিশেষে দুঃখিত চিত্তে বলিলেন:

চিত্রমেতদয়ং ত্যক্ত্বা কৃৎস্নং স্বজনমাতুরঃ।
ধর্মহেতোর্গমিষ্যামি সোঽহং মানুষসংশ্রয়ম্॥
এবং কৃত্বা ময়ি গতে যগুস্তি গুণদর্শিতা।
ক্রিয়তাং নিশ্চয়ঃ সম্যঙ্‌নয়বুদ্ধিনিমিত্তজঃ॥

—আমি ব্যথিত হইয়া আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের নিমিত্ত একজন মানুষকে আশ্রয় করিতেছি, ইহা আশ্চর্যের বিষয়। এইভাবে সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে যদি আপনার বিবেকবুদ্ধি উদিত হয়, হিতাহিত জ্ঞান জন্মে, তবে নীতিবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমীচীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

রামের শরণাগত হওয়া! রাবণের আর ধৈর্য রহিল না। ক্রোধে উন্মত্ত রাবণ সিংহাসন হইতে উঠিয়া বিভীষণকে পদাঘাত করিল। কোষ হইতে অসিও নিষ্কাশিত হইয়াছিল, অমাত্যবর্গ কোনরূপে নিবৃত্ত করিল। অপমানিত বিভীষণের হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার হইলেও তাহা দমন করিলেন। ধর্মরক্ষার জন্যই তিনি হিতবাক্য বলিয়াছেন, সুতরাং রাবণের পক্ষে পদাঘাত তাঁহার পক্ষে পরাভব নহে। তবে সংকল্প দৃঢ় হইল। কঠোর বাক্যে তিনি বলিলেন, অমাত্যবর্গ অন্যায় জানিয়াও যখন রাবণকে সমর্থন করিতেছে, তখন সন্দেহ নাই যে, সর্বনাশ সমুপস্থিত।

অতঃপর রামচন্দ্রের সহিত মিলনের অভিপ্রায়ে বিভীষণ চারিজন সদস্য-সহ লঙ্কা-নগরী পরিত্যাগ করিলেন।

দূর হইতে বিভীষণকে দেখিয়া সুগ্রীবের সংশয় হইয়াছিল। রাক্ষসগণ নানারূপ মায়া অবলম্বনে বিশেষ পটু। বানরদলের মনোভাব পূর্বেই আশঙ্কা করিয়া বিভীষণ দূর হইতে চীৎকার করিয়া নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, তিনি রামের শরণাগত। রামচন্দ্রের নিকট আশ্বাস লাভ করিয়া বিভীষণ অনুচরগণ-সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'আপনি আমার সখা।' বিভীষণ তখন সমুদয় নিবেদন করিলেন। তাঁহার হিতবাক্যে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, রাবণ পদাঘাত করিয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছেন। অতএব লঙ্কা-নগরী আত্মীয়স্বজন ও সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া তিনি রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। রামচন্দ্রও যথাবিধি সমাদর করিয়া সমুদ্রের জলে বিভীষণকে লঙ্কার রাক্ষস-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

নিঃসংশয় সুগ্রীব তখন বিভীষণকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, সমুদ্র অতিক্রমের উপায় কী! বিভীষণের মতেও সেতু-নির্মাণ ব্যতীত অপর কোন উপায় নাই। বানরদিগের মধ্যে নল কারিগরী বিদ্যায় সুনিপুণ। তাহার অধীনে সমুদ্রের উপর সেতুনির্মাণ-কার্য আরম্ভ হইল। সেতু-নির্মাণ যে সহজ হয় নাই, তাহা রামচন্দ্র কর্তৃক সমুদ্রের পূজা, পরে সমুদ্রের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রকে পীড়ন প্রভৃতি আখ্যানসমূহ হইতে বেশ ভাল করিয়াই বুঝা যায়। অবশেষে সমুদ্র বশ্যতা স্বীকার করিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামচন্দ্র যেখান হইতে সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, অধুনা উহা রামেশ্বর-দ্বীপের অন্তর্গত 'ধনুষ্কোডি' নামে প্রসিদ্ধ। বহু ভৌগোলিক পরিবর্তন সত্ত্বেও এখনও রামেশ্বরের নিকট বহু দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ বেলাভূমি এবং তাহার পর জলরাশি অত্যন্ত অগভীর। স্বচ্ছ নির্মল জলে বহু প্রস্তরখণ্ড অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। বানরগণ কর্তৃক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, শাল অর্জুন বকুল প্রভৃতি বিশাল বৃক্ষসমূহ এবং লতাগুল্ম প্রচুর আনীত হইল। প্রস্তরখণ্ডের উপর বৃক্ষসকল লতাগুল্মের দ্বারা একত্র বন্ধন করিয়া এক মাসের মধ্যে দীর্ঘ সেতু নির্মিত হইল।

সমুদ্রবরদানাচ্চ সংবিধানাচ্চ কর্মণাম্।
সেতুঃ স্বল্পকালেন নিষ্ঠাং প্রাপ্তোঽভবত্তদা
কূলে তূত্তর আরব্ধো লঙ্কাকূলে প্রতিষ্ঠিতঃ।
সাগরস্যৈষ সীমন্তশ্চিত্ররূপো ব্যদৃশ্যত ॥

—সমুদ্রের বরদানে কার্যের অনুষ্ঠান করায় অল্পকাল মধ্যেই সেতু নির্মিত হইয়া গেল। সমুদ্রের উত্তর কূলে আরম্ভ এবং লঙ্কার কূলে সমাপ্ত—সাগরের এই সীমন্তরূপ দৃঢ় সেতু অতি সুন্দররূপে শোভা পাইতে লাগিল।

রামচন্দ্র বানরগণের সাহায্যে সাগরের উপর সেতু নির্মাণ করিতেছেন—এই সংবাদ দ্রুত সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। বহুদূর হইতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল সেতু দেখিবার জন্য। সেতু দেখিয়া বিস্মিত হইয়া সকলেই রামচন্দ্রকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করিল। তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতিতে চতুর্দিক মুখরিত হইতে লাগিল।

অতঃপর রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সমগ্র বানরসৈন্য-সহ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া লঙ্কা-নগরীতে উপনীত হইলেন এবং বিভীষণ গদাহস্তে সমুদ্রের তীরে অবস্থান করিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন।

শরণ

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

অভাবের মাঝে
আসিয়া দাঁড়াও
ছিন্ন বসন পরি;

ভক্তের দ্বারে
ঘুরিয়া বেড়াও
ভিখারীর বেশ ধরি।

চিনিয়াছি বুঝি—
ভাবি মনে তবু,
দেখা নাহি পাই তব।

চেয়ে দেখি ফিরে—
এই সংসারে
কর লীলা নব নব।

কত রূপ ধরি
বিরাজিছ তুমি,
কঠিন তোমায় পাওয়া,

তোমায় চিনিতে
একই বুঝি পথ—
তোমারি শরণ লওয়া।

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত। তদানীন্তন বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'নায়ক' ও তাহার সম্পাদক পাঁচকড়ি বাবুকে বঙ্গবাসী পরমাত্মীয়ের দৃষ্টিতে দেখিত। পাঁচকড়িবাবু সাহিত্যরস অকৃপণ হস্তে বিতরণ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তিনি স্বামীজীর বন্ধু এবং তাঁহার লেখনীতে যে শ্রদ্ধা ও অন্তরঙ্গতার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে, মনে হয়—স্বামীজীকে ও তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে উপলব্ধি করিতে পাঠকবর্গকে তাহা বহুলাংশে সহায়তা করিবে :

আমরা নরেন্দ্রনাথকে জানি, চিনি, সেই নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দে পরিণতিও জানি ও বুঝি, তাই ভগবান্ রামকৃষ্ণের মহিমায় মুগ্ধ। একবার বিবেকানন্দের সম্মুখেই তাঁহার একটা বক্তৃতার সুখ্যাতি করিতেছিলাম, সে আমার মুখে হাত চাপিয়া মুখ বন্ধ করিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছিল, 'তোরা যদি অমন কথা বলবি তো আমি দাঁড়াব কোথা? কার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সখ্যের সাধ মেটাব?' উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, 'দেখ দাদা, শলুই চিনতে পারলে জাত-সাপের পরিচয় অনেকটা জানতে পারা যায়। আমি তোমায় দেখে ঠাকুরের মহত্ত্ব চেনার চেষ্টা করছি। তাঁকে তো দু-বারের অধিক দেখিনি। তোমার মতো সামগ্রী যাঁর কৃপায় তৈরী হ'তে পারে, তিনি যে কৃপার সাগর—সর্ব নিধির আধার!' বিবেকানন্দ আমার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শেষে গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বীণানিন্দিত কণ্ঠে—

'আমি সেই ভয়ে মুদি না আঁখি,
পাছে তারা-হারা হয়ে থাকি।'

—এই গানটি বাষ্প-গদ্গদকণ্ঠে অপূর্ব ভাব মিশাইয়া গাহিলেন।

বিবেকানন্দ কৃপাসিন্ধু। তাহার ইংরাজী বিদ্যার বহর জানিতাম। পরে আমেরিকা ও ইওরোপে যাইয়া সে যে-বিদ্যার ও যে-তেজের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারও অপূর্ব লীলা দেখিয়াছিলাম। ভগবান্ রামকৃষ্ণ মাতৃভাবের পলিমাটি ছড়াইয়া বাংলার যে উর্বরতা সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে মানবতার বীজ না দিলে ফসল ভাল হইবে কেন! তাই বিবেকানন্দের উপর এই রোয়া-বোয়ার ভার পড়িয়াছিল। এ-কাজের জন্য যেটুকু তেজ, যেটুকু সাহস, পাকা কৃষির ভূয়ো-দর্শনজাত যেটুকু স্পর্ধার প্রয়োজন, সে-সকলই বিবেকানন্দের পূর্ণমাত্রায় ছিল। বিবেকানন্দে ইওরোপের তেজস্বিতা, মানবতা এবং ভারতের ভক্তি, বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, সংযম ও সাধনা পূর্ণ-মাত্রায় ছিল। সে জল বৃষ্টিতে ভিজিয়া, শুখা-রুখায় পুড়িয়া যে-বীজ বপন করিয়া গিয়াছে, যখন দেবতার কৃপায় পুরা ফসল হইবে, ক্ষেতভরা ধান হইবে, তখন বাঙালী বুঝিবে—কত বড় পুরুষসিংহ তাহাদের জন্য কি কাজ করিয়া গিয়াছে! ধর্ম ও সাধনার উপর জাতীয়তার পালিশ চড়াইয়া সেবাব্রতকে জাতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া বিবেকানন্দ—সব্যসাচী অর্জুনের ন্যায় ভোগবতীর জল টানিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত সমাজের উপরের স্তরগুলিকে স্নিগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গরীব দুঃখী, মূর্খ-পণ্ডিত—সবাই এখন একসূত্রে বাঁধা হইয়াছে, সবাই

এক আদর্শের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। যে মন্ত্রের প্রভাবে বিলাসী বাবু সন্ন্যাসী হইতে পারে, রোগীর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া অহর্নিশ সেবা করিতে পারে, প্লেগে ভয় পায় না, বসন্তরোগী দেখিলে সঙ্কুচিত হয় না, উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল সাগর-সঙ্গমে ঝম্প প্রদান করিতে ইতস্তত: করে না, সে মন্ত্রই বা কেমন, সে মন্ত্রীই বা কেমন! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি—সংসারের সুখ অপেক্ষা, ঘর-বাড়ি স্ত্রী-পরিবারের আয়েস অপেক্ষা বেহেতর প্রগাঢ়তর প্রবলতর একটা সুখ, আনন্দ, উন্মাদনা না পাইলে মানুষ কি সহজে এ দুনিয়ার চাকচিক্য ভুলিতে পারে? যে গুরু এমনভাবে শিষ্যকে ভুলাইতে পারেন, সে গুরু সত্যই তো ঈশ্বর—ঈশ্বরের অবতার!

বিবেকানন্দ গুরুগিরি করিতে আসেন নাই, কেবল ভাব বিলাইতে আসিয়াছিলেন। তেমন সরল হাস্যময়, তেমন তেজস্বী সত্যসন্ধ সহচর আর কখনও দেখি নাই। তাহাকে ফাঁকি দিবার জো-টি ছিল না, মনের কথাটি টানিয়া বাহির করিত। তাহার কখনও অভিমান ছিল না। আমি একজন পণ্ডিত, আমি একজন বড় বক্তা—মিত্র-সংসর্গে এ ভাবটা তাহার কখনই ফুটিয়া উঠিত না।

বিবেকানন্দ একজন বড় দরের ভক্ত ছিলেন। গোপনে ভক্তিতত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত। কিন্তু তিনি সে ভাব চাপিয়া রাখিতেন। একবার ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন 'না ভাই, আমায় মজাইও না। আমি তাল সামলাইতে পারিব না। আমার যে কাজ, সে কাজ এখনো তো শেষ হয় নাই। ওদিকটা ফুটাইও না,—আমি পাগল হইব।' গান গাহিতে গাহিতে বিবেকানন্দ এক এক সময় সত্যই মূর্ছিত হইয়া পড়িতেন। একদিন আমার কন্যাকে লইয়া 'তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নাচ দেখি শ্যামা'—এই গানটি গাহিতে গাহিতে চারি বৎসরের কন্যাটিকে নাচাইতে নাচাইতে বিবেকানন্দ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। আর মেয়েটিও তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্থির ধীর নিস্পন্দবৎ তাঁহার বুকের উপর শুইয়াছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ এই ভাব প্রায়ই চাপিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'ছাখ্, এই ভাবের বাড়াবাড়ি হওয়াতেই আমরা কলা খেয়ে বসেছি। পৃথিবীতে-এমন মদ নেই, যাকে ভক্তিরসের সহিত তুলনা করা যেতে পারে। সকল মদের সেরা ভক্তি-মদ। সেই মদ খেয়ে বাঙালী চার-শ বছর মাতাল হয়েছিল। আর ও-মদ চালানো ঠিক নয়।' তাই বিবেকানন্দ কর্ম-জ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া বক্তৃতা করিতেন।

সে চলিয়া গিয়াছে—গুরুদত্ত বীজ ছড়াইয়া, গুরুর গৌরব-ডঙ্কা বাজাইয়া, সর্ব-সামঞ্জস্যের মহামন্ত্র বাঙালীর কানে বজ্রগম্ভীরনাদে উচ্চারণ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে! এখনও বিবেকানন্দকে বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় আসে নাই। তাই স্মৃতিসুখে সুখী হইয়া আর একজনের আশা-পথ চাহিয়া আছি। এস তুমি, ডাকার মতো ডাকিলে না কি তুমি আসিয়া থাক, তাই তোমায় ডাকিতেছি। তুমি অন্যরূপে আসিয়া অবতীর্ণ হও। তোমার কর্ম পূর্ণ কর।*

* 'প্রবাহিণী, ২২শে ফাল্গুন, ১৩২০'—'পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী'—২য় খণ্ড।

মিস সারা ফার্মার

মিস সারা ফার্মার (Miss Sarah Farmer) বিখ্যাত তড়িৎবিজ্ঞানী মোজেস গেরিস ফার্মারের কন্যা। মিঃ ফার্মার সারাকে বলিতেন যে, আবিষ্কারকের প্রধান নীতিই অনুপ্রেরণা এবং যে এই প্রেরণা আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে এবং সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইতে পারে, সেই সাফল্য অর্জন করে। চিকাগো ধর্ম-মহাসভা হইতেই গ্রীনএকার ধর্মসম্মেলনের (Greenacre Conference) উদ্ভব হয়—মনে করা যায়। এই সম্মেলনে সকলকেই নিজ বক্তব্য বলিতে দেওয়া হইবে, শুধু ধর্মান্ধকেই এখানে স্থান দেওয়া হইবে না—এইরূপ বলিতেন সারা ফার্মার।

পিস্কাটাকোয়া নদীর তীরে মেইনে ইলিয়টের নিকটে গ্রীনএকার অবস্থিত। এখানে অনুষ্ঠিত ধর্মসম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল—সকল ধর্মের সমন্বয়ের আদর্শ কার্যকরী করা। এখানে গোঁড়াদের স্থান ছিল না এবং ঐ-সময়ের নব্য-ভাবাবলম্বীদের সকলেই স্থান পাইয়াছিলেন।

মিস সারা ফার্মার স্বামীজীর সহিত নিউ-ইয়র্কে পরিচিতা হন এবং স্বামীজীকে এই ধর্ম-সম্মেলনে আমন্ত্রণ করেন। ১৮৯৪ খৃঃ জুলাই মাসে এই সম্মেলন সারার চেষ্টাতেই আরম্ভ হয়। ৩১শে জুলাই (১৮৯৪) মেরী হেলকে গ্রীনএকার হইতে লিখিত স্বামীজীর পত্রে এই সম্বন্ধে জানা যায়। যদিও এখানে নানারূপ ধর্মীয় মতাবলম্বী লোক যোগদান করেন, এমনকি ঝাড়-ফুঁকে বিশ্বাসী ও ভূতের ওঝাও ছিলেন, তথাপি ইঁহারা সকলেই আমেরিকার উদার-মতাবলম্বী লোক এবং ইঁহাদের সকলেরই হৃদয় আন্তরিকতায় পূর্ণ। মিস ফার্মারের গ্রীন-একারের এই কাজে স্বামীজী তাঁহার বাণী কার্যে পরিণত হইতে দেখিতে পান,—আধ্যাত্মিক উন্নতি মন্দ হইতে ভালতে অগ্রসর হয় না, ভাল হইতে আরও বেশী ভালতে পরিণত হয়। ১৮৯৫-এর ডিসেম্বরে মিস ফার্মারকে লিখিত পত্রের বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সারা ফার্মারকে একজন স্থিরলক্ষ্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি শান্তস্বভাব মহিলা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মহিলা এত নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতেন যে, স্বামীজী তাঁহার নিকট আমেরিকার কাজের জন্য পরামর্শ-গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন।

স্বামীজী মিসেস ওলিবুলকে লিখেন: 'শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় কারও মুখের দিকে তাকালেই নির্ভুলভাবে সেই লোকের সম্বন্ধে ধারণা ক'রে নিতে পারি এবং তার ফলে যতই ভূত-প্রেত থাকুক, আমি মিস ফার্মারের পরামর্শ খুশী মনে গ্রহণ ক'রব। এই ভূত-প্রেতের পেছনে একটি অত্যন্ত প্রেমময় অন্তর দেখতে পাচ্ছি।'

গ্রীনএকারে পাইন-বৃক্ষের বন দেখিয়া ইহার শান্ত পরিবেশে স্বামীজী খুবই আনন্দিত হন। এখানে তিনি এক বিশেষ পাইন-বৃক্ষতলে ক্লাস লইতেন, ইহা 'স্বামীজীর পাইন' নামে অভিহিত। স্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দও এই দীর্ঘ পাইন-বৃক্ষতলে ভাষণ দিয়াছেন।

এখানে স্বামীজী কি শিক্ষা দিতেন, সে-বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে মেরী হেলকে লিখিত পত্র হইতে বুঝা যায়—'দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম'-সম্বন্ধেই তিনি বক্তৃতা ও শিক্ষা দিতেন।

এই সম্মেলনে ডাঃ লুইস্ জেনস (Dr. Lewis G. Janes) উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত স্বামীজীর এখানেই বিশেষভাবে পরিচয় হয়, তিনি পরে স্বামীজীর কাজে অনেক সাহায্য করেন।

মিঃ হিরাম ম্যাকসিম্

পারী ধর্মেতিহাস-সম্মেলনে যোগদান-মানসে স্বামীজী ১৮৯০ খৃঃ অগস্ট মাসে পারী যাইয়া হিরাম ম্যাকসিমের (Mr. Hiram Maxim) সহিত প্রথম পরিচিত হন। স্বামীজী লিখিয়াছেন: ম্যাকসিম্ আদতে আমেরিকান, এখন ইংলণ্ডে বাস, ম্যাকসিম্—বিখ্যাত 'ম্যাকসিম্ গানে'র নির্মাতা; যে তোপে ক্রমাগত গোলা চলতে থাকে……। ম্যাকসিম্ তোপের কথা বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে, 'আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি—ঐ মানুষ-মারা কলটা ছাড়া?' ম্যাকসিম্ চীন-ভক্ত, ভারত-ভক্ত, ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে সুলেখক। আমার বইপত্র প'ড়ে অনেকদিন হ'তে আমার উপর বিশেষ অনুরাগ—বেজায় অনুরাগ। আর ম্যাকসিম্ সব রাজারাজড়াকে তোপ বেচে, সব দেশে জানাশুনা, কিন্তু তাঁর বিশেষ বন্ধু লি হুং চাঙ, বিশেষ শ্রদ্ধা চীনের উপর, ধর্মানুরাগ কংফুছে-মতে।

ম্যাকসিম্‌কে স্বামীজী 'বন্ধু' বলিয়াছেন। ম্যাকসিম্‌ও স্বামীজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ইওরোপ-ভ্রমণের সময় ম্যাকসিম্ স্বামীজীকে বিভিন্ন দেশের উচ্চপদস্থ লোকের নামে পরিচয়-পত্র দেন। স্বামীজী লিখিয়াছেন, 'প্যারিস নগরী হ'তে বন্ধুবর ম্যাকসিম্ নানাস্থানে চিঠিপত্র যোগাড় ক'রে দিয়েছেন, যাতে দেশগুলো যথাযথ রকমে দেখা যায়।' ভিয়েনা ও কনস্তান্তিনোপলে ম্যাকসিমের পরিচয়-পত্রের সাহায্যে বহু পদস্থ লোকের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। স্বামীজীর জাপান যাইবার কথা হওয়ায় ১৪ই জুন ১৯০১ খৃঃ তিনি মিস ম্যাকলাউডকে জাপানে (তখন ম্যাকলাউড জাপানে ছিলেন) পত্রে লিখেন, 'তাছাড়া লি হুয়াং চাঙ-এ- মিঃ ম্যাকসিমের অঙ্গীকৃত পত্রখানাও অবশ্য পাওয়া চাই।'

মিস স্পেন্সার

দ্বিতীয়বার আমেরিকাতে গিয়া
১৮৯৯ খৃঃ প্রথম ভাগে স্বামীজী ক্যালি
লস্ এঞ্জেলেসে উপস্থিত হন। এই ıhardt)
স্পেন্সার (Miss Spencer)-নামে এ ছিলেন।
স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া এবং তাঁহা পাশ্চাত্য
আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যা হন। ।সিকগণের
মাতা অন্ধ এবং মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন ত ছিল।
প্রায়ই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দবী সারা'
এবং একদৃষ্টে কি দেখিতেন! ইত। ধর্ম-

মিস্ স্পেন্সার ইহাতে কৌতু নানা স্থানে
তাঁহাকে প্রশ্ন করেন, 'স্বামীজী! -সময় সারা
আমার মায়ের মৃত্যুশয্যার পা মীজীর বাগ্মিতা
কাটান? কি দেখেন আপ লভাবে প্রকাশ
তাহাতে বলেন, 'মৃত্যু—জন্মেরই ভাবান্বিত করে।
তাই দেখতে ভাল লাগে। প্রশংসা করিতেন
সম্মুখীন হয়, তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় দেখাইতেন।
ধীরে স্থির হয়ে যায়। এই হৃত ছিলেন।
দৃষ্টিতে অপ্রীতিকর ও দুঃখ স্বামীজী যখন
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাৎপর্যপূর্ণ ও চি তেছিলেন,
সারার

শ্রীনিবাস পাই

১৮৯৩ খৃঃ শ্রীনিবাস মাদ্রাজ প্রে যে,
কলেজে পাঠ্যাবস্থায় স্বামীজীর সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হন। ইহা স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়া ক পূর্বের ঘটনা। যদিও স্বামীজী তখন একরূপ অপরিচিতই ছিলেন, তথাপি তাঁহার অনুপম ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া বহুলোক তাঁহার কথা শুনিতে আসিতেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র। তখন মাদ্রাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কম আসিতেন; ছাত্র, শিক্ষক, উকীল ও নিম্নপদস্থ

বাই বেশী আসিতেন। স্বামীজী ১৮৯৭
৯৭ হইতে বিশ্ববিজয়ী হইয়া ফিরিলে
মিস কর্মচারী, নেতা এবং সহস্র সহস্র
বিখ্যাত তাঁহার কথা শুনিতে সমবেত হইতেন—
ফার্মারের ভাঙিয়া পড়িত! ১৮৯৩ খৃঃ তিনি
যে, আবি ভট্টাচার্যের গৃহে বাস করিতেছিলেন।
এবং যে এই নিবাস অন্য ছাত্রবন্ধু-সহ মেঝেতে
এবং সাহ রে স্বামীজীর সম্মুখে বসিয়া কথা
সেই সাফ ও মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। স্বামীজী
মহাসভা আলাপ করিতেন।
(Greenacı মাদ্রাজেও বিদেশী দার্শনিকদের
করা যায়। ইংরেজীশিক্ষিত লোকেরা বেশী
বক্তব্য বলি তেন। যদিও স্বামীজীর ব্যাখ্যা
এখানে স্থান তীক্ষ্ণ ছিল, তবু ছাত্রদের পাশ্চাত্য
সারা ফার্মার পক্ষপাতিত্ব সহজে পরিবর্তিত
পিস্কাটাকোল না কিন্তু তাহারা স্বামীজীর
নিকটে গ্রীনএকর্ হইয়া যাইত।
ধর্মসম্মেলনের ইওরোপীয়গণ ভারতীয়দিগের
সমন্বয়ের আদর্শভদ্র ব্যবহার করিত। স্বামীজী
গোঁড়াদের স্থান বলিতে হৃদয়াবেগে উত্তেজিত
ভাবাবলম্বীদের স

মিস সারা তখনকার চেহারা ছবিতে দেখা
ইয়র্কে পরিচি ছবি বা বিবরণে তাঁহার চক্ষুর
সম্মেলনে ক পরিচয় পাওয়া অসম্ভব। তাঁহার
মাসে চক্ষুর অপূর্ব আকর্ষণ ছিল, লোকে
না হইয়া পারিত না। তাঁহার কণ্ঠস্বরেও এক অবর্ণনীয় আকর্ষণ ছিল। তাঁহার স্বর সুখশ্রাব্য ছিল এবং লোককে আকৃষ্ট করিয়া প্রভাবান্বিত করিত।

শ্রীনিবাসের স্মৃতি হইতে উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি : সাধারণ বাঙালীর মতো স্বামীজীর শরীর কোমল ছিল না, তাঁহার শরীর ছিল দৃঢ় ও বলিষ্ঠ। তাঁহার গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—একটু তামাটে আভাবিশিষ্ট।

স্বামীজীর ব্যবহার স্বাভাবিক, সরল কিন্তু সব সময় প্রচলিত রীতিসম্মত ছিল না। আমরা সাধু-সম্বন্ধে যে গুরু গম্ভীরভাব পরিমিত উক্তি প্রভৃতি ধারণা করি, তাঁহার মধ্যে কিন্তু সেরূপ দেখি নাই। কখনও কেহ নিজের বিদ্যা জাহির করিলে বা মূর্খের মতো প্রশ্ন করিলে তিনি প্রয়োজনবোধে কঠোর ভাষায় প্রশ্নকারীকে নিরস্ত করিতেন। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর একদিন বহু প্রশ্ন ও উত্তরের পরে একজন বেশ বিজ্ঞের মতো প্রশ্ন করেন, 'সংসারে দুঃখের কারণ কি?' স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'অজ্ঞানই দুঃখের কারণ।' আর একদিন একজন বলেন, 'স্বামীজী, আপনার মত শঙ্করের মত হ'তে ভিন্ন।' স্বামীজী উত্তর দিলেন, 'শঙ্কর একজন মানুষ, তুমিও মানুষ; তুমি নিজে চিন্তা কর।' একজন গোঁড়া পণ্ডিত স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া নিজের বিদ্যা জাহির করিতে থাকেন। স্বামীজী পরে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন, 'জ্ঞান-শব্দই যে ঠিক-মত উচ্চারণ করতে পারে না, সে কিনা সংস্কৃত-উচ্চারণের ভুল ধরার স্পর্ধা রাখে।'

১৮৯৭ খৃঃ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে মাদ্রাজে স্বামীজীকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তাহা বর্ণনাতীত এবং যে লোকসমাগম হয়, সেরূপ কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। মাদ্রাজে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতার সময় এত ভিড় হয় যে, একটি সার্কাসের তাঁবুতে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইলেও দেখা গেল—স্থানাভাব! তখন স্বামীজী বাইরে আসিয়া একটি গাড়িতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দেন। কিন্তু জনসমুদ্রের কোলাহলে তাঁহার কণ্ঠস্বর ডুবিয়া যায়, তিনি বক্তৃতা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। বর্তমান 'কুইন মেরী' কলেজের নিকটে এবং পুরাতন 'ক্যাপার হাউস' হোটেলের নিকটে একটি তাঁবুতে প্রাতে

আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা হয়। ইহা বেশ সফল হইয়াছিল।

একটি ইংরেজ মহিলা ব্রহ্মচর্যের বিরুদ্ধে বলেন এবং সন্ন্যাসীর ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজন বুঝাইলেও মহিলাটির খুব মনঃপূত না হওয়ায় এবং বুঝিতে অক্ষম দেখিয়া স্বামীজী কৌতুক করিয়া বলেন, 'মহাশয়া, আপনার দেশে অকৃতদারকে ভয় করে, কিন্তু দেখুন—এরা অকৃতদার আমাকে পূজা করে।'

একদা স্বামীজী কয়েকজন ছাত্র-শ্রোতাকে বলেন, 'শক্তি ও স্বাস্থ্য চর্চা কর। গীতা বাম হাতে রেখে ডান হাতে ফুটবল নাও!' একবার তিনি বলেন, 'যারা দুর্বল, তারাই সহজে প্রলুব্ধ হয়। যাদের যথেষ্ট তেজ-বীর্য আছে, তারা প্রলোভন জয় করতে পারে এবং বেশী সংযমী হয়।' একবার তিনি নিজের সম্বন্ধে বলেন, 'এই গেরুয়ার নীচে পালোয়ান আছে।'

এই সময় স্বামীজী বিলিগিরি আয়াঙ্গারের 'ক্যাসল্ কার্নন'-নামক গৃহে বাস করিতেন। আমরা কয়েকজন ছাত্র স্বামীজীর সঙ্গে এখানে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিবার সুযোগ পাই। স্বামীজী কৌতুক করিয়া বলেন, আমি সব ত্যাগ করতে পারি, একমাত্র ঐ সামনে যে আইসক্রীম আছে—তা-ছাড়া।' বাঙ্গালোর হইতে স্বামীজীর বন্ধুরা ফলের ঝুড়ি পাঠাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া আমাদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন, নিজেও একটু খাইতেন। কখনও তিনি ছাত্রদের লইয়া ঐ বাড়ির নিকটে সমুদ্রে স্নান করিতেন।

যখন জনসাধারণের উপর হিন্দু ও খৃষ্ট ধর্মের প্রভাবের কথা উঠে, স্বামীজী তখন বলেন, 'যদি তোমরা আমার মতো ইওরোপ-আমেরিকার নিঃস্বদের পল্লী দেখতে এবং যদি দেখতে সেখানকার বাসিন্দারা কিরূপ পশুতুল্য জীবন যাপন করে এবং তাদের সঙ্গে আমাদের জনসাধারণকে তুলনা করলেই তোমাদের মন থেকে জনসাধারণের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হয়ে যেত।'

সারা বার্নার্ড

সারা বার্নার্ড (Sarah Bernhardt) ফরাসীদেশীয়া বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁহার অভিনয়-নৈপুণ্যে তদানীন্তন পাশ্চাত্য ধনী, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও কলা-রসিকগণের মধ্যে সারার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহাকে তখন সাধারণতঃ 'দৈবী সারা' (Divine Sarah) নামে ডাকা হইত। ধর্ম-মহাসভার পরে স্বামীজী যে-সময় নানা স্থানে ঘুরিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন, সে-সময় সারা তাঁহার দর্শনপ্রার্থিনী হন। স্বামীজীর বাগ্মিতা এবং উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব সহজ-সরলভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা সারাকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করে। এই জন্য সারা স্বামীজীকে খুব প্রশংসা করিতেন ও তাঁহার শিক্ষায় খুব উৎসাহ দেখাইতেন। এই সময় সারা আমেরিকায় উপস্থিত ছিলেন।

পারী ধর্মসম্মেলনের পূর্বে স্বামীজী যখন জুল বোয়ার গৃহে পারীতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় পুনরায় স্বামীজীর সহিত সারার সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজীর পত্রে জানা যায় যে, এই অভিনেত্রী ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন। সারা স্বামীজীকে বহুবার বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন ও সুসভ্য দেশ। তিনি একবার ভারতবর্ষ-বিষয়ক একটি অভিনয় মঞ্চস্থ করেন। ভারতের পথের পুরুষ, নারী, শিশু ও সাধু সহ একটি বাস্তব দৃশ্য মঞ্চোপরি পরিবেশন করেন। অভিনয়ের শেষে সারা স্বামীজীকে বলেন, 'আমি পুরা একমাস প্রত্যেক মিউজিয়াম দেখে বেড়াই এবং ভারত-

সম্বন্ধে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় সযত্নে লক্ষ্য ক'রে জেনেছি—সেখানকার পুরুষ, নারী ও তাদের পরিচ্ছদ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি কিরূপ।' সারার ভারত দেখিবার খুব ইচ্ছা ছিল। স্বামীজীর পত্রে পাওয়া যায়ঃ 'সারার জীবনের স্বপ্ন—ভারত-ভ্রমণ। সারা স্বামীজীকে গোপনে জানান যে, ওয়েল্‌সের যুবরাজ—পরে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড সারার ভারত-ভ্রমণের সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু বিধির বিধানে তাঁহার ভারত-ভ্রমণ সম্ভব হয় নাই।

রামস্বামী শাস্ত্রী

কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রীর স্মৃতিকথা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

১৮৯২ খৃঃ শেষ ভাগে কয়েকদিন ত্রিবান্দ্রমে স্বামীজীর পূতসঙ্গ লাভ করার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। পরে ১৮৯৭ খৃঃ পুনর্বার মাদ্রাজে তাঁহার সঙ্গ লাভ করি। এই মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভে আমার জীবন পবিত্র ও ধন্য হইয়াছে।

১৮৯২ খৃঃ আমার পিতা অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ার ত্রিবাঙ্কুরের যুবরাজ মার্তণ্ড বর্মার গৃহশিক্ষকরূপে ত্রিবান্দ্রমে বাস করিতেন। মাদ্রাজ সরকার আমার পিতাকে ত্রিবাঙ্কুর সরকারের অনুরোধে সাময়িকভাবে তথায় পাঠান। আমি এই বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিবান্দ্রমে মহারাজার কলেজে ভরতি হই। এই জন্যই স্বামীজীর সঙ্গলাভের সৌভাগ্য ঘটে।

একদিন প্রাতে আমি একজন প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক এবং দীপ্তিমান্ দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে আমাদের গৃহের সম্মুখে দেখি। তাঁহার মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা এবং কোমরে কটিবন্ধ। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'অধ্যাপক আয়ার আছেন কি? আমি তাঁকে দেবার জন্য একখানা পত্র এনেছি।' তাঁহার গলার স্বর পরিণত ও উচ্চ—যেন ঘণ্টানিনাদ; রোমঁ্যা রোলাঁ স্বামীজীর কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন, 'তাঁহার স্বর খাদ বেহালার ন্যায় সুন্দর, গম্ভীর অথচ উগ্র বৈষম্যহীন, কিন্তু গভীর কম্পনভরা, যাহা গৃহ ও হৃদয়পূর্ণ করিত।' আমার বয়স তখন ১৪ বৎসর মাত্র, স্বভাবতই বালকসুলভ অজ্ঞতায় আমি তাঁহাকে একজন 'মহারাজা' মনে করিয়াছিলাম। আমি পত্রখানি লইয়া দোতলায় পিতার নিকট দৌড়াইয়া গিয়া বলি, 'একজন মহারাজা এসেছেন এবং এই পত্র দিয়েছেন।' বাবা হাসিয়া বলিলেন, 'মহারাজারা আমাদের ন্যায় লোকের গৃহে আসেন না।' আমি বলিলাম, 'নীচে এসে দেখুন, নিশ্চয়ই একজন মহারাজা।' পিতা নামিয়া আসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া দ্বিতলে লইয়া গেলেন। স্বামীজীর সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপের পরে পিতা নীচে আসিয়া আমাকে বলেন, 'তিনি সত্যই একজন মহারাজা, কিন্তু ক্ষুদ্র এক ভূ-খণ্ডের রাজা নন। তিনি আত্মার সীমাহীন এবং শ্রেষ্ঠ রাজ্যের সম্রাট্।'

ঐ-সময় স্বামীজী আমাদের গৃহে নয় দিন ছিলেন। আমার পিতা ঐ কয়দিনের কথা 'আমার স্বামীজীর সহিত প্রথম নবরাত্রি' এই প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। ত্রিবান্দ্রমে সেই স্মরণীয় অতিথির কথায় আমার মনে যে অনপনেয় ছাপ পড়িয়াছিল, তাহা বলিব।

একদিন আমার পাঠ্যপুস্তক কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্' পড়িতেছিলাম। স্বামীজী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি প'ড়ছ?' বলিলাম, 'কুমারসম্ভব—প্রথম অধ্যায়।' তিনি বলিলেন, 'তুমি কি মহাকবির হিমালয়-বর্ণনা বলতে পারো?' আমি দক্ষিণ-ভারতের প্রচলিত সুরে

কালিদাসের হিমালয়-বর্ণনার সুন্দর ও সুললিত শ্লোক পাঠ করিলাম। স্বামীজী হাসিলেন। তাঁহাকে খুশী দেখাইতেছিল। তিনি বলিলেন, 'তুমি জানো, আমি হিমালয়ের ভাবগম্ভীর দৃশ্যের মধ্যে বহুদিন ছিলাম।' আমি স্বাভাবিকভাবে উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হইলাম। তিনি পুনরায় আমাকে কুমারসম্ভবের শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে বলেন। আমি তাহা আবৃত্তি করি এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্লোকটির অর্থও বলি। তিনি বলেন, 'বেশ! কিন্তু এই অর্থই যথেষ্ট নয়।' তিনি তখন তাঁহার আশ্চর্য মধুর পরিমিত কণ্ঠে শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন:

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

স্বামীজী বলেন: এই শ্লোকের তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ হ'ল 'দেবতাত্মা' এবং 'মানদণ্ড'। কবি বলছেন যে, হিমালয় শুধু একটি প্রাচীর নয় বা প্রকৃতির খেয়ালে হয়নি। হিমালয় দেবতাত্মা এবং ভারতের ও তার সভ্যতার রক্ষক; শুধু উত্তর মেরুর হিম-শীতল ঝঞ্ঝাবাত থেকেই নয়, ভয়ঙ্কর ও দুর্ধর্ষ আক্রমণকারীদের থেকেও ভারতকে রক্ষা করে। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই সব বড় বড় নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন। এই নদনদীগুলি মৌসুমী বৃষ্টির অপেক্ষা না রেখে হিমালয়ের বরফ-গলা জলে ভরা থাকে ও ভারতকে শস্যশ্যামলা করে। 'মানদণ্ড' দ্বারা কবি বুঝাতে চান যে, ভারতীয় সভ্যতা সকল মানব-সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং এই সভ্যতার মানদণ্ডে বর্তমান অতীত বা ভবিষ্যৎ—সব সভ্যতাই পরীক্ষিত হবে। কবির স্বদেশপ্রীতি এতই উচ্চস্তরের ছিল! —তাঁহার কথায় আনন্দে আমার শিহরণ জাগিল, অদ্যাবধি আমি তাহা মনে রাখিয়াছি এবং এখনও আমার অন্তরে ঐ কথাগুলি তেমনই উজ্জ্বল আছে, একটুও ম্লান হয় নাই।

একদিন স্বামীজী বলেন, 'বাস্তবিক পক্ষে দেশপ্রীতি শুধু একটা ভাবপ্রবণতা বা দেশকে ভালবাসার আবেগ নয়, দেশপ্রেম হচ্ছে—স্বদেশবাসীকে সেবা করবার প্রবল বাসনা। আমি পায়ে হেঁটে সারা ভারত ঘুরেছি ও দেশবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখেছি। আমার প্রাণে আগুন ধরেছে এবং তাদের অবস্থা পরিবর্তন করবার ভীষণ ইচ্ছা আমার ভেতরে জ্বলছে। কর্মফলের কথা তুলো না। যদি তাদের কর্মে তারা দুঃখ পাচ্ছে বলো, তবে আমাদের কর্ম হচ্ছে—তাদের দুঃখ দূর করা। যদি ঈশ্বর লাভ করতে চাও, মানুষের সেবা কর।'

অন্য একদিন স্বামীজী আমাকে বলেন: তুমি বালকমাত্র। আমার ইচ্ছা, তুমি উপনিষদ্ ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতা—এই প্রস্থানত্রয় খুব ভক্তিভরে পড়বে, আর পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতিও পড়বে। পৃথিবীর কোথাও এমন মূল্যবান্ আর কিছু পাবে না। প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই প্রাণে—'কোথা হ'তে, কোথায়, কেন ও কি প্রকার?'—এই সব প্রশ্ন ওঠে। চারটি মূল কথা তোমার জানা দরকার, যথা—অভয়, অহিংসা, অসঙ্গ ও আনন্দ। এই হচ্ছে শাস্ত্রের মূল কথা—মনে রেখো; পরে অর্থ বুঝবে।

নয় দিন আমাদের বাড়িতে যখন স্বামীজী ছিলেন, আমি প্রায়ই তাঁহার নিকট থাকিতাম, কারণ তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। তাঁহার মধ্যে যেন চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি ছিল। আমার পিতার সহিত স্বামীজীর নানা বিষয়ে আলোচনা হইত, যাহা আমার বোঝার ক্ষমতার বাহিরে ছিল। কিন্তু স্বামীজীর চক্ষু চুম্বকের ন্যায় ছিল—যদিও দয়া ও ভালবাসায়

পূর্ণ। তাঁর গলার স্বরে অসাধারণ মাধুর্য ও শক্তি মিশ্রিত ছিল, এবং তাঁহার চালচলন এত রাজোচিত ছিল যে, আমি তাঁহার কাছে থাকিলে অত্যন্ত আনন্দ পাইতাম। তিনি আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন অন্য সময়। কিন্তু আজ ৬০ বৎসর পরে সেই সব কথা মনে নাই। শুধু পূর্বোক্ত কথাগুলিই ঠিক মনে আছে।

মাদ্রাজে ১৮৯৭ খৃঃ স্বামীজীকে যখন অভূতপূর্ব সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তখনও আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি ঐ ৯ দিনই তাঁহার সঙ্গলাভে ধন্য হই। এই সময় স্বামীজীর ভিতরে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করি। ১৮৯২ খৃঃ স্বামীজী যেন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় ছিলেন না, কিন্তু ১৮৯৭ খৃঃ তিনি শুধু যে স্থিরনিশ্চয় তাহাই নহে, তাঁহার ব্যক্তিত্বে দিব্যভাব প্রকাশ পাইত এবং সকলে যে তাঁহার কথা মান্য করিবে—সেই সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ।

১৯৫২ খৃঃ মে মাসে আমি বেলুড় মঠে স্বামীজীর ঘরে প্রবেশলাভের অধিকার পাইয়া কৃতার্থ হই।

প্রশ্নোত্তর

শ্রীগৌরপদ দাশ

বিবেকানন্দ পরমানন্দে আলোয়ারবাসিগণে,
ভজনে ও গানে বিমোহিত করি তোষিছেন জনে জনে ;
অশ্রুতে ভরা নয়নযুগল সিক্ত করিছে বদনকমল,
হৃদয় আবেগ উজাড় করিয়া গাহিছেন একমনে,
শুনিছে ভক্ত আলোয়ারবাসী আগ্রহে সযতনে।

এই কথা ক্রমে যাইল রটিয়া সারাটি রাজ্য মাঝে,
আলোয়ার-রাজ শুনি স্বকর্ণে ডাকিল একদা সাঁঝে ;
বীর-ঈশ্বর বিবেকানন্দ প্রসন্নমুখ পরমানন্দ
নির্ভীক স্বরে কন, 'মহারাজ, বল মোরে কোন কাজে,
আদেশ করেছ আসিতে হেথায়—রাজপ্রাসাদের মাঝে ?'

শুনি মহারাজ কন, 'সন্ন্যাসী, শুনিয়াছি তুমি জ্ঞানী,
নানান উপায়ে পার সঞ্চিতে প্রভূত অর্থ জানি,
তাহা না করিয়া তুমি কিনা শেষে
ভিক্ষা করিয়া ফির দেশে দেশে,—
ইহার অর্থ বুঝিতে না পারি, অর্থে কি হ'ত হানি ?
ভিখারীর বেশে ঘোরো দেশে দেশে কেন—কহ সেই বাণী।'

শুনি এই কথা বিবেকানন্দ বচসা না করি মেলা—
স্মিত হাসি হেসে কন, 'মহারাজ, শুন তবে এই বেলা—
দিবস-রজনী কেন অনুখন শ্বেতাঙ্গ-সনে হইয়া মগন
শিকার করিয়া ফির হেথা হোথা রাজকাজে করি হেলা ?
ইহার অর্থ কও তুমি রাজা, এ কোন্ রাজার খেলা ?'

নির্ভীক এই বাণী শুনি রাজা—অতীব হৃষ্টমনে
কহেন, 'স্বামীজী, ভালো লাগে তাই শিকারেতে ঘুরি বনে।'
স্বামীজী কহেন, 'আমারও সেরূপ—
ভালো লাগে তাই ভিখ মাগি ভূপ,
বুঝিলে তো কেন ঘরে ঘরে ফিরি ?' নরপতি সযতনে—
কহিল, 'বুঝেছি—আলো দেখাইতে মূঢ় এ অন্ধজনে।'

'গীতা সুগীতা কর্তব্যা'

স্বামী ধীরেশানন্দ

গীতামাহাত্ম্যে বলা হইয়াছে:

গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥

গীতাই উত্তমরূপে অধ্যয়ন করা কর্তব্য, অন্য বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কি ফল?

প্রশ্ন হইতে পারে যে, কোন্ গীতাপাঠের কথা এখানে বলা হইতেছে? কারণ 'গীতা' তো বহু আছে—অবধূতগীতা, রামগীতা, শিবগীতা, পাণ্ডবগীতা, গুরুগীতা ইত্যাদি। উত্তরে বলা হইয়াছে: যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।

—অর্থাৎ যে 'গীতা' পদ্মনাভ বিষ্ণুর পূর্ণাবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহাই স্বাধ্যায়-প্রবচন করা কর্তব্য। তাই ইহার নাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। 'গীতা' ভগবানের গীত—ভগবানের স্বভাব সংসার-দুঃখাতুর, শতসংশয়াকুল জীবকে সদা সুমধুরস্বরে পরমানন্দধামের বার্তা গাহিয়া শোনানো। যে-কেহ ভাগ্যবান্, সেই শুনিতে পায়।

জীব সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া সদা শোকে মুহ্যমান, সদা ক্রন্দনে রত। শতদুঃখে কাতর হইয়া, শত দুর্দৈবের পাষাণচাপে পিষ্ট হইয়া, নিতান্ত অনন্যশরণ হইয়াই মানুষ ভগবানের শরণ লয় ও তাঁহার দিব্যগীত-শ্রবণে প্রয়াসী হয়। অর্জুনের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আসন্ন যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-মিত্র সকলের সম্ভাবিত নিধনাশঙ্কায় ভীত ও শোকগ্রস্ত হইয়াই অর্জুন ভগবানের শরণ লইয়াছিলেন ও এই দিব্যগীত-শ্রবণে অন্তিমে কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছিলেন। বিষাদের মধ্য দিয়াই অর্জুনের ভগবানের সঙ্গে যোগ হইল। তাই কি 'গীতা'র প্রথম অধ্যায়টির নাম—'বিষাদযোগ'? এবং 'গীতা'র প্রথমেই অর্জুনের বিষাদ বর্ণিত?

'গীতা' যদিও স্মৃতিশাস্ত্র, তথাপি ইহাতে সংগৃহীত বিষয়সমূহের গাম্ভীর্য ও সার্বলৌকিক উপাদেয়তা-দর্শনে ইহাকে শ্রুতিতুল্য সম্মান দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতি অধ্যায়ের শেষেই এরূপ লেখা দেখিতে পাওয়া যায়:

'ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে······ অধ্যায়ঃ ॥'—এই পঙ্‌ক্তিটি বিচার করিলে গীতার বিষয়াদি অনেক তথ্য জানা যায়। পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতাকে 'উপনিষৎ' বলা হইয়াছে। যে তত্ত্বজ্ঞান যাবতীয় সংসার-দুঃখ মূল-অজ্ঞানসহ বিনাশকরত জীবকে পরমানন্দস্বরূপে—পরব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়, তাহাই 'উপনিষৎ'। 'গীতা'ও তাই। 'গীতা' এখানে 'উপনিষৎ' শব্দের বিশেষণ। 'উপনিষৎ' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। তাই বিশেষণ 'গীতা' শব্দটিও স্ত্রীলিঙ্গ। বিশেষণদ্বারাই বিশেষ্যকে যখন বোঝানো হয়, তখন লোকে আর বিশেষ্যের প্রয়োগ করে না। এইজন্য শুধু 'গীতা' বলা হয়। 'গীতা' অর্থ যাহা গান করা হইয়াছে। উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবিদ্যাই শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থে সুমধুর সুরে গান করিয়াছেন। তাই ইহার পুরা নাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষৎ'। সংক্ষেপে 'ভগবদ্গীতা' বা 'গীতা'। 'গীতা'তে ব্রহ্মবিদ্যাই আলোচিত হইয়াছে। কারণ শোক-মোহাদি সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইহাই

একমাত্র উপায়। ইহাই 'যোগশাস্ত্র'—কর্মযোগের তত্ত্বজ্ঞাপক শাস্ত্র। 'গীতা'তে পুনঃ পুনঃ নিষ্কাম কর্মযোগের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে; উহাও ব্রহ্মবিদ্যারই অন্তর্গত। পুনঃ বলা হইয়াছেঃ 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে'—শ্রীকৃষ্ণার্জুনের পরস্পর কথোপকথনরূপে ব্রহ্মবিদ্যা-লাভের জন্য নিষ্কাম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি নানা শাস্ত্রোক্ত সাধন, নানা রহস্যকথা এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের রীতিতে রচিত হয় নাই। ইহা বন্ধুদ্বয়ের—গুরুশিষ্যের কথোপকথন; অর্জুনের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে, তাহাই তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ভগবান্‌ও তাহার যথাযথ উত্তর দিয়াছেন। সম্পর্কে কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষ্বসা—অর্থাৎ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। বাল্যাবধি উভয়ের পরস্পর প্রীতি অপরিসীম। অর্জুন ভগবান্‌কে—সমপ্রাণ সখারূপে, স্নেহময় ভ্রাতারূপে এবং গীতায় দেখিতে পাই তত্ত্বোপদেষ্টা গুরুরূপে—নানা ভাবে পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। প্রিয় বন্ধুর প্রতি, একান্ত শরণাগত ভক্তশিষ্যের প্রতি ভগবানের প্রীতিময় এই জ্ঞানোপদেশ বড়ই মধুর। নানাপ্রকারে তত্ত্বজ্ঞানের কথাই এখানে আদ্যন্ত আলোচিত। কখনও ভগবান্ বন্ধুভাবে অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, কখনও বা গুরুরূপে তাঁহাকে সাবধান করিতেছেন।

'নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে' (২।৩);
'প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' (২।১১);
'ভক্তোঽসি মে সখা চেতি' (৪।৩);
'যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া' (১০।১);
'ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্‌ক্ষ্যসি' (১৮।৫৮);
'যথেচ্ছসি তথা কুরু' (১৮।৬৩);
'প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে' (১৮।৬৫)।

—ইত্যাদি বহুস্থলে আমরা দেখিতে পাই, কখনও বন্ধুভাবে, কখনও বা গুরুভাবে ভগবান্ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন।

অর্জুনের প্রশ্নেও এই দুই সম্বন্ধ সুস্পষ্ট।

'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' (২।৭);
'বুদ্ধিং মোহয়সীব মে' (৩।২);
'তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্' (৫।১);
'স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম' (১০।১৫)
'দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্' (১১।৪);
'সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তম্' (১১।৪১);
'করিষ্যে বচনং তব' (১৮।৭৩)

—এইপ্রকার বহু স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরজ্ঞানে, গুরুজ্ঞানে শরণার্থী হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, কোথাও বা প্রিয়সখার ন্যায় নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলিয়া বলিতেছেন। গুরু-ভাষার গাম্ভীর্য ও বন্ধু-ভাষার মধুরতা—এই উভয় একত্র মিলিত হইয়া 'গীতা'র ভাষাকে এক অপরূপ আকার প্রদান করিয়াছে।

'গীতা' শ্রীকৃষ্ণের কষ্টকল্পিত রচনাবিশেষ নহে—আত্মযোগসমাহিত অবস্থায় উচ্চারিত। ইহা তাঁহার অনুভূতিসমুজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত বাণী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কালান্তরে অর্জুন পুনঃ ঐ উপদেশ শুনিতে চাহিলে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, 'যুদ্ধপ্রারম্ভকালে তুমি বিষাদগ্রস্ত ছিলে এবং আমিও আত্মসমাহিত ছিলাম—তাই তৎকালে ঐ উপদেশ আমার মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। এখন তোমার ও আমার উভয়েরই সেই পূর্বাবস্থা আর নাই, তাই এখন আর সে উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে।'—ইহা হইতেই 'গীতা'র মহত্ত্ব আমরা অনুমান করিতে পারি। কর্ষিত ভূমি ও উত্তম বীজের সম্মিলনে যেমন শস্যাদি উৎপন্ন হয়, গুরু ও শিষ্য উভয়ের

উপযুক্ততায় তদ্রূপ ধর্মতরু উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্জুনের ন্যায় সর্বগুণাধার শিষ্য ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় গুরু একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, তাই আজ এই 'গীতা'রূপ তত্ত্বোপদেশ লাভকরত জগদ্বাসী ধন্য হইয়াছে।

'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা'—সর্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত গীতায় গ্রথিত। ভারত-সংস্কৃতির অমূল্য রত্ন 'গীতা' বিশ্বসংস্কৃতি-ভাণ্ডারের অপূর্ব শোভা বর্ধনকরত তাহাকে মহনীয় করিয়াছে।

'দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ'—গীতাকে দুগ্ধরূপ অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। ঘৃত বা মাখন বলা হয় নাই। তাহার কারণ—যত লাভ দুধ হইতে হয়, ঘৃত হইতে তত হয় না। দুধ হইতে দধি-পনীরাদি—সব কিছুই পাওয়া যাইতে পারে। বাল্যাবস্থা হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত লোক দুধ খাইয়া পুষ্ট হয়। অর্জুনের হৃদয়েও বিবেকরূপী শিশুর জন্য ভগবান্ এই গীতারূপী দুগ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। গীতার বিষয়ে ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন ঃ

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্॥

—গীতাই ভগবানের আশ্রয়, গীতাজ্ঞানসহায়েই তিনি সকলের পালক ও পোষক। সমগ্র বেদ-বেদান্তপাঠে যে-জ্ঞান লাভ হয়, এক গীতাধ্যয়নেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে সেই ফল লাভ হয়। সর্ব বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী বিষয় ইহাতে পাওয়া যায়। গীতা সর্বতোমুখী।

গীতার আঠারোটি অধ্যায়। কেহ কেহ শঙ্কা করেন, 'কেন? আঠারোটি অধ্যায় কেন? সতেরো বা উনিশটি অধ্যায়ও তো হইতে পারিত?' ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন, 'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা'—বিদ্যার অষ্টাদশ প্রস্থান। চার বেদ, চার উপবেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা—এই অষ্টাদশ প্রস্থানের সারাংশ লইয়া রচিত বলিয়াই গীতার অধ্যায়-সংখ্যা আঠারো, তন্ন্যূন বা তদধিক নহে। অর্জুন যেন সমগ্র মানবজাতির প্রতীক। প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়াই ভগবান্ সকলের কল্যাণের জন্য যোগসমাহিত চিত্তে এই অমূল্য উপদেশ করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুরলীধর, আবার চক্রধরও বটেন। তিনি কেবল প্রেমের বাঁশী বাজাইয়া ব্রজবাসিগণের মনোহরণ করিয়াই আপন কর্তব্য সমাপন করেন নাই, সুদর্শনচক্র ধারণ করিয়া অর্জুনপ্রমুখ সকলকে অধর্ম অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেও উৎসাহিত করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমুল কর্মোদ্যমের মধ্যেও আত্মনিষ্ঠ প্রশান্তি—এই কর্মযোগ, এই অনাসক্তিযোগই নিজ জীবনে প্রকৃষ্ট আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অনাসক্তিযোগ-অভ্যাসে শত বিপদ্ ও ভোগের মধ্যেও পুরুষ অবিচলিত থাকেন, সাংসারিক সর্ব কর্ম করিয়াও তিনি অন্তরে নিঃস্পৃহ শান্ত সমাহিত থাকেন। কর্মের সিদ্ধি-অসিদ্ধি-জনিত সুখ-দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না।

শিকারে বহির্গত ঘোর জঙ্গলে পথভ্রান্ত এক রাজা বনমধ্যে নিবাসকারী এক মহাত্মার আতিথেয়তায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্ধরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্মাও তাঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য রাজতুল্য ঐশ্বর্যের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পর রাজা বলিলেন যে, এখন তাঁহার ও মহাত্মার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। মহাত্মা উত্তর দিলেন, 'চল রাজন্, আমরা আবার সেই জঙ্গলে যাই।' কিন্তু ভোগাসক্ত রাজার সে সামর্থ্য কোথায়? তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কিন্তু তখনই তাঁহার সেই কন্থা-কমণ্ডলু লইয়া চলিয়া গেলেন। রাজ্য ঐশ্বর্য—সব পড়িয়া

রহিল। দেখাইলেন—পার্থক্য কোথায়!

এইরূপ বৈরাগ্যের অত্যুজ্জ্বল প্রভায় শ্রীকৃষ্ণের জীবন আলোকিত। অত সাধের, অত প্রিয় বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য তিনি মথুরায় চলিয়া গেলেন। কংসবধের পর মথুরারাজ্য স্বীয় করতলগত হইলেও উহা তিনি তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞানকরত কংসের পিতা উগ্রসেনকেই সেই রাজ্যের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। দ্বারকাতে রাজ্য স্থাপন করিয়াও তিনি নিজে রাজা হইলেন না। জরাসন্ধ বধ করাইয়া মগধরাজ্যও তিনি নিজে গ্রহণ করেন নাই, জরাসন্ধপুত্র সহদেবকেই সেই রাজ্য প্রদান করিলেন। সহদেব-প্রদত্ত অপরিমিত ধনরত্ন রাজসূয়-যজ্ঞ করিবার জন্য যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিলেন। ময়দানবকে দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের জন্য অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ করাইয়া দিলেন। নিজের জন্য কিছুই চাহিলেন না। এই সবই শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্য বা অনাসক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণের অনাসক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ—যদুবংশনাশ। সমর্থ হইয়াও তিনি স্বকুলরক্ষণার্থ কোন প্রচেষ্টা করিলেন না। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহারই সবলভুজদ্বয়রক্ষিত, আশ্রিত যদুকুল ধনমদে মত্ত ও ঐশ্বর্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়া পৃথিবীর ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি নিজে ধরাধাম হইতে বিদায় লইবার পর ইহারা সকলের ভীতিস্বরূপ হইয়া পড়িবে ও সাধুজন নিগৃহীত হইবে। তাই ধন, অসংযত ভোগ ও ঐশ্বর্যের চরম পরিণতি যে বিনাশ—এই আদর্শও তিনি লীলাসংবরণের পূর্বে দেখাইয়া গেলেন। অদৃষ্টের সুনিয়ন্ত্রিত বিধানে তাঁহার সম্মুখেই যদুকুল বিনষ্ট হইল। এই সব দেখিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ধীর, শান্ত, নির্বিকার ও অনাসক্ত।

সর্বাবস্থাতেই তিনি অবিচলিত। ইহাই শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের বিশেষত্ব। গীতায় যে অনাসক্তিযোগের কথা তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—তাঁহার নিজের জীবন। দৈনন্দিন জীবনে তাঁহার নিত্য-নিয়মিত জপ, সন্ধ্যাবন্দনা, হোম, অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণপূজন ইত্যাদির কখনও ব্যতিক্রম হইত না। ভগবদারাধনা, ব্যতীত শুধু কর্মদ্বারা কখনও মানবজীবন সার্থক হয় না। কর্ম ও উপাসনা একত্র অনুষ্ঠেয়। অনুগত ভক্ত শিষ্য অর্জুনকেও তিনি তাই বলিলেন:

> 'মামনুস্মর যুধ্য চ' (৮।৭)—হে অর্জুন! তুমি আমাকে সদা স্মরণ কর ও স্বীয় কর্তব্য অনলসভাবে করিয়া যাও।

—এই উপদেশ তিনি নিজেও পালনকরত আদর্শ স্থাপন করিয়া গেলেন।

গীতার পটভূমিটিও বড় সুন্দর, অপূর্ব। উহার মধ্যেও আমরা কিছু রহস্যের সন্ধান পাই। গীতার উদ্ভবস্থল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-প্রাঙ্গণ। যুদ্ধকামী বিবদমান দুটি পক্ষ পরস্পর মুখোমুখী হইয়া দণ্ডায়মান। সর্ববিধ্বংসী কালসমর আরম্ভ হইতে আর বিলম্ব নাই। কেবল সঙ্কেতের অপেক্ষা মাত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি। এমন সময় অর্জুন বলিলেন: 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।' (১।২১)

—হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যস্থলে রথ স্থাপন কর। কারণ সেখান হইতেই অর্জুন যুদ্ধকামী সকলকে দর্শন করিবেন। সারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও রথ চালিত করিয়া দুইদলের মধ্যস্থলে রথ স্থাপন করিলেন। দুই দলের মধ্যস্থলে যে ভূমিখণ্ড, উহাকে নিরপেক্ষ-ভূমি (Neutral Zone) বলা হয়। এখানেই সংঘটিত হইল গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তররূপী কথোপকথন। আসন্নস্বজনবধ-ভয়ে ভীত অর্জুনের যে প্রশ্ন, তাহা সকল অধ্যাত্মজ্ঞান-পিপাসুরই অন্তরের

চিরন্তন প্রশ্ন। উহা কেবল অর্জুনের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে—এই মাত্র। উহার উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যাহা বলিয়াছেন—তাহাই 'গীতা'। গীতার কথন ও শ্রবণ সবই হইয়াছে এই নিরপেক্ষ-ভূমিতে। কোন দলের মধ্যে বসিয়া ভগবান্ উপদেশ দেন নাই, এবং অর্জুনও ঐভাবে শোনেন নাই। গীতার উপদেশ আমাদেরও শুনিতে হইবে—অর্জুনের ন্যায় নিরপেক্ষ-ভূমিতে দাঁড়াইয়া ; তবেই ইহা ফল প্রসব করিবে। মনকে রাগদ্বেষ, অহংতা ও মমতা রহিত করিয়া নিরপেক্ষ করিতে হইবে তবেই গীতাশ্রবণ সার্থক হইবে। অভিমানাচ্ছন্ন হইয়া, স্বীয় পরকীয় এই ভেদবুদ্ধি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকিলে গীতার মর্ম উপলব্ধি হইবে না। অর্জুনও যখন অভিমানরহিত হইয়া নিরপেক্ষ হইয়াছিলেন, তখনই গীতাতত্ত্ব তাঁহার চিত্তমধ্যে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অন্তে

'নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা···করিষ্যে বচনং তব।'

—আমার মোহান্ধকার অপহৃত হইয়াছে, আত্মস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে। হে মধুসূদন! এখন আমি তোমার আদেশ অকুণ্ঠচিত্তে পালন করিব।

—এই কৃতকৃত্যতার ধ্বনি তাঁহার কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও যোগ-সমাহিতচিত্তে অসঙ্গ নিরপেক্ষ আত্মস্থ হইয়াই উপদেশ দিয়াছিলেন। গীতার পটভূমি—রণ-মধ্যভূমি—এই রহস্যেরই ইঙ্গিত দিতেছে। চিত্তে নিরপেক্ষ, সর্বপ্রকার সাংসারিক সম্বন্ধ ও ব্যবহারের প্রতি উদাসীন ভাব আনয়ন করিতে না পারিলে অন্তরে ধর্মভাব বিকশিত হয় না, অন্তর্নিহিত অসঙ্গ আত্মার স্ফুরণ হয় না।—গীতার সবই মহত্বপূর্ণ।

বিচারদৃষ্টিতে দেখিলে বোঝা যায়, যাবতীয় ভেদজ্ঞানই দুঃখের কারণ। অনাত্মীয় ভাব হইতেই শত্রুতার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিশ্ব-বন্ধুত্বের প্রথম সোপান—আত্মীয়ভাব। অনাত্মীয়-ভাব দূর না হইলে সংসার হইতে হিংসাত্মক সর্বধ্বংসী যুদ্ধও দূর হইবে না। এই অনাত্মীয়-ভাব হইতেই মহাভারতে কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের সূচনা। গীতার প্রথম শ্লোকেও ইহাই সূচিত হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয়॥

—এই প্রশ্নটি দেখিয়াই স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, মহাভারতের সর্বসংহারী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ যে চক্রবর্তী রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যিনি বংশের প্রধান—**'মামকাঃ'** দুর্যোধনাদি আমার ও **'পাণ্ডবাঃ'** যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতার পুত্র, তাঁহারা ভিন্ন, আমার নহে—এরূপ ভেদবুদ্ধি রাখিতেন, স্বপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে এক সমদৃষ্টিতে দেখিতেন না, সেখানে ক্ষত্রিয়কুলবিধ্বংসী সমরানল প্রজ্বলিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? ধৃতরাষ্ট্র কেবল চর্মচক্ষুবিহীন ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার প্রজ্ঞাচক্ষুরও অভাব ছিল এবং সে জন্যই তিনি এই প্রকার অনাত্মীয় ভাব পোষণপূর্বক স্বপরবিনাশের হেতু হইয়াছিলেন। একতা আত্মীয়ভাব ভিন্ন সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

গীতাদি সর্বশাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, সমজ্ঞানেই পরম শান্তি। সমগ্র বিশ্বকে আপন স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারিলেই রাগদ্বেষবিমুক্ত হইয়া শাশ্বত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সকল প্রাণীই আমার রূপ, সর্বপদার্থই স্ব-স্বরূপ বলিয়া বোধ করিলে নিজের সঙ্গে তো আর কেহ রাগ-দ্বেষ করিতে পারে না?

'অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।'

—আপন, পর—এই ভেদবুদ্ধি নীচবুদ্ধি লোকেরই হইয়া থাকে।

'উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।'
—উদারচিত্তগণের নিকট সকলেই আপন।

ভেদজ্ঞান হইতেই দুঃখ, রাগ, দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুরদাস তাঁহার কোন পদে গাহিয়াছেন যে, চতুর্দিকে দর্পণশোভিত কক্ষে প্রবিষ্ট কুকুর যেমন সর্বতঃ আপন প্রতিবিম্বসমূহ দর্শনকরত দ্বেষাবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতে থাকে, এই সংসারে জীবের অবস্থাও তদ্রূপ। মায়ারূপ দর্পণে আপন প্রতিবিম্বসমূহ দর্শন করিয়া জীবও রাগদ্বেষদ্বারা অভিভূত হইয়া জীবনে কত বিসদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে সারমেয়সদৃশ আচরণ কখনই শোভনীয় নহে। আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও রাগদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার ইতর প্রাণীতেও দৃষ্ট হয়। মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় বিবেক-বিচারাদি-সহায়ে পরমার্থবস্তুর প্রাপ্তিতে। গীতা সেই মার্গেরই সন্ধান দিয়াছেন। পরমতত্ত্বজ্ঞানেই যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ। লৌকিক ব্যাপারেও দেখা যায়, কোন দুর্বল ব্যক্তি আপন জ্ঞান-বিচারসহায়ে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী, অপর সরল ব্যক্তি জ্ঞানহীন হওয়াতে দারিদ্র্য-ঢ়ত। লৌকিক জ্ঞানেরই যখন এরূপ মহত্ত্ব ও আদর, তখন অলৌকিক ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের মহত্ত্ব সহজেই অনুমেয়। জ্ঞান অমূল্য নিধি।

অর্জুন গুড়াকেশ অর্থাৎ নিদ্রাজয়ী। ইহার অর্থ এই যে, যতটুকু নিদ্রা প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই তিনি নিদ্রা যাইতেন। লোকে অতিনিদ্রায় বৃথা আয়ুক্ষয় করে, কিন্তু নিদ্রা অর্জুনকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারে নাই; অর্জুনই নিদ্রাকে বশে রাখিয়াছিলেন। এই-প্রকার জিতেন্দ্রিয় সর্বপ্রকার দৈবীসম্পদ্সম্পন্ন অর্জুনেরও যুদ্ধপ্রারম্ভে মোহাবিষ্টতা ও ভয় বিস্ময়কর বটে! সময়বিশেষে সকলেরই চিত্ত এইপ্রকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। অর্জুন ভগবান্‌কে বলিলেন:

'শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্' (২।৭)

—আমি শরণাগত শিষ্য, আমাকে কর্তব্য নির্দেশ করুন। কিন্তু পরেই আবার বলিতেছেন—'ন যোৎস্যে' (২।৯)—আমি যুদ্ধ করিব না। যখন তিনি নিজেই স্থির করিয়াছেন যে যুদ্ধ করিবেন না, তখন 'আমি প্রপন্ন, আমার কি কর্তব্য, তাহা নির্দেশ দিন'—এরূপ বচন পরস্পর বিরোধী। নিজেই যখন কর্তব্য স্থির করিলেন, তখন আর শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করা কেন? ইহা দ্বারাই প্রমাণ হয় —অর্জুনের বুদ্ধি ব্যাকুল, বিভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত, মোহগ্রস্ত

বভূব হ' ২।৯—ইহা যথার্থ তুষ্ণীম্ভাব, মৌনভাব নহে। যুদ্ধচেষ্টা হইতে অর্জুন বিরত হইয়া বাহ্যতঃ মৌন হইলেন বটে, কিন্তু অন্তর তাঁহার অতি বিক্ষিপ্ত। স্বজনবধ-আশঙ্কায় শোকাকুল। এই শোক, মোহ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কিরূপে?—ইহারই উপায় গীতা বলিতেছেন

গীতার প্রথম অধ্যায়টি উপোদ্ঘাতমাত্র। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোক 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'—হইতে আরম্ভ করিয়া 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য……মা শুচঃ' (১৮।৬৬)—পর্যন্ত সমগ্র গীতাতেই মানুষকে শোকরহিত করিবার উপায় বলা হইয়াছে। আদিতে 'অশোচ্যান্' ও অন্তে 'মা শুচঃ' বলায় পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই অবগত হওয়া যায়।

গীতার বাণী—'মা শুচঃ'—শোক করিও না। শোক হয় মোহ হইতে। অর্জুনের আত্মীয়-স্বজনবিষয়ে মোহ ছিল, তাই তিনি শোকাকুল হইয়াছিলেন। বহুবিদ্যা, পাণ্ডিত্য, বহুগুণ, বিদ্যমান থাকিলেও শোকনিবৃত্তি হয় না। ছান্দোগ্য-উপনিষদে 'নারদ-সনৎকুমার'-সংবাদে

ইহা সুস্পষ্ট। অশেষ বিদ্যা অর্জন করিয়াও নারদ শোকরহিত হইতে পারেন নাই এবং সনৎকুমারের নিকট তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ গমন করিয়াছিলেন। নারদ বলিয়াছিলেন—'আমি বহু বিদ্যাধ্যয়নদ্বারা কেবল মন্ত্রবিৎ মাত্র হইয়াছি, এখনও আত্মবিৎ হইতে পারি নাই। একমাত্র আত্মবিৎই শোকরহিত হইতে পারেন। হে ভগবন্! আপনি শোকগ্রস্ত আমাকে শোকের পরপারে লইয়া যান।' (ছাঃ উপঃ ৭।১-৩)

শোকের কারণ মোহ, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন এই মোহ অন্য কোন উপায়ে নিবৃত্ত হইতে পারে না। গীতার ২।১১-৩০ শ্লোক পর্যন্ত শোকনিবৃত্তির উপায় আত্মজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। যখন এই উপদেশ ধারণা করত অর্জুন শোকবিমুক্ত হইতে পারিলেন না, তখন ভগবান্ তাঁহাকে নিষ্কাম কর্মযোগের উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। কর্মযোগের আদর্শ ভগবান্ নিজে কুরুক্ষেত্রের রণপ্রাঙ্গণেও দেখাইয়া গিয়াছেন। সংগ্রাম স্থলের তুমুল উত্তেজনার মধ্যে শান্তচিত্তে সমাহিতভাবে গীতামৃত বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন; সংসারে থাকিয়া, সর্ব কর্ম করিয়াও মনকে সংসারের ঊর্ধ্বে রাখিতে হইবে—ইহাই অনাসক্তিযোগ। এই নিষ্কাম অনাসক্ত কর্মযোগই গীতার প্রধান শিক্ষা। কুরুপাণ্ডবগণের সেনামধ্যস্থলে যেমন অর্জুনের রথ উপস্থাপিত, সেইরূপ মানবের জীবনরথটিও আসুরী ও দৈবীসম্পদ্‌রূপ সেনার মধ্যস্থলে বিরাজমান। আসুরী সেনার বিনাশের জন্য ভগবানের উপদেশ :

'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'—অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে সর্বদা ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ হইয়া যুদ্ধ করিয়া আসুরী সেনা পরাজিত কর। এই যুদ্ধেও বিজয়ী হইয়া অর্জুন জ্ঞানলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গীতোপদেশ চিত্তে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত না হওয়া পর্যন্ত অর্জুন বিগতমোহ হইতে পারেন নাই। অপরোক্ষ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াই অর্জুন অন্তে বলিয়াছিলেন : নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা…' (১৮।৭৩)—হে মাধব! তোমার কৃপায় এখন আমার অজ্ঞানজনিত মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে, আত্মস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে। এখন আমি ছিন্নসংশয়। নিশ্চিন্তে আপন কর্তব্য করিয়া যাইব।—সংসারশোকনিবৃত্তির জন্য গীতোপদেশ অনুষ্ঠান অপরিহার্য।

আচার্য বলিয়াছেন—'সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।'—যে বিদ্যা বা জ্ঞান মুক্তির কারণ, তাহাই যথার্থ বিদ্যা। জ্ঞানতুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই।। 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।' (৪।৩৮)

জ্ঞান মানবজীবনকে পরম পবিত্র করিয়া থাকে, মানবের সংসার-বন্ধন ছিন্নকরত তাহাকে ভূমা-য় ব্রহ্মরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

'পবেঃ সংসাররূপাৎ বজ্রাৎ ত্রায়তে রক্ষতি ইতি পবিত্রম্'—সংসাররূপ 'পবি' অর্থাৎ বজ্রপাত হইতে রক্ষাকর্তাকে 'পবিত্র' বলে। উহা তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। জ্ঞানই মহাপবিত্র বস্তু। সংসার দুঃখরূপ—'দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ' (যোগদর্শন ২।১৫)।

বিচারশীল বিবেকী সংসারকে দুঃখময় বলিয়াই জানেন। একমাত্র আত্মজ্ঞানই এই দুঃখ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে পারে, তাই ভগবান্ গীতায় প্রথমেই অর্জুনকে আত্ম-তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সর্বশেষেও তাহাই বলিলেন—'মামেকং শরণং ব্রজ' (১৮।৬৬)—তুমি মদেকশরণ হও। 'মাং' পদের সহিত 'একম্' পদ সংযোজিত হওয়াতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সর্বভূতের নিয়ন্তা সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বর সর্বত্র একইরূপে বিরাজিত। হে অর্জুন! তুমি সেই এক পরমাত্মাতেই মনোনিবেশ কর। তোমার সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে।

'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য' (১৮।৬৬)—অর্থাৎ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদির যাবতীয় শুভাশুভ ব্যবহার—যাহা তুমি এতকাল ভ্রান্তি-বশতঃ আত্মাতে আরোপ করিতেছিলে, তাহা পরিত্যাগ কর। মিথ্যা ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম ইন্দ্রিয়াদিতেই নিক্ষেপকরত সর্বদ্বৈত-নিবৃত্তিপূর্বক তুমি আমার শরণাগত হও অর্থাৎ স্বাভিন্নরূপে আমাকেই অবগত হও। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ইহাই শেষ উপদেশ।

সমালোচনা

(১) উপনিষদ্-নির্মাল্য, (২) উপনিষদ্-নৈবেদ্য, (৩) উপনিষদ্-অর্ঘ্য—পুষ্প দেবী, ১ ডাঃ শ্যামাদাস রো, কলিকাতা ১৯। পৃষ্ঠা ৮৭, ১৫০, ২৯১। মূল্য ২৲, ২৲, ৩৲।

উপনিষদ্ জ্ঞানের ভাণ্ডার। সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ থাকায় এই ভাণ্ডার সর্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত নয়। আলোচ্য গ্রন্থগুলি উপনিষদের সরল ও ব্যাখ্যামূলক ভাবানুবাদ। গ্রন্থগুলির 'নামকরণ' সার্থক। সুললিত ছন্দোবদ্ধ কবিতার মাধ্যমে উপনিষদের মহাবাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌছিয়া দিবার প্রয়াস বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

'উপনিষদ্-নির্মাল্যে' ঈশ কেন ও কঠ উপনিষদের কবিতানুবাদ স্থান পাইয়াছে। পুস্তকখানি ১৯৬২ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'লীলা পুরস্কার' লাভ করিয়াছে।

'উপনিষদ্-নৈবেদ্য'—প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয় ও ঐতরেয় উপনিষদের কাব্যানুবাদ। এই পুস্তকও 'উপনিষদ্-নির্মাল্যে'র মতো প্রশংসার যোগ্য।

'উপনিষদ্-অর্ঘ্য'—শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্য উপনিষদের বাংলা কাব্যরূপ। ছান্দোগ্য উপনিষদের মূল সংস্কৃত—গদ্য। গদ্য-সংস্কৃত পদ্যে অনুবাদ করা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক, গ্রন্থকর্ত্রী এই দুরূহ কার্যেও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। অনুবাদে উপনিষদের মূলভাব ব্যাহত হয় নাই।

অনুবাদের সঙ্গে মূল সংস্কৃত প্রদত্ত হওয়ায় গ্রন্থগুলির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা আশা করি, বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাব্যানুবাদও সত্বর প্রকাশিত হইয়া পাঠকগণের আনন্দ বর্ধন করিবে।

মহাভারতের গল্প (প্রথম খণ্ড)—স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। প্রকাশক: স্বামী সন্তোষানন্দ, সেক্রেটারি, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা স্টুডেণ্টস হোম, পোঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১২৭; মূল্য ২৲।

মহাভারত ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের বিরাট স্তম্ভ। 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে'। বিশাল ভারতবর্ষের চিন্তাধারা 'মহাভারতে' লিপিবদ্ধ, ইহাকে 'পঞ্চম বেদ' বলা হয়। এতদ্ব্যতীত মহাভারতে বহু সুন্দর গল্প আছে। এই গল্পগুলি হইতে ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী কয়েকটি নির্বাচন করিয়া সহজ ভাষায় আলোচ্য পুস্তকে প্রকাশিত। বিপদে কর্তব্য, সঙ্গের প্রভাব, ত্যাগের মহিমা, নারীত্বের আদর্শ, জীবনের লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে সচিত্র গল্পগুলি তরুণ-মনে রেখাপাত করিবে।

অবিস্মরণীয় কাহিনী (সচিত্র)—জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: জীবন-বিকাশ প্রকাশনী, ১৬এ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৬। পৃষ্ঠা ৭১; মূল্য ২৲।

কথ্যভাষায় লিখিত সরস কাহিনীগুলি ছোটদের ভাল লাগিবে ও অতীত গৌরববোধে অনুপ্রাণিত করিবে। গল্পগুলি ইতিপূর্বে 'উজ্জীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত। 'নক্ষত্রলোকের আকর্ষণ', 'অসাধ্য সাধন', 'হরিঘোষের গোয়াল', 'দিগ্বিজয়ী', 'দুষ্টুশিরোমণি', 'টাকা রাখার জায়গা', 'তোমায় চিনিব কেমনে'—প্রাচীন গল্পগুলি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা। লেখায় ভাব ও ভাষার পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি—ব্রহ্মচারী আনন্দস্বরূপ, মাধব-মন্দির, আনন্দ-নিকেতন, পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী। পৃষ্ঠা ৭৪; মূল্য ১৲।

আলোচ্য পুস্তকে সাধনার অধিকারী, স্থান, কাল, ক্রম, প্রণালী প্রভৃতি বিষয় পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 'ঈশ্বরানুরাগ' বিষয়টির নানা দিক দিয়া বিশ্লেষণ পুস্তকটির প্রধান আকর্ষণ।

সহস্রশ্লোকী ভাগবত (পকেট-সংস্করণ : দ্বিতীয় খণ্ড)—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার; ৩ অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ১৬০; মূল্য ১৲।

শ্রীমদ্ভাগবতের আঠার হাজার শ্লোক হইতে এক হাজার নির্বাচন করিয়া পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করা হইতেছে—আলোচ্য গ্রন্থ এই পর্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডের সুনির্বাচিত শ্লোক-গুলি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ হইতে নবম স্কন্ধের অন্তর্ভূ'ত। মূলানুগ অনুবাদ ও সাবলীল ব্যাখ্যা-সমন্বিত এই খণ্ডটি প্রথম খণ্ডের মতোই সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

Nalanda & Rajgir—Rastrapal Bhikshu, Nava Nalanda Mahavihara, Nalanda, Patna, Bihar, Pp. 48 ; price Re. 1/-.

বুদ্ধদেবের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান—নালন্দা ও রাজগীর। গবেষণা-মূলক আলোচ্য পুস্তিকায় এই স্থানদুইটি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত। পুস্তিকাটি নালন্দা-রাজগীর পর্যটকদিগের কাজে লাগিবে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, খনন-কার্য, ঐতিহাসিক তথ্য, দ্রষ্টব্য স্থান প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ইহাতে পাইবেন।

সমুদ্র-মন্থন (নাটক) — শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্তী। প্রকাশক : চক্রবুধ গ্রন্থালয়, পাবনা কলোনী, কাটোয়া, বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৯০; মূল্য ২৲।

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে লেখা নাটকখানি জনপ্রিয়তা ও অভিনয়-সাফল্যের আশা রাখে।

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা (১৩৭০)—প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন, ৭।৮ নস্করপাড়া ১ম বাই লেন, পোঃ সাঁতরাগাছি, হাওড়া। পৃষ্ঠা ৫২।

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি—সবই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের লিখিত। পত্রিকাটির পূর্বগৌরব অক্ষুণ্ণ আছে। স্বামীজীর শতবার্ষিকী প্রদর্শনীতে শিশুদের অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রশংসার যোগ্য।

Swami Vivekananda Birth Centenary Souvenir (1964)—Ramakrishna Mission Ashrama, Patna. Pp. 116.

ইংরেজী ১৫টি, হিন্দী ৮টি, বাংলা ৬টি সুনির্বাচিত ও সুসম্পাদিত লেখা এবং কয়েক-খানি চিত্র ও একটি সংস্কৃত স্তোত্র এই শতবার্ষিকী স্মরণিকায় স্থান লাভ করিয়াছে। The National Significance of the Life and Works of Swami Vivekananda—Sister Nivedita, Swami Vivekananda as a Social Thinker—Prof. Sailesh Kumar Bose, স্বামী বিবেকানন্দ (হিন্দী)—প্রোঃ দেবেন্দ্রনাথ বর্মা, স্বামী অদ্ভুতানন্দ—বিহারকী এক আধ্যাত্মিক বিভূতি (হিন্দী), স্বামী বিবেকানন্দ ও মানবধর্ম—ডাঃ অণিমা সেনগুপ্ত, ধর্মসংস্থাপক স্বামী বিবেকানন্দ—তথ্য ও তাৎপর্য-পূর্ণ এই প্রবন্ধগুলি সংখ্যাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

In Memoriam—Published by the Vivekananda Society, 21 Brindaban Bose Lane, Calcutta 6. Pp. 145 ; price Rs. 2·50.

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধাঞ্জলি, ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ, কবিতা, সংস্কৃত স্তোত্র ও বহু

চিত্র-সমন্বিত এই স্মরণিকা স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত। প্রবন্ধ-নির্বাচন, সুসম্পাদনা, উৎকৃষ্ট কাগজ, শোভন মুদ্রণ—সব দিক দিয়াই এই গ্রন্থ বিশিষ্টতার দাবি করিতে পারে। স্বামীজীর শতবার্ষিকী স্মৃতি-হিসাবে গ্রন্থখানি গ্রহণীয়। বিলম্বে আত্মপ্রকাশ করিলেও বহু বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ।

আলোর সন্ধানে—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক: প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়, ১১৪।২বি, হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬। পৃষ্ঠা ৮০; মূল্য ৫০ পঃ।

লেখক বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী জীবন হইতে ক্রমে কিভাবে ধর্মচেতনা লাভ করিয়া নিজেরই চেষ্টায় উন্নতির পথে অগ্রসর হন—আলোচ্য পুস্তকে তাহারই বিবরণ। একনিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে যে আত্মজ্ঞান-লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে পাওয়া যায়। অগ্নিযুগের কয়েকজন প্রখ্যাত বিপ্লবীকর্মীর সংক্ষিপ্ত বিবরণও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সনাতন হিন্দুধর্মের স্বরূপ—শ্রীঅমূলপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক: ১৪।৩সি, বলরাম বসু ঘাট রোড, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ৫০;

বর্তমান ধর্মহীনতার যুগে সনাতন হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ একটি সুন্দর পুস্তকের সত্যই প্রয়োজন ছিল। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, পুনর্জন্মবাদ, বর্ণাশ্রম-বিভাগ ও অবতারবাদ সম্বন্ধে আলোচনাগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

জীবনে সাফল্য ও ঈশ্বরোপলব্ধি—স্বামী শিবানন্দ। অনুবাদক: শ্রীরজনীমোহন চক্রবর্তী। দি ডিভাইন লাইফ সোসাইটি, দক্ষিণ কলিকাতা ব্র্যাঞ্চ, ২৮-এ সর্দার শঙ্কর রোড, কলিকাতা ২৯ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩১২; মূল্য ২৲।

'Sure ways for success in life and God-realisation' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। সদ্‌গুণের উৎকর্ষ-সাধনা, সৎসঙ্গের মহিমা, দিনলিপি রাখিবার উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা অধ্যাত্ম-পিপাসুগণের ভাল লাগিবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (প্রথম খণ্ড)—শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায়, বি ৬।১৫, পীতাম্বর পুরা, বারাণসী ১। পৃষ্ঠা ৪৮১; মূল্য ৬৲।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম, পঞ্চম, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। পুস্তকের ভূমিকাতে উক্ত চারি অধ্যায় লইবার কারণ দেওয়া হইয়াছে।

গীতার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যাখ্যার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। গ্রন্থকার পরিশ্রম ও ধৈর্য সহকারে বহু শ্লোকের প্রাচীন ও নবীন মতের যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন।

যাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা এই গ্রন্থে বহু চিন্তনীয় বিষয় দেখিতে পাইবেন। বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত উদ্ধৃতিগুলি গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

রাঁচি ঃ রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা হাসপাতালের ১৯৬২-৬৩ খৃঃ বাৎসরিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১২ বৎসরে এই হাসপাতালে দানশীল জনগণের এবং প্রাদেশিক ও ভারত সরকারের সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার সর্ববিধ আধুনিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আরোগ্যলাভের পরে যক্ষ্মারোগীর পুনর্বাসনেরও সামান্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বর্তমানে এখানে ২৪০টি রোগীর স্থান করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩টি কেবিন ও ১৩টি কুটির (Cottage) আছে। কুটিরে রোগীরা নিজের পরিচারক রাখিতে পারে। কলিকাতা ও পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে এবং জনগণের দানে ৩২টি দরিদ্র রোগীকে বিনা-খরচে চিকিৎসা করা হয়।

একটি রিক্রিয়েশন-হল আছে; রোগীদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য মাঝে মাঝে নাটক অভিনীত হয়। সেখানে ৩০০ জন লোকের বসিবার ব্যবস্থা আছে; প্রায়ই চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। বেতারের অনুষ্ঠানসকল শুনিবার ব্যবস্থা আছে। দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকা এবং লাইব্রেরি হইতে পুস্তকপাঠেরও ব্যবস্থা আছে।

আলোচ্য বৎসরে এই হাসপাতালে ৫৪৩ জনকে চিকিৎসা করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩৫৫ জন এই বৎসর-মধ্যে ভরতি হয় এবং ১৮৮ জন পুরাতন রোগী। বৎসর-মধ্যে ৩৪২ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বৎসর-শেষে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ছিল ২০১ জন। ৬৭টি রোগীকে নানারূপ অস্ত্রচিকিৎসা করিতে হয়।

কর্মচারী ও তাহাদের পরিবারের জন্য একটি জরুরী বিভাগ আছে, সেখানে ৩৫ জনের অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা হয়। বাহিরের রোগীবিভাগে ৩৭০ জন যক্ষ্মারোগী ও ৭৭৫ জন সাধারণ রোগীকে চিকিৎসাবিষয়ক উপদেশ ও সাহায্য দেওয়া হয়।

চাঁদা, দান এবং কলিকাতা ও পাটনার ব্যক্তিগণের প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে মোট ৭৮ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা-খরচে এবং ২০ জনকে কম খরচে চিকিৎসা করা হয়। এই রোগীদের মধ্যে ১২ জন তপশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ইহাদের খরচের আংশিক সাহায্য-বাবদ বিহার সরকার ৭,০০০৲ দান করেন।

৪২ জন রোগী আরোগ্যলাভের পরে স্থানীয় আরোগ্যোত্তর উপনিবেশে স্থান পায়। ইহাদের সকলকেই নানাপ্রকার বৃত্তিমূলক কার্যদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ দেওয়া হয়।

একটি অবৈতনিক হোমিওপ্যাথিক বিভাগ আছে। এখানে ৪,৩৭৬ নূতন এবং ৮,০১৮ জন পুরাতন রোগীকে ঔষধ বিতরণ করা হয়। এই বিভাগ কলিকাতার এম. ভট্টাচার্য কোম্পানির বদান্যতায় নির্মিত হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর প্রয়োজনীয় ঔষধাদি তাঁহারাই দান করেন।

বিহারের রাজ্যপাল শ্রীআয়েঙ্গার ১লা জুলাই, ১৯৬২ খৃঃ প্যাথলজিক্যাল লেবরেটরির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ঐ বৎসরের ১৫ই জুলাই বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমিশ্র কুমার প্রমথনাথ রায়ের দানে নির্মিত বিভাগ উন্মুক্ত করেন। ১২টি রোগীর জন্য একটি নূতন বিভাগ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। শুশ্রূষাকারীদের জন্য একটি বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং আর একটি নির্মিত হইতেছে।

সালেম : আশ্রম ১৯১৯ খৃঃ স্থাপিত হয় এবং ১৯৪০ খৃঃ রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় আসে। ১৯৬২-৬৩ খৃঃ বাৎসরিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আশ্রমে পাঠ বক্তৃতা ও মহাপুরুষ-জীবনী আলোচনা হয়। প্রতি শনিবার শ্রীসারদা শিশু-মন্দিরের ছাত্রী ও শিক্ষিকাগণ ভজনগানের ব্যবস্থা করেন। প্রতি বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামীজীর জন্মতিথি-উৎসব পালিত হয়। এই বৎসর স্বামীজীর জন্ম-শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

আশ্রম-লাইব্রেরিতে ইংরেজী, তামিল, তেলুগু, মালায়লম্, কানাড়া ও হিন্দী ভাষায় ১,০৭৮ পুস্তক আছে। সাধারণের জন্য অবৈতনিক পাঠকক্ষও আছে। পাঠকক্ষে অনেক দৈনিক ও মাসিক পত্রিকা রাখা হয়।

সেবাকার্য—একটি অবৈতনিক হাসপাতাল আছে। এখানে আলোচ্য বৎসরে ২৭,২৯৯ জনকে চিকিৎসা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৫,৬০৯ নূতন এবং ১১,৯৬০ পুরাতন রোগী। অধুনা সরকারের সাহায্যে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। স্থানীয় স্বাস্থ্যহীন ও রুগ্ন শিশুদিগকে টাটকা গোদুগ্ধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বারাণসী : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৬২-৬৩ খৃঃ বাৎসরিক কার্যবিবরণী পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ইহা এই প্রতিষ্ঠানের ৬২তম বাৎসরিক বিবরণী। এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবাকার্যের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য : (১) অন্তর্বিভাগীয় সাধারণ হাসপাতাল, (২) বাহিরের রোগীর চিকিৎসা-বিভাগ, (৩) বৃদ্ধ-আতুর নিবাস, (৪) অসহায় বৃদ্ধ ও মহিলাদের সাহায্যদান, (৫) সাময়িক বিশেষ সাহায্য-বিভাগ, (৬) দুগ্ধ-বিতরণ।

(১) সাধারণ হাসপাতালে আলোচ্য বৎসরে ২,৪৫৪ জন রোগীকে ভরতি করা হয় এবং ৮০০ জনকে অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়। রাস্তা বা গঙ্গার ঘাট হইতে কুড়াইয়া আনিয়া ৩২ জনকে চিকিৎসা করা হয়। গড়ে ৮৮ জন রোগী প্রত্যহ হাসপাতালে ছিল।

(২) উক্ত বৎসর ৬৭,১৭২ জন নূতন বাহিরের রোগীকে ঔষধপত্র দেওয়া হয় ও চিকিৎসা করা হয়। দৈনিক রোগীর সংখ্যা ৭১৩। পুরাতন রোগী ছিল ১,৯৩,১২৮ জন। এই বিভাগে মোট ৩,৮৪৫ জনকে অস্ত্রচিকিৎসা করা হয়।

(৩) বৃদ্ধ-আতুর নিবাসে—যাহাদের কোন সংস্থান নাই, তাহাদিগকে রাখা হয়। যদিও ২৫ জন পুরুষ ও ৫০ জন নারীকে রাখার ব্যবস্থা আছে, অর্থাভাবে ৯ জন পুরুষ ও ২৩ জন নারীকে মাত্র রাখা সম্ভব হয়।

(৪) সাহায্য-দান বিভাগে ১০৪ জনকে মাসিক অর্থ সাহায্য করা হয়। মোট খরচ হয়—টা ২,৪৯৮'৮৪।

(৫) এই বিভাগে ৯০ জনকে সাহায্য করা হয়। যে-সব ভ্রমণকারী হঠাৎ বিপন্ন হয়, তাহাদিগকে খাদ্য বা অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। ইহাতে টা ৩১০'৯৯ খরচ হয়। এতদ্ব্যতীত ২৮টি কম্বল এবং ২৮টি ধুতিও বিতরণ করা হয়।

(৬) এই বিভাগে গুঁড়া দুধ জল-মিশ্রিত করিয়া শিশু, প্রসূতি এবং বৃদ্ধ-আতুরদিগকে পাঁচ মাস বিতরণ করা হয়। গড়ে প্রত্যহ ৪০২ জনকে দুধ দেওয়া হইয়াছে এবং মোট ৩,১৪২ পাউণ্ড গুঁড়া দুধ খরচ হয়। পরে গুঁড়া দুধ দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ইহা বন্ধ রাখা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শতবর্ষজয়ন্তী তহবিল হইতে উদ্বৃত্ত ২৩১ টাকা রচনা-প্রতিযোগিতা,

লাইব্রেরির বই এবং স্কুলের দরিদ্র শিশুদের বই ইত্যাদিতে ব্যয় করা হয়। মোট ১০০ জন দরিদ্র ছাত্রকে ৫৫০ খানি পুস্তক বিতরণ করা হয়।

হাসপাতালে একটি পরীক্ষাগার ও এক্সরে বিভাগ আছে। ইলেক্ট্রোথেরাপি করারও ব্যবস্থা আছে। বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক এই হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং সহৃদয় জনগণের সাহায্যেই এই প্রতিষ্ঠান চলিতেছে।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে পাশ্চাত্য অধ্যাপক

গত ১৭ই অক্টোবর অপরাহ্নে লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর এল. এস. হার্নশো ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের এক সভায় বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক হার্নশো তাঁহার বক্তৃতায় বর্তমানের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনাদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ মিনেসোটা রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ডক্টর আর্নল্ড রোজ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের কর্তৃপক্ষ ও তরুণ ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অধ্যাপক রোজ রামকৃষ্ণ মিশনের আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ভাষণের প্রারম্ভে ডক্টর রোজ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয়ের উল্লেখ করেন।

আমেরিকায় বেদান্ত

নিউইয়র্ক: রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-কেন্দ্র।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত', 'নারদীয় ভক্তিসূত্র' ও 'ভগবদ্গীতা' অবলম্বনে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়:

জানুআরি, ৬৪: ভগবৎপ্রেম; স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান মানুষের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান; ধর্ম ও ভারতের পরিবর্তন; ইচ্ছাশক্তি বাড়াইবার উপায়।

মার্চ: আত্মচেষ্টায় আত্মোন্নতি; ধ্যান ও তীর্থযাত্রা; গুডফ্রাইডে প্রার্থনা: ক্রুশের জীবন্ত বাণী; পুনর্জীবন-লাভের তাৎপর্য।

এপ্রিল: দুঃখনিবৃত্তির উপায়; আধ্যাত্মিক রূপান্তরের পঞ্চবিধ প্রণালী; কোন্ ঈশ্বরের আরাধনা করিব? সর্বত্র ঐক্য ও সমন্বয়ের জন্য কিভাবে কাজ করিতে হয়?

মে: আধ্যাত্মিক উন্নতি জানিবার উপায়; ধর্মসমন্বয়ের দার্শনিক ভিত্তি; আকাঙ্ক্ষা-জয়ের প্রয়োজনীয়তা; আধ্যাত্মিকতা-লাভের পথে বাধা; বুদ্ধ-প্রদর্শিত 'চারিটি আর্যসত্য'।

জুন: ভয়- ও দুশ্চিন্তা-জয়ের উপায়; অশান্ত মন কিরূপে শান্ত করিতে হয়? প্রার্থনার শক্তি; ঈশ্বরে ভক্তিলাভের উপায়।

বিবিধ সংবাদ

শ্রীচৈতন্য-জীবনালেখ্য প্রদর্শনী

গত ৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা ক্যাথিড্র্যাল রোডস্থিত চারুকলা আকাদামি ভবনে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ শ্রীচৈতন্য-জীবনালেখ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীদীপেন বসু জলরঙে আঁকা ৪৬টি চিত্রে শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাহিনীর রূপ দিয়াছেন। নিমাইয়ের জন্মসূচনা, জগন্নাথ মিশ্রের সাংসার, কেশব-কাশ্মিরীর পরাজয়, ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র-দীক্ষা, শ্রীবাসের গৃহে মহাপ্রকাশ, জগাই-মাধাই-উদ্ধার, নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া, নিমাইয়ের সন্ন্যাস, জগন্নাথমন্দিরে শ্রীচৈতন্য, সমুদ্রতীরে শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি চিত্রশিল্পীর শিল্পনিপুণতার স্বাক্ষর। ১৫ই নভেম্বর পর্যন্ত বহু দর্শক এই প্রদর্শনী দর্শন করিয়া শিল্পীর বিশেষ প্রশংসা করেন।

ভারতে মহিলা-কর্মীর সংখ্যা

চীনের পরেই ভারতের সর্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক মহিলা-কর্মী। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থার নিরীক্ষায় প্রকাশ—১৯৬১ খৃঃ ভারতে ৫·৯৪ কোটি, সোভিয়েট রাশিয়ায় ৫·৬৬ কোটি এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ২·৪৫ কোটি মহিলা-কর্মী ছিল।

নিবেদন

আগামী মাঘ মাসে 'উদ্বোধনে'র নূতন (৬৭তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক স্পষ্টাক্ষরে পুরা নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বরসহ বার্ষিক চাঁদা ৫·৫০ (পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্যালয়ে পাঠাইয়া দিবেন। টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি.-তে কাগজ পাঠাইবার অতিরিক্ত ডাক-খরচ বাঁচিয়া যায় ও অযথা বিলম্ব হয় না। মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইলে কুপনে **গ্রাহক-সংখ্যা** অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ঃ রবিবার—৩টা হইতে ৫টা। অন্যান্য দিন সকাল ৭-৩০ মিঃ হইতে ১০-৩০ মিঃ এবং বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে ৫টা।

কার্যাধ্যক্ষ

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা ৩

ভ্রম-সংশোধন

গত আশ্বিন-সংখ্যায় ৪৬৫ পৃঃ ১৯ পঙ্‌ক্তিতে 'কার্ডিন্যাল রিশল্যু' স্থলে 'ডিউক রিশল্যু' পড়িবেন।

কার্তিক-সংখ্যায় ৫৯২ পৃঃ ১ম কলমের শেষে ভারতের জনসংখ্যা পড়িবেন—৪৪·৯ কোটি।



যাত্রী

শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

[...There came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. New Testament, St. Matthew, Ch. II]

তারার আলোয় ওরা পথ চিনে নেবে,
ওরা তিনজন।
জীবনে অনেক পথ
হেঁটেছে একত্রে ওরা, এই কথা ভেবে—
'নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে সমস্ত সম্পদ,
দীপ্ত হীরা, স্বচ্ছ মণি, শুভ্র মুক্তারাশি,
স্বর্ণদীপাধারে জ্যোতি, সৌগন্ধ-সম্ভার ;
সব অন্বেষণ শেষে মধুময় হাসি
যদি আলো হয়ে জ্বলে অমল আত্মার।'

পশ্চিম দিগন্তে নামে তিনটি ছায়ার
দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘ রেখা। ওরা পথ চলে,
অরণ্যে সর্পিল পথ, পথ অজানার
মরুভূমি পার হয়, শ্যামল অঞ্চলে
তৃণাঙ্গনা নদীতীরে পথ চেয়ে থাকে,
কণ্টকে বিক্ষত পথ রক্তিম নির্ভয়,
পথ মরীচিকা হয়ে ইশারায় ডাকে,
দিকচিহ্নহারা পথে তিনটি হৃদয়।

তখনি উঠেছে তারা স্তব্ধতরুশিরে,
কোন দূর চক্রবালে গ্রামান্তের পারে,
সেথা কোন পান্থশালা, অন্ধকার ঘিরে
একটি আনন্দ-রেখা বিকীর্ণ আঁধারে
ধরেছে জননীবক্ষে শিশুর মূরতি।
নিরাবৃত শুভ্রতনু, নির্মল উল্লাসে
ঘিরেছে সকল অঙ্গ সমাহিত জ্যোতি,
মাতৃমুখপানে চেয়ে দিব্যশিশু হাসে।
দু-খানি কোমল পায়ে সমস্ত ভুবন
নিঃশব্দে রেখেছে তার আত্মনিবেদন।
আনত প্রণামে
তিনটি পথিক ছায়া ধীরে এসে থামে।

কথাপ্রসঙ্গে

‘যদি শান্তি চাও—’

‘যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। কেউ পর নয় মা—সবাই আপন’—কথাগুলি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর অন্তিম বাণী। মর্ত্যজীবনের শেষ দৃশ্যটি অসহ হইয়া উঠিয়াছে—ভক্ত নরনারী চোখে জল চাপিয়া আছে, জনৈকা ভক্তমহিলা আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না—সরবে কাঁদিয়া উঠিলেন, শ্রীশ্রীমা'ও ভক্তহৃদয়ের আসন্ন বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন: ‘যদি শান্তি চাও মা কারও দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। কেউ পর নয় মা, সবাই আপন।’ কী সরল সহজ কথাগুলি—কী শক্তিভরা—জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ! প্রতিটি শব্দের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতেছে জীবনের পরম সঙ্গীত—প্রীতির রাগিণী—আত্মীয়তার সুর।

ব্যক্তিজীবনে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভর করে বিশ্বজীবনের শান্তির কাঠামো। কিন্তু শান্তি কে চায়? সবাই মুখে বলিতেছে—‘শান্তি শান্তি’—কিন্তু মনে প্রাণে কে শান্তি চায়?—তাই তো দেবীমুখে প্রথমেই উচ্চারিত হইয়াছে ‘যদি শান্তি চাও—’; যথার্থ শান্তিকামীর সংখ্যা যে মুষ্টিমেয়। মানুষ যতই অশান্তিতে থাকুক, মুখে যতই বলুক—শান্তি চাই, কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইবে—শান্তির জন্য যাহা করণীয়, তাহা সে করে না, করিতে পারে না। পরন্তু যে কারণে অশান্তির সৃষ্টি হয়—সেগুলিই সে বারংবার করিয়া থাকে। ইহাই সংসারের ধারা, ইহাই জীবনের রূঢ় সত্য। তথাপি মানুষ চেষ্টা করিবে—বিপরীত পরিবেশ জয় করিয়া জীবনে শান্তি লাভ করিতে, চেষ্টা করিবে—সমাজে শান্তি স্থাপন করিতে, চেষ্টা করিবে—বিশ্বে নানা জাতি নানা ধর্মের মানুষের মধ্যে অশান্তি দূর করিয়া বিশ্বশান্তিকে বাস্তব রূপ দিতে।

তাহারই ইঙ্গিত আমরা পাই মহাজীবনের তরঙ্গধারায়। এখানে আমরা তাহাই পাইতেছি—কোন দার্শনিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নয়, কোন রাজনীতিক জটিল সমস্যার সমাধান-রূপে নয়—নিছক ব্যক্তিজীবনের চরম প্রয়োজনে। শান্তি সকলেই চাই, কিন্তু কি ভাবের শান্তি—সেটি কেহ জানে না। যাহাই হউক—শান্তি যেমন ব্যক্তিগত (subjective) ব্যাপার, তাহা লাভের উপায়টিও ব্যক্তিগত।

প্রথমেই দেখিতে হইবে—অশান্তি হয় কেন? অপরের দোষ-দর্শনই অশান্তির প্রধান কারণ। তাই তো মঙ্গলময়ী জননীর মুখে সন্তানের কল্যাণ-কামনায়—ব্যক্ত হইয়াছে ‘কারও দোষ দেখো না।’ এ জগৎ-সংসার এইভাবেই চলিয়াছে, এইভাবেই চলিবে—ইহাই এ-সংসারের রীতি। ইহাকে দোষ বলিয়া নিজের মনকে অশান্ত করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়।

জ্ঞানের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে স্বামীজীর দেববাণী নিঃসৃত হইয়াছে: এখনও যে সংসারে দোষ-দুর্বলতা দৈন্য-দুঃখ দেখিতেছ—সে তোমারই দৃষ্টির বিভ্রম। জ্ঞানীরা এ-সকল দেখেন না। তাঁহারা দেখেন—সবই মঙ্গলময়, সবই ভাল, সবই সেই সৎ চিৎ ও আনন্দ।

পারমার্থিক দৃষ্টিতে নাই বলিয়া আপেক্ষিক দৃষ্টিতেও যে সংসারে দুঃখ-দারিদ্র্য নাই—দোষ-দুর্বলতা নাই, তাহা নয়। আছে, কিন্তু সেগুলি অত বড় করিয়া দেখিলে নিজেরই অশান্তি,

পরেরও অশান্তি। বিপরীত ক্রমে—কাহারও দোষ দর্শন না করিয়া বরং আত্মবিশ্লেষণ সহায়ে নিজের দৃষ্টিকেই দোষী সাব্যস্ত করিতে হইবে, এবং প্রার্থনা করিতে হইবে, সাধনা করিতে হইবে যাহাতে এই দুষ্ট দৃষ্টি দূরীভূত হয় এবং যথার্থ দৃষ্টি লাভ হয়। শুদ্ধচিত্তই শুদ্ধ দৃষ্টি লাভ করে, পবিত্র হৃদয়েই ঈশ্বর প্রতিভাত হন। পবিত্রাত্মা সাধক সর্বত্র ঈশ্বরকেই দর্শন করেন

পরিশেষে এই পারমার্থিক দৃষ্টি সাধ্যমত ব্যাবহারিক জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পারমার্থিক অনুভূতি লাভ করিয়া কেহ চুপ হইয়া যান, কেহ বা সংসারে সমাজে তাহা রূপায়িত করেন। সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন বা আত্মদর্শন যিনি করেন, তিনি অবশ্যই অনুভব করিবেন, 'সকলকে আমি, আমাতে সকল'—তখন আর 'কেউ পর নয়, সবাই আপন'। আপন লোককে—পুত্রকন্যা আত্মীয়-স্বজনকে যেমন সাধারণ সাংসারিক ব্যক্তি ভালবাসে, জ্ঞানী বা ভক্ত তেমনি সকলকেই ভালবাসেন, সকলেই যে ভগবানের সন্তান—আমার পরমাত্মীয়—এই বুদ্ধিতে ভালবাসেন, সর্বভূতের হিতে রত হন, সকলের সেবা করেন—সকলের দুঃখকষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করেন

সর্বভূতে প্রেমময় ঈশ্বরকে দর্শন করার ফলে সিদ্ধ সাধকের 'হৃদয় পূর্ণ হয়—হাতও কাজ করে'। সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি মানুষকে মানুষের সেবায় অনুপ্রাণিত করে। আত্মজ্ঞানের ফলিত রূপ সেবাধর্মে। জ্ঞানযোগের সহিত কর্মযোগ মিলিত হয় ভক্তিযোগ বা প্রেমের ত্রিবেণী সঙ্গমে।

এইখানেই মুক্তি—এইখানেই শান্তি; মুক্তি বা শান্তি মৃত্যুর পরে নয়, ইহজীবনেই—ইহ জগতেই। পৃথিবীতে যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে না; ভক্ত-হৃদয়ের কুণ্ঠাবিহীন বৈকুণ্ঠই সে স্বর্গরাজ্য—পবিত্র হৃদয়েই ঈশ্বরভাব প্রতিভাত হয়; ইহা প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধ সাধকগণের হৃদয়ে রূপায়িত হয় এবং তাঁহাদেরই মাধ্যমে সংসারে সমাজে সঞ্চারিত হয়।

দুইটি ধর্মসম্মেলন

সম্প্রতি ভারতের দুইপ্রান্তে দুইটি ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল, সারনাথে 'বৌদ্ধ সংগীতি' ও বোম্বেতে ক্যাথলিক খৃষ্টানদের ইউক্যারিষ্টিক সম্মেলন। প্রায় একই সপ্তাহে এই ভারতেই দুইটি ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল, দুইটিতেই শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু ও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ যোগ দিয়াছেন। দুইটি-তেই বিপুল জনসমাবেশ ধর্মের মহিমা কীর্তনের সহিত জাতির প্রতি আনুগত্যও স্বীকৃত হইয়াছে। এইসব ব্যাপারে চিন্তাশীল মানুষ নূতন করিয়া চিন্তা শুরু করিয়াছে: তবে ধর্ম একেবারে একটা অনাবশ্যক জিনিস নয়, মানবজীবনে ও জাতীয় জীবনে ধর্মের শক্তি এখনও ক্রিয়াশীল! অতীতে ও বর্তমানে ধর্ম যতই দ্বন্দ্বকলহের কারণ হইয়া থাকুক—ধর্মের সংগঠনী শক্তি বাদ দিয়া মানুষ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, এই কথাই প্রমাণিত হইতেছে। তবে এইটুকু স্মরণীয় এযুগে ধর্ম দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছে; প্রথম আক্রমণকারী বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ; দ্বিতীয়—রাজনীতি ও সাম্যবাদ। এই দুই প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হইলে ধর্মকেও সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন করিয়া লইতে হইবে। নিছক ভাবপ্রবণতা ধর্মকে গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত করে, এবং ধর্মের নামে একদল লোকের পুরোহিতশ্রেণী-সুলভ সুযোগ-সুবিধা-ভোগের চেষ্টা বঞ্চিত জনসাধারণের নিকট ধর্মকে অনাবশ্যক করিয়া তোলে। এই ভাব বর্জন করিয়া ধর্মকে আজ উদার অসাম্প্রদায়িক হইতে হইবে, এবং ত্যাগ ও সেবার দৃঢ় ভিত্তির উপর নূতন সৌধ রচনা করিতে হইবে। ওঁ।

আচার্য বিবেকানন্দ-স্মরণে

অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত

[৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খৃঃ স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের সংবাদ পাইবার অব্যবহিত পরে আমেরিকার স্থান ফ্রান্সিস্কো বেদান্তদর্শন ক্লাসের শিক্ষার্থিগণ এই শ্রদ্ধাঞ্জলি বেলুড় মঠে স্বামীজীর সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রেরণ করেন।]

আমাদের পরমপূজ্যপাদ আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আকস্মিক মহাপ্রয়াণের সংবাদ এইমাত্র শ্রবণ করিয়া আমরা গভীরভাবে শোকার্ত ও মর্মাহত হইয়াছি। আচার্যদেব গত ৪ঠা জুলাই (১৯০২ খৃঃ) জগজ্জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে চির-বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মহান্ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের পদানুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমাস্পদের উদ্দেশে বিবেকানন্দ যেরূপ সুমধুর কথা লিখিয়াছেন, এরূপ আর কেহই কখনও লিখেন নাই। তিনি তাঁহার গুরুদেবকে যেমন ভালবাসিতেন এবং ভক্তি করিতেন, আমরাও আমাদের আচার্যকে তেমনি ভক্তি করিব এবং তাঁহার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিব।

যুগে যুগে যে-সকল লোকোত্তর মহাপুরুষ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, বিবেকানন্দ তাঁহাদেরই অন্যতম। তিনি তাঁহার গুরু রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু ও অন্যান্য মহামানবগণের মতোই ছিলেন। বর্তমান যুগের প্রয়োজন সাধন করিবার উপযোগী হইয়াই বিবেকানন্দ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধর্মসমন্বয়াচার্য রামকৃষ্ণের সহিত তিনি ছিলেন অভিন্নাত্মা। তাঁহাকে প্রাচীন ও আধুনিক সকল ধর্ম ও দর্শনের প্রতিনিধি বলা যায়। বিবেকানন্দের উচ্চ ভাবধারা সমগ্র বিশ্বকে উদ্ভাসিত ও স্পন্দিত করিয়াছে—ইহা অনন্তকাল প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে। সকল জীব ও সকল ধর্মমতকে তিনি সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহার চরিত্রে ছিল খ্রীষ্টের তিতিক্ষা, এবং ভাস্বর সূর্য ও স্নিগ্ধ বায়ুর বদান্যতা। তাঁহার সহিত বালক, ভিক্ষুক, রাজপুত্র, ক্রীতদাস, চণ্ডাল সকলেই সমভাবে বাক্যালাপ করিতে পারিত। তিনি বলিতেন, 'ইহারা সকলেই একপরিবারভুক্ত, ইহাদের সকলের মধ্যে আমি আছি এবং ইহারাও আমার মধ্যে আছে—আমি দেখিতে পাই। সমগ্র বিশ্ব একপরিবারভুক্ত এবং ব্রহ্ম ইহার আদি কারণ।'

প্রকৃতিদেবী আচার্যদেবের দেহখানি সৌন্দর্যদেবতা এপোলোর অঙ্গকান্তির মতো সুদর্শন করিয়া নির্মাণ করিলেও ভিতরের বিপুল ইচ্ছাশক্তির বেগ ও বাহিরের অত্যাবশ্যক কর্তব্যের আহ্বান-জনিত অপক্ষয় প্রতিরোধ করিবার উপযোগী করিয়া গঠিত করেন নাই। কারণ পৃথিবী তাঁহার শুভাবিভাবের প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং তিনি জগতের হিত ও সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি এই সুদূর বিদেশ আমেরিকায় সম্পূর্ণ অপরিচিতভাবে আসিয়া বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মবিদ্‌গণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতা, ধর্মজ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব বাগ্মিতা দ্বারা শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে সমবেত বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন—এ-সকল দুরূহ কার্য সম্পাদন করা তাঁহার মতো একজন যুবকের পক্ষে অতিশয় কৃতিত্বের পরিচায়ক। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের এরূপ মর্যাদা লইয়া আর কেহ কখনও জয়যুক্ত হইতে পারেন নাই। অপর কোন ধর্মমত

এরূপ গৌরব ও সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই; আর কেহই এরূপ মহতী বার্তা প্রচার করেন নাই। আমেরিকার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ গভীর শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়াছেন। যখন তিনি সগৌরবে ডেট্রয়েটের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন, তখন সকলেই একবাক্যে বলেন, 'বিবেকানন্দের বিদ্যাবুদ্ধির তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ বালকসদৃশ।' এই মহান্ হিন্দু সন্ন্যাসী প্রবল ঝঞ্ঝার (Great Hindoo Cyclone) মতো পৃথিবী তোলপাড় করিয়াছেন। কোন ভাষা, জাতি ও দেশ তাঁহার নিকট অপরিচিত ছিল না। তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল সমগ্র পৃথিবী। তাঁহার কর্মের পুরস্কার-স্বরূপ তিনি এখন জগজ্জননীর ক্রোড়ে চির-বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। তিনি যখন লোককল্যাণ সাধনের জন্য আবার জন্মপরিগ্রহ করিবেন, সেই সময়ে তাঁহার পরিচিত আমরাও যেন আবার জন্মগ্রহণ করিতে পারি।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই স্বামীজীকে দর্শন করিবার ও জানিবার পরম সৌভাগ্য ও সুযোগ হইয়াছিল। তাঁহার অকাল মহাপ্রস্থানের শোকসংবাদ আমাদিগকে গভীরভাবে মুহ্যমান করিয়াছে। অনেক খ্রীষ্টান ভক্তের নিকট প্রভু যীশু যেমন প্রিয় ও পূজ্য, স্বামীজীও আমাদের নিকট তেমনি প্রিয় ও পূজ্য। অত্যধিক পরিশ্রমজনিত ব্যাধির করাল কবল হইতে মুক্ত হইয়া তিনি যদিও এখন আর আমাদের মধ্যে স্থূল শরীরে নাই, তথাপি পূর্বাপেক্ষা আরও ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। আমরা মনে করি, জীবৎকালে তাঁহাকে জানিতে পারিয়া এবং তাঁহার দিব্য সাহচর্যের মধুর প্রভাব অনুভব করিতে পারিয়া অত্যন্ত ধন্য হইয়াছি। হে আমাদের প্রিয়তম স্বামীজী, তোমার নিত্য ও শাশ্বত আনন্দই আমাদের মন্ত্র হউক।

যাঁহার সদানন্দ হাস্য, সুমধুর বাক্য ও সবিনয় সম্ভাষণ তাঁহার উপস্থিতিকে মাধুর্যময় করিয়া তুলিত, সেই স্বামীজীর মহাপ্রয়াণে আমাদের আরব্ধ কার্য একজন মহত্তম ও প্রিয়তম নায়কের অভাব বোধ করিতেছে। দেব ও মানবের গুণরাশিমণ্ডিত অনুপম ব্যক্তিত্ব লইয়া যিনি জগদ্ধিতায় নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম, চরিত্র এবং স্মৃতি অনুগামীদের নিকট প্রেরণা ও আশীর্বাদস্বরূপ হইয়াছে।

আচার্যদেব, শান্তি! বিদায়!

প্রাগুক্ত বিষয়গুলি স্মরণ করিয়া আমরা প্রস্তাব করিতেছি:

(১) আমাদের মহান্ নেতা ও আচার্য আমাদের মধ্য হইতে কেন এত অকস্মাৎ অপ্রকট হইলেন, তাহা সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিতে না পারিলেও আমরা জগজ্জননীর ইচ্ছা ভক্তিবিনম্র চিত্তে মানিয়া লইতেছি, কারণ তাঁহার বিধান অভ্রান্ত এবং করুণা অপরিসীম।

(২) আমরা পূজনীয় আচার্যের মহাপ্রয়াণ-রহস্য প্রকৃষ্টরূপে বুঝিতে অক্ষম হইলেও পরমাত্মার প্রতি আমাদের বিশ্বাস অবিচলিত আছে এবং আমরা বিশ্বাস করি তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণ এই আকস্মিক বিপৎপাতে ভগবানের নিকট হইতে প্রয়োজনানুরূপ ও যথোপযোগী সান্ত্বনা ও স্থৈর্য লাভ করিবেন।

(৩) আচার্যদেবের প্রতি আমাদের এই গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি বেদান্তদর্শন ক্লাসের অনুষ্ঠান-পত্রে লিপিবদ্ধ হউক এবং ইহার কতিপয় প্রতিলিপি বেলুড় মঠে তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতৃগণের নিকট প্রেরিত হউক।

ভক্তিবিনয়াবনত

এন. এইচ. লোগেন—প্রেসিডেণ্ট
সি. এফ. পিটারসন—ভাইস-প্রেসিডেণ্ট
এ. এস. উলবার্গ—সেক্রেটারি
স্যান ফ্রান্সিস্কো বেদান্তদর্শন ক্লাস,
ইউ. এস. এ.

ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা ?

[আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল শতবার্ষিকী স্মরণে]

ডক্টর রমা চৌধুরী

'একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে—ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা ?'১

সুদীর্ঘ তেতাল্লিশ বৎসর পূর্বে পুণ্যভূমি বিশ্বভারতীর গুণিপাদ-রজোধন্য মনোরম কানন-সভায় কে উচ্চারণ করেছিলেন—উদাত্তকণ্ঠে এই মহাবাণী—ভারতীয় ঋষিদের সঙ্গেই সুর মিলিয়ে ?

তিনি তো আমাদের পরমবরণীয় আচার্যদেব ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, যিনি তাঁর অনুপম-প্রজ্ঞাবলে পূজিত হয়েছিলেন দেশে বিদেশে দার্শনিকশ্রেষ্ঠ-রূপে, সত্যদ্রষ্টারূপে।

কি সত্য তিনি দর্শন করেছিলেন আজীবন ? ভারতের কোন্ মহাপ্রাণ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন—তাঁর নিগূঢ় প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে ?

তা প্রকাশ করা যায় একটিমাত্র কথায়, একটি মাত্র সহজ-সরল মিষ্ট-মধুর কথায়—ঐক্য ! ভারতবর্ষের পক্ষে এ অবশ্য একেবারেই নূতন কথা নয়; কারণ এ হ'ল ভারতবর্ষের প্রাণেরই পবিত্রতম কথা, অন্তরেরই অনুপম কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আচার্যদেব এই অতি পুরাতন কথাকেই কি নবীনভাবেই না উপস্থাপিত করেছিলেন সকলের সম্মুখে সগৌরবে।

সাধারণতঃ 'ঐক্য' বলতে আমরা বুঝি 'একতা' বা 'অভেদত্ব'। কিন্তু আচার্যদেব এরূপ ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত অভেদত্বের ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী। প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেরূপ, প্রত্যেক জাতিরও সেরূপ আছে স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য, আছে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য, আছে স্ব স্ব স্বরূপ। ব্যক্তি বা জাতির কেন্দ্রীভূত এই মহাসত্যটি বর্জন করলে, এই পরমতত্ত্বটি উপেক্ষা করলে তার প্রকৃত সত্তাটিকেই তো করা হয় বর্জন, তার প্রকৃত সত্যটিকেই তো করা হয় উপেক্ষা। সেজন্য 'সঙ্কীর্ণ-চেতা' এই দুর্নামের ভয় না রেখেও তিনি নির্ভীকভাবে বলতেন :

In our comparative studies of Eastern and Western thought, never allow yourselves to be carried away by the revelation of a fundamental similarity or an original kinship into believing that one is the exact replica or echo of the other. On a closer inspection of the theme, on every such occasion, you are sure to find points of divergence and disparity, coming into relief against the back-ground of fundamental similarity. (Lecture-notes)

— তোমরা যখন প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য চিন্তাধারা তুলনামূলকভাবে পাঠ করবে, তখন তাদের মধ্যে কোন মূলীভূত সাদৃশ্য অথবা নিগূঢ় সম্বন্ধ দেখেই মোহিত হয়ে এরূপ ভেবো না যে, একটি আর একটির অবিকল প্রতিরূপ অথবা প্রতিধ্বনিই মাত্র। বরং তুমি যদি সেই বিষয়টি আরও ভালোভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখ, তাহলে সব ক্ষেত্রেই দেখতে পাবে—সেই মূলীভূত সাদৃশ্যের মধ্যেও প্রভেদ ও বৈসাদৃশ্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট

অভেদের মধ্যে এই যে অনস্বীকার্য ভেদ, সাদৃশ্যের মধ্যেও যে এই অনিবার্য বৈসাদৃশ্য, একত্বের মধ্যেও এই যে অবশ্যম্ভাবী বৈচিত্র্য, তাতে ক্ষতি কিছুই নেই, ক্ষোভের কিছুই নেই, বরং লাভই সমধিক, আনন্দই সমধিক। কারণ ব্যক্তিগত দিক্ থেকেই হোক বা জাতিগত দিক্ থেকেই হোক, যদি একে অপরের

১ ৮ই পৌষ, ১৩২৮, (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২১) বিশ্বভারতীর উদ্বোধন-সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

প্রতিচ্ছবি-প্রতিধ্বনি মাত্রই হ'ত তাহলে কি জীবন সত্যই বৈচিত্র্যবিহীন, এবং সেজন্য স্বভাবতই আনন্দবিহীন হয়ে প'ড়ত না ? এই কারণে বহু ধর্ম, বহু দর্শন, বহু সংস্কৃতি, বহু ভাষার লীলা-ভূমি ভারতবর্ষ কেবল-অভেদ অথবা কেবল-ভেদ—এই দুটি চরম পন্থা বর্জন ক'রে ভেদ গ্রহণশীল অভেদের (বৈচিত্র্যে একত্ব দর্শনের) পন্থাই চিরকাল অবলম্বন করেছে। কি সুন্দর ভাবেই না আধুনিক ভারতের পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন এই প্রসঙ্গে :

You cannot make all conform to the same ideas; that is a fact, and I thank God that it is so. I am not against any sect. I am glad that sects exist, and I only wish that they may go on multiplying more and more. Why? Simply because if you and I and all who are present here, were to think exactly the same thoughts, there would be no thoughts to think. (C. .W. II. P. 361)

তুমি সকলকেই সেই একই ভাবে চিন্তা করাতে কোন ক্রমেই পারবে না। এটি একটি অমোঘ সত্য; এবং এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি কোন সম্প্রদায়-বিরোধী নই, বরং এই সব সম্প্রদায় আছে বলেই আমি খুশী; এবং আমি কেবল এই ইচ্ছাই করি যে, এই সব সম্প্রদায় যেন উত্তরোত্তর বর্ধিতই হয়। কেন ? কারণ যদি তুমি, আমি এবং এখানে উপস্থিত সকলেই সেই একই চিন্তা করি, তাহলে চিন্তা করবার তো আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

একইভাবে ব্রজেন্দ্রনাথও ব্যক্তিগত এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে চিরকাল সম্মান দিয়ে এসেছেন। সেজন্যই তিনি 'Comparative Philosophy and Religion অথবা তুলনামূলক দর্শন ও ধর্ম পঠন-পাঠনের একজন শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ ছিলেন। বস্তুতঃ, যদি একদেশের দর্শন ও ধর্ম অন্যান্য দেশের দর্শন ও ধর্মের প্রতিচ্ছবি-প্রতি-ধ্বনি মাত্র হ'ত, তাহলে এরূপ শ্রমস্বীকার ক'রে সে-সব পাঠ করবার প্রয়োজনই হ'ত না। কিন্তু বিভিন্ন দেশের এই সব দর্শনশাস্ত্র এবং ধর্মতত্ত্ব পাঠ করলে আমরা মানব-মনের ঐক্য সম্বন্ধেই জানতে পারি, শুধু তা নয়—সেই সঙ্গে মানব-চিন্তাধারা যে কত বিচিত্র, মানব-দৃষ্টিভঙ্গী যে কত বহুমুখী, মানব-মনীষা যে কত সুদূর প্রসারী, তাও সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি ক'রে যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হই। আচার্য শীল সেজন্য বলছেন :

It is one of the cherished ambitions of my life that I may found in this country a school of philosophical research, which will not merely carry on its work in accordance with age-long 'Tol' tradition, but would, by means of the critico-comparative method avail of, and add to the world's stock of knowledge.

(Lecture-notes)

আমার জীবনের অন্যতম উচ্চাকাঙ্ক্ষা হ'ল এই যে, আমাদের দেশে দর্শনের গবেষণা সম্বন্ধে একটি সম্প্রদায় স্থাপিত ক'রে যাওয়া, যা কেবল টোলের প্রাচীন রীতি অনুসারেই কার্য করবে না; কিন্তু যুক্তিসঙ্গত, তুলনামূলক রীতি অনুসরণ ক'রে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণও করবে; পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে জ্ঞান দানও করবে।

'পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ, পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারে জ্ঞান দান'—এরূপ অপূর্ব আদান-প্রদানের মাধ্যমেই তো জ্ঞান হয় পূর্ণ, জ্ঞান হয় সার্থক। আজীবন জ্ঞানতপস্বী ব্রজেন্দ্রনাথও এই পূর্ণতার, এই সার্থকতার পথেই আমাদের পরিচালিত করেছেন চিরদিন।

সমন্বয়বাদী ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন দর্শন ও ধর্মের দিক্ থেকে বৈষ্ণবমতাবলম্বী। বৈষ্ণব-মতের বৈশিষ্ট্যই হ'ল, ভেদ এবং অভেদের মধ্যে একটি

সুষ্ঠু-সুন্দর সমন্বয় সাধন করা। সত্যই, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের স্বগতভেদরূপী যে জীব-জগৎ, তা ব্রহ্মের অন্তর্ভুক্ত ব'লে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হ'তে পারে না; অথচ শেষ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্রহ্মই, জীব জীবই, জগৎ জগৎই—প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট একের মধ্যে বহুর স্থিতি যখন অনিবার্য, তখন বহু নিশ্চয়ই এদের স্বরূপভাগী, অথচ বহু বহুই, এক নয় শেষ পর্যন্ত। এই তো এক ও বহুর মধ্যে মধুর-মোহন, অত্যাশ্চর্য সম্বন্ধ!

বৈষ্ণব-ধর্মের ভক্তিবাদ ও প্রেমবাদের মধ্যেও এরই অতি সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। উপাস্য-উপাসক চিরকালই বিভিন্ন, অথচ উপাসনার মাধ্যমে তাঁরা এক; প্রেমিক-প্রেমিকা চিরকালই বিভিন্ন, অথচ প্রেমের মাধ্যমে তাঁরা এক।

ব্রজেন্দ্রনাথ যুক্তিমূলক, বিজ্ঞানমূলক প্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন আদ্যোপান্ত। অথচ তিনি যুক্তিকে ভক্তির সঙ্গে, বিজ্ঞানকে প্রেমের সঙ্গে পূর্ণভাবে সমন্বিত করেছিলেন অবলীলাক্রমে। তাঁর মাহাত্ম্য তো এইখানেই।

'In this very land of ours, which has always been the homeland of Atma-vidya, it is not self-denial or self-effacement, but self-recognition or self-assertion, that is to be the guiding principle'. (Lecture-notes)

—আমাদের এই দেশে, যে দেশ সর্বদাই আত্মবিদ্যার লীলাভূমি, আত্মাকে অস্বীকার করা নয়, আত্মবিলোপ নয়; উপরন্তু আত্মোপলব্ধি, আত্ম-প্রতিষ্ঠাই হ'ল মূলমন্ত্র।

এরূপ বীর্যের পথ, বিশ্বাসের পথই প্রতিষ্ঠার পথ। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।'

এর মধ্যেই কি আমরা উত্তর পাব না প্রারম্ভের সেই মহাপ্রশ্নের—'ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা?'

আদ্যা শকতি মাতৃ-মূরতি

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

সুর: মালকোশ—তেওরা

আদ্যা শকতি মাতৃ-মূরতি সর্ব-অবতার জননী।
লীলাতে আবার তুমি নাকি সাজ যুগ-অবতার-সঙ্গিনী॥
ত্রেতা যুগে তুমি সাজিয়াছ সীতা,
দ্বাপরে আবার সেজেছ মা রাধা;
এবারে সবার স্নেহময়ী মাতা সারদেশ্বরী-রূপিণী॥
তুমি 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী' সর্ব-কল্যাণ-কারিণী
তোমার মাতৃ-স্নেহ-সুরধুনী ভাসালো বিশাল ধরণী।
সর্ব-মঙ্গলা জননি আমার
হৃদয়-কমলে প্রকাশো এবার,
দেবতা-বাঞ্ছিত শ্রীপদ তোমার নেহারি আঁখি ভরি' দিবস-যামিনী

বৌদ্ধ ভারত

স্বামী বিবেকানন্দ

(শ্রীতামসরঞ্জন রায়-কৃত অনুবাদের পূর্বানুবৃত্তি)

বুদ্ধের জন্মকালেই প্রাণিহত্যা না করবার এবং জীবে দয়া প্রদর্শন করবার নীতি আদর্শরূপে গৃহীত ছিল —এ-কথা আমরা আলোচনা করেছি সেক্ষেত্রে বুদ্ধদেব নূতন কিছু করেননি; কিন্তু তিনি নূতন যেটি করেছিলেন, সেটি হচ্ছে—জাতিভেদপ্রথা উচ্ছেদের জন্য একটি প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত। তা-ছাড়া আরও একটি অভিনব কাজ বুদ্ধদেব সম্পন্ন করেছিলেন! তিনি তাঁর চল্লিশজন শিষ্যকে পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরণ করেছিলেন এই নির্দেশ দিয়েঃ 'বৎসগণ, তোমরা সকল দেশের সকল মানুষের সঙ্গেই উদার ভাব নিয়ে মিলিত হবে, জাতিধর্মনির্বিশেষে মিলিত হবে, এবং সকলের কল্যাণ-সাধনকল্পে মহাবাণী প্রচার করবে।'

অবশ্য এজন্য হিন্দুরা সৌভাগ্যক্রমে তাঁকে নির্যাতিত করেনি। তিনি পূর্ণবয়সে দেহত্যাগ করেছিলেন। বরাবর তিনি অতি কঠোর জীবন যাপন করেছেন। কোন দুর্বলতা কখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর বহু মতবাদে আমি বিশ্বাস করি না। না, সত্যি বিশ্বাস করি না। আমি বরং বিশ্বাস করি যে, প্রাচীন হিন্দুদের বেদান্তবাদ অনেক বেশী চিন্তাপূর্ণ; বেদান্তের জীবনদর্শন অপূর্ব। বুদ্ধের কর্মপদ্ধতি যে আমি অপছন্দ করি, তা অবশ্য নয়। তবে তাঁর যে বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে, সেটি হচ্ছে তাঁর দৃঢ়তা, তাঁর মহত্ত্ব এবং তাঁর স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি। তাঁর মস্তিষ্কে কোন জটিলতা ছিল না। যখন বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য তাঁর পাদমূলে এসেছিল, তখনও তাঁর মধ্যে তিলমাত্র পরিবর্তন হয়নি; তখনও তাঁর মধ্যে এই মনোভাব সম্পূর্ণ অব্যাহত ছিল—'আমি আর দশজনেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ'।

আপনারা জানেন, হিন্দুরা মানুষ-পূজা করতে ভালবাসে, সেদিকে তাদের আগ্রহ ঐকান্তিক। যদি আপনারা কিছু দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন, তবে দেখতে পাবেন, আমাকেও বহুলোক পূজা করবে। যদি হিন্দুদের মধ্যে কেউ কোন ধর্মপ্রচার করে, তবে জীবিতকালেই তাঁকে তারা পূজা করতে শুরু করে। ফল-কথা, কাউকে পূজা করবার আগ্রহ এবং প্রবণতা তাদের চিরন্তন। অথচ তাদেরই মধ্যে বাস করেও বিশ্ববিখ্যাত বুদ্ধদেব, আজীবন এ ঘোষণাই ক'রে গেছেন যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষমাত্র। এ-ছাড়া অন্য কোন উক্তি তাঁর কণ্ঠ থেকে তাঁর কোন ভক্ত কখনও বের করতে পারেনি।

তাঁর অন্তিম বাক্যগুলি চিরদিন আমার অন্তরে একটি অব্যক্ত স্পন্দন জাগ্রত করেছে। তিনি তখন বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃত্যুপথযাত্রী; ঠিক সে-সময়ে একজন অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ ব্যক্তি তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল; সে গলিতমাংসভোজী। হিন্দুরা সেই জাতের কাউকে লোকালয়েই প্রবেশ করতে দেয় না। সেই শ্রেণীর একটি লোক সশিষ্য বুদ্ধদেবকে তার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করেছিল। সে দীন দরিদ্র ব্যক্তিটির নাম চুন্দ। সে তার সাধ্যমত, যুক্তিবিবেচনামত সেই মহান্ আচার্যকে আপ্যায়িত করতে চেয়েছিল। তাই প্রচুর শূকর-মাংস এবং অন্ন প্রস্তুত ক'রে বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যগণকে সে পরিবেশন ক'রল। বুদ্ধদেব একবার সেই আহার্যগুলি তাকিয়ে

দেখলেন। শিষ্যেরা সবাই ইতস্ততঃ করছিল—তারা সেই ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ করবে কিনা। বুদ্ধদেব তখন তাদের বললেন, 'এ আহার্য তোমরা কেউ গ্রহণ ক'রো না, তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে।' কিন্তু তিনি নিজে শান্তভাবে আসনে বসে সেই আহার্য গ্রহণ করলেন। তিনি সমদর্শী, তিনি আচার্য; অতএব তিনি চুন্দ-প্রদত্ত খাদ্যও গ্রহণ করবেন—এমন-কি শূকরের মাংসও খাবেন! তাই তিনি খেলেন, স্থিরভাবে সেই আহার্য গ্রহণ করলেন।...

তিনি তখন মরণাপন্নই ছিলেন। এখন মৃত্যু একেবারে আসন্ন উপলব্ধি ক'রে বললেন, 'ঐ বৃক্ষের নীচে আমার জন্য শয্যা ক'রে দেওয়া হোক। আমার মনে হচ্ছে—আমার প্রয়াণের সময় উপস্থিত হয়েছে।'

তারপর সেই বৃক্ষমূলেই তিনি শয্যাগ্রহণ করলেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ করেন, আর সেই শয্যা ছেড়ে উঠতে পারেননি। ঐ বৃক্ষতলে শুয়ে তিনি প্রথমেই জনৈক শিষ্যকে বলেছিলেন, 'চুন্দের কাছে গিয়ে তাকে জানিয়ে এস, তার মতো উপকারী বন্ধু আমার আর কেউ নেই, কারণ তার দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করেই আমি নির্বাণ লাভ করতে চলেছি।'

এর পরও কতক লোক তাঁর কাছে উপদেশ-লাভের জন্য এসেছিল। একজন শিষ্য তাদের উদ্দেশ্য ক'রে বলছিল, 'প্রভুর খুব কাছে তোমরা যেও না। তিনি এখন মহাসমাধিতে নিমগ্ন হ'তে চলেছেন।' কিন্তু সে-কথা শোনামাত্র বুদ্ধদেব ব'লে উঠলেন, 'না, না, ওদের আসতে দাও।' আবার কয়েকজন লোক এল, আবার শিষ্যেরা তাদের বাধা দিতে গেল; কিন্তু আবার বুদ্ধদেব তাদের নিকটে আহ্বান করলেন। তারপর তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য আনন্দকে ডেকে বুদ্ধদেব বললেন, 'বৎস আনন্দ! আমি চলে যাচ্ছি, সেজন্য শোক ক'রো না। আমার জন্য চিন্তা ক'রো না। মনুষ্যজীবনে মৃত্যু অবধারিত। তোমরা নিজেদের মুক্তির জন্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা কর। তোমরা প্রত্যেকেই সর্বাংশে আমারই মতো। আমি তোমাদেরই একজন ছাড়া আর কিছু নই। অশেষ তপস্যায় আমি আমার জীবন গঠিত করেছি, সুতরাং তোমরাও অক্লান্ত চেষ্টা দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারো।'

বুদ্ধের শেষ অক্ষয় বাণী ছিল এইরূপ: 'কোন শাস্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্য, তা সে যত প্রাচীন গ্রন্থই হোক, মেনে নিও না। শুধু পূর্বপুরুষগণের উক্তি ব'লে কোন কথায় বিশ্বাস ক'রো না, অথবা আর দশজন লোক বিশ্বাস ক'রে বলেও কোন মতবাদ গ্রহণ ক'রো না। প্রতিটি জিনিস পরীক্ষা কর, যাচাই কর, তারপর বিশ্বাস কর। আর যদি কোন কিছু বহুজনের হিতকর হবে ব'লে মনে কর, তবে সকলের মধ্যে সেটি বিতরণ কর।'—এই শেষ বাণী উচ্চারণ করেই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেছিলেন।

এই মহতী প্রজ্ঞাবাণী অনুধাবনযোগ্য। তিনি দেবতা নন, দানব নন, দেবদূতও নন। না, সে-সব কিছুই তিনি নন। তিনি শুধু একজন দৃঢ়চিত্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি—যাঁর মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ নিখুত, পরিপুষ্ট এবং জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সতেজ ও ক্রিয়াশীল। মোহ নেই, ভ্রান্তি নেই—এই বুদ্ধের স্বরূপ। তাঁর অনেক মতবাদের সঙ্গেই আমি একমত নই, আপনাদের অনেকেও হয়তো একমত হবেন না। কিন্তু আমি ভাবি—আহা, তাঁর মহাশক্তির এককণাও যদি আমার থাকত! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাবান্ দার্শনিক তিনি। প্রবল ব্রাহ্মণ্যশক্তির অত্যাচারের কাছে

কখনও তিনি মাথা নত করেননি। না, কখনও না। সর্বত্র সহজ ও ঋজু—এই তাঁর প্রকৃতি ছিল। দুঃখীর দুঃখে তিনি দুঃখী, তাদের সাহায্যে তিনি মুক্তহস্ত। আবার সঙ্গীত-সভায় তিনি মহাসঙ্গীতজ্ঞ। শক্তিমানের মধ্যে তিনি মহাশক্তিমান্। কিন্তু সর্বত্রই সেই এক প্রাজ্ঞ মনীষী, সেই সক্ষম শক্তিমান্ পুরুষ।

কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও তাঁর মতবাদের সব কিছু আমার বোধগম্য নয়। আপনারা জানেন—হিন্দুমতে মানুষের মধ্যে যে আত্মা বিরাজ করেন, সেই আত্মাকে তিনি স্বীকার করেননি। আর আমরা—হিন্দুরা এ-কথা বিশ্বাস করি যে, মানুষের মধ্যে শাশ্বত একটি পদার্থ আছে—যেটি অপরিবর্তনীয়, যেটি অনন্তকালস্থায়ী। সেই পদার্থই আত্মা; তার আদি নেই, অন্ত নেই—সেই ব্রহ্ম। কিন্তু বুদ্ধদেব এই আত্মা, ব্রহ্ম—দুই-ই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলতেন, কোন বস্তুর চিরস্থায়িত্বের কোন প্রমাণ নেই।···সবই নিত্য পরিবর্তনের সমষ্টিমাত্র। নিত্য পরিবর্তনশীল যে চিন্তাস্রোত—তারই সমষ্টিকে 'মন' বলে। একটি ঘূর্ণায়মান মশাল যেন এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করছে, কিন্তু ঐ 'অলাতচক্র'টি মায়া। অথবা একটি নদীর উপমা গ্রহণ করা যেতে পারে—একটি নদী যেমন অবিরাম প্রবাহে গতিশীল, প্রতি মুহূর্তে তার মধ্যে নূতন জলরাশি আসছে এবং চলে যাচ্ছে—জীবনও ঠিক তেমনি; দেহ, মনও তেমনি।

কিন্তু আমি তাঁর মতবাদ ঠিক বুঝতে পারি না, হিন্দুরা কখনও বুঝতে পারেনি। তবে তাঁর মতবাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্যটি আমি বুঝতে পারি। আহা, সেটি একটি মহান্ উদ্দেশ্য—বিরাট্ উদ্দেশ্য! বুদ্ধদেব বলতেন, জগতে স্বার্থপরতাই প্রচণ্ড অভিশাপ। আমরা স্বার্থপর, তাই আমরা অভিশপ্তও বটে। স্বার্থপরতার কু-মতলব পরিহার করা কর্তব্য। একটি ঘটনাপ্রবাহেরই মতো জীবন বয়ে চলেছে। নদীপ্রবাহের সঙ্গেই তার তুলনা হ'তে পারে। ঈশ্বর নয়, আত্মা নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নিয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াও। সৎকাজের জন্যই সৎকাজের অনুষ্ঠান কর—শাস্তির ভয়ে নয়, কোন আকাঙ্ক্ষিত লোকে যাবার উদ্দেশ্য নিয়েও নয়।

সুবুদ্ধি নিয়ে দাঁড়াও, মতলব ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াও। সৎকাজ সৎ বলেই আমি তার অনুষ্ঠান ক'রব, অন্য কোন কারণে নয়—এই হবে উদ্দেশ্য। কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র এই মতবাদ! আমি তাঁর দার্শনিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে কোন সময়েই একমত নই, এ-কথা পূর্বেই বলেছি; কিন্তু তাঁর নৈতিক প্রভাব আমাকে যেন উৎসাহিত ক'রে তোলে। আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে প্রশ্ন করুন, দেখুন তাঁর মতো নির্ভীকতা নিয়ে, শক্তি নিয়ে—এক ঘণ্টাও নিজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়াতে পারেন কিনা। আমি তো পাঁচ মিনিটেই যেন ভয় পেয়ে যাই, একটি অবলম্বন যেন আমার কাছে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তখন আমি বুঝতে পারি—আমি কত ভীরু, কত দুর্বল! আর সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট্ মহামানবের কথা চিন্তা ক'রে আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি। তাঁর যে প্রচণ্ড মহাশক্তি, তার কাছাকাছি যাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তেমন শক্তি-প্রকাশ জগৎ ইতিপূর্বে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। আমি নিজে তো এরূপ শক্তি এ-পর্যন্ত কোথাও দেখিনি।

বস্তুতঃ আমরা তো জন্মভীরু। নিজেকে বাঁচাতে আমরা সর্বদা সচেষ্ট, আর সেটি হলেই আমরা তৃপ্ত হয়ে থাকি। প্রচণ্ড ভীতি, নিগূঢ় স্বার্থপরতা সর্বদা আমাদের মধ্যে কাজ করছে;

তারই ফলে আমাদের ভীরুতার শেষ নেই, ভয়ের অবধি নেই। অথচ এর মধ্যে দাঁড়িয়েই তাঁর এই ঘোষণা—'সৎ বলেই সৎকার্য অনুষ্ঠান কর। কোন প্রশ্ন উত্থাপন ক'রো না, সে-সবই নিরর্থক। গল্পে, উপাখ্যানে, সংস্কার-সহায়ে মানুষকে সৎকার্যে প্রণোদিত করা হয়ে থাকে। তথাপি সুযোগ পেলেই সে অসৎকার্যে লিপ্ত হয়। শুধু সৎকর্মের জন্যই যে ব্যক্তি সৎ কর্মের অনুষ্ঠান ক'রে থাকে, সেই যথার্থ মহৎ। কার্য-মাধ্যমে তার চরিত্রেরই যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।'······

একদা বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'মৃত্যুর পর মানুষের কী অবশিষ্ট থাকে?' উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সবই থাকে, সবই থাকে।' কিন্তু মানুষের মধ্যে অক্ষয় পদার্থ কোন্‌টি? সেটি তার চরিত্র—তার দেহ নয়, আত্মা নয়, অন্য কিছুই নয়। আর সেই চরিত্রই কালজয়ী হয়ে জীবিত থাকে। যাঁরা চলে গেছেন, তাঁরা তাঁদের চরিত্ররূপ মহাসম্পদ্‌ই শুধু রেখে গেছেন। রেখে গেছেন আমাদের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্য। আর কালে কালে সেই চরিত্র-প্রভাব কাজ ক'রে চলেছে।

বুদ্ধের কথাই বলুন, আর যীশুখ্রীষ্টের কথাই বলুন · এ-জগৎ তাঁদের চরিত্র-মহিমায় উদ্ভাসিত! মহাশক্তি সমন্বিত এই মতবাদ। · যা হোক, আসুন আমরা আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই, কারণ সে-প্রসঙ্গে এখনও আমরা পৌঁছাইনি। (সকলের হাস্য)। কাজেই আজ সন্ধ্যায় আরও দু-চারটি কথা আমায় বলতে হবে।···বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—তাঁর কর্মপন্থা, তাঁর সংগঠন। আজ গির্জা-সম্বন্ধে, ধর্মসংস্থা-সম্বন্ধে আপনাদের যে মত ও ধারণা গড়ে উঠেছে—সে-ও তাঁরই চরিত্র থেকে। তিনি মামুলি ধরনের ধর্মসংস্থা পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু নিজ সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে একত্র ক'রে নূতন একটি সংঘ গঠন করেছিলেন। সেই সংঘে—যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সাড়ে পাঁচ-শ বছরেরও পূর্বে ভোটপত্র-সহায়ে মতামত দেবার প্রথা পর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল এবং তাঁর সংগঠনও সর্বাংশে নিখুঁত ছিল। পূর্বতন ধর্মসংস্থার বাইরে—এই নূতন ধর্মসংঘ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছিল এবং ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে প্রভূত সেবামূলক কাজ করেছিল।

এর তিন-শ বছর পরে এবং যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দু-শ বছর পূর্বে মহান্ সম্রাট্ অশোকের আবির্ভাব হয়। পাশ্চাত্য দেশের ঐতিহাসিকগণ তাঁকে 'দেবোপম সম্রাট্' ব'লে আখ্যাত করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধের মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। তৎকালে সমগ্র পৃথিবীতে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্। তাঁর পিতামহ ছিলেন আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক এবং সে-সময় থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে গ্রীসের একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

অধুনা প্রায় প্রত্যহই মধ্য এশিয়ায় কোন শিলালিপি বা ঐ-জাতীয় কিছু আবিষ্কৃত হচ্ছে। ভারতবর্ষ তো বুদ্ধ বা অশোকের কথা ভুলেই গিয়েছিল। অথচ এখানে স্তম্ভগাত্রে বা শিলাখণ্ডে প্রাচীন হরফে বহু বাণী উৎকলিত ছিল, কিন্তু সেগুলির পাঠোদ্ধার করতে কেউ সক্ষম ছিল না।··· প্রাচীন মোগল সম্রাট্‌দের কেউ কেউ লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক ঘোষণা করেও সেগুলির পাঠোদ্ধারে সক্ষম হননি।

কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে-সব লিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। পালিভাষায় সে-সব বাণী লিখিত।

প্রথম শিলালিপিটি এইরূপ : " .... .

অতঃপর যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং করুণ দুঃখকাহিনী বিস্তারিতভাবে উৎকলিত হয়েছে। এর পরই অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শিলালিপিতে লিখেছিলেন : 'অতঃপর, আমার বংশধরগণের মধ্যে কেউ যেন অন্য কোন জাতিকে যুদ্ধে জয় ক'রে যশোলাভের প্রয়াসী না হয়। যদি তারা যশস্বী হ'তে চায়, তবে অন্য জাতিকে সাহায্য করেই যেন তারা যশ অর্জন করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাঁরা শিক্ষক ও আচার্য—বিভিন্ন দেশে যেন তাদের প্রেরণ করা হয়। তরবারির সহায়তায় যে যশ অর্জিত হয়, সেটা যশই নয়।'

এর পরই দেখা যায়—কিভাবে অশোক বিভিন্ন দেশে, এমন কি সুদূর আলেকজান্দ্রিয়ায় পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছেন। আর বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে ঐ-সব অঞ্চলের সর্বত্র নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল—থেরাপুত্ত, এসিনি প্রভৃতি নামে যাদের খ্যাতি। এ-সব সম্প্রদায় কঠোর নিরামিষাশী।

মহামতি সম্রাট্ অশোক, চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন; মানুষের জন্য তো বটেই, পশুর জন্যও। নানা শিলালিপিতে এই সব চিকিৎসালয় স্থাপনের নির্দেশ রয়েছে—দেখা যায়। যখন কোন গৃহপালিত পশু বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য হয়ে যাবে এবং তার মনিব দারিদ্র্যবশতঃ আর সেটিকে প্রতিপালন করতে সক্ষম হবে না, তখন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হবে, 'দয়া ক'রে হত্যা করা হবে না। সে-সব চিকিৎসালয় জনসাধারণের অর্থেই পরিচালিত হ'ত। বহির্বাণিজ্যের ব্যবসায়ীরা বিক্রীত বস্তুর ওজনের উপর হন্দর-হিসাবে যে শুল্ক দিত, সে সবই ঐ-সকল চিকিৎসালয়ের জন্য ব্যয়িত হ'ত। কাজেই কারও উপর কোন চাপ দেওয়া হ'ত না, অথচ সুব্যবস্থা ছিল সকলের জন্য। তোমার পালিত গাভীটি বৃদ্ধ হয়েছে, তুমি আর রাখতে চাও না, তাকে পশুচিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দাও, তারা রাখবে সেটিকে। এমন কি বিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি নিম্নতর প্রাণীদেরও স্থান ছিল সেখানে। মেয়েরা শুধু এগুলিকে মেরে ফেলতে চাইতেন, তাঁরা কখন কখন দলবদ্ধ হয়ে নানা বিষাক্ত খাদ্য নিয়ে যেতেন এবং তাই খাইয়ে বহু প্রাণী মেরে ফেলতেন।

কিন্তু অশোকের অভিমত ছিল এই যে, মানুষের জীবন রক্ষা করা যেমন সরকারের কর্তব্য, প্রাণীদের জীবনরক্ষাও তেমনি সরকারের কর্তব্য হওয়া উচিত। প্রাণিহত্যা করা হবে কেন? কোন্ যুক্তিতে? কোন সঙ্গত যুক্তি নেই তার পশ্চাতে। তবে মানুষের আহারের প্রয়োজনে পশুবধ নিষিদ্ধ করবার পূর্বে সর্বপ্রকার সবজির ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। সেই জন্যে নানাদেশ থেকে তরকারির বীজ সংগ্রহ ক'রে দেশে বপন করেছিলেন তিনি এবং সেগুলি আহারোপযোগী হবার সঙ্গে সঙ্গেই ফরমান জারি করেছিলেন যে—প্রাণিহত্যামাত্রই দণ্ডনীয় অপরাধ ব'লে গণ্য হবে। যে-কোন যোগ্য সরকারের পক্ষে প্রাণীদের রক্ষা করাও অবশ্য করণীয় কার্যরূপে গণ্য হওয়া উচিত। নিজের আহারের জন্য গো ছাগ প্রভৃতি প্রাণী হত্যা করবার কি অধিকার মানুষের আছে?

এই ভাবে বৌদ্ধধর্ম রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অসাধারণ প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। কালক্রমে অবশ্য ধর্মপ্রচারকদের নানা অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সে ধর্ম বিপর্যস্ত হয়েছিল। তবে

তাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক হিসাবে এ-কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তারা কখনও তরবারির সাহায্য গ্রহণ করেনি। আর সেই সঙ্গে এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এক বৌদ্ধধর্ম ভিন্ন জগতের আর কোন ধর্মই রক্তপাত না ক'রে এক পা অগ্রসর হ'তে সক্ষম হয়নি। মাত্র মস্তিষ্কের শক্তি দিয়ে হাজার হাজার নরনারীকে ধর্মান্তর গ্রহণ করানো—অপর কোন ধর্মের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। না, কোথাও হয়নি, কোন যুগে হয়নি।

আর আপনারা ঠিক এই জিনিসই করতে চলেছেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে। তরবারি দিয়ে ধর্ম শেখানো—এই তো আপনাদের প্রণালী! এই তো ধর্মযাজকগণ প্রচার ক'রে থাকেন! বলপ্রয়োগে জয় ক'রে, হত্যা ক'রে ধর্মশিক্ষা দেওয়া! ধর্মশিক্ষার এক বিচিত্র প্রণালীই বটে !!

আপনারা জানেন—কিভাবে মহামতি সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যৌবনে তিনি খুব সৎ লোক ছিলেন না। তাঁর এক ভাই ছিল। দুই ভাইয়ের মধ্যে একবার প্রচণ্ড কলহ হয়। অশোক পরাজিত হয়েছিলেন সেই কলহে। সেই প্রতিহিংসায় নিজ ভ্রাতাকে হত্যা করবার সংকল্প করেছিলেন অশোক। তাঁর ভ্রাতা তখন আত্মরক্ষার জন্য এক বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় নিয়েছেন। সংবাদ পেয়ে অশোক সেই বিহারে নিজে গিয়ে দাবি করলেন—ভ্রাতাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করবার জন্য। তখন মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী তাঁর নিকট এই বাণী প্রচার করেছিলেনঃ 'প্রতিহিংসা ভাল নয়। প্রেম দ্বারা ক্রোধ জয় কর। ক্রোধ কখনও ক্রোধ দ্বারা শান্ত হয় না, ঘৃণাও ঘৃণা দ্বারা দূরীভূত হয় না। প্রেম দ্বারা ক্রোধ জয় কর—হিংসা জয় কর। হে বন্ধু, একটি অন্যায়ের পরিবর্তে তুমি যদি আর একটি অন্যায় কার্য কর, তবে তার দ্বারা প্রথম অন্যায়টির প্রতিকার হয় না বরং সংসারে আরও একটি নূতন অন্যায় সাধিত হয়ে থাকে।' উত্তরে সম্রাট্ বলেছিলেন, 'ঠিক কথা, ঠিক কথা! কিন্তু তুমি একটি মূর্খ! ঐ ব্যক্তির জীবনরক্ষার জন্য তোমার নিজ জীবনটি বিসর্জন দিতে তুমি প্রস্তুত আছ কি ?'

'হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত আছি সম্রাট্।' এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে সন্ন্যাসী সম্রাটের সম্মুখে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সম্রাট্ও তরবারি কোষমুক্ত ক'রে বলেছিলেন—'তবে প্রস্তুত হও।' কিন্তু তরবারির আঘাত হানতে গিয়ে সহসা তিনি সেই সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকালেন। প্রশান্ত সে মুখমণ্ডল, চোখের পলকটি পর্যন্ত যেন পড়ছে না! সম্রাট্ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এ সাহস, এ অকম্পিত ভাব কোথা থেকে আয়ত্ত করলে—ভিক্ষুক সন্ন্যাসী ?'

তখন সে সন্ন্যাসী আবার বুদ্ধের বাণী উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং সম্রাট্ও বিস্মিত, মুগ্ধ হয়ে সেই অমৃত বাণী আরও শোনবার জন্য অনুরোধ জানাতে লাগলেন। এইভাবে বুদ্ধের জীবন ও বাণীর কাছে অশোক আত্মসমর্পণ করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে তিনটি জিনিস আছে। স্বয়ং বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও তাঁর সংঘ। প্রথমে সেই ধর্ম অত্যন্ত সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল। তাঁর মৃত্যুকালে তদীয় শিষ্যগণ প্রশ্ন করেছিলেন—'প্রভু, আপনার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি? আপনার স্মৃতিরক্ষার জন্য কিরূপ স্মৃতিস্তম্ভ আমরা নির্মাণ ক'রব ?'

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে নিয়ে তোমাদের কিছুই করণীয় নেই। যদি ইচ্ছা

হয়, আমার চিতাভস্মের উপর একটি মাটির স্তূপ নির্মাণ ক'রো। অথবা তাও করবার আবশ্যকতা নেই।' কিন্তু কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হ'ল। বিশাল মন্দির ও স্তূপাদি বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন-রূপে নির্মিত হ'ল। বৌদ্ধরাই মূর্তিপূজা প্রচলিত ক'রল, অথচ তার পূর্বে মূর্তিপূজার বিষয় মানুষের জানাই ছিল না। বুদ্ধের নানা অবস্থার মূর্তি, ভোগ-নিবেদন, উপাসনা—সবই এসে গেল। এবং সংঘের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এ-সবের জটিলতাও বর্ধিত হ'তে লাগলো। ক্রমে বৌদ্ধধর্মসমূহ প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হ'ল ; আর পতনের বীজও উপ্ত হ'ল সেই সঙ্গে।

সন্ন্যাস যদি অল্পসংখ্যক যোগ্য অধিকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেটি ভাল, কিন্তু যখন সেই সন্ন্যাস এমনভাবে প্রচারিত হ'তে থাকে যে, যে-কোন পুরুষ বা নারী সামান্য আগ্রহ বা অনুপ্রেরণা বশেই সমাজ ও সংসার ত্যাগ ক'রে সেটি গ্রহণ করতে শুরু করে ; যখন দেখা গেল—সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অনেক মঠ বা আশ্রম গড়ে উঠেছে এবং এক-একটিতে শত সহস্র সন্ন্যাসী বাস করছে, এমন-কি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ হাজার পর্যন্ত ভিক্ষু একই মঠে-বিহারে বাস করছে—বিরাট্ বিশাল সব পাকা মঠ বা আশ্রমের বাড়ি অবশ্য জ্ঞানচর্চার কেন্দ্ররূপেই সেগুলি পরিচালিত, তখনই যথার্থ বিপদের কাল—কারণ জাতীয় জীবনস্রোত তখনই ব্যাহত হয়। সৎ গৃহীর অভাবে সৎ পুত্রকন্যা আর সমাজে তখন যথেষ্ট সংখ্যায় জন্মগ্রহণ ক'রত না। সবল ও শক্তিমান্‌গণ চলে গেল সমাজের বাইরে, আর দুর্বলের সংখ্যাধিক্য ঘ'টল সমাজে। ফলে শক্তি ও বীর্যের অভাবেই জাতি ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেল।...

এবার বিচিত্র বৌদ্ধ সংঘের কথা কিছু ব'লব। বিরাট্ ছিল সে সংঘ ; তবে চিন্তা এবং মতবাদ এক কথা, আর বাস্তবভূমিতে তার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অন্য কথা।

অহিংসা, মৈত্রী—এ-সব তত্ত্ব-হিসাবে উত্তম, কিন্তু আমরা সবাই যদি সত্যি সত্যি অহিংস নীতি অবলম্বন ক'রে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দণ্ডায়মান হই, তাহলে এ নগরের আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। অর্থাৎ তত্ত্ব-হিসাবে ঠিক হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তার সার্থক প্রয়োগের পথ কেউ নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়নি। আরও একটি কথা। সেটি বর্ণবিচার-সম্পর্কে। রক্তের বিশুদ্ধতার দিক থেকে বর্ণবিচারের কিছুটা অর্থ আছে। বংশ-ক্রমিকতা অনস্বীকার্য। এদিক থেকে নিগ্রো কিংবা রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে আপনারা নিজেরা কেন রক্ত-সম্পর্ক স্থাপন করতে চান না, সেটা হয়তো উপলব্ধি করতে পারবেন। প্রকৃতিই এর প্রতিকূল হয়ে থাকে। প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা-হেতুই এরূপ রক্তের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে না। কোন অদৃশ্য শক্তিই যেন এইভাবে বিভিন্ন জাতিকে রক্ষা ক'রে থাকে।... বস্তুতঃ এইটিই আর্যদের বর্ণবিভাগ। তার অর্থ এ নয় যে, নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণদের সমপর্যায়ের নয়, কিংবা বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে। তবে এটা আমরা জানি যে, রক্তের অবাধ মিশ্রণে জাতির অবনতি হয়। আর্য এবং অনার্যদের মধ্যে কঠোর জাতিবিচার সত্ত্বেও বর্ণবিভেদের প্রাচীর কতকাংশে তারা অপসারিত করেছিল এবং তারই ফলে একাধিক বহিরাগত জাতি তাদের অদ্ভুত আচার-ব্যবহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে এদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। পরিচ্ছদে এদের শালীনতা ছিল না, মৃতদেহের গলিত মাংস এরা আহার ক'রত। তথাপি প্রথমাবস্থায় খানিকটা বাহ্য ভব্যতা বজায় ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই এদের গোঁড়ামি, কুসংস্কার, নরবলিপ্রথা, গোষ্ঠীগত কদাচার—সবই ধীরে ধীরে এসে মূল

সমাজে প্রবেশ ক'রল। প্রথম দিকে খানিকটা প্রচ্ছন্ন থাকলেও পরে ঐ সব দোষই অত্যন্ত প্রবল হ'ল, প্রকট হয়ে উঠল। তাতে সমগ্র জাতি নীচু হয়ে গেল, অসবর্ণ-বিবাহের মধ্য দিয়ে উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘ'টল এবং জাতি হীনবীর্য হয়ে গেল।

অবশ্য দূর ভবিষ্যতে এটিও শুভ ফলপ্রসূই হয়ে থাকে। ধরুন, আপনারা যদি নিগ্রোদের সঙ্গে কিংবা রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে রক্ত-সম্পর্কে মিশ্রিত হন, তবে নিঃসন্দেহ—বর্তমান সভ্যতা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু বহু শতাব্দী পরে এই মিশ্রণের ফলেই এক দুর্ধর্ষ জাতির উদ্ভব হবে—যার বলবীর্য হবে অতুলনীয়। কাজেই সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পরে সুফল লাভ সম্ভব হয়ে থাকে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, জগতে মাত্র একটিই সুসভ্য জাতি আছে—সেই জাতি আর্যজাতি। এ একটি বিচিত্র বিশ্বাস সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু এ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে পারি না, কারণ এর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আমি পাইনি। এই আর্যজাতির শোণিত-মিশ্রণ লাভ করতে না পারলে নূতন সভ্য জাতির উদ্ভব সম্ভব নয়। কোন প্রকার শিক্ষার দ্বারা সেটি হ'তে পারে না। আর্যজাতির রক্ত হচ্ছে প্রাথমিক প্রয়োজন, তারপর তার সঙ্গে শিক্ষা—এতেই নূতন সভ্যতা জন্মলাভ করে; কেবলমাত্র শিক্ষায় নয়।

আপনাদের দেশের কথা ধরুন—আপনারা যদি নিগ্রোদের সঙ্গে রক্ত-মিশ্রণে সম্মত হন, তবে নিগ্রোদের মধ্যে উচ্চতর সংস্কৃতি প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সেরূপ রক্ত-মিশ্রণে কি সম্মত হবেন আপনারা?

হিন্দুরা বর্ণবিভাগ পছন্দ করে। ঠিক বলতে পারি না, তবে হয়তো আমার মধ্যেও সে বর্ণবিভাগের ছোঁয়া লেগে থাকতে পারে। পূর্বগ আচার্যগণের আদর্শে আমি বিশ্বাস করি। সে আদর্শ মহান্ আদর্শ। কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণ খুব সার্থক হয়নি এবং উত্তরকালে ভারতীয় জাতির অধঃপতনের সেটি অন্যতম কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এর ফলে আবার এক প্রচণ্ড সংমিশ্রণও সংঘটিত হয়েছিল। যেখানে নানাজাতির রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটেছে—কেউ শ্বেত, কেউ পীত, কেউ আমারই মতো কৃষ্ণকায়—অর্থাৎ নানা বিপরীত বর্ণের সংমিশ্রণ, অথচ কোন জাতিই নিজ নিজ আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করছে না—সেখানে ধীরে ধীরে এক অভাবিত রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটছে এবং তার ফলে যথাকালে এক মহাবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আপাততঃ সে মহাদৈত্য ঘুমিয়ে থাকবে, তার জাগরণের দেরি আছে। বিভিন্ন জাতির রক্ত-মিশ্রণের এই পরিণাম।...

বৌদ্ধধর্মের ক্রম-অবনতির কালে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সমগ্র জগৎ একটি ঐক্যসূত্রে বিধৃত। এক জ্ঞানই সত্য—বহুজ্ঞান অজ্ঞান; সেটি ভ্রম, সেই একত্বের ধারণা থেকেই দ্বৈতবর্জিত অদ্বৈতবাদের উদ্ভব। ভারতীয় চিন্তায় সেই বিশিষ্টতা। যুগ যুগ ধরেই সেই অদ্বৈত মতবাদ ভারতবর্ষে বর্তমান। জড়বাদের উদ্ভব হ'লে কিংবা নাস্তিকতা দেখা দিলেই সেই অদ্বৈততত্ত্ব ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও তাই হ'ল। বৌদ্ধধর্মের মুক্তদ্বার-পথে নানা জাতিয় বর্বর তাদের বিচিত্র রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার নিয়ে ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করেছিল, আর তারই ফলে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ভারতীয়

সমাজে। সেই প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন একজন তরুণ সন্ন্যাসী—তিনি আচার্য শঙ্কর। কোন নূতন মতবাদের প্রচার না ক'রে বা কোন নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা না ক'রে তিনি বৈদিক ধর্মকেই পুনর্বার বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করেছিলেন। কাজেই আধুনিক হিন্দুধর্ম—প্রাচীন হিন্দুধর্মের উপাদানেই গঠিত, বেদান্তের প্রভাব ও প্রাধান্য এখানে প্রবল। তবে যে বস্তু একবার লুপ্ত হয়, তা আর পূর্ব জীবনীশক্তি নিয়ে ফিরে আসে না। কাজেই হিন্দুধর্মের পুরাতন উৎসবানুষ্ঠানাদি আর জীবন্ত হয়ে ফিরে এল না। আপনারা শুনলে বিস্মিত হবেন যে, প্রাচীন প্রথানুসারে—যে-হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না, সে খাঁটি হিন্দুই নয়। কোন কোন উৎসবে তাকে গোবধ করতেই হ'ত, গোমাংস ভক্ষণ করতেই হ'ত। আর আজ সেই প্রথা একেবারে বীভৎস ব'লে গণ্য হয়ে থাকে। অন্য সব বিষয়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মত-পার্থক্য থাকলেও এ-বিষয়ে আজ সবাই এক মতাবলম্বী। কেউ আর এখন গোমাংস ভক্ষণ করে না। প্রাচীন যুগের দেবদেবী, প্রাচীন যুগের পশুবলি - সবই লুপ্ত হয়েছে, চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়েছে। আর বর্তমান ভারতবর্ষ বেদের আধ্যাত্মিক অংশটুকু গ্রহণ করেছে।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই ভারতের প্রথম ধর্মসম্প্রদায়। এই ধর্মসম্প্রদায়ই এ-কথা প্রথম প্রচার করেছিল যে, বৌদ্ধধর্মের নির্ধারিত পথই একমাত্র পথ—সেই পথের আশ্রয় ভিন্ন মুক্তির আর কোন পথ নেই—সেই পথই সত্য পথ। কিন্তু হিন্দুরক্ত ধমনীতে প্রবাহিত থাকায় অন্যান্য দেশের গোঁড়া সাম্প্রদায়িকদের মতো তত নিষ্ঠুর এরা হ'তে পারেনি। কাজেই অন্যদেরও মুক্তি হবে, তবে বহু বিলম্বে এবং ধীরে ধীরে সেটি হওয়া সম্ভব—এ-কথাও তারা ব'লত। হিন্দুরক্তের প্রভাবের ফল ছিল সেটা। খুব বেশী নির্মম হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে হবে—এই ছিল নির্দেশ।

এদিকে হিন্দুদের মতে অন্য সম্প্রদায়ে যোগদান করা ঠিক নয়। যে যেখানে আছ, সেইখানেই থাক—সেই স্থানটি যেন পরিধি, সেখান থেকেই কেন্দ্রবিন্দুতে যাত্রা করা যেতে পারে। এইটি ঠিক। হিন্দুধর্মের সুবিধা এই যে, মত বা সূত্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব হিন্দুধর্ম আরোপ করে না, আরোপ করে জীবনের উপর। জগতের সর্বোত্তম দার্শনিক মতবাদের অনুগামী হয়েও কেউ যদি আচারে ব্যবহারে মূর্খ হয়—নির্বোধ হয়, তবে তার জ্ঞান ব্যর্থ। আর যদি জীবনে এবং ব্যবহারে কেউ সৎ হয়, তবে তার আশা আছে, তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে বৈদান্তিকগণ সকলের জন্যই অপেক্ষা করতে পারেন। বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে এই যে, এক অদ্বয় বস্তুই নিত্য সত্যরূপে বিরাজিত—তিনিই ব্রহ্ম। স্থান, কাল, কার্যপরম্পরা প্রভৃতি সব কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর স্থান। কোন সংজ্ঞা দ্বারা তাঁকে প্রকাশ করা যায় না। তিনি সৎ, তিনি চিৎ এবং তিনি আনন্দময়—এ-ছাড়া অন্য কোনভাবে আর তাঁকে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি একক সত্য। আমি, তুমি—সজীব, নির্জীব—যেখানে যা কিছু আছে, সব কিছুর মধ্যেই তিনি সত্যরূপে অনুস্যূত। সেই পরজ্ঞানের উপর আমাদের সমুদয় জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, সেই পরমানন্দেই আমাদের সকল আনন্দ বিধৃত। মানুষ যখন এ তত্ত্বটি উপলব্ধি করে, তখন সেই পরম সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য হয়। সে এবং অদ্বৈত সত্য অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।

অতএব সর্ব মলিনতা অপসারিত হ'লে, সর্ব স্থূলতা দূরীভূত হ'লে—সৎ ও পবিত্র স্বভাবের মধ্য দিয়ে মানুষ উপলব্ধি ক'রে—যীশুখ্রীষ্ট যেমন বলেছিলেন, 'আমি এবং আমার পিতা এক ও অভিন্ন।'

বৈদান্তিকগণ সকলের জন্য ধৈর্য ধারণ ক'রে অপেক্ষা করতে পারেন। যেখানে যে অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, 'আমি এবং পরমপিতা ঈশ্বর অভিন্ন'—এ উপলব্ধিই শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি। এটিকে উপলব্ধি করতে হয়। যদি মূর্তিপূজা এ উপলব্ধির সহায়ক হয়, তবে মূর্তিপূজাই বিধেয়। যদি কোন মহাপুরুষ এ-বিষয়ে সাহায্য করতে সক্ষম হন, তবে তাঁকেই পূজা কর। যদি মহম্মদকে পূজা করলে কাজ হয়, তবে তাই কর। কিন্তু যাই করবে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে কর। বেদান্ত-মতে নিষ্ঠাই সিদ্ধির ধ্রুব সহায়ক। কেউ বাদ যাবে না, কেউ প্রত্যাখ্যাত হবে না। তোমার চিত্ত—যেখানে সর্বসত্য নিহিত—ধীরে ধীরে পর্যায়ে পর্যায়ে বিকশিত হবে এবং চরমে এই পরমতত্ত্ব তুমি উপলব্ধি করবে, 'তুমি ও তোমার পরমপিতা এক ও অভিন্ন।'

মুক্তি কি? ব্রাহ্মী স্থিতিই মুক্তি। কিন্তু কোথায় সেই ব্রাহ্মী স্থিতি? সর্বত্র, সর্বস্থানে ও সর্বকালে যে ব্রাহ্মী স্থিতি, তাকেই 'মুক্তি' বলে।

এই যে বর্তমান মুহূর্তটি, বর্তমান ক্ষণটি—মহাকালের বুকে যে-কোন মুহূর্তেরই মতো সেটি পরম মূল্যবান্…এই হচ্ছে প্রাচীন বেদের মহতী বার্তা। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এই বার্তা পুনর্জীবিত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল সত্য, কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনে সে এক অক্ষয়চিহ্ন রেখে গিয়েছে—দাক্ষিণ্যে ও জীবজন্তুর প্রতি অহিংসায়। আর আজ ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বৈদান্তিক মতবাদ তার বিজয়াভিযান শুরু করেছে।

প্রার্থনা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যর্থ এ প্রাণে পরমেশ তুমি
সান্ত্বনা কর দান,
বেদনায় ভরা চেতনায় আজ
না দেখি পরিত্রাণ।
সঞ্চয় যাহা ভেবেছিনু কত,
বঞ্চনা তার আঘাতে সতত
ভ'রে আসে আঁখি কী ভীষণ ফাঁকি
কেঁদে মরে অভিমান।

কেঁদে মরে তবু নাহি ছাড়ে আশ,
বুঝিতে পারি না একি পরিহাস,
মরণের মুখে এ কী কৌতুকে
উদ্দাম অভিযান।
তাই এ মিনতি নিখিলের পতি
নিবারো তাহার দুর্বার গতি
তব পদ-ছায়ে সুশীতল বায়ে
হোক দুখ অবসান।

শিবানন্দ-স্মৃতি

[জনৈক প্রবীণ সন্ন্যাসীর ডায়েরী হইতে]

(পূর্বানুবৃত্তি)

তিন বৎসর পর মাদ্রাজ হইতে বেলুড় মঠে আসিয়াছি। আজ ১৯৩১ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুআরি শুক্রবার, বেলা প্রায় ১১॥টা। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ মধ্যাহ্নের আহার-সমাপনান্তে নিজ শয়নকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আমি পার্শ্ববর্তী ঘরে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইলাম, তিনি কয়েকখানা চিঠিতে নাম সহি করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার সেবক আমাকে ডাকিলেন। আমি ভক্তিভরে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই যে, তোমাকে প্রথম চিনতেই পারিনি! তোমার শরীর তো বেশ ভাল হয়েছে।'

আমি। —মহারাজ, আপনার শরীর কেমন যাচ্ছে ?

মঃ মঃ। —ঠাকুরের ইচ্ছায় এক-রকম চলে যাচ্ছে। তাঁর কাজের জন্য শরীরটা এখনও রয়েছে। কয়েকদিন পূর্বে হাঁপানি বড্ড বেড়ে গিয়েছিল। এখন অনেকটা কম। তুমি কি এই এলে ?

আমি। আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ। কিছুক্ষণ হ'ল, এখানে এসে পৌছেছি।

মঃ মঃ। তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়নি ? (সেবককে) 'এর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দে দেখি।' (নিজের শরীর দেখাইয়া) দেখ-না শরীরের এই অবস্থা! সকলেরই এই অবস্থা হবে। ধ্বংস শরীরের ধর্ম। কেউ রোধ করতে পারে না। ষড়্‌বিকারের ভিতর দিয়ে সকলকেই যেতে হবে। তোমাদেরও হবে। তাই সময় থাকতে সব ক'রে নিতে হয়। শরীরে যখন সামর্থ্য থাকে, তখনই সাধন-ভজন সব ক'রে নিতে হয়। দেখ, ওরা (যাঁরা মঠের কাজকর্ম এখন দেখছেন) কাজকর্মের কথা অনেক কিছু বলবে। কাজ কারও জন্য ঠেকে থাকে না। ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ঠিকমত হয়ে যাবে। কিছু আটকে থাকবে না। কিন্তু শরীরটি ভেঙে পড়লে আর কিছু (সাধন-ভজন) করা চলবে না। জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব!

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ভাবস্থ হইয়া পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। তিনি স্নেহভরে আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। এখন কোথায় নির্জন স্থানে থাকিয়া কিছুদিন একান্ত মনে সাধন-ভজন করিবার ইচ্ছা—সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এদিকে আহারান্তে তাঁহার বিশ্রামের ব্যাঘাত হইতেছে মনে করিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলাম।

মঃ মঃ। এখন যাও, খাওয়া-দাওয়া কর এবং বিশ্রাম কর; পরে কথাবার্তা হবে।

মহারাজকে প্রণাম করিয়া নীচে আসিলাম।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে দেওয়ার জন্য মাদ্রাজ মঠ হইতে কয়েকখানি চিঠি আমার সঙ্গে পাঠানো হইয়াছিল। বিকাল বেলা সেগুলি দেওয়ার জন্য মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, 'এস, দেখ দেখি—পাটনা থেকে ওরা কি চিঠি লিখেছে

ওরা নূতন জমি নিয়েছে, টাকাও কিছু যোগাড় হয়েছে। বেশ হয়েছে! ঠাকুরের ইচ্ছায় আর যে টাকার দরকার, তা এসে যাবে।'—এই বলিয়া তিনি চিঠিখানা আমাকে পড়িতে দিলেন। উহা পড়া শেষ হইয়া গেলে আমার সঙ্গের চিঠিগুলি তাঁহাকে দিলাম।

আমি। মহারাজ, (মাদ্রাজের) রামানুজ সস্ত্রীক শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজার পূর্বেই এখানে আসবেন। রামু কন্যাকুমারীর ছবির জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। [মহাপুরুষ মহারাজ এই ছবির জন্য কয়েকদিন পূর্বে মাদ্রাজে রামুকে লিখিয়াছিলেন। আমি মাদ্রাজে থাকাকালেই রামু ঐ চিঠি পাইয়াছিলেন এবং উক্ত ছবি সংগ্রহের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছিলেন।]

মঃ মঃ। ও ঠিক যোগাড় করবে। আমি ঐ ছবির বদলে তাকে এমন একটা জিনিস দেবো, যা সে কখনও দেখেনি।

অতঃপর তাঁহাকে মাদ্রাজ মঠের সকল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের প্রণাম জ্ঞাপন করিলাম। তিনিও একে একে সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমিও সকলের কাজকর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বলিলাম।

আমি। মহারাজ, 'বেদান্তকেশরী' পত্রিকার কাজেরও সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমি না ফিরে গেলেও কাজ চালাতে ওঁদের কোন বেগ পেতে হবে না।

মঃ মঃ। তুমিও যেমন কাজ কি কখনও কারও জন্য ঠেকে থাকে? ও ঠিক চলে যাবে ঠাকুরই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। তুমি ওজন্য আর ভেবো না। এখন কিছুদিন স্থির হ'য়ে ধ্যান-ভজন কর। কোথায় থাকবে ঠিক করেছ?

আমি। মহারাজ, ৺কাশীতে কিছুদিন থাকব।

মঃ মঃ। কিছুদিন কেন? বেশী দিনই থাকো না। কোন তো অসুবিধা নেই। চন্দ্র (স্বামী নির্ভরানন্দ) রয়েছে। আরও সকলে আছে। আহা! কাশী হেন স্থানে ধ্যান-ভজন করতে পারলে তো খুব ভালই হয়। তোমার কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন সময় কয়েকজন গৃহস্থ ভক্ত আসিয়া পড়ায় আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

আজ ১৭ই ফেব্রুআরি। পূঃ মহাপুরুষ মহারাজ বিকাল বেলা উপরের বারান্দায় বসিয়া 'কথামৃত' পাঠ করিতেছেন। আমি প্রণাম করিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ?'

আমি। আজ্ঞে ভাল আছি।

মঃ মঃ। তোমাদের সন্ন্যাস কবে হবে?

আমি। মহারাজ, আপনি তো বলেছিলেন ঠাকুরের জন্মতিথির দিন হবে।

মঃ মঃ। হ্যাঁ, তাইতো। সেইদিনই হবে। তোমার নাম কি হবে?

আমি। মহারাজ, আমার নাম কি হবে, তা আমি কি ক'রে ব'লব? আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই হবে।

মঃ মঃ। দেখ, 'কথামৃতে'র ভিতর সব আছে। বেদ-বেদান্ত যা কিছু বলো, সব এতে আছে। ঠাকুর এবার সব সহজ সরলভাবে ধর্মের অতি গূঢ় কথাগুলি সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। 'কথামৃত' বেশ ক'রে পড়বে।

আমি। আচ্ছা মহারাজ।

মঃ মঃ। দেখ, নির্ভরতা চাই। তাঁর ওপর নির্ভরতা না হ'লে কিছুই হয় না। তবে নিজেরও চেষ্টা করতে হয়। সাধন-ভজন করতে করতে ঐ ভাবটি ভিতরে ফুটে ওঠে। এই দেখ না, 'কথামৃতে' নির্ভরতার কেমন একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

এই বলিয়াই পূঃ মহাপুরুষ মহারাজ 'কথামৃত' হইতে সেই 'বিষ্ণুভক্ত ও ধোপা'র গল্পটি শুনাইলেন। উহার মর্মার্থ এই: একজন রজক কিছু কাপড় পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে শুকাইবার উদ্দেশ্যে একস্থানে বিছাইয়া দিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে জনৈক বিষ্ণুভক্ত ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিল ভাবের আতিশয্যে ও তন্ময়তা-বশতঃ সে বুঝিতেই পারে নাই যে, সে ঐ কাপড়গুলি মাড়াইয়া চলিয়াছে। লোকটির এইরূপ অন্যায় আচরণে রজক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার ভক্তের লাঞ্ছনা-দর্শনে তাহার রক্ষার্থে ব্যথিত হৃদয়ে সহসা বৈকুণ্ঠের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া মর্ত্যধামে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, ইতোমধ্যেই ভক্তবর আত্মরক্ষার জন্য স্বহস্তে দণ্ড গ্রহণপূর্বক রজকের প্রতি ধাবিত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া গেলেন। লক্ষ্মীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেনই বা এত তাড়াতাড়ি গেলে এবং নিমেষের মধ্যে কেনই বা ফিরে এলে।' ভগবান্ বিষ্ণু তখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া লক্ষ্মীদেবীকে বলিলেন, 'ভক্তবর স্বয়ংই যখন স্বহস্তে আত্মরক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছে, তখন তাকে রক্ষা করবার জন্য আমার প্রয়োজন নেই।' বাস্তবিকপক্ষে যাহারা ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, ভগবান্ তাহাদেরই রক্ষার ও যোগক্ষেমের ভার গ্রহণ করেন।

এইসব কথা হওয়ার পর আমি নীচে চলিয়া আসিলাম। সন্ন্যাসের দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাই আমরা সকলে কয়েকদিন বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। যতই নির্দিষ্ট দিন নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই এক অনির্বচনীয় আনন্দে হৃদয়-মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। উপনিষদ্-গ্রন্থে সন্ন্যাস-সম্বন্ধে ঋষিকণ্ঠে উদ্গীত হইয়াছে: 'ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বা ইতরথাঃ ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা।'—মন্দাধিকারীর পক্ষে শাস্ত্রে বিহিত রহিয়াছে যে, গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করিবে। তারপর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পরে সন্ন্যাসী হইবে। কিন্তু বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির পক্ষে অন্যপ্রকার বিধান রহিয়াছে; যখনই অন্তরে বৈরাগ্যাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, তখনই ব্রহ্মচর্যাশ্রম গৃহস্থাশ্রম বা বানপ্রস্থাশ্রম—যে-কোন আশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারিবে। বস্তুতঃ কৌমার-বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষু-সম্বন্ধে ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ চিরদিনই উদার মত পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। তাই ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হইবার পর ব্রহ্মজ্ঞ ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণ আমাদের সকলের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্যক্ অবগত হইয়া যাহাদিগকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করেন, তাহাদিগকে এই ব্রতে দীক্ষিত করিয়া উন্নত জীবন-পথের পথিক করিয়া দেন। যাহা হউক, আমার পরম সৌভাগ্য যে, বহুদিন-পোষিত এই সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণের শুভ সংকল্প ভগবদিচ্ছায় সত্বরই পূর্ণ হইতে চলিয়াছে

আজ ১৯৩১ খৃঃ, ১৯শে ফেব্রুআরি। পূর্ব-দিনেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের জন্য বিহিত শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। রাত্রির চতুর্থযামে পুরাতন ঠাকুর-মন্দিরে আমরা সকলে যথারীতি পবিত্র সন্ন্যাসমন্ত্র আচার্যের নির্দেশমত সমস্বরে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে উচ্চারণ করিয়া প্রজ্বলিত পবিত্র অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলাম। তদনন্তর পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতে

আমরা গৈরিক বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া গূঢ় 'প্রেষ-মন্ত্র' শ্রবণ করিলাম এবং তিনি আমাদিগকে সন্ন্যাসোচিত নূতন নামও প্রদান করিলেন। আমরা মহারাজকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক এই ক্ষুরধার দুর্গমপথে চলিবার জন্য তাঁহার আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলাম। তিনিও 'শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের সন্ন্যাস রক্ষা করুন' ও 'তোমাদের চৈতন্য হোক' বলিয়া ভাবগদ্‌গদ কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া আমাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন।

সন্ন্যাস হইয়া যাইবার কয়েকদিন পর শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট জয়রামবাটী ও কামারপুকুর হইয়া আমার ৺কাশীধামে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। যেদিন রওনা হইব, সেদিন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় তাঁহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করিয়া বলিলাম, 'মহারাজ, আশীর্বাদ করুন—যেন সাধনভজনের প্রতি আমার মনের দৃঢ়তা দিন দিন বৃদ্ধি পায়।'

মঃ মঃ। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার কোন ভয় নেই। তোমার মন দিন দিন আরও ভাল হবে।

আমি। মহারাজ, মধ্যে মধ্যে মনে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সংস্কার জেগে ওঠে। তাতে বড় কষ্ট হয়। আমি মাদ্রাজ মঠ থেকে আপনাকে পত্র লিখে এ-সব কথা জানিয়েছি।

মঃ মঃ। কেন, তুমি আমার সব পত্র পাওনি? আমি তো লিখেছি যে, তোমার ও-সব ভাব আস্তে আস্তে চলে যাবে। সাধন-ভজনের সময় ঐ-সব ভাব মধ্যে মধ্যে মাথা উঁচু ক'রে ওঠে। তবে তার জন্য বেশী ভাবতে নেই। কিছুদিন পর সব কেটে যায়। ঠাকুরের কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি।

আমি। আজকাল ঐ সব বিরুদ্ধ সংস্কারের উদ্দীপনা পূর্বের মতো হয় না। আপনার আশীর্বাদে অনেকটা কেটে গেছে। তবে এখনও রয়েছে। ভয় হয়—কখন আবার ওরা মাথা উঁচু ক'রে উঠবে।

মঃ মঃ। তোমার কোন ভাবনা নেই।

আমি। মহারাজ, আমি তো এখান থেকে চলে যাচ্ছি। ৺কাশীধামে থেকে সাধনভজন করতে ইচ্ছা করেছি। আশীর্বাদ করুন আমার মন যেন বাজে চিন্তায় আর উচাটন না হয়।

মঃ মঃ। তোমার মন দিন দিন ভালোর দিকেই যাবে। জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ! (তিনি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন; তারপর বলিতে লাগিলেন), কোন ভয় নেই। ঠাকুর তোমার সঙ্গে রয়েছেন। তাঁর উপর বিশ্বাস রেখো।

আমি। যদি কিছু দিন পর হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে যাবার ইচ্ছা হয়, তবে যাব কি?

মঃ মঃ। হাঁ, হাঁ। সে তো তপস্যারই স্থান। সাধুদের ঐরূপ স্থানে থেকে তপস্যা করা ভাল।

এই সকল কথার পর আমি তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হইয়া পুনরায় আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলাম। তিনিও শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সেই করুণামাখা শান্ত-স্নিগ্ধ দৃষ্টি এখনও মনে পড়ে। সেদিন সন্ধ্যার সেই মৌন-গাম্ভীর্যের মধ্যে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ভাবতন্ময়তার ভিতর দিয়া যে স্নেহধারা উৎসারিত হইয়াছিল, তাহার অমৃত স্পর্শে হৃদয়-মন চিরদিনের জন্য এক দিব্যভাবে অভিসিঞ্চিত ও রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে। যখন নৈরাশ্য আসিয়া চিত্তকে মথিত করিয়া ফেলে, তখনই তাঁহার সেই স্নিগ্ধ-মধুর মুখমণ্ডল হৃদয়পটে ফুটিয়া

ওঠে—হৃদয়ের সব গ্লানি দূরে চলিয়া যায়!

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণকালেও বুঝিতে পারি নাই যে, তাঁহার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। তবে এ-জীবনে যে নিবিড় স্নেহের স্পর্শ এই স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহা কোটি জন্মের সাধনার ফলেই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। তাঁহার গভীর ভালবাসা ও স্নেহে সর্বক্ষণই মনে হইত—শ্রীশ্রীরাজা-মহারাজের অপার করুণা যেন পূর্ণভাবে পূঃ মহাপুরুষ মহারাজের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বৎসরাধিক কাল ৺কাশী অদ্বৈতাশ্রমে অবস্থান করিয়া উত্তরাখণ্ডের প্রসিদ্ধ প্রাচীন তীর্থ ৺উত্তরকাশীতে তপস্যার্থে গমন করি। একমাত্র মহাপুরুষ মহারাজের আশীর্বাদেই ঋষিমুনি-সেবিত সেই পরম পবিত্র সাধনানুকূল তীর্থভূমিতে প্রায় চার বৎসর ভিক্ষাশনে নিষ্ঠার সহিত ধ্যান-ভজনাদি করিবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। উত্তরকাশীতে থাকাকালে সংবাদ পাইতে লাগিলাম—পরমপূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শরীর উত্তরোত্তর ভাঙিয়া পড়িতেছে। বুঝিলাম—যুগাবতার তাঁহার যে ঈপ্সিত কাজের জন্য তাঁহাকে এই পৃথিবীতে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় শেষ হইতে চলিয়াছে! যোগিবর ধীরে ধীরে মর্ত্যলীলা অবসানের উদ্যোগ করিতেছেন। শরীর তখন শয্যাশায়ী, অর্ধাঙ্গ অবশ—তথাপি এই শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর মনকে দেহাতীত কোন এক চেতনার রাজ্যে স্থাপন করিয়া জগজ্জনের কাছে তাঁহার অহৈতুকী কৃপা বিতরণ করিয়া চলিয়াছেন। এইকালেই তদানীন্তন বিদগ্ধ সমাজের অগ্রণী পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় বেলুড় মঠে আসিয়া রোগশয্যায় শায়িত—নির্বিকার শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিয়া একদিন অশ্রুসিক্ত নয়নে সকলকে বলিয়াছিলেন, 'শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত পুরুষের অবস্থা পড়েছি মাত্র, আজ তো প্রত্যক্ষ করলাম। উনি তো সমাধিস্থ হয়ে আছেন! কখনও সামান্য বাহ্যদশা প্রাপ্ত হন মাত্র। এ যোগিবরকে দর্শন ক'রে আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল। অনেক শাস্ত্র পড়েছি, সমাধি সম্বন্ধেও অনেক পড়েছি—আলোচনাদিও করেছি; কিন্তু জীবনে সমাধিমান্ পুরুষ দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়নি—আজ তা হ'ল, আজ আমার জীবন সার্থক।'

পরমযোগী শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ১৯৩৪ খৃঃ ২০শে ফেব্রুআরি মঙ্গলবার দিবস মহাসমাধিযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে চিরতরে মিলিত হইয়াছেন—উত্তরকাশীতে বসিয়াই এই নিদারুণ সংবাদ পাইলাম। এতদিন যিনি সম্মুখে ছিলেন, আজ তিনি পাঞ্চভৌতিক যবনিকার অন্তরালে অকস্মাৎ আত্মগোপন করিলেন। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-পতাকাবাহী পরম যোগিবর এই জরা-মরণ-পীড়িত পৃথিবীর বুকে রাখিয়া গেলেন তাঁহার অক্ষয় পদচিহ্ন, যাহা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবনায় ভাবিত অগণিত ভক্তজনের মানসলোকে নিরবধিকাল 'চরৈবেতি' মন্ত্রের প্রেরণা সঞ্চার করিবে।

একদিন যিনি তাঁহার পুণ্যস্পর্শে আমার জীবনের স্রোত নূতন খাতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে যিনি আমার জীবন-তরীর কর্ণধার হইয়া আমাকে তরঙ্গাকুল এই দুস্তর জীবন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যিনি অপার করুণাবশে আমাকে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রদান করিয়া চরমলক্ষ্যে পৌছিবার প্রকৃত পন্থার সন্ধান দিয়াছিলেন, যাঁহার শক্তিশালী উৎসাহবাক্যে উদ্দীপিত হইয়া সুদূর জনবিরল সেই হিমালয়-

ক্রোড়ে নিরালম্বভাবে তপস্যা করিতে সাহসী হইয়াছিলাম, আজ তাঁহার আকস্মিক তিরোধান-বার্তা যে কত মর্মন্তুদ ও হৃদয়বিদারক, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। উত্তরকাশীর সেই নির্জন কুটিরে বসিয়া যখনই তাঁহার অগাধ-স্নেহের কথা স্মরণ করিতাম, তখনই বিরহবিধুর এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কাঁদিয়া উঠিত এবং আমার অন্তরের নিগূঢ় ব্যথা অশ্রুতে আত্মপ্রকাশ করিয়া আমাকে বিচলিত করিয়া তুলিত।

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পরেও এই জীবন-সন্ধ্যায় আমার ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের গুরুর পুণ্য স্মৃতিকথা স্মরণ করিয়া হৃদয় মন যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরহে কাতর হইয়া একদিন করুণকণ্ঠে গাহিয়াছিলেন :

'হরি গেও মধুপুর, হাম কুলবালা।
বিপথ পড়ল যৈছে মালতীমালা ॥
নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস।
সুখ গেও পিয় সঙ্গ, দুখ মঝু পাশ ॥'

আজ বিরহবিধুর অন্তরে অশ্রুজলে প্রেমার্ঘ্য সাজাইয়া আকুল আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আমার অধ্যাত্মজীবনের পথপ্রদর্শক অহেতুক-কৃপাসিন্ধু পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে আমিও গভীর শ্রদ্ধার সহিত গাহিব :

'দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী ?
সুখে দুঃখে সমবন্ধু এমন কে,
শোকতাপভয়হারী ?
সঙ্কট-পূরিত ঘোর ভবার্ণব,
তারে কোন্ কাণ্ডারী ;
কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল-বিপ্লবকারী ?
পাপ-দহন-পরিতাপ নিবারি,
কে দেয় শান্তির বারি ;
ত্যজিলে সকলে অন্তিমকালে,
কে লয় ক্রোড় প্রসারি ?'

মাতৃ-বোধন

সেখ সদর উদ্দীন

জাগো মা অভয়া, জগজ্জননী, দনুজ-দলনী মাগো,
জাগো 'মহালয়া', জগদ্ধাত্রী, সনাতনী মাগো, জাগো!
টুটাও নিদ্রা, ঘুচাও রজনী নূতন আলোক-পাতে,
বিবেক-জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাও অজ্ঞানতার রাতে।
জীবনের বীজে অঙ্কুর হোক, মুকুলে ফোটাও ফুল—
অন্যায় পথে চলেছে যাহারা, ভাঙো তাহাদের ভুল!
করুণাময়ী মা অন্নপূর্ণা, এসো আমাদের ঘরে—
অয়ি অন্নদে, অন্ন দাও মা, সন্তান কেঁদে মেরে।

সন্তান যদি হাসে নাচে মাগো, সেই তো তোমার সুখ,
সন্তানেরই বেদন-ব্যথায় মা'র যে মলিন মুখ।
জাগো গো জননী, পরমেশ্বরী মানবীর রূপ নিয়ে
জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াও জননী স্নেহের পরশ দিয়ে ;
জাগো মা সারদা, অভয়া বরদা, কোলেতে তুলিয়া নাও,
আর্ত-পীড়িত মুমূর্ষুজনে বাঁচিতে শকতি দাও!
জাগো মা শুভদা, সব শুভ হোক তব শুভ জাগরণে,
শান্তির বারি সিঞ্চিত কর বিশ্ববাসীর মনে!

ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মজীবন

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কেম্পিসের 'Of the Imitation of Christ' স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় গ্রন্থগুলির মধ্যে ছিল অন্যতম। এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের অধ্যায়ে অধ্যায়ে লেখকের জ্বলন্ত সত্যানুরাগের স্বাক্ষর আছে। লেখক কেবল পরমভক্তই ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রথম স্তরের মনস্তত্ত্ববিদ্‌। 'Of the reading of Holy Scriptures' অধ্যায়টিতে লিখেছেন :

Let not the authority of the writer influence thee, whether he be of great or small learning ; but let the love of pure truth draw thee to read.

—লেখকের বিদ্যার গভীরতা বা স্বল্পতা যেন তোমাকে প্রভাবিত না করে ; নিছক সত্যের প্রতি অনুরাগে তুমি পড়বে।

Search not who spoke this or that, but mark what is spoken.

—কে এই কথা বলেছেন বা কে ঐ কথা বলেছেন, তা অনুসন্ধান করতে যেও না। কি বলা হয়েছে, তাই তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ পড়বার সময় আমাদের সমস্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে থাকা চাই—ইংরেজীতে যাকে বলে 'Objectivity'. মহম্মদ ছিলেন খাদিজার একজন নিরক্ষর উষ্ট্রচালক, শ্রীরামকৃষ্ণের পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না বললেই চলে, যীশু ছিলেন একজন গ্রাম্য ছুতারের সন্তান, যিনি লেখাপড়া অল্পই জানতেন বা জানতেন না, আবার ভগবদ্গীতার কৃষ্ণ ছিলেন একজন মহাপণ্ডিত—কোরান, কথামৃত, বাইবেল বা গীতা পড়বার সময়ে এই তথ্যগুলিকে আমরা বড় ক'রে দেখব না। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিমাপূজা করতেন, কি করতেন না—সে-কথাকেও প্রাধান্য দিয়ে আমরা তাঁর বাণীর মূল্য বিচার ক'রব না। পৃথিবীর এইসব ধর্মগুরুর বাণীকেই আমরা গুরুত্ব দেবো। সেই বাণীর সত্যকে আমরা দেখব -মহাকালের কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে। প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে যা ঘোষিত হয়েছে, তা কি আজও সজীব? আমাদের নিত্যনূতন অভিজ্ঞতার আলোয় তা কি আজও সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়? অথবা মনে হয়—প্রথম উচ্চারিত হওয়ার কালে তার মধ্যে সত্যের যে দীপ্তি ছিল, তা ম্লান হয়ে গেছে?—তা হারিয়ে ফেলেছে তার আদিম সজীবতা এবং গতিবেগ? 'Essays on the Gita'-য় শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন :

Its influence is not merely philosophic or academic but immediate and living, an influence both for thought and action, and its ideas are actually at work as a powerful shaping factor in the revival and renewal of a nation and culture,

—গীতার প্রভাব কেবলমাত্র দার্শনিক অথবা শুষ্ক একটা তত্ত্বের দিক দিয়ে নয়। এর জীবন্ত প্রভাবের ছাপ বর্তমানের উপরেও, যেমন চিন্তার উপরে তেমনি কর্মেরও উপরে। গীতার ভাবধারা একটা জাতির এবং একটা সংস্কৃতির ঝিমিয়ে-পড়া জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করবার কাজে সক্রিয়ভাবে আজও সাহায্য ক'রে চলেছে ; তাদের অভ্যুদয়ের পথে গীতার প্রভাব নিঃসন্দেহে একটা শক্তির উৎস।

গীতার মধ্যে এই প্রাণশক্তির প্রাবল্য ও প্রাচুর্য আছে বলেই ঐ গ্রন্থ যুগে যুগে সমাদৃত

হয়ে আসছে দেশে এবং বিদেশে; অগণিত জীবনের ব্যক্তিগত দুঃখের অন্ধকারে বহন ক'রে আনছে আশার আলো, অত্যাচারের দুর্বিনীত শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে দিয়েছে বিদ্রোহ করবার প্রেরণা, ক্লৈব্যে অবসাদগ্রস্ত জাতির চিত্তকে শুনিয়েছে 'মাভৈঃ' বাণী। তাইতো শঙ্করাচার্য থেকে এ যুগের বঙ্কিম-তিলক-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-গান্ধী-অরবিন্দ পর্যন্ত গীতার মধ্যে কেউ দেখেছেন—জাতির আত্মার বাঙ্ময় প্রদীপ্ত প্রকাশ, কেউ পেয়েছেন—দিব্যজীবনের শিখরে পৌঁছে দেবার আলো, কেউ শুনেছেন—জীবন্মৃত জাতিকে প্রাণচঞ্চল ক'রে তুলবার অগ্নিমন্ত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অর্ধনগ্ন দেহ এবং পুঁথিগত বিদ্যার স্বল্পতা নিয়ে রোমাঁ৷ রলাঁর মতো অমন একজন গগনস্পর্শী প্রতিভার অধিকারীকে এমন একটা দোলা দিয়েছেন যে, তাঁকে লিখতে হয়েছে, 'রিক্ত তপ্ত ক্লান্ত ইওরোপের শুষ্ক অধরকে সিক্ত করবার অমৃত রয়েছে বাংলার ঐ গ্রাম্য-মানুষটির বাণীতে; রামকৃষ্ণ খ্রীষ্টেরই সোদর।' ফরাসীদেশের এক ক্যাথলিক খ্রীষ্টান পরিবারের বিশেষ একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের আবহাওয়ায় রলাঁর শৈশব এবং কৈশোর কেটেছিল। কত রকমের সংস্কার নিঃশব্দে কাজ করছিল তাঁর রক্তের মধ্যে। রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর আচারগত, ভাষাগত, রুচিগত, বিশ্বাসগত কত রকমেরই না পার্থক্য ছিল! তবু সমস্ত পার্থক্যের দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু পার হয়ে তিনি উপনীত হ'তে পারলেন ঐক্যের পরম সত্যের উত্তুঙ্গ শিখরে। সেই শিখরে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে পেলেন, ইতিহাসের বুকে কালে কালে চলেছে চিরন্তন একের অভিযান। মানবাত্মার পরম উপলব্ধিগুলি দেশের বা কালের কোন সীমারেখাকে স্বীকৃতি দেয় না। যে অনন্তের সুর বেজে উঠেছে যীশুর কণ্ঠে 'নিউ টেস্টামেণ্টে'র মধ্যে সেই সুরই 'কথামৃতে', সেই সুরই মার্কিন কবি হুইটম্যানের 'Leaves of Grass'-এ। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক ষ্টিভেন্‌সন (Robert Louis Stevenson) 'Leaves of Grass' পড়তে পড়তে বিস্ময়ে চমকিত হয়েছেন খ্রীষ্টের বাণীর সঙ্গে হুইট্‌ম্যানের বাণীর অদ্ভুত মিল দেখে। কবির লেখার আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন: Sentences that have the intrinsic force of the teachings of Jesus.—খ্রীষ্টের উপদেশগুলির মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে, কবির কাব্যের অনেক লাইনের মধ্যে সেই শক্তিরই প্রকাশ। অন্যত্র বলেছেন: There is much that is startingly Christian in 'Leaves of Grass'. এই যে উপলব্ধির সঙ্গে উপলব্ধির, বাণীর সঙ্গে বাণীর আশ্চর্য মিল এই মিলের মধ্যে একটি চরম সত্যের অভিব্যক্তি রয়েছে। এই চরম সত্যটি রলাঁর ভাষায় হ'ল: It is always the same Book. It is always the same Man—the Son of Man, the Eternal, our Son, our God reborn. With each return He reveals Himself a little more fully, and more enriched by the universe.—সর্বকালে সেই একই গ্রন্থ! সেই গ্রন্থে একই মানবের একই আত্মার গভীরতম উপলব্ধিগুলির বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রকাশ। সেই মানব কালজয়ী, অনন্ত। আমাদেরই ভগবান্ নব-নবরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ফিরে ফিরে আসেন সেই সকলকালের মানব আর প্রতিবারই তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন পূর্ণতর মহিমায় আরও একটু বিভূতি-সম্পন্ন হ'য়ে। 'Allowing the differences

of country and of time Ramakrishna is the younger brother of our Christ.' —দেশের ও কালের ব্যবধানের জন্যে যেটুকু পার্থক্য অনিবার্য, তা মেনে নিয়ে বলা যেতে পারে, রামকৃষ্ণ খ্রীষ্টেরই অনুজ। রলাঁ রামকৃষ্ণকে খ্রীষ্টের অনুজ ব'লে ঠাকুরের মর্যাদাকে কমান-নি, বরং বাড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ঠাকুরে খ্রীষ্টেরই পূর্ণতর অবতার, আরও ঐশ্বর্যময় প্রকাশ। রামকৃষ্ণের অদ্ভুত জীবন ও বাণীর মহিমা রলাঁর চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত ক'রে দিল দিব্য জীবনের এক মহাকাব্য। সেই মহাকাব্যের ছত্রে ছত্রে রলা খুঁজে পেলেন এমন সব চিন্তাধারা, যাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় যেন জন্ম-জন্মান্তের! রামকৃষ্ণের জীবনকাব্য তিনি তুলে ধরলেন ইওরোপের চোখে। সেই একই গ্রন্থ—শুধু ভিন্ন ভঙ্গীতে লেখা। সেই চিরপুরাতনের আবির্ভাব শুধু নূতনতর ভঙ্গীতে। চোখ তো সাধারণতঃ মলাটে নিবদ্ধ—ভিতরের শাঁস অবধি পৌছায় না!

এক একজন মানুষ কেমন ক'রে দেশের ও কালের পার্থক্যগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েও জগতের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্যের সন্ধান পান? কেমন ক'রে তাঁরা আবিষ্কার করেন—সব ধর্মই মূলতঃ এক এবং ইতিহাসের বুকে নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে সেই শাশ্বত একেরই অভিযান চলেছে শিখর থেকে শিখরে? এই রহস্যের উপরে আলোকপাত করেছেন এমার্সন তাঁর কতকগুলি অমূল্য মন্তব্যে। এমার্সন বলছেন, মানুষ দুই জাতের। এক জাতের মানুষ আছে, যারা চায় 'repose' অর্থাৎ বিশ্রাম, আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ, খ্যাতি। এরা হাতের কাছে সহজে প্রথম যা কুড়িয়ে পায়, তাই নিয়ে আমৃত্যু সন্তুষ্ট থাকে। এরা সত্যের মুক্ত হাওয়ায় ডানা মেলে আলোয় উড়তে চায় না; বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে যে-বিশ্বাস, যে-ধারণা, যে-জীবন-দর্শন সহজেই পায়, তারই আতপ্ত কোটরের আবেষ্টনীর মধ্যে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। এমার্সন বলছেন, 'What is the hardest task in the world?' অর্থাৎ পৃথিবীতে কঠিনতম কাজ কি? নিজেই নিজের এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, 'To think.'—চিন্তা করতে পারা। আমরা বেশীর ভাগ মানুষই জীবনে আরাম চাই। পূর্বপুরুষেরা যে-পথে চলেছেন, সেই পথই আমাদের পথ। নতুনের পথে পা বাড়াতে আমাদের দ্বিধার অন্ত নেই। কিন্তু এক এক জন কোথা থেকে ছুটে আসেন, যাঁরা চান সত্যকে। এঁদের মধ্যে কোন গোঁড়ামি নেই। প্রচলিত সংস্কারের রজ্জু ছিঁড়ে এঁরা সত্যের জন্যে মরিয়া হবার সাহস রাখেন। রোমাঁ রলাঁ এই শেষোক্ত পর্যায়ের মানুষ। তাই সমুদ্রপারের একটি ক্যাথলিক পরিবারের বিশেষ সংস্কারগুলির মধ্যে মানুষ হয়েও, এত লেখা-পড়া করেও বঙ্গদেশের একটি অখ্যাত গ্রামের এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণের দিব্য জীবনের ও বাণীর মধ্যে আবিষ্কার করতে পারলেন খ্রীষ্টেরই নবতর, পূর্ণতর আবির্ভাবের মহিমাকে। রামকৃষ্ণের মহাজীবনের গ্রন্থের মলাটে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রাখবার মানুষ ছিলেন না তিনি। সেই অনুপম গ্রন্থের মর্মের মধ্যে তিনি প্রবেশ ক'রে অমৃতরসের আস্বাদন পেলেন। এবং পাশ্চাত্য যাতে সেই রসের আস্বাদ পেয়ে তাঁরই মতো কৃতার্থ হয়, সেজন্যে রামকৃষ্ণের জীবনী লিখলেন।

হ্যাঁ, শ্রদ্ধা নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে অজানার অতলে ডুব দেবার দুঃসাহস দরকার। ইতিহাসের এই দুঃসাহসী কলম্বাসেরাই অকূলে পাড়ি দেবার সাহস রাখে বলেই অজানাকে

জানে, অচেনাকে চেনে, অ-ধরাকে ধরে। রবিঠাকুরের ভাষায় তারা 'বায় না তরী কেবল তীরে তীরে।' কেন-না দিগন্তের হাতছানি যে তাদের মজিয়েছে ; সত্য যে তাদের ভৈরবভেরী বাজিয়ে অকূলে ডেকেছে ; আকাশের আহ্বান শুনে তাদের ডানা যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে !

আমাদের দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর—ঈশ্বর আছেন জেনে তো বসে থাকেননি। কুটুম্ব-বাড়ি তত্ত্ব করতে হবে, 'পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, একখান কাপড় পাঠাইবে', চিঠিতে আরও কত কি! পত্রে জিনিসের ফর্দ পেয়ে সাধক সেটি ফেলে দিলেন। বেরিয়ে পড়লেন সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় অর্থাৎ বস্তুর অন্বেষণে। তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় তিনি ভেসে বেড়ান না ; ডুবে যান জলধির গভীরে যেমন ক'রে মুক্তার সন্ধানে ডুবুরীরা ডুব দেয় সমুদ্রে। এইরূপ দুর্গম স্থান থেকে মুক্তা নিয়ে ঠাকুর যখন ফিরে এলেন, মুখে তাঁর দিব্যজ্যোতিঃ, সমস্ত শরীর থেকে যেন একটা সোনালি আভা ফুটে বেরুচ্ছে! কত রকম করেই তিনি ভক্তির পথে ঈশ্বরের মধ্যে আমাদের যে-একটি অনির্বচনীয় আনন্দ রয়েছে, সেই আনন্দ আস্বাদন করলেন! এমন-কি তান্ত্রিক সাধনার অতি দুরূহ এবং অতি বিপজ্জনক পথে হাঁটতেও সঙ্কুচিত হলেন না তিনি! কিন্তু যিনি পরম পরিপূর্ণ সত্যকে সমগ্রভাবে জানবার জন্য মরিয়া হয়েছিলেন, তিনি সবিকল্প সমাধির চূড়ায় এসে থেমে যাবেন কেমন ক'রে? নির্বিকল্প সমাধির গৌরীশৃঙ্গের খুব কাছাকাছি তিনি এসে পড়েছেন! আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে প'ড়ে ঠাকুর দুর্গম পার্বত্যপথের প্রায় তিনপোয়া চলে এসেছেন। এইবার শিখরে উঠবার জন্যে তাঁকে চরম শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এতদিন মা-ই সব জোটপাট ক'রে দিয়েছেন। সেই ইচ্ছাময়ীরই ইচ্ছায় সাধনায় বিচিত্র পথে ঈশ্বরকে আস্বাদন করবার জন্যে ব্রাহ্মণী যথাসময়ে হাজির হয়েছেন। এবার নির্বিকল্প সমাধির চূড়ায় উঠতে পারলেই তো চরম সিদ্ধি! কিন্তু পথপ্রদর্শক কোথায়? মড়ার মাথার খুলি জুটেছে, স্বাতীনক্ষত্রে বৃষ্টির জলও ঐ খুলিতে পড়েছে, সাপও এসেছে, ব্যাঙও এসে হাজির। এবার খুলির ভিতর সাপের বিষ পড়লেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। যোগাযোগ মা ক'রে দিলেন। ব্রাহ্মণীকে যিনি এনে দিয়েছিলেন, তিনিই তোতাপুরীকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে এলেন। ন্যাংটা সাধু পথ-প্রদর্শক হয়ে ঠাকুরকে নিয়ে যখন নির্বিকল্প সমাধির শিখরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত, তখন অকস্মাৎ বাধা এল ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে। কিন্তু 'আরও এগিয়ে পড়ো'—এই ছিল যাঁর মূল-মন্ত্র, যিনি সেই কাঠুরিয়ার মতো চন্দনের বন, নদীতীরের রূপোর খনি, সোনার খনি—সমস্ত কিছুকে পিছনে ফেলে নব নব ঐশ্বর্যের সন্ধানে সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন, তিনি ব্রাহ্মণীর নিষেধে কর্ণপাত করবেন কেন? তারপর শুরু হ'ল সেই চমকপ্রদ আধ্যাত্মিক অভিযান! মানসপটে পুনঃ পুনঃ মাতৃমূর্তির আবির্ভাব, বিচারের খড়্গ দিয়ে মূর্তিকে দ্বিখণ্ডিত করার সেই অশ্রুতপূর্ব কাহিনী, সঙ্গে সঙ্গে সাধনপথের চরম বাধার অপসারণ এবং নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে সত্তার নিঃশেষে বিলুপ্তি, ব্রহ্মের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার অনির্বচনীয় অনুভূতি! তেনজিং-হিলারির এভারেস্ট অভিযানের কাহিনীর চেয়েও কৌতূহলোদ্দীপক, ক্যাপ্টেন স্কটের মেরু-অভিযানের চেয়েও দুঃসাহসিক, কলম্বাসের নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের চেয়েও রোমাণ্টিক!

এত কথার অবতারণা শুধু একটি তত্ত্বকে পরিস্ফুট করবার জন্যে। সেই তত্ত্বটি হ'ল,

আমরা যখন ধর্মশাস্ত্রগুলি প'ড়ব, তখন নিছক সত্যের প্রতি অনুরাগের বশবর্তী হয়ে যেন সেই কাজটি করি। ধর্মগুরুদের জীবন ও বাণীর যথার্থ তাৎপর্য ঠিক ঠিক বুঝতে হ'লে সত্যের জন্যে মরিয়া হওয়া দরকার। সঞ্চিত সংস্কারগুলির সমস্ত বেড়াকে অতিক্রম করেই আমরা সত্যের সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতে পারি। এমার্সন যাকে 'repose' বলেছেন, সেই আরামকে রল্যাঁ যদি বেছে নিতেন, তবে ক্যাথলিকদের ধর্মবিশ্বাসকেই ঈশ্বর পাওয়ার একমাত্র পথ ব'লে বসে থাকতেন। নিরক্ষর হিন্দু রামকৃষ্ণ মন্দিরে ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে মূর্তিপূজা করেন—এই তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ামাত্র তাঁর নাসিকা কুঞ্চিত হ'ত। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, তাঁর অমূল্য উপদেশ, অমৃতবাণী—কোন কিছুরই মর্মে প্রবেশ করবার দুর্বার আগ্রহ তিনি অনুভব করতেন না। কিন্তু যাঁরা সত্যের পায়ে জীবন সমর্পণ করেছেন, তাঁরা তো কোন একটা নির্দিষ্ট মতবাদের পালঙ্কের কোমল শয্যায় আরামের মধ্যে জীবন যাপন করতে পারেন না! তাঁরা চিরকালের পথিক; মুক্তপথের তাঁরা যাত্রী। সেই পথ কত অরণ্য পেরিয়ে পর্বত পেরিয়ে চলে গেছে দূর থেকে দূরান্তরে! আমাদের ঠাকুর তো শুধু সাকারবাদের মধ্যে তৃপ্ত থাকতে পারেননি! জ্ঞান-খড়্গে কালীমূর্তি দু-টুকরো ক'রে অরূপের মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন! খ্রীষ্টান-মতে সাধনা করেছিলেন; মুসলমান, বৈষ্ণব—সব মতের সাধনাই করেছিলেন। যখন মুসলমান-মতে সাধনা করেছিলেন, তখন মুসলমানের খানা খেতেন, মুসলমানের পরিচ্ছদ পরতেন। যখন খ্রীষ্টান-মতে সাধনা করেছেন, আচারে ব্যবহারে তখন খ্রীষ্টান। তিনি ছিলেন 'এগিয়ে পড়' মন্ত্রের সাধক। ইংরেজীতে যাকে বলে 'resting on one's oars'—সেটি ঠাকুরের জীবনে ঘটবার উপায় ছিল না! ঠাকুরের কাছে যারা আসত, তাদের তিনি বলতেন, 'এগিয়ে গেলে আরও ভালো জিনিস পাবে। একটু জপ ক'রে উদ্দীপন হয়েছে ব'লে মনে ক'রো না, যা হবার তা হয়ে গেছে।' হুইট্‌ম্যানের 'Leaves of Grass'-এ আছে: No friend of mine takes his ease in my chair, I have no church, no chair, no philosophy.

—কোন বন্ধু আমার আরাম-কেদারায় শুয়ে বিশ্রাম করে না, আমার কোন বিশেষ ধর্মমত নেই, কোন চেয়ার নেই, কোন বিশেষ জীবন-দর্শন নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর সঙ্গে কবির বীণা যেন একসুরে বাঁধা! শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ একটা মতবাদ ছিল না। ডাক্তারকে বললেন, 'তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তাতে দোষ কি?' সাকারবাদীর পথ, নিরাকারবাদীর পথ—সব পথই তিনি মানতেন। 'Never a word of condemnation for any' গোঁড়ামি ব'লে তাঁর কিছু ছিল না। তাঁর যুগবাণী 'যত মত তত পথ' অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছে সব রকমের ভাবকে, সব রকমের বিশ্বাসকে। ছিদ্রান্বেষী তিনি একেবারেই ছিলেন না।

আমরা যে অন্য ধর্ম সম্পর্কে বিচারে প্রায়ই ভুল ক'রে থাকি, তা কি আত্মপ্রীতির আতিশয্যে নয়? Thomas a Kempis ঠিকই লিখেছেন: We often judge of things according as we fancy them; for self-love deprives us easily of true judgment.—আমরা কল্পনার চশমা দিয়ে সব-কিছুকে যেমনটি ভাবি, মনে করি—সেইটিই বুঝি তাদের সত্যরূপ! কারণ আত্মপ্রীতি সহজেই আমাদের সিদ্ধান্তকে ভুলের মধ্যে নিয়ে যায়। 'Many secretly seek themselves in what they do and know it not.' আগেই বলেছি, কেম্পিস্ শুধু

একজন ভক্ত ছিলেন না ; মানুষের মনের অলি-গলির সন্ধানও তিনি ভালোই রাখতেন। অন্যের চলনকে আমরা অনেক সময়ে বাঁকা দেখি—অথচ সে সোজা হয়েই চলছে! বাঁকা যে দেখি—সে তো কল্পনায় সত্যকে বিকৃত ক'রে দেখি ব'লে। কল্পনার এই বিকারের মূলে কিন্তু আদিম পাপ—আত্মপ্রীতি। যার চলন বাঁকা ব'লে মনে হচ্ছে, তার নিখুঁত চলন আমরা কামনা করিনে। আমাদের রুচির সঙ্গে হয়তো তার রুচি মেলে না ; আমাদের সংস্কারে হয়তো সে আঘাত দিয়েছে ; ফলে সে আমাদের বিরাগ-ভাজন হয়েছে। যে আমাদের বিরাগভাজন তাকে পাগল, খোঁড়া, কৃপণ, মূর্খ ইত্যাদি ভাবতে আমাদের সুখ! আমরা যা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করি, তাই আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন মমতা, প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ-বুদ্ধি নিজের ভুল দেখতেই দেয় না, পক্ষান্তরে যার সঙ্গে অমিল, তাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করতে উৎসাহিত করে। তাই পৃথিবীর ধর্মশাস্ত্রগুলি পড়বার সময় কল্পনাকে দূরে সরিয়ে রাখা চাই। আত্মপ্রীতি যেন তিলমাত্র প্রশ্রয় না পায়—'but the love of pure truth draw thee to read.' এই সত্যানুরাগের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাঠ করলে রলাঁ যেমন 'রামকৃষ্ণ-কথামৃতে'র মধ্যে রামকৃষ্ণের ধর্মজীবনের চমকপ্রদ উপলব্ধিগুলির মধ্যে একটি বিশ্বজনীন সুর খুঁজে পেয়েছেন, আমরাও তেমনি যে-কোন ধর্ম-বিশ্বাসের আবহাওয়াতেই মানুষ হই না কেন, কোরান, 'কেম্পিস্', বাইবেল, উপনিষদ্ সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই জীবন-সত্যের অমৃত ভাণ্ডটি খুঁজে পাবো। ঠাকুর মাকে শুচি-অশুচি, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম সবই দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু সত্য দিতে পারেননি।

মাতৃদর্শন

শ্রীপুষ্পকুমার পাল

বছরের আবার সেই পুণ্য দিনটি ফিরে এল। ১২৬০ সনের ৮ই পৌষ এই বাংলা দেশে তাঁর আবির্ভাব হ'ল। সেদিনটি কেমন ছিল, কে জানে! বাঁকুড়া জেলার সেই প্রায় অজ্ঞাত গ্রাম জয়রামবাটীর মাঠের ধান বোধ হয় সে-সময় ঘরে এসে উঠেছে। নূতন ধান ও নূতন গুড়ের গন্ধ। সবজির ক্ষেত শিশির-ধোয়া। উপরে নীলাকাশ, নিচে শ্যামলিমা। আমোদরের জল যেন ঘন নীল! এই মনোরম পরিবেশে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হ'ল। বাঙালীর পুণ্যে বাংলা দেশে শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী আবির্ভূতা হলেন।

জনক ও জননী দেখলেন—যেন মা জগদ্ধাত্রী রূপ ধরে তাঁদের ঘর আলো ক'রে এলেন! প্রায় শিশুকালেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর পরিণয়। উত্তরকালে সেই পরমপুরুষ ষোড়শী-জ্ঞানে তাঁকে পূজা করলেন। তিনি বললেন, 'ও সারদা সরস্বতী—জ্ঞান দিতে এসেছে।'

যৌবনে মা প্রায় প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। লোক-চক্ষুর অন্তরালে দক্ষিণেশ্বরের সেই স্বল্পপরিসর নহবত-ঘরে পবিত্র সেই পুষ্প-কুঁড়ি ধীরে ধীরে বিকশিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর সেই বিকশিত পুষ্প মনোরম মাধুর্য নিয়ে বহুজনের সুখ ও কল্যাণের জন্য পবিত্র মাতৃরূপে অনন্ত স্নেহ দয়া ও কৃপা নিয়ে মানবসমাজে অধিষ্ঠিতা হলেন।

শ্রীশ্রীমাকে কত জনে কত রকমে দেখেছেন। তাঁর পিতা মাতা তাঁকে জেনেছেন জগদ্ধাত্রীরূপে। স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছেন সরস্বতীরূপে—পূজা করেছেন তাঁকে মহামায়ার পূজামন্ত্রে। আর সকলে জেনেছে এক অপরূপা স্নেহময়ী জননীরূপে।

আজ এই পুণ্যদিনে কাকে অনুসরণ ক'রে সেই অনন্যা জননীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করি। কোথায় যাই? সেই শিবপুরী জয়রামবাটীতে, না উদ্দীপনাময় 'উদ্বোধনে'—মায়ের বাড়িতে? আজ কাকে স্মরণ করি? এবং কাকে অনুসরণ করি? পূজ্যপাদ যোগানন্দ মহারাজকে কি মনে ক'রব? তিনি ছিলেন মায়ের একান্ত অনুগত সন্তান। একটি পয়সা পেলে তিনি মায়ের সেবার জন্য তা জমিয়ে রাখতেন। ভিক্ষা-করা কয়েকটি পয়সা নিয়ে মাকে স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্য তাঁর কত প্রয়াস! শ্রীশ্রীমা বলতেন, 'আমার জন্যে কৃচ্ছ্রসাধন করেই অকালে যোগেনের শরীর চলে গেল।' যাই, তাঁর কথা মনে ক'রে মায়ের দেখা পাবার জন্যে বসে থাকি।

কিন্তু মায়ের দর্শন পেতে হ'লে মায়ের সেই স্নেহধন্য সন্তান পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজকে স্মরণ করা কি আরও সহজ নয়? শরৎ মহারাজের কথা মা অন্যথা করেন না। শ্রীশ্রীমার শরীর অসুস্থ—ব্যাধির প্রকোপে জরা-জীর্ণ। দীক্ষাদান একেবারে বন্ধ। কিন্তু তবু 'যাবৎ শরীর, তাবৎ ক্রিয়া।' কোন কোন ভাগ্যবান্ সেই অবস্থাতেই মায়ের কৃপা পেয়েছেন। মায়ের জনৈক গৃহী সন্তান তাঁর এক আপনজন নিয়ে এসেছেন। বড় আশা শ্রীশ্রীমা তাঁকে কৃপা করবেন। মা বললেন, 'শরৎকে বলো।' ভক্ত অনুযোগ করলেন, 'তাঁকে কেন? আপনি মনে করলেই হয়ে যায়।' শ্রীশ্রীমা বললেন, 'সে কি কথা? শরৎ না বললে কিছুই হবে না।' সন্তানটি শরৎ মহারাজকে মায়ের কথা জানালেন। শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা ঐ-কথা বলেছেন?' ভক্তটি বললেন, 'মহারাজ, আপনি কত বড়! আপনার প্রতি মায়ের কত নির্ভরতা!' স্বামী সারদানন্দের চক্ষু প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। আবেগে তিনি বললেন, 'তোমার মতো আমিও তাঁর দিকে চেয়ে বসে আছি। তিনি একবার কৃপা ক'রে চাইলেই তোমাকে আমার আসনে বসাতে পারেন।'

শ্রীশ্রীমা বলতেন, 'শরৎ আমার বাসুকি।' অথবা বলতেন, 'শরৎ যেন ছাতি ধরে আছে। সে না থাকলে আমার থাকা হয় না।' সেই ভাল, যাই উদ্বোধনে শরৎ মহারাজের ঘরে গিয়ে বসে থাকি। আজ এই বিশেষ দিনে শরৎ মহারাজের সঙ্গে মায়ের হয়তো কথাবার্তা হ'তে পারে। মায়ের কৃপা হ'লে তাঁর দর্শন পাব এবং সেই মায়ের পায়ে উৎসর্গিত জীবন, 'মায়ের দ্বারী' নামে অভিহিত সেই বিশেষ সন্তানেরও বোধ হয় দেখা পাবার সুযোগ হবে।

আচ্ছা, যদি রুদ্রাণী গৌরীমাতার কথা স্মরণ করি? মায়ের উপর তাঁর কত জোর ছিল। কোন সৌভাগ্যবতীকে তিনি মায়ের কাছে এনেছেন, তাকে দীক্ষা দিতে হবে। বিশেষ আধার দেখলে গৌরী-মা বলতেন, 'বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী স্বশরীরে উদ্বোধনে আছেন, তাঁর কাছে গেলেই তিনি কৃপা করবেন।' মা হয়তো কখনও বললেন, 'আবার ধরে এনেছে, আমি বাপু পারবো না।' বললেন, 'দেবে না তো কি? তবে এলে কেন?' শ্রীশ্রীমা আর দ্বিধা না ক'রে ভক্ত কন্যাটিকে কৃপা করলেন। সন্ন্যাসিনী গৌরী-মার কাছে শ্রীশ্রীমা 'বৈকুণ্ঠের রমা, কৈলাসের উমা।' তাই যাই।

কিন্তু কাকে বাদ দিয়ে কার কথা ভাবি? শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানেরা কেই বা নগণ্য। যে তাঁর কাছে এসেছে, সেই তাঁর সন্তান। সেই করুণাময়ীর কাছে শরৎ ও আমজাদ ছিল সন্তানরূপে সমান। সেই অপরূপ মাতৃস্নেহ সকলে সমানভাবে উপভোগ করেছে। সকলেই ভেবেছে, মা তাঁকেই সবচেয়ে স্নেহ করেন।

আজ এই পুণ্যদিনে শ্রীশ্রীমা নিশ্চয়ই সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত রামকৃষ্ণলোক থেকে ভক্ত সন্তানদের দেখা দেবার জন্যে 'উদ্বোধনে' আবির্ভূতা হবেন, তাঁর ও ঠাকুরের সন্তানেরাও তাঁর সঙ্গে আসতে পারেন। দর্শন দেওয়ার সময় উপস্থিত হ'লে মা আবার হয়তো সেইরূপ করুণার প্রতিমূর্তি হয়ে পদযুগল ঝুলিয়ে উপবিষ্ট হবেন। সেই লজ্জাশীলা জননী সর্বাঙ্গে চাদর জড়িয়ে একে একে সন্তানদের প্রণাম নেবেন। অন্ততঃ কল্পনায় দেখা যাবে—কত কৃপাধন্য সন্তান মায়ের শ্রীচরণে মস্তক অবনত করছেন! মায়ের কত কন্যা এই উৎসবের দিনে মাকে প্রণাম ক'রে খুশীমনে বসে আছেন।

এতদিন মাকে ডাকছি, এতদিন তাঁর পট ও মূর্তির দিকে নির্নিমেষে চেয়ে আছি, তবু কি আজকের দিনে চকিতে একবার তাঁকে দেখা পাওয়া অসম্ভব? যে-কোন সন্তানের ডাকে তো মা স্থির থাকতে পারতেন না! কতবার কতদিন সুদূর জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানেরা তাঁর নাম নিয়ে দুর্গম পথে তাঁর দর্শন পাবার জন্য এসেছে। মা আগেই জানতে পারতেন এবং উন্মুখ হয়ে তাদের জন্যে দরজায় অপেক্ষা করতেন। লোক পাঠিয়ে ঠিক পথে তাদের এগিয়ে আসতে সাহায্য করতেন। তবে কেন তাঁর দর্শনের আশা ক'রব না? হয়তো আরও ধৈর্য ধরতে হবে। মনীষীরা বলেন, ধৈর্যেরই আর এক নাম 'ধর্ম'। তাই করি, আপাততঃ অনুভূতির সাহায্যে মায়ের সান্নিধ্য অনুভব করি।

বলেছেন, 'ভগবান্‌কে আর কে দেখেছে? কেই বা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে? ভাবে দর্শন, ভাবে কথাবার্তা।' শ্রীশ্রীমা ঈশ্বরী, জগজ্জননী, জগদ্ধাত্রী—তাঁকে এমনি দেখা সম্ভব নয়। তাঁর ভাবে ভাবময় হয়ে অনুভূতির সাহায্যে তাঁর কৃপা পেতে হবে। শরণাগত হয়ে শ্রীশ্রীমাকে একমনে স্মরণ করলে মা কৃপা ক'রে দেবেন সেই দিব্যদৃষ্টি। দেখা যাবে—শ্রীশ্রীমায়ের বিভূতি যেন বিচ্ছিন্নভাবে সংসারে ছড়িয়ে আছে। এই মানুষের মধ্যেই তাঁর অপার স্নেহ, অসীম সহিষ্ণুতা ও অনন্ত কৃপা উপলব্ধি করতে হবে। মানুষের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের করুণা প্রকাশ পায়। মানুষের মধ্যেই তাঁকে দর্শন করা যায়। মানুষকে ভালবাসলে ও মানুষের কল্যাণ কামনা করলেই তিনি দেখা দেন।

বার বার মনে আসছে—শ্রীশ্রীমা জনৈক বালিকাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বাপ-মা আত্মীয়দের কাছে তার দুরন্তপনা ও অবাধ্যতার অন্ত ছিল না। মায়ের কাছে আসলে বা তাঁর কাছে থাকলে সে কিন্তু খুব শান্ত থাকত। মা তাকে সকলকে ভালবাসবার উপদেশ দিতেন। সে-সময় প্রয়োজনে মাকে জয়রামবাটী যেতে হচ্ছে। মা বালিকাটিকে তাঁর অনুপস্থিতিতে ভালভাবে থাকতে উপদেশ দিচ্ছেন। মায়ের কাছে ভালভাবে থাকা মানে—সকলকে ভালবাসা। শ্রীশ্রীমা বালিকাটিকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'কেমনভাবে সকলকে ভালবাসবে?' বালিকাটি ঠিক কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে বোধ হয় মায়ের দিকে চেয়ে আছে! মা বললেন, 'প্রতিদানের কোন আশা না রেখে সকলকে ভালবাসতে হবে।'

আমাদের মতো সাধারণের আজকের দিনে প্রার্থনা: মা আমাদের সেই দিব্যদৃষ্টি দিন, অপরের কল্যাণ-সাধানায় যেন তাঁকে অবিরাম দর্শন করি। পরসুখকামনায় জীবনের প্রতিদিন যেন তাঁর সান্নিধ্য উপলব্ধি করি।

স্বামীজীর সন্নিধানে

স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রিয়নাথ সিংহ

এক পাড়াতেই বাড়ি। নরেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ আশৈশব খেলার সাথী। উভয়ের মধ্যে নিবিড় বন্ধুত্ব। বাল্যকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও বহুবিধ গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া প্রিয়নাথ মনে এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতেন, বড় হইয়া নরেন্দ্র জীবনে বিশেষ সাফল্য লাভ করিবে—সন্দেহ নাই।

এ হেন নরেন্দ্র যখন যৌবন-প্রারম্ভেই সন্ন্যাসী হইয়া পদব্রজে ভারতবর্ষ পর্যটন করিতে লাগিলেন, তখন প্রিয়নাথ মনে করিলেন—একটা সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন বৃথা নষ্ট হইয়া গেল!

বহুদিন বন্ধুর কোন সংবাদ নাই, কিন্তু সেই বাল্যবন্ধুর আকর্ষণ ও স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই। হঠাৎ খবর পৌছিল, স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক ভারতীয় সন্ন্যাসী চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিয়া শ্বেতাঙ্গ-জগতে ভারতকে এক গৌরবান্বিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, দলে দলে আমেরিকা ও ইংলণ্ডবাসী তাঁহার শিষ্যত্বও গ্রহণ করিতেছে। যখন জানিতে পারিলেন—এই স্বামী বিবেকানন্দই বাল্যসখা নরেন্দ্রনাথ, তখন প্রিয়বাবুর আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না!

সন্ন্যাস-জীবনেও যে এইরূপ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব, তাহা প্রিয়বাবু কেন, ভারতের ইংরেজীশিক্ষিত সকলেরই ধারণার অতীত ছিল। হিন্দু ধর্মও যে একটি মহান্ ধর্ম, খৃষ্টান জগতেও প্রচার করিবার মতো ইহাতে উৎকৃষ্ট বিষয় রহিয়াছে এবং এই ধর্ম যে এত সহজ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তাহাও প্রিয়বাবু এই প্রথম বুঝিলেন।

যদিও নেতৃসুলভ আত্মপ্রত্যয়, অভিমান-রাহিত্য, দুর্জয় সাহস, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অকাট্য যুক্তি, অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা, নিপুণ বাগ্মিতা প্রভৃতি গুণ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্যাবধি ছিল, তথাপি কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই যে, নরেন্দ্রনাথ কৌপীন সম্বল করিয়া ভারতের পথে প্রান্তরে ঘুরিয়া এইরূপ বিশ্ববরেণ্য হইবেন। শুধু একজন—প্রায়-নিরক্ষর ব্রাহ্মণ, রানী রাসমণির মন্দিরের পূজারী—বহুপূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, 'নরেন্দ্র একদিন জগৎ মাতাইবে', কিন্তু তাহা শুনিয়াছিলেন মুষ্টিমেয় লোক এবং তাঁহারাও তখন সেই ব্রাহ্মণের কথা ঠিক বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে ১৮৯৭ খৃঃ স্বামীজী ২০শে ফেব্রুআরি কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন। বিরাট্ সভায় তাঁহার স্নিগ্ধ-গম্ভীর বক্তৃতা সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিল।

অনবরত লোকের ভিড়, বহুলোক স্বামীজীর দর্শনপ্রার্থী। মুখের দুইটি কথা শুনিবার জন্য কী সেই উৎকণ্ঠা! যাহা হউক, এক অবসরে প্রিয়বাবু নিভৃতে বাল্যবন্ধুর সহিত আলাপের সুযোগ লাভ করিলেন। স্বামীজী পূর্ববৎ ব্যবহার করিলেও প্রিয়বাবুর মনে হইল—নরেন্দ্রনাথ রক্ত-মাংসের মানুষ, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যেন দেবতা!

প্রিয়বাবুর সহিত আলাপে স্বামীজী নিম্নোদ্ধৃত ভাবে কথা বলেন: সভা-সমিতি অভ্যর্থনা—

সকলই শ্রীরামকৃষ্ণের নাম-প্রচারের উদ্দেশ্যে। এদেশে বক্তৃতায় কোন লাভ নেই। মরচে-পড়া লোহা পিটলে ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাবে, প্রথম পুড়িয়ে লাল ক'রে তবে গড়ন সম্ভব। এ-দেশে চাই জীবন্ত উদাহরণ। যে দেশের লোক পেট ভরে খেতে পায় না, তাদের ধর্ম হবে কি! সবাই তমোর সমুদ্রে ডুবে আছে। নড়ে না, চড়ে না, ঘরে বসে হরিনাম করলেই সাত্ত্বিক হয় না!

তোরা নীচের স্তরের মানুষগুলোকে অত্যাচার ক'রে পশুতে পরিণত করেছিস। দু-পাতা ইংরেজী পড়ে উপরের স্তরের লোকেরা সাহেবদের গোলামি করতে ছুটছে! বড়লোকেরা, উচ্চশিক্ষিতেরা দল বেঁধে সাহেবদের দুয়ারে 'দাও দাও' রবে হল্লা করে। আর যে দু-চার জন ও-দেশে যায়, তারা ভারতের নিন্দা ও শ্বেতাঙ্গদের প্রশংসা ক'রে বাহবা নিয়ে ফিরে আসে।

প্রকৃতির নিয়ম আদান-প্রদান। ওদের বিজ্ঞান ও কারিগরি-বিদ্যা শিখে নে, তার বিনিময়ে তোদের ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন ধর্ম ওদের দে। তাতে মর্যাদার হানি হবে না, পরস্পর সম্প্রীতিও বজায় থাকবে।

স্বামীজীর সহিত নানা বিষয়ে উদ্দীপনাপূর্ণ আলোচনা প্রিয়নাথবাবু তাঁহার স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মার্থা ব্রাউন ফিংকে

মার্থা ব্রাউন ফিংকে (Martha Brown Finke) ১৮৯৩ খৃঃ নর্দাম্পটন, ম্যাসাচুসেটস স্মিথ কলেজে ভরতি হইয়া স্বামীজীর সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

ধর্ম-মহাসভার পর নভেম্বর মাসে স্বামীজী এই কলেজে দুইটি বক্তৃতা দেন। সেই সময় দূর গ্রামে অবস্থিত এই বিদ্যায়তনে তাঁহার প্রতিভার খ্যাতি পৌঁছায় নাই। তিনি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী—এই মাত্রই ছিল সেখানে স্বামীজীর পরিচয়।

'যে দেশে ১৯১২ খৃঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিউ ইয়র্কের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়াও আশ্রয় লাভে সক্ষম হন নাই, সেই দেশে ১৮৯৩ খৃঃ ভারতীয় হিন্দু সন্ন্যাসীকে আমাদের বোর্ডিং-এ অভ্যর্থনা করা ছাত্রী-নিবাসের তত্ত্বাবধায়িকার অত্যন্ত সাহস ও উদারতার পরিচায়ক'—মার্থা ফিংকে তাঁহার স্মৃতিকথায় এইরূপ লিখিয়াছেন।

১৯৩৫ খৃঃ মার্থা বেলুড় মঠে আসেন এবং মিস ম্যাকলাউডের সহিত পরিচিতা হন। বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবৃন্দ তাঁহার নিকট স্বামীজীর কথা জানিতে চাহিলে মার্থা ৪২ বৎসর পরে তাহা এইভাবে লিপিবদ্ধ করেন:

১৮৯৩ খৃঃ আমি ১৮ বৎসরের বালিকা। আমেরিকার অন্যান্য সাধারণ বালিকার মতোই ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে আমার জ্ঞান!

স্বামীজী আসিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক গুরুগম্ভীর ভাব ও প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডল। অপূর্ব এক শক্তিচ্ছটা তাঁহার দেহ হইতে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। আমি স্বামীজীর কাছেই বসিয়াছিলাম, কিন্তু এমনই অভিভূত যে, কথা বলার শক্তিও হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম!

সেই দিনের বক্তৃতার বিষয় আমি মনে করিতে পারিতেছি না। শুধু মনে আছে—তাঁহার সুন্দর ইংরেজী বলার ধরন ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বক্তৃতার পরে যে আলোচনা হয়, তাহা আমার মনে আছে। আমাদের দেশের গণ্য-মান্য ধর্মযাজকগণ স্বামীজীকে নানা প্রশ্ন করিতে থাকিলে আমি আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম—বাইবেল, ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন—সর্ব বিষয়েই স্বামীজীর জ্ঞান

তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। একটা উদারতার ভাব ঘরময় ছড়াইয়া পড়িতেছিল!

বেলুড় মঠে একজন সন্ন্যাসী আমাকে বলেন, স্বামীজী ছিলেন প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ, কিন্তু সেই রাত্রে আমার মনে হইয়াছিল—তিনি শান্তির ঘনীভূত মূর্তি। আলোচনা প্রথম ভদ্রতা-সহকারে আরম্ভ হইলেও আমাদের পাদরীরা ক্রমেই উত্তেজিত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। যতই তাঁহারা তর্কে পরাজিত হইতে থাকেন, ততই তাঁহারা বেশী উত্তেজিত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। আমি কিন্তু স্বামীজীর সাফল্যে খুবই উৎফুল্ল হই এবং আজও আমার সেই ভাব।

ভোরে আমরা স্নানাগারে শুনিলাম—আমাদের অজানা ভাষায় মধুরকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ হইতেছে। প্রাতরাশের সময় আমরা তাঁহাকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, 'আমি সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য মন্ত্র পাঠ করি।'

আমার ইহা খুবই আশ্চর্য মনে হইল। আমরা নিজেদের জন্য প্রার্থনা করি, পরে আমাদের পরিবারের জন্য। সকল প্রাণী তো দূরের কথা, সমগ্র মানবজাতিকেই আমাদের পরিবারভুক্ত বলিয়া ভাবিতে ও তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিতে কখনও শিখি নাই।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর স্বামীজী আমাদের চারজন বন্ধুকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হন। ইহাতে আমরা খুবই গর্ব অনুভব করি। তিনি কথায় কথায় বলেন: 'খ্রীষ্টের রক্ত'—কথাটা আমার বড়ই অপছন্দ।

আমাকে তিনি বেদ পাঠ করিতে বলেন—সম্ভব হইলে মূল গ্রন্থ। আমি দুই দিন মাত্র তাঁহার পূতসঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য পাইয়াছিলাম। জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া ৪২ বৎসর পরে ভারতে আসিয়া মনে হইতেছে—ইহা যেন আমার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন!

অ্যানি বেশান্ত

ভারতবাসীর নিকট অ্যানি বেশান্তের (Annie Besant) নাম সুপরিচিত। তিনি তদানীন্তন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি থিওজফিস্ট সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে চিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁহার সঙ্গে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও ছিলেন। এই ধর্মসভাতেই স্বামীজীর সহিত বেশান্তের পরিচয় ঘটে।

পরে ইংলণ্ডে ১৮৯৬ খৃঃ মধ্যভাগে অ্যানি বেশান্তের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। বেশান্ত স্বামীজীকে তাঁহার 'লজে' বক্তৃতা করিতে আমন্ত্রণ করেন এবং স্বামীজীও এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও ভক্তি-সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

স্বামীজী বেশান্তকে 'অকপট মহিলা' বলিয়াছেন। ইংলণ্ডে বেশান্ত প্রথম শ্রেণীর বক্তাদের মধ্যে পরিগণিতা হইয়াছিলেন। স্বামীজী বলেন: বেশান্ত একজন ত্যাগী মহিলা, কিন্তু 'মহাত্মা' 'কুথুমি'[১] প্রভৃতিতে আমি বিশ্বাসী নহি।

ইহার পরে ১৮৯৮ খৃঃ মে মাসে আল-মোড়ায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গৃহে পুনরায় উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বালিকা-বয়সে স্বামীজীকে জানিতেন এবং স্বামীজী আলমোড়ায় আসিয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ গৃহে আনান। এখানে বেশান্তও সে-সময় অতিথিরূপে উপস্থিত থাকায় উভয়ের সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। অন্য একদিন চক্রবর্তী

১ থিওজফিস্টদের বিশ্বাস 'কুথুমি' ও 'মোরিয়া' দুইজন মহাত্মা গূঢ়ভাবে থিওজফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। পঞ্চভূত ছাড়াও সাতটি রশ্মি মানুষের উপর ক্রিয়া করে। সাতজন মহাত্মা এই সাতটি রশ্মি নিয়ন্ত্রণ করেন, ইহা থিও-জফিস্টদের বিশ্বাস। 'মোরিয়া' প্রথম রশ্মি—ইচ্ছাশক্তি এবং 'কুথুমি' দ্বিতীয় রশ্মি—দর্শন ও জ্ঞান পরিচালনা করেন।

স্বামীজীর সহিত অ্যানি বেশান্তের আলাপের সুযোগ করিয়া দিবার জন্য স্বামীজীকে নিজ গৃহে চায়ের নিমন্ত্রণ করেন। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে আনন্দদায়ক আলাপ-আলোচনা হয়। পরদিবস স্বামীজী অসুস্থ থাকায় বেশান্তকে ভগিনী নিবেদিতার এক বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করিতে অনুরোধ করিয়া এক 'চিরকুট' পাঠান। বেশান্ত ইহাতে সম্মত হন এবং ভারতবন্ধু দুই ইংরেজ মহিলা একসঙ্গে মিলিতা হন।

১৮৯৮ খৃঃ ১১ই মার্চ কলিকাতা স্টার থিয়েটারে 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব' সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার বক্তৃতা দিবার পূর্বে স্বামীজী এই বলিয়া নিবেদিতাকে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচয় করাইয়া দেন যে, 'ভগিনী নিবেদিতা' ইংলণ্ডের ভারতকে আরও একটি উপহার। অন্য দুইটির মধ্যে একজন 'বেশান্ত', অন্যজন 'মূলার'।

আলমোড়ায় সাক্ষাতের পর আর উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে অ্যানি বেশান্ত স্বামীজী-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:

ধর্ম-মহাসভায় প্রতিনিধিবর্গের ব্যবহারের জন্য যে প্রকোষ্ঠ ভিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে স্বামীজীকে যখন দেখিলাম, তখন আমার স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা এইরূপ: হলুদ ও কমলা রঙের পোশাক-পরিহিত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটি চিকাগোর ধোঁয়াটে আবহাওয়ায় ভারতীয় সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান্। তাঁহাব সিংহের মতো উন্নত মস্তক, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, চঞ্চল ওষ্ঠ, দ্রুত ও অপ্রত্যাশিত গতি—সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। লোকে তাঁহাকে সন্ন্যাসী' বলিত, যথার্থ এই তাঁহার পরিচয়, তবে তিনি ছিলেন—যোদ্ধা সন্ন্যাসী! প্রথম দর্শনে তাঁহাকে সন্ন্যাসী অপেক্ষা 'সৈনিক' বলিয়াই বেশী মনে হইত, কারণ তিনি মঞ্চ হইতে অবতরণ করিবামাত্র তাঁহার দেহে জাতি ও দেশের গর্ব ফুটিয়া উঠিত। তিনি ছিলেন প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি, চতুষ্পার্শ্বে পরিবেষ্টিত ছিল অতি-আধুনিক কৌতুহলী দর্শকবৃন্দ, যাহারা কিছুতেই তাহাদের দাবি ছাড়িতে প্রস্তুত ছিল না—যেন তিনি যে প্রাচীন ধর্মের প্রতিনিধি, তাহার মহিমা আশেপাশে সম্মিলিত প্রতিনিধিগণের ধর্মসমূহের মহিমা অপেক্ষা হীন। কিন্তু এই ভারতসন্তান যতদিন সেই সুপ্রাচীন ধর্মের বার্তাবহ, ততদিন ধাবমান ও গর্বিত পাশ্চাত্যের নিকট ভারতের লজ্জা পাইবার কারণ নাই। তিনি ভারতের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন, ভারতের পক্ষে তিনি বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইয়াছেন, এবং এই 'চারণ' সকল দেশের রানী—তাঁহার মাতৃভূমির মর্যাদা স্মরণ রাখিয়াছিলেন। স্থিরলক্ষ্য, শক্তিমান্, প্রাণবন্ত, মানুষের মতো মানুষ, নিজেকে সমর্থন করিবার সামর্থ্যসম্পন্ন এই ভারতীয় সন্ন্যাসী!

মঞ্চোপরি আরও একটা দিক্ প্রকট হইল। মর্যাদা, সহজাত যোগ্যতা ও ক্ষমতার বোধ সেখানেও বর্তমান ছিল। স্বামীজী যে আধ্যাত্মিক বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন, তাহা অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্যে পূর্ণ। অত্যাশ্চর্য আত্মতত্ত্ব ভারতের প্রাণস্বরূপ। সেই অতুলনীয় দিব্যবাণীর মহিমা দ্বারা সব কিছু আচ্ছন্ন হইয়া গেল! বিরাট্ জনতা মোহিত হইয়া তাঁহার কথা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিল, একটি শব্দও যেন হারাইয়া না যায়, একটি স্বরপ্রবাহও যেন শুনিতে ভুল না হয়! তিনি যখন বিশাল সভাস্থল হইতে বাহিরে আসিলেন, একজন বলিলেন, 'এই লোকটিকে আমরা পৌত্তলিক বলি! আমরা তাঁহার দেশে মিশনরী পাঠাই! তাঁহাদেরই উচিত আমাদের দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠানো।'

স্বামীজী কিন্তু অ্যানি বেশান্তের থিওজফিস্ট সম্প্রদায়ে থাকা পছন্দ করিতেন না। স্বামীজী বেশান্তকে বলেন, 'আপনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির সংস্রব ছেড়ে দিন এবং নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া যা সত্য মনে করেন, তাই প্রচার করুন।'

অন্যস্থানে স্বামীজী বলিয়াছেন, 'সাক্ষাৎভাবে বেশান্ত-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, তবে আমাদের ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান বড় অল্প। তিনি এদিক ওদিক থেকে একটু আধটু ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম আলোচনা করিবার অবসর তাঁহার হয় নাই।'

কন্সটান্স টাউন

কন্সটান্স টাউনের (Constance Towne) কুমারী অবস্থার নাম মিস গিবন্স (Gibbons)। তিনি যখন তাঁহার মাতার সহিত নিউ ইয়র্কে বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ পান (১৮৯৪ খৃঃ)।

তিনি ডাক্তার গুয়েরন্সী (Dr. Guernsey)-প্রদত্ত এক ভোজে ঐ অল্প বয়সেই ভারতীয় সন্ন্যাসীর বিপক্ষে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় চতুর্বিংশতি বৎসর। ডাক্তার গুয়েরন্সী নিউইয়র্কে বিশিষ্ট কেহ উপস্থিত হইলে সমাজে তাঁহাকে প্রথম পরিচিত করিবার সুযোগ পাইয়া আনন্দ লাভ করিতেন। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম-মহাসভায় আশাতীত সাফল্য লাভ করিবার পরে নিউইয়র্কের সমাজে তাঁহাকে প্রথম পরিচিত করিবার সুযোগ গ্রহণ করা ডাঃ গুয়েরন্সীর পক্ষে স্বাভাবিক মনে হয়।

১৪ জন অতিথি। তন্মধ্যে স্বামীজী ও মিস গিবন্স পাশাপাশি বসিয়াছিলেন। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা ছিল যে, স্বামীজী যদিও পৌত্তলিক, তথাপি তাঁহাকে সৌজন্য দেখাইতে কেহই যেন কার্পণ্য না করেন, কিন্তু দেখা গেল—ধর্ম-যাজকগণই ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া সৌজন্যের গণ্ডি অতিক্রম করিতেছেন। স্বামীজী আমাকে বলিলেন, 'মিস গিবন্স, আপনার ও আমার দর্শন এক এবং আমাদের ধর্মে আভ্যন্তরীণ কোন প্রভেদ নাই।' মিসেস গিবন্স শুধু ইংলণ্ডের চার্চেই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে কন্যার নিকট ঐ ভোজের সংবাদ ও স্বামীজীর প্রশংসা শুনিয়া যদিও বিরক্ত হন, তবু ক্রমে স্বামীজীর উদারতা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করে এবং তিনি বেদান্ত-সমিতিতে যোগ দেন।

মিসেস গিবন্সের নানারূপ গোঁড়া চাল চলন ও কথাবার্তায় স্বামীজী খুবই কৌতুক বোধ করিতেন। ৪০ বৎসর পরেও কন্সটান্স যেন চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেন—স্বামীজী প্রাণখোলা হাসিতে ফাটিয়া পড়িতেছেন।

একবার 'ফস্ট' (Faust) অভিনয়ে গণ্যমান্য লোকেরা যাইবেন জানিয়া মাকে বলিয়া কন্সটান্স স্বামীজীকে অভিনয়ে লইয়া যান।

সেদিন অভিনয় কেহ দেখিয়াছিল বলিয়া কন্সটান্সের মনে হয় নাই, কারণ স্বামীজীই সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেইরাত্রে যেন তাঁহাকে আরও বেশী সুন্দর দেখাইতেছিল।

৪০ বৎসর পরে স্মৃতিকথায় কন্সটান্স টাউন নিম্নরূপ লিখিয়াছেন :

স্বামীজী আমাকে বেদান্তদর্শন এবং ধ্যান শিক্ষা দেন। তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। অপরের মতে তাঁহার সহিষ্ণুতার ভাব খুবই প্রকাশ পাইত। তিনি আমার সঙ্গে গির্জায় গিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন।

যখন সকল লোকের মস্তক খ্রীষ্টের উদ্দেশে নমিত, তখন তিনি আমাকে অনুচ্চস্বরে বলেন, 'আমরা একই ঈশ্বরের আরাধনা করি।'

ভ্যান হ্যাগেন

হেনরী ভ্যান হ্যাগেন (Van Haagan) স্বামীজীর নিউইয়র্ক বেদান্ত-সমিতির ছাত্র ছিলেন। তিনি বহু বৎসর পরে নিজের স্মৃতি-কথায় লিখিয়াছেন :

মানুষ যখন অন্ধকার হইতে অতি উজ্জ্বল আলোকে হঠাৎ প্রবেশ করে, তাহার চক্ষু ঝলসিয়া যায় এবং কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টিশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যখন আমাদিগকে আমাদের অন্তরাত্মা যে আনন্দে উদ্ভাসিত, তাহা প্রকাশ করিতে বলা হয়, আমরা তখন ভাষা খুঁজিয়া পাই না। কোন ব্যক্তি পরম আনন্দ অনুভব করিলেও তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইতে পারে। আমার জীবনের অবিস্মরণীয় পুরাতন দিনগুলির কথা যখন চিন্তা করি, তখন আমার এইরূপ অবস্থাই হয়। যদিও বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, তবু মনে হয়—সব যেন গতকালের ঘটনা!

আমি গীতা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছিলাম। সেই দেশের মানুষ স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিবার জন্য আমার যতটা আগ্রহ হইয়াছিল, তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার উদ্দেশ্যে ততটা হয় নাই; তাঁহার ক্লাসে উপস্থিত হইলাম। আমার বন্ধুরা স্বামীজী-সম্বন্ধে আমার মনে নানারূপ বিরুদ্ধভাব প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। ক্লাসে বসিয়া আছি, এক সময় দেখি—একজন লোক প্রবেশ করিলেন, তাঁহার চলনে রাজোচিত ভাব ও মহত্ত্ব—যেন তিনি সব কিছু পাইয়াছেন, তাঁহার কিছুরই আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি লক্ষ্য করিলাম—তিনি একজন অতি উচ্চস্তরের মানুষ এবং শীঘ্রই তাঁহার চরিত্রও অতি মধুর জানিতে পারিলাম।

এতক্ষণে আমি স্থির করি—তাঁহার কথা মন দিয়া শুনিব। কয়েকটি কথা শুনিয়াই আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, আমি তাঁহার ক্লাসে ও বক্তৃতায় নিয়মিত উপস্থিত থাকিব। আসার সময় আমার যে তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল, তাঁহার গভীর জ্ঞান ও আকর্ষণে তাহা যেন গলিয়া গেল—মনে হইল। ক্ষুধার্ত যেমন পুষ্টিকর খাদ্যে এবং তৃষ্ণার্ত যেমন নির্মল পানীয়ে তৃপ্তিলাভ করে, এই আশ্চর্য লোকটির শিক্ষায় আমার সত্যানুসন্ধিৎসা তেমন তৃপ্ত হইল! স্বামী বিবেকানন্দ যে বেদান্তদর্শন শিক্ষা দিতেন, তাহা অপেক্ষা বেশী ভাল বা সরল ব্যাখ্যা অদ্যাবধি অন্য কিছুতেই পাই নাই।

শুধু যে তাঁহার ক্লাসের বা বক্তৃতার কথাই উপদেশমূলক ছিল—তাহা নহে, রাস্তায় বা পার্কে কথাবার্তাও সেই একই রূপ! একবার আমি দুঃখ করিয়া বলি, 'স্বামীজী, আপনার এইরূপ জ্ঞানগর্ভ শিক্ষায় বেশী শ্রোতা হয় না।' তিনি বিচক্ষণতার সহিত উপযুক্ত উত্তর দেন, 'যদি ইচ্ছা করি, সহস্র সহস্র লোক বক্তৃতায় আনতে পারি। শুধু অকপট শিক্ষার্থীই এই প্রচেষ্টাকে সফল করবে, সংখ্যা নয়। যদি সারাজীবনে একজনকেও মুক্তিলাভে সাহায্য করতে পারি, তবে আমার শ্রম সার্থক মনে ক'রব।' —এই কথায় আমি তাঁহার ছাত্র হইব, স্থির করি।

এই প্রিয় গুরু তাঁহার ছাত্রদের মনে যে গভীর ছাপ রাখিতেন, তাহা এই—যখন তাহারা তাঁহার কাছে থাকিত, প্রত্যেকেই মনে করিত, তিনি শুধু তাহার প্রতিই পুরা নজর দিতেছেন। তিনি ছাত্রদের সামান্য প্রশ্ন ও প্রয়োজন মিটাইতেও তৎপর ছিলেন, ফলে এই সুন্দর ও আনন্দদায়ক ব্যবহারে ছাত্রেরা অত্যন্ত গুরুভক্ত ও উৎসাহী হইয়া উঠিত। ইহাতে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এক অপূর্ব প্রেমের বন্ধন সৃষ্টি হইত, জীবনে সাফল্য-লাভের জন্য ইহা অত্যন্ত প্রয়োজন। কি চমৎকার বাণী-শক্তি তিনি অর্জন করিয়াছিলেন! আজ প্রত্যেক বুদ্ধিমান্

ব্যক্তিই তাঁর বাণীর সহিত পরিচিত। বহু অধ্যাপক, ধর্মযাজক এবং সাধারণ লোক—তাঁহার বাণী ও রচনার সহিত পরিচিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন।

আর্য ঋষিদের মনের শান্তি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন—তাঁহার শিক্ষায় ইহাই আমরা জানিয়াছি। অতি অল্পদিন হইল, একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, আমাদের বিলাসিতা ও ব্যবসায়ের জীবন একটা অবিরাম স্নায়ুর ঝড়, ইহা দ্রুত শক্তিক্ষয় করিয়া মানুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দেয়। অর্থ ও পার্থিব সুখের প্রবল বাসনায় স্নায়বিক শক্তির প্রচুর অপচয় ঘটে এবং তাহা পূরণ করার কোন চেষ্টাই আমাদের নাই। বেদান্ত-দর্শনের শিক্ষানুযায়ী জীবনযাপন করা অপেক্ষা আর ইহার অন্য কি ভালো প্রতিষেধক হইতে পারে। এই জীবনধারাতেই শুধু সেই শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে, যাহা পাশ্চাত্যে নাই।

স্বামীজী আমাদিগকে আত্মসংযম শিক্ষা করিতে বলিয়াছেন। মতের অমিল হইলেই মানুষকে ক্রোধে ও ঘৃণায় হত্যা করা অন্যায়। যুদ্ধজয়ে কোন লাভ নাই, তিনি যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। স্বামীজী বলিতেন, 'যে নিজেকে জয় করে, সে সকলকেই জয় করতে পারে, এ-কথা জেনে রাখো, কখনও ভুলো না। পুস্তকে মন্দিরে বা অন্যত্র বৃথাই শান্তির অনুসন্ধান, তোমার নিজের কর্মই তোমাকে চালিত করছে। দুঃখ করা বন্ধ ক'রে কর্মচাঞ্চল্য ত্যাগ করো।'

মানুষকে তিনি সত্যের সন্ধান দিয়া নিজের কার্য শেষ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। আমাদের কর্তব্য—জীবনে সত্য রূপায়িত করিতে চেষ্টা করা। আমাদিগকে সাহায্য করার জন্য বহু বেদান্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখানে ক্লাস, বক্তৃতা হইতেছে এবং স্বামীজীর গুরুভাই ও শিষ্যেরা আমাদের দেশে আসিয়াছেন। স্বামীজী সত্য ও জ্ঞান দান করিয়াছেন, বিনিময়ে কিছুই চান নাই। আমরা বেদান্তের আদর্শে জীবন যাপন করিয়া যেন দেখাইতে পারি যে, স্বামীজী বৃথা এ-দেশে এক আশ্চর্য বাণী বহন করিয়া আনেন নাই।

কামাখ্যানাথ মিত্র

কামাখ্যানাথ মিত্র ১৮৯৭ খৃঃ কলিকাতা হইতে বি-এ. পাশ করেন এবং ঐ বৎসরই বলরাম-মন্দিরে স্বামীজীকে প্রথম দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি লিখিয়াছেন:

বাল্যকাল হইতে ধর্ম-সম্বন্ধে আমার বিশেষ অনুসন্ধিৎসা ছিল। সমসাময়িক দেশবাসীর প্রধান আকর্ষণ ছিল রাজনীতি, কিন্তু আমার ছিল ধর্ম। বহু ধর্মান্দোলন ও বিরুদ্ধ সমালোচনা ঐ-সময় চলিতেছিল শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রায় সকলেই ক্রমবর্ধমান ব্রাহ্ম-মতে সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সনাতনপন্থী গোঁড়ার দল সব-কিছুরই বৈজ্ঞানিক ও যেন তেন প্রকারে খামখেয়ালী ব্যাখ্যা দ্বারা হিন্দুধর্মের সমর্থনে কোমর বাঁধিতে প্রস্তুত। অপর দিকে থিওজফির 'মহাত্মা', রহস্যবিদ্যা ও আত্মার গবেষণা ইত্যাদিতেও বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আকৃষ্ট। ইঁহাদের আকর্ষণের দুইটি কারণ—ব্রাহ্মদের পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গি ইঁহারা অপছন্দ করিতেন এবং আমেরিকার কর্ণেল অলকট ও ইংলণ্ডের মিসেস অ্যানি বেশান্ত কর্তৃক ভারতীয় সব কিছুর অবাধ প্রশংসায় ইঁহারা গর্ববোধ করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক ছাত্র স্বাধীন-চিন্তাপন্থী, যুক্তিবাদী ও অজ্ঞেয়বাদী ছিল। তাহারা মিল, কমতে, স্পেন্সার, হাক্সলী ও হেকেল বদহজম করিয়া—ধর্মমাত্রই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিত। প্রথম যৌবনে আমিও এইরূপ ছিলাম। আমি ধর্মে কোন রকম প্রাণের আবেগ অনুভব করি নাই! ধর্ম একটা বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্গীভূত বিষয় বলিয়াই জানিতাম। কলেজে ভরতি হইয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের লেখা 'প্রকৃত মহাত্মা' পড়িয়া আমার চোখ খুলিয়া গেল। ব্রাহ্মদের সমাজ-সংস্কারে বিশ্বাসী হইলেও তাঁহাদের ধর্মমত সমর্থন করিতে পারি নাই।

এই সময় জানিলাম—শ্রীরামকৃষ্ণের এক শিষ্য

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তিনি যখন কলিকাতায় আসিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না, তবু বিভিন্ন স্থানে তাঁহার প্রদত্ত ভাষণগুলি পাঠ করিয়া আমি দৃঢ়নিশ্চয় হই যে, ভারতের আত্মা তাঁহার মধ্য দিয়া বাণী প্রচার করিতেছেন। অমন শক্তি, অমন তেজ কল্পনাতীত! কেশব সেনের বক্তৃতার ভঙ্গি, বাগ্মিতা ও ধর্মানুরাগ সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু স্বামীজীর ভাষণে এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ, একাধারে স্বজাতীয় ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষ করিলাম। আমি তাঁহার লাহোরে প্রদত্ত বেদান্ত-বিষয়ক ভাষণ পাঠ করিয়া বুঝি যে, তিনি সর্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন; কিন্তু সেই ধর্ম গোঁড়া সনাতনী, তথাকথিত সংস্কারক এবং ভারতীয় পণ্ডিত ও প্রাচীন পন্থিগণের ধর্ম হইতে পৃথক্।

১৮৯৭ খৃঃ তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে সহপাঠী নরেন্দ্রকুমার বসুর সহিত বলরাম-মন্দিরে স্বামীজীকে দেখিতে যাই। ঘর-ভরতি লোক—বেশীর ভাগই ছাত্র। স্বামীজীর বড় বড় চোখদুইটি—প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক তেজে দীপ্ত, তাঁহার প্রতিটি কথা যেন অগ্নিবর্ষী ও ভাব আবেগপূর্ণ। প্রতি কথায় তাঁহার ভিতর হইতে শক্তির তরঙ্গ যেন আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। তাঁহাকে দর্শন করাই শিক্ষা, তাঁহার কথা শোনাই প্রেরণা! ঐ দিনটি আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

তিনি দেশের অধঃপতনের কথা ও নির্যাতিত জনসাধারণের দুর্দশার কথা এমন মর্মস্পর্শী ভাবে বলিতেন, মনে হইত—যেন তাঁহার হৃদয়ে যে সহানুভূতি ছিল, তাহার শতাংশের এক অংশও আমাদের থাকিলে দেশে দুঃখ-দারিদ্র্য থাকিত না! শক্তি-অর্জনের কথাই স্বামীজী বলিতেন। তাঁহার মুখে হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে শুনিয়া মনে হইয়াছিল—তিনি ধর্মজগতে নেপোলিয়ন এবং আলেকজাণ্ডার ও সীজার যে ধাতুতে গড়া, তিনিও সেই একই ধাতুতে গড়া—প্রভেদ শুধু কর্মক্ষেত্রে। উত্তরমেরু হইতে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত সর্বত্র হিন্দুধর্মের পতাকা উড্ডীন দেখাই ছিল—তাঁর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

শক্তি, আত্মবিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবার কথাই স্বামীজী বলিতেন। সর্বদাই তিনি শক্তি ও সাহসের প্রশংসা করিতেন, বলিতেন—সকল কর্মের সাফল্যের কারণ এই দুইটি। বলিতেন—ইস্পাতের মতো স্নায়ু ও লোহার মতো শক্ত মাংসপেশী চাই। এক মুহূর্তের সতেজ জীবন বহু বৎসর অকর্মণ্য জীবনযাপন অপেক্ষা অনেক ভাল। কাপুরুষেরাই বহুবার মরে। কপট ধার্মিক অপেক্ষা একজন অকপট নাস্তিক অনেক ভাল।

পর দিবস স্বামীজীর সম্পূর্ণ অন্য রূপ দেখি। সেদিন বলরাম-ভবনেই তিনি গুরু-ভাইদের সহিত বালকের ন্যায় হাসিঠাট্টা করিতেছিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে স্টার থিয়েটারে ভগিনী নিবেদিতাকে জনসাধারণের নিকট পরিচিত করাইয়া দিবার সময় স্বামীজীকে বক্তৃতা দিতে শোনার সৌভাগ্য হয়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। থিয়েটার-হল একেবারে লোকে লোকারণ্য। আমার শুধু স্যর জগদীশ বসু ও আনন্দ চারলুর কথাই মনে আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা দিলেন, এমন আর কখনও শুনি নাই, শুনিবও না। নিউইয়র্ক দৈনিক হেরাল্ড, তাঁহাকে যে বলিয়াছিল, 'দৈবশক্তি-সম্পন্ন বক্তা', ইহা একটুও অতিরঞ্জিত নয়।

স্বামীজীর বাণী বুঝিবার জন্য আমি তাঁহার বাণী ও রচনা এবং তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে সকল লেখা পাঠ করি। আমাদের ব্যষ্টি-জীবনে, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এমন কোন সমস্যা নাই, যাহাতে তিনি নবীন আলোক সম্পাত না করিয়াছেন। তিনি দেশে এক নবীন জীবন সঞ্চারিত করিয়া গিয়াছেন। স্বামীজী দিয়াছেনঃ—মুক্তি, শক্তি, অভীঃ ও আত্মবিশ্বাসের বাণী। তিনি আমাদের ধর্মের চিরন্তন সত্য যুগোপযোগী করিয়া প্রচার করিয়াছেন এবং বর্তমানে এ-দেশের ও সমগ্র পৃথিবীর উপকারে এই সত্য কিরূপে কার্যকর করা সম্ভব, তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন।

মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারা ও আদর্শ এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে—ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী মহিলা-সম্মেলন

শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত
(সহ-সম্পাদিকা, মহিলা-সম্মেলন উপ-সমিতি)

একশত বৎসর পূর্বের ঘটনা। ইতিহাসের মহানায়ক সন্ন্যাসীর কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল এক অভূতপূর্ব আহ্বান: আমি চাই বিদ্রোহীর দল—নর ও নারী দুইই—যারা অপ্রতিরোধ্য সমুদ্র-তরঙ্গের মতো দেশের বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে, মুক্তি সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী দূর-দুরান্তে সকলের দরজায় পৌঁছে দেবে, আনবে এক আমূল রূপান্তর। সে আহ্বানে যারা দেশবিদেশ হ'তে সাড়া দিয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন সিংহিনী-প্রতিম পাশ্চাত্য নারী ছিলেন। কিন্তু হায়, কোথায় তখন ভারতের নারী, যাদের উপর তাঁর আশা, আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল সবচেয়ে বেশী! সূর্যালোক হ'তে বঞ্চিত, শিক্ষার অধিকার হ'তে বঞ্চিত, এক দুঃসহ জীবনের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাদের চারপাশে তখন দুর্ভেদ্য দেওয়াল, তারই গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল সে আহ্বান—তাদের তখন পথও ছিল না, প্রস্তুতিও ছিল না। কিন্তু সে-পথ তিনিই তৈরী ক'রে দিয়ে গেলেন। সমাজ-নেতাদের সচকিত ক'রে বজ্রকণ্ঠে শোনালেন সাবধান-বাণী—'এক পক্ষে কখনও পক্ষী উড্ডীয়মান হ'তে পারে না।' আর দিয়ে গেলেন মুক্তির উদার অগ্নিমন্ত্র:

'I shall not rest till I root out this distinction of sex. Is there any sex-distinction in the Atman? Out with the differentiation between men and women. All are Atman, all are children of God.'

মহাবিদ্রোহী, নবযুগে 'স্ত্রী-শূদ্রে'র মহান্ মুক্তিদাতার বেদনার্ত কণ্ঠে উদ্গীত এই অগ্নিমন্ত্র—'আত্মায় স্ত্রীপুরুষ-ভেদ নেই,' যতদিন না স্ত্রীপুরুষে সকল বৈষম্য দূর হয়, আমি শান্ত হবো না'—এই শতাব্দীকাল ধরে কল্যাণকর্মীদের কর্ণে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়েছে, অনন্তকাল ধরেই তা কালের কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরবে। নারীকে এমন মহিমময় মুক্তি-মন্ত্র আর কে শুনিয়েছে? সকল বৈষম্যের মূলে কে আর এমন ক'রে কুঠারাঘাত করেছে? তারপরের এক শ বছরের ইতিহাস কেবল একটানা জাগরণের ইতিহাস, জীবনের সকল ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলার ইতিহাস; যদিও আজও অনেক পথ চলা বাকী, যদিও পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী-পুরুষের সকল বৈষম্য আজও দূর হয়নি।

সেজন্য যখন এক শতাব্দী পরে এল সেই মহান্ নেতার পুণ্য জন্মশতবার্ষিকী উৎসব, উদ্যোক্তারা মনে করলেন, যে নারীজাতির জাগরণের জন্য তিনি এত করলেন, তাদের এক সম্মেলন এ উৎসবের হবে যোগ্যতম কর্মসূচী। তা শুধু নয়, শতাব্দীর অগ্রগতির সমীক্ষণেরও বড় প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল আগামী দিনের পথ-নির্ণয়ের। সেজন্য গতবৎসর ডিসেম্বর-জানুআরি মাসে কলকাতায় বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী উৎসবে অনুষ্ঠিত সকল কার্যসূচীর মধ্যে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল ২৫শে ডিসেম্বর হ'তে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দিবসচতুষ্টয়-ব্যাপী মহিলা-সম্মেলন। এই মহাসম্মেলনে ভারত ও ভারতের বাইরে থেকে তিনশত প্রতিনিধি যোগদান

করেন—ভারতের কোন প্রদেশ বাদ যায়নি এবং বহির্বিশ্ব হ'তে জার্মানি, অষ্ট্রিয়া, আমেরিকা, জাপান ও মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিরা যোগদান করেছিলেন। জ্ঞানে মনীষায়, শিক্ষায় ও সমাজ-সেবায় যাঁরা নিজ নিজ অঞ্চলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁরাই এসেছিলেন প্রতিনিধিত্ব করতে, সেদিক থেকে দেশবিদেশের এত গুণী মহিলার একত্র সমাবেশ খুব কমই দেখা গেছে।

বৎসরাধিক কাল ধরে এই মহাসম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্ব চলেছিল। ডিসেম্বর ১৯৬২ খৃঃ শিক্ষা ও সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে সুপরিচিত কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী সমিতির সঙ্গে যুক্ত একটি মহিলা-উপসমিতি গঠিত হয়। প্রস্তুতি-পর্ব হিসাবে এই উপসমিতি কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি জনসভার অনুষ্ঠান করেন, সব-কয়টিতেই সর্বসাধারণের নিকট হ'তে বিপুল সাড়া পাওয়া যায়। সম্মেলনের ছয়মাস পূর্বে একটি অভ্যর্থনা-সমিতিও গঠিত হয়েছিল যার সদস্য-সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল ৪৩২ এই বৃহৎসংখ্যক সদস্যাদলে ধনী-দরিদ্র, তরুণী বৃদ্ধা, ছাত্রী ও শিক্ষিকা এবং আরও নানাশ্রেণীর সমাজসেবী, চাকরি-জীবী, ও বুদ্ধিজীবী মহিলা —সকলেই ছিলেন; গৃহী-ভক্ত ছিলেন, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনীরাও ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সমিতিগুলির অধিবেশন ছিল সবসময় উৎসাহে দীপ্ত, কর্মোদ্যমে পরিপূর্ণ, সকলের সঙ্গে সকলের সহযোগিতায় ও সমপ্রাণতায় অভূতপূর্ব প্রেরণাপূর্ণ এবং কখনও মতদ্বৈধ, মনোমালিন্য বা বাদানুবাদ দেখা যায়নি। শুধু দেখা গেছে এক বিষয়ে প্রতিযোগিতা—কে কতটা দেবেন—অর্থ, সামগ্রী, শ্রম, সময়, সেই এক বিষয় ছাড়া প্রতিযোগিতার আর দ্বিতীয় বিষয় ছিল না। সম্মেলনের অভূতপূর্ব সাফল্য এই কারণেই সম্ভব হয়েছে। সবসময়ই যেন কলের মতো কাজ হয়েছে, বিপুলসংখ্যক কর্মী এসেছে। এতবড় সম্মেলনের অতিথিসেবার জন্য প্রয়োজনীয় সকলপ্রকার জিনিসপত্র দান-হিসাবে পাওয়া গিয়েছে—কাগজ, পেন্সিল, প্যাড, চাল-ডাল, তরি-তরকারি, দুধ, মিষ্টি, চা, সাবান, এমন-কি ঘর পরিষ্কার করবার জন্য ফিনাইল পর্যন্ত। সেইজন্য আমাদের এই সম্মেলন এক আনন্দ-উৎসবে পরিণত হয়েছিল—এবং এ উৎসব যে শুধু আনন্দে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, তা নয়, অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ—পুণ্যময় ও শান্তিময় হয়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে জগজ্জননীর পরিপূর্ণ আশীর্বাদ এই সম্মেলন লাভ করেছিল।

সম্মেলনের অতিথি-আবাস স্থাপিত হয়েছিল দমদমে যশোর রোডের উপর অবস্থিত রামকৃষ্ণ-সারদা-মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের নবনির্মিত প্রশস্ত গৃহে। ২৩শে ডিসেম্বর হ'তে প্রতিনিধিদের আগমন শুরু হয়। সংসার ফেলে রেখে সম্মেলনের আহ্বান সর্বাপেক্ষা বড় মনে ক'রে অভ্যর্থনা-সমিতির যে-সকল সদস্যা কয়দিন প্রতিনিধি-আবাসে অতিথিসেবার ভার গ্রহণ করেছিলেন, তারা পূর্বে কখনও কল্পনা করতে পারেননি—কতবড় আনন্দ-যজ্ঞে তাঁদের ডাক পড়েছে। এ কয়দিন সব ব্যবধান ঘুচে গিয়েছিল —সংসারে অধিবাসিনীরাও আশ্রমবাসিনী হ'তে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ এ কয়দিনের জন্য বিপুল কর্মস্রোতের মধ্যেও আশ্রমজীবনের পুণ্য পরিবেশে চিত্তের আনন্দময় বিশ্রামসুখই তারা উপভোগ ক'রে গিয়েছেন। সত্যই—পুণ্য আশ্রমবাস, অনুক্ষণ ত্যাগপূত সন্ন্যাসিনীদের পুণ্যসঙ্গে তাদের জীবন অদ্ভুত প্রেরণায় ভরে গিয়েছিল। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অতিথিসেবার আয়োজনে ব্যস্ত থেকেও উষাগমের বহুপূর্বেই তারা শয্যাশ্রয় ত্যাগ করেছেন—কারণ মঙ্গল-

আরতির আহ্বান। এখানকার এই অমৃতমধুর জীবনের একটুও বাদ দিলে তো তাদের চলবে না। প্রতিনিধি-ভবনে সাধারণ উপাসনা-মন্দিরে সেই যে মঙ্গল আরতির সঙ্গে ভজন-কীর্তন শুরু হ'ত, তা সারাদিন অব্যাহত থাকত, একের পর এক বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিনিধিদল তা চালিয়ে যেতেন। সেজন্য সেই মঙ্গল-আরতির সুর ছড়িয়ে যেত সকলের সারাদিনের সব কাজে, সব কথায়, সব আচরণে। তাই এ-কয়টি আনন্দপূর্ণ দিনের কথা, এই এক অন্য জগতের কথা—যে জগতে কর্ম ও শ্রম, আনন্দ, প্রীতি, পূজা-আরতি, ধ্যান-জপ-উপাসনা-প্রার্থনা-ভজন-নামগানের সুরে সুরে ভরা—তার কথা আর কোনদিনই কি ভোলা যাবে?

২৪শে ডিসেম্বরের সন্ধ্যাটি ছিল সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে মিলন-মধুর, চারিদিকে যেন সত্যই এক আগমনীর সুর বাজছিল। সেদিন প্রতিনিধি-আবাসের প্রশস্ত উপাসনা-মন্দিরে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যাগণ প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সম্মুখে শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি চন্দনপুষ্পে সজ্জিত রাখা ছিল। সেদিন ছিল ভগবান্ যীশুর আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা—সেজন্য তাঁরই একখানি আলেখ্য পত্রপুষ্পে সজ্জিত হয়ে সম্মুখে শোভা পাচ্ছিল। ঘরে তিলধারণের স্থান ছিল না, বারান্দাও ভরতি, অনেকে দাঁড়িয়েও ছিলেন। চারিদিকে তাকিয়ে মনে হ'ল কি বৈচিত্র্যের শোভা—কত বিচিত্র বেশভূষা, কত বিচিত্র ভাষার কল-কাকলী। এই সভার মনে হচ্ছিল বিচিত্র একটি পুষ্পগুচ্ছ। এবং এত বৈচিত্র্যের মধ্যে সকলে একমন, একপ্রাণ। মনে হ'ল স্বামীজীর কথিত 'বিশ্বাত্মার ঐক্য' এখানে যেন কায়া ধারণ করেছে। অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী ডক্টর রমা চৌধুরী অতিথিদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন, শুভেচ্ছা জানালেন শতবার্ষিকী সমিতির সাধারণ সম্পাদক পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী। একের পর এক প্রতিনিধিগণ উঠে তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানালেন নানাদেশে ছড়ানো সম-আদর্শে বিশ্বাসী সমপ্রাণ ভগিনীদের সঙ্গে এই মিলনোৎসবে যোগদান করতে পেরে তাঁরা পরম আনন্দিত। সংক্ষিপ্ত ভাষণসূচী ছিল গৌণ, অল্পক্ষণ-মধ্যেই তা শেষ হ'ল। আরম্ভ হ'ল সেদিনের মুখ্য অনুষ্ঠান—ভগবান্ যীশুর আবির্ভাব-উৎসব। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা বাইবেল থেকে যীশুর মহাজীবন পাঠ ক'রে শোনাতে লাগলেন। সেই দিব্য কাহিনী সকলের মনে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার ক'রল।

২৫শে ডিসেম্বর বিকাল ৩ টায় পার্ক-সার্কাস ময়দানে প্রশস্ত সভামণ্ডপে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আরম্ভ হ'ল। পুরোধা ছিলেন শ্রীরাম-কৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী, তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর উপস্থিতিতে চারিদিকে একটি ভাব-গম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। মঞ্চের উপর উপস্থিত ছিলেন সারদা মঠের ব্রহ্মচারিণী ও সন্ন্যাসিনীগণ। সারদা মঠের ব্রহ্মচারিণীগণ পবিত্র বেদমন্ত্র পাঠ ক'রে উদ্বোধন-সভার কাজের সূচনা করলেন, সম্মুখে বিপুল জনসমুদ্রের মধ্যে অমনি নেমে এল উপাসনা-গৃহের স্তব্ধতা। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি, কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর স্নেহলিপিতে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় নারী সম্বন্ধে স্বামীজীর নির্দেশ—তাকে সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চিরদিন চলতে হবে।

ভক্তিনম্র আলোচনায় স্বামীজীর পুণ্যজীবন পরিক্রমা ক'রে সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন রাজমাতা—সিন্ধিয়ার মহারানী। এ দিন ডক্টর রমা চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যাগত ও দর্শক—সকলকে আবাহন জানালেন। প্রসঙ্গক্রমে 'সংস্কৃত' কথাটির তাৎপর্য-সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনায় তিনি বলেন: সংস্কৃতি আত্মানুভূতিতে ও আত্মস্থতায় লাভ হয়, তার পরাকাষ্ঠা লাভ হয় সেই অনুভূতি সকলের সঙ্গে যুক্ত ক'রে। মঞ্চের উপর এদিন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন প্রতীচ্যের বিশিষ্ট প্রতিনিধি ডাঃ মারিয়া বুর্গি—জন্মসূত্রে গ্রীক এবং বিবাহ-সূত্রে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক, রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান ও প্রাচ্যদর্শনে সুপণ্ডিত। তাঁর ভাষণ-দক্ষতা ও অপূর্ব বিশ্লেষণ-ক্ষমতা এই সম্মেলন ও পরবর্তী ধর্মমহাসভার বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। তিনি অবেগময়ী ভাষায় স্বামীজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন এবং পুণ্যভূমি ভারত দর্শন ক'রে তার পুণ্যময়ী নারীকুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি যে গভীরভাবে অভিভূত হয়েছেন, তাও নিবেদন করলেন। সারদামঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা স্বামীজীর জীবনব্রত এবং তাতে নারীর স্থান সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষণ দিলেন। পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ তাঁর ভাষণে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনাদর্শের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন: 'ভগিনী নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে স্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের অনুপম চারিত্রিক গুণগুলি তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন, কারণ শ্রীশ্রীমায়ের অনুপম চরিত্রেই দেখা যায়—মাতৃহৃদয়ের অপূর্ব কোমলতার সঙ্গে সংযুক্ত বীরের সঙ্কল্প, দক্ষিণ সমীরণের স্নিগ্ধতার সঙ্গে সংযুক্ত বজ্রের কঠিনতা, বৈদিক হোমাগ্নির পবিত্রতা। এবং স্বামীজীর মতে এই আদর্শই ভারতের নারীর চিরন্তন আদর্শ।' সভাপতি মহারাজ যখন ভাষণ শেষ করলেন, তখনও তাঁর প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বরের রেশ ভাসছে—'জগজ্জননী মা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।' দীর্ঘ সময় কেটে গেছে—প্রায় তিন ঘণ্টা, কিন্তু মনে হ'ল মুহূর্তকাল। সেদিনের সেই ভাবগম্ভীর পরিবেশ ভোলবার নয়।

'শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ তোমাদের উপর বর্ষিত হোক'—মনে হ'ল, এর পর আবার কি চাই!

পূর্বেই বলা হয়েছে—স্বামীজীর আবির্ভাবের পর থেকে এক-শ বছরে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে দেশে ও যে-সকল নূতন সমস্যা আজকের নারীজীবনকে পর্যুদস্ত ও বিভ্রান্ত করছে, উদ্যোক্তারা তার একটি সমীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর দুটি যথাযোগ্য আলোচনার বিষয় পূর্বেই স্থির করা হয়েছিল। ২৬শে ডিসেম্বরের বিষয় ছিল—'নারীজীবনে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের প্রভাব।' বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব ক'রে একে চারভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল: 'পরিবারে নারী', 'সমাজ-জীবনে নারী', 'শিক্ষাক্ষেত্রে নারী', 'সমাজ-সেবায় নারী'। ঐদিন সকাল ৮টায় প্রতিনিধি-শিবিরে চারটি বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন শাখার অধিবেশন ব'সল শ্রীমতী রক্ষা শরণ, শ্রীমতী রেণুকা রায়, শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ ও ডাঃ শ্রীমতী সরযূ বলের নেতৃত্বে। শতাধিক প্রতিনিধি অভিনিবেশ-সহকারে প্রায় তিনঘণ্টাব্যাপী গভীর আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, 'শিল্পায়নের ফলে পরিবার-প্রথার উপর কঠোর আঘাত এসেছে, যৌথ-পরিবার একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। নারীকে জীবিকার্জনে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে, ফলে তার আর্থিক স্বাধীনতা এলেও শিশুপালন ও গৃহ-কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে

নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তার বৃত্তিশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন হয়েছে। সমাজ-জীবনে সে এগিয়ে এসে সব ক্ষেত্রে যথাযথ স্থান গ্রহণ করেছে, কিন্তু তার মূল্যবোধে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে—পাশ্চাত্যের অনুকরণ-প্রবণতা। অথচ এই সঙ্কটের সম্মুখীন পাশ্চাত্যের নারীগণ ভারতীয় জীবনাদর্শের মধ্যে সমাধান খুঁজছে। এ-বিষয়ে স্বামীজীর প্রদর্শিত আদর্শই তাকে সহায়তা করতে পারে—প্রতীচ্যের আদর্শের জাতীয়করণ এবং পুরানো আদর্শকে নব-রূপমণ্ডন করতে হবে, প্রাচ্যের ধ্যানপরায়ণতার সঙ্গে প্রতীচ্যের দক্ষতার সমাবেশ করতে হবে। সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে নারী দৃঢ়পদে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু সেবাকার্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত ত্যাগব্রতী কর্মীর প্রয়োজন। এ-বিষয়ে স্বামীজী-প্রবর্তিত সেবাদর্শ ই তাকে পথ দেখাতে পারে।'

ঐদিন সায়ংকালীন সাধারণ অধিবেশনে শাখা-সভাপতিগণ উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ জনসাধারণের গোচরে আনেন

আধুনিক যুগে যান্ত্রিক জড়বাদের প্রভাব সর্বত্র পরিস্ফুট। এই সময়ে স্বামীজীর প্রচারিত বেদান্ত-তত্ত্বের উপযোগিতা নিয়ে জিজ্ঞাসুর চিত্তে প্রশ্নের অন্ত নেই। সেজন্য 'আধুনিক জীবনে বেদান্ত' বিষয়টি আলোচনার জন্য রাখা হয়েছিল ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে। সেদিনের সভায় অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়েছিল, বোধ হয় তাদের কাছে বিষয়বস্তুটির বিশেষ আবেদন ছিল। সভানেত্রী মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া, বাংলার প্রখ্যাত দার্শনিক ডক্টর রমা চৌধুরী, রামকৃষ্ণ-সারদা-মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা এবং পাশ্চাত্য বিদুষী ডাঃ মারিয়া বুর্গি প্রমুখ প্রখ্যাত মহিলা দার্শনিকগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এঁদের সমবেত সিদ্ধান্ত: 'সর্বাধুনিক বিজ্ঞান জড়বাদের ভিত্তি চূর্ণ করেছে। আজ বিজ্ঞানও ঘোষণা করতে চায়—বিশ্ব-সত্য হ'ল একটি অখণ্ড চৈতন্য-প্রবাহ, এই তত্ত্বই বৈদিক যুগ হ'তে বেদান্ত ঘোষণা করেছে। ব্যাবহারিক জীবনে সাম্য, মৈত্রী ও মানব-ঐক্যের ভিত্তি এই বেদান্ত-তত্ত্ব। এই তত্ত্বের সহায়তাতেই আধুনিক জীবন-সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়, নূতন গঠনের নির্দেশ পাওয়া যায়।'

সম্মেলনের শেষ দিবস ২৮শে ডিসেম্বর সকাল ও সন্ধ্যায় দুটি অধিবেশন বসে, আলোচ্য বিষয় ছিল—'স্বামীজীর জীবন ও বাণী'। বিভিন্ন দিনের বিষয়গুলি যেন স্তরে স্তরে পরস্পর সংযুক্ত। প্রথম আলোচনা-অনুযায়ী শিল্পায়নের প্রভাবে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, তার সমাধান বৈদান্তিক জীবনাদর্শে পাওয়া যায়। পরদিন তাই বেদান্ততত্ত্ব আলোচনা হ'ল। এই বৈদান্তিক জীবনাদর্শের মূর্ত বিগ্রহ স্বামীজী, তাই তাঁর জীবন ও বাণী আলোচনার শেষ ধাপে এল। প্রাতঃকালীন অধিবেশনে শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় সভানেত্রীত্ব করলেন। তিনি স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর পূজনীয়া প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা (সারদা মঠের অধ্যক্ষা) শুভেচ্ছা-বাণী দিলেন। অতঃপর বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ স্বামীজীর জীবন-দর্শন ও সমাজ-দর্শন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন। জার্মানির প্রতিনিধি হিলট্রুড রুস্তঁা এই অধিবেশনে পাশ্চাত্যে স্বামীজীর প্রভাব-সম্বন্ধে একটি সুন্দর রেখাচিত্র দিলেন।

সায়ংকালীন অধিবেশনে সভামণ্ডপে তিল-ধারণের স্থান ছিল না। এই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁকে যে, তাঁরই মাতামহ-গৃহে একদিন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আতিথ্য গ্রহণ

করেছিলেন এবং সেখানেই তাঁর দেশখ্যাতা জননেত্রী জননী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁর (স্বামীজীর) দর্শন লাভ ক'রে ধন্য হন। আরও স্মরণ করিয়ে দিলেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবর্ষ-জয়ন্তীতে আহূত ধর্মমহাসভার একটি অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পৌরোহিত্য করেছিলেন। আলোচনায় আজ অংশ গ্রহণ করলেন —প্রথমে অষ্ট্রিয়ার প্রতিনিধি শ্রীমতী রুথ উইলসন। তিনি বিবরণ দিলেন—কিভাবে আজকের যুগ-সমস্যায় প্রতীচ্য দেশের জীবন-যাত্রায় স্বামীজীর চিন্তা সমাধানের উপায় নির্দেশ ক'রে চলেছে। জাপানের প্রতিনিধি শ্রীমতী ইয়সু উঠে বললেন, 'একদিন ভারত হ'তে ভগবান্ বুদ্ধ জাপানকে প্রভাবিত করেছিলেন, আর আজ সমৃদ্ধ জাপানকে প্রবুদ্ধ করছেন নবযুগাচার্য স্বামীজী। দুঃখের বিষয় স্বামীজী অজ্ঞাত-পরিচয়ে জাপানে পদার্পণ করেছিলেন, তখন কেউ তাকে চিনে নিতে পারেনি।' অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা আলোচনায় অংশ গ্রহণ ক'রে মনোজ্ঞ ভাষণে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন—আমাদের উপস্থিত কর্তব্য। হিন্দীভাষা-ভাষীদের নিকট স্বামীজীর জীবনচরিত ব্যাখ্যা করলেন শ্রীমতী সুভদ্রা হাকসার। অধ্যক্ষা শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ্ত স্বামীজীর আদর্শ বিবৃত করলেন সংক্ষিপ্ত সরল ভাষণে।

সেদিন সকাল হ'তেই সকলের মনে বিসর্জনের সুর বাজছিল, মনে হচ্ছিল বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল আমাদের এতদিনের কাম্য এই প্রিয় সম্মেলন—আমাদের এ-কদিনের আনন্দের হাট। স্বজনবিদায়-ব্যথা সকলের অন্তরকে মৌন ক'রে তুলেছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী তাই শেষ বিদায়-ভাষণে 'বিদায়' কথাটি উচ্চারণ করতে পারলেন না—বললেন, 'পুনরাগমনায় চ, পুনর্দর্শনায় চ।' শতবার্ষিকী সমিতির পক্ষ থেকে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজী সম্মেলনের সাফল্যে অভিনন্দন জানালেন। বিষাদের মধ্যে এইটুকু বড় আনন্দের—এমন শিক্ষাপ্রদ, বুদ্ধি-বিদ্যা-জ্ঞান-শুভেচ্ছার সঙ্গমে উচ্ছল সম্মেলন খুবই কম দেখা যায়। প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার শ্রীমতী অদিতি দে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিলেন।

বিদায় দিতে না চাইলেও সংসারে সব কিছুই বিদায় নেয়। শেষ হয়ে গেল আমাদের সম্মেলন।

মাত্র চারদিনের সম্মেলন। কিন্তু দেশ-বিদেশের এত বন্ধুলাভ এর পূর্বে আর কখনও কি হয়েছে? এই বন্ধুত্বের একটি সূত্র—সকলেই স্বামীজীর মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত! পশ্চিম জার্মানির প্রতিনিধি তাই সদ্যোলব্ধ বন্ধুটির বাংলা-ভাষায় রচিত গ্রন্থখানি সাদরে চেয়ে নিল অনুবাদ ক'রে পড়বে। এই পরস্পরকে বোঝবার প্রয়াস—এ কি পরম সম্পদ্ নয়? এই সম্মেলন হ'তে আমরা এই মহাসম্পদ্ই পেয়েছি। স্বামীজীও মানুষকে এই মহাসম্পদ্ দান করতে বলেছিলেন, 'Expansion is life and contraction is death. Love is life and hatred is death ?'

দিন চলে যাবে। স্বামীজীর এই শতবার্ষিকী উৎসবের কথা—ধর্মমহাসভার কথা, এই মহিলা-সম্মেলনের কথা, ইতিহাসের বিষয় হয়ে যাবে। অনেক যুগ পরের মানুষ জানতে চাইবে—নবযুগাচার্য স্বামীজীর প্রথম জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের কথা, জানতে চাইবে সমস্ত খুঁটিনাটি। তখন হয়তো তারা জেনে রোমাঞ্চিত হবে—এমন একটি মহিলা-সম্মেলন তখন হয়েছিল। সত্যই মহিলাদের মধ্যে এত বিদ্বজ্জন, কল্যাণধর্মী ও ত্যাগব্রতীদের এমন সমাবেশ বড় বেশী দেখা যায় না। এত প্রীতি, এত সৌহার্দ্য এখানে উৎসারিত

হয়েছিল এবং স্বামীজীর আদর্শকে নূতন ক'রে বোঝবার এমন আন্তরিক প্রয়াস হয়েছিল, যা সমাজ-জীবনে ও ব্যক্তি-জীবনে অশেষ কল্যাণ-প্রদ। যে বিপুল জনসমাগম এখানে প্রতিদিনই হয়েছে, তাও এক বিস্ময়ের বিষয়। প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে বসে থেকে গভীর অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা সহকারে এই বিপুল জন-সমাবেশ শুনেছে গভীর তত্ত্ব-আলোচনা এবং আধুনিক জীবন-সঙ্কট সম্বন্ধে বিশ্লেষণ-ধর্মী আলোচনা। এদের প্রকৃত আকর্ষণ সম্বন্ধে এতদিনের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল মনে হ'ল। মনের গভীরে আজকের মানুষের যে শূন্যতা—যে অভাব-বোধ, তার পরিপূরণ আজকের জীবনধারার মধ্যে নেই বলেই তার আজ এত অস্থিরতা।

এমন একটি ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগ দিতে পেরেছি, এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি—এ আমাদের অশেষ সৌভাগ্যের বিষয় ব'লে মনে করি।

সাবিত্রী-আবির্ভাব

শ্রীমতী পুষ্প দেবী

কম্পিত হ'ল বায়ুতরঙ্গ-কম্পিত অম্বর !
মহাশূন্যেতে শুধু শোনা যায় গুরুগম্ভীর স্বর।
তপ—তপস্যা শুধু এই কথা
জানালো কাহার আদেশ-বারতা
চারিধার শুধু প্রলয় গভীর শুধু কালো শুধু কালো-
কল্পারম্ভে ব্রহ্মার চোখে জ্বলে যে আশার আলো।

প্রলয়চিহ্ন হয়নি লুপ্ত গর্জে সাগর-জল,
ঊনপঞ্চাশ বায়ুর বেগেতে চারিদিক উচ্ছল।
ব্রহ্মা প্রথম সৃষ্টি করিতে
মোহের তামস নামিল চকিতে
আহত ব্রহ্মা—আপন সৃজনে টুটিল অহঙ্কার ;
রুদ্রমূর্তি ক্রোধ এল ধেয়ে—ভোগেতে জন্ম যার।

পদ্মগর্ভ সভয়ে তাকায় রুদ্র ভয়ঙ্করে,
সাগরের জল অতলান্তিক মৃত্যুর রূপ ধরে।
হেরিয়া করাল মূরতি তাহার
স্বয়ম্ভু হেরে সকলি আঁধার,
লক্ষ লক্ষ নাগিনী ফুঁসিছে পবনে অট্টহাস
ধ্যানের আসনে হ'ল চঞ্চল সৃষ্টি করার আশ।

করুণকণ্ঠে করে প্রার্থনা জুড়িয়া কমলপাণি—
অন্ধকারেতে কে শোনাল মোরে এই তপস্যাবাণী ?
উত্তর এল—অনন্ত আমি,
বিরাট অসীম ত্রিলোকের স্বামী
সৃষ্টির বীজ আমারি মধ্যে অনাদি ও মহাকাল
আমি তবে কেবা ?—কহিছে ব্রহ্মা কুঞ্চিত করি ভাল।

মম নাভিমূলে নব সৃষ্টির জন্য উদিলে তুমি,
কল্পে কল্পে পুরাতনী হয় এই প্রস্তুত ভূমি।
ক্ষুণ্ণ ব্রহ্মা কন জোড় হাতে—
এই কি প্রকাশ মৃত্যু যাহাতে
স্মিত হাসি হেসে কন দেব তবে—দোষী তুমি এর তরে
শান্ত জ্ঞানের কর আরাধনা শুদ্ধি হৃদয়ে ভরে।

লজ্জিত হয়ে ব্রহ্মা তখন পুনরায় বসে ধ্যানে—
কল্যাণময় সৃষ্টির তরে মগন আকুল প্রাণে।
তবু অস্থির কেন হয় মন ?
চারিধারে হায় সে কি গর্জন !
কম্পিত স্বরে করে প্রার্থনা—মোহ মোর কর ক্ষয়,
সত্যের আলো দাও হৃদে ভরে অসত্য কভু নয়।

প্রার্থনা তার হ'ল না বিফল মিটিল মনের সাধ ;
ব্রহ্মার কাছে জাগিল পুলকে আলোর আশীর্বাদ।
কমল নয়ন খুলিয়া তখন
কমলযোনি যে করে দরশন
আলোর আঁধার কাটায়ে আসিছে অপরূপ রূপবতী
অমরা-লাবণি শ্বেত কমলেতে সে কোন দিব্য জ্যোতিঃ !

-

আনন্দে হ'ল বিহ্বল মন স্তব্ধ পদ্মযোনি
রূপের সাগরে মগন পরান হৃদে আনন্দ-ধ্বনি
মনের বাসনা বুঝিয়া তাঁহার
দৈববাণীর হ'ল সঞ্চার
পরমা বিদ্যা জ্ঞানরূপা এই 'সাবিত্রী' নাম ধরে—
সবিতা দেবেরও বরণীয়া ইনি কল্যাণে সব ভরে।

সাবিত্রী দেবী নামিয়া দাঁড়ালো মরাল বাহন হ'তে
আঁখি-দিঠি তাঁর অমৃতে ভরিয়া বহে আনন্দ-স্রোতে,
দুধে ধোয়া যেন মুখ-শতদল
চরণ চুম্বি কালো কুন্তল
ক্ষণেকের তরে ব্রহ্মার মনে মোহের আবেগ জাগে—
শিহরি সরমে মিলালো সে রূপ অভিমানে অনুরাগে।

কহি গেল—একি, তুমি যে ব্রহ্মা, কল্যাণ-রূপ তব,
কামনার দাস নহ তো কখনো কেমনে হেথায় রবো?
মিলালো মূরতি অচল চরণ
অশ্রু ঝরিছে, কমল-নয়ন
কহে—ফিরে এস তুমি সাবিত্রী,' কেন নাহি সাড়া দেয়!
নিবিড় আঁধার সে কি বিভীষিকা কল-কল্লোল হায়!

কমল-নয়নে ঝরে শতধারা অনুতাপে ভরা মন
সদয় হইয়া অলক্ষ্য হ'তে আবার কে কথা কন:
অখিল লোকের জ্ঞান-প্রকাশিকা
তাহারে হারালে পাবে কার দেখা?
কামনার দাসী নহে সেই নারী বরণীয় সেই জন,
জ্ঞান-বিদ্যায়—শুধুই হৃদয়ে আবির্ভূত যে হন।

সে মহাশক্তি নিজ ইচ্ছায় আপনি যখন আসে,
শুদ্ধসত্ত্ব সাধনার বশে নিজে সাধকের পাশে,
অশুচি তোমার এই তনুমন—
করহ শুদ্ধ ক'রে আরাধন,
অন্তর তব কর পবিত্র তুষ্ট করিয়া তাঁয়,
তবে পাবে তাঁর পুন দরশন জগৎ যাঁহারে চায়।

সুকঠিন তপে রত হন তবে ব্রহ্মা কঠোরভাবে,
বহিরন্তর করিল শাসন শোধন তপের তাপে।
কহে—ক্ষমা কর, তুমি ধৃতি মেধা,
মঙ্গলা তুমি নির্মলা স্বধা,
কল্যাণী তুমি সৃষ্টি-সহায়ে আমারে পূর্ণ করো,
নয়ন অন্ধ, শ্রবণ বধির আমার জড়তা হরো।

সহস্রার-মাঝে ধ্বনি শোনা গেল—স্তব্ধ পদ্মযোনি !
বাহিরেতে নয়, নিজ অন্তরে সে কোন চরণধ্বনি !
দিব্য জ্যোতির মধুর ছন্দ
চারিদিক ভরে কিসের গন্ধ
সে জ্যোতি আপনি ধরিল মূরতি ব্রহ্মা আত্মহারা !
পুলকে বিভল অন্তরে তাঁর বহে আনন্দধারা ।

হৃদয়-কমলে আসিয়া দাঁড়ালো জ্যোতির প্রতিমাখানি
সর্বশুক্লা ধীরে ধীরে যেন হয়ে গেল নীল মণি
হৃদয়-সাগরে সুনীল আলোক
ভরে গেল তার ভূলোক দ্যুলোক
নীল নয়নেতে নীলের আবেশে সে কি আনন্দময় !
চমকি ব্রহ্মা শুধান আপনি—কে ইনি, কি এঁরে কয় ?

হাসি সাবিত্রী বলে—আমি হই সৃষ্টির সহায়িনী—
আমি রজোদ্যুতি রক্তকমলে আমি তব ব্রহ্মাণী ।
প্রলয়কালেতে সর্বশুভ্রা
স্থিতিতে নীলাভ হই নীলপ্রভা—
সৃষ্টির কালে রক্তাভ আমি তিনরূপে রূপ ধরি,
বীর্য বিবেক ক্ষমা ও শান্তি রয়েছে আমারে ঘিরি ।

কমল-দলেতে আসিয়া দাঁড়ালো ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণী
আজিকে সৃষ্টি পূর্ণ করিতে এল সাবিত্রীরানী :
দোঁহার মিলন দীপ্ত প্রভাতে
চক্রের মালা এলো সাথে সাথে
সুদিব্য সেই মালায় গাঁথা যে চতুর্বেদের বাণী ;
চরণে প্রণমি জানালো জগৎ, জননী তোমায় জানি ।

তখন সাগর হইল শান্ত, সে কোন মন্ত্রবলে,
ভুজঙ্গদল মাথা নত ক'রে হয়ে যেন হীনবলে,
চারি বেদ আর সপ্ত ছন্দে
ছত্রিশ রাগ চরণ বন্দে
ছন্দ মধুর সৃষ্টির সুরে ভরিল গগনতল,
থামিল সকল কল-কলরোল স্তব্ধ সাগরজল ॥*

---

* দ্রষ্টব্য : শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম অধ্যায় ২য় স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায় ৩য় স্কন্ধ এবং দেবী ভাগবত ২৬ অধ্যায় ৯ম স্কন্ধ ।

সমালোচনা

শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ-চরিতম্ (সংস্কৃত—চম্পূ-কাব্যম্)—ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। প্রকাশক: স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সেক্রেটারি, বিবেকানন্দ-জন্মশতাব্দী জয়ন্তী সমিতি, ১৬৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৪। পৃষ্ঠা ১৪৫; মূল্য ২৲।

সংস্কৃত দেবভাষা। হিন্দুদিগের ধর্মগ্রন্থ অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃত ভাষা স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁহার পুণ্য জীবনচরিত সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশন যে সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সংস্কৃতও যে কথ্যভাষা হইতে পারে, গ্রন্থের সরলতা ও সহজবোধ্যতা তাহাই প্রমাণ করে। ডক্টর যতীন্দ্রবিমলের জীবনব্যাপী সাধনাই ছিল সংস্কৃতকে সহজ সরল করিয়া জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করা। স্বামীজীর আবির্ভাব হইতে মহাসমাধি পর্যন্ত ঘটনাবলী এই গদ্যপদ্যময় চম্পূকাব্যে নিপুণভাবে সুবিন্যস্ত। প্রাঞ্জল ভাষায় অলঙ্কার-প্রাচুর্য—যেন মণিকাঞ্চন-যোগ। পদ্যগুলি বিভিন্ন ছন্দে সংগ্রথিত। গ্রন্থখানি সুধীজনের আদরণীয় হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ (দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ)—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পৃষ্ঠা ৪০২+১২; মূল্য ৬৲।

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত তথ্যপূর্ণ এই স্মারক গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করায় প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত। যথাসময়ে পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ইহার পরিচালকমণ্ডলী ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণে ছয়টি মূল্যবান্ সুচিন্তিত প্রবন্ধ নূতন সংযোজিত, 'বিবেকানন্দ-দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ত্ব' প্রবন্ধটি পরিবর্ধিত এবং ভগিনী নিবেদিতার 'The National Significance of the Swami Vivekananda's Life and Work' প্রবন্ধের অনুবাদ সন্নিবেশিত। বহু নূতন চিত্র ইহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থের কলেবরের তুলনায় এক টাকা মূল্যবৃদ্ধি অসমীচীন হয় নাই।

পুণ্যতীর্থ ভারত—(দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ) স্বামী দিব্যাত্মানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৪০৮; মূল্য ১০৲।

এই গ্রন্থে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের প্রসিদ্ধ ও প্রধান তীর্থসমূহের ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভ্রমণকাহিনীর সহিত তীর্থগুলির ঐতিহ্যগত তত্ত্ব বিবৃত হওয়ায় পাঠক-পাঠিকামাত্রেরই হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইবে। এই পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে কৈলাস, কেদার-বদরী, পশুপতি, অযোধ্যা, প্রয়াগ, বিন্ধ্যাচল, বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্লী, কুরুক্ষেত্র, বৈদ্যনাথ এবং বাংলাদেশের তারকেশ্বর, নবদ্বীপ, কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর ভ্রমণবৃত্তান্তও লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

দৈনিক বসুমতী সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক-গ্রন্থ (১৩৭১)—দৈনিক বসুমতীর সুবর্ণজয়ন্তী কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত ও ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২১২।

'দৈনিক বসুমতী'র ৬০ বৎসরের ইতিহাস—ভারতের পতন-অভ্যুদয়ের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। ঐতিহ্যপূর্ণ এই পত্রিকা স্বামীজীর আশীর্বাদ-পূত, তাঁহারই প্রদত্ত 'নমো নারায়ণায়' মন্ত্র অবলম্বন করিয়া নরনারায়ণের সেবায় 'বসুমতী'র আত্মপ্রকাশ। দীর্ঘকালের মধ্যে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে আদর্শের দিকে আগাইয়া দিয়াছেন। সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শুভেচ্ছা, সুলেখকগণের রচনা, বহু চিত্র ও নানা তথ্যে এই স্মরণিকা সমৃদ্ধ। প্রবন্ধের মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনগুলি সন্নিবেশিত না হইলে পত্রিকার সৌষ্ঠব আরও বৃদ্ধি পাইত।

The Awakening—Swami Vivekananda Centenary Women's Conference Souvenir, Published by Swami Sambuddhananda. General Secretary, Swami Vivekananda Centenary Committee, 163 Lower Circular Road, Calcutta 14. Pp. 101 + xiii; price Rs. 3·50.

স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত বিরাট মহিলা-সম্মেলনে যে-সব সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা সচিত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের আশীর্বাণী ও শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজের ভাষণ এই স্মরণিকার প্রথম দিকে সন্নিবেশিত। বিশিষ্ট ভারতীয় প্রতিনিধিদের ভাষণগুলি ছাড়াও দেশবিদেশের প্রতিনিধিগণের ভাষণ দ্বারা পত্রিকাখানি সমলঙ্কৃত। শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এই মহিলা-সম্মেলনের বহু চিত্র এই পত্রিকাটিকে জীবন্ত করিয়াছে।

Swami Vivekananda Centenary Exhibition (1964): A Bibliography and a Brief Chronology, National Library, Calcutta.

জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত বিবেকানন্দ-শতবার্ষিকী প্রদর্শনীতে স্বামীজীর ও স্বামীজী-সম্বন্ধীয় যে গ্রন্থরাজি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার একটি বিবরণী-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রত্যেকেরই ধারণা হইবে যে, বিবেকানন্দ-সাহিত্য সাহিত্য-জগতে এক বিরাট সংযোজন এবং স্বামীজীর সঞ্জীবনী বাণীর জন্য সমগ্র জগদ্বাসীর আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পুস্তিকা পূর্ণাঙ্গ নয়, কারণ বহু ভাষায় বহু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, এইসব পুস্তকের তথ্যাদি সংগ্রহ করা দুরূহ। তথাপি ইহা প্রকাশ করার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পথিকৃৎ বলিয়া ধন্যবাদার্হ। ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন ভাষায় স্বামীজী-সম্বন্ধে ৯৩৬ খানি পুস্তকের উল্লেখ আছে।

প্রাক্তনী (১৩৭০): স্বামী বিবেকানন্দ-শতাব্দী জয়ন্তী সংখ্যা, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, চব্বিশ-পরগনা। পৃষ্ঠা ৮৭।

বিদ্যার্থী ভবনের প্রাক্তন বিদ্যার্থিবৃন্দ কর্তৃক প্রকাশিত 'প্রাক্তনী' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা ১২টি আকর্ষণীয় চিত্রে সুশোভিত। বহু খ্যাতনামা সন্ন্যাসী লেখকের লেখনীমুখে স্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিশ্লেষণ পত্রিকাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। স্বামীজীর জীবন-পটভূমিকায় মনোজ্ঞ লেখাগুলি মানবের কল্যাণসাধনে সক্ষম হইবে।

বিদ্যার্থী (১৩৭০): স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্দী জয়ন্তী সংখ্যা, রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা

আশ্রম, বেলঘরিয়া, চব্বিশ-পরগনা। ।৮৮+৬৪।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ মৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ আশীর্বাণী-দানে 'বিদ্যার্থী' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। মঠ-মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজীর কল্যাণবাণী পত্রিকাটির কল্যাণ-সাধন করিবে—সন্দেহ নাই। ইহাতে ১০ খানি চিত্র সন্নিবেশিত। প্রবন্ধ-নির্বাচন অতি সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক হইতে লিখিত রচনাগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

হে মহাজীবন: শ্রীশান্তশীল দাশ। ৯৮ সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা ৩০। পৃষ্ঠা ৩২; মূল্য ১৲।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে আটটি এবং স্বামীজীর উদ্দেশে বারোটি কবিতা স্বামীজীর শতবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচ্য পুস্তকে সঙ্কলিত। ছন্দোবদ্ধ রচনায় মহাজীবনের অনুধ্যান সুস্পষ্ট। আবৃত্তির উপযোগী কবিতা-গুলি আশা করি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে।

রাধা-মদনমোহন (তৃতীয় সংস্করণ): শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র, ১১-এ গোকুল মিত্র লেন, মদনমোহনতলা, কলিকাতা ৫। পৃষ্ঠা ১৮৪; মূল্য ৫৲।

কলিকাতা বাগবাজারের বিখ্যাত বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদনমোহনের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক অলৌকিক কাহিনী ঐতিহাসিক তথ্যসহ সুখ-পাঠ্য গল্পের মাধ্যমে অত্যন্ত ভক্তিভাবে পরিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানি কিরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে, ইহার তৃতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ।

বাংলার বৈষ্ণবদর্শন—মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ। প্রকাশক: শ্রীগুরু লাইব্রেরি। ২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬। ৩২৬; মূল্য সাত টাকা।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। অধ্যাত্মদর্শনের দিক থেকে সমগ্র ভারত, এমন-কি সমগ্র বিশ্বের কাছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন আপন স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল শাস্ত্র। পঞ্চম পুরুষার্থে প্রেম প্রতিপাদ্য বিষয় হওয়ায় দুরূহ শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে গভীর অনুভূতির এমন আশ্চর্য সমন্বয় এ দর্শনে ঘটেছে, যার ফলে শুধুমাত্র দার্শনিকের কাছেই নয়, কবি, শিল্পী, সৌন্দর্য-রসপিপাসু সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছেই বাংলার বৈষ্ণবদর্শন পরম আগ্রহের বিষয়।

বাংলার গৌরব ও সাধনার এই অপূর্ব সম্পদ মহামহোপাধ্যায় প্রথমনাথ তর্কভূষণের স্বচ্ছ প্রাঞ্জল মনীষাদীপ্ত ভাষায় বাংলা দর্শন-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে এ গ্রন্থের প্রবন্ধসমষ্টি মাসিক বসুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতকাল পরে মহামহোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্যের সুসম্পাদনায় এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়ে জিজ্ঞাসু পাঠকসমাজের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করেছে।

ভারতীয় দর্শনে বাঙালীর দান, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন, পারমার্থিক রস, মুক্তি ও ভক্তি, শ্যামের বাঁশী, সাহিত্যে শ্রীরাধা এবং রথযাত্রা—এ-কয়টি প্রবন্ধসমষ্টিকে পর্বাকারে ভাগ ক'রে ষড়্দর্শনের পটভূমিকায় বাংলার বৈষ্ণবদর্শনের যে তথ্যভূয়িষ্ঠ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে সাধিত হয়েছে, বাংলা ভাষায় দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে তা আদর্শস্বরূপ। মহামহোপাধ্যায়ের বিপুল শাস্ত্রজ্ঞানের পটভূমিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপ সবরকম একদেশদর্শিতা-মুক্ত হয়ে নিজস্ব মহিমায় প্রকাশিত হ'তে

পেয়েছে—এইটিই এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু যে সরস নৈপুণ্যের সঙ্গে এই জটিল বিষয়কে শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ সর্বজনবোধ্য ক'রে তুলেছেন, বাংলা গদ্যশিল্পে তাঁর সেই অসাধারণ দক্ষতাও এ গ্রন্থপ্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে জাগে। দার্শনিক তত্ত্ববিচারে ভিন্নমতের অবকাশ থাকলেও বাংলা সাহিত্যে দার্শনিক তত্ত্বালোচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে এ গ্রন্থের লেখক ও সম্পাদকের কাছে বাঙালী জাতির ঋণ অবশ্যস্বীকার্য।

সুমুদ্রিত ও সুশোভন প্রচ্ছদসমন্বিত এ গ্রন্থের বাঁধানোর কাজ আর একটু স্থায়িত্বগুণসম্পন্ন করা যায় কি না, এ সম্বন্ধে প্রকাশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় বা গ্রন্থাগারে এ বইখানি একান্ত প্রয়োজন।

মুখবন্ধে শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'ক্ষুরধার সূক্ষ্মবুদ্ধির সহিত রসবোধের একটা বিরোধ আছে বলিয়া আমাদের সাধারণ ধারণা। আমরা মনে করি—দীর্ঘদিনের জ্ঞানের চর্চা মানুষের হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া দেয়। কিন্তু কথাটি যে সর্বত্র সত্য নহে, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।' শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দাশগুপ্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলি, এ গ্রন্থটিও সেই প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত

—প্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

কার্যবিবরণী

মালদহ: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৬৩-৬৪ খৃঃ সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণীতে প্রকাশ—আলোচ্য বর্ষে মঠশাখায় নিয়মিত ধর্মালোচনা, শাস্ত্রপাঠ, ভজন, প্রতি একাদশীতে রামনাম-সঙ্কীর্তন, আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা, নরনারায়ণসেবা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

মিশন-শাখা কর্তৃক অনেকগুলি শিক্ষা ও সেবাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। আশ্রম-সংলগ্ন ভূমিতে বিবেকানন্দ-বিদ্যামন্দির উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৫৬৬। আশ্রমের ছাত্রাবাসে ২৩জন বিদ্যার্থী ছিল। গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্যা ১,৭২৯; ব্যবহৃত পুস্তকসংখ্যা ৮১৩। নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, উদ্বাস্তু বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, শিশুসঙ্ঘ, মহিলা-শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র, নার্সারি বিদ্যালয় প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

আশ্রমে ও গ্রামে দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়ে মোট ৫৩,৮০৭ রোগীকে (নূতন ৬,১৩২) ঔষধ দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদ্যাপিত হয়। মিশন-শাখা কর্তৃক ১০৬টি মধ্যবিত্ত পরিবার-সমন্বিত একটি উদ্বাস্তু কলোনী শহরের এক সুদৃশ্য অংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্যামলাতাল: শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের বার্ষিক কার্যবিবরণী (এপ্রিল '৬৩—মার্চ '৬৪) প্রকাশিত হইয়াছে। ৪,৯৪৪ ফুট উচ্চে হিমালয়ের সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশে এই আশ্রম

১৯১৪ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫ মাইলের মধ্যে অন্য কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় না থাকায় সেবাশ্রমটি অসহায় ও দরিদ্র পার্বতীয়দের একমাত্র চিকিৎসার স্থান।

সেবাশ্রমের দুইটি বিভাগ: বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ। অন্তর্বিভাগে ১২টি শয্যা আছে। এ পর্যন্ত উভয় বিভাগে মোট ২,৩১,১৩৯ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বহির্বিভাগে চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯,৬৮৯ (নূতন ৭,৩৬০); অন্তর্বিভাগে ১৬৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে।

পশু-চিকিৎসালয়: গৃহপালিত মূক প্রাণীদের চিকিৎসার জন্য এই বিভাগটি ১৯৩৯ খৃঃ খোলা হয়। এ পর্যন্ত ৬০,৫৩১ পশুর চিকিৎসা করা হইয়াছে। অস্ত্র-চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষে ৩,৩১৪ পশু চিকিৎসিত হয়।

আমেরিকায় বেদান্ত

স্যানফ্রান্সিস্কো (বেদান্ত-সোসাইটি): নূতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। অগস্ট মাসে কোন বক্তৃতা হয় নাই। পুরাতন মন্দিরে ধ্যানের ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই: সাধারণ মানুষ কিরূপে সাধুতে পরিণত হয়; আধ্যাত্মিক অনুভূতি; নীরবতা অভ্যাস; শরীর-মনের বিকার ও আত্মা; ঈশ্বরদর্শনের অর্থ; বিজ্ঞান ও অনুভূতি-সম্মত ধর্মই প্রয়োজন; গুরু ও শিষ্য।

সেপ্টেম্বর: ঈশ্বর স্বয়ংপ্রকাশিত, না আমরা তাঁহাকে আবিষ্কার করি? ধ্যানের সময় তীর্থযাত্রা; স্বপ্ন ও অধ্যাত্ম-জীবন; আত্ম-চেতনা জাগাইবার উপায়; স্বামী বিবেকানন্দ ও জগতের ঐক্য।

বিবিধ সংবাদ

ধর্মপাল-জন্মশতবার্ষিকী

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনাগারিক ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী ও অহিংসার মহাবাণী পৃথিবীতে নূতন করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটিতে বিহারের রাজ্যপাল শ্রীআয়েঙ্গার ধর্মপাল-জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন সিংহলের সহকারী হাই-কমিশনার এবং গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম, নেপাল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানি, ব্রিটেন ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণ। সকলেই ধর্মপালের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। কলিকাতার বিশিষ্ট বক্তাগণ ধর্মপালের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। সভায় শ্রদ্ধেয় দালাই লামার প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। ১৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি ও পণ্ডিত ব্যক্তি ভাষণ দেন।

পোপের ভারত-আগমন

গত ২রা ডিসেম্বর খ্রীষ্টান জগতের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ষষ্ঠ পল ৩৮তম ইউক্যারিষ্টিক কংগ্রেসে যোগদান উপলক্ষে ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি বোম্বেতে খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান উভয়বিধ জনসাধারণ কর্তৃক বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর

জাকির হোসেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সান্তাক্রুজ বিমান-বন্দরে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। পোপ বিশ্বশান্তি-স্থাপনে ভারতের প্রয়াসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—সকল মানুষই পরম পিতা ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং এই সূত্রে তাহারা ভাই। এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব-বোধ যত প্রসার লাভ করিবে, এই যুগে জগতের ততই কল্যাণ। তিনি ভারতবাসীর অভ্যর্থনায় বিশেষ অভিভূত হন এবং বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করেন।

বৌদ্ধ-মহাসম্মেলন

সারনাথে গত ২৯শে নভেম্বর সপ্তম সাধারণ বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাত্র মহাসম্মেলন সংঘটিত হয়। ইহাতে বহু বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদিগের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিশ্বশান্তি, মানবের ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের বাণী যে কতখানি সাফল্যলাভে সহায়তা করিতে পারে, তাহা এই সম্মেলনে বিশদভাবে আলোচিত হয়। রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভাষ ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাণী ও জীবনাদর্শের উপলব্ধি করিয়া মানবজীবনে তাহা রূপা করিতে পারিলে মানবসমাজের বহু উপকা হইবে—এইরূপ বলেন। সন্দেহ ও হিংসাদ্বে জর্জরিত এই বিশ্বে ভগবান্ বুদ্ধের বাণীই শান্তি দানে সক্ষম।

পরলোকে পাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে অবসরপ্রাপ্ত পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শান্তিপুরনিবাসী পাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত ১লা নভেম্বর ৭৮ বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করিয়াছেন. তিনি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সাধুগণের তিনি আজীবন সেবা করিয়া গিয়াছেন। শান্তিপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইহার সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহা দেহমুক্ত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। ওঁ শান্তিঃ



বিজ্ঞপ্তি

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শুভ জন্মতিথি আগামী ১০ই পৌষ (২৫.১২.৬৪) শুক্রবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে ও অন্যত্র বিশেষ পূজানুষ্ঠান সহকারে উদ্‌যাপিত হইবে।



